শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ অনুধ্যান

(তৃতীয় ভাগ)

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on *Bhagavat Mahapuran*
before the students of Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

হিন্দু ধর্ম যদিও বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুদের কাছে বেদই মূল গ্রন্থ, তথাপি আঠারোটি পুরাণকে হিন্দু ধর্মের খুবই উচ্চমানের গ্রন্থ রূপে গণ্য করা হয়। ঋষি-মুনিদের দ্বারা উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যে সমৃদ্ধ হিন্দু ধর্মে আজ পর্যন্ত যা কিছু আছে সব বেদ থেকেই এসেছে, বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রমাণ মানে বাংলার প্রমাণ নয়, এই প্রমাণ দর্শন শাস্ত্রের প্রমাণ, যার দ্বারা কোন জিনিসকে জানা হয়। অধ্যাত্মের যা কিছু আছে, ধর্মের যা যা আছে তার একমাত্র প্রমাণ বেদ, বেদ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নেই। যেমন কথামৃতে ঠাকুর যে কথা বলেছেন, এটাই প্রমাণ, ঠাকুর বলে দিয়েছেন এর উপর আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। বেদে যা যা কথা বলা আছে তার উপর আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। কেন প্রশ্ন করা যায় না, এর উপর আবার দর্শন শাস্ত্রে বিস্তারিত আলোচনা চলে। কেন প্রশ্ন করা যায় না, এটি একটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। হিন্দু ধর্ম যেমন বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক তেমনি ইসলাম ধর্ম কোরানের উপর প্রতিষ্ঠিত, খ্রীশ্চান ধর্ম বাইবেলে প্রতিষ্ঠিত। বাইবেলে যদি কোন কথা পরিষ্কার ভাবে বলা থাকে, খ্রীশ্চানরা আর ওটাকে নিয়ে প্রশ্ন করবে না। কিন্তু বেদে সব কথা বলা নেই, কিছু কথা যেমন বিস্তারিত ভাবে বলছেন আবার কিছু কিছু কথা আকার ইঙ্গিতে বলে দিয়েছেন, কিছু কিছু ধারণা বীজাকারে দিয়ে গেছেন। পরের দিকের ঋষি মুনিরা ঐ কথাগুলোকে, বীজাকারে থাকা ধারণাগুলিকে বিস্তারিত ভাবে দাঁড় করালেন, পরে ওটাই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হয়ে গেছে।

যে কোন ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চারটি স্তম্ভের দরকার, প্রত্যেক ধর্মই চারটে স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমটাই হয় দর্শন, যে কোন ধর্মের যদি পরিষ্কার কোন দর্শন না থাকে, যে দর্শন তাকে অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা করে দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ধর্মই ধর্ম হবে না। হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন আসে উপনিষদ আর গীতা থেকে। গীতা উপনিষদ আবার বেদের উপরেই আধারিত। দ্বিতীয় স্তম্ভ অর্চনা বিধি, দর্শনের পরেই যে কোন ধর্মের দরকার হয় অর্চনা বিধির, অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজা, অর্চনা, উপাসনা কিভাবে করা হবে। এই অর্চনা বিধির কিছু আসে পুরাণ থেকে আর কিছু আসে তন্ত্র থেকে। কিন্তু এরও মূল কথা বেদেই আছে, বেদ থেকেই বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু পুরাণে চলে গেছে আবার কিছু তন্ত্রে চলে গেছে। তৃতীয় স্তম্ভ আচার সংহিতা, সকালে আমাদের কখন শয্যাত্যাগ করতে হবে, রাত্রে কখন শুতে যাব, হাত কতবার ধুতে হবে, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ কিভাবে হবে, এগুলোকে বলে সামাজিক আচার বিধি। হিন্দু ধর্মের যত রকম আচার আছে, সব আচার আসছে স্মৃতি শাস্ত্র থেকে। মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, রঘুনন্দন স্মৃতি, হিন্দু ধর্মে এই রকম শত শত স্মৃতি আছে, বর্তমান কালে ভারতের সংবিধান এটাও একটা স্মৃতি। তবে সংবিধানকে শাস্ত্র বলা যাবে না, কেন বলা যাবে না, পরে প্রসঙ্গক্রমে এর উপর আলোকপাত করা হবে। ধর্মের চতুর্থ স্তম্ভ পুরাণ, পুরাণ মানে পৌরাণিক কাহিনী। আধ্যাত্মিক সত্যগুলোকে সরাসরি বলে দিলে মানুষ ঠিক ধারণা করতে পারবে না। ওগুলোকে ধারণা করানোর জন্য দরকার কিছু কথা ও কাহিনী। কথা কাহিনী আবার দুই রকমের হয়। একটা হয় যেখানে রাজারানী, রাজ্য, সাম্রাজ্য এগুলোকে কেন্দ্র যে ধর্মীয় কাহিনী রচিত হয় তখন তাকে বলা হয় ইতিহাস। স্কুল কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয় এই ইতিহাস সেই ইতিহাস নয়। এই ইতিহাসের একটা বিশেষ অর্থ হয়, রাজারানী, সাম্রাজ্য এই কাহিনীকে আধার করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলোকে মানুষের মনে ঢোকান। আর যখন দেবী-দেবতাদের কাহিনী দিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ধারণা করান হয় তখন তাকে বলা হয় পুরাণ। আমাদের মিথোলজিতে দুটো গ্রন্থ আছে, ইতিহাস আর পুরাণ, এর নামই হল ইতিহাস-পুরাণ সাহিত্য। তবে ইতিহাস আর পুরাণে খুব বেশি তফাৎ করা যায় না। যেমন রামায়ণ মহারভারতেও প্রচুর দেবী-দেবতার কাহিনী আছে আর পুরাণেও রাজারানীর কাহিনী আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছুই ঐতিহাসিকরা পুরাণ থেকে খুঁজে খুঁজে বার করেছেন। যেমন চন্দ্রগুপ্তের আগে যে নন্দ বংশ ছিল, এদের কথা পুরাণে আছে। পুরাণের দুটো

ভাগ বলা হল, ইতিহাস আর পুরাণ। ইতিহাসের মধ্যে আসে বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত। পুরাণেরও আবার দুটো ভাগ, পুরাণ আর উপপুরাণ। আমাদের আঠারোটি পুরাণ, উপপুরাণও আঠারোটি। আঠারোটি পুরাণ মিলিয়ে শ্লোকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। যেমন ভাগবত পুরাণ, আমরা যার আলোচনা করছি, এতে প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে। আর মহাভারতের একাই এক লক্ষ শ্লোক।

হিন্দু ধর্মকে যদি ঠিক ঠিক জানতে হয়, বুঝতে হয় তাহলে এগুলোকে জানতে হয়। হিন্দু ধর্মের এই বিশাল শাস্ত্রের সবটাই আমাদের ঋষিরা রচনা করে গেছেন, তাঁরা আবার কোথাও নিজের নামটাও উল্লেখ করছেন না, আমরা তাই জানি না এত শাস্ত্র কারা রচনা করেছিলেন, শুধু বলা হয় ঋষিদের রচনা। ঋষিরা মনে করতেন, এর সব কথা ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে এখানে আমার কিছু কৃতিত্ব নেই। ঋষিরা তাই কোথাও নিজের নাম উল্লেখ করতেন না। তাতে একটা সমস্যা হয়ে গেল। ব্যাসদেব তাঁর নিজের সময় একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন। হিন্দু ধর্মের তাঁর বিরাট অবদান, প্রথমে তিনি বেদের বিভাজন করলেন। ব্যাসদেবের আগে বেদ বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, ঋষিদের কাছে ছড়িয়ে ছিল, কেউ জানতেন না কত বেদ আছে। তিনি নিজের শিষ্যদের দিয়ে যেখানে যত বেদ ছড়িয়ে ছিল সব বেদকে সংগ্রহ করলেন, সংগ্রহ করার পর উনি সমগ্র বেদকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঋক্, সাম, যজুঃ আর অথর্ব এই চারটে ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি মহাভারত রচনা করলেন। ব্যাসদেবকে তাঁর নিজের সময়ই হিন্দুরা একজন যুগপুরুষ রূপে মেনে নিল। পুরনো দিনে বালুঘড়ি ছিল, বালুঘড়িতে একটা পয়েন্ট থাকে, যেখান দিয়ে প্রত্যেকটি বালিকণাকে বেরোতে হয়। পাত্রের উপরের অর্দ্ধাংশে যে বালি থাকে সেখানে প্রত্যেক বালিকণাকে যেতে হয় না, কিন্তু ঐ যে ছোট ফুটো আছে ওখান দিয়ে সব কটা বালিকণাকে আসতে হয়। ব্যাসদেব হলেন হিন্দু ধর্মের সেই ফুটো। ব্যাসদেবের আগে পর্যন্ত হিন্দু ধর্মে যা কিছু ছিল, তার যেগুলো ব্যাসদেবের ফুটো দিয়ে গিয়েছে সেটাই হিন্দু ধর্মে থাকল, যেগুলো ঐ ফুটো দিয়ে আসেনি সেগুলো ইতিহাসের গর্ভে পড়ে থেকে গেল। তখনকার দিনে ধর্মের যা কিছু ছিল সব কিছুকে ব্যাসদেব সমন্বয় করলেন। যুগপুরুষের দিক থেকে দেখলে শ্রীকৃষ্ণকেই যুগপুরুষ বলা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যে গীতা সেটা আবার ব্যাসদেবের রচনার মধ্যেই পড়ে, সেইজন্য ব্যাসদেব আর শ্রীকৃষ্ণকে আমরা একসাথে নিয়েই চলছি।

হিন্দু ধর্মের দ্বিতীয় সমন্বয় শঙ্করাচার্য এসে করলেন। ব্যাসদেবের পর হিন্দু ধর্মের সব কিছু আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল, শঙ্করাচার্য এসে সব একটা জায়গায় নিয়ে এলেন। সেখান থেকে আবার সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এসে সব কিছুকে আবার সমন্বয় করে দিলেন। হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে তিনটে মিটিং পয়েন্ট, যেখানে সব কিছু এসে মিশে যায়। যদি বাংলা চারকে (৪) আড়াআড়ি করে কয়েকটা চার লেখা হয়, চারের মাঝখানে এসে সব এসে মিশে যাচ্ছে, তারপর আবার ওখান থেকে ছড়িয়ে আবার একটা জায়গা গিয়ে মিশে যাচ্ছে। এর একটা জায়গায় ব্যাসদেব দাঁড়িয়ে আছেন, আরকটা জায়গায় আচার্য শঙ্কর দাঁড়িয়ে আছেন আর তার আরেকটা জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। এখন ঠাকুর স্বামীজী যা বলে দিয়েছেন হিন্দু ধর্মে ঐটাই থাকবে। শঙ্করাচার্য যেটাকে বাদ দিয়ে দিলেন, হিন্দু ধর্ম থেকে সেটা চিরদিনের মত বাদ হয়ে গেল, ঠিক তেমনি ব্যাসদেব যেটাকে বাদ দিয়ে দিলেন সেটাও চিরদিনের মত বাদ হয়ে গেল। ঐ সময় এত কবিরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ঠাকুর, দেবী-দেবতা নিয়ে এত কিছু যে রচনা করলেন, এখন এনাদের কথা কে শুনতে যাবে! ওনারা তাই যা কিছু লিখলেন বলে দিলেন এটা ব্যাসদেবের রচনা। সেই থেকে পরম্পরাতে প্রচলিত হয়ে গেল, যত পুরাণ আছে সবই নাকি ব্যাসদেবের রচনা। ভৌতিক রূপেও এটা সম্ভব নয় যে ব্যাসদেব তাঁর জীবদ্দশায় একা এত কিছু রচনা করে গেছেন। অনেকের মত হল, ব্যাসদেব ভাগবতের সারটুকু লিখছিলেন, পরের দিকের কবি বা ঋষিরা ওর কলেবরকে বাড়িয়েই গেছেন। কলেবর যেমন যেমন বাড়তে থাকল, পুরাণ গুলোও তেমন তেমন আলাদা হতে থাকল। এই আঠারোটি পুরাণের সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক একটা মনুষ্য জীবনে পড়বে কখন? তার উপর আবার আঠারোটি উপপুরাণ, সব মিলিয়ে ছত্রিশ খানা মোটা মোটা গ্রন্থ। এই নিয়ে তখন কোন এক ঋষি একটা খুব সুন্দর শ্লোক রচনা করেছিলেন, *অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনং দ্বয়ম্*, আঠারোটি পুরাণে ব্যাসদেবের মাত্র দুটি কথা, পরোপকার

যদি কর তাহলে এটাই পূণ্য আর অপরকে যদি কষ্ট দাও তখন এটাই পাপ। পূণ্য মানে অপরের উপকার করা আর পাপ মানে অপরকে কষ্ট দেওয়া। পুরো আঠারোটি পুরাণে এই ছোট্ট দুটি কথা।

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ

বেদের অনেক সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। বেদ হল যজ্ঞ প্রধান, যজ্ঞের মাহাত্ম্যকেই বেদে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদে অন্য কারুর অধিকার ছিল না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের দ্বিজ বলা হত ঠিকই, তাঁরাও ব্রাহ্মণদের কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে পারতেন, যদিও আমরা এর খুব কম দৃষ্টান্ত পাই। বেদ অধ্যয়ন যদিও বা করতে পারতেন কিন্তু যজ্ঞ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউই যজ্ঞ করতে পারতেন না। তাহলে এত যে বিশাল জনসংখ্যা পড়ে থেকে গেল এদের কি হবে? বলা হয় সেখান থেকেই পুরাণাদির মাহাত্ম্য বেড়ে গেল। পুরাণ এমন শাস্ত্র যে শাস্ত্রে সবারই অধিকার ছিল, সবাই পুরাণ পড়তে পারতেন, সবাই শুনতে পারতেন। ভাগবত পুরাণের প্রথম দিকেই নারদ ব্যাসদেবকে বলছেন, যা কিছু বেদে আছে, বেদের যা বক্তব্য, সেগুলোকেই কাহিনী রূপে পুরাণে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য কলিযুগে কারুরই আর বেদ অধ্যয়ন করার দরকার নেই, পুরাণ অধ্যয়ন করলেই তার হয়ে যাবে।

যদিও বেদে সব কথা আছে, আর মহাভারতের সাথে পুরাণের অনেক মিল আছে তা সত্ত্বেও পুরাণের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। কোন গ্রন্থকে যদি পুরাণ বলতে হয় তখন তার পাঁচটি লক্ষণ থাকতে হবে। প্রথম লক্ষণ সর্গ, সর্গ মানে সৃষ্টি, পুরাণকে বর্ণনা করতে হবে প্রথম সৃষ্টি কিভাবে হল। আমরা অনেক রকম কল্পনা করে ভাবতে পারি যে সৃষ্টি এভাবে হয়েছে, কিন্তু না সেভাবে সৃষ্টি হয় না। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ ভালো করে পড়লে দেখা যাবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করেননি, কিন্তু পরে আঠারো ঊনিশ বয়সে তিনি এক অকল্পনীয় সাধনা শুরু করলেন, সেই সাধনার গভীরে যেতে যেতে মনের এমন এক নৈঃশব্দ অবস্থাতে চলে গেছেন যেখানে তাঁর জগৎ ভুল হয়ে গেছে, জগৎ ভুল হয়ে যাওয়াতে তাঁর যে আমি বোধ, ঐ আমি বোধটাও চলে গেছে। গভীর নিদ্রাতেও মানুষের জগৎ ভুল হয়ে যায় কিন্তু সেখানেও তার আমি বোধটা, তার স্বপ্ন জগতটা থাকে। স্বপ্ন জগৎ থেকে যখন আরও গভীরে চলে যায়, বেদান্তীরা যাকে সুষুপ্তি বলেন, তখন তার আর কোন কিছুরই বোধ থাকে না, ওটাই অবচেতনের সুষুপ্তি, কিন্তু আরেকটা হয় চেতনের সুষুপ্তি। চেতনের সুষুপ্তি অবস্থায় ওখানে আমি জেনেশুনে, আমার নিজের চেষ্টাতে গেছি, আর ওখানে আমার আমি বোধটাও চলে গেছে। কিন্তু ঘুমের যে সুষুপ্তি ওটা আমাদের চেষ্টায় হয় না, নিজে থেকেই হয়। ঐ অবস্থাতে, যেখানে মনের পুরোপুরি লয় হয় যায়, তখন ঐ অবস্থাকে বলে সমাধি। আমরা সবাই রোজ রাত্রিবেলা সুষুপ্তিতে কিছুক্ষণের জন্য যাই। যার সুষুপ্তি যত কম তার স্বপ্ন তত বেশি হয় আর তার জীবন তত বেশি অস্থির। যদি দেখা যায় জাগ্রত অবস্থায় কারুর মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকছে, একটুতেই রেগে যাচ্ছে আর আলস্য করে সব সময় শুয়ে থাকতে চাইছে, বুঝতে হবে তার সুষুপ্তি হচ্ছে না। নিয়মিত ধ্যানাদি করলে সুষুপ্তিটা বেড়ে যায়। সুষুপ্তি যত হয় ঘুমের প্রয়োজন তত কমে যায়। সুষুপ্তি, স্বপ্ন এগুলো মানুষের নিজে থেকেই হয়, তাকে চেষ্টা করে সুষুপ্তি বা স্বপ্নে যেতে হয় না। ধ্যান কিন্তু পুরোপুরি নিজের চেষ্টাতে হয়, ধ্যান করতে হলে আগে মনকে একটা ট্রেনিং দিয়ে তাকে একটা পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়, ধ্যান হল তার একটা টেকনিক। সমাধির ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হয়, যেখানে মন একেবারে শান্ত হয়ে যায়। সুষুপ্তি আর সমাধি এই দুটো অবস্থাতেই তার আমি বোধটা চলে যায়, কিন্তু তফাৎ হল সুষুপ্তিতে গিয়ে বোকা মানুষ বোকা মানুষ হয়েই ফিরে আসে কিন্তু সমাধিতে থেকে বোকা মানুষ জ্ঞানী হয়ে ফেরে। একজন মানুষ কতটা সমাধিতে গেছেন, তাঁর কথাবার্তা ও জ্ঞানের প্রকাশেই বোঝা যায়। ঠাকুর নির্বিকল্প অবস্থায় দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, শুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র আছেন। ভগবান যীশুও একই জিনিস অনুভব করেছেন, মহম্মদেরও একই অনুভূতি হয়েছিল, ভগবান বুদ্ধও এই রকম দেখছেন। তবে এনারা আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন। ধ্যানের সেই গভীরে গিয়ে যেখানে তিনি দেখছেন ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই ছাড়া কিছুই নেই, সেখান থেকে আবার যখন আস্তে আস্তে মনটা ফেরত চলে আসছে তখন দেখছেন এই বিশাল জগৎ। এই দুটোকে মেলাবেন কি করে? এই দুটোকে মেলানো যায় না, সম্ভব নয়। কিন্তু এই জগতও সত্য আর সমাধির গভীরে ওটাও সত্য। আমাদের ঋষিরা, ঋষি মানে ঠাকুরের

মত নন, ঠাকুর অবতার, অবতারের ঠিক নীচে যাঁরা তাঁরা এই দুটোকে মেলাতে যান। ঠাকুরের সমাধির যে শেষ কথা আর জগতের বাস্তবিকতা, এই দুটোকে মেলাতে হয়। সেইজন্য বলতে হয় সৃষ্টি কোথা থেকে শুরু হল। এই উত্তরটা পুরাণ দিচ্ছে, এই উত্তর যদি না দেয় তাহলে সেটা আর পুরাণ হবে না। যদি পুরাণ হতে হয় তাহলে বলতেই হবে সৃষ্টি কোথা থেকে হল।

সৃষ্টির বর্ণনায় হিন্দু ধর্ম আর ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে তফাৎ হয়ে যায়। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে সৃষ্টি এককালীন ব্যাপার, একবার যা সৃষ্টি হওয়ার হয়ে গেছে, এরপর আর কোন সৃষ্টি হবে না। হঠাৎ ভগবানের ইচ্ছে হল তিনি সৃষ্টি করে দিলেন, তারপর একদিন সৃষ্টিটা শেষ হয়ে যাবে, এরপর আর সৃষ্টি হবে না। হিন্দু ধর্মের কাছে সৃষ্টি তা নয়, হিন্দু ধর্মের কাছে সৃষ্টি হল আবর্তনশীল ব্যাপার, চক্রাকারে সৃষ্টি হয়েই চলছে, এই সৃষ্টি হয়েছে এর একদিন বিনাশ হয়ে যাবে, আবার সৃষ্টি হবে সেই সৃষ্টি আবার ধ্বংস হয়ে যাবে, এরপর আবার সৃষ্টি হবে, সৃষ্টি আর লয় চলতেই থাকবে। একটা হল মূল সৃষ্টি, সৃষ্টির পেছনে কি আছে, এটা হল প্রাথমিক সৃষ্টি (primary creation)। প্রাথমিক সৃষ্টি যেমন আছে তার আবার গৌণ সৃষ্টিও (secondary creation) আছে, পুরাণকে দুটোরই বর্ণনা করতে হয়। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি এই স্থুল জগৎ কি করে হলেন? ঠাকুরও বলছেন, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য সেখান থেকে এই জগৎ কি করে হল? ঠাকুর এর কয়েকটা উপমা দিচ্ছেন, যেমন বলছেন, সমুদ্রের ফেনা থেকে কত শক্তি জিনিস তৈরী হয়ে যায়, আবার বলছেন, শুক্র কত তরল কিন্তু সেখান থেকে হাড়মাংসওয়ালা মানুষ হয়ে যাচ্ছে। হতে যে পারে না তা নয়। রামকৃষ্ণ পরম্পরায় পরে পরে যে দার্শনিকরা আসবেন তাঁরা ঠাকুরের কথাগুলোকে দাঁড় করাবেন, প্রাথমিক সৃষ্টি কি রকম আর গৌণ সৃষ্টি কি রকম। কিন্তু এটা হল সচ্চিদানন্দ থেকে কিভাবে সৃষ্টি আসে।

কিন্তু সৃষ্টি তো চিরদিন থাকবে না, এর একদিন বিনাশ হয়ে যাবে, মানুষ যেমন মারা যাচ্ছে সেই রকম সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সব একদিন নাশ হয়ে যাবে। কিছু সময়ের ব্যবধানে আবার সৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাবে, একই জিনিসের পুনারবর্তি চলতে থাকে। দ্বিতীয় লক্ষণ প্রতিসর্গ – সৃষ্টির সংহার কিভাবে হয়। সব পুরাণেই সংহারের বর্ণনা থাকতে হবে। পুরাণের তৃতীয় লক্ষণ বংশ, পুরাণকে বংশের কথা বলতে হবে। ভারতে দুটি বিখ্যাত বংশের কথা বলা হয়, সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশ। শ্রীরামচন্দ্র সূর্যবংশের ছিলেন, অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশের ছিলেন। পুরাণকে বর্ণনা করতে হয় সূর্যবংশ কিভাবে এসেছে, চন্দ্রবংশ কিভাবে এসেছে, তাঁদের কারা কারা রাজা ছিলেন, কার সাথে কার কি সম্পর্ক হল, এগুলোকে নিয়ে প্রত্যেক পুরাণকে আলোচনা করতে হয়। চতুর্থ লক্ষণ হল মন্বন্তর, ব্রহ্মা যে সৃষ্টি করলেন, এই একটি সৃষ্টি আর তার প্রলয়ের মাঝখানে চৌদ্দজন মনু হন। যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অষ্টম মনুর বর্ণনা করছেন, অষ্টম মনু যিনি হবেন তিনি কিভাবে মায়ের সাধনা করে মনু হবেন সেই কাহিনী বলছেন। প্রত্যেকটি মনুর কাহিনী পুরাণকে বলতে হয়। শেষ লক্ষণ বংশানুচরিত, ঐ যে সূর্যবংশ আর চন্দ্রবংশের কথা বলা হল, এই দুটো বংশ থেকে ধারাবাহিক ভাবে কিভাবে বংশের বিস্তার হয়েছে তার বর্ণনা সব পুরাণকেই করতে হয়। যে কোন পুরাণে এই পাঁচটি জিনিসের আলোচনা থাকতে হবে, সেইজন্য বলা হয় *পুরাণম্ পঞ্চলক্ষণম্,* যে কোন পুরাণে এই পাঁচটি লক্ষণ থাকতে হবে। তবে আধ্যাত্মিক ব্যাপার যখন আসে তখন বেদে যা আছে পুরাণ ঐ একই কথা বলে। আধ্যাত্মিক সত্যের যখন কথা আসে তখন সেখানে বলা হয় ঈশ্বরই সত্য, বাকি কোন কিছুর দাম নেই। সবটাই সত্য কিন্তু ঈশ্বরই বস্তু। আর যদি আমাদের স্তরে নামিয়ে আনা হয় তখন বলবে, অপরের মঙ্গল করাই পূণ্য, অপরকে কষ্ট দেওয়াটাই পাপ।

চতুঃশ্লোকী ভাগবত

ভাগবতকে বলা হয় চতুঃশ্লোকী ভাগবত। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে চব্বিশ হাজার শ্লোকে ভাগবত কি বলতে চাইছে, তা চারটি শ্লোকের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেন সম্পূর্ণ ভাগবত যদি কেউ পাঠ না করতে পারে, এই চারটে শ্লোক পাঠ করলেই তার হয়ে যাবে। ঠাকুর আরও সহজ করে বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ভগবানই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। ঈশ্বর ছাড়া যে কিছু নেই, এটাকে কে জানবে? যতক্ষণ এক না থাকে তখন অপরকে জানবে কি করে, ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু নেই তাহলে জানবে কোথা থেকে! জানার কোন পথ নেই। তখন বলে, লক্ষণ দিয়ে জানা যায়। শাস্ত্রের খুব নামকরা কথা হল তটস্থলক্ষণ। নদীর ওপারে

দেখা গেল ধুয়ো উঠছে, ধুয়ো যখন উঠছে তখন বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে নিশ্চয় লোকজন আছে। তখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, কেন জঙ্গলের আগুনও হতে পারে। হতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে যদি বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়, যখন ধুয়ো দেখছি তখন ওর পেছনে কোন একটা কারণ থাকবে। আমার কারণটা ভুল হতে পারে। এখন মনে করা যাক জঙ্গলে কিছু দস্যু আছে, তাদের খুঁজে বার করার জন্য কিছু সৈন্য তল্লাশী করছে, করতে করতে দেখল ধুয়ো উঠছে, তখন বুঝে গেলে ওখানেই দস্যুরা আছে। ঐ ধুয়ো দস্যুদেরও হতে পারে বা অন্য কেউ থাকতে পারে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ওখানে কিছু একটা হচ্ছে। সৃষ্টির আগে ভগবানই ছিলেন, এটাকে কি করে জানা যাবে? বলছেন, তটস্থলক্ষণ দিয়ে জানা যায়। সৃষ্টিকে দেখে জানা যায়। আমরা বলতে পারি, আমরা তো মানব না যে ভগবানই সৃষ্টি করেছেন, এর কি প্রমাণ আছে? কোন প্রমাণ নেই। একটা জায়গায় দেখছি ধুয়ো উঠছে, ঐ ধুয়োটা কে লাগিয়েছে? ওখানকার লোকেরা লাগিয়েছে, নাকি দস্যুরা লাগিয়েছে, নাকি কোন পিকনিক পার্টি লাগিয়েছে, নাকি জঙ্গলেরই আগুন, জানার কোন উপায় নেই। কিন্তু আন্দাজ করার এটাই পথ। কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চিত, তা হল এই জগতের বাইরে যে একটা আধ্যাত্মিক সত্তা আছে এটাকে এনারা প্রত্যেকেই ধ্যানের গভীরে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা যে কজনের নাম নিলাম, ভগবান যীশু, মহম্মদ, ভগবান বুদ্ধ, শুধু এনারাই নন, ভারতে শত শত ঋষিরা রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বলছেন, জগতের বাইরে একটি সত্তা আছে, সেটাই আসল সত্তা। কিন্তু ঐ সত্তা থেকে এই সত্তার সাথে সংযোগ সাধন কিভাবে হবে, এটা কেউ বলতে পারেন না। যিনি বলে দিয়ে গেছেন, যেমন যীশু, তিনি তো এর বেশি কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা যাঁরা আছেন তাঁরা অপরের সাথে তর্কাতর্কি করছে, কারণ তাঁদের সেই জ্ঞানটা নেই। কারণ ভগবান যীশু যেটুকু বলে গেছেন অতটুকু জ্ঞান আছে আর বাকিটা নিজেদের বুদ্ধি লাগিয়ে কিছু বলে দিচ্ছেন। বুদ্ধি আর বুদ্ধির লড়াই সব সময়ই থাকবে, এখানে কারুর কিছু করার নেই। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সব সময়ই এক হবে, কিন্তু যেখানেই বুদ্ধি এসে যাচ্ছে সেখানে পাঁচ রকমের মত এসে যাবে, মতের মধ্যে লড়াই হবে, কিছু করার নেই। কারণ বুদ্ধির এটাই কাজ, বুদ্ধি পাঁচ দিকে যায়। কিন্তু কোন আচার্যই বলবেন না যে, ভাই আমার সব দেখা হয়ে গেছে, কোথাও কিছু নেই। ভগবান বুদ্ধ যিনি ঈশ্বর মানতেন না, তিনিও বলছেন তোমার এই যে সত্তা এই সত্তা থেকে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। এখন ভাগবত যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা কিভাবে জিনিসটাকে দেখছেন?

তাঁরা বলছেন, ভগবানই ছিলেন, তাঁর ইচ্ছে হল সৃষ্টি হোক। এই যে তাঁর ইচ্ছে হল, কেন ইচ্ছে হল? আমরা কি করে বলব! আমার উপরে যিনি আছেন, যাঁর ইচ্ছাতে আমি নাচছি, তাঁর কথা আমি কি করে বলব! সেইজন্য খ্রীশ্চান, মুসলমানরা বলে, God's will বা আল্লার ইচ্ছা। আর হিন্দুরাও তাই বলে, তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে, তাঁর খেলা, তাঁর লীলা। বেদান্তীরা এর খুব সুন্দর নাম দিলেন – মায়া। এটাই মায়া, আমরা জানি না, জানার কোন উপায় নেই। ঈশ্বর কোন জিনিস কেন করেন, কি করে আমরা বলব! তিনি তো আমাদের মত মানুষ নন, সেইজন্য তাঁর নাম মায়া। যেটা খ্রীশ্চানদের God's will সেটাই বেদান্তে মায়া। সেটাই তন্ত্রে গিয়ে হয়ে যায় শক্তি। ঈশ্বরের ইচ্ছা বললেও যা, ঈশ্বরের লীলা বললেও যা আর ঈশ্বরের মায়া বলতেও তাই। সৃষ্টি যখন হল তখন প্রথম এলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কেমন ছিলেন? আমরা কি করে জানব ব্রহ্মা কেমন ছিলেন! কারণ আমরা তো তার অনেক পরে এসেছি, বাকিটা তাই কল্পনা করে নিতে হয়। তাহলে ব্রহ্মাকে কি কেউ দেখেছেন? নিশ্চয়ই দেখেছেন, যাঁরা ধ্যান, ধারণা করেছেন তাঁরা দেখেছেন। যদি নাও দেখে থাকেন তাহলেও ঐ জিনিসটাকে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, আধ্যাত্মিক সত্তাকে এক রকম দেখছেন আর জগতকে আরেক রকম দেখছেন, এই দুটোকে মেলানোর জন্য আমাদের কয়েকটা ধাপে ধাপে আসতে হয়। পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমে জিনিসটাকে রাখছেন, কিন্তু বেদে ব্রহ্মা বলেও কেউ নেই, যদিও বেদেরই পরে পরে কিছু অংশ আছে যেখানে ব্রহ্মার নাম পাই, বিষ্ণু নামে একজন অত্যন্ত সাধারণ দেবতার কথা বলছেন, কিন্তু আজকে ভগবান বিষ্ণুর যে ধারণা হিন্দু ধর্মে প্রবল, সেরকম বিষ্ণু বলে বেদে কেউ নেই, ভগবান বলেও কেউ নেই। ঠিক তেমনি শিব বলেও বেদে কেউ নেই, রুদ্র আছেন কিন্তু তিনি আবার অতি সাধারণ দেবতা। কিন্তু পরের দিকে আঞ্চলিক কিছু কিছু দেবতা আর তার সাথে বেদে যে কিছু কিছু গুণের বর্ণনা করা হয়েছে, সব মিলিয়ে

মিলিয়ে শিবের একটা ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে গেল, এই বিবর্তনকেই স্বামীজী বলছেন evolution of our religion ideas। মূল আইডিয়া কখনই evolve করবে না, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, মূল তত্ত্ব কখন পাল্টাবে না। কিন্তু এর মাঝে যে তত্ত্বগুলো আছে, যেখানে একটু বুদ্ধি লাগছে, ঐ জায়গাতে একটু পাল্টে যায়। সেইজন্য বেদ থেকে আমাদের আজকের ধর্ম অনেক পাল্টে গেছে। তাঁদের কাছে একটাই আছে, আধ্যাত্মিক সত্তা। আর সৃষ্টিতে যিনি প্রথম সৃষ্ট হলেন তাঁকে বলছেন প্রজাপতি, যেখান থেকে সৃষ্টির খেলা শুরু। তাহলে তো দুটো সত্তা এসে গেল। প্রথমে হলেন পুরুষ, পুরুষই পরের দিকে ভগবানের সত্তাতে চলে গেলেন। পৌরাণিক কথা অনুসারে প্রথম যিনি সৃষ্টিতে এলেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। ভগবান বিষ্ণু, তিনি তো নিরাকার, যেমনি তিনি সৃষ্টি করবেন ঠিক করলেন, তখন হঠাৎ কারণ সলিল দেখা গেল, সে এক মহাসমুদ্র। সেই সলিলে শেষ নাগের উপর ভগবান বিষ্ণু শয়ন করে আছেন। কোন সাধকের হয়ত এই দিব্য দর্শন হয়েছিল, সেখান থেকে এটাই কাহিনী রূপে দাঁড়িয়ে গেল।

যাই হোক, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন তাঁর শরীরটাও বিরাট হবে। তাঁর যে নাভি সেটাই একটা বিরাট সরোবর, সেই সরোবরে একটা বিরাট পদ্ম, ঐ পদ্ম ফুলের উপর ব্রহ্মা বসে আছেন। ব্রহ্মা এখন চারিদিকে তাঁর দৃষ্টিকে অবলোকন করালেন, কোথাও কিছু দেখছেন না। তারপর তিনি শুনতে পেলেন 'ত' আর 'প', সেখান থেকে তিনি বুঝে গেলেন যে তাঁকে তপস্যা করতে বলা হচ্ছে। তপস্যা করতে শুরু করলেন। অনেক দিন তপস্যা করতে করতে তাঁর সব স্মৃতি ফিরে এল, ও তাই! এর আগেও সৃষ্টি ছিল, এখন আবার সৃষ্টি করতে হবে, আমাকেই সৃষ্টি করতে হবে। আর সৃষ্টি ঠিকে সেভাবেই হবে এর আগে যেভাবে সৃষ্টি ছিল। সেখানে কোন কিছু পাল্টানো যাবে না। তখন ভগবান ব্রহ্মার সামনে আবির্ভূত হলেন, কারণ ব্রহ্মা এখন সৃষ্টিকার্যে নামবেন, তার আগে তাঁকে আধ্যাত্মিক সত্যটা বলে দিচ্ছেন। প্রথম শ্লোকে ভগবান বলছেন –

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।২/৯/৩২

অহমেবাসমেবাগ্রে, সৃষ্টির পূর্বে যখন কোন কিছুই ছিল না, তখন আমিই ছিলাম। আমি ছাড়া কোন সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না। সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম, এই কথা শুনে মনে হবে অতি সাধারণ কথা, এমন বিরাট কথা আর কি বলছেন। কিন্তু তা না, অত্যন্ত গভীর কথা। সৃষ্টির অনেক রকম থিয়োরী আছে, একটা খুব নামকরা থিয়োরী হল, শূন্যবাদ। যেমন বৌদ্ধরা বলছেন সৃষ্টি শূন্য থেকে হয়েছে। এখানে *অহমেবাসমেবাগ্রে* এই কথা দিয়ে বৌদ্ধদের মতকে নাকচ করে দেওয়া হল। আর বর্তমান কালের বিজ্ঞানের যে থিয়োরী, যেখানে বিগ ব্যাঙ থিয়োরী আসছে, যাতে বলা হচ্ছে পদার্থ আছে সেখান থেকে সৃষ্টি আসছে। এই থিয়োরীকেও নাকচ করে দেওয়া হল। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ নামে বৌদ্ধদের একটা সিদ্ধান্ত আছে, যেখানে বলা হয় নদীর স্রোতের মত সৃষ্টির প্রবাহ চলছে, এটাকেও এই কথাতে নাকচ করে দেওয়া হল। বৈশাষিকদের মতে পরম্পর অনুগুলোর মিলনে সৃষ্টি হয়েছে, এই মতকেও নাকচ করে দেওয়া হল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, সাংখ্য দর্শন আর যোগ দর্শন বলছে সৃষ্টি প্রকৃতি করে, এটাকেও নাকচ করে দিচ্ছেন। হিন্দুদের যে ছয়টি দর্শন তাকে আস্তিক দর্শন বলা হয়, আস্তিক দর্শন মানে যাঁরা বেদকে প্রমাণ মনে করেন, প্রমাণ মানে শেষ কথা। এই ছটি দর্শনকে একসাথে বলা হয় ষড়দর্শন – সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, পূর্বমীমাংসা বা কর্মকাণ্ড এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। এই ছটি দর্শনই বেদকে প্রমাণ রূপে নেন, কিন্তু এদের মধ্যে প্রচুর ঝগড়া বিবাদ আছে, যেমন সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে এই ব্যাপারে সবাই এক মত নন। সবাই চৈতন্যকেই শেষ কথা মনে করছেন, জগৎ সত্য এটাও সবাই এক মনে করবেন, কিন্তু দুটোর যে সম্পর্ক সেই ব্যাপারে সবাই এক মত নন, আর ঈশ্বরই শেষ কথা এটাও সবাই মানবেন না। যেমন সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরকেই মানে না, যোগদর্শন, পূর্বমীমাংসাদের কাছে তো ঈশ্বর বলে কিছু নেই, অথচ এই তিনজনই বেদের উপর আধারিত। বেদ খুব খোলামেলা শাস্ত্র, কেউ যদি চায় সে বেদ থেকে ঈশ্বরের সত্তা নিয়ে আসতে পারে, যদি কেউ না চায় তাহলে তাকে ঈশ্বরের সত্তাকে আনার কোন দরকার হবে না। কিন্তু এটা ভাগবত গ্রন্থ, ভাগবত ধর্মের কথা বলা হবে, এখানে তাই বলছেন *অহমেবাসমেবাগ্রে*, প্রথমে আমিই ছিলাম। যাঁরা ভাগবত পড়ছেন, ভাগবত ধর্ম মানছেন তাঁদের কাছে সৃষ্টি

মানে, ভগবান থেকে সৃষ্টি। প্রথমে ভগবানই ছিলেন, এটাকে আর প্রশ্ন করা যাবে না। কেউ যদি বলে, আমি এটুকু বাদ দিয়ে বাকিটা নিয়ে চলব। না, ওভাবে চলা যাবে না। ভাগবত ধর্ম যদি কারুর ধর্ম হয়, ভাগবতের দর্শনই যার দর্শন তাহলে তাকে মানতে হবে – প্রথমে ঈশ্বরই ছিলেন। যদি না মানতে চায় তাহলে তাকে অন্য দর্শনে যেতে হবে।

তারপর বলছেন *নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্*, সৎ মানে যে জিনিসটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় আর অসৎ মানে যেটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। তখন সৎ বলেও কিছু ছিল না, অসৎ বলেও কিছু ছিল না। অসৎ আবার দু রকম হয়, একটা হয় অলীক, অলীক মানে কোন কালেই যার অস্তিত্ব হয় না, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, বন্ধ্যাপুত্র বলে কিছু হয় না, যে বন্ধ্যা তার পুত্র হবে না, যার পুত্র হয়েছে সে বন্ধ্যা হবে না, সংস্কৃতে এটাকে বলে অলীক, যার শব্দের খেলা মাত্রই আছে। সমস্যা হল, বেশির ভাগ দর্শন, বেশির ভাগ চিন্তা-ভাবনা অলীক, সব শব্দ মাত্র। শব্দ দিয়ে শব্দকে সাজিয়ে যে কেউ যে কোন জিনিস দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। বলছেন, অলীক বলেও কোন কিছু ছিল না। অলীকের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল অসৎ, অসৎ মানে ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানা যায় না। খুব সহজ উপমা যদি নেওয়া হয়, এই ঘরে আমরা সবাই আছি, ঘরে আলো জ্বলছে, সেই আলোতে আমরা সবাই পরস্পরকে দেখছি, আমরা সৎ, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। লাইট অফ করে দিলে এটাই অসৎ হয়ে যাবে, কারণ ইন্দ্রিয়ে দিয়ে কিছুই জানা যাচ্ছে না, সব নিস্তব্দ। বেশিক্ষণ লাইট অফ থাকলে ঘুমিয়ে পড়ব, ঘুমিয়ে এবার নাক ডাকবে, নাক ডাকার আওয়াজ আবার বাইরে যাবে, সেটা শুনে কেউ বলবে, ঐতো ওখানেই আছে, আবার ওটা সৎ হয়ে গেল। অসৎ মানে কোথাও কোন চিহ্ন নেই। একট বটবৃক্ষের যে বীজ, সেই বীজের মধ্যে যে DNA আছে, তার যে জীনস্ আছে, সেগুলোকে আমরা চোখে দেখতে পাই না ঠিকই কিন্তু ওগুলো অসৎ নয়, কারণ মাইক্রোস্কোপে রেখে দিলে দেখা যাবে। অসৎ মানে হয়, যেমন আমাদের মোবাইল ফোনে সিম্ রয়েছে, ওর মধ্যে কি আছে আমাদের জানার উপায় নেই, কিন্তু একটা কম্প্যুটারে লাগিয়ে দিলে সেটাও জেনে যাবে। আপাতদৃষ্টি ওটা অসৎ, কারণ ওকে জানা যায় না, কিন্তু এখানে অসৎ বলতে আরও বেশি, যেখানে একেবারে সূক্ষ্ম ভাবে আছে। যে মেয়ে কুড়ি বছরের কুমারী, সে তখন নিজে সৎ কিন্তু তার কাছে তার বর হল অসৎ, তখন বর বলে কিছু নেই, যখন তার বিয়ে হয়ে গেল তখন বর সৎ হয়ে গেল। তারপর যখন তার সন্তান হল, এটা খুব কাছাকাছি উপমা, সূক্ষ্ম রূপে সন্তান তার গর্ভেই ছিল, কোন পরিস্থিতিতে সন্তান আবার বেরিয়ে এসেছে। সন্তান তখন অসৎ ছিল এখন সৎ হয়ে গেল। ভগবান বলছেন, তখন সৎও কিছু ছিল না, অসতও কিছু ছিল না, তার স্থূল কিছু ছিল না, সূক্ষ্মও কিছু ছিল না। স্থূল মানে যেটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে মন দিয়ে জানা যায়, সূক্ষ্ম মানে যেটা ইন্দ্রিয় দিয়েও জানা যায় না আর মন দিয়েও জানা যায় না। স্থূলও ছিল না, সূক্ষ্মও ছিল না। তার মানে কিছুই ছিল না? তা নয়। তাহলে কি শূন্য ছিল? তাও নয়। অহম্ আমি ছিলাম। পরম, শ্রেষ্ঠ, একমাত্র আমিই ছিলাম।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্, একটা কিছু ছিল সেটা নাশ হয়ে গেল, যেমন একটা ঘট ছিল, ঘটটা ভেঙে গেল, ঘটটা শেষ হয়ে গেল, ঐ ঘটটা আর কোন দিন হবে না। ভগবান বলছেন, সৃষ্টি যখন শেষ হয়ে যাবে তখনও আমিই থাকব। তৈত্তেরীয় উপনিষদে বলছেন, *আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দাদ্ধেব খল্বিমাণি ভূতানি জায়ন্তে,* আনন্দ ভগবানেরই আরেকটি নাম, আনন্দেই সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি তাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর যখন লয় হয় সৃষ্টি তাতেই লয় হয়। যেমন ঢেউ, সমুদ্রেই তার জন্ম, সমুদ্রেই তার অবস্থান, সমুদ্রেই সে বিলীন হয়ে যায়। এখানে মনে রাখতে হবে, উপমা দিয়ে কখন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, যে কেউ বলতে পারে সমুদ্রে যেমন ঢেউ ওঠে, ঢেউ থাকে, ঢেউ চলে যায়, ঠিক তেমনি ভগবানে সৃষ্টি ওঠে, সৃষ্টি থাকে, সৃষ্টি চলে যায়। আমাদের শাস্ত্র সেভাবে চলে না, উপমা দিয়ে সত্য চলে না, উপমা দিয়ে সত্যকে বোঝাতে হয়। কোন ঋষি বললেন সৃষ্টি এভাবে হয়, আমরা বলতে পারি আমি বুঝতে পারছি না, কি করে হতে পারে? হয়, ঐ দেখ যেমন নদীতে হয়, সমুদ্রে হয়। সমুদ্রে ঢেউয়ের সৃষ্টির জন্য তো অন্য শক্তি লাগে, বাতাস লাগে, সূর্যের তাপ লাগছে, আরও অনেক কিছু লাগে, সৃষ্টিতে এটা কি করে হয়? তন্ত্র মতে, শাক্ত মতে এই সমস্যা আছে, তখন ঈশ্বর লাগবে আর তার শক্তি লাগবে। তখন আবার বলা হবে ঈশ্বরও যা

তার শক্তিও তাই, দুটো আলাদা কিছু না। ফলে শাক্ত মতে শিব আর শক্তিকে আলাদা করে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর তা মানবেন না, তিনি বলবেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, শক্তিমান আর তার শক্তি অভেদ। ঠাকুরও বার বার বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি এক। বেদান্ত ঠিক নাকি শাক্ত মত ঠিক? দুজনেই ঠিক, আমার মতে কোনটা মেলে, আমার মন যেটাকে নিতে চাইছে আমাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে। কারণ আমার উদ্দেশ্য হল আমার বাস্তবিক স্বরূপে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রথমে তিনিই ছিলেন, শেষেও তিনি, মাঝখানে কি হচ্ছে সেটাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে নেই। যে কোন একটা পথ অবলম্বন করিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, নিজের স্বরূপে পৌঁছাতে হবে, বাকি আর কোন কিছুরই কোন মূল্য নেই।

আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, *যদেতচ্চ*, এখানে যা কিছু আছে সেটাও আমি, সৃষ্টি যেটা আছে এটাও আমি, আমা ছাড়া আর কিছু নেই আর সৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে আমিই থাকব। সমুদ্রের ঢেউ আর সমুদ্র আলাদা কিছু নয়। তবে এটা ঠিক যে, ওটা সমুদ্র নয়। এখানে এসেই জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা হয়ে যায়। জ্ঞানী দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, নাম আর রূপটা মিথ্যা। আমি আছি আমার একটা নাম আছে, আমার একটা আকৃতি আছে, বেদান্ত বলবে আত্মাই সত্য, এই নাম আর রূপটা মিথ্যা। ভক্ত দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, মানুষ রূপে আমাদের যে বাস্তবিকতা, এটাকে জ্ঞানীও নেয় না, ভক্তও নেয় না, যোগীরাও নেবে না, কেউই নেয় না। কবিতায় আমরা বলতে পারি 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কখনই বলা যাবে না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সব থেকে বড় মিথ্যাই হল মানুষ, মানুষ বলে কিছু নেই। হয় আত্মাই আছেন আর নয়তো ঈশ্বরই একমাত্র আছেন, মানুষ বলে কিছু নেই। কারণ নাম ও রূপ জিনিসটাই মিথ্যা। প্রথম যাঁরা এই কথা শুনবেন তাঁদের এটা ধারণা করতে অনেক বছর লাগবে। প্রথম প্রথম তাই শুনে যেতে হয়, শাস্ত্র এই রকম কথা বলছেন, সাধু সন্ন্যাসীরা মুখে এই কথা বলছেন, শ্রদ্ধা সহকারে মেনে যেতে হয়। শুনতে শুনতে বিশ্বাসটা যখন একটু দৃঢ় হবে, তারপর সাধনা শুরু করবে, সাধনা করতে করতে ধারণা হবে শাস্ত্রে যেমনটি শুনেছিলাম জিনিসটা ঠিক তাই। এখানে এটাই বলছেন, সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম, সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু তা আমিই হয়েছি। তার মানে এখানে বেদান্তের দৃষ্টি নিচ্ছেন না, বেদান্তের দৃষ্টিতে আত্মাই আছেন, নাম রূপ মিথ্যা, কিন্তু বলছেন, আমি ভগবান, আমিই সব কিছু হয়েছি। এতে বোঝা যায় যে, ভাগবত গ্রন্থ মূলতঃ ভক্তিমার্গের। কিন্তু তাহলে কি ভক্তি আর জ্ঞান আলাদা? না, তা কখনই না, জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই, জ্ঞানী দেখেন আত্মাই আছেন, ভক্ত দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। সেইজন্য একক যেটা, তার কোন মূল্য নেই, আমি যেটা তার কোন মূল্য নেই, তুমি যেটা তারও কোন মূল্য নেই। মূল্য একটারই আছে, হয় আত্মার নয়তো ঈশ্বরের। যিনি বলছেন আত্মাই সব তিনি হয়ে গেলেন জ্ঞানী, যিনি বলছেন ঈশ্বরই সব তিনি হয়ে গেলেন ভক্ত। কিন্তু দুটোতেই মানুষ রূপে, জীব রূপে, জগৎ রূপে, বস্তু রূপে যা কিছু আছে সবটাকেই নাকচ করে দেওয়া হয়। সত্তা ঐ একটাই থেকে যাচ্ছে, হয় ঈশ্বরী সত্তা আর নয়তো আত্মার সত্তা। আত্মাও শুদ্ধ চৈতন্য, ভগবান তিনিও সেই শুদ্ধ চৈতন্য। তবে ছোট্ট একটা তফাৎ থাকে, সৃষ্টি তখন সত্য হয়ে যায় এই অর্থে যখন ভগবান রূপে দেখছে, তাদের কাছে তাই আনন্দ বেশি। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে সৃষ্টিটাই মিথ্যা। সেইজন্য জ্ঞানীরা সব সময় নেতি নেতি পথ নেন, এটা নয়, এটা নয় করে করে আত্মার সত্তাতে পৌঁছে যান। আর যাঁরা ভক্ত তাঁরা ইতি ইতি সাধন করেন, সবটাই তিনি। এগুলো এক একজনের মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

এখানে আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, আমি যেটার জন্য প্রস্তুত একমাত্র সেটাই আমি গ্রহণ করতে পারব, ওর বাইরে আমি কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারব না। ভগবান তাঁর নিজের তত্ত্ব বোঝাতে যাচ্ছেন তাঁর প্রথম সন্তান ব্রহ্মাকে। তিনি জানেন ব্রহ্মা স্রষ্টা, কিন্তু তিনিও ভগবানের তত্ত্ব ধারণা করতে পারবেন না। সেইজন্য প্রথমে ব্রহ্মাকে বলে দিলেন তপস্যা কর। তপস্যা করে ব্রহ্মার পাত্রতা তৈরী হল। তপস্যা করে ঐ ক্ষমতা অর্জন করলেন যাতে ঈশ্বরের তত্ত্ব ধারণা করতে পারেন। তখন ভগবান বললেন *অহমেবাসমেবাগ্রে*, সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম, সৃষ্টি যখন নাশ হয়ে যাব তখনও আমিই থাকব। এই একটা কথাকে বোঝানর জন্য ব্রহ্মার মত একজনকে, যিনি ভগবানের প্রথম সন্তান, তাঁকে দিয়ে এত তপস্যা করাবার কোন মানে হয়! এগুলোকে আমাদের গভীর ভাবে বিচার করতে হয়। ব্রহ্মা যিনি আদিপুরুষ, তাঁকে ভগবান

বলছেন তপস্যা কর। তপস্যা করার পর ভগবান এসে বলছেন তোমাকে একটা সত্য বলছি। কি সেই সত্য? সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম, সৃষ্টির পরে আমিই থাকব। এ আর কি এমন কথা, এর কি কোন দাম আছে! এই কথা তো আমরা সব সময়ই শুনছি। কিন্তু ঐ অতটুকু কথা শুনে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু সৃষ্টি করে দিলেন। এই জগতে যাই গোলমাল থাকুক, তিনি করে দিলেন সৃষ্টি। তাঁর প্রস্তুতি হয়ে গেছে, শুধু বুঝে ধারণা করার প্রস্তুতি না, সেটাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতাও এসে গেছে। এই কথাগুলোকে যে আমরা বুঝব, বুঝে ধারণা করব, ধারণা করে সেটাকে কাজে লাগাব, সেই তপস্যা আমাদের কোথায়! ঠাকুর বলছেন, জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীবের সেবা। ঠাকুরের মুখে নরেন্দ্রনাথ এই কথা শোনার পর অন্যানদের বলছেন, আজ একটা নতুন সত্য পেলাম, আমি এটাকে করে দেখাব। ওখানে নরেন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেকেই শুনেছিলেন কিন্তু কেউই তো সত্য পেলেন না। অন্য একদিন ঠাকুর কিছু কথা বলছিলেন, সেই সময় একজন বলে উঠল, ওসব জানা আছে। ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন, শুধু বুঝলে হবে না, ধারণা করতে হবে। এই ধারণার জন্য তপস্যা লাগে। আমরা যে এখানে বছরের পর বছর শাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছি, এটাও তপস্যার মধ্যেই পড়ছে। আমাদের শুনে মনে হবে এগুলো জানা আছে। একেবারেই নেই, কারণ একবার যদি বুঝে ধারণা হয়ে যায় তখন জীবন পুরোপুরি পাল্টে যাবে। আমি যে ঘরে রোজ ঘুমোতে যাই, কেউ যদি চেঁচিয়ে বলে ঘরে একটা সাপ আছে, আমার তখন কি অবস্থা হবে? মীরাট শহরে একটা চিতা বাঘ নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে ওখানকার সব স্কুল কলেজ বন্ধ, হাসপাতাল বন্ধ, লোকেদের বাড়ির দরজা বন্ধ, এক চিতা বাঘের খবরেই এই অবস্থা। আমরা চারিদিকে এত এত ভক্ত সম্মেলনে যাচ্ছি, কত লেকচার শুনছি, কিন্তু কারুর কি ধারণা হয়েছে যে ঈশ্বর আছেন? দৃঢ় বিশ্বাস যদি হয়ে যায় যে ঐ ঘরে সাপ আছে, আমি কি আর ঐ ঘরে ঘুমোতে যেতে পারব! তেমনি একবার যদি বিশ্বাস হয়ে যায় ঠাকুর আছেন, এরপর সেকি আর কোন জাগতিক কাজের দিকে মন দিতে পারবে? যত দিন মন দিতে পারবে তত দিন বুঝতে হবে তার ভেতরে গোলমাল আছে। কেন ধারণা হয় না? আমাদের সেই সাধনা নেই, তপস্যা নেই। আধ্যাত্মিক সত্য ধারণা করার জন্য বেদের সময় ওনারা দুটো পথ খুলে দিলেন, ব্রাহ্মণ ছেলেদের ছোটবেলা থেকে বেদ মুখস্ত করিয়ে দিতেন। মুখস্ত করতে করতে একটা সময় যখন সাধনাতে নেমে যেত তখন তার যে অনুভূতি গুলি আসতে শুরু হত, তখন দেখত আমি যে জিনিসগুলো মুখস্ত করেছিলাম সবই তো মিলে যাচ্ছে। দ্বিতীয়, আখ্যায়িকার মাধ্যমে তত্ত্ব গুলিকে ছেড়ে দিলেন। কাহিনীর মাধ্যমে যখন কোন তত্ত্বকে সামনে রাখা হয় মানুষ তখন ওটা সহজে গ্রহণ করতে পারে। তারপর একদিকে সে সাধনা করছে আর অন্য দিক জগৎ থেকে প্রচুর আঘাত খেতে খেতে একটা সময় কি করে যে তার মন অন্তর্মুখী হয়ে গেল, টেরই পায় না, তখন দেখে আরে তাই তো এই কথাই তো ঐ কাহিনীতে পেয়েছিলাম। আমাদের ভালো ভাবে জেনে রাখা ভালো যে, যতক্ষণ আমাদের ভেতর থেকে সত্য না জেগে ওঠে ততক্ষণ কোন দিন কোন আধ্যাত্মিক কথা আমরা গ্রহণ করতে পারব না। কোন কবিতা, কোন ছবি, কোন দর্শন, কোন চিন্তাকে আমরা appreciate করতে পারব না। পাঁচজন যদি ভালো বলে দেয় আমিও ভালো বলব, এর বেশি কিছু হবে না। সেইজন্য এখানে আমাদের বার বার একই কথা শুনতে হবে, বিরক্তি লাগতে পারে, কিন্তু এছাড়া কোন উপায় নেই। যাই হোক, দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন –

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাহভাসো যথা তমঃ।।

খুব কূট একটা শ্লোকের আলোচনা করা হচ্ছে। মায়া বলতে ভগবান বলছেন, আমার বাইরে যা কিছু প্রতীতি হচ্ছে সেটাই মায়া। যে জিনিসটা নেই অথচ দেখাচ্ছে আর যেটা আছে অথচ দেখা যাচ্ছে না, এটাই আমার মায়া। তারপর বলছেন দিনের আলোতে যেমন নক্ষত্রদের আকাশে দেখা যায় না, অথচ নক্ষত্র দিনের আকাশেও বিদ্যমান থাকে। আমাদের ঋষিরা জানতেন যে নক্ষত্ররা শুধু রাতের আকাশেই দেখা যায় আর দিনের আকাশে তারারা সব লুকিয়ে থাকে। সূর্য যখন মধ্য গগনে নক্ষত্রগুলি তখনও সেখানেই আছে। ভাগবত তাই বলছে সূর্য থাকলে আকাশে তারা দেখা যায় না, ঠিক তেমনি জগৎ আছে কিন্তু ঈশ্বরকে দেখা যায় না। বলছেন – চন্দ্রমা আকাশে একটাই আছে কিন্তু চোখের দোষের জন্য দুটো দেখায়। দুটো চাঁদ দেখা এগুলো

চোখের গোলমাল ও মাথার গোলমালের জন্য হয়। আমার সামনে এই বোতলটা দেখছি, এটা কেন বোতল দেখছি? মাথার গোলমালের জন্য। মাথার গোলমাল কেন? কারণ পরমেশ্বরকে এখানে দেখা যাচ্ছে না। তাই ভগবান বলছেন পরেমশ্বর ব্যতিরেকে যা কিছুর প্রতীতি হচ্ছে সেটাই মায়া। এই যে সৃষ্ট জগৎ সামনে পরিদৃশ্যমান, কিন্তু জগৎ নেই অথচ দেখাচ্ছে, মানে যেটা নেই সেটা দেখাচ্ছে। আবার যেটা আছে সেটা দেখাচ্ছে না, পরমেশ্বরই আছেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পারছি না, এটাই মায়া। শাস্ত্রের পরিভাষায় এর নাম আবরণ বিক্ষেপ। আবরণ মানে, যেটা আছে সেটাকে ঢেকে দেয়, বিক্ষেপ মানে যেটা নেই সেটাকে সামনে ছুঁড়ে দেয়। মায়া মানেই এই – আবরণ বিক্ষেপ। মানুষ কামিনী-কাঞ্চনে বেশী মোহগ্রস্ত হয় বলে কামিনী-কাঞ্চনকেই মায়া বলা হয়। কিন্তু জগতের সব কিছুই মায়া, জগৎটাই মায়া। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা যাবে এগুলো সব পরমেশ্বরেরই রূপ তখন আর মায়া থাকবে না।

কি রকম আবরণ বিক্ষেপ? বলছেন – এই বিচিত্র যত কিছু দেখছ এটাই বিক্ষেপ। আর আবরণ কি? ঈশ্বর সর্বত্র, সর্বদা, সর্বব্যাপক রূপে বিদ্যমান অথচ তাঁকেই দেখা যাচ্ছে না। ভগবান বলছেন এটাই আমার মায়া। এই যে আকাশতত্ত্ব – আকাশতত্ত্বটা কি? এই বোতলের মধ্যে আকাশ রয়েছে, এর বাইরেও আকাশ রয়েছে। বোতলটার মধ্যে আকাশ ঢুকে গেছে। যদি বোতল এখানে না থাকত, আকাশ তখনও এখানে থাকত। মানে আকাশ এখানে আছে অথচ বোতলে ঢুকেছে, ঠিক তেমনি ঈশ্বর আত্মারূপে সর্বত্র বিদ্যমান অথচ শরীরের মধ্যে অন্তর্যামী রূপে ঢুকে আছেন। তাই বলছেন – আমি সর্বত্র আছি, সমস্ত প্রাণীর মধ্যেও আছি, তাদের শরীরে প্রবেশ করেছি, সেইজন্য সে চৈতন্য, এটাই আমার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রাণীরা যদি না থাকত তাহলে কি আমি ওখানে থাকতাম না? না, আত্মরূপে আমি সব জায়গায় আছি। যেমন এই বোতলে বাতাস ভর্তি আছে, কিন্তু বোতল যদি এখানে না থাকত তাও এখানে বাতাস থাকত। বাতাস বোতলের বাইরেও আছে ভেতরেও আছে। কিন্তু আমরা ভেতরের বাতাসকেই শুধুমাত্র বুঝি। আকাশের ব্যাপার আরো মজার। যেমন এই ডাস্টারটা এখানে তার আকার অনুযায়ী space নিয়ে বসে আছে। ডাস্টার যদি এখানে না থাকত এই space এখানেই থাকত। ঠিক তেমনি মানুষের ভেতরে চৈতন্য শক্তি অন্তর্যামী রূপে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু আত্মরূপে সব জায়গাতেই আছেন অথচ মনে হচ্ছে তিনি শুধু মানুষেই আছেন। এটাই ভগবানের বৈশিষ্ট্য। আমি যদি দেহ দৃষ্টিতে দেখি তাহলে দেখছি আমার এই শরীরের মধ্যে ভগবান অন্তর্যামী রূপে ঢুকে আছেন। কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে পরমেশ্বর ঢুকবেন কোথায়। সবটাই তো পরমেশ্বর। সেইজন্য আধ্যাত্মিক পুরুষরা কখন কোন কিছুকে বস্তু জ্ঞানে দেখেন না, সব কিছুকেই তাঁরা আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে দেখেন। তৃতীয় শ্লোকে বলছেন –

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।

এগুলো অত্যন্ত সহজ জিনিস আবার অত্যন্ত কঠিন জিনিস। একটা খালি গ্লাশ আছে, গ্লাশের ভেতরে space রয়েছে, আমরা তো space বলি না, আমরা বলি আকাশ। আকাশ হল খুব সূক্ষ্মতমো পার্টিকেলস বা অণু, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দিয়ে তৈরী। Free space বলতে কিছু হয় না, space বলতে আমরা যা বুঝি, হিন্দু ধর্ম সেইভাবে space বলে কোন কিছুকে মানে না, ওনারা বলেন সবটাই অণু। এই গ্লাশ তৈরী হয়েছে মূলতঃ আকাশ বা বাকি যে চারটে ভূত আছে, সেই পার্টিকেলস দিয়ে। আর ঐ পার্টিকেলসের মধ্যেই এই গ্লাশ দাঁড়িয়ে আছে অর্থাৎ spaceএর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আর গ্লাশের ভেতরের ফাঁকা যে অংশ তাতে আবার আকাশ পার্টিকেলস আছে। এটাই একটা উদ্ভট জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, এই আকাশ পার্টিকেলস দিয়েই গ্লাশ নির্মিত, আকাশেই অবস্থিত আর ঐ আকাশই গ্লাশের ভেতরে ভর্তি হয়ে আছে। এটা একটা উপমা মাত্র। এই উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর দিয়েই এই শরীর নির্মিত আর সেই ঈশ্বরই এই শরীরের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। ভগবান তাঁর রচনা করে তার মধ্যে ঢুকে গেলেন, যেমন বাড়ি তৈরী করে মানুষ তার মধ্যে ঢুকে যায়। এখানে বাড়ি আলাদা মানুষ আলাদা, মানুষ কখনই বলবে না যে আমিই বাড়ি হয়েছি। সেইজন্য উপমাটা খুব ভালো উপমা নয়। কিন্তু এই গ্লাশ আকাশ অণু দিয়েই তৈরী, আকাশের অণুর

সমুদ্রে তার অবস্থান আর সেই আকাশ অণু দিয়েই গ্লাশের ভেতরটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সাধনা এই ধারণাকে নিয়েই শুরু হয়, আমার ভেতরে সেই চৈতন্য আছেন, অন্তর্যামী রূপে ভগবান আছেন। এটাই সাধনা, সেখান থেকে দেখে সবারই ভেতরে সেই চৈতন্য বিদ্যমান, সেখান থেকে শেষে দেখে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। একজন খুব উচ্চমানের মহারাজ ছিলেন, অনেক সাধু, ব্রহ্মচারীরা ওনার কাছে অনেক কিছু শিখেছেন। উনি যখন দেহ যাবার অবস্থায় এসে গেছেন তখন একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ গিয়ে বলছেন, মহারাজ! আপনার তো শেষ সময় হয়ে এসেছে, এখনও কি আপনার মন ঈশ্বরে আছে? মহারাজ তখন ব্রহ্মচারীকে বললেন, আগে তুমি বল ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা, তুমি ঈশ্বরকে কিরূপ ভাব? ব্রহ্মচারী বললেন, এই যেমন সবার ভেতরেই তিনি আছেন। মহারাজ তখন বলছেন, you fool get out from my room। অবশ্য তিনি মজা করেই বললেন, রেগেমেগে বলেননি। আমরা মনে করছি মহারাজ সব সময় ঠাকুরকেই দেখছেন, আসলে জিনিসটা তা নয়, জিনিসটা অন্য রকম হয়। চতুর্থ শ্লোকে ভগবান বলছেন –

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাহত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।

যাঁরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁদেরকে নিয়ে এখানে বলছেন। আমি আপনি এখনও তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই। কারণ যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ঈশ্বরের তত্ত্বকে যিনি জানতে চাইছেন, তাঁর জীবনটাই পুরো অন্য রকম হয়ে যায়, তাঁর একেবারে ধারণা হয়ে যায় ঈশ্বর আছেন আর ঈশ্বরই আছেন। প্রথম ধারণা হয় ঈশ্বর আছেন, তারপর ধারণা হয় ঈশ্বরই আছেন, তাছাড়া আর কিছু নেই। তখন শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয় এই গুণগুলো হুড়মুড় ঢুকে পড়ে। যাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা এসে গেছে, হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন, ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়ে গেছে, তাঁকে দেখলে আমাদের মনেও ঈশ্বরের ভাবই জাগবে, তখন আর কাম ভাব জাগবে না, জাগতিক কোন ভাব আসবে না, যদি না একেবারে অত্যন্ত স্থূল মানসিকতার না হয়ে থাকে। ভগবান বলছেন, *অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা*, যাঁরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাঁকে শুধু এতটুকু জানতে হয়। জানার পদ্ধতিটা কি, *অন্বয়ব্যতিরেক*, এটাকেই ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার বলছেন নেতি নেতি বা ইতি ইতি। নেতি নেতি মানে, এটা ঈশ্বর নয়, এটা ঈশ্বর নয়। ঠাকুর নেতি নেতিকে বলছেন বিচার পথ, যেখানে গিয়ে বিচার থেমে যায় সেখানেই ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বর জ্ঞান হয়। এগুলো আমাদের পক্ষে বোঝা একটু কঠিন। সাধন ভজন করে, তপস্যা করে মন যখন অনেক শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, তিনি তখন নিজের মনকেই বিচার করতে থাকেন, তার সাথে মনকে শূন্য করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বহির্জগতের দিকে তখন তাঁর তাকাবার কোন প্রশ্নই নেই। ওনার থাকা, খাওয়া, পড়া সব গরুমোষের মত হয়ে যায়। ঠাকুর এই ধরণের জ্ঞানীদের দেখে কাঁদতেন, মা! আমারও কি এই অবস্থা হবে? এই অবস্থা সবারই হয়, ভক্তেরও হয় জ্ঞানীরও হয়। শুধু ভক্তের শেষের দিকে এই অবস্থা হয় আর জ্ঞানীর প্রথম থেকেই এই অবস্থা হয়ে যায়। জ্ঞানীর আর বাছবিচার থাকে না, কি খাচ্ছে, কি পড়ছে কোন দিকে দৃষ্টি নেই। মনকে শুধু খালি করতে থাকেন, নৌকাতে ফুটো হয়ে গেলে যেমন একটু একটু জল ঢোকে, মাঝি জলটাকে একটা পাত্র দিয়ে বার করে দিতে থাকে, যতক্ষণ না নৌকা ওপারে পৌঁছে যাচ্ছে। বিচার করতে করতে মনটা স্থির হয় নিজের শরীরে, শরীর থেকে মনে স্থির হয়, সেখান থেকে মনের মধ্যে যে প্রাণন ক্রিয়া চলছে সেখানে চলে যান, সেখান থেকে একে একে বুদ্ধি, অহঙ্কার এগুলোতে গিয়ে গিয়ে শেষ অবস্থায় ঈশ্বরের যে জগতের একটা রূপ সেই জায়গার কোথাও গিয়ে দাঁড়ায়। তখনও নেতি নেতি করে দেখছেন এটাও নয়। যখন বিচার হয় তখন দুটো থাকে, একটা হল বিচার, আরেকটা হল বলছেন এটাও না। গুরু তাঁকে বলে দিয়েছেন ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, তাহলে দুটো কি করে এসে যাচ্ছে। যদি আমি বলি এই গ্লাশ ব্রহ্ম নয়, তখন এখানে দুটো জিনিস এসে যাচ্ছে, একটা হল বিচার রূপে গ্লাশ আসছে আর দ্বিতীয় এটা ব্রহ্ম নয়, এই বিচারটাও থাকছে, তার মানে গোলমাল আছে। ঈশ্বরের যখন ধারণা হয় তখনও দুটি ধারণা হয়, আমি আছি আর ঈশ্বর আছেন, জ্ঞানী ঐটাকেও কেটে দেন, তখন বিচার বন্ধ হয়ে যায়। কারণ বিচার হলেই আমি থাকবে, আমি থাকলেই তুমিও থাকবে। অর্থাৎ তুমি থাকলে আমি থাকবে, আমি থাকলে তুমি থাকবে। বিচার যেখানে বন্ধ হয়ে যায় সেখানে আমিও নেই তুমিও নেই। এটাকেই বলে অন্বয়, যেখানে বিচার করে করে বিচার একটা জায়গায় গিয়ে থেমে

যায়। ইতি ইতি সাধনায় এর ঠিক উল্টোটা হয়, সবটাই তিনি। জ্ঞান আর ভক্তিতে এটাই তফাৎ, ভক্ত দেখেন তিনিই সব কিছু হয়েছেন আর জ্ঞানী দেখেন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। যেখানে এই তিনি বোধটা আছে, সেইজন্য এনারা বলেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু শুধু মুখে বললে হয় না, ওটাকে বোধে বোধ করতে হয়। সাধনা এই দুটো মার্গে চলে, জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ। ঠাকুর কথামৃতে বলছেন, মোটামুটি তিন রকমের যোগ হয়, জ্ঞান, কর্ম আর ভক্তি। সেখানে ঠাকুর বলছেন, জপ, তপ, পূজা এগুলোও কর্ম। কর্ম মানেই দুই বোধ। আমি তুমি এই দুই বোধ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এই সাধনা হয় না। সাধনা তখনই শুরু হয় যখন আমিটা উড়ে যায়, তা সে জ্ঞানমার্গেই হোক আর ভক্তিমার্গেই হোক। আর বাস্তবিক যেটা দেখেন সেটাতে দেখছেন তিনিই আছেন, ভগবান এই কথাই বলছেন *অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা*, সব সময়, সব অবস্থাতে, সব পরিস্থিতিতে তিনি এটাই দেখেন যে, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। খুব বিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি এইভাবে সাধনা করি, কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হবে, আমি সবার মধ্যে সেই এক দেখছি। কিন্তু তা হয় না, আমার গুরু আর একজন হিংসাপরায়ণ খুনী, দুজনকে এক দেখব, এ কখনই সম্ভব নয়, জ্ঞানী ছাড়া এভাবে কেউ দেখতে পারবে না।

চতুঃশ্লোকী ভাগবতের এই চারটি শ্লোকের মূল বক্তব্য একটাই, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, যা কিছু তুমি দেখছ সব মায়ার মত ভাসছে, মায়াটাও ঈশ্বরের। এই যে বলছেন, *তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাহভাসো যথা তমঃ*, যেমন মরীচিকাতে জলের আভাস, ঠিক তেমনি এই চৈতন্যে অবিদ্যার আভাস। জগতে যা কিছু দেখছি, সব কিছুই সেই চৈতন্যে ভাসমান, ভাসমান মানে যার কোন বাস্তবিকতা নেই। বাস্তবিকতা নেই মানে, দেশ, কাল ও বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন, এটাই মায়া। বেদান্ত যখন যে কোন বস্তুর realকে ব্যাখ্যা করে তখন তার পরিভাষা হল, যে জিনিস গতকাল ছিল, আজও আছে আর আগামী দিনেও থাকবে, তিনটে অবস্থায় যে জিনিসটা আছে ওটাই একমাত্র সৎ, বাকি সব অসৎ। অসৎ বলতে অলীক নয়, অলীক মানে যে জিনিসটা কোন কালেও ছিল না আর কোন কালেও হবে না। যেমন বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুম, আকাশকুসুম বলে কিছু হয় না। আবার যদি বলা হয় নীল ঘোড়া, নীলটাও সত্য, ঘোড়াটাও সত্য, কিন্তু দুটোকে মিলিয়ে যদি নীল ঘোড়া বলা হয় তখন ওটাই অলীক হয়ে যাবে, কারণ নীল ঘোড়া কোন কালে ছিলও না আর কোন কালে হবেও না। এই জগৎ অলীক নয়, জগৎ আছে। বৌদ্ধদের অনেক দার্শনিক এগুলোকে অনেক জটিল করে দিয়ে অনেকের মধ্যে নানা রকমের সংশয় তৈরী করে দিয়েছেন। আমিও আছি আপনিও আছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই, এই ঘর, এই মাইক্রোফোন সবই সত্য কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা সময় আমিও ছিলাম না, আপনিও ছিলেন না বা এই ঘর, এই মাইক্রোফোন এগুলো কিছুই ছিল না, আবার একটা সময় আসবে যখন আমি, আপনি, এগুলো কিছুই থাকবে না। এটাই বেদান্তের মায়া, মায়া একটা বিশেষ শব্দ, মায়া মানে মিথ্যা না। মায়া মানে যেটা কোথাও একটাতে পরিচ্ছিন্ন, হয় দেশে, নয় কালে, নয়তো বস্তুতে। যেমন এই মাইক্রোফোন বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন, গ্লাশটা মাইক্রোফোন নয়, মাইক্রোফোনটা গ্লাশ নয়, বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দেশেও পরিচ্ছিন্ন, মাইকটা এই টেবিলে আছে, অন্য টেবিলে নেই। কালেও পরিচ্ছিন্ন, অমুক কোম্পানিতে এই মাইকটা তৈরী হয়েছে, এর আগে ছিল না, কিছু দিন পরে থাকবে না। আমরা যে জিনিসকে ভালোবাসছি, যার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যাকে পেতে চাইছি, যাকে অত্যন্ত সম্মান দিচ্ছি, দেখা যাবে সেই জিনিসটা গতকাল ছিল না, আজকে আছে, আগামীকাল থাকবে না বা কাল ছিল আজকে নেই। তাহলে এই শাস্ত্র গুলোও তো মায়া? না মায়া নয়। কেন নয়, এটাই বলছেন, বেদ ঈশ্বরের সঙ্গেই থাকে। ঈশ্বর যেমন সৎ ঠিক তেমনি বেদও সৎ। জ্ঞান কখন অসৎ হয় না, জ্ঞান সব সময় ঈশ্বরের সঙ্গে থাকে। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, সেইজন্য জ্ঞান, যেটা বেদে পাওয়া যায়, সেটাও সৎ। সনাতন একমাত্র দুটি জিনিস, এক ভগবান আর তাঁর সাথে যে জ্ঞানরাশি আছে, সেইজন্য তাঁর নাম সচ্চিদানন্দ, সৎ, চিৎ আর আনন্দ। সৎ মানে যেটা আছে, যেটা সনাতন, চিরদিন আছে চিরদিন থাকবে। তাঁর আরেকটি নাম চিৎ বা চৈতন্য, চৈতন্য মানে জ্ঞান। তাই বলে কবিদের কবিতা নয়, মানুষ মারা যাবে, এটাও ঐ জ্ঞানের মধ্যে পড়ে না। এই জ্ঞান মানে, যেমন সচ্চিদানন্দই আছেন, বেদে যে কথাগুলো বলছে সেখানে এই জ্ঞানের কথা আসে। এই জ্ঞান ঈশ্বরের সঙ্গে সব সময় থাকে বলে এই জ্ঞানও অনন্ত, এর কোন

দিন নাশ হবে না। বেদকে তাই বলা হয় অনাদি, অনন্ত। তার বাইরে সব কিছু বিনাশী, কবিদের কবিতা আগে ছিল না, এখন আছে, কিছু দিন পরে সেই ভাষাটাও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, কবিতাও আর থাকবে না। কিন্তু ঐ কবিতার পেছনে যে চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, আর যদি সেটা খুব উচ্চমানের চিন্তা হয় তাহলে থাকবে।

চারটে শ্লোকের মূল বক্তব্য ভগবানই আছেন। ঠাকুরও বার বার এই কথা বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। যা কিছু দেখছ সবই সচ্চিদানন্দের মধ্যে মায়ার উপর ভাসমান। নেতি নেতি বা ইতি ইতি এই দুটোর মধ্যে কোন একটা পথ বেছে নিয়ে, ঈশ্বরই আছেন, এই সত্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হও। ভগবান বলছেন, আমার যাঁরা ভক্ত, যাঁরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁদের এই এতটুকু জানলেই হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, নিজেকে মারার জন্য একটা নুড়ুন হলেই হবে কিন্তু অপরকে মারার জন্য ঢাল তলোয়ার দরকার। এই চারটি শ্লোক হল নুড়ুন, এইটুকু সাধনা করলেই বাকি সব হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দ্বারা তো সাধনা হবে না, সেইজন্য ভাগবতের মত মোটা মোটা গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হয়। আমরাও এবার তাই মূল ভাগবতের আলোচনায় প্রবেশ করছি।

ভাগবতের সূচনা

ভাগবত শুরু হয় *জন্মাদ্যস্য যতঃ* এই শ্লোক দিয়ে, ব্রহ্মসূত্রের শুরুও হয় *জন্মাদ্যস্য যতঃ* শ্লোক দিয়ে। বেদান্তের তিনটি মূল গ্রন্থ, উপনিষদ, গীতা আর ব্রহ্মসূত্র। এই তিনটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে বেদান্ত দাঁড়িয়ে আছে। যিনি বলছেন আমার যে মত বেদান্তেরও এই মত, যেমন আমরা বলছি ঠাকুরের এই মত, তখন উপনিষদ, গীতা আর ব্রহ্মসূত্র দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে ঠাকুরের যে মত বেদান্তেরও একই মত। ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরুপণ করা হয়েছে, আর তার শুরুই হয় *জন্মাদ্যস্য যতঃ* থেকে। *জন্মাদ্যস্য যতঃ* মানে যেখান থেকে সব কিছুর সৃষ্টি। এখন তাহলে ঠিক করতে হবে কোথা থেকে সব কিছুর সৃষ্টি? বিজ্ঞানীরা বলবে পদার্থ থেকে জন্ম, কেউ বলবে এটা এভাবেই চলে আসছে, এগুলো কিছু না। সাংখ্যবাদীরা বলবেন প্রকৃতি থেকে সব কিছুর জন্ম। এর আগে এগুলো আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র মতে, যেটা আচার্য শঙ্কর স্থাপন করলেন আর যেটা ভাগবত শুরু করছেন সেটা হল – ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি। যদি কেউ বলেন এর প্রমাণ দিন। তখন তাকে বলে দিতে হবে, তুমি ভাই ব্রহ্মসূত্রের যে আচার্য শঙ্করের ভাষ্য আছে ওটা তুমি পড়ে নাও, তাহলে তুমি বুঝে যাবে যে এর অন্যথা কিছু হতে পারে না। *জন্মাদ্যস্য যতঃ* এই শ্লোকের উপর বিরাট আলোচনা চলতেই থাকে।

মুনি পুত্রের অভিশাপে পরীক্ষিতের সাত দিনে সর্পদংশনে মৃত্যু হবে। এর আগের লম্বা কাহিনীতে, আমরা যাচ্ছি না। এই সাত দিন পরীক্ষিৎ কিভাবে কাটাবেন? তিনি ঠিক করেলেন ব্রাহ্মণের অভিশাপ অমোঘ, মৃত্যু আমার অবধারিত, আমি ঈশ্বরে মন দেব। সব কিছু ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করে বসে গেলেন। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে যেতেই মুনি, ঋষিরা গঙ্গার তীরে এসে সমবেত হয়েছেন। ওদিকে শুকদেবও খবর পেয়েছেন, তিনিও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সবাই মিলে শুকদেবকে অনুরোধ করলেন ভাগবত কথা শোনাবার জন। তিনি রাজী হয়ে ভাগবত কথার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। ব্যাসদেবের কাছে শুকদেব ভাগবত কথা শুনেছিলেন। শুকদেব কৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু আমাদের পরম্পরাতে কোন কাহিনীই দুম্ করে শুরু হয়ে যায় না, একটু পেছন থেকে শুরু করতে হয়। এরা আগে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। পুরাণের যে কোন কাহিনীতে প্রথমেই বলে দিতে হয় সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, তার সাথে যাদের কথা বলা হবে তাদের বংশের ইতিহাসটাও বলতে হবে। সেইজন্য শুকদেবও শুরু করছেন, সৃষ্টি কিভাবে হল, কিভাবে সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ এসেছে, কোন কোন অবতাররা এসেছেন, সব কিছু বলে বলে তারপর তিনি শেষে আসছেন দশম স্কন্ধে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বর্ণনা দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নেওয়ার পর বৃন্দাবনে কি কি লীলা করলেন, যশোদার সাথে তাঁর কি ব্যবহার, গোপীদের সাথে তাঁর কি ব্যবহার এগুলোকে নিয়ে বলছেন। আমরা এর আগে রাসলীলা পর্যন্ত আলোচনা করে এসেছি। এখন আমরা দশম স্কন্ধেরই আরও অনেক কিছুকে নিয়ে আলোচনা করব। ভাগবত ধর্মের ঐতিহ্যে বলা হয় যে, দশম স্কন্ধ হল ভাগবতের প্রাণ বিশেষ করে রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায় ভাগবতের পাঁচটি প্রাণ আর একাদশ স্কন্ধ ভাগবতের আত্মা।

দশম স্কন্ধের শেষাংশ

অক্রূরের ব্রজভূমি আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরাগমন

রাসলীলার পর শ্রীকৃষ্ণ আরও কিছু লীলা করছেন, সুদর্শন ও শঙ্খচূড় কিছু অভিশপ্ত শাপকে উদ্ধার করছেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা চলতে লাগল। এরপর আসছে যুগলগীত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে চির আকাঙ্খিত রাসলীলা আস্বাদন করার পর গোপীদের আর সংসারের কাজে মন লাগছে না। শ্রীকৃষ্ণ দিনের বেলা গোপ বালকদের সাথে গোচারণ করতে বনের দিকে চলে যেতেন সেই সময় গোপীরা সবাই এক জায়গায় একত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার স্মৃতিমন্থন করে লীলাগান করতেন। এই লীলাগান নিয়েই যুগলগীত, দশম স্কন্ধের পঁয়ত্রিশতমো অধ্যায়ের নাম যুগলগীত। শ্রীকৃষ্ণের রূপের সৌন্দর্য, তাঁর লীলামাধুরি গোপীদের মুখ দিয়ে যুগলগীতে বর্ণনা করা হয়েছে। সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গোপীরা শুধু শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলে যাচ্ছেন। যুগলগীতে খুব সুন্দর সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা আছে। এক জায়গায় যেমন বলছেন *বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ। কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তিঃ।। ১০/৩৫/২২।* গোধুলী বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, শ্রীকৃষ্ণ ধেনুদের নিয়ে গোষ্ঠে ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। গোপীরা অধীর আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। এক গোপী বলছেন 'কি ব্যাপার! এখনো কেন কৃষ্ণ ফিরে আসছে না'। তখন অন্য গোপী বলছেন 'দেখো সখী! তুমি তো জানো গোবিন্দ একান্তভাবেই গোবৎসল, ব্রজের গাভীদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ, এক্ষুণি হয়তো তিনি সব গাভী ও গোবৎসদের একত্রিত করে এসে পড়বেন'। 'কিন্তু তার জন্য এত দেরী হওয়ার তো কথা নয়'। তখন বলছেন 'আসলে কি হয় জানো, ফেরার পথে বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মা আর জ্ঞানবৃদ্ধ শঙ্কর ও অন্য অনেক দেবতারা পথের মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনা করতে থাকেন বলেই তো এত দেরী হয়'। তার মানে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ফিরতে বিলম্ব হওয়াটুকুও সহ্য করতে পারছেন না বলে নানান ধরণের অজুহাত দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইছেন। যুগলগীতের মাধুর্যরস ও ভাব খুব সুন্দর। এরপর আসে অরিষ্টাসুর উদ্ধার কাহিনী।

অন্য দিকে মথুরায় ইতিমধ্যে কংসের কাছে বৃন্দাবনের কিছু কিছু সংবাদ আসতে শুরু হয়েছে। কংসের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার স্বয়ং দেবর্ষি নারদ একদিন মথুরাতে এসে কংসকে বলছেন – শোন কংস! তুমি যে শিশুকন্যাটিকে মারতে উদ্যত হয়েছিলে আর কন্যাটি তোমার হাত থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে উঠে গিয়েছিলে, আসলে সে ছিল যশোদার সন্তান আর যশোদা এবং নন্দের কাছে যে পুত্রটি পালিত হচ্ছে সেটিই প্রকৃতপক্ষে দেবকীর পুত্র। নারদের মুখ থেকে এই কথা শোনার সাথে সাথে ক্রোধের বশে কংসের সমস্ত ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে উঠল। তখনই কংসের মাথায় নানান রকমের দুর্বুদ্ধি খেলতে লাগল। কি করে এই কৃষ্ণ আর বলরাম দুটোকে বধ করা যেতে পারে চিন্তা করতে শুরু করে দিল। কৃষ্ণ আর বলরামকে কায়দা করে যে করেই হোক মথুরায় নিয়ে আসতে হবে। তারপর এদের সাথে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। কংসের দুজন নামকরা পালোয়ানকে বলে দেওয়া হল তোমরা ওদের দুজনকে মল্লযুদ্ধের ছলে বধ করে দেবে। তার আগে এও করা যেতে পারে, মল্লযুদ্ধের মঞ্চে পৌঁছানোর আগেই দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামের মহাবলশালী হাতীকে এনে রাখা হবে। কৃষ্ণ আর বলরাম আসার সময় এই বলশালী হাতিটিকে ওদের দিকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর তখনই দুজনকে পায়ের তলায় পিশে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। এইভাবে হাতি দিয়ে কোন শত্রুকে বধ করা খুব পুরনো প্রথা, মুঘল আমলেও এইভাবে অনেককে বধ করা হয়েছিল। হাতিদের এই কাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া থাকতো। মাহুত একটু ইঙ্গিত করতেই হাতি গিয়ে পায়ের তলায় পিশে দিত। কিন্তু তার আগে কৃষ্ণ আর বলরামকে তো বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে আসতে হবে। দুজনকে নিয়ে আসার জন্য কংস যদুবংশীয়দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ অক্রূরকে দায়ীত্ব দিলেন। অক্রূর ছিলেন নন্দবাবাদের সম্বন্ধী। মহাভারতে বিদুর যেমন, তেমনি অক্রূরও একজন ধর্মজ্ঞ ও সন্ত প্রকৃতির পুরুষ। কংস সেই অক্রূরকে বললেন – হে অক্রূর! তোমার মত উদারস্বভাব, দানশীল পুরুষ জগতে বিরল। ভোজবংশীয় তথা বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের মধ্যে তোমার মত হিতকারী আমার আর কেউ নেই। তোমাকে আমি একটা কাজের দায়ীত্ব দিতে চাইছি। তুমি নন্দরাজের

ব্রজভূমিতে যাও আর গিয়ে বলো মথুরায় কংস এক মল্ল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন, সেই প্রতিযোগিতায় যেন কৃষ্ণ আর বলরাম অংশ গ্রহণ করে।

দেবর্ষি নারদের সব কিছুই জানা। তিনি কংসের কাছ থেকে ফিরে সোজা ব্রজভূমিতে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গোপনে সব বলতে শুরু করেছেন। তার আগে নারদ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বলছেন – *কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর। বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো।।১০/৩৭/১১।* হে কৃষ্ণ! হে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ! হে যোগেশ্বর! হে জগদীশ্বর! সর্বভূতে বিরাজমান! হে অখিলবাস! ভক্তজনবাঞ্ছিত হে কৃষ্ণ! হে আমার প্রভু! যেমন একই অগ্নি সকল অরণির মধ্যে বিদ্যমান, ঠিক সেই ভাবে আপনি সমস্ত জীবের মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করছেন। সমস্ত প্রাণীর শরীর যেন পঞ্চকোষীয় গুহা, অর্থাৎ আমাদের শরীর অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কোষ দ্বারা আবৃত। নারদ বলছেন আপনি এই পঞ্চকোষীয় গুহার মধ্যে গূঢ় ও গুপ্ত ভাবে লুকিয়ে আছেন। আপনিই সবার ভেতরে রয়েছেন। আপনিই আবার বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দ। আপনি সবারই অধিষ্ঠান কিন্তু আপনি নিজে অধিষ্ঠানন্তর রহিত, স্বতন্ত্রপুরুষ। আপনার আত্মাতিরিক্ত অপর কোনো পদার্থের প্রয়োজন হয় না, কারণ আপনি সর্বশক্তিমান এবং সত্যসংকল্প। যেমন আমাদের যে স্বরূপ তাতে আমাদের হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি আছে, আর আমাদের মন আছে, মনের মধ্যে নানা রকম সঙ্কল্প বিকল্প এবং বহুবিধ সংস্কার আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তা নন, তিনি হলেন বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন। এর বাইরে যা কিছু দেখাচ্ছে এগুলো আপনার খোলস মাত্র। দেবর্ষি নারদ এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে কংস কৃষ্ণ আর বলরামকে বধ করবার জন্য কি কি পরিকল্পনা করেছে সব জানিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সব শুনলেন। শ্রীকৃষ্ণও সব আগে থাকতেই জানতেন আর তিনি এও জানতেন যে তাঁদের দুই ভাইকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূর আসছেন। অক্রূর আবার শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালোবাসতেন, অক্রূর নিজেই একজন মহাত্মা ছিলেন, তিনি জানতেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

অক্রূর সেই রাতটি মথুরাপুরীতে কাটিয়ে সকাল হতেই রথ নিয়ে ব্রজধামের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রা পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে মনে মনে চিন্তা করছেন *কিং ময়াহহচরতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ। কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্।।১০/৩৮/৩।* অক্রূর মনে মনে ভাবছেন আমি কি এমন শুভকর্ম করেছি, কি এমন শ্রেষ্ঠ তপস্যা করেছি, কোন্ সৎপাত্রকে আমি মহৎ দান করেছি। শুধু দান করলেই হয় না, সৎপাত্রে দান করতে হয়, সেইজন্য অক্রূর এখানে সৎপাত্রে দানের কথা বলছেন। বলছেন যার ফলস্বরূপ আজ আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব। অক্রূর খুব বিনয় পূর্বক বলছেন, আমি হলাম বিষয়াসক্ত মানুষ, আমার মত বিষয়াসক্ত মানুষের পক্ষে ভগবানের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ, যেমন শূদ্র বালকের পক্ষে বেদপাঠ একটা অঘটন। কিন্তু যেভাবেই হোক আমার হয়তো সব অশুভ কর্ম শেষ হয়ে গেছে, আমার জন্মও ধন্য হয়ে গেছে সেইজন্য আজ আমি ভগবানের সেই চরণকমলে আমার প্রণতি নিবেদন করতে পারব। অক্রূর এইভাবে চিন্তা করতে করতে ব্রজভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। যেতে যেতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিরাট স্তুতি করে চলেছেন। অক্রূর ভাবছেন শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা হলে তিনি প্রথমে কি করবেন। বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা হতেই আমি ঝাঁপিয়ে তাঁর চরণদুটো জড়িয়ে ধরবো, কারণ শ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষরা আত্মসাক্ষাৎকার করার জন্য সর্বদা ভগবানের চরণকমলের ধ্যান করেন। যোগীদের সেই কাঙ্খিত চরণকমল আমি স্থূল চোখে দেখতে পাবো।

নন্দগৃহে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অক্রূরের সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আসার সময় ব্রজের মাটিতে অক্রূর পরিষ্কার শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। এরা আগে রাসলীলাতেও গোপীরা ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখতে পান। অক্রূরও সেই পদচিহ্নে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যার মধ্যে পদ্ম, যব, অঙ্কুশ এই ধরণের দুর্লভ চিহ্ন, যে চিহ্নগুলো সাধারণত মানুষের থাকে না। প্রথম যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন, সেখানেই রথ থেকে নেমে মাটিতে সেই পদচিহ্নের উপর গড়াগড়ি দিতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে এবার আমি নিজের চোখে দেখতে পাবো ভেবে অক্রূর আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। যদিও উনি কংসের প্রতিনিধি রূপে আমন্ত্রণ নিয়ে আসছেন। অক্রূরের মনে আবার ভয়, আমি কংসের দূত সেইজন্য আমাকেই না বধ করে দেন।

হিন্দুদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল মানবজন্ম বার বার হয়, কখন মানব দেবতার শরীর ধারণ করে, কখনও আবার পশুপাখি ও তির্যকাদি প্রাণীর শরীর ধারণ করে। এখানে অক্রূরের কথা বলতে গিয়ে শুকদেব পরীক্ষিৎকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন *দেহংভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্। সন্দেশাদ্ যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবনাদিভিঃ।।১০/৩৮/২৭।* অক্রূর নন্দগ্রামে পৌঁছে মাটিতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে তার উপর যে লুটোপুটি খেলেন, এতে যাই হয়ে থাকুক না কেন, এখানে মূল লাভ এটাই – কংসের আদেশ থেকে শুরু করে শ্রীহরির পদচিহ্ন দর্শন পর্যন্ত অক্রূরের চিত্তের যে অবস্থা ছিল, জীবমাত্রেরই দেহধারণের এটাই পরমপ্রাপ্তি, এটাই জীবের পরম পুরুষার্থ। সেইজন্য সমস্ত দেহধারীরই একমাত্র কর্তব্য হল *দম্ভং ভিয়ং শুচম্*, দম্ভ অর্থাৎ অহঙ্কার, ভয় আর শোক এই তিনটে ত্যাগ করে ভগবানের মুর্তি আর তাঁর যাঁরা ভক্ত এবং ভগবানের চিহ্ন, লীলা, স্থান, ভগবানের গুণাবলির দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা অক্রূরের মত ঈশ্বরীয় ভাব অধিগত করার চেষ্টা করা। ঠাকুর বলছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। ঈশ্বর দর্শন না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে মানবজীবনকে কীভাবে লাগাবো। কুকুর, বেড়াল, গাধা, হাতি এদের মনে কি চলছে আমাদের জানা নেই, অথচ আমরা নিজেদের এদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলছি। মানুষের মনে কি চলছে আমাদের জানা আছে। মানুষ ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারে, যেমন বিজ্ঞানে আজ মানুষ আজ কত উপরে উঠে গেছে। বিজ্ঞানের মত খেলাধূলার জগতে, শিল্পের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষ কত এগিয়ে গেছে। কিন্তু এগুলোর কোনটাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানবজীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভগবানের বাহ্যিক যা কিছু আছে সেইদিকে আগে মনটা লাগানো। ভগবানের বাহ্যিক ব্যাপার মানে, যেখানে ভগবানের বিগ্রহ মুর্তি আছে সেই বিগ্রহের সামনে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, প্রণাম করা, পূজাদি করা। যাঁরা ভক্ত তাঁদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, আদর করা। যেখানে যেখানে ভগবানের চিহ্নাদি আছে সেখানে প্রণাম করা, যেখানে যেখানে তিনি লীলা করেছেন সেখানে যাওয়া এবং তাঁর লীলা চিন্তন করা। এসব করলে ঈশ্বরীয় ভাবটা ভেতরে গাঢ় হয়।

মহম্মদ বলছেন মক্কার কাবাতে যত মুর্তি আছে আল্লার মুর্তি বাদে সব মুর্তিকে ভেঙে দাও। কিন্তু ভাগবত এখানে আদেশ করে বলছেন মানবজীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ভগবানের প্রতিমা, বিগ্রহ, চিহ্নাদি দর্শন করলেই দম্ভ, ভয় ও শোক ত্যাগ করে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করা। তাহলে এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়? এই তফাৎটা সবারই খুব ভালো করে বোঝা দরকার। মহম্মদ যে মুর্তিগুলো ভেঙে ফেলতে বললেন আর হিন্দুরা ভগবানের যে মুর্তি পূজা করে, এই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। হিন্দুদের অনেক জায়গায় যেমন শীতলাদেবীর পূজা করা হয় বা আদিবাসীরা যে নানান রকম উদ্ভট মুর্তির পূজা করে, এগুলোকে ঠিক ধর্ম বলা যায় না, এগুলো হল গ্রাম্য সংস্কৃতি। মক্কাতে এই গ্রাম্য সংস্কৃতিটাই ছিল। অন্য দিকে মক্কা অনেক প্রাচীন তীর্থস্থান, আর ওখানে যে সম্প্রদায়রা ছিল তারা তীর্থযাত্রীদের ওই মুর্তি দর্শন করিয়ে অর্থ উপার্জন করত। মক্কাতে তখন যে মুর্তি পূজার প্রচলন ছিল সেই মুর্তি পূজার মাধ্যমে তারা কখনই অনন্তের পূজা করত না, শুধু মুর্তি পূজাই করত। হিন্দুরা কখন মুর্তির মাধ্যমে মুর্তিরই পূজা করে না, মুর্তির মাধ্যমে তারা সেই অনন্তের পূজাই করছে। মহম্মদ বলছেন অনন্তকে দেখা যাবে না, তাঁর অনুভব করা যাবে না, কিন্তু তাঁর শব্দ শ্রবণ করা যাবে। তাঁর শব্দ কি? কোরান। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, তোমার অনন্তকে কেউ দেখতে পারবে না, অনুভব করতে পারবে না কিন্তু তাঁর কথা শুনতে পারবে, এটা কি ধরণের যুক্তি? কিন্তু এটাই ইসলাম ধর্মের মৌলিক তত্ত্ব – আল্লাকে দেখা যাবে না, তাঁকে অনুভব করা যাবে না কিন্তু তাঁর কথা হল কোরান। কোরানের নির্দেশ মত যদি চল তাহলে তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে যাবে। ইসলামের কিছু সাধক যখন সাধনা করতে শুরু করলেন তাঁরা ঠিক এই জায়গাতে আপত্তি করলেন। তাঁরা বললেন আমি স্বর্গ যেতে চাই না, স্বর্গেই যদি না যেতে চাই তাহলে আমি কেন তোমার কথা পালন করতে যাব। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাকে অনুভব করা যাবে। এঁরাই হলেন সুফি সাধক। সুফিরা বললেন আল্লাকে অনুভব করা যাবে, কিন্তু মুসলমানরা বলল সুফিদের এই কথা মহম্মদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সুফিদের জীবন বিপন্ন হওয়ার প্রধান কারণ এটাই। হিন্দুদের কাছে এই নিয়ে কোন সমস্যা নেই, হিন্দুরা বলেন যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই নিরাকারেরই মুখ। কিন্তু এখানেও আবার প্রশ্ন হবে, নিরাকারের কি আবার মুখ হয়? মহম্মদ যে বলছেন

নিরাকারকে বোধ করা যায় না, এখানে মহম্মদ একেবারে ঠিক কথা বলছেন, এতে হিন্দুরাও কোন আপত্তি করবেন না। ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রথম আসার পর মুসলমান পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তাঁরা স্পষ্ট করে এই কথাই লিখছেন, ভারতে দুটো ধর্ম চলে – একটা সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ধর্ম এবং আরেকটি হল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যে ধর্ম পালন করছেন। তাঁরা বলছেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ধর্ম অত্যন্ত উচ্চমানের ধর্ম। উচ্চমানের ধর্ম কোনটা? যে ধর্মের কথা আমরা এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করছি, এটাই উচ্চমানের ধর্ম। এর বাইরে এতদিন আমরা যে ধর্ম পালন করে এসেছি সেই ধর্ম হল সহজ ধর্ম। সহজ ধর্মটা কিন্তু কখনই হিন্দু ধর্ম নয়। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যে ধর্ম পালন করতেন, ঋষিরা যে ধর্মের কথা বলে গেছেন সেটাই আসল হিন্দু ধর্ম, সেই ধর্মের কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি। ঋষিরাও জানতেন নিরাকারকে দেখা যায় না, মহম্মদও একই কথা বলছেন। নিরাকারের শব্দ হতে পারে, সেটা মহম্মদও বলছেন। ঋষিরা বলছেন নিরাকারের শব্দ হল বেদ, মহম্মদ বলছেন কোরান। কিন্তু এখান থেকে হিন্দুরা আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে।

ঋষিরা বলছেন – যিনি নিরাকার তিনি যদি চান তিনি সাকার হতে পারেন, সেই সাকারকে দেখা যায়, অনুভব করা যায়, সেটাই নিরাকারের মুখ। তাহলে নিরাকারের মুখ কোথায় হবে? পুরুষসূক্তমে বলছেন *সহস্রশীরসা মুখম্*। নিরাকারের কি একটা মুখ হবে? না, তাঁর হাজার হাজারটা মুখ হবে, হাজার মানে অনন্ত। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণও তাঁর মুখ, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর মুখ আর শ্রীরামকৃষ্ণও সেই নিরাকারের মুখ। নিরাকারের মধ্যে যিনি যেতে চাইছেন তাঁকে এখান থেকে একটা মুখকে ধরে নিরাকারের দিকে যেতে হবে। কোন হিন্দুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি মহম্মদকে কীভাবে দেখেন? হিন্দুদের কাছে এর খুব সহজ উত্তর – আমরা মহম্মদকে অবতার রূপে দেখি। কিন্তু মহম্মদ তো নিজেকে অবতার বলছেন না। তাতে কি আছে, আমরা তাহলে তাঁকে একজন ঋষি রূপে দেখব। মহম্মদকে ঋষি মানতে কারুরই আপত্তি হবে না। স্বামীজীকে আমরা অবতার বলছি না, তাঁকে আমরা ঋষি মানছি। স্বামীজীর মাধ্যমে কি নিরাকারে পৌঁছানো যাবে না? অবশ্যই পৌঁছান যাবে। ঠাকুর, মা, স্বামীজী যাঁকে নিয়েই চলি না কেন, নিরাকারেই চলে যাব। উদ্দেশ্য হল নিরাকারে যাওয়া। খ্রীশ্চান, মুসলমান, হিন্দু সবারই একই উদ্দেশ্য, নিরাকারে পৌঁছান। কিন্তু সাধনার পদ্ধতি আর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তফাৎ এসে যাবে। আবার এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে মক্কায় মহম্মদ যে মুর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছিলেন, ভারতের ধর্মীয় মুর্তি মক্কার মুর্তির মত নয়। পরে যখন ইসলাম ভারতের প্রবেশ করল তখন তারা ভারতের সব মুর্তি, শিবলিঙ্গ ভাঙতে শুরু করে দিল। কিন্তু এখানকার মুসলমানরা যেটা ভুল করছে তা হল, মহম্মদ যে মুর্তি পূজার বিরুদ্ধে বলছেন, ভারতের এই পূজা সেই মুর্তির পূজা নয়। মহম্মদ যেই অর্থে মুর্তি পূজার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, সেই অর্থে আচার্য শঙ্করও এই ধরণের মুর্তি পূজার অত্যন্ত নিন্দা করেছেন, তিনি তো জানতেনও না মহম্মদ বলে কেউ ছিলেন। আচার্য বলছেন, মাতৃকাগণ, বিনায়কাদির যে পূজা করা হয় এগুলো হেয়, এই ধরণের পূজা করতে নেই। ঠাকুরও এইসব মুর্তি পূজার নিন্দা করেছেন, আমাদের সব শাস্ত্রই নিন্দা করছে। কিন্তু ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যে ভবতারিণীর মুর্তি পূজা করলেন বা এত সন্ন্যাসী, গৃহীভক্তরা ঠাকুরের পূজা করছেন এগুলোকে আমরা কি বলব? আসলে এর কোনটাই মুর্তি পূজা নয়, যে অর্থে পৌত্তলিক পূজা বলে সেই অর্থে এগুলো মুর্তি পূজা নয়। অনন্তের অবধারণা করা যায় না। কিন্তু একটা অবলম্বন করা যায়, অনন্তের অবধারণা করার জন্য যাঁকে অবলম্বন করা হচ্ছে সেটাকে কখনই মুর্তি পূজা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মুসলমানরা মালায় আল্লার নিরানব্বুইটা নাম জপ করেন। জপ যখনই করছেন তখনই তো মুর্তি পূজা হয়ে গেল। যে কোন অবলম্বন নিয়ে নিলেই মুর্তি পূজা হয়ে যাবে। নিরাকারের নাম কি করে হবে! আল্লার যখন নিরানব্বুইটা নাম এসে গেল তখন তো তিনি আর নিরাকার থাকলেন না। সমস্যা হল, মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা জানেন এইভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে নাম, রূপ না দিলে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হবে না। কাবাতে যে পাথরকে প্রদক্ষিণ করা হয়, ওটাই তো মুর্তি পূজা হয়ে গেল। কাবার কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, যেমনি বললেন আমি মক্কায় হজ করতে যাব, তখন ওটাই মুর্তি পূজা হয়ে গেল। আসলে এগুলো না রাখলে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম কোন দিন পৌঁছাতে পারবে না। ইসলাম ধর্মের যাঁরা সত্যিকারের উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন পুরুষ তাঁরা জানেন যতক্ষণ আল্লার নিরানব্বুইটা নাম জপ না করা হবে ততক্ষণ মানুষের কিন্তু

আধ্যাত্মিক উন্মেষ হবে না। মুসলমানরা যতই নিরাকার নিরাকার করুক, ব্রাহ্ম সমাজ যতই নিরাকার নিরাকার করুক, একমাত্র ঠিক ঠিক নিরাকার সাধক হলেন উপনিষদের ঋষিরা, বিশেষ করে যাঁরা ঠিক ঠিক জ্ঞানমার্গের সাধক, যাঁরা নেতি নেতি করে সব কিছু উড়িয়ে দিয়েছেন। এঁরাই ঠিক ঠিক নিরাকার সাধক, কোন ভগবান মানবেন না, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, কোন অবতারকেও মানবেন না, মন্দির, মসজিদ কিছুই মানবেন না। সব থেকে বড় কথা হল, এই ধরণের ঠিক ঠিক নিরাকার সাধকরা নিজের দেহকেও মানেন না। তাঁর হাত কেটে গেছে, দর দর করে রক্ত পড়ছে, কিন্তু নির্বিকার, আমি তো দেহ নই আমি শুদ্ধ আত্মা। এঁরাই ঠিক ঠিক নিরাকার সাধক। ব্রাহ্ম সমাজের লোকরা একদিকে বলছে নিরাকার অন্য দিকে আবার গানে গাইছে – দাও হে প্রভু তোমার চরণধূলি, একদিকে নিরাকার, সেই নিরাকারে আবার চরণ আছে আবার সেই চরণে ধুলিও আছে। ঠাকুর সেইজন্যই বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন – আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া ছিল।

ঋষিরা আগে থেকেই জানতেন নিরাকারকে গ্রহণ করার সাধারণ মানুষের সেই প্রস্তুতিই নেই। শুকদেব তাই পরীক্ষিৎকে বলছেন – মানবজীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল *হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ*, দম্ভ, ভয় ও শোক ত্যাগ করে লিঙ্গ মানে চিহ্ন, হরির লিঙ্গ মানে ভগবানের কোন মুর্তি, যেমন শিবলিঙ্গ বা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর মুর্তি, এটাই অনন্তের মুখ, সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, প্রণাম করা, পূজাদি করা। ভগবান বিষ্ণু আর সেই বিরাট পুরুষ দুজনেই সেই এক। হিন্দুরা ভগবানের কোন মুর্তিকেই মুর্তি রূপে দেখে না, দেখে সেই বিরাটের মুখ, যাকে অবলম্বন করে আমি সেই অনন্তে পৌঁছে যেতে পারি। মুর্তিতে যদি বিরাটের মুখ না দেখে তাহলে আর অনন্তে যাওয়া যাবে না। ঋষিরা এই সমস্যাটা অনেক দিন আগেই সমাধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে একটা দল আছেন, যাঁদের বলা হয় বেদান্তিক ঋষি, এনারা কোন কিছুই মানবেন না। তাঁদের সাধনাই হল সব কিছুকে নেতি নেতি করে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে – ভগবানের মুর্তির তো কোন প্রশ্নই নেই, এমনকি আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই বলতে বলতে শরীরটাও ফেলে দেন। এটাই একেবারে খাঁটি নিরাকার সাধনা। সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন, সেই দেখে তোতাপুরী বলছেন – ক্যায়া রোটী ঠোক রহে হ্যায়। তোতাপুরী কি জানতেন না যে ঠাকুর মধুর স্বরে ভগবানের গান করছেন, কিন্তু এত কাঠখোট্টা নিরাকারী সাধু যে ভগবানের নামেও ব্যঙ্গ। তোতাপুরী পেটের ব্যাথায় কাতরাচ্ছেন আর বলছেন – ধ্যুৎ! এই শরীরই রাখবো না। বলেই চললেন গঙ্গায় ডুবে মরতে। কিন্তু যে ভাবেই হোক, গঙ্গায় তখন হয়তো ভাঁটা ছিল, গঙ্গায় জল কম ছিল, হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ওপারে পৌঁছে গেছেন, ডোবার মত জল আর পেলেন না। কিন্তু এতে তোতাপুরীর চেতনায় ভাবের একটা পরিবর্তন এসে গেল, শক্তিটাও সত্য। আমরা এই ঘটনা শরৎ মহারাজের লীলাপ্রসঙ্গ থেকে জানতে পারছি। ওখান থেকে তোতাপুরী মা ভবতারিণীর মন্দিরে এসে মায়ের স্তুতি করতে শুরু করলেন। তোতাপুরীর মত উচ্চকোটি মহাপুরুষের স্তুতিতে সারা মন্দির গম্ গম্ করতে লাগল। যাই হোক, স্তুতি করার পর মাকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। এরপর তিনি শক্তিকে মানলেন কি মানলেন সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে ঘোর নিরাকার সাধকরা এই রকমই হন, তাঁরা নিজের শরীরকেও গ্রাহ্য করেন না। যাই হোক, অক্রূর এসে সব কিছু বললেন, কংস আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুজনকে মল্ল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নন্দরাজা ও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম সবাই রাজী হয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবার বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাবেন। ঠিক হল আগামীকাল সকালবেলা শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামকে নিয়ে অক্রূর মথুরার দিকে রওনা হবেন।

গোপীরা খবর পেলেন মথুরা থেকে লোক এসেছে তাঁদের প্রাণারাম আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে যাবার জন্য। খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – *কাশ্চিত্তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ। স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন।।১০/৩৯/১৪।* মথুরা থেকে অক্রূর দুজনকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন শুনেই গোপীদের মানসিক উৎকণ্ঠা আর দুঃখের শেষ নেই। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন্দ ছেড়ে চলে যাবেন এই সংবাদ শুনেই গোপীরা মুর্ছা যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেরই হৃদয়ে এমন জ্বালা সৃষ্টি হয়েছে যে তাঁদের মুখ দিয়ে আগুনের মত প্রচণ্ড গরম নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসতে শুরু হয়েছে। আমাদের প্রাণের ধন, ভালোবাসার আকর শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আমরা কীভাবে থাকব! কোন কোন গোপীর পদ্মের মত নরম মুখ গরম নিঃশ্বাসে শুষ্ক হয়ে গেছে। অনেকের চেতনাই লুপ্ত হয়ে

গেল, মনে হচ্ছে তারা যেন কোন অচেতন পদার্থ। বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়াতে তাঁদের শরীরের অঙ্গ থেকে ওড়না খসে গেছে, কবরী থেকে সাজ আলগা হয়ে গেছে, মাথার ফুল ঝরে পড়ছে, কোন দিকেই আর তাদের কোন হুঁশ নেই। *অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ। নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব।। ১০/৩৯/১৫।* শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন এমন গভীর ভাবে চলে গেছে যে তাঁদের চিত্তে আর কোন কিছুর বৃত্তি নেই, গোপীদের চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে গেছে। ভাগবতে বলছেন 'অশেষ বৃত্তি', অর্থাৎ গোপীদের বৃত্তি শেষ হয়ে গেছে, চিত্তবৃত্তি পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে। তার ফলে গোপীদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে কোন হুঁশ নেই। রাজযোগের শুরু হয়ে এইখান থেকে – *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*। মনে সব সময় নানা রকমের বৃত্তি উঠতে থাকে, চিত্তের সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করাই যোগীর সাধনা। বৃত্তি যখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, সেই অবস্থাকে বলে সমাধি। চিত্তবৃত্তি নিরোধে যে সমাধি লাভ হয় সেই অবস্থাতেই মানুষের ঈশ্বর দর্শন হয়।

মনের সমস্ত বৃত্তিকে নিরোধ করতে করতে ঈশ্বরের ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে যাওয়ার পর সাধকের শরীর, জগৎ কোন দিকেই দৃষ্টি থাকে না। ঠাকুর যখন ধ্যানে ডুবে যেতেন তখন তাঁর মাথায় পাখি এসে চুলের ভেতরে খাবার খুঁজত। ঠাকুর তখন ধ্যানের গভীরে জড়বৎ, ঠাকুরের হাঁটুর উপর দিয়ে সাপ চলে যাচ্ছে, যেন কোন ব্যাপারই না। শরীরে যত নড়াচড়া, অনুভূতি সব স্নায়ুর জন্য হয়ে থাকে। স্নায়ুগুলো চলছে মস্তিষ্কের জন্য, আর মস্তিষ্ককে চালাচ্ছে মন, সব কিছুর মূলে মন। মন যদি স্থির হয়ে যায় স্বাভাবিক ভাবে স্নায়ুগুলো অকেজো হয়ে যাবে। স্নায়ু কাজ না করলে শরীর নড়বে না। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার মস্তিষ্কের সব কর্মক্ষমতা চলে যায়, শরীরটা কাঠের মত পড়ে থাকে। সমাধিতে মন নিরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শরীরের সব কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। গোপীরা ভগবানকে শুধু ভালোবেসেই এই অবস্থা লাভ করেছিলেন। অবশ্য সাধারণ মানুষেরও কখন সখন এই অবস্থা হয়ে যায়। মা নিজের সন্তানকে খুব ভালোবাসে, হঠাৎ খবর এল সন্তান মারা গেছে, ঠাকুর বর্ণনা দিচ্ছেন, তখন সে ঝাঁট দিচ্ছিল, ঝাঁট দেওয়া থেমে গিয়ে 'আঁ!' 'আঁ!' করে কথা বন্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, যদিও একে সমাধির সঙ্গে তুলনা করা হয় না। মনটা ছড়িয়ে ছিল, ছড়ানো মনটা হঠাৎ কুড়িয়ে এককাট্টা হয়ে গেল। এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। আধ্যাত্মিক পুরুষও তাঁর ছড়ান মনকে কুড়িয়ে আনেন। কিন্তু সেখানে তাঁর একটা সচেতন প্রচেষ্টা থাকে। চেষ্টা করে করে তাঁরা ছড়ান মনকে নিজের অধীনে নিয়ে আসেন, এনারাই সমাধিবান পুরুষ হন। এখানে সেই কথাই বলছেন, যোগীদের ঈশ্বর চিন্তন করে করে যা হয়, গোপীদেরও একই জিনিস হয়েছিল।

গোপীদের মন ওই অবস্থা থেকে একটু বেরিয়ে আসার পর তাঁদের যেই চেতনা ফিরে এসেছে সবাই বিলাপ করতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে থাকা যে কি অসহনীয় বেদনা সেই কথা ভেবে প্রথমে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে খুব আকুতি মিনতি করছেন। পরে ভগবানকেই গোপীরা গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছেন *অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্ দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ। তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং বিক্রীড়িতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা।।১০/৩৯/১৯।* বলছেন *'অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্ দয়া'* বিধাতা তুমি সত্যিই ধন্য, তুমি সব কিছুর বিধান কর কিন্তু তোমার হৃদয়ে দয়া বলে কিছু নেই'। এখানে বিধাতা বলছেন ভগবানকে, যিনি সব কিছুর বিধান করছেন, বিধাতা বললে যা হয়, ঈশ্বর বললেও তাই হয়। ঈশ্বর শব্দ আসছে 'ঈশ' ধাতু থেকে, 'ঈশ' মানে যিনি শাসন করেন। আর বিধাতা হলেন যিনি বিধান করেন, যিনি আদেশ করেন কি করবে কি করবে না। ঈশ্বর, বিধাতা, ভগবান সব শব্দের একই অর্থ। গোপীরা তাই বলছেন তুমি সব কিছুর বিধান কর কিন্তু এইতো তোমার অবস্থা, তোমার ভেতরে দয়া বলে কোন পদার্থ নেই। প্রথমে তুমি কি কর? তুমি তোমার ভালোবাসা দিয়ে, সৌহার্দ দিয়ে এক প্রাণীকে অন্য প্রাণীর সঙ্গে জুড়ে দাও। জুড়ে দেওয়ার পরেই তুমি কি কর? তাদেরকে এক করে দাও। শুধু যে তুমি তাদের কাছাকাছি নিয়ে আস তাই না, তাদেরকে এক করে দাও, আর সেখান থেকে তাদের মধ্যে কামনা বাসনার জন্ম হয়, ইচ্ছা, আকাঙ্খার জন্ম হয়ে সেইগুলো যখন পূর্ণ হতে যাবে ঠিক তার আগেই তুমি আবার দুটো প্রাণীকে আলাদা করে দাও। হে ভগবান, তোমাকে কি আর বলব, বাচ্চাদের খেলা যেমন নিরর্থক, তোমার এই সৃষ্টি, তোমার এই খেলা একেবারে ঠিক সেই রকম।

হিন্দী লেখক রাজেন্দ্রকুমারের একটা নতুন ধরণের লেখা আছে, যার নাম 'খেল'। একটা মেয়ে নদীর ধারে খেলা করছে। খেলার ছলে সে বালি দিয়ে একটা বাড়ি তৈরী করেছে। খুব সুন্দর বাড়ী তৈরী করার পর তার খেলার সাথিকে খুব উৎসাহ নিয়ে ডেকে বলছে দেখো কি সুন্দর আমি বাড়িটা বানিয়েছি। ছেলেটি এসে কি বানিয়েছ বলতে বলতে এক লাথি মেরে বাড়িটাকে ভেঙ্গে ফেলেছে। মেয়েটা কিছুই বলল না, শুধু চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। প্রথমে ছেলেটা মজা করে ভেঙ্গে দিয়েছিল, এখন দেখছে তার সঙ্গিনী কোন অভিযোগ, অনুযোগ না করে নীরবে চোখের জল ফেলে যাচ্ছে, কোন কথা বলছে না। ছেলেটি তখন অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে মেয়েটির মানভঞ্জন করতে। কিন্তু মেয়েটি কোন সাড়া দিচ্ছে না, কথাও বলছে না। অনেকক্ষণ পরে ছেলেটি বুঝতে পারল এটা কোন সাধারণ রাগারাগি বা মন খারাপ নয়। তখন ছেলেটি মেয়েটিকে বলছে 'সুরবালা, তুমি মন খারাপ করো না, আমি তোমাকে ঠিক এই রকম আরেকটা বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছি'। মেয়েটি তখনও ছেলেটির কথাতে কোন সাড়া দিচ্ছে না। তারপর ছেলেটি একই জায়গাতে একটা বাড়ি বানিয়ে মেয়েটিকে বলছে 'এই দেখো, আমি কেমন বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি'। এবার মেয়েটি কথা বলতে শুরু করেছে। মেয়েটি বলছে 'কেন, এই জায়গাতে আমার রান্নাঘর ছিল, আর রান্নাঘরের মাথায় ধুয়ো বার করার একটা চিমনি ছিল'। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠি দিয়ে ফুটো করে দিল, আর মেয়েটি যা যা বলছে সেইভাবে সে তাই তাই করতে লাগল। এইভাবে সব শেষ হয়ে যাবার পর ছেলেটি বলছে 'এবার তুমি খুশিতো'? মেয়েটি তখন ধপাৎ করে এক লাথি মেরে বাড়িটা ভেঙ্গে দিল। দুজনে মিলে তখন হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে এক অজানা রাজ্যের দিকে এগিয়ে গেল। শেষে লিখছেন, নদীর ধারে ধারে ছিল বিশাল বিশাল দেবদারুর গাছ, সেই গাছগুলো দার্শনিকের মত এদের দেখছে আর যেন ঘাড় নাড়তে থাকল। এই কাহিনীটা আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। এই জগতকে তিনি কেন সৃষ্টি করেছেন, কেন তিনি দুটো প্রাণীকে কাছে নিয়ে আসছেন আবার দূরে ঠেলে দিচ্ছেন, এসবের উত্তর আমরা কোন দিনই পাব না।

একজন সাধুবাবা হিমালয়ের দিক থেকে নেমে আসছেন, আরেকজন দার্শনিক উপরের দিকে উঠছেন। সাধুবাবা তাকে জিজ্ঞেস করছেন 'কোথায় চলেছেন'? দার্শনিক বলছেন 'এই জীবনের কি অর্থ তার সন্ধানে চলেছি'। তখন সাধুবাবা মজা করে বলছেন 'আরেকটা সম্ভাবনাও তো থাকতে পারে, এই জীবনের কোন অর্থই নেই'। ঠিক এই ভাবটাই গোপীরা দুঃখ করে বলছেন 'হে ঈশ্বর, এই তো তুমি আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এলে, শুধু যে নিয়ে এলে তা না, তার সাথে আমাদের মিলন করিয়ে এক করে দিলে। আর আমাদের মনে নন্দ-তনয় শ্যামসুন্দরকে ঘিরে যে ইচ্ছা, অভিলাষার উদয় হল, সেটা ঠিক ঠিক পূর্ণ হওয়ার আগেই তুমি এই আশাসৌধকে দুমড়ে মুচড়ে ধুলোতে মিশিয়ে দিলে। তোমার এই সৃষ্টি বাচ্চাদের খেলার মত নিরর্থক'।

সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুদের এটি একটি খুব উল্লেখযোগ্য ভাব। হিন্দু ধর্মে বলে সংসার ভগবানের একটা খেলা, জগৎটা তাঁর ক্রীড়া। এখানে সংস্কৃতে *বিক্রীড়িতং* শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটাও সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুদের একটা ব্যাখ্যা। কি রকম খেলা? As meaningless as child's play, বাচ্চাদের খেলার মত যেন একটা মজা, মজা ছাড়া কিছুই নয়। বাচ্চাদের খেলা যেমন নিরর্থক, এই জীবনের অর্থ খুঁজতে যাওয়াও নিরর্থক। তাই দার্শনিকের মত এই জগতের অর্থ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। জগতের, এই সংসারের কি দরকার ছিল? এর কেনই বা সৃষ্টি হল? যত দিন জগৎ থাকবে ততদিন মানুষের মনে এসব প্রশ্ন আসবে। জগৎটা ঈশ্বরের একটা লীলা, অনেক মতের মধ্যে এটাও একটা মত। লীলাখেলা মানে এর কোন অর্থ নেই, শুধু আনন্দ পাওয়া। বাচ্চারা যেমন আনন্দ পাওয়ার জন্য খেলার ছলে ঘর বাড়ি তৈরী করে আবার নিজের খেয়ালে ভেঙ্গে ফেলে, ঈশ্বরও নিজের আনন্দের জন্য এই লীলা করছেন। তাই এই জগতের কোন কিছুর জন্য আমাদের উদ্বেগের মধ্যে থাকার কোন অর্থই হয় না। আমরা কত দিন বাঁচব কেউ জানিনা, কিন্তু এটা ঠিক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর মত আমরা সব সময় মৃত্যুর প্রহর গুনে যাচ্ছি। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী জানে আগামীকাল সূর্য ওঠার আগে তাকে ফাঁসিতে ঝোলান হবে, আমাদের শুধু সময়টা জানা নেই। কিন্তু আমরাও সবাই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত। আজ বিকালে ভগবান যদি এসে আমাকে বলে দেন আগামীকাল সন্ধ্যাবেলাই তোমার শেষ সন্ধ্যা। এখন আমি চব্বিশ ঘন্টা কাটাব কীভাবে? আর যারা আসামী, তাদেরও যখন শুনিয়ে দেওয়া হয়

অমুক দিনে তোমার ভোরবেলা ফাঁসি হবে, সে বাকী সময়টুকু কীভাবে কাটাবে? আজ তার শেষ রাত। আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে আমরা সবাই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর মত, আমাদের জীবনের যদি কোন তত্ত্ব থাকে, দর্শন থাকে, কোন সত্য থাকে তা হল এই দেহটাকে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, এই বিচ্ছেদটাই জগতের শাশ্বত নিয়ম। অন্য কোন কিছুর ব্যতিক্রম হয়তো হলেও হতে পারে, কিন্তু এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। স্বামীজী বলছেন কীভাবে জীবন যাপন করবে, তিনি বলছেন – সকালে উঠেই ভাববে আজকের দিনটাই আমার জীবনের শেষ দিন। সকালে উঠেই যদি জেনে ফেলি আজকের দিনটাই আমার জীবনের শেষ দিন, তাহলে আমি কীভাবে বাকী সময়টা অতিবাহিত করব? আমি বারো ঘন্টা বাজব, না বারো বছর বাঁচব, না কুড়ি বছর বাঁচব এটা কোন কথা না, আসলে এটা একই ব্যাপার, গুণগত দিক দিয়ে এর কোন তফাৎ নেই। এক মহারাজ মজা করে বলতেন – এই জগতটা খিদিরপুরের ডক, এখানে সব ছাগলগুলোকে নামান হয় খিদিরপুরে কষাইদের কাছে পাঠানোর জন্য, আমরা এই খিদিরপুর ডকে নেমেছি এখন জবাই হবেই। কেউ প্রথমে জবাই হবে, কারুর একটু দেরীতে জবাই হবে, কিন্তু প্রত্যেকের হবে। শুধু সময়ের তফাৎ। একবার যদি চিন্তা করে দেখা হয় সারাটা জীবন ধরে আমরা যা করছি এটাকে যদি ঈশ্বরের খেলা বলে ভেবে নেওয়া যেতে পারে তাহলে আর কোন ঝামেলা থাকে না, খেলা মানেই মজা, সময়ের অপচয় আর অর্থহীন। এর মধ্যে কোথাও যদি কোন সত্য থাকে তাহলে ঈশ্বর যদি সত্য হন, আমাদের উচিৎ তাঁর দিকে এগোন। এটাই একমাত্র পথ। ঈশ্বর যদি সত্য হন তাহলে এই জগৎটা অতি তুচ্ছ হয়ে যায়। আর ঈশ্বর যদি সত্য নাও হন তাহলেও এই জগতটা আরও বেশী করে অপ্রয়োজনীয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিরও কোন অর্থ নেই আর মানুষের নিজের সৃষ্টিরও কোন অর্থ নেই। এটাই সমস্ত আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি। এই যে অর্থহীন একটা জগতের পেছনে ছুটে চলেছ সেই ছোটাটা বন্ধ করে সবার আগে এই জগত থেকে বেরিয়ে এসো।

গোপীরা ছিলেন একেবারেই গ্রাম্য সরল মহিলা। তারা আক্ষেপ করে চলেছেন 'কাল যে সকাল হবে, সেই সকাল মথুরার মেয়েদের জন্য কত সৌভাগ্যের সকাল হবে, আলো ফুটলেই তারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখবে। আর কাল থেকেই শুরু হবে আমাদের অমঙ্গলের দিন। যাঁর এই মিষ্টি হাসি, যাঁর এই লুকোচুরির খেলা, যাঁর এই হেঁয়ালি কথা, আর এই যে আমরা তাঁর সঙ্গে রাসলীলায় আনন্দ করলাম, আমাদের এই ভালোবাসা একদিন বা দুদিনের নয়, আমরা এতদিন যে ভালোবেসে কাটালাম, এখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে আমরা কীভাবে আগামী দিনগুলি কাটাব। গোধুলী বেলার আলো আঁধারিতে দেখতাম তিনি গোবৎসদের নিয়ে ফিরছেন, তাঁর সেই কালো কালো ঢেউ খেলানো চুল, তাঁর সেই চোখের চাহনি যেটা আমাদের দিকেই থাকত, যা দেখে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে যেত। এতদিন ধরে আমরা শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসার মধ্যে ডুবে ছিলাম, এখন তিনি চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে, কীভাবে কাটবে আমাদের কৃষ্ণহীন সন্ধ্যা, গোধুলীবেলা, সকালবেলা। তাঁকে ছাড়া আমরা কি করে বাঁচব'। এইভাবে গোপীরা সারা রাত ধরে কাঁদছে। বিধাতাকে গালাগাল দিচ্ছেন, অক্রূরের নাম করে বলছেন, তোমার নাম তো অক্রূর হয়েছে এই কারণে, তুমি আমাদের প্রাণবল্লভকে কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছ তুমি কত ক্রূর হতে পারো এটাই তার প্রমাণ। গোপীদের মনের অবস্থা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ পরে দূত মারফৎ গোপীদের বলে পাঠিয়েছিলেন, আমি আবার আসব। এই খবর শোনার পর গোপীরা একটু সান্ত্বনা পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন দিন আর ব্রজভূমিতে আসেননি। গোপীদের সাথে পরে একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের দেখা হয়েছিল। অনেক বছর পর কোন এক সূর্যগ্রহণের সময় বৃন্দাবন থেকে গোপীরা কুরুক্ষেত্রের তীর্থে স্নান করতে এসেছিলেন, আবার মথুরা থেকে শ্রীকৃষ্ণও এসেছিলেন, সেই সময় দেখা হয়েছিল। তখন অবশ্য গোপীদের অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে।

ভোরবেলা গোপীরা দেখে রথে বসে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের সাথে চলে যাচ্ছেন। গোপীরা সব পাথরের মুর্তির মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাগবতে এই জায়গাটাকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যাঁরা দাঁড়িয়ে আছে তাঁরা প্রস্তর নির্মিত মুর্তির মত নিথর হয়ে আছেন। কেন এমন হল তাঁদের? বলছেন – তাঁদের প্রাণ আর আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রথে করে চলে গেছে, তাই তাঁদের নড়াচড়ার ক্ষমতা আর নেই। যে প্রাণ আমার শরীরকে চালাতো সেই প্রাণতো শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে গেছে এখন আমার শরীরকে কে চালাবে?

এর আগে রাসলীলায় দেখান হয়েছিল ভক্তিমার্গে মধুরভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক হয়। এখানে আসছে ঈশ্বরের বিরহভাব। বিরহভাব সাধারণত সাহিত্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা শাস্ত্রেও এই বিরহভাবের খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে যদিও হিন্দু ভক্তিশাস্ত্রে এর বেশী উল্লেখ নেই। কিন্তু খ্রীশ্চান ভাবাধারায় এই বিরহভাবের একটা খুব ভালো স্থান আছে, সেখানে বলা হয় Dark night of the soul, ভগবান সাধককে এক ঝলক দেখা দিয়ে দেন, কিন্তু তারপরেই তিনি সাধকের অদর্শনে চলে যান। সাধক তখন পাগলের মত হয়ে যায়। এমন মানসিক অবস্থা হয়ে যায় যে, কখন কখন সে মনে করে আত্মহত্যাই করে ফেলবে। অন্ধকারে যেমন কিছু বোঝা যায় না, এই অবস্থাতে ঠিক তাই হয়, কিছুই বোঝা যায় না সে কি করবে। এই পর্বটা পেরিয়ে গেলেই আসে অপরোক্ষানুভূতি। মহম্মদের জীবনেও ঠিক তাই আছে। মহম্মদের যে এক একটা অনুভূতি আসত ঠিক তার আগে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেত, মনে হত যেন ব্যাথার যন্ত্রণায় তিনি মরেই যাবেন। গোপীদের যে বিরহভাব এখানেও একই জিনিস যেটা খ্রীশ্চানদের Dark night of the soul এ হয়।

অক্রূরের দিব্যদর্শন ও অক্রূর কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি

ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে অক্রূরের রথ যমুনার তীরে এসে পৌঁছেছে। সেখানে তিনজনই যমুনার জলে হাতমুখ ধুয়ে যমুনার পবিত্র জলপান করলেন। অক্রূর দুই ভাইকে রথে বসিয়ে তাঁদের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য সময় প্রার্থনা করে কালিন্দীর জলে বন্দনাদি ও স্নান করতে গেলেন। অক্রূর যখন জলে ডুব দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন তখন তিনি জলের ভেতরে শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামকে দেখতে পেলেন। জলের মধ্যে দুই ভাইকে দেখে অক্রূর ভাবছেন আমি তো এঁদের রথে বসিয়ে এসেছি কিন্তু এখানে কি করে তাঁরা এলেন, নিশ্চয়ই রথে নেই। জল থেকে মাথা তুলে রথের দিকে তাকিয়ে দেখছেন তাঁরা দুজন আগের মতই রথে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। তাহলে আমি কি জলের ভেতরে যা দেখছিলাম সেটা কি আমার চোখের ভুল – অক্রূর আবার ডুব দিলেন। ডুব দিয়েই জলের মধ্যে অক্রূরের এক দিব্য দর্শন হল, তিনি দেখছেন বলরাম অনন্ত নাগ হয়ে বসে আছেন আর তাঁর উপর শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করে আছেন আর যত দেবতা, অসুর, প্রজাপতি সবাই ভগবানের স্তব স্তুতি করছেন। বার বার এই দৃশ্য দেখার পর ভক্তিপথের পথিক অক্রূরের হৃদয় পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আনন্দে অক্রূরের চোখে জল এসে গেছে। তখন তাঁর এক চরম অনুভূতি হল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন। তার সাথে দেখছেন সেই বৈকুণ্ঠধাম, শ্রীকৃষ্ণ সেই ধামে বিরাজ করে আছেন আর ঋষিরা চারিদিক ঘিরে ভগবানের বন্দনা করছেন।

দেখেছেন সেখানে ঈশ্বরের কয়েকটি শক্তি মুর্তিমতী হয়ে ভগবানের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাগবতে ঈশ্বরের এই কটি শক্তির নাম বলছেন। ভগবানকে সব সময় ছজন নারী ঘিরে থাকেন – লক্ষ্মী, পুষ্টি, সরস্বতী, কান্তি, কীর্তি ও তুষ্টি। এই ছজন নারীকেই আবার ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য রূপে বলা হয় – ঐশ্বর্য, বল, জ্ঞান, শ্রী, যশ ও বৈরাগ্য। ভগবানের সঙ্গে এই ছয়টি ঐশ্বর্য সব সময় থাকবে। এই ছয়টি ঐশ্বর্যকে এখানে আবার মুর্ত রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর সাথে আবার ইলা (পৃথ্বী শক্তি), ঊর্জা (লীলা-শক্তি), বিদ্যা ও অবিদ্যা (জীবের মোক্ষ ও বন্ধনের কারণস্বরূপ বহিরঙ্গাশক্তি), হ্লাদিনী, সংবিৎ (অন্তরঙ্গা শক্তি) এবং মায়া শক্তি মূর্তিমতী হয়ে ভগবানের সেবা করছেন। মূর্তরূপের ধারণা প্রথম নিয়ে আসা হয়েছে বাল্মীকি রামায়নে। বিশ্বামিত্র যখন শ্রীরামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র দিচ্ছিলেন সেই সময় দিব্যাস্ত্র গুলো সব দেহধারণ করে মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে হাতজোড় করে শ্রীরামচন্দ্রের সামনে দণ্ডয়মান ছিল। এগুলো কতটা কবির কল্পনা আর কতটা সত্য আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু বেদে কোথাও এভাবে কিছু বর্ণনা করা হয়নি। পরের দিকে সব কিছুকে মূর্তরূপ করে দেওয়া হয়েছে। আলবিরুনি বলছেন – যে কোন জিনিসকে নিয়ে আসুন হিন্দুরা প্রথমেই তাকে একটা শরীর দিয়ে দেবে, তারপর তার একটা বিয়ে দিয়ে দেবে, শেষে একটা সন্তানও দিয়ে দেবে। যেমন ঊষাকাল হল সূর্যোদয়ের প্রাকমুহূর্ত, সেই ঊষাকালকে একটা নারীর শরীর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার বিয়ে দেওয়া হল, তারপর সন্তানও হয়ে গেল। চন্দ্রমাকেও একটা শরীর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য এক পরমাসুন্দরী রমণী নিয়ে আসা হয়েছে বিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের এক পুত্রও হল, যার নাম বুধ।

এরপর অক্রূর ভগবানের স্তুতি করছেন। ভাগবতের এই অংশটিও খুব মূল্যবান। অক্রূর খুব সুন্দর স্তুতি করে বলছেন – *নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে হ্যজাদয়োহনাত্মতয়া গৃহীতাঃ। অজোঽনুবদ্ধঃ স গুণৈরজায়া গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্।।১০/৪০/৩।।* প্রকৃতি আর প্রকৃতি থেকে যা কিছু জন্ম নেয় সবই '*ইদংবৃত্তি*'। সংস্কৃতে *ইদংবৃত্তি* মানে এটা আছে। ভাগবত শুরু হয়েছিল *জন্মাদ্যস্য অতঃ* এই শ্লোক দিয়ে, ব্রহ্মসূত্রও শুরু হয় এই মন্ত্র দিয়ে। আচার্য এর উপর ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে শুরুতেই বলছেন জগতে যা কিছু আছে সবই *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়ঃ*। আমি প্রত্যয় আর তুমি প্রত্যয় দিয়ে জীবের বোধ শুরু হয়। সাধারণ মানুষ দেখে আমি আছি আর এই জগৎ আছে আর তিনি আছেন। এখানে বলতে চাইছেন, প্রকৃতি থেকে যা কিছু জন্ম নিয়েছে তার সব কিছুকে মেপে নেওয়া যায়। গীতাতে ভগবান এই মেপে নেওয়াকেই বলছেন *মাত্রাস্পর্শাস্তু*, মাত্রা মানে মেপে নেওয়ার অর্থে বলছেন। প্রকৃতিতে যাবতীয় যা কিছু আছে তার সব কিছুকে মেপে নেওয়া যায়। কি দিয়ে মেপে নেওয়া যায়? ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দিয়ে মেপে নেওয়া যায়। এই মেপে নেওয়ার ব্যাপারটাকেই সংস্কৃতের পরিভাষায় বলছেন '*ইদংবৃত্তি*'। *ইদংবৃত্তি* হওয়ার ফলে প্রকৃতির সব কিছুই সীমিত। এই সীমিত বস্তুর পক্ষে কখনই আমার স্বরূপকে জানা সম্ভব নয়। আমরা কত কঠিন ভাষায় এই সব কথা বলছি, কারণ ভাগবত হল বিদ্বজ্জনের শাস্ত্র। এই ব্যাপারটাকেই ঠাকুর অতি সহজ ভাবে বলছেন – এক সের ঘটিতে পাঁচ সের দুধ ধরে না। প্রকৃতির সব কিছুই মাপা যায় বলে সীমিত, যেটাই সীমিত সেটাই ছোট আর ছোট দিয়ে কখনই বড়কে মাপা যায় না। এটাকেই ঠাকুর আবার অন্য ভাবেও বলছেন – বেগুনওয়ালার কাছে যদি হীরে বিক্রী করতে নিয়ে যায় সেও হীরেকে মাপবে, মেপে বলবে এর বদলে আমি তোমাকে খুব বেশী নয় সের বেগুন দিতে পারি। বেগুনওয়ালার মনের মধ্যে যে মাপ নির্ধারিত হয়ে আছে, তার বাইরে সে কখনই যেতে পারবে না। সেটাই এখানে বলছেন, জগতে যা কিছু আছে তার সব কিছুকে 'ইদংবৃত্তি' দিয়ে মেপে নেওয়া যায়, সেইজন্য প্রকৃতির এই জিনিসগুলো কোন দিন আমার আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে না। প্রকৃতির কোন কিছু দিয়েই ভগবানকে জানা যাবে না।

হিন্দুধর্মে বলা হয় সব ধর্ম আর সব পথ একই কথা বলছ, সেই একই ঈশ্বর কার কার ভেতরে কি কি রূপে থাকেন হিন্দু ধর্মের এই কথাকে অক্রূর স্তবের মাধ্যমে তিন চারটে শ্লোক বলছেন *ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্। সাধ্যাত্মং সাধিভূতং চ সাধিদৈবং চ সাধবঃ।।১০/৪০/৪।* যাঁরা সাধু, যোগী, যোগী মানে যে কোন যোগী, জ্ঞানযোগীই হন আর কর্মযোগীই হন, তাঁরা নিজের হৃদয়ে আত্মা রূপে আপনাকে দেখেন, অর্থাৎ যোগীরা আপনাকে দেখেন অন্তর্যামী রূপে, এনারা নিজের অন্তঃকরণেরই ঈশ্বরকে আত্মা রূপে দেখেন। আর বহির্জগতে যা কিছু ভৌত আর ভৌতিক পদার্থ আছে, ঈশ্বরকে এদের সকলের পরমাত্মা রূপে দেখেন। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, দেবমণ্ডলে ইষ্টদেবতা রূপে দেখেন, এই ইষ্টদেবতাকে বলা হয় আধিদৈবম। সব কিছুর জন্য একজন দেবতা আছেন, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা আছেন, তিনি সব দেবতাদের নিয়ন্তা, যোগীরা ঈশ্বরকে ইষ্টদেবতা রূপে সাধনা করেন। এখানে যোগীরা ঈশ্বরকে কীভাবে দেখেন বলা হল। ইষ্টদেবতাও একটা তত্ত্ব, যেমন চোখের ইষ্টদেবতা আদিত্য – মানে চোখের যিনি দেবতা আছেন আর সূর্যের যিনি দেবতা তিনি এক। তাই যোগীরা দেবমণ্ডলে ঈশ্বরকে ইষ্টরূপে দেখেন। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন – *সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ*। অধিভূত, অধিযজ্ঞ আর অধিদৈব এই তিনটে রূপে তাঁরই আরাধনা করা হয়। এই তিনটে রূপ ছাড়া কোন কোন যোগী ঈশ্বরকে সাক্ষী চৈতন্য রূপে সাধনা করেন, আবার কোন কোন যোগী 'নিয়ন্তা ঈশ্বর' রূপে আরাধনা করেন।

অক্রূর স্তুতি করে বলছেন, যাঁরা কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ পূর্বমীমাংসকরা যজ্ঞ দিয়ে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি আদি রূপে আপনার উপাসনা করেন। এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার হওয়া দরকার, কর্মকাণ্ডীরা ঈশ্বর মানেন না। হিন্দু মানেই যে ভগবানকে বিশ্বাস করতে হবে তা নয়। শংকরাচার্য আসার আগে ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী মতবাদ ছিল এই কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ডীরা ঈশ্বর মানেন না, শুধু মাত্র কর্মকেই তাঁরা মানেন, কর্ম মানে, তুমি যজ্ঞ যাগ কর ফল পাবে। মহাভারতে আছে, যখন সর্পযজ্ঞ হচ্ছিল সেখানে বলছে যজ্ঞ কর, এই যজ্ঞ

দিয়ে ইন্দ্রকেও আমরা বেঁধে স্বর্গ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসব। অথচ ইন্দ্র কর্মকাণ্ডীদের সবচেয়ে বড় দেবতা। কিন্তু অক্রুর এখানে এই যজ্ঞ যাগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যোগসূত্র করছেন। কীভাবে? বলছেন কর্মকাণ্ডীরা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি দেবতাদের জন্য যে যজ্ঞ যাগ করছেন আসলে তা আপনার উদ্দেশ্যেই করা হয়।

একে ত্বাখিলকর্মাণি সন্ন্যস্যোপশমং গতাঃ। জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্।।১০/৪০/৬। জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসী সব কিছু ত্যাগ করে শান্তভাব আশ্রয় করেন, তিনিও আপনাকে পাওয়ার জন্য কর্মসন্ন্যাস করে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আপনারই আরাধনা করছেন। এখানে খুব মজার ব্যাপার, একদিকে বলছেন কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণরা কর্মের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণরই উপাসনা করছেন, অন্য দিকে যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা কর্মসন্ন্যাস করে দেয় আপনাকেই পাওয়ার জন। কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগ দুটোই বিপরীত। কর্মযোগে মানুষ কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে চাইছে আর জ্ঞানযোগে কর্মের সন্ন্যাসের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে চাইছে, এবং দুজনেই ভগবানকে পান। হিন্দু দর্শনের এটাই এক আশ্চর্যজনক তত্ত্ব। ঈশ্বরকে কেউ কর্মের মাধ্যমে উপাসনা করছেন আবার কেউ কর্মসন্ন্যাসের মাধ্যমে উপাসনা করছেন, একেবারে বিপরীত পথে দুজনই ঈশ্বরকে লাভ করছেন। এটা কি করে সম্ভব? হিন্দু ধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ধর্ম মানুষকে কর্মের পথ দিয়েও নিয়ে যায় আবার কর্মত্যাগের পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে এই দুই বিপরীত পথের কথা বলবে না, এমনকি করতেও দেবে না। কোন মুসলমান বলতে পারবে না আমি কোরানকে অতিক্রম করে গেছি, কোন খ্রীশ্চান বলতে পারবে না আমি বাইবেলকে অতিক্রম করে গেছি। বললে তারা খুব বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম বলে উচ্চতম বিদ্যা পেতে হলে তোমাকে বেদের বাইরে যেতে হবে। অথচ বেদ হল ধর্মের শেষ কথা। কোন হিন্দু যদি বলে আমি বেদকে অতিক্রম করে গেছি তখন হিন্দুরা তাঁর নামে মন্দির বানিয়ে তাঁর পূজা করতে শুরু করে দেবে, এ জিনিস অন্য কোন ধর্মে কল্পনাই করা যায় না। এখানে বলছেন, কর্ম করে যে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে, কর্ম ত্যাগ করে সেই ঈশ্বরকেই পাওয়া যাবে, দুটোই বিপরীত পথ। আধ্যাত্মিকতার মূল উদ্দেশ্য হল 'আমি' আর 'আমার' এই ভাবকে মুছে দেওয়া। কর্মযোগীরা যখন কর্ম করছেন তখন তিনি বলছেন আমার যা কিছু আছে, কর্মের যা কিছু ফল সব ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে দিলাম। এখানে তখন 'আমি' ও 'আমার' এই ভাবকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। জ্ঞানমার্গের সাধক বলছেন আমার কিছুই নেই, আমার আমিটাও নেই। কর্মযোগীরও তাই শেষে আমি বলে কিছু থাকে না, ভক্তেরও আমি বলে শেষে কিছু থাকে না, তিনিই আছেন। যিনি যোগী তিনিও সমাধি অবস্থায় গিয়ে নিজের আমিটাকে মুছে ফেলছেন। যিনি জ্ঞানী তিনি আমি বলতে যা কিছু বোঝায় সেটাকে ত্যাগ করে দিচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগ আলাদা, একজন বলছে কর্ম কর, আরেকজন বলছে কর্ম ত্যাগ কর, কিন্তু শেষে দুজন একই কথা বলছেন, আমিটাকে ত্যাগ করা। দেখে মনে হবে সবাই ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছে, কিন্তু মূলে গিয়ে দেখে সবাই একই কথা বলছে। মূল হল অহং ভাবের সম্পূর্ণ নাশ করা, তোমার আমি ভাবকে মুছে ফেল।

আবার শুদ্ধচিত্ত বৈষ্ণবরা নারায়ণ রূপে আর যারা চতুর্ব্যূহ, চতুর্ব্যূহ মানে বৈষ্ণবদের একটা মতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ এই চারটিই শ্রীকৃষ্ণেরই চারটি রূপ তাই বৈষ্ণবদের অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে এই চারটে রূপেই পূজা করে, সেইজন্য এই মতাবলম্বীদের বলা হয় চতুর্ব্যূহ। বৈষ্ণবরা যখন এই চারটি রূপে পূজা করে তখন তারা আপনারই পূজা করছে, আবার যখন নারায়ণের পূজা করছে তখন আপনারই পূজা করছে। শিবের ভক্তরা যখন শিবের পূজা করে তখন আপনারই পূজা করে। আর চার্বাকরা যারা কোন কিছুকেই মানে না, সেটাও আপনি। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, যোগীর দৃষ্টিতেই দেখি, সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতেই দেখি, ভক্তের দৃষ্টিতেই দেখি, শৈবদের দৃষ্টিতে দেখি, কর্মকাণ্ডীদের দৃষ্টিতে দেখি, সবারই ইষ্ট আপনি। এদের যে সবার ইষ্টের কথা বলা হয়েছে যোগীরা ইষ্টকে কীভাবে দেখে, সন্ন্যাসীরা, কর্মকাণ্ডীরা ইষ্টকে কীভাবে দেখেন অক্রূর তারই বর্ণনা করে ভগবানের স্তুতি করছেন।

অক্রুর বিরাট স্তুতি করে শেষে বলছেন *নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্বপ্রত্যয়হেতবে। পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।।১০/৪০/২৯।* হে প্রভু! আপনি হলেন বিজ্ঞানস্বরূপ বিজ্ঞানঘন। আপনি সচ্চিদানন্দ।

আপনিই সেই চিৎ, এই চিৎ এর যে স্বরূপ তার নানান আকৃতি হয়, তারই ঘনিভূত রূপ আপনি, তাই আপনাকে বলে বিজ্ঞানঘন। যা কিছু প্রতীতি হয় আপনি তার কারণ আর তার অধিষ্ঠান। যেমন এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুর কারণ সূর্য আর এর সব কিছুর অধিষ্ঠান সূর্য। পৃথিবী সূর্য থেকেই এসেছে। আর পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে, মানুষ, পশু, পাখি যা কিছু আছে সব ফটো সিনথেসিসের জন্যই হয়। ফটো সিনথেসিস হয় বলে সব কিছু চলছে আর আমরাও সূর্য থেকে শক্তি পাই। সেইজন্য সূর্যই আমাদের অধিষ্ঠান আর সূর্যই আমাদের কারণ। এখানে শুধু কার্য আর কারণটাই নয়, বলছেন যেটার ওপরে কারণটা সাধিত হয় সেটাও আপনি।

এইভাবে বলার পর বলছেন আপনি অনন্ত, আপনার শক্তি অনন্ত, আপনি সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনি বাসুদেব, আপনি সমস্ত জীবের আশ্রয়। সমস্ত জীবের আশ্রয় বলে শ্রীকৃষ্ণের আরেকটা নাম সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের দুটো অর্থ, একটা অর্থ বলরাম, কারণ তার জন্ম হয়েছিল অন্য ভাবে। তাকে দেবকীর গর্ভ থেকে টেনে যশোদার গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সঙ্কর্ষণের আরেকটা অর্থ তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয়। অক্রুর বলছেন – আপনি বুদ্ধি আর মনের অধিষ্ঠাতা, সেইজন্য আপনি হলেন হৃষিকেশ, মানে প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ। প্রদ্যুম্ন বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আর অনিরুদ্ধ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এগুলো সবই বৈষ্ণব ভাবের অভিপ্রকাশ। বৈষ্ণবরা যখন অবতারকে দেখেন তখন কীভাবে দেখেন সেটাই বলছেন।

যাই হোক যমুনার জলে ডুব দিয়ে ভগবানের ওই দিব্যদর্শন লাভের পর স্তুতি করে জল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে খুব মজা করে বলছেন ‘কাকা! আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আশ্চর্য কিছু দেখেছেন, কারণ আশ্চর্য কোন কিছু না দেখলে আপনার চোখ মুখ এ রকম হতো না। বলুন মাটিতে, আকাশে বা জলে কি কোন অদ্ভুত কিছু দেখেছেন’? উপনিষদেও ঠিক এই দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায় – শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে। ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর শিষ্যকে দেখে গুরু বলছেন ‘তোমার চোখ মুখ তো ব্রহ্মজ্ঞানীর মত দীপ্যমান হয়ে গেছে’। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যান, যাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে তাঁদের চোখে মুখে একটা আনন্দের ছাপ পড়ে যায়। অক্রূরেরও তাই হয়েছে, তিনি যমুনার জলে ডুব দিতেই জলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান নারায়ণ রূপে বৈকুণ্ঠে দর্শন করেছেন।

এবার অক্রূরও মজা করে শ্রীকৃষ্ণে পাল্টা উত্তর দিচ্ছেন *অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে। ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেহদৃষ্টং বিপশ্যতঃ।।১০/৪১/৪।* হে প্রভু! পৃথিবীতে, আকাশে ও জলে এবং এই তিনটি লোকে যাবতীয় যা কিছু আছে তা তো আপনার মধ্যেই বিদ্যমান, আপনিই বিশ্বরূপ আর আপনি আমার চোখের সামনে রথে বসে আছেন, এবার বলুন আমি এরপর কি আর অদ্ভুত বস্তু বা দৃশ্য দেখতে পারি? অক্রূর এখানে খুব হেঁয়ালি ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের কথার জবাব দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে তিনি অক্রূরকে তাঁর নিজের স্বরূপের দিব্য দর্শন দিয়েছেন, কিন্তু মজা করে বলছেন আপনার চেহারাটা অন্য রকম দেখাচ্ছে, আপনি কি অবাক হওয়ার মত কোন অদ্ভুত কিছু দেখেছেন? অক্রুরও সরাসরি উত্তর না দিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অবাক হওয়ার মত বস্তু বা দৃশ্য হতে পারে সেতো আপনার মধ্যেই বিদ্যমান আর আমি তো আপনাকে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি, এরপর আর কি অবাক জিনিস দেখার বাকী থাকতে পারে। তার মানে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে প্রকারান্তরে বলে দিলেন, আপনার যে বাস্তবিক স্বরূপ, আমি সেটাই দেখেছি। এখানে আমরা দুটো কৃষ্ণ পাই, একজন শ্রীকৃষ্ণ যিনি রথের উপর বসে আছেন, যাঁকে ব্রজভূমি থেকে মথুরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ হলেন যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছেন। দুজনে দুজনের কথার ছলে ভাগবত এখানে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, যিনি ভগবান নারায়ণ তিনিই আপনি, আপনিই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যপ্ত। যোগী, কর্মী, জ্ঞানী, বৈষ্ণব সবাই আপনাকেই আরাধনা করেন।

কংস বধ

অক্রূরের রথ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সহ মথুরার দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর সবাই মথুরাতে পৌঁছালে অক্রূর কংসকে বললেন ‘আপনি আমাকে যে দায়ীত্ব দিয়েছিলেন আমি তা সম্পন্ন করেছি’। এরপর

অনেক কিছু ঘটনার বর্ণনা করা হচ্ছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম বিকেলে মথুরা নগরী ঘুরে ঘুরে দেখছেন। এক জায়গায় কংসের ধোপা কংসের পোষাক পরিষ্কার করে রঙ করছিল। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে রাজার রজোককে বললেন এই ধরণের পোষাকই তো আমাদের মত শরীরের জন্য উপযুক্ত। রজোকের কাছে পোষাক চাইতেই রজোক খুব কুৎসিৎ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামকে গালাগাল দেওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হয়ে রজোককে একটা চপেটাঘাত করতেই তার মুণ্ডুটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। মথুরার পথে এক সুন্দরী রমণীর সাথে দেখা হল, সুন্দরী কিন্তু তার দেহটি কুব্জ। মেয়েটি ছিল সৈরিন্ধ্রী, যাদের কাজ মেয়েদের অঙ্গরাগ, অঙ্গলেপন ইত্যাদি করা। কুব্জা ছিল আবার কংসের দাসী। শ্রীকৃষ্ণকে দেখার পরেই কুব্জার মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির অনুভূতি জেগে উঠল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের চরণ দিয়ে কুব্জার পায়ের অগ্রভাগকে চেপে হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কুব্জার চিবুক ধারণ করে তার শরীরটাকে উপরের দিকে টেনে তুলে দিতেই তৎক্ষণাৎ কুব্জার শরীরটা বেঁকা থেকে সোজা হয়ে গেল। ভক্তদের সামনে কৃষ্ণলীলা পরিবেশন করার জন্য এগুলোর খুব দরকার হয়। এর আগেও আমরা দেখেছিলাম শ্রীকৃষ্ণ দুই রূপে থাকেন। একজন শ্রীকৃষ্ণ হলেন ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ, অন্যজন হলেন ভাব সাম্রাজ্যের শ্রীকৃষ্ণ। ভাবরাজ্যের শ্রীকৃষ্ণের সাথে ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের মিল হওয়ার কথা নয়। যদি মিল হয় তাহলে কিন্তু আর এই জিনিসগুলো চলবে না। বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে ঐতিহাসিক চরিত্র রূপেই দেখিয়েছেন। সেখানে তিনি কাব্যিক শৈলী দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে একজন আদর্শ পুরুষ রূপে দাঁড় করিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শ পুরুষ রূপে দাঁড় করাতে গিয়ে বাল্মীকি তাঁর কাব্যে ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটে জিনিষের শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু পরে যখন বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে অন্যান্য রামায়ণ লেখা হয়েছে সেখানে গ্রন্থ প্রণেতারা প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শ পুরুষ রূপে নিচ্ছেন না, দ্বিতীয় কাব্যের সাহায্য নিচ্ছেন না, তৃতীয় ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটের মধ্যে মোক্ষকেও ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এখনও শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে কত রকম কাহিনী যে লেখা হয়ে চলেছে কল্পনাই করা যায় না। এত রকম রামায়ণ লেখা হওয়াতে এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে শ্রীরামচন্দ্র কোন সাধারণ পুরুষ ছিলেন না। সাধারণ পুরুষ হলে তাঁকে নিয়ে একটা কাহিনী লেখা হবে, খুব জোড় হয়তো দুটো কাহিনী লেখা হবে, কিন্তু তারপর আর কোন কাহিনীই চলবে না। শ্রীরামচন্দ্র যদি আদর্শ পুরুষ না হতেন তাহলে এত রকমের রচনা কখনই হতো না। কোন কবি একটা আদর্শ চরিত্রকে সামনে যখন দেখেন তখন কবি তাঁর চারিদিকে একটা ভাবরাজ্য তৈরী করে নেন। ঐ ভাবরাজ্যের চালচিত্রে তিনি সেই আদর্শ পুরুষকে চিত্রিত করেন। আমাদের মনে হতে পারে সেই ভাবরাজ্যে আজগুবি সব গল্প রয়েছে, কিন্তু আদপেই তা নয়। ওই ভাবরাজ্যে কবির নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র যুক্তি ও বৌদ্ধিক দৃষ্টি আছে।

স্বামীজী বলছে Information comes from outside all knowledge are within you। যা কিছু জ্ঞান সব আমাদের ভেতরেই আছে, জ্ঞান কখনই বাইরে থেকে আসে না। আমার মধ্যে একটা জ্ঞান আছে, যে জ্ঞানে আমি জানছি আপনি যদি এই কাজ করেন তাহলে আপনার ক্ষতি হবে। এখন আপনাকে আমি কীভাবে বলবো, আমাকে তখন বাংলায় বলতে হবে 'ওটি করবেন না'। ইংরাজীতেও বলতে পারি কিংবা কোন অঙ্গভঙ্গি দিয়ে ইশারা করে বোঝাতে পারি। এগুলো সবই একটা ভাবকে প্রকাশ করার মাধ্যম। সবটাই ভাষা, বাংলা ভাষা, ইংরাজীও একটি ভাষা, ঠিক তেমনি চোখের চাহনিটাও একটি ভাষা। ঠিক তেমনি যখন সিনেমা তৈরী হচ্ছে সেটাও একটা ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যম, চিত্রকলা ভাস্কর্যও সেই রকম একটি ভাষা। এমন কি জ্যোতিষ বিদ্যাও একটা ভাষা, একটা পরিস্থিতিকে ভাষার মাধ্যমে বলছে। এটা বলবে না যে আপনার বিপদ হয়ে গেছে, বলবে আপনার এই গ্রহে রাহু ঢুকে পড়েছে। তেমনি রাসলীলাও একটা ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যম। কি ভাব? পরা ভক্তি, ভক্তি যখন শেষ পর্যায়ে চলে আসে তখন তার প্রস্তুতিতে কি কি লাগে, কীভাবে মানুষ সেই অবস্থায় পৌঁছায়, আর সেই অবস্থায় পৌঁছে তার কি হয়, এই জিনিসগুলোকে বোঝাবার জন্যই রাসলীলাকে মাধ্যম করা হয়েছে। ঠিক তেমনি এই ধরণের কাহিনীগুলোও একটা বিশেষ ভাবকে ব্যক্ত করতে একটা বিশেষ ভাষা। কি সেই ভাব? শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তিনি অবতার হয়ে শরীর ধারণ করেছেন। এত দিন গোকুলে একটা ছোট্ট নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তিনি অবতারের কাজ করার জন্য গোকুলের ছোট্ট গণ্ডীর বাঁধন ছিঁড়ে বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এবার বহির্দুনিয়ার

অনেকের সাথে তাঁর যোগাযোগ হচ্ছে, তার মধ্যে কেউ তাঁকে পছন্দ করছেন, কেউ তাঁর উপর নিন্দাবাদ ছুড়ে দিচ্ছেন। তিনিও এখন কারুকে কৃপা করছেন, কারুর উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছেন – এই ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য এই ধরণের লীলাকাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামকে মথুরায় নিয়ে আসার পেছনে কংসের একটিই উদ্দেশ্য, এদের দুজনকেই বধ করে দেওয়া। তার জন্য কংস আগে থাকতেই পর পর কতকগুলো ব্যবস্থা করে রেখেছিল যাতে এর যে কোন একটা ব্যবস্থাতে আগেই বধ করে দেওয়া যায়। তারমধ্যে একটা ছিল কুবলয়াপীড় উদ্ধার। প্রধান ফটকের সামনে একটা হাতিকে মত্ত করে রাখা ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ যখন মল্ল প্রতিযোগিতায় আসবেন তার আগেই হাতিটাকে তাঁতিয়ে দিয়ে দুজনকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলা হবে। শ্রীকৃষ্ণ হাতির লেজ ধরে পর্যায়ক্রমে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আছাড় দিয়ে মেরে ফেললেন। এগুলো আর কিছুই না, ভাবরাজ্য আর কবিতার সম্মিলনের একটা ছবি। কংস কৃষ্ণ ও বলরামকে কুস্তি প্রতিযোগিতা অংশ গ্রহণের জন আমন্ত্রণ জানিয়ে মথুরায় নিয়ে এসেছেন। আসলে কোন কুস্তি-টুস্তি নেই। কংস আগেই ব্যবস্থা করে তার বড় বড় পালোয়ানদের বলে রেখেছিলেন কুস্তি লড়ার নাম করে তোমরা দুজনকে বধ করে দেবে। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দুজনে কুস্তি লড়ার জন্য ঢুকে প্রথমেই সব পালোয়ান গুলোকে মেরে শেষ করে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধ করার জন্য কংস যত রকম ব্যবস্থা করেছিল সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। এরপর কংস যেখানে সিংহাসনে বসে ছিল, এক লাফ দিয়ে সেখানে উঠে শ্রীকৃষ্ণ কংসকেও বধ করে দিয়েছেন। যদিও কংস অস্ত্র বার করে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কিছুই করতে পারলো না। কংস বধ হয়ে যাওয়ার কংসের যত রানীরা ছিল তারা দৌড়ে এসে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। সাহিত্যে যাকেই খল চরিত্র তৈরী করা হয় তার মধ্যে রীতিমত কালো রঙ দিতে হয়, কালো রঙ না দিলে মানুষের যদি খল নায়কের প্রতি অনুকম্পা হতে শুরু হয় তাহলে অনেক গোলমাল হয়ে যাবে। সাহিত্যিকরা যদিও খল নায়কের মধ্যে কিছু কিছু গুণ ঢেলে দেবেন কিন্তু তার ব্যক্তিত্বে রীতিমত কালো রঙটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যতই কালো রঙ লাগাক তাদেরকেও কেউ না কেউ খুব ভালোবাসবে, যেমন রাবণের রানীরা রাবণকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো, ঠিক তেমনি কংসের রানীরা কংসকে খুব ভালোবাসতো।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তিনি নিজে গিয়ে রাজবধূদের সান্ত্বনা দিতেই তাঁরা সবাই শান্ত হয়ে গেলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুজনে মিলে চলেছেন মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে কারাবন্ধন থেকে মুক্ত করতে – *মাতরং পিতরং চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ। কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাঽস্পৃশ্য পাদয়োঃ।।১০/৪৪/৫০।* এই মুহুর্তে এটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাঁর পিতা-মাতা আজ কারারুদ্ধ। দুজনকে বন্ধন মুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মস্তক পিতা-মাতার চরণে স্থাপন করে প্রণাম করলেন। এরপর ভাগবতে একটা খুব সুন্দর শ্লোক আছে – *দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ। কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ।।১০/৪৪/৫১।* দেবকী ও বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম করেছেন, ওনারাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতে দিয়েছেন, কিন্তু দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন না। এই প্রথম বাবা-মা তাঁদের সন্তানকে দেখছেন, সন্তান তাঁদের প্রণাম করলেন কিন্তু আনন্দে ও আবেগে শ্রীকৃষ্ণকে কেউই বুকে জড়িয়ে ধরলেন না। তাঁরা ভাবছেন আমাদের সন্তান হতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তিনি জগদীশ্বর, তাঁকে কি করে আমাদের সন্তান মনে করে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি, একটা অজানা শঙ্কায় তখন দুজনেই অঞ্জলীবদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আগেকার দিনের প্রথা ছিল, সন্তান প্রণাম করলে বাবা-মা দুজনেই সন্তানকে বুকে জড়িয়ে নিতেন। কিন্তু দেবকী আর বসুদেব দুজনেই প্রথম দিন থেকে জানতেন ইনি হলেন ভগবান, জগদীশ্বর তাই কি করে পুত্র মনে করে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নেব! সেইজন্য তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতে দিলেন অথচ বুকে জড়ালেন না। দ্বিতীয় কথা, যখন কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন তখন দেবকী আর বসুদেবকে তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে দর্শন দিয়েছিলেন, যাতে ওনারা সন্তানের মায়াতে শ্রীকৃষ্ণের আসল স্বরূপকে ভুলে না যান, তাঁদের সেই দৃশ্যটা মনে ছিল বলে বুকে জড়ালেন না।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গুরুগৃহবাস

এরপর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ব্যবহারিক জীবনের সংস্কার কর্মাদি শুরু করা হয়েছে। প্রথমে দুজনেকে যজ্ঞ উপবীত দিয়ে উপনয়ন করান হল। উপনয়নের পর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে। সান্দীপনি তখনকার দিনের খুব নামকরা মুনি ছিলেন। এতদিন শ্রীকৃষ্ণের বিধি অনুসারে কোন শিক্ষা হয়নি, এই কয় বছর তো গোয়ালাদের মধ্যে থেকেছেন। এখানে আমাদের কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু জাতিতে গোয়ালা ছিলেন না। গোয়ালার মধ্যে পালিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু উনি নিজে ছিলেন ক্ষত্রিয়। শুধু ক্ষত্রিয়ই নয়, খুব উচ্চ বংশের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু কর্ম বিপাকে তাঁকে গোয়ালাদের কাছে বড় হতে হয়েছিল। তখনকার বিধান অনুযায়ী গোয়ালাদের যজ্ঞ উপবীত হতো না, ক্ষত্রিয় বলেই শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ উপবীত হয়েছিল আর তাঁকে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে পাঠানো হল।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্মের সময় বসুদেব মনে মনে কিছু সঙ্কল্প করেছিলেন, আমি এত গোদান করবো, এত বস্ত্রদান করবো ইত্যাদি। এখন তিনি মুক্ত হস্তে দানক্রিয়াদি সম্পাদন করে সঙ্কল্প কার্যকর করলেন। যদুবংশের তখন আচার্য ছিলেন গর্গ ঋষি। তাঁকে দিয়ে সব সংস্কারাদি করান হয়েছে। এবার গুরুগৃহে দুজনকে প্রেরণ করা হবে, পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন *প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ। নান্যসিদ্ধামলজ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ।।১০/৪৫/৩০*। পরীক্ষিৎ! এও এক মনোহর লীলা! শ্রীকৃষ্ণ হলেন সমস্ত বিদ্যার *প্রভবৌ*, জগতে যত রকম বিদ্যা আছে সব বিদ্যা ওনার ভেতর থেকেই উৎপত্তি। বলা হয় ব্রহ্মার মুখ থেকে বেদ বেরিয়েছে। বেদ কিন্তু কখনই ভগবান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, যেটা এর আগে আমরা আলোচনা করলাম, যতক্ষণ বেদকে অতিক্রম করা না হয় ততক্ষণ কিন্তু ভগবানের কাছে পৌঁছান যাবে না। ইসলামেও এই নিয়ে প্রথমের দিকে একটা বিতর্ক ছিল, ভগবান আর তাঁর কথা কি এক, নাকি আলাদা। অর্থাৎ আল্লা আর কোরান একই জিনিস কিনা। এগুলো আবার বিচার করতেন তখনকার সুলতানরা, যাদের কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানই ছিল না। ভারতে এই জিনিসটাকে অনেক আগেই সমাধান করে দেওয়া হয়েছে। একটা জিনিসকে আকার, ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে। তুমি যদি ভগবানকে পেতে চাও তাহলে আগে বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত করে বেদকে অতিক্রম করে যেতে হবে। বেদও জানে আমরা কোন দিন ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারবো না, সেইজন্য বেদের ঋচারা গোপী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন যাতে ওঁরা ভগবানের দর্শন স্পর্শন পেতে পারেন। সেই বেদ থেকে সব বিদ্যা বেরিয়েছে আর বেদ ভগবান থেকেই বেরিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই ভগবান, তিনি জগদীশ্বর ওনার আর শিক্ষা লাভের জন্য গুরুগৃহে যাবার কি দরকার ছিল! শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে জ্ঞান সেই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, এর জন্য কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় না। যেমন টিউব লাইট জ্বলছে, আলো দিচ্ছে। এর কি প্রমাণ যে টিউব লাইট আলো দিচ্ছে, এখানে কোন প্রমাণের দরকার হয় না, এটাই স্বতঃসিদ্ধ। কিছু কিছু জিনিসকে জানার জন্য প্রমাণের দরকার হয় না।

কিন্তু যেই নিয়মটা চলে আসছে, শাস্ত্রীয় বিধিকে পূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম অবন্তিপুরে সান্দীপনি মুনির আশ্রমে শিক্ষানবিশ হয়ে গেলেন। ঐখানে তিনি যত রকমের শাস্ত্রাদি আছে সব শাস্ত্রকে রপ্ত করে নিলেন। তিনি সেখানে মাত্র চৌষট্টি দিনে চৌষট্টি কলা অধ্যয়ন করে শিক্ষা লাভ করে নিয়েছিলেন। ঐখানেই তাঁর শিক্ষা পূর্ণ হয়। এরপর ওনারা কত দিন সান্দীপনি আশ্রমে ছিলেন জানা যায় না। এই চৌষট্টিটি শাস্ত্রই হিন্দু ধর্মের চৌষট্টি বিদ্যা। যাঁরা সব কয়টিতে অভিজ্ঞ হয়ে যান তাঁদেরকে বলা হয় – তিনি চৌষট্টি কলাতে নিপুণ। এগুলো হচ্ছে – গান, বাদ্য, মানে যে কোন (১)বাদ্যযন্ত্র, (২) নৃত্য, (৩) নাট্য, (৪) চিত্রকারী, (৫) বুটিকের কাজ করা, (৬) তণ্ডুল ও ফুল দিয়ে পূজার উপাচার রচনা, (৭) তিলকাদি রচনা, (৮) পুষ্পাস্তরণ, (৯) দাঁত, বস্ত্র এবং অঙ্গ রঙ্গীন করার বিদ্যা। আগেকার দিনে মানুষ দাঁতেও রঙ লাগাতেন, কি রঙ লাগাতেন আমাদের জানা নেই, আসলে দাঁতকে কীভাবে মুক্তোর মত ঝকঝকে রাখা যায়, এটাও একটা চারুকলা বিদ্যা, (১০) মণি ও পাথর দিয়ে ঘরের মেঝে নির্মাণ বিদ্যা, (১১) ফুলের সজ্জা তৈরী করা, আগেকার দিনে রাজারা রাত্রে যখন বিছানায় শুতে যেতেন তারা ফুলের বিভিন্ন সাজ দিয়ে সজ্জা তৈরী করতে চাইতেন, যে কেউ ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়ে দিতে পারবে না, বিভিন্ন আবহাওয়াতে বিভিন্ন ঋতুতে কোন্ সাজটা ঠিক হবে, কি ধরণের

ফুল, তার ম্যাচিং রঙ কি হবে সেটা আগে জানা দরকার। (১২) জলকে কীভাবে বেঁধে রাখতে হয়, (১৩) বিচিত্র ধরণের সিদ্ধাই দেখানো, তাসের খেলা, (১৪) বিভিন্ন রকমের মালা তৈরী করা, (১৫) ফুলের মুকুট তৈরী করার বিদ্যা, (১৬) অভিনেতাদের মেক-আপ করানোর বিদ্যা, (১৭) ফুলের অলঙ্কার তৈরী করা, (১৮) কানের বিশেষ অলঙ্কার তৈরী করা, (১৯) সুগন্ধী দ্রব্য তৈরী করার বিদ্যা, (২০) ইন্দ্রজাল বা যাদুকরী বিদ্যা, (২১) নিজের রূপকে তাৎক্ষণিক ভাবে পাল্টে ফেলার ক্ষমতা, গোয়েন্দারা যেমন একটু কিছু এদিক সেদিক করে নিজের চেহারা পাল্টে নিতে পারে। (২২) বিভিন্ন হাত সাফাইয়ের খেলা, (২৩) নানান রকমের ব্যঞ্জন রান্না করার বিদ্যা, (২৪) বিভিন্ন রকমের পানীয় বস্তু তৈরী করা, (২৫) সূচের কাজ, (২৬) পুতুল বানান আর সেই পুতুলের খেলা দেখান, (২৭) ধাঁধা তৈরী করা আর যে কোন ধাঁধার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা, (২৮) বিভিন্ন মুর্তি বানান, (২৯) কূটনীতি, (৩০) পাখিদের যেমন টিয়া, ময়না, শালিখের ডাক নকল করা আর এদের মত করে কথা বলা। জিম করবেট প্রত্যেকটি পশুর নকল করতে পারতেন। জিম করবেটের একটা ঘটনা আছে, একবার তিনি কিছুতেই একটা বাঘকে মারতে পারছিলেন না। তারপর তিনি বাঘিনী বাঘের সাথে মিলনের জন্য যেভাবে ডাকে ঠিক সেই ডাক নকল করে, আর ঐভাবে ডেকে ডেকে বাঘটাকে কাছে নিয়ে এসে তারপর গুলি করে মারলেন। (৩১) অধ্যাপনা ও আবৃত্তি করার বিদ্যা, (৩২) নাটক ও আখ্যায়িকা রচনা বিদ্যা ও সাহিত্যের রসগ্রহণের ক্ষমতা, (৩৩) সমস্যা সমস্যা সমাধানের কুশলতা, (৩৪) বাঁশ ও বেতের সাহায্যে বাণ ও অন্যান্য বস্তু তৈরী করার বিদ্যা, (৩৫) গালিচা নির্মাণ করা, (৩৬) কাঠের কাজ ও ভাস্কর্য বিদ্যা, (৩৭) বাস্তুবিদ্যা, (৩৮) সোনা, রূপার মত ধাতু ও রত্নের পরীক্ষা করার বিদ্যা, (৩৯) ধাতুবিদ্যা, (৪০) রঙ প্রস্তুত করার প্রণালী, (৪১) খনিবিদ্যা, (৪২) গাছপালার পরিচর্যা ও লতাপাতা এবং বিভিন্ন গাছগাছালির বিভিন্ন অংশ দিয়ে রোগ নিরাময় করা, (৪৩) মেষ, মোরগের লড়াই করানোর বিদ্যা, (৪৪) উচাটন বিদ্যা, এটা একটা মন্ত্রশক্তি, এর দ্বারা যে কোন লোককে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, (৪৫) চুলের পরিচর্যার কৌশল, (৪৬) মুঠোর জিনিস আর মনের জিনিসকে জেনে নেওয়ার ক্ষমতা, রিডার্স এণ্ড ডাইজেস্টে একটা ঘটনা বেরিয়েছিল, একটা স্কুলের ছেলে বন্ধুদের হাতের মুঠোয় জোড় না বেজোড় সংখ্যায় যেটা থাকবে সেটা প্রত্যেক বার ঠিক বলে দিত, একবারও তার ভুল হতো না। এই আশ্চর্য ক্ষমতা জানাজানি হওয়ার পর, কিছু মনস্তাত্বিক ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করে এর রহস্যটা কি। ছেলেটি একটা কথাই বলল ‘ঐ ছেলেটির মনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে জানতে চেষ্টা করি আমি যদি ও হোতাম তাহলে আমি কি রাখতাম, সেই সময় আমার যে চিন্তাটা আসে আমি সেটাই করি’। ছেলেটি একবারও ভুল বলেনি। এটাও একটা বিরাট কলা। এটা কিন্তু এমন কিছুই নয়, ছেলেটি নিজের মনকে শূন্য করে দিচ্ছে আর সেখানে সে ওর বন্ধুর মনকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তার ফলে সে বন্ধুর মন কি ঠিক করেছে সে বুঝে ফেলছে। চৌষট্টি কলা বিদ্যার মধ্যে এটিও একটি বিদ্যা। (৪৭) ম্লেচ্ছ কাব্যাদি বুঝে নেওয়া, তখন তো আর উর্দু, ফার্সি ভাষা ছিল না, সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় যে কাব্য রচনা করা হবে তুমি এই বিদ্যা অর্জন করলে বুঝে নেবে। (৪৮) দেশীয় বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান, (৪৯) কোন ঘটনাকে বিচার করে ভবিষ্যতে ভালো-মন্দ কি হবে বলে দেওয়া, (৫০) নানা রকমের মাতৃকা-যন্ত্র নির্মাণ, (৫১) হীরা আদি রত্নের অলঙ্কার রচনা বা ফুল দিয়ে খেলনা গাড়ি তৈর করা, (৫২) সাংকেতিক ভাষা তৈরী করা, (৫৩) মনে মনে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করা, (৫৪) প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে কার্যোদ্ধার করার কৌশল আবিষ্কার করার বিদ্যা, (৫৫) চালাকির দ্বারা কার্যোদ্ধার করা, (৫৬) অভিধান জ্ঞান, (৫৭) ছন্দোজ্ঞান, (৫৮) পোষাক গোপন করা এবং পোষাক পরিবর্তনের কৌশল, (৫৯) দ্যুত ক্রীড়া, (৬০) দূরের কোন বস্তুকে আকর্ষণ করার বিদ্যা, (৬১) বাচ্চাদের খেলা জানা, (৬২) মন্ত্রবিদ্যা, (৬৩) নতুম নতুন কথা বার করা। যখন ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হয় তখন নতুন নতুন কথা দিয়ে আলোচনাকে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। (৬৪) শেষে মজার জিনিস তাকে বেতাল সিদ্ধি জানতে হবে অর্থাৎ বেতাল বশীকরণ বিদ্যা। এই হল চৌষট্টি বিদ্যা। সবাই সব কটি বিদ্যা কখনই অর্জন করতে পারবে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম চৌষট্টি দিনে এই চৌষট্টিটি বিদ্যা অর্জন করে নিয়েছিলেন। এগুলো সবটাই কথা কাহিনী নয়। ভারতে প্রশ্ন-বিচার নামে একটা বিদ্যা আছে, মূলতঃ এটিই ভারতের ঠিক ঠিক জ্যোতিষ বিদ্যা। প্রশ্ন-বিচার বিদ্যা যিনি জানেন তাঁকে যদি কেউ যে কোন একটা প্রশ্ন করে, যেমন কেউ প্রশ্ন করল – আমার ট্রেন কি আজ ঠিক সময়ে আসবে? এখানে তিনি এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ কিংবা

না কিছুই বলবেন না। শুধু প্রশ্নটা শোনার পর প্রশ্নকর্তার ব্যক্তিত্ব কি রকম, তার মনের অবস্থা কি রকম, তার বন্ধুরা কি রকম, তার কত শত্রু আছে শত্রুদের ক্ষমতা কি রকম সব পর পর বলে দেবেন। এখানে যে চৌষট্টি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে এগুলো কোন কাল্পনিক নয়। রাজা বিক্রমাদিত্যও চৌষট্টি কলা জানতেন।

শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম এখন সান্দীপনি মুনির আশ্রমে আছেন। এখানে একটা কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার পর দুই ভাই সান্দীপনি মুনিকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। প্রভাসতীর্থে সান্দীপনি মুনির ছেলে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। সান্দীপনি মুনি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া পুত্রকে ফিরিয়ে আনতে বললেন – এটাই হবে তাঁদের গুরুদক্ষিণা। দুই ভাই মিলে প্রভাসতীর্থে সমুদ্রের কাছে গিয়ে বললেন – হে সমুদ্র! তুমি এখান থেকে তোমার বিশাল তরঙ্গ দিয়ে যে বালকটিকে গ্রাস করেছিলে, সে আমাদের গুরুপুত্র। তুমি অবিলম্বে তাকে ফিরিয়ে এনে দাও। এরপর নানা কাহিনীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে এনেছেন। সান্দীপনি মুনি পুত্রকে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে বললেন – এটাই আমার গুরুদক্ষিণা, আমার আর কিছু লাগবে না।

ভ্রমরগীত

এরপর আসছে বিখ্যাত ভ্রমর গীত। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় এসে অনেক কিছুই করছেন। থেকে থেকে তাঁর গোপীদের কথাও মনে পড়েছে। গোপীদের এভাবে ছেড়ে আসতে হল, তারা আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল। আমাকেও তাদের জন্য কিছু করা উচিৎ। তিনি তখন উদ্ধবকে তাঁর দূত রূপে ব্রজে গোপীদের কাছে পাঠালেন। উদ্ধব এখন শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ নিয়ে গোপীদের কাছে এসেছেন। অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গেছেন আর উদ্ধব এসেছেন শ্রীকৃষ্ণের হয়ে গোপীদের বোঝাতে। উদ্ধব যখন রথ নিয়ে আসছেন তখন গোপীরা ভাবছেন আবার কেন রথ আসছে! আবার কি অঘটন হতে চলেছে! রাসলীলার অল্প কিছু দিন পরেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ছেড়ে মথুরায় চলে গেছেন। আর কোন দিন তিনি গোপীদের কাছে ফিরে আসেননি। যাই হোক উদ্ধব যখন এসেছেন, তখন গোপীদের খুব অভিমান, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সাথে এটা কি করলেন! গোপীরা এখন তাঁদের অভিমানের কথাই উদ্ধবকে বলে যাচ্ছেন। এটাই ভ্রমর গীত নামে সুপরিচিত। ভ্রমর-গীত খুব বিখ্যাত কাব্য রচনা। রাসলীলাতে যেমন পরা ভক্তির চরমতম অবস্থাকে দেখানো হয়েছে, ভ্রমর-গীতে জাগতিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসার চিন্তায় হারিয়ে গেছে, আর যাঁকে এতো ভালোবেসে ছিলেন তিনি চিরদিনের মত হারিয়ে গেছেন। ভগবানের অদর্শনে গোপীদের যে বিরহ যন্ত্রণা তারই বর্ণনা ভ্রমরগীতিতে করা হচ্ছে। উদ্ধব ছিলেন খুব জ্ঞানী পুরুষ। ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলা গানে বা বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে অক্রুরের বৃন্দাবনে আগমন আর পরে উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ নিয়ে গোপীদের কাছে আসা এই দুটি ঘটনাকে যেখানে যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেই অংশগুলি সাহিত্যের নিরিখে খুবই উচ্চাঙ্গের।

যখনই গোপীদের আর শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আসবে তখন একটা জিনিস আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে গোপীরা ছিলেন একেবারেই গ্রাম্য সরল মহিলা। তাঁরা বেদের ঋচা হতে পারেন, বা আগের আগের জন্মে বড় বড় সন্ত মহাত্মা হতে পারেন কিন্তু আমরা যে গোপীদের কথা বলছি তারা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর, গ্রাম্য অবলা নারী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভালোবাসাকে অন্যরা যে ভাবেই দেখে থাকুন না কেন, এটা ঘটনা যে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রেমিক রূপেই ভালোবাসত। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ থেকে মথুরা চলে আসার পর তাঁদের মনটা সেই থেকে ছটফট করছে। তাঁরা কিছুতেই কৃষ্ণবিহীন জীবনের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিলেন না। একেই বাড়িতে দুর্নাম হয়ে গেছে, অন্য দিকে যাঁর জন্য দুর্নাম হল তাঁকেও পেলেন না।

আমাদের মনে হতে পারে, যে অন্তর্যামী বাইরে লীলা করছিলেন তিনি এখন কোথায় গেলেন? আসলে এখানে দুটো জিনিস চলছে। বলা হয়ে যে গল্পের মধ্যে অনেকগুলো স্তর থাকে, এই কাহিনীর মধ্যেও স্তর আছে। একটা হল অন্তর্যামী তিনি বাইরে লীলা করছেন। ঠাকুর একদিন ভগবান নারায়ণকে বাইরে দেখছেন, তিনি মধুরভাবে তাঁকে আলিঙ্গন করতে গেছেন। ঠাকুরকে বলছেন, এখন এভাবে হবে না, তুমি এখন ভৌতিক শরীরে আছ, এটা এই শরীর নয়। আলিঙ্গন করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে তাঁর দাঁত ভেঙে গেল। আবার আছে,

ঠাকুর একজনকে বলছেন, এখন তোমার ঐ দিব্য দর্শন গুলো হবে না। দিব্য দর্শন কখনও হয় কখনও আবার হয় না। অনেকে তখন ছটফট করেন আবার অনেকে এগুলো কোন গুরুত্ব দিতে চান না। স্বামীজীর এই ধরণের দর্শনের কোন বালাই ছিল না, অন্য দিকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর প্রচুর দিব্য দর্শন হত। আমরা এখন এটাই মেনে চলছি যে গোপীদের এখন আর দিব্য দর্শন হচ্ছে না। কিন্তু কাহিনীর দিক দিয়ে বলা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেছেন, গোপীরা কৃষ্ণ বিরহে ছটফট করছেন। যাই হোক উদ্ধব বৃন্দাবন যাচ্ছেন, তাঁর শুধু এখন শ্রীকৃষ্ণের কথা আর গোপীদের তাঁর প্রতি ভালোবাসার কথাই মনে হচ্ছে।

গোপীরাও খবর পেয়েছেন মথুরা থেকে উদ্ধব সংবাদ নিয়ে এসেছেন। উপমা দেওয়া হচ্ছে, একটা শান্ত পুকুর, তার মধ্যে কয়েকটা পাথর ছুড়ে দেওয়া হল। গোপীরা মোটামুটি ভাবে কৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণা সামলে নিচ্ছিলেন, তীব্র কষ্টটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল, আর সেই সময় উদ্ধবের ব্রজে আগমন তাঁদের মনে সেই পুরানো যন্ত্রণাটা আবার জাগিয়ে দিল। উদ্ধবকে দেখে গোপীরা কথা বলতে গিয়ে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছেন না, নিজেদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন। গোপীরা এখন অভিমানে ভারাক্রান্ত, এত অভিমান যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অভিমান আবার দু রকমের, যেখানে একটা পাওয়ার আশা থাকে, আরেকটা যেখানে পাওয়ার কোন আশা নেই। গোপীরা বুঝে গেছেন, কৃষ্ণকে আর পাওয়ার আশা নেই। এ যে কী অভিমান, বলাও খুব কষ্টের। কথামৃতে গোপীদের বিরহের কথা যেখানে বলছেন, রাধার বিরহের এত তাপ যে চোখের জল বের হতে হতেই বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। ভাগবতের এই জায়গার বর্ণনা সাহিত্যের এক অসাধারণ সৃষ্টি। কাব্য সাহিত্যের কত মাধুর্য্য থাকতে পারে এই অংশটা না পড়লে বোঝা যায় না, কবিতা যদি ঠিক ঠিক কবিতা হয়, তখন সেই কবিতা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে, ভ্রমরগীত না পাঠ করলে বোঝা যাবে না।

অক্রুর যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিতে এসেছিলেন তখন গোপীরা একবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন, উদ্ধবকে দেখে আবার নতুন করে গোপীদের মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। এত উতলা হয়ে উঠেছে যে উদ্ধবের কাছে শ্রীকৃষ্ণের নামে নিন্দা করে মনের যত অভিযোগ উজার করে দিয়ে যেন হাল্কা হতে চাইছেন। সেই সময় একটা ভ্রমর একজন গোপীর কাছে উড়ে এসে গুণগুণ করছিল। সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের নাম করে ঐ ভ্রমরকে গালাগাল দিচ্ছে। ভ্রমরের উদ্দেশ্যে গোপীর যে উক্তি, উক্তির ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যত খেদোক্তি, তাই নিয়েই এই পুরো অধ্যায়। এর কাব্য, ভাব, শৃঙ্গার সবটাই খুব উচ্চমানের। কেউ যদি সুফিদের আধ্যাত্মিক রচনা বা খ্রীশ্চানদের যাঁরা মরমীয়া সাধক, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁদের যে সাহিত্য কিংবা স্বামী সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গে মধুরভাবের অধ্যায়টা, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ভাব, পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যখন ঈশ্বরকে সাধক প্রেমিক রূপে সাধনা করে, আমি ঈশ্বরকে একেবারে প্রিয়তম রূপে পেতে চাই, তখন তাদের মনের ভাব, আবেগ কীভাবে চলে, কত গভীর ভাবে তারা নিজেদেরকে প্রেমিকা রূপে ঈশ্বরের কাছে সব কিছু উজার করে দেন। এটাই ঠিক ঠিক রাগাত্মিকা ভক্তি, এখানে ঈশ্বর প্রেমিকরা কি করছেন, কি বলছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কি খাচ্ছেন, তার আর কোন দিকে হুঁশ থাকে না।

উদ্ধব ছিলেন জ্ঞানী পুরুষ। গোপীদের এই ব্যাকুলতা দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যাঁদের খুব আগ্রহ আছে, তাঁদের খুব বেশী শাস্ত্র পড়তে হবে না, শুধু লীলাপ্রসঙ্গ আর কথামৃত আর তার সাথে সাথে এই দুটো বইতে যে চরিত্রগুলো আছে তাঁদের জীবনীর উপর কয়েকটা বই খুব গভীর মনযোগ সহকারে পড়লেই হবে। যেমন গোপালের মা, গোপালের মার জীবনীটা যদি একটু জেনে নেওয়া যায়, কিংবা লাটু মহারাজের জীবনী পড়া থাকে, তাহলে আধ্যাত্মিক জীবন বলতে ঠিক কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা করে নিতে পারা যাবে।

গোপালের মা ঠাকুরের সামনে নরেন্দ্র নাথ দত্তকে তাঁর বিভিন্ন আধ্যাত্মিক দর্শন ও অনুভূতির কথা বর্ণনা করে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে গোপালের মা নরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করছেন 'বাবা নরেন আমি যে কথাগুলি বলছি এগুলি সব ঠিক না ভুল'? নরেন আর কি উত্তর দেবে, তার চোখে জল, বলছেন 'না, আপনি যা বলছেন সব ঠিক বলছেন'। আর ঠাকুর আনন্দে ভাসছেন, নরেন এসব মানছে। নরেনের তখন ছিল বই পড়া বিদ্যা,

নরেন এসব মানত না। কিন্তু গোপালের মা এক বিধবা গ্রাম্য মহিলা, যিনি সাক্ষাৎ দেখছেন ঈশ্বর তাঁর সন্তান রূপে খেলা করছে, দুষ্টুমি করছে, অথচ গোপালের মার বই পড়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান কিছুই নেই, কিন্তু কোথায় কোন্ উচ্চ অবস্থাতে তিনি বিচরণ করছেন! গোপীদের ঠিক এই অবস্থা। তাঁদের ভালোবাসা কত গভীর, গভীর থেকে গভীরতর। এই ধরণের কাব্য ভাগবতে আর নেই। অন্যান্য সাহিত্যে যেমন গীতগোবন্দে বা অন্য অনেক সাহিত্যে এই ধরণের কাব্য পাওয়া যায়। এখানে দর্শন তত্ত্ব খুব একটা নেই, কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তি কি রকম হয় তার যে একটা বিশেষ দিক আছে, সেটাকে আমরা ধারণা করতে পারছি। গোপীদের ছিল পরকিয়া ভক্তি, মীরাবাঈয়েরও রাগাত্মিকা ভক্তি কিন্তু তার ভক্তিকে পরাকিয়া ভক্তি বলা যাবে না, মীরাবাঈয়ের ক্ষেত্রে হয়ে যায় স্বকীয়া ভক্তি। স্বকীয়া ভক্তিতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে ভালোবাসা হয়, এখানে একটা বাঁধন আছে। গোপীদের ক্ষেত্রে পরাকীয়া ভক্তিতে সব বাঁধন ছাড়া। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়েছেন – কোন মেয়ে যখন উপপতি করে, সে একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে উপপতির গলায় গামছা দিয়ে বলে 'তোর জন্য সব ছাড়লাম এখন তুই দেখবি না মানে!'

ঠাকুর একটা বাক্যে যেটা বললেন, এটাই ঠিক ঠিক ভ্রমরগীতের মূল ভাব। পুরো ভ্রমর গীতের সার ঠাকুরের এই একটি বাক্যে দেওয়া আছে। আমরা সব কিছু ছেড়ে তোমাকে ভালোবাসলাম তুমি দেখবে না মানে। কথামৃতের প্রত্যেকটি কথাতে যে কি গভীর তাৎপর্য লুকিয়ে আছে শুধু পড়ে গেলে বোঝা যায় না, খুব জপ ধ্যান, সাধনা না থাকলে বোঝা যাবে না। উপর উপর পড়লে একটু মজা লাগবে, হাসি পাবে, ব্যস্ ঐটুকুই এর বেশী কিছু হবে না। ভ্রমরগীতও সবাই বুঝতে পারে না। সাধারণ মানুষরা মনে করে যে এসব গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের উপর অভিমানের কথা। কিন্তু ভ্রমরগীত অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। একমাত্র যাদের কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে তারাই এই ভ্রমরগীত পাঠ করবার উপযুক্ত অধিকারী।

যাই হোক, উদ্ধব এসেছেন। গোপীরা প্রথমে উদ্ধবকে বসালেন। আগেকার দিনে গ্রামে গঞ্জে প্রথা ছিল মেয়ের শ্বশুড় বাড়ি থেকে যখন কেউ আসত তখন তাকে কোন একটা জায়গায় বসান হত, আর পুরো গ্রামের মেয়েরা তাকে ঘিরে রাখত। এখন আর এই প্রথা দেখা যায় না। যাই হোক, উদ্ধবকে বসান হয়েছে, জল খেতে দেওয়া হয়েছে। জলটল খাওয়ার পর সব গোপীরা উদ্ধবকে ঘিরে ধরেছেন, আর বলতে শুরু করেছেন *জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্। ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া।।১০/৪৭/৪।।* 'ও! আপনি এসেছেন, খুব ভালো, আপনি যে যদুনাথের পার্ষদ আমাদের জানা আছে। আপনি আমাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ নিয়ে এসেছেন বলছেন? আপনি বলছে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে? আমাদের বোকা বানাবেন না! আসলে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে তো এখানে তার বাবা মা, নন্দবাবা আর যশোদার কাছে পাঠিয়েছেন তাঁদের খোঁজ নিতে।' গোপীরা অভিমান করে বলছেন আপনি কি আমাদের কাছে এসেছেন? আসলে আপনিতো এসেছেন নন্দবাবার কাছে। আপনি আমাদের বোকা বানাতে চাইছেন। ওনার বাবা মাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আপনাকে পাঠাননি। গোপীরা একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন –

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে। স্নেহানুবন্ধো বন্ধুনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ।।১০/৪৭/৫।। বড় বড় মুনি ঋষিরাও তাঁদের বাবা মার বন্ধন কাটাতে পারেন না, নিজের বন্ধু-বান্ধবদের ভুলতে পারেন না। ঠাকুরও মাকে ছেড়ে বৃন্দাবনে থাকতে পারলেন না, শেষ দিন পর্যন্ত মাকে কাছে রেখেছেন। স্বামীজী এত দেশে বিদেশে গেলেন কিন্তু মায়ের কথা সব সময় মনে রেখেছেন। সন্ন্যাসীরাও তাঁদের পূর্বাশ্রমের বন্ধুদের ভুলতে পারেন না। কোন বন্ধুর সাথে দেখা হলে, বন্ধু বলবে, সাধু হয়ে তুই তো এখন আমাকে ভুলেই গেছিস। সন্ন্যাসীদের স্মৃতি কি অত সহজে খারাপ হতে পারে! সাধুদের স্মৃতি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। স্মৃতিটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী যাদেরকে ভালোবেসেছেন তাদের প্রতি ভালোবাসাটা অনেক গুণ বেড়ে যায়। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের যদি পতন হয়, তখন ঐ পতনটাও মারাত্মক রকমের হয়। একজন সাধারণ মানুষের কুমিরের চামড়া, ওর উপরে ভালোবাসার কেন কোন কিছুরই দাগ পড়ে না। সাধু সন্ন্যাসীদের মন এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে, যেদিকে যাবেন ঠিক করে নিলেন তাঁকে আর ওদিকে যাওয়া থেকে আটাকানো যাবে না।

ঈশ্বর লাভের জন্য দুটো জিনিস প্রচণ্ড ভাবে দরকার, একটা হল খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সেইজন্য কোন মুর্খের ভগবান লাভ হয় না। মুর্খ বলতে লেখাপড়া না জানার কথা বলা হচ্ছে না, বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ, কথাগুলো চটপট বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা। দ্বিতীয় এনাদের আবেগ, অনুভূতির প্রবণতা প্রচণ্ড শক্তিশালী, ইমোশান যদি পাওয়ারফুল না হয় তাহলে ভগবানের ভালোবাসা কি করে বুঝবে! একজন কবির যে আবেগ তার থেকে অনেক বেশী আবেগ একজন ঋষি বা সন্ন্যাসীর হয়। গোপীরা তাই বলছেন, বড় বড় মুনি ঋষিরাও তাঁদের বাবা-মা, নিজের বন্ধুদের ভুলতে পারেন না। ভুলবে কি, তাঁদের আরও বেশি মনে পড়ে। তবে কি, সাথে সাথে অনাসক্তির ভাবটা থাকে বলে একটা বেড়া দিয়ে রাখেন। কোন কারণে যদি ঐ বেড়াটা ভেঙে যায়, তখন তাঁকে সামলানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। এই যে যোগ সাধনায় যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়, বেদান্তে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের কথা বলে, এগুলো দিয়ে কখনই ঈশ্বর লাভ হয় না। ঈশ্বর লাভের পথে ভালোবাসা, বিবেক বিচার নিয়ে যখন কেউ এগোয় তার পতন কিন্তু হবেই হবে, এর থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। যে যোগী বা সন্ন্যাসীর কোন দিন পতন হয়নি বুঝে নিন সে নোঙর ফেলে হাল টেনে যাচ্ছে। নোঙর ফেলে নৌকা চালাতে কোন সমস্যা হয় না, কোন ঢেউ ধাক্কা দেবে না, ঝড় তুফানে বেসামাল হবে না, কিন্তু যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। যে যোগীর পতন হয়নি সে কোন দিন সিদ্ধ হবে না, হতেই পারে না। পাহাড়ে যারা ওঠে তাদের কোমড়ে দড়ি বাঁধা থাকে, যদি পা স্লিপ করে পড়ে তাহলে যাতে চূড়া থেকে একেবারে নীচে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে না যায়। কোমড়ে এমন ভাবে দড়ি বাঁধা থাকে একটা জায়গা পর্যন্ত পড়ে যেন সেখানেই আটকে থাকে, তার নীচে যেন না চলে যায়। যম, নিয়ম, আসন, নিত্যানিত্য বিচার, জপধ্যান এগুলো হল কোমরে দড়ি বাঁধা, যখন পতন হবে তখন একটা অবস্থার নীচে যেন না চলে আসতে পারে। কারণ যে যত উপরে চলে গেছে, সেখান থেকে পতন হলে তার তত বিনাশ হবে। সেইজন্য বৈষ্ণবরা খোল করতাল নিয়ে খুব কীর্তন করে, ভাবে গড়াগড়ি দেয়। কিন্তু তারপর যখন সংসারে নেমে আসে তখন তাদের আর সামলানো যায় না। যোগীদের কিন্তু তা হয় না। বিশ্বামিত্রের কত রকমের গোলমাল, একটার পর একটা গোলমাল করে ফেলছেন, কিন্তু আবার তিনি দাঁড়িয়ে পড়ছেন। কারণ তাঁর যে তপস্যা, ঐ তপস্যার জোরেই তিনি আবার আগের মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। পুরো যোগশাস্ত্র, পুরো বেদান্ত শাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র যে জপধ্যান, যম, নিয়মাদি, নিত্যানিত্য বিবেক বিচারের কথা বলছেন, এগুলো কখনই আমাদের উপরে নিয়ে যাবে না। আমাদের ভেতরে যে আত্মার শক্তি, এই আত্মার শক্তিই সবাইকে উপরে নিয়ে যায়। এগুলোতে আমাদের মনের শুদ্ধি হয়, মনের শুদ্ধি হওয়া মানে সে এবার উপরের দিকে যাচ্ছে। পতন সবারই হবে, পতন থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, কিন্তু এসব করে যে প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছে, এটাই তাকে আবার পতন থেকে সোজা উপরের দিকে ঠেলে দেবে।

স্বামীজী দিদিমার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। রাত্রিবেলা পড়াশোনা করছেন, হঠাৎ তাঁর ভেতরে কাম বেগ এসেছে। স্বামীজী এত রেগে গেলেন যে, শীতের সময় মালসায় আগুন জ্বলছিল, সোজা আগুনের মালসায় গিয়ে বসে পড়লেন। পেছনটা পুরো পুড়ে গেছে, বলছেন, এরপর আবার যদি আসে তখন এর থেকেও কড়া শাস্তি পাবে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের একদিন কাম বেগ এসেছে, তিনি মাটিতে পড়ে মুখ রগরাচ্ছেন, মুখ ছড়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে, আর বলছেন, মা এরপর আবার যদি হয় তাহলে গলায় ছুড়ি দেব। এনারা কেউ সাধক ছিলেন না, এনারা হলে আচার্য। আচার্যেরই এই অবস্থা সেখানে আমি আপনি কোন ছার। তাই বলে আমরা যদি সাধন ভজন ছেড়ে দিই, তাহলে তো আরও গেল। এখানে গোপীরা এটাই উদ্ধবকে বলতে চাইছেন, ঋষি মুনিরাও নিজের বাবা-মা, সম্বন্ধীদের ভুলতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা এমন একটা প্রাচীর তুলে দেন, যার জন্য আমরা কোন দিন জানতে পারব না। গোপীরা ব্যঙ্গ করে বলছেন, তা কৃষ্ণ কি কাটাবে, সেতো এখনও বাচ্চা। আপনি যে মনে করছেন আমাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে ভোলাবেন, তা সম্ভব হবে না। আমরা আর কি, আমাদের কথা কৃষ্ণ কি আর মনে রাখবে! আমরা ভালো করেই বুঝি কায়দা করে আমাদের নাম করে তাঁর বাবা মার কাছে আপনাকে পাঠিয়েছেন। আর আপনি প্রথম থেকেই ধাপ্পা মেরে যাচ্ছেন যে কৃষ্ণ আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই সব কথা গোপীরা উদ্ধবকে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ চলে গেছেন, তাঁদের কষ্ট হয়েছে, তাঁদের অভিমানকে এই ভাবে প্রকাশ করছেন।

তারপরে আরও বলছেন গোপীরা *অন্যেস্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্। পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ।।১০/৪৭/৬।* জগতে যত সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দেখা যায়, সবাই স্বার্থ সাধনের জন্য সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে, প্রয়োজন মিটে গেলে সেই বন্ধুত্বের ভাণও ঘুচে যায়। যখন মানুষ ঢং করে কাউকে ভালোবেসে বলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' তখন সব সময় তার কিছু না কিছু স্বার্থ থাকে। এই ধরণের ভালোবাসাকে গোপীরা ভ্রমরের সাথে তুলনা করে বলছেন, এই যে ভ্রমর, সে যখন ফুলের কাছে গিয়ে নেচে বেড়ায় আর গুন গুন করে গান করে, তারও তখন স্বার্থ থাকে। ফুলের মধুটুকু নিংড়ে নেবে বলে ঐ ভাবে ফুলের কাছে গিয়ে নাচতে থাকে আর গান গেয়ে ফুলকে দেখায় আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। পুরুষরাও নারী সঙ্গে এই রকম ভালোবাসার অভিনয় করে, নারীর সঙ্গে কাজ ফুরিয়ে গেলে তাকে ফেলে দিয়ে চলে যায়। জগতে ভালোবাসা বলে কিছু হয় না, সবটাই ভালোবাসার ভাণ মাত্র, ভালোবাসাতে কোন না কোন স্বার্থ নিহিত থাকে। অপূর্ণ ভালোবাসা প্রসূত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের নামে গালাগাল দিয়ে বলছেন – এই কৃষ্ণেরও স্বার্থ ছিল, এই যে আমাদের সঙ্গে রাসে এত নৃত্য, এত গান করল, আমাদের নিয়ে এত খেলা করল, এগুলো করল শুধু নিজে আনন্দ পাওয়ার লোভে। এসব করে আমাদের সব কিছু নিংড়ে সে পালিয়ে গেছে, তার আশ মিটে গেছে, আমাদের কাছে তার আর কিসের প্রয়োজন!

গোপীরা পর পর কয়েকটি উপমা সহযোগে বলছেন – নষ্টা মেয়ে যাকে ভালোবেসেছে, মেয়েটি যখন দেখে লোকটির আর টাকা পয়সা নেই, সে তখন আর তাকে পাত্তা দেয় না। প্রজা যখন দেখে রাজা আমাকে আর রক্ষা করছে না, তখন সেই প্রজা রাজাকে ত্যাগ করে দেয়। শিক্ষকের কাছে যা শিক্ষা নেওয়ার শিখে নিয়ে ছাত্ররা যখন দেখে এই শিক্ষকের কাছে আর কিছু শেখার নেই তখন সেই ছাত্ররা শিক্ষককে বাই বাই করে দেয়। এইজন্য গুরুরা সব বিদ্যা একবারে দিয়ে দেন না, কিছু রেখে ঢেকে শেখান। ঋত্বীক, যাঁরা যজ্ঞযাগ করায়, যখন দেখেন এখানে ভালো দক্ষিণা পাওয়া যাবে না, মাঝখানেই যজ্ঞ অসমাপ্ত রেখে তাঁরা সরে পড়েন। বৃক্ষে ফল যদি না ফলে, পাখিরা সেই বৃক্ষকে ছেড়ে চলে যায়। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পর অতিথি গৃহস্থের দিকে আর ফিরেও তাকায় না। জঙ্গলে আগুন লাগলে পশুরা জঙ্গলকে ছেড়ে দেয়। আর নারীর মনে যত ভালোবাসাই থাকুক, কামী পুরুষ নিজের ভোগ চরিতার্থ হয়ে গেলে সেই নারীর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে ছেড়ে চলে যায়। গোপীরা এইটাই বলতে চাইছেন, স্বার্থ যখন ফুরিয়ে যায় তখন সরে পড়বে, কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালে পাজি। তা, কৃষ্ণের তো আমাদের থেকে কাজ ফুরিয়ে গেছে, আমরা তো এখন তার কাছে কিছুই না। এইভাবে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের নামে লম্বা লম্বা অভিযোগ দিয়ে চলেছেন।

উদ্ধব দেখছেন গোপীদের মন কীভাবে শ্রীকৃষ্ণে একেবারে লীন হয়ে আছে, তাঁরা সবাই এমন কৃষ্ণময় হয়ে গেছেন যে কোন্ কথা বলতে হয়, কোন্ কথা বলতে নেই সেই বোধটাও তাঁদের হারিয়ে গেছে। সেই ছোটবেলা থেকে এতদিন শ্রীকৃষ্ণ যা যা করতেন, গোপীদের মনের স্মৃতির মণিকোঠায় তারই স্মৃতিমন্থন চলছে আর সেই আনন্দের দিনগুলির কথা উদ্ধবকে বলতে বলতে ভেতরে আনন্দ অনুভব করছেন অন্য দিকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। এত দিনে তারা শ্রীকৃষ্ণের চলে যাওয়ার কষ্টটা সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু উদ্ধবকে দেখার পর থেকে তাদের মনটা আবার হারিয়ে গেছে। ভোজপুরীতে একটা খুব সাধারণ কবিতা আছে, একজন সাধারণ কবির লেখা, কিন্তু ভাবের অভিব্যাক্তি এত সুন্দর আর গভীর, একবার পড়লেই মনে দাগ কেটে যায়। একটি মেয়ে গান করছে, আমার হৃদয়-সমুদ্রের আকাশের উপরে যখন তোমার চেহারার চাঁদ উদিত হয় তখন সমুদ্রের জোয়ার চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসে। খুব সুন্দর ভাব। হৃদয়কে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হৃদয় সমুদ্র এমনিতে শান্ত থাকে, কিন্তু যখনি আকাশে চাঁদ ওঠে, সমুদ্রের জলে সে চাঁদ যখন প্রতিবিম্বিত হয়, সেই চাঁদটা কে? প্রেমিকের চেহারা, তখন জোয়ার আসে। সেই জোয়ারের জল কোথায় যাবে? চোখের যে নদী, সেইখান দিয়ে সে প্রবাহিত হতে থাকে। অর্থাৎ প্রেমিকার চোখে জল আসে। এখানেও তাই, উদ্ধব এসেছেন, গোপীদের মনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেই চেহারা আবার ভেসে উঠেছে। তাঁরা তাঁদের শরীর, মনের কথা একেবারে ভুলে গেছে, কার সামনে কাকে কি কথা বলতে হবে সব ভুলে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছেন। মন এত চঞ্চল হয়ে গেছে কোন দিকেই তাঁদের কোন হুঁশ নেই। উদ্ধবকে দেখে তাঁদের মানস সরোবরে যেন একটা পাথর

এসে পড়ল। সেই ছোটবেলা থেকে শ্রীকৃষ্ণ কি কি করেছিলেন সব পুরনো ঘটনা স্মৃতির মণিকোঠা থেকে একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে তাঁরা সবাই আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন।

সেই সময় একজন গোপীর কীভাবে মনে পড়ল রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে কত নিবিড় ভাবে আনন্দ করেছিলেন। আর ঠিক ঐ মুহুর্তে সেই গোপী দেখছেন তাঁর পাশে একটা ভ্রমর এসে গুনগুন করছে। এখান থেকেই ভ্রমরগীত শুরু হয়। প্রিয়তমর জন্য যে কি নিদারুন বিরহ বেদনা হতে পারে, ভ্রমরগীতের মাধ্যমে সেই বিরহ জ্বালাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। ঐ গোপীর তখন আর কোন হুঁশ নেই। ভ্রমরকে দেখে গোপী মনে করছেন যে এ নিশ্চয়ই ভ্রমর নয়, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো কোন নতুন ফন্দি করে দূত বানিয়ে পাঠিয়েছে। এর আগে দেখেছেন উদ্ধব এসেছেন দূত হয়ে, তাই সবাইকেই সেই গোপীও মনে করছেন এও বুঝি শ্রীকৃষ্ণেরই দূত। মনের এই রকম পরিস্থিতিই হয়, কেউ যদি আমাকে বলে, আপনি এই রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, সাবধানে যাবেন সামনে দুটো পাগলা কুকুর আছে, অনেককে কামড়েছে। এই কথা শোনার পর আমি যখনই কোন কুকুর দেখবো আমার মনে হবে এটা বুঝি সেই পাগলা কুকুর।

গোপীরও ঠিক তাই অবস্থা। উদ্ধব দূত হয়ে আসার পর ভ্রমরকেও ভাবছে এও বুঝি শ্রীকৃষ্ণের দূত হয়ে এসেছে। আর কি ভাবছেন? 'ও! আমার অভিমান হয়েছে বলে আমার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই ভ্রমরকে পাঠিয়েছে?' গোপী বলছেন 'ওহে মধুপ! তুমি যার দূত হয়ে এসেছ সে নিজেই একজন কপট, ধূর্ত। তুমিও তোমার বন্ধুর মত কপট আর ধূর্ত'। গোপীর আর কোন হুঁশ নেই যে ভ্রমরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোন সম্পর্ক নেই, সে নিজের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার মাথার মধ্যে বসে গেছে যে এই ভ্রমর শ্রীকৃষ্ণের দূত। বলছে 'ভ্রমর, তুমি আমার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছ কেন? তুমি আমার পায়ে ধরে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছ? তুমি আমাকে ধাপ্পা মেরো না, এই দ্যাখো, তোমার গোঁফের গায়ে হলুদ হলুদ পরাগ লেগে আছে, আমি কি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবছ'। ভ্রমর কোন ফুলে মধু খেতে বসেছিল সেখান থেকে গোঁফের মধ্যে ফুলের রেনু লেগে থাকবে, আবার কিছু কিছু ভ্রমরের গোঁফের রঙটাই হলুদ থাকে। কিন্তু গোপীর মন সেই শ্রীকৃষ্ণে ডুবে আছে। বলছে 'রাসলীলার সময় আমার যে সতীনরা ছিল, তারা যে গলায় ফুলের হার পরেছিল, সেইখানে তুমি তোমার নিজের মাথা রেখেছিলে বলে তোমার মুখে এই হলুদ রঙ লেগেছে, আর এখন তুমি আমার কাছে ঢঙ করতে এসেছ, তুমি কি মনে করেছ যে তুমি আমার সতীনদের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে আসবে আর আমি তোমাকে খাতির করব? তুমি এখানে কিসের জন্য এসেছে তুমি সেখানেই যাও। আর হে ভ্রমর, মনে রেখো আমাকে তুমি অত সহজে পাবে না, তুমি যেখানে প্রেম করছিলে সেখানেই যাও'। গোপীর মন এখনও সেই রাসলীলাতে পড়ে রয়েছে। মনে করছে এখনো তাদের শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাসলীলা চলছে। গোপী বলছে 'এই যে এতগুলো মেয়ের সাথে তিনি যে এই সব কাণ্ড করে বেরিয়েছেন এগুলিতো একটা হাস্যকর, লজ্জাকর ব্যাপার, অথচ তার কোন লজ্জা নেই, এখন আবার আসছে আমার মানভঞ্জন করতে! মুখটা লুকিয়ে রাখতে বলবে। আর দ্যাখো, সে যেমন কালো তুমিও সেই রকম কালো। আরো মজার ব্যাপার দ্যাখো, উনি যেমন সব মেয়েদের সঙ্গে মজা করে আনন্দ করে রস নিংড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল, তুমিও ঠিক একই জিনিস কর, সব ফুলের রস টেনে নিয়ে পালিয়ে যাও। যতক্ষণ তোমার রস নেওয়ার থাকে ততক্ষণ গুনগুন করে গান করবে আর নাচবে, আর সব রস নেওয়া হলে উড়ে পালিয়ে যাও। আমরা তখন তাঁর মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়েছিলাম, আর তাঁর একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা কত রকমের কাণ্ডটাই না করেছি। আর ভ্রমর, তুমিও তোমার বন্ধুর মত তাই করে বেড়াও, তুমি ফুলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য বসবে, কিন্তু ঐটুকুর জন্য তুমি কত নাটক করবে, অথচ ফুলগুলো কত আশা করে তোমার পথ চেয়ে বসে থাকে তুমি কখন আসবে। আর আমরাতো বন-জঙ্গলের মেয়ে, আমরা না জানি তোমাদের মত মন ভোলানোর আদব কায়দা, না জানি তোমাদের মত মার্জিত রীতিনীতি, আর তিনিতো এখন বড় রাজা হয়ে বসেছেন। তুমি যেমন ফুলের রস পান করে উড়ে যাও, তিনিও সেইভাবে একবার শুধু আমাদের ভালোবাসা দিলেন, আমাদের রস পান করে এইভাবে আমাদের ফেলে দিয়ে উড়ে গেলেন'।

ইতিমধ্যে ভ্রমরটা কি করে গোপীর পায়ের কাছে বসেছে, ভ্রমর নিজের মত উড়তে উড়তে গোপীর পায়ের কাছে এসে গুনগুন করছে। কিন্তু গোপী এটাকেই খুব গভীর অর্থ করে বলছেন 'হে মধুকর! তুমি আমার পায়ে মাথা নত করে ক্ষমা চাইতে এসেছ? আমি জানি তুমি ক্ষমা চাইতে আর কথা বানাতে অত্যন্ত নিপুণ, এই তুমি এত দিন খেলা করে এসেছ, আর তুমি তো তার বন্ধু, তুমিও তারই মত নাটক করতে শুরু করেছ। তুমি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এসব কায়দাগুলো খুব ভালোই রপ্ত করেছ, শ্রীকৃষ্ণই তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কি করে মানভঞ্জন করাতে হয়। সেইজন্য এখন আমার পায়ে মাথা রেখে মাথা রগড়াচ্ছ। কিন্তু তুমি মনে রাখবে আমরা এখন আর অতটা বোকা নই আগে যতটা ছিলাম। আমাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে সে আমাদের অনেক বোকা বানিয়েছে, কিন্তু এখন আর আমরা আর অতটা বোকা নই যে খুব সহজে আমাদের বোকা বানিয়ে দেবে। আর দ্যাখো, এই শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমরা সব কিছু ত্যাগ করে, লজ্জা, ভয়, ঘৃণার তোয়াক্কা না করে তাঁর জন্য বেরিয়ে তাঁর কাছে ছুটলাম, কিন্তু তাঁর মনে আমাদের জন্য একটুও কৃতজ্ঞতা বোধ নেই, এতটুকু দয়া, মায়া নেই! অক্রুর এলো আর আমাদের ছেড়ে চলে গেল, আর কোন খোঁজ পর্যন্ত নিল না! তা তুমি যে তাঁর কাছ থেকে সন্দেশ নিয়ে এসেছ আমাদের সাথে সন্ধি করার, তুমিই বল, এই রকম লোকের সঙ্গে কেউ কি কখন সন্ধি করে, যে আমাদের এই ভাবে সর্বস্ব হরণ করে আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যায়'?

গোপীরা আবার রামায়ণ থেকে রামকথা টেনে নিয়ে বলছেন 'এই কৃষ্ণের কাণ্ড দ্যাখো, যখন তিনি শ্রীরামচন্দ্র রূপে এসেছিলেন তখন তিনি বালিকে খুব নির্দয় ভাবে লুকিয়ে বধ করেছিলেন, সুর্পনখা তাঁর কাছে কাম বাসনার ডালি নিয়ে এসেছিল, মেয়েরা এই কাম বাসনা নিয়েইতো পুরুষের কাছে আসে, তিনি কি করলেন? সীতাকে তিনি এমনই ভালোবাসতেন যে, সুর্পনখার নাক আর কান কেটে দিলেন'। রামকথার উল্লেখ থাকাতে এটাই বোঝায় যে ভাগবত যখন লেখা হচ্ছে তখনই রামকথা ভারতে খুব জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল, তা নাহলে এত বিস্তৃত ভাবে থাকতো না। বলছেন 'আবার আরেকবার তিনি ব্রাহ্মণের বাড়িতে বামন রূপে জন্ম নিলেন। তখন তিনি কি করলেন? বেঁটে বামন হয়ে জন্ম নিয়ে তিনি চলে গেলেন বলি রাজার কাছে, সেখানে গিয়ে বলিকে বললেন আমাকে ভিক্ষা দাও। আর দেখুন, ভিক্ষার নামে বলিকে কোথায় নামিয়ে দিলেন। কাকেদের যখন খাবার দেয় তখন কাকেরা কা কা করে চেঁচিয়ে সব কাকেদের ডেকে নিয়ে আসে, আর যারা খাবার দিচ্ছে তাদেরকেই অসুবিধায় ফেলে দেয়। তোমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ বেঁটে বামন হয়ে বলি রাজার সঙ্গে ঠিক এই কাকেদের মত করেছিলে। তিনিও সবাইকে ডেকে এনে বলি রাজাকে ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিলেন, যে দান দিচ্ছে তাকেই ফেলে দিলেন সঙ্কটের মধ্যে'। এই জন্য বলা মুশকিল ভ্রমর গীত কবেকার রচনা, এখানে আগেকার অবতারের কথা বলা হচ্ছে, আরেকটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এখানে অবতারবাদ খুব জোড়াল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। আরেকটা যেটা দেখার তা হল, ভালোবাসা, নিষ্ঠা কতটা গভীর, আর কি গভীর প্রেম হলে মানুষের মনকে কোথায় নিয়ে যায়, যে নিজের প্রিয়তম, তাকেও কীভাবে গালাগাল দিচ্ছে।

তারপর গোপী ভ্রমরকে বলছেন 'শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে দাও, এই জগতে কোন কালো জিনিসকে আমি আর বিশ্বাসও করব না আর সহ্যও করতে যাচ্ছি না'। এই ভাবগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় খুব সুন্দর সুন্দর গীতি কাব্য রচিত হয়েছে। এক জায়গায় বলছেন – একবার শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের উপর খুব রেগে গেছেন, রেগে গিয়ে বলছেন 'কৃষ্ণ কালো তাই আমি আর কোন কালো জিনিস সহ্য করব না'। তখন একজন সখী বলছেন 'রাধা তুমি এত মান কর না, তোমার চুলতো কালো'। শ্রীরাধা চুল কেটে ফেললেন। তখন সখী বলছে 'তোমার চোখ তো কালো'। শ্রীরাধা বলছেন 'আমি চোখ ফুটো করে দেব'। সখী বলছে 'তাহলে তো তুমি কানা হয়ে যাবে'। শ্রীরাধা বলছেন 'আমার কানাই ভালো'। এর আবার দুই রকম অর্থ দাঁড়ায়। একটা অর্থ আমার 'কানা'ই ভালো, মানে অন্ধ হয়ে যাওয়া ভালো, আবার 'কানাই' ভালো, এই কানাই শ্রীকৃষ্ণের আদরের নাম। গোপী বলছেন 'শ্রীকৃষ্ণতো চিরদিন এরকমই করে এসেছে, তবে তুমি যাও, তোমাকে আমরা আর কি বলব। তাকে তো আমরা ভুলতেও পারছি না। আবার সেই দিন কবে আসবে আবার তাকে আমরা এই চোখে দেখব'। এই ভাবে গোপী শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নানা কথা বলে যাচ্ছেন। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটা কথা মাত্র বললাম।

অন্য দিকে সব গোপীরা উদ্ধবকে ঘিরে রেখেছে। তাদের মান, অভিমান, রাগ, চোখের জল সব আছে আবার অন্য দিকে মনের ভেতরে ছটফটানিও আছে শ্রীকৃষ্ণ তাদের জন্য কি সন্দেশ পাঠিয়েছেন জানার। তখন উদ্ধব গোপীদের বলছেন *অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ। বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ।।১০/৪৭/২৩*। 'হে গোপীরা! তোমরা শোন, এত উতলা তোমরা হয়ো না, তোমরা কিন্তু সত্যিকারের কৃতকৃত্য। তোমাদের এই মনুষ্য জীবন, এই জন্ম সফল, তোমরা সত্যি সত্যি ধন্য। তোমরা সারা জগতের পূজনীয়া, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা তোমাদের সব কিছু অর্পণ করে দিয়েছ। তোমাদের শরীর, তোমাদের মন, তোমাদের হৃদয়, তোমাদের মান-সম্মান সব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত'। এই ভাবে সব কিছু ভগবানকে দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। জগতের পূজনীয় বন্দনীয় হলেন ভগবান, কিন্তু তার সাথে ভগবানে যিনি নিজের সব কিছু অর্পণ করে দিয়েছেন তিনিও পূজনীয়। সেইজন্য পূজা করা হয় ভগবানের, তার সঙ্গে সাধু মহাত্মাদেরও পূজা করা হয়। উদ্ধব বলছেন 'তোমরাই এটা সম্ভব করেছ, তাই তোমরা সারা জগতের পূজ্যা। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তোমাদের আর কিছু নেই, তাই তোমরা কৃতকৃত্য'। সব ধর্মেই এই জিনিস হয়, যিনি নিজের ইষ্টের জন্য সব কিছু অর্পণ করে দেন তাঁরাই পূজনীয় হয়ে যান। স্বামীজী বলছেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী তোমার আদর্শ। ভারতে এত নারী থাকতে স্বামীজী কেন সীতা, সাবত্রী, দময়ন্তীর নাম করলেন। কারণ এনারা সবাই ছিলেন পতিব্রতা নারী। পতিব্রতা নারী যখন নিজের স্বামীকে একবার বরণ করে নিয়েছে, এরপর স্বামীর যত দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ হোক, স্বামীকে পতিব্রতা নারী কোন দিন ছেড়ে চলে যাবে না। আমি তোমাকে বরণ করে নিয়েছি, আর আমি তোমাকে ছাড়বো না। কোন কিছু যে স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করছে তাও না, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, এরপর যাই হয়ে যাক আমি তোমাকে আর ছাড়বো না। এই কারণেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীরা পূজনীয়া।

উদ্ধব বলছেন *দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।।১০/৪৭/২৪*। 'যারা দান করে, তপস্যা করে, ব্রত করে, যজ্ঞ করে, বেদ অধ্যয়ণ করে, জপ করে, ধ্যান করে, ধারণা করে, সমাধির চেষ্টা করে, আর আত্মকল্যাণের জন্য যা কিছুই করে এর একটাই উদ্দেশ্য, ভগবানে ভক্তি কীভাবে অর্জন করা যায়। কিন্তু তোমরা এসব কিছু না করেই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি পেয়ে গেছ'। একবার দুর্গাপূজার সময় শ্রীশ্রীমা এসেছেন বেলুড় মঠে। সেখানে সব সাধুরা আনাজ কুটছিলেন। শ্রীমা দেখে বলছেন 'বাঃ ছেলেরা তো খুব সুন্দর আনাজ কুটছে'। তখন একজন মহারাজ বলছেন 'এসবের একটাই উদ্দেশ্য, জগজ্জননীকে প্রসন্ন করা আর তাঁর কৃপা পাওয়া, সে পূজা করেই হোক আর কুটনো কুটেই হোক'। কিন্তু বলছেন, এই যে জপ, ধ্যান, তপস্যা করেও তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না। অথচ গোপীরা অনায়াসে পেয়ে গেছেন। কেননা তাঁরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। আসলে সরল মনের পক্ষে সব কিছু ঐ জায়গায় দিয়ে দেওয়াটা খুব সহজ হয়।

আগে গ্রামের মেয়েরা যেভাবে তাদের স্বামীকে নিজেদের দিয়ে দিত, আজকালকার দিনে শহরে তিরিশ বছর পর্যন্ত পড়াশুনা করে পিএইচডি করে আর বড় বড় পোস্টে চাকরি করে কি আর সমর্পণ করবে, প্রশ্নই আসে না। মেয়েদের পক্ষে আর সম্ভবই না। আর তাই সামান্য সামান্য জিনিস নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া মারামারি শুরু করে দিচ্ছে, আর কয়েক বছর পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে সকালে খবরের কাগজ এলে আগে স্বামী পড়বে না স্ত্রী পড়বে এই ঝগড়তেই ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য যারা খুব সরল হয় তাদের পক্ষেই এই ধরণের ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তি অনুরাগ সম্ভব। গোপীরা তাই বলছেন 'যে তাঁকে বিশ্বাস করে, যে ভগবানের দিকে এগোয় তার সাথেই তিনি ছলনা করেন। তবে আমরা আর কি বলব, শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসা এমনই যে, একবার যদি কেউ একটু স্পর্শ করে নেয়, সে আর ওই স্পর্শ সুখকে ছাড়তে চায় না। কোন মানুষই ছাড়তে পারে না। আমাদেরও এই দুরবস্থা, যতই আমরা মনে কষ্ট পাই না কেন, কিন্তু কৃষ্ণের ভালোবাসার স্বাদ একবার পেয়েছি কিনা, এই কষ্টেই আমরা সারা জীবন পেয়ে যাবো কিন্তু তবু কৃষ্ণকে ছাড়তেও পারবো না'।

উদ্ধব দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের কি গভীর ভালোবাসা। উদ্ধব বলছেন *ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা। ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা।।১০/৪৭/২৫।* বড় বড় ঋষি, মুনিরা, যাঁরা পবিত্র জীবন যাপন করেছেন, যাঁদের সব কিছুই পবিত্র, তাঁরাও এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন না, তোমরা যে অবস্থায় পৌঁছেছ এবং জগতে তোমরা ভগবানকে পতিরূপে কীভাবে ভালোবাসতে হয় তার আদর্শ স্থাপন করে গেলে। হে গোপীগণ! তোমরা যে নিজেদের পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন, গৃহ সব কিছু ত্যাগ করে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তোমাদের পতিরূপে বরণ করেছ এ অতি দুর্লভ, ভাবাও যায় না। উদ্ধব খুব সুন্দর বলছেন *সর্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে। বিরহেণ মাহাভাগা মহান্ মেহনুগ্রহঃ কৃতঃ।।১০/৪৭/২৭।* সাধু, মুনি, ঋষি, সাধকরা কত সাধনা করার পর যে অবস্থাকে প্রাপ্ত করেন, আর তোমরা শুধুমাত্র বিরহের মাধ্যমে সেই অবস্থাকে প্রাপ্ত করেছ। এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই ঠাকুরের জীবনে। ঠাকুর প্রথম যখন সাধনা করছেন তখন তাঁর মধ্যে শুধু ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা ছিল। ঠাকুর তাই পরেও বার বার বলছেন, ব্যাকুলতা চাই। কিন্তু ব্যাকুলতা আর বিরহ দুটো আলাদা। ব্যাকুলতাতে সাধক এখনও ভগবানকে পাননি কিন্তু বিরহে ভগবানের সাথে একটু মিলন হয়েছে তারপরই ভগবানের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। উদ্ধব এই কথাই বলছেন, এই যে তোমাদের বিরহ, এই বিরহে তোমাদের যে ছটফটানি, এই ছটফটানিতেই তোমরা সেই অবস্থাতে চলে গেছ, যে অবস্থা মুনি, ঋষি, সাধুরা ত্যাগ, তপস্যা করে পান। এর আগে আমরা কর্মযোগ জ্ঞানযোগ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, কর্মযোগ বলছে কর্ম কর আর জ্ঞানযোগ বলছে কর্ম সন্ন্যাস করতে। দুটোতেই আমি ভাবটা মুছে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীদের আমি ভাবটা, মানে আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার সংসার, আমার দেহ, আমার রূপ, আমার মন এগুলো সব খসে পড়ে যাচ্ছে। সব কিছু খসে গিয়ে কি থেকে যাচ্ছে? শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকে উদ্ধব এই কথাই বলছেন 'তোমাদের যে এই শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিরহ, তোমাদের আগে হয়েছিল সংযোগ, সংযোগের পর শ্রীকৃষ্ণ থেকে তোমাদের বিয়োগ হয়েছে। এই বিয়োগ হয়ে যাওয়ার পর যে বিরহের জ্বালা, সেই বিরহ জ্বালায় যিনি ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা, তাঁর প্রতি তোমাদের সেই ভাবটা এসে গেছে, যে ভাবটা এসে গেলে সমস্ত বস্তুর মধ্যে তাঁকেই দর্শন করে, জগতে এটা অসম্ভব জিনিস, কিন্তু আমি তোমাদের কৃপাতেই এই দুর্লভ জিনিসকে আমার চোখের সামনে তোমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম'।

গোপীদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, তারা শ্রীকৃষ্ণকে এতো ভালোবাসে, এখন তাদের শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগ হয়ে গেছে, তাদের ভেতরে এখন বিরহের দাবানল জ্বলছে। গোপীরা এখন চারিদিকে কৃষ্ণময় দেখছে। কি রকম? এইমাত্র যেটা আমরা দেখলাম, একটা ভ্রমর ঘুরঘুর করছে তাতেও গোপীরা দেখছে সে শ্রীকৃষ্ণ অথবা সে বুঝি শ্রীকৃষ্ণের সখা – সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ, পুরো জগতটা কৃষ্ণময়। এটা কখন হয়? যখন বিয়োগ হয়। একটু দর্শন হয়েছে, একটু মিলন হয়েছে আর তারপরেই বিয়োগ। এই বিয়োগে যে বিরহের আগুন জ্বলে উঠবে তাতেই সে চারিদিকে তাঁকেই দেখতে থাকবে। আর যখন খুব উচ্চাবস্থায় যাবে, ঠাকুরের শেষের দিকে তিনি দেখছেন সবটাই তিনিই হয়েছেন, সেই সচ্চিদানন্দই সব হয়েছেন, শুধু যেন একটা খোলস পড়ে আছে। এটা এক দিক থেকে আবার গোপীদের অন্য দিক থেকে, কিন্তু জিনিসটা এক। উদ্ধব এই কথাই গোপীদের বলছেন। এটাই সাধকের সব থেকে উচ্চতম অবস্থা, যেখানে পৌঁছালে সাধক পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখে না। উদ্ধব বলছেন 'কিন্তু তোমরা অনায়াসে সেখানে পৌঁছে গেছ। তা যাই হোক, আমি তো একটা সন্দেশ নিয়ে এসেছি, এখন এই সংবাদটুকু আমাকে বলতে দাও'।

এরপরে আত্মতত্ত্বের উপর একটা বড় আলোচনা আছে। এটাকে আমরা এখানে আর আলোচনা করছি না। উদ্ধব এর পরে বলছেন 'যে ভাবে নদীগুলো ঘুরে ঘুরে সমুদ্রে এসে পৌঁছায়, ঠিক তেমনি যারা বেদ অধ্যয়ন করেন, যোগ সাধন করেন, আত্ম-অনাত্ম বিবেক বিচার করেন, ত্যাগ তপস্যা সত্যধর্ম ইত্যাদি যাঁরা অনুশীলন করেন, যা কিছুই করছেন এর ফলে তাঁরা সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছেই চলে আসেন'। ধরুন কেউ একজন বলল আমি সত্যের অনুশীলন করব, কিংবা আমি ধর্মের অভ্যাস করব, এটাই তাকে অনায়াসে সেই শ্রীকৃষ্ণের দিকেই নিয়ে যাবে। কেন? বলছেন – এই অভ্যাস গুলো যখন করতে থাকে তখন মনকে নিরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। আর মন যখন নিরুদ্ধ হয় তখন মনটা নিজে থেকেই ঈশ্বরের দিকে চলে যায়। এই

সব যা কিছু করা তার একমাত্র প্রাথমিক লক্ষ্য মনকে নিরুদ্ধ করা। যখন বেদ অধ্যয়ণ করছে, যোগাভ্যাস করছে, জপ করছে যা কিছুই করছে এগুলো করা শুধু মনের বৃত্তিগুলোকে আটকানোর চেষ্টা, একাগ্র করার চেষ্টা। একাগ্র হয়ে গেলে ঐ মনটাই ঈশ্বরের দিকে দিয়ে দিলো। নদীগুলো যেমন সমুদ্রের দিকে যায়, ঠিক তেমনি এই সমস্ত অভ্যাস, অনুশীলন সাধককে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়।

উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ কি বলে পাঠিয়েছেন সেটাই এতক্ষণে বলছেন 'শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমি জানি আমি তোমাদের জীবনের সর্বস্ব, আমি তোমাদের জীবনের ধ্রুবতারা। আমি হলাম তোমাদের চোখের মণি। কিন্তু আমি তাও তোমাদের থেকে দূরে, কেন? এইজন্যই যে, তোমাদের ঘর সংসার আছে সেগুলো চালাতে হবে, কিন্তু তোমাদের মন যেন আমাতেই সর্বক্ষণ পড়ে থাকে। একটা কথা মনে রেখ, প্রিয়তম যখন কাছে থাকে তখন মানুষ অত মনে করে না, প্রিয়তম যখন দূরে চলে যায় তখন তার কথা বেশি মনে পড়ে। সেইজন্য তোমাদের আমার কথা এখন বেশি মনে হবে। এখন আমাতে ছাড়া যাতে আর অন্য কোথাও মন না দাও, এরই জন্য আমি তোমাদের থেকে দূরে আছি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাঽঽপুরমদ্বীর্যচিন্তয়া।।১০/৪৭/৩৭।।* তবে একটা কথা বলি, শরতের পূর্ণিমা রাতে আমরা যে রাসলীলা করেছিলাম, এটাকে মনে রেখো। যে গোপীরা স্বজনদের বাধা দানের জন্য সেদিন ব্রজেই নিজের নিজের গৃহে আবদ্ধ হয়ে থেকে গিয়েছিল, আমাদের রাসলীলায় আসতে পারেনি, তারা আমার বীর্য, সেই সময় তারা আমার গুণ, আমার কর্মাদিকে একাগ্র চিত্তে চিন্তা করতে করতে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছিল। তোমরাও আমার কথা যদি চিন্তা কর, কিভাবে আমি তোমাদের সাথে রাসলীলা করেছিলাম, তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকেই পাবে এই আশ্বাস তোমাদের দিচ্ছি, কিন্তু এই পাওয়াটা সূক্ষ্ম শরীরে পাবে'।

এত কথার বলার পর গোপীরা আস্তে আস্তে একটু শান্ত হয়েছে। তখন গোপীরা আবার নানান কথা বলছেন – যেমন জঙ্গলে আগুন লেগে সব ছাই হয়ে যায় ইন্দ্র আবার বৃষ্টি দিয়ে সব সবুজ করে দেয়, হে উদ্ধব আপনি ঠিক সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ দাবানলে দগ্ধ আমাদের জীবন দান করেছেন।

এই কাহিনী শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন। শুকদেব এতক্ষণ ধরে গোপীদের বিরহ অবস্থার কথা বর্ণনা করে খুব সুন্দর কথা বলছেন *ক্বেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ। নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ।।১০/৪৭/৫৯।।* 'দ্যাখো পরীক্ষিৎ, একদিকে কোথায় এই অশিক্ষিত, অমার্জিত, গ্রাম্য গোয়ালিনী গোপীরা, এরা বনচারিণী, কোন শাস্ত্রীয় আচারও জানে না, আর অন্য দিকে কোথায় সেই সচ্চিদানন্দ, কিন্তু কি গভীর সম্পর্ক, আমরা ধারণাও করতে পারি না। এদের ভালোবাসা কল্পনা করা যায় না'। শুকদেব এটা বলছেন না যে গোপীরা আগের জন্মে বেদের ঋচা ছিলেন কিংবা জ্ঞানমার্গী ঋষি ছিলেন, গোপীরা গ্রাম্য, অশিক্ষিতা, সরলমতি রমণী। কিছু মানুষ জাতিতে শ্রেষ্ঠ হয়, কেউ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয় আবার কেউ আচারে শ্রেষ্ঠ হয়। তিনটে দিক থেকেই গোপীরা একেবারে নিকৃষ্ট, গোয়লা অত্যন্ত নীচু জাতি, জ্ঞান, লেখাপড়া কিছু জানে না আর আচার, শাস্ত্রের আচার জানেই না। কিন্তু দেখ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এদের কী অনন্য প্রেম। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানেন না, শ্রীকৃষ্ণের গুণ জানেন না, শ্রীকৃষ্ণের রহস্য জানেন না শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে কী উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন। শুকদেব বলছেন, ভগবান তখন নিজের শক্তিতেই তাঁর সব কিছু ঠিক করে দেন আর তাঁর পরম কল্যাণ সাধন করে দেন। যেমন কেউ যদি অজান্তায় অমৃত পান করে নেয় তাতেও সে অমর হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, মিছরির রুটি আড় করেই খাও আর সিধে করেই খাও মিষ্টি লাগবে। বা অমৃত সাগরে কেউ যদি নিজে ঝাঁপ দেয় বা যদি কেউ ঠেলে ফেলে দেয় সে অমর হয়ে যাবে। ঠাকুর আবার বলছেন, বাবার বড় ছেলে বাবা বলে ডাকতে পারে, তার থেকে ছোট ছেলে বাবা বলতে পারেন, শুধু বা বলছে, আরও ছোট ছেলেটি পা বলছে, বাবা সব ছেলেকেই ভালোবাসে। এখানে এটাই দেখাচ্ছেন, তুমি উচ্চকুলের নাও হতে পার, তোমার আচার নাও থাকতে পারে, তোমার অনুকূল সাধনা নাও থাকতে পারে, কিন্তু শুধু যদি ভগবানের প্রতি তোমার অনন্য ভালোবাসা হয় তাতেই তুমি ঐ উচ্চাবস্থায় চলে যাবে, যে অবস্থায় যোগীরা যোগ করে, ঋষিরা তপস্যা করে পৌঁছে যান। কিছু লাগবে না, শুধু,

হে ঈশ্বর আমি তোমাকেই চাই, তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু চাই না, এই ভাব যদি একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীর ভাবে এসে থাকে, ভগবানই তখন তার জন্য সব কিছু ঠিক করে দেন। তুমি এমনি পেয়ে যাবে না, শুধু ভালোবাসছি বলেই পেয়ে যাবে তা না। একজন ফিল্মস্টারকেই ভালোবেসে কেউ পেয়ে যায় না, সেখানে ভগবানকে কী করে পাবে ভাবছে। ভগবান তখন করেন কি, তার পথটা ঠিক করে দেন। কিভাবে ঠিক করে দেন? এই যে এখানে গোপীদের খেলাচ্ছেন, কখন তাঁদের মাঝখানে যাচ্ছেন, কখনও তাঁদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছেন, কখন একেবারেই বাইরে চলে যাচ্ছেন, এই করে করে তাঁদের দেহবোধ, অহঙ্কার, কাম সব কিছুকে নাশ করে দিয়ে তিনিই সব কিছু ঠিক করে দেন। ঠাকুর এর আরেকটা উপমা দিচ্ছেন, কোন জমিদার যদি তার কোন কর্মচারীর বাড়ি যাবেন বলে ঠিক করেন, জমিদার আগে থেকেই তার নিজের জিনিসগুলো তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আমরা অতি সাধারণ লোক, আমাদের পক্ষে ঐ কঠোর সাধনা করা সম্ভব নয়। তখন তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন, কিন্তু তার শর্ত আছে। কি শর্ত, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী প্রেম। উদ্ধবও গোপীদের এই ভালোবাসার অভিব্যক্তি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেছে, যদিও তিনি পণ্ডিত লোক কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে ভালোবাসা সেটা এই পাণ্ডিত্য দিয়ে কোন ধারণাই করা যেতে পারে না। উদ্ধব তখন নিজে বলছেন ‘আমার পক্ষে খুব আনন্দের হয় যদি এই ব্রজভূমিতে আমি একটা ছোট গাছ হয়ে থাকি, যদি কোন লতা, গুল্মাদি বা দুর্বা হয়ে যেতে পারি, তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যাব। কেননা, এই ব্রজবালা গোপীরা যাওয়া আসা করতে গেলে তাদের স্পর্শ পাবো, তাদের চরণের ধুলি আমার উপর পড়বে তাতেই আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি এমনিতেই দুর্লভ কিন্তু গোপীদের যে ভক্তি আর অনুরাগ, ভক্তির যে পরাকাষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, যে নিষ্টার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন এ জিনিস জগতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না, এই গোপীদের চরণ ধুলি যাতে আমি পেতে পারি, তাই এই ব্রজধামে আমি একটা সামান্য দুর্বাঘাস, বা ছোট গাছ হয়ে থাকতে চাই’। উদ্ধব এখানে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য কামনা করছেন না, চাইছেন গোপীদের চরণরেণুর স্পর্শ। গোপীদের চরণরেণু স্পর্শ পেতে হলে কি হতে হবে, বৃন্দাবনের ছোট গুল্মলতা বা দুর্বা, আমার উপর দিয়ে গোপীরা যাওয়া আসা করবে, তাতে তাঁদের চরণস্পর্শ পাবো, আমার জীবন তাতেই ধন্য হয়ে যাবে। উদ্ধব তিনি একজন ঋষি, তিনি বলছেন আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে যদি গোপীদের চরণরেণুর স্পর্শ পাই। উদ্ধব শেষে বলছেন, ‘শ্রুতি, যে ভগবানের নিঃশ্বাস স্বরূপ, যে ভগবদবাণী রূপে মূর্ত, সেই শ্রুতিও ভগবানকে পায় না’। অর্থাৎ বেদ, বেদের জ্ঞান যাঁদের আছে এরা কেউই ভগবানকে পান না, অথচ গ্রামের অশিক্ষিত, গ্রাম্য ললনারা, তাদের না আছে কোন আহামরি রূপ, না আছে কোন সংস্কৃতি কিন্তু শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেই শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে গেল। এখন যে বর্ণনা চলছে পুরোপুরি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কথা চলছে, এখন আর মানুষ কৃষ্ণ নেই। উদ্ধবের এই কথাগুলো শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলছেন।

পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন – দ্যাখো, এই গোপীরা ধন্য, কেননা স্বজনদের ত্যাগ করা খুব মুশকিল, নিজের বাড়ির লোকেরা, আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। তার থেকেও কঠিণ, লোক মর্যাদা, ধর্ম যেটা বলে দিয়েছে এটা করো না, তার অর্থ হচ্ছে কিছু কিছু আমরা ধর্মমতে কাজ করি আবার কিছু কিছু লোকমতে কাজ করি। ধর্মমত মানে শাস্ত্র যেটা বলে দিয়েছে এটা করবে না, সেটা করতে নেই, লোকমত মানে কিছু পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি আছে, কিছু জিনিস করতে হয় কিছু জিনিস করতে নেই, এগুলোও করতে হয়, কিন্তু এই রীতিনীতি গুলো আবার কালের নিয়মে পাল্টে যায়। বলছেন – গোপীরা এই সমস্ত মর্যাদাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, ধর্মের মর্যাদাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, লোক মর্যাদাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই যে প্রীতি, ভালোবাসা, অনুরাগ, প্রেম এটাকি মানুষের পক্ষে সম্ভব! একজন একজনকে ভালোবাসতে পারে কিন্তু সব ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে, এটা সম্ভব নয়। শুকদেব বলছেন – গোপীরা হলেন ভগবানের পদবী। এখানে পদবী এই অর্থে বলা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে সমান, equality। তাঁর সঙ্গে তন্ময়তা, একাত্ম বোধ আর পরমা প্রেম – এই তিনটে জিনিস গোপীরা পেয়ে গেছেন তাই ভগবানের সঙ্গে তাঁদের আর কোন ভেদ নেই। অন্যের কথা বাদ দাও, ভগবানের যিনি নিঃশ্বাস সেই বেদ, শ্রুতি এঁরাও খুঁজে বেড়াচ্ছেন

ভগবানের ভালোবাসাকে, এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে। আসলে বেদে ভক্তির কোন উল্লেখ নেই, শুকদেব এই ব্যাপারটাকেই বলতে চাইছেন। তাই বলছেন এই শ্রুতি ভগবানের ভালোবাসাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু এখনও খুঁজে পায়নি। অথচ এই গোপীরা কত সহজে ভগবানের ভালোবাসাকে পেয়ে গেল। অনেকে বলে, বেদের ঋচাগুলো একদিন ভগবানকে বলছে – আমরাতো আপনার সব কিছু করলাম কিন্তু আপনার যে গুণগান, আপনার প্রতি যে ভক্তি সেইটা করতে পারলাম না, তাই আমরা আর পবিত্র হতে পারলাম না। তখন ভগবান তাদের বলে দিলেন – আমি যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে আসব তখন তোমরা গোপী হয়ে এসো। এই গোপীরূপে তোমরা আমাকে যে ভক্তি করবে তাতেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে।

কথামৃতে আছে, রাসলীলার সময় একজন গোপী বলছেন আমি কৃষ্ণ হয়েছি, তিনি কৃষ্ণ প্রেমে এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক করে ফেলেছেন। শুকদেব বলছেন – ভগবানের প্রতি ভালোবাসায়, প্রেমে এই তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে নিজেকে এক করে ফেলা, এ জিনিস তুমি বড় বড় ঋষি মুনিদের কথা বাদ দাও, বেদের যে ঋচা যারা ভগবানের প্রতিপাদ্য, ভগবানকে যিনি দেখিয়ে দেন, ভগবানের বাচক, তাঁরাও কিন্তু ভগবানের প্রতি এই ভক্তি, ভালোবাসা পান না। আর আনপড়, গেঁয়ো গোপীরা এই ভালোবাসা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের এক করে ফেলেছিলেন। আমরা খুব সংক্ষেপে এই অধ্যায়টা আলোচনা করলাম। কথামৃতে যখনই গোপীদের ভালোবাসার কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন হত তখনই ঠাকুরের চোখ দিয়ে জল পড়ত, আবার কখন সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। আধ্যাত্মিক জগতে এটা এক খুব উচ্চ অবস্থা যেখানে ঈশ্বরের প্রতি গোপীদের মত ভালোবাসা হয়।

আমরা এখনও দশম স্কন্ধেই আছি। দশম স্কন্ধ আবার দুটো ভাগে দেওয়া হয়েছে। প্রথম ভাগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে মোটামুটি তাঁর মথুরায় আগমন পর্যন্ত। কংস বধের পর যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় সেই অংশকে আরেকটা ভাগে দেওয়া হয়েছে, এই অংশের নাম উত্তরার্ধ। কংস মারা যাওয়ার খবর পাওয়ার পর কংসের সম্বন্ধী জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে মেরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বার বার মথুরার উপর আক্রমণ করতে লাগলেন। জরাসন্ধ যত বারই আক্রমণ করে ততবারই পরাজিত হয়ে ফেরত চলে আসত। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করতেন। জরাসন্ধের বার বার আক্রমণে শ্রীকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন মথুরাতে থেকে লাভ নেই, এখানে থাকলে যুদ্ধ-বিগ্রহেই সব শক্তি, অর্থ, সময় চলে যাবে, তার থেকে ভালো হবে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে থাকা। শ্রীকৃষ্ণ তখন সবাইকে মথুরা থেকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন দ্বারকায়।

মুচকুন্দ উপাখ্যান

দ্বারকাতে চলে আসার পর কালযবন নামে এক খুব বড় বীরযোদ্ধা ছিল, সে চাইছিল যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে বধ করে দিতে। কাল যবনের মনে কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ ছিল। এই কালযবনকে নিয়ে এখানে একটা কাহিনী শুরু হয়। এর মূল চরিত্র মুচকুন্দ। এই কাহিনীর জন্য শ্রীকৃষ্ণের আরেকটা নাম হয়েছে রণছোড়। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজীর পুরো নাম ছিল মোরারজী ভাই রণছোড়জী দেশাই। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধভূমি থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল রণছোড়। এই কাহিনীতে কালযবন বলে এক অসুর ছিল। আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল কালযবন বলতে ঠিক কি বোঝায়। যবন মানে গ্রীক। কালযবন মানে খুব হিংস্র গ্রীক। আলেকজাণ্ডার আসার পরেই ভারতে গ্রীকদের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। ভাগবতে যবনদের কথার উল্লেখ দেখে অনেকে এই মীমাংসায় আসেন যে, তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে ভাগবত লেখা হয়েছে। কারণ ওই সময় আলেকজাণ্ডার ভারতের উপর আক্রমণ করেছিলেন। তা নাহলে কালযবনের এই চরিত্র ভাগবতে আসতো না। আমরা এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে যাচ্ছি না। যাঁরা মহাকাব্য রচনা করেন তাঁরা অনেক সময় নিজের কল্পনা, কিছু শোনা কথাকে নিজের মত করে রচনা করে একটা রূপ দিয়ে দেন।

কালযবন খুব শক্তিমান যোদ্ধা ছিল। দেবর্ষি নারদ আবার কালযবনকে খুব তাতিয়ে দিয়েছেন – তোমার মত যোদ্ধার সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই রাখেন। নারদ আবার শ্রীকৃষ্ণের চেহারার বর্ণনা

বলে দিয়েছেন যাতে সহজে কালযবন শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারে। বিষ্ণুর যে আসল রূপ সেই রূপেরই বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণও মনে মনে ঠিক করলেন কালযবনকে মাধ্যম করে একটা বড় কাজ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, কালযবনের সাথে মিছিমিছি যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই, অকারণে কিছু সৈন্য ও লোকক্ষয় হবে। উনি কায়দা করে একদিন কালযবনকে তাঁর বিষ্ণুর রূপটা দেখিয়ে দিলেন। কালযবনকে রূপটা দেখিয়ে যুদ্ধভূমি থেকে এমন ভাবে পালাতে শুরু করলেন মনে হবে যেন তিনি কালযবন থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে ছাইছেন। আর এমন ভাবে পালাচ্ছেন যাতে কালযবন দেখতে পায় যে শ্রীকৃষ্ণ তার ভয়ে পালাচ্ছেন। এই কাহিনীকে পরে অনেকে খুব হাস্যরসাত্মক ভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সব সময় পীতাম্বর পরিধান করতেন। দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ নিজের পীতাম্বর পরিধান করে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে, কখন পাহাড়ের উপত্যাকা দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। আর কালযবন তাঁর পেছন পেছন ধাওয়া করছে আর চেঁচিয়ে চলেছে – কেন পালাচ্ছ, কোথায় পালাচ্ছ, দাঁড়াও, তোমার এত নাম শুনেছি, যদুবংশে তোমার জন্ম, তোমার শৌর্য-বীর্য দেখাও, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর আমার সাথে। কালযবনের যুদ্ধ করার থেকে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। এমন ভাবে পালাচ্ছেন দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি কালযবন শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলল। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু থামছেন না, ময়দান থেকে পালিয়ে পালিয়ে চলেছেন। সবাই ভাবছে শ্রীকৃষ্ণ এটা কি করলেন।

এইভাবে পালিয়ে পালিয়ে শ্রীকৃষ্ণ একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। সেই গুহার মধ্যে তখন মুচকুন্দ নামে এক রাজা নিদ্রা যাচ্ছিলেন। মুচকুন্দ ছিলেন মান্ধাতার পুত্র। একবার দেবাসুর সংগ্রামে মুচকুন্দ দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করে অসুরদের পরাস্ত করেন। তখন দেবতারা খুব খুশী হয়ে রাজা মুচকুন্দকে বললেন – আপনি আমাদের হয়ে এত বড় একটা কাজ উদ্ধার করলেন আপনি একটা বর চেয়ে নিন। মুচকুন্দ বললেন – দেখুন! এতদিন যুদ্ধ করে আমি খুব ক্লান্ত, আমি এখন একটু শান্তিতে কয়েক দিন ঘুমোতে চাই, আপনারা তাই আমাকে এই বর দিন যাতে আমি যেন খুব ভালো করে ঘুমাতে পারি। আর কোন মুর্খ যদি আমার ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় তাহলে তার দিকে আমি তাকালেই সে যেন ভষ্ম হয়ে যায়। দেবতারা বলল – আমরা যখন বলেছি বর দেব, ঠিক আছে এটাই হবে, কিন্তু এটা কি একটা কোন বর হল! আপনি এত বড় কাজ করলেন, আপনি এর থেকে ভালো কিছু বর চান। মুচকুন্দ তারপর একটু চিন্তা ভাবনা করে বললেন – ঠিক আছে, আমার যেন তারপরেই ইষ্ট দর্শন হয়।

মহাভারত বা ভাগবতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র পাই, তাতে দেখতে পাই, যে জিনিসগুলো কখনই ঘটতে পারে না, ঘটানও যায় না, সেগুলোই শ্রীকৃষ্ণ অবলীলায় ঘটিয়ে দেন। ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন – একজনের খুব কঠিন ব্যাধি হয়েছে। বাঁচবার আশা প্রায় নেই। বৈদ্য এসে বলছে একে যদি স্বাতি নক্ষত্রের জল, সেই জল মড়ার খুলিতে জমবে, সেই সময় একটা ব্যাঙ লাফাবে, তখন একটা সাপ ব্যাঙটাকে খেতে আসবে, সাপ ছোবল মারতেই ব্যাঙটা লাফিয়ে বেঁচে যাবে কিন্তু সাপের বিষটা সেই মড়ার খুলির মধ্যে স্বাতি নক্ষত্রের জমা জলে পড়বে, সেই জল এনে যদি খাওয়ানো যায় তবেই একে বাঁচানো যাবে। এরপর পরিবারের আপনজন স্বাতী নক্ষত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। দেখছে বৃষ্টিও পড়ছে। কিছু দূর এগিয়ে একটা মড়ার খুলিও দেখতে পেল, ওর মধ্যে জলও জমেছে। সে তখন খুব ব্যাকুল হয়ে বলছে 'হে ঠাকুর! এত কিছু করে দিলে এবার বাকিটুকুও করে দাও'। তারপর দেখে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। ব্যাঙ দেখেই লোকটি খুব জোর গলায় বলছে 'ঠাকুর! কৃপা কর, কৃপা কর'। ঠিক তখনই একটা কালসাপ কোথা থেকে এসে গেছে। সাপটাও ব্যাঙটাকে খাবার জন্য ছোবল দিতে যাবে আর ব্যাঙটা লাফ দিয়েছে, আর বিষটা গিয়ে পড়ল মড়ার খুলিতে। লোকটির তখন খুব আনন্দ। এরপর ঠাকুর কিন্তু বলছেন না যে লোকটির ব্যাধি সারলো কি সারলো না। আগেকার দিনের বৈদ্যরা রোগ সারাবার জন্য এমন এমন নিদান দিতেন যে ওগুলো জোগাড় করাই অসম্ভব ছিল। রোগী মারা গেলে বৈদ্য বলতে পারতো – তুমি তো আমার কথা মত ওষুধ আনতে পারলে না বলে রোগীকে বাঁচানো গেলো না।

শ্রীকৃষ্ণও এই রকম বিচিত্র বিচিত্র অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করে দিতেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই যে পালাতে শুরু করেছিলেন, ঐভাবে পালাতে পালাতে মুচকুন্দ যে গুহায় ঘুমাচ্ছিলেন সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে ঘুমন্ত

মুচকুন্দের শরীরের উপর তাঁর পীতাম্বর চাদরটা চাপা দিয়ে মুচকুন্দের পালঙ্কের তলায় নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন। বলছেন – যিনি যোগীদেরও দুর্লভ, যোগীরাও যাঁকে পায় না, তাঁকে ধরার জন্য কালযবন দৌড়াচ্ছে, সে কি কখন যোগীশ্বরের নাগাল পায়! কালযবন তাড়া করতে করতে সেও ঐ গুহার মধ্যে ঢুকেছে। ঢুকে দেখছে একজন লোক পীতাম্বর গায়ে চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে দেখে কালযবন বলছে – ব্যাটা আমাকে এত দৌড় করিয়ে নিয়ে এসে এখানে ঘুমোচ্ছে! ব্যাটা এখন সাধুবাবা সেজেছে। এই বলে কালযবন মুচকুন্দের গায়ে জোড় এক পদাঘাত করেছে। মুচকুন্দ এত দিন ধরে ঘুমিয়ে আছে। তার গায়ে লাথি মারার পর সে বুঝতে পারছে না, কি হচ্ছে। চোখও খুলতে পারছে না, আস্তে আস্তে চোখটা একটু ফাঁক হওয়াতে দেখতে পাচ্ছেন একটা বিদ্‌ঘুটে লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখার পর ধীরে ধীরে তাঁর শরীরে ক্রোধ উৎপন্ন হতে লাগল। ক্রোধ উৎপন্ন হতেই ওখানেই কালযবন পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণকে আর লড়াই টড়াই করতে হল না, কালযবন ঐখানেই শেষ হয়ে গেল।

এই ঘটনা হয়ে যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ আস্তে করে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন। মুচকুন্দ কিছুই বুঝতে পারছেন না। এত দিনের ঘুম কিনা। একজন ভষ্ম হয়ে গেল, আরেক জন তার খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল, সে অবাক বিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন। মুচকুন্দ ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের মান্ধাতা রাজার সন্তান। দেবতাদের দেওয়া বর সেটাও এখন পূর্ণ হয়ে গেল। আর তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও কাজ হয়ে গেল, যুদ্ধ না করে, কোন প্রাণহানি না ঘটিয়ে তাঁর কার্য সিদ্ধি হয়ে গেল, যদিও শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর যাদব সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এখানে তিনি যুদ্ধ না করেই একটা যুদ্ধকে জয় করে নিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে কোন প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন না। দেবতারা মুচকুন্দকে বর দিয়েছিলেন, আর দেবতারা হলেন ভগবানের বিশেষ প্রিয়, যেহেতু তাঁর বিশেষ প্রিয় তাই দেবতাদের স্বার্থে শ্রীকৃষ্ণ এই অসম্ভব কার্যের সমাধান করে দিলেন। আর সেখান থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল রণছোড়জী, যুদ্ধের ময়দান থেকে যিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন পালিয়েছিলেন কেউ জানত না, পালানোর কারণ এটাই, দেবতাদের দেওয়া কথা যেন সিদ্ধ হয়। মুচকুন্দ তখন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন 'হে প্রভু! আমি আপনার জন্ম, আপনার কর্ম, আপনার গোত্র এগুলো জানার আগ্রহ প্রকাশ করছি। আপনি আমাকে একটু আপনার কথা বলুন। কারণ দেবতারা আমাকে বর দিয়েছিলেন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেই আমার ইষ্ট দর্শন হবে। আপনার পরম দিব্য ও বিপুল তেজ আমার সমস্ত শক্তিকে গ্রাস করে নিচ্ছে, আমি আপনার দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছি না। তখন শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর কথা বলছেন *জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মেহঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেহনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি।।১০/৫১/৩৭।* আমার হাজারটি নাম, হাজারটি জন্ম, হাজারটি কর্ম আছে, এই অনন্ত নাম, অনন্ত জন্ম আর অনন্ত কর্ম হওয়ার জন্য গণনা করে আমার নাম, আমার জন্ম, আমার কর্ম বলা সম্ভব নয়। গীতাতেও ভগবান ঠিক একই কথা বলছেন – *বহূনি মে ব্যাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন*। হে অর্জুন! তোমার ও আমার এর আগে অনেক জন্ম হয়েছে। কিন্তু *তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ*, আমি কবে কখন কোথায় কীভাবে জন্ম নিয়েছি সব আমার মনে আছে কিন্তু অর্জুন তোমার কিছুই মনে নেই। কেন আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মনে নেই? শ্রীকৃষ্ণের কি করে মনে আছে? আমাদের যে জন্ম হয় সেটা অজ্ঞানজনিত কারণে, কিন্তু ভগবান যখন জন্ম নেন তখন তিনি নিজের ইচ্ছাতে লীলাখেলার জন্য করছেন বলে সবটাই তাঁর মনে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ মুচকন্দকে বলছেন, সনক, সনন্দাদি ঋষিরা সর্বদা আমার লীলা বর্ণনা করে যাচ্ছেন কিন্তু আমার লীলার বর্ণনা তাঁরাও শেষ করতে পারছেন না। তবে তোমাকে সংক্ষেপে বলছি – এবার আমি বসুদেবের গৃহে জন্ম নিয়েছি, সেইজন আমার নাম বাসুদেব। এই কালযবন আমারই প্রেরণায় তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ জীবনের এটি একটি খুব মজার লীলাকাহিনী, যেখানে তিনি যুদ্ধ ভূমি থেকে পালিয়েছিলেন।

রুক্মিণী ও জাম্ববতীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী

এরপর পর পর কয়েকটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে যাদের বিবাহ হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন রুক্মিণীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ। রুক্মিণীর দাদা ছিলেন রাজা রুক্মী। রাজা রুক্মী তার বোন রুক্মিণীর

বিবাহ শিশুপালের সঙ্গে দেবেন বলে আগে থেকেই মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার আগেই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন খবর পেয়ে রুক্মিণীর দাদা ও শিশুপালরা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে। তখন তিনি শিশুপালদের পরাজিত করে রুক্মিণীকে নিয়ে দ্বারকায় চলে এসেছেন। ভাগবতের একটা বিবরণ অনুযায়ী রুক্মিণী নাকি এক ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে একটা চিঠি পাঠিয়ে তাঁর মনের অভিলাষ জানিয়েছিলেন – আমি মন প্রাণ দিয়ে আপনাকেই চাই, আপনি আমাকে বরণ করে নিন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী যখন মন্দির থেকে পূজো দিয়ে ফিরছিল, রাস্থা থেকেই সব রাজা ও রক্ষীদের সামনে থেকে রুক্মিণীকে রথে তুলে নিয়ে দ্বারকায় এসে শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ করেন।

এরপরে জাম্ববতীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়। সত্রাজিৎএর কাছে স্যমন্তক মণি ছিল, সেই মণি হারিয়ে যাওয়ার পর সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করেছিল। স্যমন্তক মণি যার কাছে থাকতো সে নাকি রোজ আট ভার করে স্বর্ণমুদ্রা লাভ করতো। তাই যার কাছে স্যমন্তক মণি থাকতো সে বিরাট বড়লোক হয়ে যেত। স্যমন্তক মণি চুরি হওয়ার কলঙ্ক স্খালন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মণি উদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। খোঁজ করতে করতে গভীর জঙ্গলে চলে গেছেন। জঙ্গলে গিয়ে দেখেন কয়েকটি ভাল্লুকের বাচ্চা স্যমন্তক মণি নিয়ে খেলা করছে। শ্রীকৃষ্ণ বাচ্চাদের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি নিতে গেলে বাচ্চাগুলো চেঁচাতে শুরু করেছে। ভাল্লুকের বাচ্চাদের চেঁচামেচি শুনে জাম্বোবান ছুটে এসেছেন। এই সেই জাম্বোবান, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সময় সমস্ত ভাল্লুকদের নিয়ে লঙ্কায় রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণের সাথে জাম্বোবানের লড়াই শুরু হয়েছে। জাম্বোবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত, কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না। লড়াইয়ের কোন নিষ্পত্তি হচ্ছে না দেখে শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের রাম রূপ জাম্বোবানকে দেখিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুর্তি দেখে জাম্বোবান বিস্মিত হয়ে গেছেন – আমি এ কি করছি! যিনি আমার ইষ্ট আমি তাঁর সাথে লড়াই করছি! তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চেয়ে স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলে দিলেন আর নিজের মেয়ে জাম্ববতীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ দিলেন। জাম্বোবান ছিলেন ভাল্লুক, তাহলে তাঁর মেয়ে কি রকম দেখতে হবে? এটাই কাব্যগ্রন্থের মাহাত্ম্য, এগুলোকে নিয়ে কবি খেলা করেন। কখন যে এই চরিত্র একটা জাতি হয়ে যাবে, কখন যে পশু হয়ে যাবে, এই জিনিসটা কবি আমাদের কিছুতেই বুঝতে দেবেন না। ভাল্লুক পশুকে কবি এখানে জাতি বানিয়ে দিলেন, জাতি বানিয়ে দিলে এবার তাঁর মেয়েকে বিয়ে করা যাবে। আর লড়াই যুদ্ধ যা হয়েছে সেটা আবার ভাল্লুক পশু রূপে দেখানো হয়েছে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বিবাহের বর্ণনা করা হয়েছে।

ভৌমাসুর ও শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রীর কাহিনী

এরপরে আসে ভৌমাসুর কাহিনী। ভৌমাসুর নামে এক শক্তিশালী অসুর ছিল, সে তখনকার সময়ের সব রাজাদের হারিয়ে দিয়ে তাদের বাড়ির সব মেয়েদের নিয়ে এসে নিজের রাজপ্রাসাদে বন্দী করে রেখেছিল। পৃথিবীতে অনাচার বেড়ে গিয়েছিল বলেই পৃথিবী প্রার্থনা করেছিলেন পাপের ভার লাঘব করার জন্য। এখন এই অনাচারকেও মেটাতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ তখন একটা লড়াই করে এই ভৌমাসুরকে বধ করে দিলেন। ভৌমাসুর যে সব রাজকুমারীদের বন্দী করে রেখেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ষোল হাজার। এখন এরা ছাড়া পেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই মনে মনে তাকেই তাদের স্বামী রূপে গ্রহণ করল, তারা বলল শ্রীকৃষ্ণই আমাদের স্বামী হবেন। এই মেয়েরা এত দিন অন্য এক রাজার বাড়িতে বন্দি ছিল, এখন এদের কে বিয়ে করবে, এরা কতটা শুদ্ধ আছে কে বলবে! তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন – ঠিক আছে চিন্তার কিছু নেই, আমিই এদের সবাইকে বিয়ে করে সবার দেখাশোনা করব। এই ষোল হাজার নারীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামে অনেক অনেক রকম মন্তব্য করে। আসলে ভৌমাসুরের বন্দিনী হয়ে কলঙ্কের অপবাদ মাথায় নিয়ে ফিরে এল। এদের আর কোন গতি নেই দেখে শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার রাজকুমারীদের নিজের স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীরা সবাই ছিলেন লক্ষ্মী অংশস্বরূপা। সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করার সময় আমরা মায়া আর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি এই শব্দগুলো পেয়েছিলাম। ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি বা তাঁর মায়া। শ্রীমতি রাধা ছিলেন ভগবানের শক্তি, কিন্তু রুক্মিণীকে বলা হয় লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা। লক্ষ্মী আর শক্তি এই দুটোর মধ্যে

পার্থক্য আছে। এখানে এসে ভাগবত নিজেকে যেন একটু জট পাকিয়ে ফেলে। আর সমগ্র পুরাণে এই জটিলতাটা বরাবরই থেকে গেছে। পুরাণ কোথাও লক্ষ্মীকে শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে না। শ্রীশ্রীমাকে আমরা জানি তিনি ঠাকুরের শক্তি, অন্য দিকে শ্রীশ্রীমা বলছেন 'আমি এখন হয়তো বৈকুন্ঠে তাঁর পদসেবা করতাম', তার মানে তিনি নিজেকে লক্ষ্মী বলছেন। গানেতেও আছে 'বৈকুন্ঠ থেকে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর এই মাটিতে'। এখানে লক্ষ্মী আর শক্তিকে সমান করে দেখা হচ্ছে। পুরাণে কিন্তু পার্থক্য করে দিয়েছে। পুরাণে লক্ষ্মী খুব সাধারণ একজন দেবী মাত্র। সরস্বতী যেমন বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী ঠিক তেমনি ঐশ্বর্যের দেবী। লক্ষ্মী আর শক্তি বা প্রকৃতি বা মায়া এই দুটোর পার্থক্য আছে। কিন্তু পরবর্তি কালের যে শাস্ত্রগুলি এসেছে সেখানে এই দুজন আবার এক হয়ে গেছেন। দুটোকে যদি এক করে দেওয়া হয় তাহলেও শ্রীরাধা আর রুক্মিণী কে নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। শ্রীরাধা প্রভুর শক্তি আর রুক্মিণী লক্ষ্মীর অবতার। সীতার ক্ষেত্রে কোথাও কখন কখন তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিও বলা হয়েছে আবার কখন তাঁকে লক্ষ্মী রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে।

এই গণ্ডগোলটা আমাদের শাস্ত্রেই আছে। তবে এগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তর্কবিতর্কে যেতে নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, যেখানেই সগুণ সাকার আসবে সেখানেই নানা রকমের জটিলতা আসবে। খ্রীশ্চানিটির সর্বনাশ হয়ে গেল শুধু এই সগুণ সাকারের জন্য। ইসলামে তো সগুণ সাকার করতে গিয়ে আরও তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু খ্রীশ্চানে নির্গুণ নিরাকার আছে, ইসলামে শুরুই হয়েছিল নির্গুণ নিরাকার দিয়ে। নির্গুণ নিরাকারের সমস্যা হল সাধারণ মানুষ ধরে রাখতে পারে না। তখন এই ধর্মগুলো নির্গুণ নিরাকারকে বানিয়ে দেয় all in all অথবা সগুণ নিরাকার। সগুণ নিরাকার যখন হল তখন আরো সর্বনাশ। ব্রাহ্মরা এই সগুণ নিরাকারকে নিয়েই চলেছে, তিনি নিরাকার কিন্তু সগুণ। যেমনি ভগবানের গুণ নিয়ে আসা হবে আর আকার দিয়ে দেওয়া হবে তাহলে বুঝে নিন, আজ হোক বা কাল হোক সেই ধর্মে জটিলতা আসবেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা। হিন্দুরা এই কারণে দুটোকে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। তুমি কি চাও? ভক্তি চাও না জ্ঞান চাও? যদি ভক্তি চাও সগুণ সাকারের দিকে যাও। যদি জ্ঞান চাও নির্গুণ নিরাকারের দিকে যাও। আগেকার দিনে লোকেরা এগুলো গ্রাহ্যই করতো না, কিন্তু পরে গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে দেখছে যে ঐভাবে গেলে ধর্মকে ধরে রাখাতে গিয়ে প্রচুর সমস্যা এসে যাবে। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসেছে শুধু হিন্দু ধর্ম আর কিছুটা বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধরা কায়দা করে সগুণ সাকার বা Personal God কে নিয়ে এল অবতার রূপে।

একটা মজার ঘটনা আছে। দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর একজন সেবক ছিলেন। সেবক প্রভু মহারাজের খুব সেবা করেছিলেন। প্রভু মহারাজ একদিন চুপচাপ তন্ময় হয়ে বসে আছেন, সেই সময় সেবক গিয়ে প্রভু মহারাজকে বলছেন 'মহারাজ, আপনাকে কি আর শরীর ধারণ করতে হবে'? সাধুদের মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সেবক জিজ্ঞেস করছেন 'মহারাজ আপনি দশম প্রেসিডেন্ট, আপনাকেও কি আবার শরীর ধারণ করতে হবে'? প্রভু মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলছেন 'ঠাকুর আর মা, এনারা যদি আবার আসেন তাহলে আমাকেও আসতে হবে'। সেবক তখন বলছেন 'মহারাজ আপনি এলে আমাকেও তো আসতেই হবে, আমার তো আর পথ নেই'। ঠাকুরের যে ষোল জন পার্ষদ, শিষ্য, তারপরেই অধ্যক্ষ মহারাজদের স্থান, যাঁরা ঠাকুরের বিশেষ কাজ করছেন। এখন সেবকের যিনি প্রিয়, তিনিও সেবক মহারাজকে বলবেন – মহারাজ আপনি যদি আসেন তাহলে আমাকেও আসতে হবে আপনাকে দেখার জন্য। তাহলে শেষমেষ মুক্তিতো কারুরই হবে না। সগুণ সাকারে এই সমস্যা হয়ে যায়। ঠাকুরকে একজন বলছে, মহাশয় কেশব যদি এই হয় তাহলে আপনি কে? ঠাকুর বলছেন আমি হলাম তাঁদের চরণের রেণুর রেণু। এগুলোকে যখন বড্ড বেশী করে কচলানো হয়, আপনি যদি এই হন তাহলে ঠাকুর কে, ঠাকুর যদি এই হয় তাহলে শ্রীমা কে, শ্রীমা যদি এই হন তাহলে স্বামীজী কি? তখন নিজের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ছিটকে গিয়ে এগুলোর মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। সগুণ সাকারের এই এক বিশাল সমস্যা। একটা অবস্থার পর বেশী যেতে নেই।

শ্রীরাধা আর রুক্মিণী এদের কে শক্তি, কে লক্ষ্মী কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এগুলোকে বেশী নাড়াচাড়া করতে গেলে সব গুলিয়ে যাবে। ঠাকুরের কাছে একবার একজন ছবি এঁকে চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ বোঝাচ্ছিলেন, ঠাকুর বলছেন 'বন্ধ কর, আমার মাথা ঝিমঝিম করছে'। সগুণ সাকারে যখন লক্ষ্মী বা শক্তি শ্রীরাধার কথা বলা

হয় তখন এগুলো বলাই হয় ভক্তির জন্য। বৃন্দাবনে সব কিছুতেই সবাই, এমন কি রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা সবাই বলবে 'রাধে' 'রাধে'। মানে আমাদের ভক্তি সেই শ্রীরাধার প্রতি, আমি সেই পরমা শক্তির আরাধনা করছি। এর বেশী হিসাব মেলাতে নেই। এর বেশী হিসেব কষতে গেলেই সমস্যা এসে যাবে, তখন এদিকেও হবে না ওদিকেও হবে না। মূল কথা রুক্মিণী হলেন লক্ষ্মী।

সমুদ্র মন্থনের সময় লক্ষ্মী জন্ম নিয়েছিলেন সমুদ্র থেকে। এটাই শক্তি আর লক্ষ্মীর মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য। শক্তি সব সময় ঈশ্বরের সঙ্গেই থাকেন কিন্তু লক্ষ্মীকে পরে জন্ম নিতে হয়েছে। লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে জন্ম নিয়েই সবার দিকে তাকাচ্ছেন কার কাছে আমি যাব, কে আমার উপযুক্ত। কিন্তু শক্তি হলে সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর দিকে চলে যেতেন। লক্ষ্মী প্রথমে ঋষিদের পছন্দ করলেন কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন এদেরও কিছু ঘাটতি আছে। সব দেখার পর শেষে ভগবান বিষ্ণুর কাছেই গেলেন। বিষ্ণুকে নিয়ে লক্ষ্মীর আবার এক সমস্যা হয়ে গেল। সবাই লক্ষ্মীকে নিজের সঙ্গিনী রূপে চাইছেন, অন্য দিকে বিষ্ণু লক্ষ্মীকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। বিষ্ণু পাত্তা দিচ্ছেন না বলে লক্ষ্মী তাঁর দিকে আরো বেশী আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পেছন পেছন ঘুরতে শুরু করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী সংবাদ

রুক্মিণীর ভাই রুক্মী ছিল কৃষ্ণ বিদ্বেষী, সে তার বোনের বিয়ে ঠিক করে রেখেছিল শিশুপালের সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণ কায়দা করে রুক্মিণীকে খবর পাঠিয়ে মন্দিরে পূজা দিতে নিয়ে এসেছেন, রুক্মিণী পূজো দিতে এসেছে আর সেখান থেকে তাকে হরণ করে পালিয়েছেন। পরে সেই রুক্মিণীর মধ্যে একটু যেন অহংকার হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের যত রানী আছেন আমি হলাম তাঁর সব থেকে প্রিয়। রুক্মিনী ঈশ্বরের শক্তি নয় কিনা, তাই অহঙ্কার এসেছে। দু পয়সার ভিক্ষুকদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ খবর পাঠিয়েছিলেন কিনা, কিন্তু এনারা যে ঋষি ছিলেন রুক্মিণী বুঝতে পারেননি। লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা হলে কি হবে, হিংসাটা থেকেই যায়। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলছেন 'শোন রুক্মিণী! তোমার স্বয়ম্বরাতে কত বড় বড় রাজারাই এসেছিলেন, তাঁরা রূপে, ঐশ্বর্যে আমার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। তোমার বাবা, তোমার ভাই তোমাকে শিশুপালের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। শিশুপালও তোমাকে পাওয়ার জন্য কামোন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল। এদের ছেড়ে তুমি কেন যে আমাকে বিয়ে করতে চাইলে, তাদের মধ্যে তুমি যাকে খুশী বরণ করে নিলে পারতে'। ভাগবতের এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনেক কথা রুক্মিণীকে বলে যাচ্ছেন। 'আমার আবার যত শক্তিমান রাজাদের সাথে শত্রুতা। আমরা যে কোন পথের অনুগামী আর আমাদের মার্গ যে ঠিক কি তাই জানিনা। আর সব থেকে বাজে ব্যাপার হল আমি লোকব্যবহার একেবারেই জানিনা'। শ্রীকৃষ্ণ এই লোকব্যবহারের কথা কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'আমাদের কাছে অর্থবল নেই কিন্তু আত্মবল সব সময়ই আছে। মেয়েদের সাথে কীভাবে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলতে হয় সেটাও আমার জানা নেই। এই রকম একজন মানুষের পেছনে কেন চলে এলে বল তো? যারা কাঙাল, যাদের কাছে কিছু নেই, আর কোনদিন কিছু হবেও না, আমার যত বন্ধুত্ব তাদের সাথে। তুমি তো ভুলবশতঃ একটা ভিক্ষুককে বিয়ে করে নিয়েছ। *অথাত্মনোহনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্। যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে।।১০/৬০/১৭।* 'দেখো! এখনও বেশী কিছু ক্ষতি হয়নি। আমি তো তোমার ইহকাল পরকাল সব শেষ করে দিয়েছি, তা তুমি এখন এক কাজ কর, এখনও সময় আছে তুমি উপযুক্ত কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে বরণ করে নাও, তাতে তোমার ইহলোক আর পরলোকের সব আশা-আকাঙ্খা পূরণ হয়ে যাবে'। এই শ্লোকটা খুব মজার একটি শ্লোক, এখনও অনেকে মনে করে যে আগেকার দিনে দ্বিতীয় বিবাহের প্রথা ভারতে ছিল না। এই কথা কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রও সীতাকে বলছেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে রাবণের ডেরা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন তখন তিনি সবার সামনেই সীতাকে বলেছিলেন 'হে সীতা! আমি হলাম ক্ষত্রিয়, রাবণ তোমাকে অপহরণ করে আমার পৌরুষে খোঁচা দিয়েছিল, তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি তাকে বধ করেছি, তুমি মনে কর না যে আমি তোমার ভালোবাসার জন্য, কামবশত এই কাজ করেছি। আমি কোন কামুক পুরুষ নই যে একটা মেয়ের জন্য আমি এত বড় একটা সংহার করব। আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালনের জন্য আমি এই সংহার করেছি। এখন তোমার যেখানে খুশি তুমি যেতে পার'। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাগুলোই রুক্মিণীকে বলছেন 'দন্তবক্ত্র, জরাসন্ধ, শিশুপাল এদের পর্যুদস্ত করার জন্যই তোমাকে অপহরণ করেছিলাম,

তোমার ভালোবাসার জন্য নয়, তোমাকে বিয়ে করাতে এছাড়া অন্য কোন কারণ ছিল না। আর এখনও সুযোগ আছে তুমি যদি চাও তুমি যার কাছে মন যায় চলে যেতে পার। আর এত দিনে তুমি দেখে নিয়েছ যে স্ত্রী, টাকা-পয়সা, সন্তান কোন দিকেই আমার কোন দৃষ্টি নেই'।

এখানে খুব মুল্যবান কথা যেটা শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলছেন তা হল – *উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকঃ। আত্মলব্ধ্যাঽঽস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ।।১০/৬০/২০।।* যে নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ কিনা শরীর, সম্পত্তি, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সব কিছু থেকে দীপ শিখার মত আলাদা থাকে, আমি হলাম সেই সাক্ষী মাত্র। এর তাৎপর্য হল, যদি এই ঘরে একটা আলো জ্বেলে রাখা হয়, আলোটা নিরপেক্ষ, আলোতে আমি লেখাপড়াই করি, ঘুমিয়েও যদি থাকি আর আমি কোন আসামী না একজন সাধু এতে আলোর কিছু যায় আসে না। শ্রীকৃষ্ণ এইটাই বলছেন – আমি হলাম এই দীপ শিখার আলোর মত, সাক্ষী মাত্র, নিরপেক্ষ, অনাসক্ত। এটাই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত শক্তির রহস্য। বলছেন – আমি পূর্ণকাম, কৃতকৃত্য। কেন? আমরা আত্মসাক্ষাৎকারী। এই শ্লোকটি ভাগবতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে রুক্মিণীকে বলছেন যে আমার স্ত্রী-পুত্র, টাকা-পয়সা কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই, আমি হলাম পূর্ণকাম। সমস্ত জীবকুলের যেটা সব থেকে উচ্চতম অবস্থা সেই অবস্থাকে লাভ করে আমি কৃতকৃত্য হয়ে গেছি। আলোর দীপশিখার মত আমি অনপেক্ষ ও অনাসক্ত, সব কিছুর সাক্ষী মাত্র। রুক্মিণীকে এই সব কথা শ্রীকৃষ্ণ বলে যাচ্ছেন।

মানুষের কামনা এই তিনটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। সেইজন্য কামনাকে বলা হয় এষণাত্রয়, এষণা মানে ইচ্ছা। বাকি যত কামনা সব এই তিনটের মধ্যেই ফেলে দেওয়া যায়। এই জগতের জন্য পুত্র বিত্ত আর ওই জগতের জন্য স্বর্গ। এই তিনটের বাইরে যে কামনাগুলো হয়, সেগুলো সাধারণ ইচ্ছা। যদি পুত্র ইচ্ছা হয় তখন তার জন্য এক নারী চাই। নারী চাইলে তখন আসবে নারীকে দেখতে কেমন হবে। সেইজন্য যখন সুন্দরী নারীর প্রতি আকর্ষণ হয় তখন সেটা পুত্রৈষণার মধ্যেই চলে আসবে। নারী এসে গেলে একটা বাড়ি চাই, ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ী চাই, গাড়ী চালাবার জন্য তেল ভর্তে টাকা চাই – সব এই পুত্রৈষণা থেকেই আসছে। যিনি পূর্ণকাম অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞানী, তাঁর এই তিনটে এষণা খসে যায়। গীতায় বলছেন *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, জন্মালে মারা যাবে, মারা গেলে আবার জন্ম নেবে। এখানেই লোকৈষণা এসে যাচ্ছে, মৃত্যুর পর আমি যেন ভালো স্বর্গে গিয়ে থাকতে পারি, ভালো বংশে যেন আমার জন্ম হয়। কিন্তু যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনি তো জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে গেলেন, সেখানেই তাঁর লোকৈষণা খসে পড়ে গেল। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন তাঁর মন পরিপূর্ণ, তাঁর মনে ফাঁকা জায়গা নেই। জায়গা ফাঁকা থাকলে তবেই তো কিছু রাখা যাবে। তিনি এখন এত উচ্চ জিনিষে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন, তিনি আর সাধারণ জিনিস নেবেন না। শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছেন, আমরা আত্মজ্ঞানী, আমাদের আর কোন কিছুর সম্বল নেই, তুমি ভুল জায়গায় বিয়ে করেছ, ইচ্ছে করলে তুমি অন্য কারুর কাছে চলে যেতে পার, তাই বলে এই নয় যে তুমি চলে গেলে আমি অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করব, আমরা হলাম পূর্ণকাম।

যারা সত্যিকারের আত্মজ্ঞানী, আত্মা সাক্ষাৎকার করে নেন, এখানে নকল আত্মজ্ঞানীর কথা বলা হচ্ছে না, কেননা যেখানে আসল টাকা চলে সেখানে নকল টাকাও চলে, ঠিক তেমনি যেখানে আত্মজ্ঞানী আছেন সেখানে নকল আত্মজ্ঞানীও থাকবে, যাঁরা সত্যি সত্যি আত্ম সাক্ষাৎকার করে নিয়েছেন তাঁদের আত্মা, শরীর, মন, বুদ্ধি পুরো আলাদা হয়ে যায়। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন খড়ো নারকেলের মত, নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে খোলা আর শাঁস আলাদা হয়ে যায়, নাড়ালে ঢপর্ ঢপর্ আওয়াজ হবে। আত্মজ্ঞানী যেটাই চাইবেন এই স্থূল শরীরের দ্বারাই সেটা করতে পারবেন, এই ব্যাপারটা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা শুধু মুশকিলই নয়, ধারণা করাও অসম্ভব। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা একটু বোঝা যেতে পারে – ক্রিকেট ব্যাটের ওপর একটা বল রেখে যদি ছোঁড়া হয় তাহলে বলটা বেশী দূর যেতে পারবে না। কিন্তু এই বলটাই যখন বোলার ব্যাটসম্যানকে ছুঁড়ে দেয় তখন ব্যাট দিয়ে মারলে সেটা অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাবে। ব্যাট বল যদি এক হয়ে থাকে তাহলে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন বল বেশী দূর যাবে না। Object এর

সাথে এক হয়ে যায় বলে ওর উপর শক্তিটা কাজ করতে পারে না। কিন্তু যখনই আলাদা করে দেওয়া হবে, যখনই একটা ব্যবধাণ তৈরী হয়ে গেল তারপরে যে কি হবে আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

লণ্ডনে একজন ব্রিটিশ প্রফেসর কিছু দিন আগে ঠাকুরের উপরে একটা বই লিখেছেন। এর আগে তিনি স্বামীজীকে নিয়ে লিখেছিলেন। ঠাকুরের বই লিখতে গিয়ে এক জায়গায় লিখছেন – Swami Vivekananda is not an interesting person, his Guru is much more interesting, এটা কিন্তু ঘটনা, স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় একঘেঁয়ে মনে হবে। এই জায়গাটা বোঝার জন্য আমাদের সেই অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার। এখানে কাউকে তুলনা করতে যাওয়া হচ্ছে না। আত্মজ্ঞানী যিনি হয়ে যান তাঁকে আর কোন তুলনামুলক বিশ্লেষণ করা যায় না। আমাদের কাছে সব আত্মজ্ঞানীই সমান। আকাশের উপর দিয়ে যখন এক সাথে কয়েকটা প্লেন উড়ে যায় আমরা নীচ থেকে বলতে পারব না কোনটা নীচে কোনটা উপর দিয়ে যাচ্ছে। আত্মজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও আমরা এই রকম দেখি। আমরা যদি শ্রীরামকৃষ্ণের উপর থেকে অবতারকে সরিয়ে দিই তাহলে দেখতে পাই তিনি হলেন শিক্ষদীক্ষা হীন এক গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষ, মন্দিরের সামান্য পূজারী। অথচ আজকে দেখুন সারা জগতে তাঁর কি প্রচণ্ড প্রভাব। আমরা এর হিসেব কখনই মেলাতে পারব না। কিন্তু যখন আত্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখব তখন আর হিসেবের গোলমাল হবে না। আত্মজ্ঞানী যেখানেই হাত দেবেন সেখানেই, আর যেটাই তিনি করতে চাইবেন সেটাতেই সাফল্য তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। স্বামীজীর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে।

যুদ্ধ ক্ষেত্রেও এই একই জিনিস প্রযোজ্য। যুদ্ধের সময় একটা তীর নিয়ে যার নাম করে তিনি সেটাকে ছুঁড়বেন, ঠিক তাকেই গিয়ে বিদ্ধ করবে, কারুর শক্তি নেই ওটাকে আটকায়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ নিজেদের আত্মাকে সব কিছু থেকে পৃথক করে নিয়ে সেই শক্তিকে অস্ত্রের উপরে লাগিয়েছিলেন বলে তাঁদের কোন অস্ত্র ব্যর্থ হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই শক্তিকেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মোচন ও প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখালেন। স্বামীজী এই শক্তিকেই লাগালেন তাঁর বাচন শৈলীতে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ঠিক এটাই বলছেন – 'দ্যাখো, রুক্মিণী তুমি ভুল জায়গায় এসে গেছ, আমার কোন ব্যাপারেই আসক্তি নেই। আমার একমাত্র সম্পদ এই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাকে পূর্ণতা দিয়েছে, আমি কৃতকৃত্য হয়ে গেছি'। রুক্মিণীর একটু অহঙ্কার হয়ে গিয়েছিল, আর এই অহঙ্কারে বশীভূত হয়ে সে তার নিজের ইচ্ছা মত শ্রীকৃষ্ণকে চালাতে চাইছিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তাকে রাস্থায় নামিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে রুক্মিণীদেবী খুব কষ্ট পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। রুক্মিণীও বুঝতে পেরেছেন তাঁর মধ্যে অহঙ্কার এসেছিল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – আপনি যে বলছেন আপনার আমার মধ্যে মিল নেই, আমি আপনার উপযুক্ত নই, সত্যিই তো আপনার অনুরূপ নই, কারণ আপনি তিনটে গুণের রাজা আর আমি তিনটে গুণের স্বরূপিণী মায়া, আমি আপনার পেছন পেছনেই ছুটতে থাকি। তাই আমার আর আপনার মধ্যে মিল কখনই হতে পারে না। আপনার মত জগতে আমি আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! আপনি ঠিকই বলেছেন, কারণ আপনি সমস্ত জ্ঞান ঐশ্বর্যের মুর্ত বিগ্রহ, আপনি নিজের অখণ্ড মহিমাতে অবস্থিত। সেই তুলনায় আমিতো আপনার কাছে কিছুই নই। আপনি বলছেন আমার ঐশ্বর্য আছে, আপনার কিছুই নেই, কিন্তু জিনিসটা উল্টো। আপনি সাক্ষাৎ ভগবান, ঐশ্বর্য আপনার কাছে স্বাভাবিক, আর আমিতো কিছুই নই। আপনি তিন গুণের পারে আর এই তিন গুণের মালিক আপনি, আর আমি তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ। এখানে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ তার বর্ণনা রুক্মিণী পর পর করে গেছেন। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই তিনটে গুণের, মানে সত্ত্ব, রজো ও তমোর পারে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তিনি যখন মথুরায় ছিলেন, সেই সময় জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করাতে তিনি বিরক্ত হয়ে পুরো মথুরাকে তুলে গুজরাটের দ্বারকাতে নিয়ে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার উল্লেখ করে বলছেন 'আমি এমনই অসহায় যে দুষ্ট রাজাদের ভয়ে পালিয়ে এই সমুদ্রে এসে লুকিয়ে আছি'। আসলে দ্বারকা শহর চার দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, পরে সমুদ্রের মধ্যে পুরো শহরটাই তলিয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তিনি রাজাদের ভয়ে

দ্বারকার সমুদ্রে এসে লুকিয়ে আছেন। সংস্কৃত ভাষার এটাই বৈশিষ্ট্য, একই শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়। রুক্মিণী তখন বলছেন 'আপনি যে বলছেন রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে লুকিয়ে আছেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমিও একমত আপনার সাথে'। রাজার একটা অর্থ হয় তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো ও তমো। এই তিনটে গুণের পারে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে, সমুদ্রকে এখানে রুক্মিণী বলছেন সচ্চিদানন্দ, চৈতন্যঘন। রুক্মিণী বলছেন আপনি এই তিনটে গুণের পারে সচ্চিদানন্দ সাগরে রয়েছেন। পৃথিবীর রাজাদের ভয়ে আপনি লুকিয়ে নেই, সত্ত্ব, রজো ও তমো, এই তিনটে গুণের যে রাজা, তার থেকে লুকিয়ে অর্থাৎ তিনটে গুণের পারে অনুভূতি স্বরূপ হয়ে চৈতন্যঘন রূপ সচ্চিদানন্দ সাগরে স্বস্বরূপে অবস্থান করে আছেন'। বলতে চাইছেন, এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, এখানে ভগবানকে কখনই পাওয়া যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রে লুকিয়ে আছেন মানে, ইন্দ্রিয়ের সাম্রাজ্যের রাজারা যাতে আপনাকে ধরতে না পারে সেইজন্য চৈতন্যের যে চিৎসাগর, সেখানে গিয়ে আপনি লুকিয়ে আছেন। যারা আপনাকে পেতে চায় তাদের কি করতে হবে? তাদের ঐ সমুদ্রের মধ্যে আসতে হবে, কিন্তু এখানে এই রাজারা কোন দিনই আসতে পারবে না। যিনি চৈতন্যস্বরূপ তাঁর সব সময় ইন্দ্রিয়ের সাথে শত্রুতা। একটা উচ্চ তত্ত্বকে রূপকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। দুষ্ট রাজারা কারা? ইন্দ্রিয়গুলি। যাঁরা সাধক তাঁরা এই ইন্দ্রিয় থেকে দূরে সমুদ্রে পালিয়ে যায়। সমুদ্রটা কি? আত্মানুভূতি চৈতন্যঘন শুদ্ধ চৈতন্য। যাঁরা শুদ্ধ চৈতন্যের কাছে চলে যান তাঁরাই ইন্দ্রিয়রূপী শত্রদের থেকে ত্রাণ পান। সমাজ, পরিবার, জগতের মধ্যে পড়ে থাকলে কোন দিন ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যাবে না। ত্রাণ পাওয়ার একটাই উপায়, শুদ্ধ চৈতন্যের আশ্রয় নেওয়া। জরাসন্ধ, ভৌমাসুর, কালযবন, শিশুপাল এদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিরক্ত এসে গেছে। এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়ের সাথে লড়াই করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছেন। তখন তিনি সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন। সমুদ্র কি? চৈতন্যঘন আত্মানুভূতি।

অধ্যাত্ম-রামায়ণেও নারদ যখন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গেছেন তখন শ্রীরামচন্দ্র নারদকে বলছেন 'আহা, আমরা ধন্য হয়ে গেলাম, আমরা সংসারী লোক, এই রকম সাধু দর্শন আমাদের মত সংসারী লোকদের পক্ষে খুবই দুর্লভ'। নারদ তখন হাত জোড় করে শ্রীরামচন্দ্রের কথার অন্য অর্থ করে বলছেন 'আপনি ঠিকই বলছেন, কারণ সংসারের যিনি কারণরূপা মায়া, তিনিই আপনার অনুসরণ করেন, সুতরাং আপনি সংসারীতো বটেই'। শ্রীরামচন্দ্র যে অর্থে বললেন, নারদ সেটাকেই অন্য অর্থে উত্তর দিলেন।

রুক্মিণী তারপর বলছেন 'আপনি বলছেন আপনি মার্গ জানেন না, লৌকিক ব্যবহার জানেন না, ঠিকই বলেছেন। কারণ বড় বড় ঋষি-মুনিরা লৌকিক ব্যবহার জানেন না'। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পড়লে বোঝা যায় ঠাকুরও লৌকিক ব্যবহার জানতেন না। মথুরবাবুর সাথে ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। গায়ে উত্তরীয় নেই বলে ঠাকুর মথুরবাবুকে বলছেন 'হ্যাঁগো! কিছু হবে না তো'। আবার বিদ্যাসাগরের কাছে যাওয়ার সময় মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন 'আমার জামার বোতাম গুলো খোলা কিছু মনে করবে না তো'। কখনো দেখছেন ধুতি ঠিক নেই, আবার কখন সেই ধুতি পুরোটাই যে বগলে চলে আসবে তারও কোন হুঁশ নেই। আবার তখনকার দিনের রাজা উপাধি প্রাপ্ত সমাজের এক গণমান্য ব্যক্তিকে বলছেন 'আমি তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারবো না'। তবে ঠাকুর যে একেবারেই লৌকিক আচরণ জানতেন না তা নয়, কিন্তু কখন এই রকম আবার কখন ওই রকম। আত্মজ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহারে মনই থাকে না। স্বামী ভূতেশানন্দজীর সেবক একবার কলকাতায় দাঁত দেখাতে এসেছেন শুনে মহারাজ খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন – এখন কি হবে! আমার খাওয়ার কি হবে! আমি কি খাব ওই জানে। আত্মজ্ঞানীদের এই অবস্থাই হয়, নিজের ব্যাপারে কোন হুঁশই থাকে না। সেবক কয়েক ঘন্টার জন্য বাইরে গেছেন মহারাজ বুঝতে পারছেন না দুপুরে আমি কি খাব। এখানে বলছেন যাঁরা ঈশ্বরের পাদপদ্মের রস আস্বাদন করেছেন তাঁরা লৌকিক ব্যবহারে থাকেন না। সাধারণ মানুষ ধারণাই করতে পারবে না এনারা কোন উচ্চস্তরে বিচরণ করেন। এনাদের সব ব্যবহারই অ-লৌকিক। সেইজন্য জাগতিক মানুষের ব্যবহারকে বলে লৌকিক।

আপনি বলছেন আপনি দরিদ্র, অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তো সেইই যার কাছে কোন জিনিস নেই, ঠিকই বলছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর তো কিছু নেই, ভগবান ছাড়া আর কোন বস্তু নেই, ভগবানের বাইরে কিছু

নেই। তাহলে ভগবান তাঁর কাছে কি রাখবেন! ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু। তাই ভগবানের বাইরে যেটা থাকবে সেটাই তো তিনি সংগ্রহ করে সঞ্চয় করবেন। কিন্তু ভগবানের বাইরে তো কিছুই নেই, তাই ভগবান কি সংগ্রহ করবেন? মেয়েরা গয়না কিনতে ভালোবাসে, তাদের কাছে গয়না একটা বস্তু, আর সেই গয়না তাদের বাইরে আছে। এবার বাইরে থেকে তাদের গয়না সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ভগবানের বাইরে তো কিছুই নেই, তিনি বাইরে থেকে তো কিছুই সংগ্রহ করতে পারবেন না। সেইজন্য আপনি অকিঞ্চন, আপনার কিছুই নেই। রুক্মিণী বলছেন *ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্। তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন।।১০/৬০/৩৭।* 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারটে পুরুষার্থ আপনিই, আপনিই এই চারটে পুরুষার্থের ফল রূপে জগতের সামনে দণ্ডয়মান হয়ে আছেন আর আপনাকে পাওয়ার জন্য সবাই ছুটছে। যারা সব কিছুকে ছেড়ে আপনাকে পাওয়ার জন্য ছুটে যায় একমাত্র তারাই আপনাকে পেতে পারে। *পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন* যারা এই সাধারণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পড়ে আছে তারা কোন দিনই আপনাকে পাবে না। নারী-পুরুষ দেহের সুখের জন্য এক অপরের সাথে থেকে যে সুখ ও দুঃখের উৎপন্ন হয়, সেই সুখ ও দুঃখে যারা আবদ্ধ থাকে তারা কখনই আপনাকে পাওয়ার যোগ্য নয়'। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলেছিলেন আমি কাঙাল আমার বন্ধুরাও কাঙাল। সেই কথাকেই ঘুরিয়ে রুক্মিণী এই কথা বললেন। জগতে বড়লোক কারা? যাদের কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা, সম্পদ আছে, তাদের সুখ-দুঃখ হয় নারী পুরুষেরর সঙ্গ থেকে। এই ধরণের সুখ-দুঃখের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া মানুষ কোন দিন ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।

রুক্মিণী *বলছেন তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশমাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্। স্যান্মে তবাঙ্‌ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা যো বৈ ভজন্তমুপয়াত্যনৃতাপবর্গঃ।।১০/৬/০৪৩।* হে প্রভু! আপনি সমস্ত জগতের প্রভু। ইহলোকে ও পরলোকে যত রকমের আশা আকাঙ্খা আপনিই পূর্ণ করেন, আপনিই আত্মা। আপনিই আমার গতি, আপনি ছাড়া আমার আর কেউ গতি হতে পারে না। আপনার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা আমি যেন আপনার চরণকমলের সেবা থেকে কোন দিন বঞ্চিত না হই, আমি যেন আপনার চরণেই পড়ে থাকতে পারি। ইত্যাদি অনেক কথা বলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে আবার মিলন হল। এই শ্লোকে দুটো কথা খুবই অনুধাবনীয়, যাঁরাই আপনার ভজনা করেন তাঁদের মিথ্যা সংসার ভ্রম নিবারণ হয়ে যায়। এর আগে দ্বিতীয় কথা হল, সবারই কামনা আপনিই পূরণ করেন। এখানে শব্দটা হল *কামপূরম্*, প্রথমে হল মিথ্যা সংসার ভ্রম, এই সংসারে কিছু কিছু জিনিস মিথ্যা। আর যদি গভীর ভাবে বিচার করা যায় তখন দেখা যাবে যা কিছু আমরা জড়িয়ে রেখেছি তার সবটাই মিথ্যা, একেবারেই ফালতু। দ্বিতীয় কথা, যিনি ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক ধরে আছেন, তাঁর ছোটখাটো বাসনাগুলোকে ঈশ্বর পূরণ করে দেন। গীতায় ভগবান বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, ভগবানের যিনি অনন্য ভক্ত তাঁর ছোটখাটো চাহিদাগুলো ভগবান নিজেই মিটিয়ে দেন। যাঁরাই ঈশ্বরের ভজনা করেন তাঁদের ভেতর থেকে সব কিছু চলে আসে। সেইজন মানুষ ঋষিদের কাছে গিয়ে বলে আপনি আশীর্বাদ করলেই সব হয়ে যাবে। ঋষি বা সাধু আশীর্বাদ করলে কেন হয়ে যাবে? কারণ ঋষিরা যে আশীর্বাদটা করবেন তখন সেটাই তাঁর ইচ্ছা হয়ে গেল, মানে কামনা হয়ে গেল এর এই ভালো হোক, তখন তিনি ইচ্ছা করা মাত্রেই ভালো হয়ে যাবে। রুক্মিণী বলছেন – এগুলোই আপনার ঠিক ঠিক গুণ ও স্বভাব।

এর আগে রুক্মিণীকে বলছিলেন তিনি লক্ষ্মী, সেখান থেকে আবার এখানে একটা সাধারণ চরিত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঁচা মন নিয়ে পড়লে মনে হবে ভাগবত বিপরীত কথা বলছে। কিন্তু বিপরীত ভাব কিছু নেই, এই ধরণের সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন তাঁরা একটা চরিত্রকেই তিন ভাবে ঘোরাতে থাকেন। কথামৃতেও ঠাকুর নিজের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের কথা বলছেন। তিনি কখন নিজেকে ভক্তের রাজা বলছে, আবার কখন বলছেন আমি দেখি আমার ভেতরে আমি আছি আর তিনি আছেন, আবার বলছেন তিনিই আছেন। ঠাকুর আবার চৈতন্য মহাপ্রভুর অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বলছেন, মহাপ্রভু তিন অবস্থায় থাকতেন – বাহ্যদশ, অর্ধবাহ্যদশা আর অন্তর্দশা। তিনটে আলাদা ব্যক্তিত্বই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রকটিত হতে দেখা গেছে। একটা হল জাগতিক রূপ, যেখানে তিনি ভক্তের মত বলছেন – আমার ইচ্ছে এরপর যদি জন্মগ্রহণ করি

তাহলে যেন ব্রাহ্মণের বালবিধবা হয়ে জন্মাই, এক ফালি জমি থাকবে তাতে শাক বুনবো, শাকভাত খাবো আর শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভেবে ভেবে তাঁর নাম করে যাব। ভাগবতের মত এখানেও মনে হবে বিপরীত কথা, একদিকে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, আবার অন্য দিকে বলছেন আবার যদি জন্ম হয় তাহলে ব্রাহ্মণ বিধবা হয়ে শাকভাত খাবো আর কৃষ্ণনাম করে যাব। বিপরীত কিছু নেই, এগুলো আলাদা আলাদা ভাব। কথামৃতে ঠাকুরের তিনটে ভাবই দেখা যায় একটা ভক্তের ভাব, দ্বিতীয় ভাব ভক্ত আর ভগবান এক সঙ্গে আছেন আর তৃতীয় ভাব শুধু ভগবানই আছেন। ভাগবতে এখানে ঠিক একই ব্যাপার, রুক্মিণী কখন নিজেকে লক্ষ্মী রূপে দেখছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনী রূপে আর কখন নিজেকে সাধারণ একজন মানবী রূপে দেখছেন, এই তিনটে রূপ এক সঙ্গেই চলে। যাই হোক রুক্মিণীর অহঙ্কারকে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নাশ করে দিলেন। ভগবান সব কিছু সহ্য করেন কিন্তু অহঙ্কার তিনি একেবারেই সহ্য করেন না। শ্রীমতি রাধারও একবার অহঙ্কার হয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বেশী ভালোবাসেন। এই বোধ যখনই তাঁর হল তখনই তিনি দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ভগবান অহঙ্কারকে কিছুতেই সহ্য করেন না। আমরা এখানে ভক্তিশাস্ত্র দিয়ে বিচার করছি, যেমনি আমরা যোগশাস্ত্রে চলে যাব, জ্ঞানযোগে চলে যাব তখন আর এগুলো দরকার পড়বে না।

নারদ কর্তৃক ভগবানের গার্হস্থ্য-ধর্ম অবলোকন

নারদের একবার খুব জানার ইচ্ছে হল, শ্রীকৃষ্ণ যে ষোল হাজার রাজকুমারীকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন, কিন্তু এই ষোল হাজার স্ত্রীদের সাথে তিনি কিভাবে গার্হস্থ্য-ধর্ম কিভাবে পালন করছেন। একজন খ্রীশ্চান ফাদারের সঙ্গে ট্রেনে এক হিন্দুর দেখা হয়েছে। হিন্দুকে দেখে খ্রীশ্চান ফাদার হিন্দু দেবদেবীদের খুব গালাগাল দিতে শুরু করেছে – দ্যাখো, আমাদের যীশু কেমন, বিয়ে থা করলেন না, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জগতের কল্যাণে নিজের জীবন দিয়ে দিলেন, আর তোমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার মেয়েকে বিয়ে করেছিল'। তখন হিন্দু ছেলেটি ফাদারকে জিজ্ঞেস করছে 'আচ্ছা ফাদার, আপনি আমেরিকা না ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছেন'। ফাদার বলল, 'না, আমি আমেরিকা থেকে এসেছি'। 'আচ্ছা, ওখানে শুনেছি নাকি খুব ডিভোর্স হয়? এটা কি সত্যি'? 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ, তা হয়'। 'আচ্ছা ডিভোর্স কেন হয় বলুনতো'? 'এটা আর এমন কি, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলে ডিভোর্স হয়ে যায়'। 'তাহলে, ফাদার চিন্তা করে দেখুন, আপনাদের দেশে স্বামীরা একটা মেয়েকে সামলাতে পারেনা, ঝগড়া হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, আর ইনি ষোল হাজার মেয়েকে সামলে রেখেছিলেন, ভগবান ছাড়া এই অসম্ভব কাজ কি কেউ কখন করতে পারে? ষোল হাজার স্ত্রীকে একা সামলে রেখেছিলেন বলেই তিনি ভগবান, ভগবান ছাড়া কেউ এই কাজ করতে পারবে না'!

যাই হোক, নারদেরও মনে সংশয় হলো লোকে একটা স্ত্রীকেই ঠিক মত সামলে রাখতে পারেনা, সেখানে ষোল হাজার স্ত্রীকে কীভাবে সামলাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেইভাবেই আছেন যেভাবে সাধারণ মানুষ থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই ক্ষেত্রে কিছু নারীকে উদ্ধার করে মর্যাদা দিচ্ছেন। মহম্মদও বারোটা বিয়ে করেছিলেন, উনিও কিছু বিবাহ উদ্ধার করার জন্য করেছিলেন। ইসলাম যখন নতুন একটা ধর্ম রূপে দাঁড়াচ্ছিল তখন মহম্মদের লোকদের অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যুদ্ধে মহম্মদের এমন অনেকে মারা গিয়েছিল যাদের স্ত্রীদের দেখার জন্য আর কেউ ছিল না, এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে স্ত্রীদের না খেয়েই মরতে হবে। মহম্মদ তাদের বিয়ে করে উদ্ধার করেছিলেন। বর্ণনা আছে, বারো জন স্ত্রীদের মধ্যে দুজন ছিল যাদের চেহারা অত্যন্ত কুৎসিৎ। কিন্তু মহম্মদ শুধু শরণাগতি দেওয়ার জন্য তাদের বিয়ে করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার বিবাহ আর মহম্মদের বারো জনকে বিবাহ করা একই রকমের। আমরা যে অর্থে বিয়ে করা বুঝি সেই অর্থে এই বিয়ে নয়, এখানে শরণ দেওয়ার জন্য বিয়ে করা হয়েছে। যাই হোক নারদ গেছেন। এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। ষোল হাজার স্ত্রীকে তো একই মহলে রাখা যাবে না, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা মহল তৈরা করা হয়েছে। এক মহলে নারদ প্রবেশ করেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দেখেই দৌড়ে এলেন, আরে আপনি কখন এলেন? আসুন, আসুন, আপনি হলেন আত্মারাম, আত্মকাম আর আমরা হলাম অপূর্ণ, আমরা সংসারীরা আপনাকে আর কি সেবা করব! ওখান থেকে বেরিয়েই আরেক মহলে গিয়ে নারদ দেখছেন সেখানে ঐ একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ

নিজের ছোট ছোট সন্তানদের আদর করছেন। ওখান থেকে বেরিয়ে আরেক মহলে গেছেন সেখানে গিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ করে চলেছেন। সেখান থেকে অন্য মহলে গিয়ে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলছেন। আরেকটা ঘরে ঢুকে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন। সেখান থেকে আরেকটা বাড়িতে গিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ একজনের সাথে যুদ্ধের আলোচনা করে চলেছেন। আর ঠিক পাশের বাড়িতে তিনি আরেক জনের সঙ্গে সন্ধির কথা বলে যাচ্ছেন। ওখানে থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের ছেলে বিয়ে করে ফিরবেন তিনি পুত্রবধূকে বরণ করবার জন্য গৃহের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আছেন। আরেক জায়গায় গিয়ে দেখেন তিনি নিজের মেয়েকে বিয়ের পর বিদায় দিচ্ছেন। যেমন যেমন জায়গায় যাচ্ছেন সব জায়গাতেই শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছেন আর তিনি বিভিন্ন কর্মের মধ্যে একেবারে লিপ্ত হয়ে আছেন। আবার আসল রাজসভাতে গিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আর উদ্ধবাদির সাথে মন্ত্রণা করছেন। আবার কোন মহলে তিনি ব্রাহ্মণদের দান করছে, কোন মহলে তিনি প্রিয় স্ত্রীর সাথে হাসি মজা করে যাচ্ছেন, কোথাও ধনসংগ্রহ কীভাবে করা হবে সেই নিয়ে একজনের সাথে পরামর্শ করছেন আবার কোথাও তিনি প্রকৃতির অতীত সেই প্রাণপুরুষের ধ্যান করে যাচ্ছেন, তার পাশের মহলেই গিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে কীভাবে সৎপুরুষের মঙ্গল করা যেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করছেন।

দেখতে দেখতে নারদ যেন কিছুই কুলকিনারা ঠিক করতে পারছে না, তখন তিনি শেষে বলছেন *বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দর্শা অপি মায়িনাম্। যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া।।১০/৬৯/৩৭।* হে যোগেশ্বর! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে আত্মদেব! যাঁরা বড় বড় মায়াবী, ব্রহ্মাকে সব থেকে বড় মায়াবী বলা হয় কারণ তিনি সৃষ্টি করছেন, নারদ বলছেন আপনার এই মায়া ব্রহ্মাও বুঝতে পারবেন না, তাই ব্রহ্মার কাছেও আপনার মায়া অগম্য। আপনার এই যোগমায়াকে কেউ জানতে পারে না আর এর থেকে কেউ পার পায় না। কিন্তু আপনার যোগমায়ার একটা রহস্য আছে। সেই রহস্যটা কি? *ভবৎপাদনিষেবয়া*, আপনার চরণকমলের সেবা করলে আপনাকে পাওয়া যায়। মায়ার জগতে একটাই তথ্য, তথ্যটি হল ভগবানের পদসেবা। দেবর্ষি নারদের বক্তব্য হল, এই সংসারটা এমন মায়া যেখানে বড় বড় মায়াবীরাও এই মায়াকে বুঝতে পারে না, যেমন ব্রহ্মা, তিনিও এই যোগমায়াকে অর্থাৎ সৃষ্টিকে বুঝতে পারবেন না। কিন্তু এই যোগমায়ার মধ্যে একটি এমন তথ্য আছে, সেটা দিয়ে এই যোগমায়াকে পার করা যায়, সেটা হল আপনার পদসেবা। যদি কেউ গঙ্গার স্বরূপ জানতে চেষ্টা করেন তখন তিনি হতাশ হয়ে যাবেন, সেই গঙ্গোত্রী থেকে কত রাজ্য, কত শহর, গ্রামগঞ্জ, পাহাড় ডিঙিয়ে সমুদ্রে এসে মিশছে। কিন্তু গোমুখ থেকেই যে গঙ্গা আসছে তাও বলা যাবে না, কারণ গোমুখে আবার বরফ এসে জমা হচ্ছে, বরফ আবার সমুদ্র থেকে আসছে, সমুদ্রকে জানতে গেলে আবার কুলকিনারা পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা জিনিস করা যায়, গঙ্গার দুই কুলে পারাপার করা যায়। কি করে করা যাবে? নৌকা নিয়ে এপার ওপার করা যায়। ঠিক তেমনি মায়ার স্বরূপকে জানার বা বোঝার চেষ্টা করলে হতাশ হয়ে বসে পড়তে হবে, মায়ার স্বরূপকে কোন দিন জানা যাবে না। কিন্তু মায়াকে পার করা যায়। কি ভাবে? ভগবানের পদসেবা করে। উপনিষদের ঋষি বলছেন, ব্রহ্মকে জানলে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করে মৃত্যুর পারে চলে যাওয়া যায়। মৃত্যুকে পার করা মানে মায়াকে পার করা, জন্ম-মৃত্যুর চক্র এটাই মায়া। ভগবান দুটি রূপে জগতের ভেতরে এবং জগতের বাইরে বিরাজ করে আছেন। পুরুষসূক্তমে বলছে *এতাবানস্য মহিমা*, এই সৃষ্টি তাঁর মহিমা। কিন্তু এই সৃষ্টিতেই তিনি শেষ হয়ে যান না। একটা সোনার তাল আছে, সেই সোনার তাল দিয়ে গয়না বানাবার পর সোনাটা শেষ হয়ে যাবে। সেই রকম ভগবান কিন্তু সৃষ্টিতেই শেষ হয়ে যান না, সৃষ্টির বাইরেও তিনি আছেন। এই ব্যাপারটা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য বলা হয়, সেই শ্রীরামচন্দ্র দশরথের ব্যাটা, তিনিই ঘট ঘট মে ল্যাটা। জগতের সব রূপে শ্রীরামচন্দ্রই আছেন। সেটাই এখানে দেখাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণ একই সাথে সবার সাথে আছেন। মানুষ খুব সহজে এটা বুঝে নিতে পারে। কিন্তু যদি বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র অনু থেকেও অনুর মধ্যে বিরাজ করে আছেন, তখন মানুষ বুঝতে পারবে না। তিনি ছাড়া কিছুই নেই বললে মানুষ বুঝতে পারবে না। কিন্তু যখন বলা হবে তাঁর ষোল হাজার স্ত্রী, ষোল হাজার মহলে শ্রীকৃষ্ণ একই সাথে সবার সঙ্গে আছেন, কোথাও তিনি বাচ্চাকে স্নান করাচ্ছেন, কোথাও তিনি

খাওয়াচ্ছেন, কোথাও তিনি মন্ত্রণা করছেন আবার কোথাও তিনি পাশা খেলছেন। তখন সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। আমাদের ঋষিরা একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে এক উচ্চ আদর্শ রেখে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী ছিল এই তথ্যের কোন দাম নেই। এক দিন করে এক একজন স্ত্রীর সাথে থাকতে গেলে মোটামুটি পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ যদি তিরিশ বছর বয়সে ষোল হাজার মেয়েকে বিয়ে করে থাকেন তাহলে ষোল হাজারতম স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণের আশি বছর বয়স হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের না হয় আশি বছর বয়স হয়ে যাবে, কিন্তু এদিকে রানীগুলোর কি হবে ভাবাই যায় না। তারাও সবাই বুড়ি হয়ে যাবে, হয়তো তার আগেই মরে যাবে। এই বিয়ে করে লাভ কি হল! এগুলো হল, একটা কাহিনীকে অবলম্বন করে একটা উচ্চ তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। উচ্চ তত্ত্বটা কি? তিনি সব জায়গায় বিরাজমান।

যাই হোক শ্রীকৃষ্ণের এই অত্যাশ্চর্য অদ্ভূত সব কাণ্ড দেখার পর নারদ একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন। কী আশ্চর্যের ব্যাপার, একই লোক একই সঙ্গে এতগুলি রূপে বিরাজমান? নারদ বলছেন 'সত্যিই প্রভু! এই যে ব্রহ্মাদি দেবতারা রয়েছেন এনাদের পক্ষেও আপনার মায়া অগম্য। যিনি সাক্ষাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তিনিও আপনার মায়াকে বুঝতে পারেন না, আমরা আর আপনাকে কি বুঝতে পারব! আপনি আমাকে আশীর্বাদ করে অনুমতি দিন যাতে আপনার এই মায়ায় মুগ্ধ না হই, আর আপনার অনন্তলীলা কথাকেই যেন কীর্তন করতে করতে ত্রিজগতে বিচরণ করতে পারি'। তখন শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে বলছেন *ব্রহ্মন্ ধর্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা। তচ্ছিক্ষয়ঁল্লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ।।১০/৬৯/৪০।* হে দেবর্ষি নারদ! আমি হলাম স্বয়ং ধর্মের বক্তা, ধর্ম আমার থেকেই বেরিয়েছে, ধর্মের পালন কর্তা আমিই, অর্থাৎ আমি নিজে ধর্ম পালন করে দেখিয়ে দিই কি করে ধর্ম পালন করতে হয় আর এর অনুমোদন কর্তাও আমি। অনুমোদন কর্তা মানে, যারা এটাকে পালন করছে আমিই বলে দিই তুমি এটা ঠিক করছ, না ভুল করছ। বর্তমান সমাজে এখন বাচ্চাদের ধর্মাচরণ কীভাবে করতে হয় তার কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না, আর কর্তা তো একেবারেই নেই। গৌহাটি রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন পূজনীয় ধূর্জটি মহারাজ, তিনি অত্যন্ত উচ্চমানের সাধু ছিলেন, শুধু উচ্চমানেরই না একেবারে আদর্শ সন্ন্যাসী ছিলেন। গৌহাটির একজন ডাক্তারের ছেলে দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছিল। ছেলেটি ছুটিতে গৌহাটি গেছে। সেই সময় একদিন ছেলেকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে বাড়িতে দিদির কাছে রেখে বাবা-মা সিনেমায় কিংবা কোন পার্টিতে গেছে। বাবা-মা ফিরে এসে দেখে ছেলে বাড়ির সব কাপ-প্লেট ভেঙে রেখেছে। পরে ছেলেটির বাবা খুব দুঃখ করে ধূর্জটি মহারাজকে বলছেন 'আমার ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে পড়ছে, কিন্তু দেখুন আমরা সেদিন বাইরে গেলাম, ছেলে সব কাপ-প্লেট ভেঙে রেখে দিয়েছে। এই কি স্বামীজীর শিক্ষা'! মহারাজ তখন খুব কড়া হয়ে বলছেন 'হ্যাঁ ঠিকই তো! স্বামীজীর শিক্ষা হল ছেলেকে বাড়িতে রেখে বাপ-মা সিনেমা দেখতে বাইরে ফূর্তি করতে বেরোবে, তাই তো'! মহারাজের কড়া কথা শুনে ডাক্তার একেবারে থ হয়ে গেছে। খুব আশা করেছিল মহারাজ বলবেন ছেলেটি খুব অন্যায় করেছে। যখনই ছেলে-মেয়ের কোথাও কোন গোলমাল দেখা যাবে তখন বুঝতে হবে তার বাবা-মায়ের কিছু ত্রুটি আছে, হয়তো শতকরা এক অংশ দোষ আছে, সেই এক শতাংশকেই ছেলে-মেয়ে টেনে আশি শতাংশে নিয়ে যাবে, কিন্তু দোষ বাবা-মায়ের থাকবেই। আমাদের সমস্যা হল আমরা সবাই মনে করি আমার মত Perfect কেউ নেই। ছেলে-মেয়ের মধ্যে যদি গোলমাল থাকে তাহলে দেখা যাবে হয় মায়ের চরিত্রের দোষ আছে, নয়তো বাবার চরিত্রে দোষ আছে, তা নাহলে হয় মায়ের মধ্যে ডিসিপ্লিনের অভাব আছে, তা নয়তো বাবার মধ্যে ডিসিপ্লিনের অভাব আছে, তা নাহলে হয়তো মা-বাবার মধ্যে ভালোবাসার অভাব আছে, আর সব যদি ঠিক থাকে তাহলে দেখা যাবে কোথাও বাবা-মা সন্তানদের ঠিক ভাবে শিক্ষা দিতে পারেনি। এই চারটে যদি ঠিক থাকে সন্তান কখনই গোলমেলে হবে না, হতে পারে যদি কোন কারণে অসুর যদি বংশে জন্ম নেয়। বক্তা, কর্তা ও অনুমন্তা এই তিনটেই যদি বাবা-মার মধ্যে থাকে তাহলে ছেলে-মেয়ে কখনই বিপথে যাবে না।

শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলছেন, আমি হলাম ধর্মের বক্তা, কর্তা ও অনুমন্তা। সংসারে ধর্ম কীভাবে আচরণ করতে হবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি নিজে এই আচরণ গুলো করছি। তুমি যে দেখছ আমি এতো

কিছু করছি, তার কারণ, কোনটা করণীয় আর কোনটা অকরণীয় সমস্ত প্রাণীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আমি এগুলো করেছি। নারদকে বলা হয় ভগবানের সন্তান, তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'হে আমার সন্তান, তুমি আমার এই মায়াতে কখন মোহিত হতে যেও না। এই মায়াতে যদি তুমি একবার ফেঁসে যাও তাহলে তুমি আর এর থেকে বেরোতে পারবে না'। এরপর শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলছেন *ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্মান্ পাবনান্ গৃহমেদিনাম্। তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ।।১০/৬৭/৪১।* শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই আবার ষোল হাজার মহলে পৃথক পৃথক ভাবে সংসার ধর্ম পালন করে নারদকে দেখিয়ে দিলেন, জগতে এই সংসার ধর্ম কি করে পালন করতে হয়। এই হল ভৌমাসুরের কাহিনী আর শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রীদের মাধ্যম করে আধ্যাত্মিক দর্শনের একটা গভীর তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গৃহস্থ ধর্ম বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আদর্শ সম্পর্ক কেমন হবে সেটাও শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিলেন।

ভগবান সেই এক, কিন্তু তিনি এতগুলো মহলে আলাদা আলাদা হয়ে সমস্ত রকম সাংসারিক দায়ীত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আসলে ব্যক্তি ঈশ্বর নিয়ে আমাদের সমস্যটা খুব জটিল। ভগবানের দুটো রূপ, একটা – Transcendent আরেকটা Immanent। Transcendent হল এই সৃষ্টির বাইরে তিনি, সৃষ্টিটা তাঁরই করা। Immanent হল এই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আছেন। এখন ভগবান কি Transcendent না ভগবান Immanent? প্রত্যেকটি ধর্মে এটা একটা বিরাট সমস্যা। হিন্দুরা বলে তিনি Transcendent-Immanent মানে তিনি বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন। গীতায় বলছেন – *বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ*, তিনি বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন। পণ্ডিতদের কাছে এসব যুক্তিতর্কের ব্যাপার। ভগবান কোনটাই কিছু না। ঠাকুর রঙের গামলার কথা বলছেন। একটাই রঙের গামলা, যে যা রঙ চাইছে সেই একটা গামলাতেই চুবিয়ে সেই রঙ বার করে দিচ্ছেন। ঠাকুর খুব সুন্দর করে বলছেন – তোমার কোন রঙটা লাগবে বল আমি দিয়ে দিচ্ছি। অন্য ধর্মের কথা আমরা অতো গভীরে জানি না, হিন্দু ধর্ম কিছুটা জানি। হিন্দু ধর্মের ঋষিরা, বড় বড় মহাত্মারা দেখছেন ভগবান হলেন সৃষ্টির পারে, আবার অনেকে দেখছেন তিনি সব কিছুর মধ্যে। যাঁরা দেখছেন তাঁরা নিজেদের অনুভূতি দিয়ে দেখেছেন, তাঁদের কাছে সেটা পরিষ্কার, এই নিয়ে তাঁদের সাথে তর্ক করতে গেলে তারা কোন তর্কই করবেন না। কথামৃতে একজন ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করতে এলে ঠাকুর বলছেন 'তোমার সঙ্গে আমি কি তর্ক করব, আমি তো এই রকমই দেখেছি'। তিনি যেটা দেখেছেন সেটা তিনিই দেখেছেন, তর্কের মাধ্যমে তিনি তাঁকে অনুভূতি করিয়ে দিতে পারবেন না। এই কাহিনীগুলো কিছুই না, আমাদের বোঝানর জন্যই বলা হয়েছে। মূল কথা হলো ভগবানের কথা বা তাঁর লীলাকে ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করা যায় না। যেদিন অনুভূতি হবে সেদিনই স্পষ্ট হবে।

রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা এবং শিশুপাল উদ্ধার

অন্য দিকে পাণ্ডবরাও বড় হয়ে গেছে, ইন্দ্রপ্রস্থও তৈরী হয়ে গেছে। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে আছেন। যুধিষ্ঠির এখন রাজা। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করছেন। অগ্রপূজা কাকে দেওয়া হবে এই নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সভায় বিভিন্ন রজ্যের রাজারা সমবেত হয়েছেন। সবাই নানান রকম বুদ্ধি দিচ্ছেন, দশজন মিলে যেখানে কোন কাজ হয় সেখানে মতের অমিল হবেই, কথায় বলে অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। অগ্রপূজা কাকে দেওয়া হবে এই নিয়ে যখন খুব তর্কবিতর্ক চলছে তখন সহদেব বলছেন *অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। এষ বৈ দেবতাঃ সর্বা দেশকালধনাদয়ঃ।।১০/৭৪/১৯।* এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি আমাদের হিতৈষী। সহদেব খুব স্পষ্ট আর দৃঢ়তার সাথে বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দেবতা রূপে, কাল রূপে, ধন-সম্পদ রূপে ভাসমান। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনায় ভীষ্মের বক্তব্যই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে, ভাগবতে ভীষ্মের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। তারপর সহদেব বলছেন *যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ। অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাংখ্যা যোগশ্চ যৎপরঃ।। ১০/৭৪/২০।* সহদেব এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বলছেন – সমগ্র বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে জগতে কিছু নেই। যজ্ঞ, যজ্ঞের যে অগ্নি, সেই অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, যে

মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা আহুতি দেওয়া হয় সবই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, সবটাই তিনি। কারকের যত বিভক্তি হয় সবটাই তিনি, তিনিই কর্তা, তিনিই কর্ম, তিনিই করণ আর সম্প্রদানও তিনি। ক্রিয়াও তিনি আর কর্মের ফলটাও তিনি।

উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্তির জন্য দুটি পথ – জ্ঞান পথ আর কর্মের পথ, গীতায় জ্ঞানমার্গকে সাংখ্যযোগ আর কর্মমার্গকে যোগ বলছেন, এই দুটো পথও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তির জন্য। স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলছেন, কিন্তু এখানে দুটি যোগ বলছেন, সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগ। আসলে জ্ঞানমার্গ ছাড়া বাকি যত পথ হতে পারে সব পথই কর্মমার্গ, ধ্যান করাটাও কর্ম, ভক্তি করাটাও কর্ম। ঠিক ঠিক বলতে গেলে বিচার পথ অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্ম বিচার করাটাও কর্ম। কিন্তু এখানে বিচার করতে করতে যা কিছু অনাত্ম আসছে তার সব কিছুকে ত্যাগ করে আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এই পথকে বলছেন সাংখ্যযোগ, সাংখ্য মানে সম্যক, সম্যক জ্ঞান যে মার্গকে অবলম্বন করে হয় তাকেই বলছেন সাংখ্যযোগ। এর বাইরে সবটাই কর্মযোগের মধ্যে আসবে। আমি আর ঈশ্বর আলাদা এই বোধ নিয়ে যা কিছু করা হবে সেটাই কর্মযোগ হয়ে যাবে। ধ্যান যখন করা হচ্ছে, যখন পূজা, জপ করা হচ্ছে তখন আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদা এই বোধটা থাকছে। যখন বিচার করছি ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু তখন সেটাও কর্মযোগ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন বলছে আত্মা ছাড়া বাকি সব অনাত্মা, আমি সেই আত্মা, এটাকে এনারা বলছেন সাংখ্যযোগ। যতগুলো পথ আছে সব পথে করা হয়, যেমন কর্ম করা হয়, ভক্তি করা হয়, ধ্যান করা হয়, বিচার করা হয়, যোগ করা হয় কিন্তু জ্ঞান করা হয় কেউ বলে না। জ্ঞানই একমাত্র জিনিস যেটা করা হয় না। তাই জ্ঞান বাদে সবটাই কর্মযোগ। জ্ঞানযোগে যেটাই করা হয় সেটাই ফেলে দেওয়া হয়। সেইজন্য গুণত্রয়বিভাগযোগে যে সত্ত্ব, রজো ও তমোর বিচারের কথা বলা হচ্ছে, সেটাও জ্ঞানযোগের মধ্যে ধরা হয়েছে। সেখানে বলছেন এই তিনটে গুণ অনাত্মা এগুলো ফেলে দাও, তিনটে গুণের বাইরে যেটা আছে সেটা নিয়েই থাক। বিচার করে ত্যাগ করা হলেই জ্ঞানযোগ কিন্তু বিচার করছে কিন্তু ত্যাগ হচ্ছে না, তখন কিন্তু আর বিচার থাকলো না। নিজের স্বরূপে অবস্থান করাটাই সাংখ্যযোগ।

সহদেব বলছেন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সত্তা, আর স্বজাতীয় ও বিজাতীয় কারুর সাথে কোন মিল নেই, কোন ভেদও নেই। ষড়বিকারের কোন বিকারই তাঁর মধ্যে নেই। তিনি আত্মস্বরূপ, তাই সঙ্কল্প মাত্রই তিনি জগৎকে সৃষ্টি করেন। শুধু তাই নয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই মানুষ বিভিন্ন কর্মের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারটে পুরুষার্থের দিকে এগিয়ে যায়। যারা অত্যন্ত বিষয়ী, তারাও যখন কাম-বাসনাদির দ্বারা প্রেরিত হয়ে কর্ম করছে তখন তারা কিন্তু এই চারটে পুরুষার্থের মধ্যে কামেরই একটা নিকৃষ্ট রূপকে অনুসরণ করছে। তারাই যখন চেতনার একটা উচ্চস্তরে গিয়ে বলে আমি ধর্মে অবস্থিত হয়ে কাম ভোগ করব, তখন সেটাই চারটের পুরুষার্থের একটা, অর্থাৎ কাম হয়ে যায়। কিন্তু যখন লাগাম ছাড়া হয়ে কামের মধ্যে পড়ে থাকে তখন সেটাই জাগতিক কামের মধ্যে চলে যায়, সেটা আর পুরুষার্থ থাকছে না। শ্লোকে এটাই বলছেন, ভগবান কর্মের মাধ্যমে সবাইকে এই চারটে পুরুষার্থের মধ্যে নিয়ে আসছেন। যারা কামনা-বাসনা নিয়ে কর্ম করছে তাদেরকেও ভগবান ওই কর্মের মাধ্যমে চারটে পুরুষার্থের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। কিন্তু যারা কোন কর্মই করছে না, অলস হয়ে বসে থাকে, ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন 'কুমড়ো কাটা বঠ্‌ঠাকুর', এরা কখন এগোতে পারে না। মানুষের তিনটে শত্রু – কামিনী, কাঞ্চন আর আলস্য। কামিনী-কাঞ্চন অনেক রূপে আসে। অনেকে বলে আমার কাম-বাসনা নেই, হয়তো বিয়েও করলো না। কিন্তু তাই বলে কি তার মধ্যে কাম ভাব নেই? অবশ্যই থাকবে, ভেতরে কাম-বাসনা গিজগিজ করছে, এই কাম-বাসনা তার মধ্যে কত রূপে যে খেলা করছে বুঝতেও পারছে না। কাঞ্চনও অনেক রূপে আসে। কাম-কাঞ্চনের খেলা মানুষকে একেবারে মোহিত করে রেখেছে। কিন্তু এই দুটোর থেকেও বড় শত্রু হল আলস্য। আলস্য এক দিকে গৃহস্থকে মারছে, ভগবান তাকে আর টানবেন না, এখানেই তার এই মনুষ্যজীবনের ইতি হয়ে গেল। পরের জন্মে হয়তো গাছপালা হয়ে জন্মাবে, গাছের পরের জন্মে হয়তো পাথর হয়ে যাবে। অন্য দিকে সাধু-সন্ন্যাসীদেরও আলস্য মেরে পথে বসিয়ে দেয়। সাধু-সন্ন্যাসীদের ধরেই নেওয়া হয় যে তাঁর আর কামিনী-কাঞ্চনে কোন আসক্তি নেই। কিন্তু আলস্য তাঁকে ধরে নেয়। স্বামীজী তাই এই জায়গাতে খুব জোর ধাক্কা দিয়েছেন। সাধু হয়েছ তো কি হয়েছে তোমাকেও বাপু কাজ করে যেতে হবে, নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য কাজ করে যেতে হবে। অপরের জন্য

কাজ করা বন্ধ করেছ কি তুমি মরেছ, কাজের মাধ্যমে নিজেকে সব সময় সচল রাখতে হবে। স্বামীজী এই কারণেই সমাজসেবার আদর্শ দিয়ে গেলেন। গৃহস্থের কোন কাজ না থাকলে সমাজের মঙ্গলের জন্য সেবামূলক কাজ করুক, আলস্য যেন না পেয়ে বসে। স্বামীজী বলছেন দেওয়াল চুরি করে না, গরু মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু দেওয়াল দেওয়ালই থেকে যায়, গরু গরুই থেকে যায়। মানুষই এগোতে পারে, মানুষই ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কারণ মানুষের মধ্যে যখন কর্ম করার প্রেরণা আসে তখন শ্রীকৃষ্ণই তাকে এবার এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে সহদেব শেষে বলছেন – রাজসূয় যজ্ঞের অগ্রভাগ পূজা তাই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই প্রদানের জন্য বিবেচিত হোক। শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করলে শুধু যে ভগবানেরই পূজা হবে তাই না, এই পূজায় জগতের সমস্ত প্রাণীর পূজা করা হবে এবং তার সাথে নিজেরও পূজা হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করা কর্তব্য। সহদেবের কথা শুনে যুধিষ্ঠির ও যজ্ঞসভাতে উপস্থিত বিদ্বৎমণ্ডলী সহদেবের বক্তব্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করে তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। যুধিষ্ঠির তখন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিদ্বৎজনদের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের পাদপূজা করে শ্রীকৃষ্ণের পরমপবিত্র পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন।

এই সব কাণ্ড দেখে শিশুপাল ক্রোধানলে জ্বলতে শুরু করেছে। ক্রোধে ধৈর্যচ্যুত হয়ে সভার মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণকে শুনিয়ে শুনিয়ে কঠোর বাক্য বলতে শুরু করেছে *ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। বৃদ্ধানামপি যদ্ বুদ্ধির্বালাবাক্যৈর্বিভিদ্যতে।।১০/৭৪/৩১।* শিশুপাল বলছে – শ্রুতি বলছে একমাত্র কালই ঈশ্বর। কাল মানে সময়। কারণ, যেভাবেই হোক কাল নিজের কাজ আদায় করে নেয়। শ্রুতি বাক্যের প্রমাণ এখানেই প্রত্যক্ষ পাওয়া গেল। তা নাহলে এখানে যাঁরা বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আছেন, একটা বাচ্চা ও মুর্খ ছেলের কথা শুনে তাঁদেরও বুদ্ধি বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে! এই যে আপনারা সবাই, যেখানে পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কুলুগুরু কৃপাচার্যের মত জ্ঞানী বয়োবৃদ্ধরা আছেন, একটা বাচ্চা ছেলের কথাতে কি করে কৃষ্ণকে অগ্রপূজার করতে চাইছেন! *বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্বধর্মবহিস্কৃতঃ। স্বৈরবর্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্যাং কথমর্হতি।।১০/৭৪/৩৫।* এই কৃষ্ণের না আছে কোন বর্ণ, না আছে কোন আশ্রম, উচ্চকুল জাত নয় আর সব ধর্ম থেকে কৃষ্ণ বহিস্কৃত। কৃষ্ণের যত আচরণ সব বেদ ও লোকমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে, এর মধ্যে কোন সদ্‌গুণ নেই। আপনার কি করে বলছেন এই কৃষ্ণ অগ্রপূজা পাওয়ার যোগ্য? শিশুপাল এই সব কথা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছে। মহাভারতে এর থেকে আরও বেশী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা আছে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ যত লীলা করেছিলেনে একটা একটা করে তার উল্লেখ করে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের অযোগ্যতা ও লোকমর্যাদবিহীন কাজের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। যেমন ধেনুকাসুর বধ, বকাসুর বধ ইত্যাদি লীলাগুলিকে নিয়ে শিশুপাল বলছে, শ্রীকৃষ্ণ একটা বাছুরকে মেরে দিল, একটা পাখিকে মেরে দিয়েছে, একটা ঘোড়াকে মেরে দিল আর সেটাকেই আপনারা এত বড় করে দেখছেন! ভাগবতে অবশ্য এই বর্ণনা করা হয়নি। এই শ্লোকেই শিশুপাল বলছে, এদের কুলের রাজা যযাতি অভিশাপ দিয়ে রেখেছেন এরা কোন দিন রাজা হতে পারবে না, আর এরা মথুরা থেকে পালিয়ে বেদচর্চারহিত দেশ দ্বারকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে।

মহাভারতে কেন ওইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আর ভাগবতে কেন শিশুপালকে দিয়ে সেইভাবে বর্ণনা করা হয়নি এর পেছনে একটা বড় যুক্তি আছে। এখানেও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করছে, কিন্তু মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের যে নিন্দা করছে ভাগবতে সেগুলোর কোন উল্লেখ করা হয়নি। ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হয়েছে সেগুলো মহাভারতেও আছে। এর কারণ, ভাগবতে যদি শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাকে নিন্দা করা হয় তখন ভাগবত নিজের কথারই বিপরীত হয়ে যাবে। যে কোন শাস্ত্রে ভাবরাজ্যের যা কিছুই বলা হয় সেখানে inner contradictions থাকে না। এর আগে পূতনা উদ্ধার, ধেনুকাসার উদ্ধার, বকাসুর উদ্ধার নিয়ে এক একটা অধ্যায়ে বর্ণনা করার পর হঠাৎ যদি বলে দেয় এগুলো কিছু নয় এগুলো একটা বাছুর ছিল, পাখি ছিল, একটা অবলা মেয়েকে বধ করেছে তখনই এগুলো হয়ে যাবে inner contradiction, এতক্ষণ আপনি এক একটি অধ্যায়কে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে গেলেন আর এখন বলবেন এগুলো কিছুই না, তখনই ভক্তদের মনে সংশয় এসে যাবে, তার ভাবরাজ্যটাই উড়ে যাবে, ভাগবত কখনই

এই জিনিস হতে দেবে না, এতে ভাগবতের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তিনি সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু মহাভারতে এই সমস্যা নেই, সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবতের মত ভগবান রূপে বর্ণনা করা হয়নি ঠিকই কিন্তু যখন বর্ণাশ্রম নিয়ে বলছে, এখানে কোন ভুল বলছে না, যযাতি অভিশাপ দিয়েছিলেন এটা ঠিক, দ্বারকায় সমুদ্রে গিয়ে বসে আছে এটাও ঘটনা, এক জায়গায় জন্ম অন্য জায়গায় অন্য বর্ণে বড় হয়েছেন এটাও সত্য, এখানে inner contrdiction নেই।

যাই হোক, শিশুপালের কথা শোনার পর অনেক রাজা ঠিক করলেন শিশুপালকে বধ করে দিতে হবে। শিশুপালও তখন ঢাল তলোয়ার নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সমর্থনকারী সমস্ত রাজাদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করতে শুরু করেছে। শিশুপালের এই ঔদ্ধত দেখে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন আর মনে মনে ভাবলেন শিশুপালকে আর সহ্য করা যায় না, এবার আমার সুদর্শন চক্র দিয়ে এর বধ করে দিতে হবে আর মুখে সব রাজাদের শান্ত হয়ে আসন গ্রহণ করতে বললেন। বলেই সবার সামনে তিনি সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালের গলাটা কেটে দিলেন। ভাগবতের তুলনায় মহাভারতে এই দৃশ্যের আরও বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। শিশুপালের মাকে শ্রীকৃষ্ণ কথা দিয়েছিলেন ওর একশটা অপরাধ ক্ষমা করবেন, এসব কাহিনী মহাভারতেই পাওয়া যাবে। হিন্দু পরম্পরাতে শ্রীকৃষ্ণের যত কথা কাহিনী আজ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে সবই বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে এসেছে, কখনই বলা যাবে না যে একটি শাস্ত্র থেকেই শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী এসেছে। কিছু মহাভারত থেকে, কিছু ভাগবত থেকে কিছু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীগুলো এসেছে। যাই হোক, এখানে বলছেন, শিশুপাল নিহত হতেই সবাই প্রত্যক্ষ করলেন শিশুপালের শরীর থেকে একটা জ্যোতি নির্গত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। শুকদেব বলছেন *জন্মত্রয়ানুগুণীতবৈরসংরব্ধয়া ধিয়া। ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্।।১০/৭৪/৪৬।* শিশুপাল তিন জন্ম ধরে বৈর ভাবে ভগবানের সাধনা করে যাচ্ছিল। শিশুপাল শত্রু ভেবে ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত থাকত, আর তার মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একেবারে তন্ময় হয়ে যেত, যার ফলে শিশুপাল ভগবানের পার্ষদ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ভগবানই সবাইকে মুক্তি দেন। এখানে অবশ্য তিন জন্মের বর্ণনা নেই। জয় বিজয় ভগবানের দ্বারপাল ছিলেন। সনক, সনন্দনাদি ঋষিদের অভিশাপে শিশুপাল হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। শুকদেব বলছেন *ভাবো হি ভবকারণম্*, মৃত্যুর সময় মনের মধ্যে যে ভাব আসবে, সেই ভাবের উপরই তার গতি নির্ভর করে।

ভাগবতের এখনে আমরা একটা বিচিত্র ঘটনা পাই, যেটা সাধারণত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আগেকার দিনে বিবাহের ক্ষেত্রে অনুলোম আর প্রতিলোম এই দুটো শব্দ প্রায়ই আসত। যখন কোন উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের মেয়েকে বিবাহ করত তখন তাকে বলত অনুলোম, এই ধরণের বিবাহ তখনকার দিনে অনুমোদিত ছিল। প্রতিলোম ঠিক এর উল্টো, যেখানে উচ্চবর্ণের মেয়ে নিচু বর্ণের ছেলেকে বিয়ে করছে। অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ করে স্মৃতিতে এই নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে।

বলরাম কর্তৃক সূতমুনি রোমহর্ষণ বধ

আমরা যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তাতে একটা খুব নামকরা বিবাহের কথা আছে, যেখানে ছেলে ক্ষত্রিয় আর মেয়ে ব্রাহ্মণ। ছেলে যদি ক্ষত্রিয় হয় আর মেয়ে যদি ব্রাহ্মণ হয় আর তাদের যে সন্তান হত তাদেরকে বলা হত সূত। সেই সময় ব্রাহ্মণ বাবা আর ব্রাহ্মণ মায়ের যে সন্তান হত একমাত্র তারাই বেদের যজ্ঞাদি করানো এবং বেদ অধ্যাপনা করার অধিকার পেত। কিন্তু প্রতিলোমের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মা যদি ব্রাহ্মণ হয় আর বাবা যদি ক্ষত্রিয় হয় তাদের সন্তানদের কেউ হয়তো বেদ পড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু এরা কখনই বেদ অধ্যাপনার করার অধিকার পেত না। এদেরকেই বলা হত সূত।

সূতরা সাধারণত রাজাদের মন্ত্রী হতেন আর মহাভারত, ভাগবতাদি পুরাণ জাতীয় শাস্ত্র লোকেদের পাঠ করে শোনাতেন। এদের মধ্যে যারা খুব পণ্ডিত হতেন, অনেক সাধনা তপস্যা করতেন, তাঁরা খুব সম্মানাদি পেতেন। কর্ণকে সূতপুত্র বলা হত, অধিরথ সন্তান, এখানে অধিরথ ছিল সারথি, সারথির কাজ যারা করত তাদেরকেও সূত বলা হত, সেখানেও প্রতিলোম বিবাহ থেকেই হত। কিন্তু এখানে যে সূতের কথা বলছেন তার মা একজন ব্রাহ্মণ আর বাবা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সবচেয়ে নামকরা সূত হলেন রোমহর্ষণ, অনেকে এনাকে

লোমহর্ষণও বলে, রোমহর্ষণ আর লোমহর্ষণ একই লোক। ইনি খুব উচ্চমানের পণ্ডিত আর খুব বড় একজন তপস্বী ছিলেন, আর এনার প্রচুর সম্মানও ছিল। মহাভারতেও রোমহর্ষণের নাম পাওয়া যায় আবার ভাগবতেও তাঁর নাম আসছে। উনি খুব ভালো কথাবাচক ছিলেন, পুরাণটা খুব ভালো জানতেন। ব্যাসদেবের কাছেই এনার শিক্ষা। ব্যাসদেবের যেমন অনেক শিষ্য ছিল বেদের পণ্ডিত, তেমনি রোমহর্ষণ ছিলেন পুরাণের পণ্ডিত।

এই ঘটনার আগে ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অনেক বড় হয়ে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে তিনি জয় পেয়েছেন। এই সময়তেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। বলরাম দেখছেন কৌরব আর পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই তিনি হিতৈষী, তিনি ঠিক করে নিলেন কারুর পক্ষ তিনি অবলম্বন করবেন না। এমনকি যুদ্ধের সময় কুরুক্ষেত্রের ধারে কাছেও তিনি থাকতে চাইলেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগেই তিনি তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেলেন, যখন যুদ্ধ চলছে সেই সময় তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেতে যেতে তিনি পোঁছেছেন নৈমিষারণ্যে। নৈমিষারণ্য লক্ষ্ণৌর কাছাকাছি, এখনও নৈমিষারণ্য আছে। পুরাণাদি যত কাহিনী আছে সব কাহিনী শুরুই হয় নৈমিষারণ্যে – একদা নৈমিষারণ্যে – একবার নৈমিষারণ্যে ইত্যাদি। নৈমিষারণ্যে অনেক সাধু মহাত্মারা থাকতেন। সারাদিন ওখানে কি আর করবেন, দিনরাত সব সময়তো জপ, ধ্যান করা যায় না। তাই ওনারা মাঝে মাঝেই একটা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করতেন। কোন যজ্ঞ হয়তো ছমাস ধরে চলতো, কোনটা হয়তো বেশ কয়েক বছর ধরে চলতো, কোন কোন যজ্ঞ বারো বছর ধরেও চলছে। এখন যদি বারো বছর ধরে যজ্ঞ চলে, তাহলে সারাটা দিন করবেনটা কি।

যখন বারো বছর ধরে যজ্ঞ চলে, সেই সময় তখনকার দিনের নামকরা সূতদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হত। যজ্ঞের যখন বিরতি হত তখন সূতরা পুরাণকথা পাঠ করতেন। এই রকম একটা যজ্ঞ নৈমিষারণ্যে চলছে, সেই সময় বলরাম ঘুরতে ঘুরতে নৈমিষারণ্যে এসেছেন। তিনি এসে দেখছেন ব্রাহ্মণ আর ঋষিদের বিরাট সমাগম হয়েছে। সেখানে রোমহর্ষণ উচ্চাসনে বসে আছেন। ভাগবতে যেভাবে বর্ণনা করছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, বলরাম এসেছেন, সেই সময় রোমহর্ষণ একটা উঁচু বেদীতে বসে আছেন। কথাবাচকরা সাধারণতঃ উঁচু আসনে বসেই পাঠ করতেন, সবাই যাতে তাঁকে দেখতে পায়, তিনিও যাতে সবাইকে দেখতে পান।

বলরামকে দেখে রোমহর্ষণ নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন না, আর হাত জোড় করে যে নমস্কার করতে হয় সেই অভিবাদনটাও করলেন না। বলরামের কাছে ব্যাপারটা খুব অসম্মানজনক মনে হল, আমি হলাম রাজা। কৃষ্ণের দাদা কিনা! আর দেখছেন যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা মাটিতে নীচে বসে আছেন আর রোমহর্ষণ উচ্চাসনে বসে আছেন। ব্যাপারটা বলরামের একেবারেই পছন্দ হয়নি, স্বাভাবিক ভাবেই বলরাম প্রচণ্ড রেগে গেছেন। বলরাম একটুতেই খুব রেগে যেতেন। তিনি রেগে গিয়ে বলছেন 'এই যে রোমহর্ষণ, এ প্রতিলোম, এর বাবা নিচু জাতের, তাও সে নিজেকে ব্রাহ্মণদের থেকে উপরে বসিয়ে রেখেছে'! ভারতে জাতপাতের প্রভাব প্রাচীন কাল থেকেই যে কত শক্তিশালী ছিল এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। বলরাম তারপর বলছেন 'ইনি ভগবান ব্যাসদেবের শিষ্য, ইতিহাস, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়েছেন অথচ নিজের মনের উপর কোন সংযম নেই, এই রোমহর্ষণ অত্যন্ত অবিনয়ী, দুর্বিনীত ও অস্থিরচিত্ত'। মনুস্মৃতিতে এই রকম একটা শ্লোক আছে যেখানে বলা হচ্ছে কোন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেয় তাহলে তার কানে গরম তেল ঢেলে দাও, যাতে আর কখন এই রকম না করে। ছোটবেলা থেকে আমরাও শুনে আসছি বড়দের, গুরুজনদের কখন উপদেশ দিতে নেই, এগুলো অত্যন্ত গর্হিত আচরণ।

বলরাম বলছেন 'নাটকে যেমন অভিনেতারা একটা বহুরুপীর পোষাক পড়ে নেয়, এর শাস্ত্রাধ্যয়নও তেমনি কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্যই, আসলে এর ভেতরে কিছুই নেই'। সন্ন্যাসীদেরও পথেঘাটে এই ধরণের টিপ্পনী শুনতে হয় – গেরুয়াটাই পড়ে আছে আসলে একটা ভণ্ড। বলরামেরও তাই মনে হয়েছে। বলছেন 'যারা ধর্মের চিহ্ন ধারণ করে অথচ ধর্ম পালন করে না, এরা হল বেশী পাপী'। ধর্ম পালন করছে না ঠিক আছে, কিন্তু তার উপর আবার যদি ধর্মের চিহ্ন ধারণ করে থাকে, যেমন গেরুয়া পোষাক, তিলক কাটা, এগুলো সবই ধর্মের চিহ্ন, দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমি ধর্ম পথের লোক – একে বলে লিঙ্গম্, লিঙ্গম্ মানে চিহ্ন।

সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল যে আমার এখন এই পথ। কিন্তু ধর্মের চিহ্ন ধারণ করার পরও যদি অধর্ম আচরণ করে তাহলে তারা হয়ে যাবে দ্বিগুণ পাপী। একেই তো পাপ করছ অথচ দেখাচ্ছ অন্য রকমের।

বলরাম হলেন শেষনাগের অবতার, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এসেছেন, তিনি বলছেন 'আমি এসেছি, এই ধরণের যারা দুষ্ট তাদের নাশ করতে। কিন্তু যেহেতু আমি তীর্থে বেরিয়েছি তাই আমিতো কোন অস্ত্র ধারণ করব না, কিন্ত এই পাপীকে আমি এক্ষুণি শেষ করে দেব'। এই বলে তিনি তাঁর হাতে একটা কুশ ছিল, সেই কুশকে মন্ত্রে অভিষিক্ত করে রোমহর্ষণের উপর চালিয়ে দিলেন। আর ওই কুশটাই বজ্রের মত গিয়ে রোমহর্ষণকে সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দিল। শ্রীরামচন্দ্রও একবার এই রকম একটা ঘাসকে মন্ত্রপূত করে ব্রহ্মাস্ত্রে রূপান্তরিত করে একটা কাকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। কাকটা মা সীতাকে খুব জ্বালাতন করছিল। এখন কাক প্রাণ ছেড়ে যেখানেই পালাচ্ছে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র তার পেছনে পেছনে ধাওয়া করে চলেছে।

যাই হোক রোমহর্ষণ ওখানেই মারা গেলেন। এই ঘটনার যে কি তাৎপর্য্য বোঝা খুব মুশকিল। বলরাম যে কেন রোমহর্ষণের মত একজন শ্রেষ্ঠ সূতকে মেরে ফেললেন কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না। কিন্তু মূল কথা এটাই যে তখনকার দিনে লোকেরা সূতদের কীভাবে দেখত এই ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদের ধর্মের পরম্পরাতে প্রায়ই এই ধরণের মানসিকতা দেখা যায় যেখানে নিম্নবর্ণের কেউ যদি শাস্ত্রের কথা বা ধর্মের কথা বলে উচ্চবর্ণের লোকেরা তা কখনই মেনে নিতে পারত না।

রোমহর্ষণেকে বলরাম এভাবে মেরে ফেলতেই ওখানকার যত ব্রাহ্মণ ছিলেন সবাই আঁৎকে উঠে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সব ব্রাহ্মণরা বলরামকে বলছেন 'এ আপনি কি করে বসলেন, এনাকে আমরাই আশ্রয় দিয়েছি, আমরাই তাঁকে এখানে বসিয়েছি, এই যে এখানে তিনি এখন উচ্চাসনে আচার্য পদে বসে আছেন, সেইজন্য তিনি আর এখান থেকে নড়বেন না। উনি যেটা করছিলেন ঠিকই করছিলেন। ওনার বয়সে হয়ে গিয়েছিল, যজ্ঞসত্র যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ তিনি আমাদের আশ্রয়েই থাকবেন, সেইজন্য তাঁর যাতে মৃত্যু না হয় আমরা তাঁকে তাই আয়ু দিয়ে রেখেছিলাম। আপনি বিরাট অন্যায় করেছেন। আপনি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন, কিন্তু যে কাজটা আপনি এখানে করলেন এটা ব্রহ্মহত্যা। আপনি যদি নিজে থেকে এর প্রায়শ্চিত্ত করে নেন তাহলে আপনার পক্ষে ভালো হবে। কেননা আপনাকে তো আমরা তা বলতে পারি না, আপনি শ্রীকৃষ্ণের বড়দা, ভগবানের মতই আমরা আপনাকে দেখি'।

ব্রাহ্মণদের কথা শুনে বলরাম একটু হতচকিত হয়ে বলছেন 'ঠিক আছে, যা হবার হয়ে গেছে, এখন বলুন আমাকে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে'। ব্রাহ্মণরা বলছেন 'আপনিতো রোমহর্ষণকে মেরে ফেললেন, এনাকেতো আর বাঁচান যাবে না, কিন্তু আপনি এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে আমাদের এই যজ্ঞটা মাঝ পথে বন্ধ না হয়ে যায়'। বলরাম তখন বলছেন 'ঠিক আছে, যজ্ঞ আপনাদের যাতে বন্ধ না হয়ে যায় তার একটা উপায় বার করতেই হবে'। বলরাম এবারে বলছেন 'আমাদের শাস্ত্রে আছে পুত্র মানুষের আত্মা, রোমহর্ষণের যে পুত্র সন্তান আছে তাকে এই আসনে বসার অনুমতি দেওয়া হোক। আর আমি আশীর্বাদ দিলাম তাঁর সন্তানও রোমহর্ষণের মত জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ হবে'।

রোমহর্ষণের নাম আমরা মহাভারতে ও পুরাণে অনেক বার পাই। খুব বড় পণ্ডিত ও তপস্বী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। শাস্ত্র কথা বলার জন্য আচার্যের আসনে বসে আছেন, বলরাম কি বুঝলেন তিনিই জানেন আর এই বোঝার জন্য রোমহর্ষণের প্রাণটাই চলে গেল। সেইজন্য ধর্মের গতি কোন দিকে যাবে, কেন যাবে কিছুই বলা যায় না। আমরা ঠাকুরের ইচ্ছার উপর চালিয়ে দিতে পারি, কর্মফলের উপর চাপিয়ে দিতে পারি, কিন্তু যার উপরেই চাপাই না কেন এর অর্থ আমরা কোন দিন খুঁজে পাবো না। রোমহর্ষণের মত ব্যক্তিত্ব, যিনি সারাটা জীবন ঈশ্বরীয় কথাই বলে গেলেন, তাও আবার নৈমিষারণ্যের মত পবিত্র জায়গায় সাধুদের সামনে ঈশ্বরীয় কথা বলছেন, ভগবানের সখা এসে তাঁকে মেরে ফেললেন। কারণ – একজন অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের থেকে উচ্চাসনে বসে আছেন, অথচ ব্রাহ্মণরাই তাঁকে সম্মান দিয়ে উচ্চাসনে বসার মর্যাদা দিয়েছেন।

জগতের কোন কিছুই মেলানো যায় না, দুইয়ে দুইয়ে চার করা অসম্ভব। যাই হোক, বলরাম ব্রাহ্মণদের থেকে বিদায় নিয়ে লোকশিক্ষার জন্য প্রভাসাদি তীর্থে ব্রহ্মহত্যার জন্য নানান রকম প্রায়শ্চিত্ত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা সংবাদ

এরপরেই খুব নামকরা সুদামার কাহিনী আসে। যখনই ঈশ্বরকে সগুণ সাকারে নিয়ে আসা হবে তখনই অনেক সমস্যা দাঁড়িয়ে যায়। সগুণ সাকারকে যে কোন ধর্মেই আনুক না কেন, যদি খ্রিশ্চানিটিতে আনে, বা ইসলামে কিংবা পার্সিতে আসে বা ভবিষ্যতে আরও যেসব ধর্ম আসবে তাতেও যেমনি সগুণ সাকার আসবে তার পঞ্চাশটা সমস্যা দাঁড়িয়ে যাবে। খ্রীশ্চানিটি আজকের দিনে যে এত মার খেতে শুরু করেছে তার একমাত্র কারণ এটাই, তাদের ভগবান সব সময় সগুণ সাকার। হিন্দুরা এই জিনিসটা অনেক আগে থেকেই বুঝে গিয়েছিল বলে তারা সগুণ সাকারে বেশী জোর না দিয়ে একটা কথাই বারবার বলে এসেছে, যিনি সগুণ সাকার তিনিই নির্গুণ নিরাকার, আর এই সগুণ সাকার রূপে যা কিছু দেখছ এটাই মায়া। সগুণ সাকার ঈশ্বর যখন তাঁর মায়াকে অবলম্বন করে মানব শরীর ধারণ করেন, তখন সেই নির্গুণ নিরকার ঈশ্বরকেই মানুষ বিভিন্ন জাগতিক সম্পর্কের মাধ্যমে ভালোবাসে, মানে ভগবানকে অনেক ভাবে ভালোবাসা যায়।

ঈশ্বরকে অনেক রকম ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে একটা হয় মিত্রবৎ, ভগবানকে নিজের বন্ধুর মত ভালোবাসা। নিজের সখা রূপে ভগবানকে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত কিছুটা পাই শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে আর পাই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে। এই দুজন অবতার ছাড়া অন্য অবতারে সখা বা বন্ধু রূপে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যীশুর সেই ধরণের কোন বন্ধু ছিল বলে আমাদের জানা নেই। ভগবান বুদ্ধেরও নেই আর আমাদের ঠাকুরেরও নেই। একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রের সাথে গুহকের যে মিত্রতা হয়েছিল সেখানে ভগবানকে বন্ধুরূপে ভালোবাসা পাই আর পাই সুগ্রীবের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের ভালোবাসায়। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে অর্জুন আর সুদামা এই দুজন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধুরূপে ভালোবাসতেন। ভগবানের সাথে যখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয় তখন সেই বন্ধুত্বটা কীভাবে হয় আর বন্ধুর প্রতি ভগবানের ভালোবাসাটা কীভাবে চলতে থাকে তারই আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি তাই এক অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত ভিন্ন ভাবরসে পরিপূর্ণ। ভাগবত মূলতঃ ভক্তিগ্রন্থ, মহাভারত যেমন সব কিছুকেই নিয়ে এসেছে, কিন্তু ভাগবত শুধু ভক্তিকে নিয়ে এগিয়ে গেছে। জ্ঞানের যা শেষ কথা ভাগবত সেই শেষ কথাতেও ভক্তির মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ব্যাপারটাই একটু অন্য রকম হয়ে যায়, সেখানে বলছেন জ্ঞানই মুক্তি, মুক্তিই জ্ঞান। কিন্তু ভাগবত শুধু ভক্তির মাধ্যমেই জ্ঞানে পৌঁছে দিচ্ছে, এখানে জ্ঞানকে মাধ্যম করে কখনই ভক্তিকে নিয়ে আসা হবে না। বেদ, উপনিষদ, গীতার সবার শেষ কথা ভগবানই আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। সেই ভগবানকে জানা বা ভগবানে পৌঁছানো অর্থাৎ যেখানে মানুষ ঈশ্বরের সাথে নিজেকে এক মনে করছে, এই অবস্থায় পৌঁছানোর অনেক পথের মধ্যে ভক্তিও একটা পথ। ভক্তি পথ সহজ পথ, সবাই এই পথ অবলম্বন করতে পারে। ঠাকুরও বলছেন ভক্তি পথ সহজ পথ। সহজ এই অর্থে, সবাই এই পথ অবলম্বন করতে পারে, কিন্তু তাই বলে ভক্তিতে যে খাটাখাটনিটা কম তা নয়।

অন্যান্য সব পথে প্রস্তুতির দরকার, যেমন যোগে যম-নিয়মের দ্বারা প্রস্তুতি করতে হবে, জ্ঞানযোগে শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিতে হবে। ভক্তিপথে কোন প্রস্তুতির দরকার হয় না, ভাগবতের এর সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত হল গোপীরা। তাঁদের কোন প্রস্তুতি ছিল না শুধু ভালোবাসা দিয়ে ভগবানকে পেয়েছিলেন। ভক্তিপথে যে কোন প্রস্তুতির দরকার পড়ে না, এর ভালো আরেকটি দৃষ্টান্ত ভাগবতের প্রথমেই পাওয়া যাবে যেখানে গোকর্ণের ভাই ধুন্ধুকারীর মত এক অতি পাপী লোকও শুধু শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা নিয়ে ভাগবত শুনেই বৈকুণ্ঠ লাভ করে নিয়েছিলে। শুধু শ্রদ্ধাটুকু থাকলেই হয়ে যাবে। ভক্তিতে একমাত্র দরকার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা একই জিনিস। একটা জিনিষের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে ভালোবাসা হয় না, শ্রদ্ধা মানে একটা জিনিষের প্রতি বিশ্বাস থাকা। সুদামার কাহিনীতে এই শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালোবাসাটা কেমন হতে পারে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে।

শুকদেবকে রাজা পরীক্ষিৎ বলছেন *সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎ কর্মকরৌ মনশ্চ। স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজোঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপূণ্যকথাঃ স কর্ণঃ।।১০/৮০/৩।* যাঁরা ভক্তিমার্গের পথিক তাঁদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক ঠিক সার্থক বাণী কোনটা? যে বাণী দিয়ে ঈশ্বরের গুণগান করা হয়, তাঁর কথা বলা হয়, সেই বাণীই সার্থক। সেই রকম হাত তখনই সার্থক যখন এই হাত দিয়ে ঈশ্বরের জন্য কাজ করা হয় বা ঈশ্বরের সেবার কার্যে লাগানো হয়। কান তখনই ঠিক ঠিক সার্থক হয় যখন কান দিয়ে শুধু মাত্র ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করা হয়। মন তখনই সার্থক হয় যখন যে মন দিয়ে বিশ্বচরাচরের নিত্য নিবাসকারী ভগবানের স্মরণ-মনন কার্য সম্পাদন হয়। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে এত রকম আবর্জনাতে ভরা যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাকে এই করতে হবে, অমুকটা পেতে হবে, অমুককে সায়েস্তা করতে হবে এই ভেবে ভেবে মানুষ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৌড়েই যাচ্ছে। আমরা সবাই এখনও পশুর স্তরে পড়ে আছি। তন্ত্রে বলছে এই পশুভাবকে দিব্যভাবে তুলে নিয়ে আসতে হবে। দিব্যভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে যতটা পারা যায় স্মরণ মনন করে যেতে হবে। মনকে বস্তু চিন্তা, বিষয় চিন্তার মধ্যে ফেলে রাখতে নেই। যে মস্তক শ্রীভগবানের চরণে নত করা হয়েছে সেই মস্তকই সার্থক, যে নেত্র দিয়ে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন হয়েছে সেই নেত্রই সার্থক এইভাবে পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলে যাচ্ছেন। পরীক্ষিৎ অনেক কথা শুনে যাচ্ছেন কিন্তু এখনও তাঁর প্রাণের তৃষ্ণা মিটছে না। তখন শুকদেব পরীক্ষিৎকে এই সুদামার কাহিনী বিস্তারে বলছেন। এর আগে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়নাদি সংস্কার হয়ে যাবার তাঁরা সান্দীপনি মুনির আশ্রমে বিদ্যার্জনের জন্য গেছেন। সেখানে তাঁদের সহপাঠি ছিলেন সুদামা।

গুরুগৃহে বিদ্যার্জন সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ রাজা না হয়েও রাজার মত, আর সুদামা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান, তিনি সেই গরীবই থেকে গেছেন। শুকদেব সুদামার বর্ণনা দিচ্ছেন *কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ। বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।।১০/৮০/৬।* শুধু ব্রাহ্মণই নন, সুদামাকে শুকদেব বলছেন *ব্রহ্মবিত্তমঃ*, জ্ঞানীদের মধ্যে তিনি উত্তম, শ্রীকৃষ্ণের গুরুভাই বলে কথা। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে গুণের কথা বলা হয়েছে সেই গুণগুলোই এখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সুদামা একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ থেকে তিনি বিরক্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সব সময় প্রশান্ত। তিনি গৃহস্থ ছিলেন কিন্তু সব সময় অপরিগ্রহ হয়ে যদৃচ্ছ ভাবে যা কিছু পেতেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। অর্থাভাবে সেই ব্রাহ্মণ জীর্ণ পুরাতন বস্ত্রই ব্যবহার করে যেতেন আর তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও তথৈবচ। শুকদেব সুদামার স্ত্রীকে বলছেন দারিদ্রতার প্রতিমূর্তি। পতিব্রতা স্ত্রী একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে স্বামীকে বলছেন *ননু ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ। ব্রহ্মণাশ্চ শরণাশ্চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভ।। ১০/৮০/৯।* সুদামা স্ত্রীর কাছে প্রায়ই বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ আর আমি এক সাথে পড়াশুনা করতাম, তিনি আমার সখা ছিলেন। সুদামার স্ত্রী তাঁর স্বামীকে সেটাই মনে করিয়ে দিয়ে বলছেন 'আপনি প্রায়ই বলেন শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা ছিলেন, তিনি লক্ষ্মীপতি, আপনি তাঁর কাছে যান, তাঁকে আমাদের এই দুরবস্থার কথা বলুন, আপনি তাঁর বন্ধু, তাঁর বন্ধু হয়ে আপনি এতো দুঃখ-কষ্টে আছেন জানতে পারলে নিজে থেকে উনি আপনাকে কিছু না কিছু অবশ্যই দিয়ে দেবেন'।

সুদামা ঠিক করলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাবেন। কিন্তু এতদিন পর বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন বন্ধুর জন্য তো কিছু নিয়ে যেতে হবে। এদিকে ঘরেও কিছু নেই যে সঙ্গে করে যাবেন। শুকদেব বলছেন *যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্। চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্।।১০/৮০/১৪।* তণ্ডুল শব্দের দুটো অর্থ হয়, একটা হয় খুদ জাতীয় চাল আর দ্বিতীয় হয় চিড়ে। তবে খুদ অর্থেই বেশী নেওয়া হয়। খুদ বা চিড়া ব্রাহ্মণের বাড়িতে নেই, ব্রাহ্মণী তাই পরের বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে আনলেন, আমার স্বামী বিদেশ যাচ্ছে আপনারা যদি একটু কিছু দান করেন। নিজের খাওয়াই নেই আবার এত পথ সুদামাকে হেঁটে যেতে হবে, রাস্তায় কিছু খেতে হবে তাই ব্রাহ্মণী পাড়া থেকে চার মুষ্টি চিড়া ভিক্ষা করে চেয়ে এনেছেন। ভারতে দারিদ্রতা চিরদিনই ছিল। চিরদিনই ভারতের বেশীর ভাগ মানুষ কোন রকমে জীবন-ধারণ করে চলতেন।

যাই হোক সুদামা দ্বারকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পৌঁছে গেছেন। কোন রকমে দ্বারপালদের অনেক সুরক্ষা ব্যূহ অতিক্রম করে শ্রীকৃষ্ণের দেখা পেলেন। এখানে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ষোল হাজার রানীদের সাথে আছেন। ষোল হাজার রানীদের মহলের মধ্যেই একটা মহলে তিনি রানী রুক্মিণীর সাথে বসে আছেন। নারদ যখন শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তখন বলা হয়েছিল নারদ দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার রানীর প্রত্যেকের সঙ্গে একই সঙ্গে সাক্ষাৎ বিরাজ করে আছেন। কিন্তু এখানে তিনি শুধু রুক্মিণীর সঙ্গেই আছেন।

সুদামাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত খুশি, আনন্দে একেবারে ঝাঁপিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো দেখেই চিনতে পেরেছেন বা আগে থেকেই কারুর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কাছে খবর পাঠানো হয়েছিল আপনার সহপাঠী এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে। সাহিত্যে বন্ধুদের নিয়ে যদি কোন কাহিনী তৈরী হয় তখন সেখানে নানা রকমের নাটকীয় মুহূর্ত তৈরী করা হয়, কোথাও পাঠকের চোখের জল বার করাবে, কোথাও তাকে হাসাবে। ধর্মশাস্ত্রে যেখানে মানুষকে একটা মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হয়, তখন এই ধরণের কাহিনীর উপস্থাপনটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। গোপীরা মধুর ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে যে জ্ঞান প্রাপ্তি করেছিলেন, সুদামার ক্ষেত্রে দেখানো হচ্ছে সখ্য ভাবে ভালোবেসেও কীভাবে সেই জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। ঠাকুর সেইজন্য বারবার বলছেন একটা ভাব অবলম্বন করতে। ঈশ্বরের প্রতি একটা ভাব যতক্ষণ অবলম্বন না করা যায় ততক্ষণ কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন যায় না। সাধারণতঃ দুটো ভাবকে বেশী অবলম্বন করতে দেখা যায়, একটা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ভাব আর দ্বিতীয় প্রভু-ভৃত্যের বা সেব্য-সেবকের সম্পর্কের ভাব। আচার্য শঙ্করও বলছেন, যখন কাজ করবে তখন এই সেব্য-সেবকের ভাব নিয়ে করবে। ঈশ্বরেরই কাজ আমি করছি, আমি করছি কিন্তু কাজটা ঈশ্বরের। রেল বা অন্যান্য সরকারি অফিসের কর্মচারীরা অফিসে হয়তো মন-প্রাণ দিয়েই কাজ করছে কিন্তু জানে আমি রেল মন্ত্রণালয়ের বা সরকারের কাজ করছি, আমার নিজের কাজ নয়। ঠিক তেমনি বাড়িতে মায়েরা যখন রান্নাবান্না বা সংসারের সব কাজ করছে তখন তারাও মনে করবে আমি ঈশ্বরের কাজই করছি, এই ভাব যদি না থাকে তাহলে কারুরই আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। গীতাতে ভগবান বলছেন *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ*, যে কাজ যজ্ঞ রূপে করা হয়নি সেই কাজই বন্ধন তৈরী করে। ইসলামে সেব্য-সেবক ভাব ও পিতা-পুত্রের ভাব এই দুটি ভাবই চলে, খ্রীশ্চান ধর্মের এই দুটো ছাড়া আরও অন্য ভাব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম সব ভাবকে নিয়েই চলে। সুদামার চরিত্র হল সখ্যভাবের নিদর্শন।

এতদিন পর বন্ধুর সাথে দেখা হতেই আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল দিয়ে প্রেমাশ্রু বিসর্জন হতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে দেখে খুব ভালোবেসে সুদামাকে অনেক প্রশ্ন করছেন। গুরুগৃহ থেকে ফিরে তুমি বিয়ে করেছ কিনা ইত্যাদি। অনেক প্রশ্ন করে বলছেন *প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহতং তথা। নৈবাতিপ্রীয়সে ব্রহ্মন্ ধনেষু বিদিতং হে মে।।১০/৮০/২৯।* 'হে ব্রাহ্মণ! আমি জানতাম তুমি যদি বিয়েথা করে সংসারীর জীবন-যাপনও কর তাও বিষয়ভোগে তোমার কখন আসক্তি হবে না'। কম বয়সেই এই জিনিসগুলো বোঝা যায়। সান্দীপনি আশ্রমেই শ্রীকৃষ্ণ সুদামার মানসিকতার গঠনটা বুঝেছিলেন, সুদামা ভবিষ্যতে এই রকমেরই হবে। সেটাই শ্রীকৃষ্ণ এখন বলছেন আমি জানি তোমার মন এই সংসারে নেই। এইভাবে প্রাথমিক কথাবার্তার পর শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলানো হয়েছে। এরমধ্যে একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন – *কেচিৎ কুর্বন্তি কর্মাণি কামৈরহতচেতসঃ। ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্।।১০/৮০/৩০।* হে সুদামা! এই সংসারে খুব কম লোক আছেন যিনি ভগবানের এই মায়া নির্মিত জাগতিক ভোগবাসনা সব ত্যাগ করে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে বলছেন ভগবান যে বিষয়বাসনা দিয়ে রেখেছেন এটাকে ত্যাগ করতে পারে এই রকম লোক খুব কম। ঠাকুর বলছেন – যে কাম জয় করেছেন তিনি তো মহাপুরুষ। কারণ যিনি কামকে জয় করে নিয়েছেন তিনি তো আর স্ত্রীর বশে থাকবেন না। যিনি স্ত্রী-বশে নেই তখন তিনি আর স্ত্রীকে খুশী করার জন্য চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করবেন না। আবার তাঁদের মধ্যেও যাঁদের কোন বিষয়-বাসনা নেই, শুধু লোকশিক্ষার জন্য, অপরের মঙ্গলের জন্য কাজকর্ম করেন, এই ধরণের লোক তো জগতে অতি বিরল। প্রথম বিরল হল মনে কোন বিষয়-বাসনা নেই। বলে, সাধুর সব অহঙ্কার চলে যায় কিন্তু সাধুত্বের অহঙ্কার কিছুতেই

যেতে চায় না, এটাও বিষয়-বাসনা। লোকে আমাকে মানুক-জানুক, এটাও বিষয়-বাসনা। দ্বিতীয় বিরল, কোন বিষয়-বাসনা নেই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন। নিজের জন্য কোন কাজ করছেন না, একমাত্র লোকংগ্রহার্থে, জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। কেন কাজ করছেন? বেলুড় মঠের কোনও এক সেন্টারে অনেক আগে একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি তখন সেই সেন্টারের সেক্রেটারি ছিলেন। উনি রাত্রিতে সামান্য একটু আহার করতেন। বেশীর ভাগ মঠে নিয়ম আছে রাত্রিবেলা খাওয়ার পর সবাই একটা ঘরে এসে জড়ো হবেন, একজন মহারাজ কোন একটা শাস্ত্র থেকে কিছু অংশ পাঠ করবেন। তিনি পাঠের পর নিজের ঘরে চলে আসতেন, আলো নিভিয়ে মশারির ভেতরে আসন পেতে জপ-ধ্যানে বসে যেতেন। রাত দশটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত ওইভাবে টানা জপ-ধ্যান করে যেতেন। চারটের সময় মঙ্গলারতির ঘন্টা পড়লে উনি আসন থেকে উঠে সোজা মন্দিরে এসে বসতেন। মঠে খুব কড়া নিয়ম ছিল, যে সাধু মঙ্গলারতিতে আসবেন না সেদিন তিনি মঠে খাওয়া পাবেন না, তাঁকে বাইরে ভিক্ষা করে খেতে হবে। উনি সামনে এসে বসতেন। বসেই ঢুলতে শুরু করতেন। সারা রাত জপ করেছেন, শরীর আর কথা শুনছে না, সেও বিশ্রাম চাইছে। এরপর আবার অফিসের কাজকর্মও করছেন। সকালবেলায় মঙ্গলারতিতে এসে জপ-ধ্যান করার ওনার কোন দরকারই নেই। তাও কেন আসছেন? নিজের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য আসছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সুদামার প্রশংসা করছেন সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলছেন – তোমার তো কিছুই প্রয়োজন নেই, কিন্তু তুমি এখন সংসারী হয়েছ, নানা রকম কর্ম করতে হচ্ছে। কেন করছ? যাতে অপরেও এইভাবে কাজকর্ম করে, অপরের শিক্ষার জন্য তুমি কাজ করছ। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখে গৃহস্থ সাহস পেয়ে এক আনা ত্যাগ করবে। সংসারীদের পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সংসারী একশ টাকা আয় করলে ছ’টাকা দান করবে, পারবেই না, একটা টাকা দান করতেও অনেক চিন্তা ভাবনা করবে। এই ত্যাগ করার জন্য গৃহস্থের সামনে একটা আদর্শ চাই। সেই আদর্শ হলেন সন্ন্যাসী।

আজকে ভারতের যে এই দুরবস্থা, এই দুরবস্থা তো হবেই, কিছু করার নেই। কারণ ভারতভূমি হল ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আদর্শের ভূমি। ধর্মের দেশ হওয়ার জন্য তার সামনে সব সময় সেই আদর্শকে রাখতে হয়। আদর্শ হলেন সন্ন্যাসীরা, কিন্তু বেশীর ভাগ সন্ন্যাসী, বাবাজীরা এখন ভোগের পেছনে, নাম-যশের পেছনে ছুটছে। ভালো যে কজন আছেন তাঁরা সব গুহায় গিয়ে বসে গেছেন। স্বামীজী বলছেন ধর্ম পথে যাঁরাই আসেন তাঁদের পঁচাশি শতাংশই ভেকধারী, বাকি দশ শতাংশের মাথায় গণ্ডগোল, অবশিষ্ট পাঁচ শতাংশ ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। মানুষের সামনে যখন আদর্শ থাকে তখনই সে একটু ভরসা পায়। আদর্শ হল সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ। স্বামী প্রেমেশানন্দকে একজন ভক্ত একটা খুব দামী ভেলভেটের আসন দিয়েছিলেন। তিনি সেই আসনটাকে সব সময় উল্টো করে রাখতেন। মহারাজের সেবক মজা করে বলছেন, সব সময় উল্টেই যদি রাখতে হয় তাহলে আসনটা নিলেন কেন? প্রেমেশানন্দজী তখন সারগাছিতে থাকতেন। তিনি সেবককে বলছেন, ‘দেখো বাবা! এখানে গ্রামের লোকেরা আসে, গ্রামের লোকেরা খুব গরীব, যখন ওরা দেখবে সন্ন্যাসী দামী আসন ব্যবহার করে, তখন ওদের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাটা চলে যাবে’।

স্বামীজী বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের জন্য নিয়ম করে দিলেন, সকালে মঙ্গলারতির ঘন্টা পড়লে সবাইকে মন্দিরে আসতে হবে, মঙ্গলারতির পর সবাইকে ধ্যান করতে হবে। যে আসবে না তাকে সেদিন ভিক্ষা করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বামীজীর নিয়ম শুনে লাটু মহারাজ পরের দিন নিজের লোটা কম্বল নিয়ে মঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন – লোরেন ভাই নিয়ম করে দিয়েছে ঘন্টা পড়লে মনটাকে ধ্যানে লাগিয়ে দেবে আর ঘন্টা পড়লে ধ্যান বন্ধ করতে হবে, এগুলো আমার দ্বারা হবে না। স্বামীজী যখন শুনলেন তখন তিনি আটকাতে গেলেন না। কারণ একটা সঙ্ঘ চালাতে গেলে অনুশাসন দরকার। পরে অবশ্য তিনি লাটু মহারাজকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন – লাটু ভাই এসব নিয়ম তোমার জন্য নয়।

শ্রীকৃষ্ণ আরও কিছু কথা বলার পর গুরুর সম্বন্ধে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কোন দ্বিজাতি অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যরা যদি গুরুকুলে না যায় তাহলে জীবনের যে কি উদ্দেশ্য আর জীবনে যে কি জ্ঞাতব্য, মানে জীবনে কি জানতে হবে, এই বিষয়ে তারা অজ্ঞই থেকে যায়। সংসারে তিন জন গুরু। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন

প্রথম গুরু জন্মদাতা পিতা, অবশ্য কোন কোন জায়গায় মাকে বলা হয়, যাই হোক প্রথম গুরু বাবা আর মা। যিনি উপনয়ন করান এবং কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র দান করে সৎ কর্মের শিক্ষা দেন তিনি দ্বিতীয় গুরু। এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'এই যে গুরু যিনি উপনয়ন করিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র দান করছেন তিনি আমার মতই পূজ্য'। আমার মত মানে ভগবানকে যেভাবে পূজা করা হয় ঠিক সেইভাবে তাঁরও পূজা করতে হবে। তৃতীয় গুরু, যিনি শাস্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করে জ্ঞান উপদেশ দেন। কিন্তু এখানে একটা শর্ত দিচ্ছেন, তা হল, যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে পরমাত্মার দিকে এগিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন জ্ঞান উপদেশ দিয়ে যিনি পরমাত্মার দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন তিনি হলেন আমার স্বরূপ। প্রথম গুরুর ক্ষেত্রে কিছু বলছেন না, দ্বিতীয় গুরুর ক্ষেত্রে বলছেন তিনি আমার মতই পূজ্য আর তৃতীয় গুরুর ক্ষেত্রে বলছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মানে গুরু আর ইষ্ট এক। কিন্তু এখন অনেক কিছু পাল্টে গেছে, এখনকার গুরুরা মন্ত্র দীক্ষাটুকু দিয়ে ছেড়ে দেন, যেমন মঠ মিশনে, এমন কি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইদানিং যেভাবে দীক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়, আগেকার দিনে এই রকম ছিল না। তখনকার দিনে গুরুগৃহে বাস করতে হত। সেখানে গুরু শাস্ত্র পড়িয়ে পড়িয়ে শেষে হয়তো ইষ্টমন্ত্র দিলেন, কিংবা নাও দিতে পারেন, অথবা গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে দিলেন, তখন গায়ত্রী মন্ত্রই ইষ্টমন্ত্র ছিল। সেখান থেকে তার মন ঈশ্বরের প্রতি চলে যেত। উপনিষদের সময় ঋষিদের কাছে সত্যকাম, আরুণি, নচিকেতা, যাজ্ঞবল্ক্যের মত বালকরা গুরুগৃহে বাস করতেন আর সেখানে শাস্ত্র পড়তে পড়তে তাঁদের জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে যেত। এই গুরুরা পরম গুরু, এঁদের কথা কল্পনাই করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'যারাই বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করে নিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য এই তিন গুরুর আবশ্যক – পিতামাতা, যিনি গায়ত্রী মন্ত্র দিয়েছেন আর যিনি শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন'। এখনকার দিনে গুরুর এই বিভাজনটা আবার অন্য রকম করে দেওয়া যায় – যেমন মা-বাবা, তারপর দীক্ষগুরু আর শাস্ত্রগুরু। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ। যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণম্।। নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা। তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রুষয়া যথা।।১০/৮০/৩৩-৩৪।* হে আমার প্রিয় সখা! আমি হলাম সবারই আত্মা আবার গুরু রূপে একমাত্র আমিই আছি। সেইজন্য যারা গুরুর উপদেশ অনুসারে সব কিছু অনুশীলন করে তারা এই জন্ম-মৃত্যু রূপ ভগবসাগরকে অতিক্রম করে স্বার্থ ও পরমার্থের যথার্থ জ্ঞানী হয়ে যায়। ভবসাগরকে অতিক্রম করা মানুষের কর্ম নয়। সেইজন্য বলা হয় ইষ্ট আর গুরু এক। অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমি সবারই আত্মা, সবারই হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে আমি বিরাজ করছি। পুরাণে এসে হিন্দু ধর্মের চিরাচরিত রূপটা অনেক পাল্টে যায়। উপনিষদের সময় যিনি গুরু, তিনি শুধুই গুরু, কিন্তু ভাগবত ধর্মে এসে গুরু যিনি, তিনি সাক্ষাৎ গোবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ এইটাই এখানে বলছেন যে এই যে তিন জন গুরু – মা-বাবা, দীক্ষাগুরু আর শাস্ত্রগুরু, এই তিনটে আমি নিজে, আর গুরুকে এই ভাব নিয়েই দেখতে হবে। আমরা যে এই শাস্ত্রাদি পাঠ করছি, এর মধ্যে থেকে কোন দিন যদি কেউ দু চারটে কথাকে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে, তাতেই তার অনেক দুঃখ-কষ্ট মিটে যাবে। ঠাকুর আবার বলছেন, তিনি একদিন পঞ্চবটীর দিকে ঝাউতলায় যাচ্ছেন, যেতে যেতে রাস্তায় দেখছেন একটা হেলে সাপ একটা কোলা ব্যাঙকে মুখে ধরেছে। আর কোলা ব্যাঙটা ডেকেই যাচ্ছে, এখন সাপেরও কষ্ট আর ব্যাঙটারও কষ্ট। যদি জাত সাপ হত তাহলে তিন ডাকেই শেষ হয়ে যেত। এইজন্য ঠাকুর বলছেন – ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা, সেইজন্য কিছু হয় না। কিন্তু গুরু যদি ঠিক হয় – *আশ্চর্যোবক্তা কুশলস্যলব্ধা* – তখন ঐ তিনি ডাকেই সাফ্। হয়না কেন? যিনি বলছেন তাঁরও আধার নেই আর যে শুনছে তারও পাত্রতা নেই। এখানে এটাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে আমিই, তাই কেউ যদি গুরুর কথা পালন করে সে ভবসাগর পার করবেই।

আমি সবারই আত্মা, আর সবারই হৃদয়ে আমি অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত, এই কথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ খুব দামী কথা বলছেন। যাঁরা বিভিন্ন বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে আছেন তাঁদের বিভিন্ন ধর্ম পালন করতে হবে। যেমন গৃহস্থের ধর্ম হল তাকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হবে, ব্রহ্মচারীর ধর্ম বেদ অধ্যয়ন, সংযমিত জীবন যাপন করা ইত্যাদি, বাণপ্রস্থির ধর্ম তপস্যা, আর সন্ন্যাসীর ধর্ম বৈরাগ্য। ভারতের সমস্যা হল সন্ন্যাসীর ধর্ম গৃহস্থের কাছে চলে গেছে, সন্ন্যাসীর ধর্ম হল সব কিছু থেকে বৈরাগ্য, কোন কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়াবে না আর গৃহস্থের

ধর্মই হল পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা। পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রথম হল ঋষিযজ্ঞ, শাস্ত্রাদি নিয়মিত পাঠ করা, দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ – নিয়মিত পূজা অর্চনা করা, তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ – শ্রাদ্ধাদি করা, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে রোজ জল দেওয়া ইত্যাদি, চতুর্থ নৃযজ্ঞ – অতিথি সেবা করা আর পঞ্চম ভূতযজ্ঞ – রোজ পশুপাখিদের কিছু খাওয়ানো।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী আর সন্ন্যাসী এরা যদি নিজের নিজের ধর্মে ঠিক ঠিক অবস্থিত থাকে তাতেও আমি এতটা খুশি হইনা, যতটা আমি গুরুর সেবা শুশ্রুষা আদিতে খুশি হই। আসলে যখন গুরুর সেবা করা হয় তখন তার মধ্যে শরণাগতির ভাব থাকে, নিজেকে গুরুর কাছে সমর্পিত করে দেওয়ার মনোবৃত্তিটা তখন প্রবল থাকে। শরণাগতির ভাব নিয়ে যখন নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া হচ্ছে তখন তার মন থেকে অহঙ্কারের ভাবটাও নাশ হয়ে যায়। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর গুরুর নাম ছিল বিরজানন্দ। বিরজানন্দ জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। বৃন্দাবনেই সব সময় থাকতেন। বেদের বিরাট বড় পণ্ডিত ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী অনেক ঘুরে ঘুরে যখন বিরজানন্দকে দেখলেন তখনই বললেন ইনিই একমাত্র আমার গুরু হবার যোগ্য। গুরুর কাছেই তিনি থাকতেন। বিরজানন্দ আবার কাজকর্মের ব্যাপারে প্রচণ্ড কঠোর ছিলেন, একটু কোন দোষ পেলেই দয়ানন্দ সরস্বতীকে উত্তম-মধ্যমও দিতেন। একদিন দয়ানন্দ সরস্বতী ঘর ঝাড় দিয়েছেন। ঘরের কোণে কোথাও হয়তো একটু ময়লা থেকে গেছে। গুরু বুঝতে পেরে দয়ানন্দ সরস্বতীকে মারতে শুরু করেছেন। খুব করে মারা হয়ে যাওয়ার পর দয়ানন্দী সরস্বতী বলছেন 'দেখুন! আমি মাথা মোটা লোক আর নানা রকম শারীরিক কাজকর্ম করে আমার শরীরটা খুব বলিষ্ঠ, মোষের মত হয়ে গেছে বলতে পারেন। আপনি যে আমাকে মারছেন তাতে আপনার হাতেরই কষ্ট হচ্ছে। আপনার হাতটা দেখি কোথাও চোট ফোট লেগে গেছে কিনা'। কত বড় নিষ্ঠা গুরুর প্রতি! পরবর্তী কালে দয়ানন্দ সরস্বতী কোথায় উঠে গেলেন! গুরুর প্রতি এই নিষ্ঠাই ভেতরের সব অহঙ্কারকে নাশ করে দেয়। যিনি নিজের অহঙ্কারকে মুছে ফেলেছেন তিনিতো আধ্যাত্মিক সাধনার শেষ কথায় চলে গেলেন। আধ্যাত্মিক সাধনার শেষ কথা হল কাঁচা আমিকে মুছে সেখানে পাকা আমিকে নিয়ে আসা। পাকা আমি মানে – ঈশ্বরই সব বা আত্মাই সব, এখানে বলছেন গুরুই সব, একই জিনিস। বাকি চারটে যে বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বলা হয়েছে এগুলো হল এর প্রস্তুতি।

হিন্দুদের মতে যারাই ধর্ম পালন করছে তাদের সবাইকে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হবে, যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন না করতে চায় তাহলে সে যা খুশি তাই করতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় ধর্ম পালন আর আধ্যাত্মিক উন্নতি, তখন চতুর্বর্ণাশ্রম পালন করতেই হবে। চতুরাশ্রমে সবাইকে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারশ্রমের যা যা ধর্ম আছে সব পালন করতে হবে। এগুলো কেন করা হয়? যাতে প্রভু খুশি হন। ব্রহ্মচারীরা যখন ব্রহ্মচর্য পালন করে তখন আমি নিশ্চয়ই খুশি হই, গৃহস্থরা যখন পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে তখন আমি নিশ্চিত ভাবেই খুশি হই, কেননা তাদের পক্ষে এখন আর কিছু করা সম্ভবই না, কারন তারা এখন অর্থোপার্জন করছে, আর পঞ্চাশ রকমের ঝামেলা তাদের সামলাতে হয়। ঠাকুর বলছেন, সংসারীর ঈশ্বরকে ডাকা মানে মাথায় এক মণ বোঝা নিয়ে বর দেখা। সন্ন্যাসী মানে, সে ঝাড়া হাত পা, যা খুশি সে করতে পারে। গৃহস্থরা পারেনা, তাই বলছেন তুমি সেখানে যতটুকু করছ তার মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞটা ঠিক ভাবে কর। যেটাই করবে সেটা একটু দেবতাদের নামে দাও, একটু পিতৃপুরুষদের নামে দাও, একটু মানুষের নামে, একটু ভূতদের নামে দিয়ে দাও, ব্যাস এতেই হবে, এর বেশী করা তোমার পক্ষে সম্ভব না। এই এত জপ করতে হবে, এত যজ্ঞ করতে হবে, আজ এই ব্রত কাল এই ব্রত – এসব তোমাকে কিছু করতে হবে না, স্মৃতি এসে সব পাল্টে দিয়েছে। একটু মানুষের সেবা, একটু ভগবানকে স্মরণ করা, একটু অতিথি সেবা, কেউ এলে দূর দুর করিয়ে তাড়িয়ে না দিয়ে তাকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করা, এতেই ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে যান, আর কিছু করতে হবে না।

যারা বাণপ্রস্থী তারা সব ছেড়ে দিয়ে শুধু তপস্যাতে মন দেবে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পেনশানের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, ব্যস্, আর সংসারের দিকে তাকাতে নেই, এখন শুধু তপস্যা, শরীরের দিকে বেশী মন না দিয়ে শুধু তপস্যা। আর সন্ন্যাসী মানে, সব শেষ, কোন কিছুতেই সে

থাকবে না, না আছে তাঁর জীবনের প্রতি কোন মোহ, না আছে মৃত্যুর প্রতি কোন স্পৃহা, কোন কিছুতেই তাঁর আসক্তি থাকবে না।

এই সব বলার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'ভাই আমরা যখন গুরুকুলে ছিলাম তখন সেখানে আমাদের কত রকমের ঘটনা ঘটেছিল, সেই একবার আমরা জঙ্গলে গিয়েছিলাম কাঠ আনতে, তখন কি ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি শুরু হল, মনে হচ্ছিল যেন প্রলয় কাল এসে গেছে। সূর্যাস্ত হয়ে গেলে অন্ধকারে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে পথ খুঁজছি। সারারাত আমাদের ওই জঙ্গলেই কাটাতে হয়েছিল। ভোর হতেই গুরু উদ্বিগ্ন হয়ে অন্য শিষ্যদের নিয়ে আমাদের অন্বেষণে সেই গভীর অরণ্যে আমাদের বিধ্বস্ত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। গুরু তখন প্রসন্ন হয়ে আমাদের কি আশীর্বাদ দিয়েছিলেন তোমার মনে আছে সুদামা? তিনি বলছিলেন 'আমার জন্য তোমরা কত কষ্ট সহ্য করলে। যে মানবদেহ সকলের অতি প্রিয় সেই দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমরা আমার সেবায় আত্মনিবেদন করলে, তোমাদের অবশ্যই জ্ঞান হবে, তোমাদের অধিত বিদ্যা যেন কখনই বিস্মৃত না হয় এই আশীর্বাদ করছি'। তবে জানো কি সুদামা! সব মিলিয়ে আমি যেটা বুঝেছি গুরুকৃপা না হলে জীবনে শান্তি আসেনা *ইত্থংবিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মসু। গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে।।১০/৮০/৪৩।* গুরুগৃহে বাসের সময় এই রকম কত ঘটনাই না ঘটেছে, কিন্তু গুরুর সেবা করে যখন গুরুকৃপা লাভ হয় তখনই জীবনে পূর্ণ শান্তি আসে, এটাই আমার মত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সুদামার সঙ্গে আলোচন করছেন গুরুর কৃপা সম্বন্ধে। আমরা ছোটবেলায় কোন ভালো শিক্ষকের কাছে একসাথে পড়েছিলাম, তাঁর প্রতি আমাদের একটা গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা জন্মায়। পরে সহপাঠীদের সাথে দেখা হলে সেই শিক্ষকের প্রসঙ্গ স্মৃতিরোমন্থন করে আমরা কত আনন্দ পাই।

সবাই বলে জীবনে শান্তি নেই। শান্তি তো না হওয়ারই কথা। শান্তি কখন আসে? যখন মানুষ আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণকাম হয়ে যায়। মনে যখন কোন কামনা-বাসনা না থাকে তখনই মন শান্ত হয়। সমুদ্রে বাতাস লাগছে, সমুদ্রে তাই ঢেউ উঠছে। আমাদের মনের মধ্যে কামনা-বাসনার ঝড় বইছে, তাই মন সব সময় বিক্ষুব্ধ। পূর্ণকাম যদি না হও ততক্ষণ শান্তি আসবে না। শান্তি মানেই পূর্ণকাম। যার মনে একটু কামনা-বাসনা আছে তার অশান্তি হবেই। আত্মকাম হওয়ার জন্য গুরুকৃপা অত্যন্ত জরুরী, গুরুকৃপা না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণকাম হবে না। সখা শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই সব কথা শুনে সুদামা বলছেন – হে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ! এটাই আমার পরম সৌভাগ্য, গুরুগৃহে তোমার মত সত্যাশ্রয়ী ও পরমাত্মার সঙ্গ লাভ। এখানে সুদামা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন তুমি সত্যাশ্রয়ী, অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প, তুমি যা সঙ্কল্প করে নিয়েছ সেটাই হবে। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করলেন জরাসন্ধকে বধ করতে হবে, জরাসন্ধ বধ হয়ে গেল। শিশুপালকে বধ করতে হবে, সুদর্শন চক্রে শিশুপালের গলা কাটা গেল। মনের মধ্যে যা উঠবে সেটাই সত্য হবে, সেইজন্য বলা হয় সত্যসঙ্কল্প, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। সুদামা বলছেন *যস্যচ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহ আবপনং বিভো। শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্।।১০/৮০/৪৫।* 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের যে প্রবাহ এ সবই তোমার শরীর। তোমার শরীর থেকেই ছন্দ মানে বেদ বেরিয়েছে আর এই চারটে পুরুষার্থও তোমার শরীর থেকে বেরিয়েছে'। কারণ এই চারটে পুরুষার্থের কথা আমরা বেদ থেকেই পাই। বেদ যদি না মানে তাহলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ মানার কোন দরকার নেই। চারটে বর্ণ, চারটে আশ্রম আর চারটে পুরুষার্থ যারা বেদ মানে তাদের জন্য। যারা বেদ মানে না তাদের এর কোনটাই দরকার লাগবে না। ভারতে যখনই কেউ শাসন করতে আসতো তখন তাকে বলা হত, দেখো ভাই! ভারতের ধর্ম হল জাতিপ্রথা, জাতিপ্রথাতে যতক্ষণ হাত না দিচ্ছ ততক্ষণ তোমাকে কেউ বিরক্ত করবে না। তোমার কর বাবদ কত টাকা তুলতে চাও সব পেয়ে যাবে। আকবর যখন শাসন করতে এলেন তখন তিনি জাতিপ্রথাতে কোন হাত দিলেন না, জাহাঙ্গীরও তাই করলেন, সাজাহান তাই করলেন। কিন্তু যেই ঔরঙ্গজেব এসে জাতিপ্রথায় হাত দিল তাকে উল্টে ফেলে দিল। কারণ জাতিপ্রথা বেদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সুদামা বলছেন সেই বেদ, যা কিনা সব কিছুর শেষ কথা, সেই বেদ তোমার থেকে বেরিয়েছে। মুসলমানরা যেমন বলে কোরান হল আল্লার কথা, তেমনি হিন্দুরা বলে বেদ হল ভগবানের বাণী। বেদকে বলা হয়

ভগবানের নিঃশ্বাস। সুদামা বলছেন যাঁর শরীর থেকে বেদ বেরিয়েছে তিনি গুরুকুলে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন করবেন এর থেকে আশ্চর্যের আর কি আছে, এ নাটক ছাড়া আর কি হতে পারে!

সুদামার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – যিনি আমার প্রেমী ভক্ত তিনি যখন ভালোবেসে আমাকে সামান্য যা কিছু দেন সেটাই আমি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে যাই। গীতাতেও ভগবান একই কথা বলছেন, গীতার শ্লোকটি ভাগবতেও তুলে দেওয়া হয়েছে *পত্রং পুষ্পং ফল তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমোশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।১০/৮১/৪।* ভক্তির সঙ্গে যদি আমাকে কেউ একটা পাতা বা সামান্য ফুল, একটু ফল বা সামান্য জল দিয়ে দেয় তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়ে যাই। শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছাড়া তুমি আমাকে বিশ্বের সমস্ত ধন, রত্ন দিয়ে দিলেও তার কোন দাম নেই আমার কাছে। হে সুদামা! তুমি আমার জন্য গৃহ থেকে কি উপহার এনেছ? ঠাকুর ভক্তদের বলতেন – এখানে যখনই আসবে খালি হাতে আসবে না, এখানকার জন্য কিছু আনবে। সাধুদর্শনও খালি হাতে করতে নেই। ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর কাছে খালি হাতে কখন যেতে নেই। ঠাকুর বলতেন কিছু যদি না পারো অন্তত একটা হরীতকি নিয়ে আসবে। আচার্য শঙ্করের জীবনে একটা ঘটনা আছে। আচার্য একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর কুটিরে উপস্থিত হয়েছেন। এত দরিদ্র যে ব্রাহ্মণীর ঘরে সেদিন কিছুই নেই যে ভিক্ষা দেবেন। আচার্য শঙ্করের ভেতরে দরিদ্রা বৃদ্ধার প্রতি একটা অহেতুক করুণা জেগে উঠেছে। তিনি বলছেন 'মা! কিছু একটা ভিক্ষা দিন'! ব্রাহ্মণী তখন ঘর থেকে খুঁজে শেষে একটা গোটা আমলকী পেয়ে সেটা আচার্য শঙ্করকে দিয়েছেন। তখন সেই আমলকী হাতে নিয়ে আচার্য মা অন্নপূর্ণার কাছে প্রার্থনা করছেন 'মা! আপনি প্রসন্না হয়ে এই দরিদ্রাকে কিছু দিন'। অন্নপূর্ণা তখন আবির্ভূতা হয়ে আচার্যকে বলছেন 'এই রমণী মহা কৃপণ, একে আমি কিছু দিতে পারছি না'। আচার্য বলছেন 'না মা! এই দেখুন আমাকে আমলকী দিয়েছে'। বলেই সেইখানে দাঁড়িয়ে আচার্য অন্নপূর্ণা দেবীর বিখ্যাত স্তব রচনা করে স্তুতি করলেন। আচার্যের স্তুতিতে অন্নপূর্ণা দেবী খুব প্রসন্না হয়ে গেছেন। ওই যে দরিদ্রা একটা আমলকি আচার্যকে দিয়েছিলেন, এখন অন্নপূর্ণার কৃপাতে সেই দরিদ্র কুটিরে সুবর্ণ আমলকির বৃষ্টি হতে শুরু হয়ে গেছে। এগুলো আখ্যায়িকা, যাতে মানুষের মন ত্যাগের দিকে যায়।

সুদামাকে শ্রীকৃষ্ণ তো খুব ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েছেন। এদিকে সুদামা এত গরীব, আর শ্রীকৃষ্ণ যিনি রাজার মত ঐশ্বর্যশালী ও ক্ষমতাশালী। সুদামা লজ্জায় চার মুঠো চিড়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে বার করতেই ইতস্ততঃ করছেন, কিছু বলতেও পারছেন না, পুটলিটাকে লুকিয়ে রাখছেন। এই অবস্থাই হয়, যখন অত্যন্ত গরীব লোক মহান ঐশ্বর্যের কাছে চলে যায় সে তখন কিছু চাইতেই পারে না। ঠাকুর নরেনকে মা ভবতারিণীর কাছে পাঠিয়েছেন – মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি। নরেন কিছু চাইতেই পারলো না। নরেনের জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলেও চাইতে পারত না। যেমন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সূর্যের আলোর মধ্যে চলে এলে চোখটা ঝলসে যায়, ঠিক তেমনি যদি কোন সাধারণ লোক হঠাৎ বিরাট ঐশ্বর্যবান লোকের কাছে পৌঁছে যায় তখন সে তার কাছে কিছু চাইতেই পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। চাওয়া-চায়ির ব্যাপারটা তখনই আসে যখন কাছাকাছির ব্যাপার থাকে। আমাকে যদি রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেখানে গিয়ে যদি আমাকে বলতে বলা হয় যে পাড়ার স্ট্রীট লাইট গুলো রোজ জ্বলে না, ওগুলো জ্বালাবার ব্যাবস্থা যদি করে দেন, এই কথা কেউ বলতেই পারবে না। ঠাকুর যদি তাঁর ঐশ্বর্যটা দেখিয়ে দেন, যে ঐশ্বর্যর কাছে কুবেরের ভাণ্ডার কিছুই না, তখন কি কেউ ভাববে আমি কোন জিনিসটা নেব? রাধু শ্রীশ্রীমার সাথে রামেশ্বর গেছেন, রামনাদের রাজা তাঁর কোষাগার খুলে বলে দিলেন যা ইচ্ছা নিয়ে নিন। রাধু কিছুই নিতে পারল না। শ্রীমা প্রার্থনা করছেন যাতে রাধুর মনে কোন বাসনার না উদয় হয়। প্রশ্নই নেই কিছু নিতে পারার, চোখ ঝলসে যাবে।

সুদামার ঠিক তাই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাছে থেকে তাঁর ওই ঐশ্বর্য দেখার পর সুদামার মনেই হচ্ছে না যে বন্ধুর কাছে আমার জন্য কিছু চাইতে হবে। তাঁর সেই ইচ্ছাটাই চলে গেছে। শ্রীকৃষ্ণতো সুদামাকে খুব খাতির করে রেখে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসার সময় ব্রাহ্মণী যে সামান্য চার মুষ্টি চিড়ে দিয়েছিলেন, সেই চিড়ের পুটলিটাকে লজ্জায় লুকিয়ে রাখছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো সবই জানেন, তিনি সুদামাকে বলছেন – আরে বন্ধু! বৌদি কি কিছু আমার জন্য পাঠাননি? সুদামা লজ্জায় ভাবছে কীভাবে এই সামান্য চিড়ে শ্রীকৃষ্ণকে

দেবেন! শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সুদামার কাছ থেকে পুটলিটা টেনে বার করে দেখছেন আরেকটা বস্ত্রখণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'আরে এটা কি দেখি দেখি'! তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *নন্বেতদুপ্নীতং মে পরমপ্রীণনং সখে। তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ।।১০/৮১/৯।* হে প্রিয় সখা এই তো তুমি আমার অতি প্রিয় উপহারদ্রব্য নিয়ে এসেছ। এই চিড়া শুধু আমাকেই নয়, সমগ্র জগৎকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম। দ্রৌপদীর কাছে যখন একটা শাকের টুকরো শ্রীকৃষ্ণ খেয়ে নিলেন, তাতেই তাঁর প্রাণ ভরে গেল। তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন মানে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের পেট ভরে গেল মানে দুর্বাসা আর তাঁর শিষ্যদেরও পেটে ভরে গেল, নদী থেকেই তাঁরা পালিয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণও এখন এক মুঠো নিয়ে খুব আনন্দের সাথে ভক্ষণ করলেন। এক মুঠো খাওয়ার পর যেই দ্বিতীয় মুঠো খাওয়ার জন্য নিয়েছেন, তখনই রুক্মিণীদেবী দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিলেন। বাধা দিয়ে রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন *এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে। অস্মিঁল্লোকেহথবামুষ্মিন্ পুংসস্তত্তোষকারণম্।।১০/৮১/১১।* হে বিশ্বাত্মা! আপনি ভগবান! থামুন! থামুন! আর নয়। এই এক মুঠো চিড়ে ব্রাহ্মণের থেকে ভক্ষণ করলেন, এই লোকে সমস্ত রকমের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি এবং পরের লোকের জন্য যা যা হতে পারে এই এক মুষ্টিই অনেক। এরপর আর নেবেন না। কারণ এরপর নিলে আপনার মধ্যে যে কৃতজ্ঞতার দায়ভার এসে যাবে, আপনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব ঐশ্বর্য দিয়েও এই কৃতজ্ঞতার পাশ থেকে বেরোতে পারবেন না। সেইজন্য দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ থেকে বিরত হন। বড়লোক, বড় হৃদয়ের মানুষ সাধারণতঃ এই রকমই হয়, বড়লোকেদের কিছু উপকার করে দিলে তাঁরা সেটা খুব মনে রাখেন। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – বাগানের মালী একটা শশা, বা পেপে নিয়ে এসে বাবুকে বলছে, বাবু এটা আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। আরে বাগানটাতো বাবুরই, সেই জিনিসটাও তার। মালী সেটা নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে বাবু খুব খুশি হয়েছেন। যারা বড়লোক অথচ সৎ ও হৃদয়বান, তাঁদের সামান্য একটু সেবা করলে প্রতিদানে তাঁরা যেটা দেন সেটা বিরাট প্রতিদান হয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে কয়েক দিন খাতির করে রেখেছেন। সুদামা ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁকে নিজের বিছানাতেই শুইয়ে সেবা করেছেন। কিছুদিন শ্রীকৃষ্ণের সাথে আনন্দে কয়েকটা দিন কাটানোর পর এবার সুদামা বিদায় নেবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজের দারিদ্রতার কথা একবারও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন না, আর নিজের জন্য কিছু যাচনাও করলেন না, শ্রীকৃষ্ণও যেঁচে কিছু দিলেন না। এবার বিদায় নিয়েছেন। সুদামা ফিরে আসার সময় খুব লজ্জা পেলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তো আমার দারিদ্রতার কথা কিছুই বলা হল না। সুদামা বলছেন *অধনোহয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ। ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেহভূরি নাদদাৎ।। ১০/৮১/২০।* ভগবান জেনে শুনেই আমাকে কিছু দিলেন না, তিনিতো আমার সখা, ভগবান। উনি ভাবলেন আমি তো দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরে মন দেওয়াই আমার ধর্ম, একটু টাকা-পয়সা যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে মাথাটা আমার হয়তো বিগড়ে যাবে, তখন আর আমার ঈশ্বরের দিকে মন যাবে না, আমার ভালোর জন্যই, আমাকে রক্ষা করার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কিছু দেননি'। এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে মনের আনন্দে চলেছে – যাক্ বাবা আমার মাথাটা আর বিগড়াবে না।

বর্তমান যুগে সমস্ত বড় বড় চিন্তাবিদ্‌রা গবেষণা করে দেখতে চাইছেন সারা বিশ্ব জুড়ে যে ক্রমাগত অসন্তোষ বেড়ে চলেছে এর কারণটা কোথায়। সারা বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, তার মধ্যে একটা হল খ্রীশ্চান সভ্যতা, যেটা ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে রয়েছে, আরেকটি ইসলাম সভ্যতা, এই রকম ভারতীয় সভ্যতা, চীন সভ্যতা, জাপানী সভ্যতা। বিশ্বের সমস্ত মানুষকে এই কয়েকটি সভ্যতার মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়। এখানে মজার ব্যাপার হল, যখন থেকে পয়গম্বর মহম্মদ এলেন তখন থেকে প্রায় হাজার বছর ধরে ইসলাম ধর্ম প্রসার হতে থাকল আর তার সঙ্গে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল। ধাক্কাধাক্কি, কাটাকাটি অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু ইসলাম ধর্ম নিজেকে একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। ভারত, চীন, জাপানেও ঠিক তাই হয়েছে, অনেক কিছুর মধ্যে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামিক সভ্যতা যখন তুঙ্গে তখন পুরো ইউরোপ একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, ইউরোপের এই সময়টাকে বলাই হয় Dark Ages কিন্তু তারপরে ইউরোপের নানান রকমের

বিজ্ঞানের আবিষ্কার হতে শুরু হল, এর সাথে সাথে ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সের রাজনীতিতে ও শিল্পে অনেক বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। এর ফলে যে চিন্তা-ভাবনা গুলো এতদিন উচ্চ ভদ্র শ্রেনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল এখন সেই চিন্তাভাবনা সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে আসতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে শিল্প বিপ্লবও শুরু হয়ে গেছে। শিল্প বিপ্লবে উপরতলা থেকে নীচের তলা সবাই জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ শুধু বড়লোকরা এগিয়ে গেলে হবে না, শিল্প বিপ্লব মানেই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলা। যেমনি সবাইকে নিয়ে চলা শুরু হল তখন নীচের তলার মানুষ বলতে আরম্ভ করল আমাদের অধিকার দিতে হবে। এইভাবে গণতন্ত্রবাদ মাথা তুলে দাঁড়াল। তার প্রভাবে আবার ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়ে গেল। শিল্প, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র এগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার। একটা উৎপন্ন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, শিক্ষা দেওয়া যে এই দ্রব্যটি ব্যবহার করে আপনার কি কি লাভ হবে। এইভাবে হতে হতে শিল্পের উন্নতি যখন একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেল তখন তার বাজার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। তখন এদের মাথায় এলো এবার আমাদের উপনিবেশ তৈরী করতে হবে। তারপর তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ তৈরী করতে শুরু করে দিল। উপনিবেশ করার জন্য তারা বেছে নিল ভারত, মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আর চীনের মত কিছু দেশকে। তারা এইসব দেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে নিজেদের দেশে মাল তৈরী করে সেগুলো এইসব দেশে রপ্তানী করতে শুরু করল। কাঁচামাল তৈরী করতে গেলে তাদের অনেক মজুর লাগবে, সুপারভাইজার লাগবে। ইংল্যাণ্ড থেকে যদি এই কাজের জন্য লোক নিয়ে আসতে তাহলে তাদের অনেক মজুরি দিতে হবে। সেইজন্য দেশের লোকগুলিকে শিক্ষা দিয়ে তাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু আসল ব্যবহারিক শিক্ষাটা যাচ্ছিল মুষ্টিমাত্র কয়েকজনের কাছে, যার ফলে দেখা গেল কিছু লোকের কাছে অর্থের আমদানি হচ্ছে আর কিছু লোক আর্থিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শিল্পের উন্নতির যে পরিণতি, তার ফল সবাই ভোগ করতে পারছে। যেমন রেল লাইন, ইংরেজরা দেখল ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে আগে রেললাইন দরকার, তাই ভারতে রেললাইন ছড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতে রেললাইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে যেভাবে সচেতন, তারা জানে রেললাইন আমাদের লাইফ লাইন, এখানে যদি কিছু গোলমাল হয় তাহলে আমরা সবাই মরব। কিন্তু ভারতের লোকেরা জানে রেল লাইন মানে সরকারের, সুযোগ পেলে বিনা পয়সায় ট্রেনে ঘুরবো, সুযোগ পেলে ট্রেনের টিউব-লাইট, পাখা খুলে নিয়ে চলে যাব, কারণ এটা সরকারের, আমাদের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই। আমরা প্রায়ই বলি সমাজে এখন প্রগতির জোয়ার এসেছে, সমাজ এখন এগিয়ে যাচ্ছে। আসলে সমাজ এখনও যেখানে ছিল সেখানেই আছে, সমাজ মোটেই এগোচ্ছে না, সমাজের কয়েকজন মাত্র এগিয়েছে। এই সমস্যা যত উপনিবেশ দেশ ছিল সব জায়গাতে আছে। এই সব দেশগুলিতে যা কিছু উন্নতি হচ্ছে তার সুবিধাটা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এখন সবাই বলছে ভারতে গণতন্ত্র সার্থকতার মুখ দেখেনি। ভারতে গণতন্ত্র যে ব্যর্থ হবে তাতো জানা কথাই। এই জিনিসটাকে আনার জন্য সারা ইউরোপে তিনশ বছর ধরে লড়াই হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে, কত লোক লড়াই করে মরেছে, তার থেকে বেশী না খেয়ে মরেছে। ভারতকে এই ধরণের কোন লড়াই করতে হয়নি। আমেরিকা ইংল্যাণ্ড লড়াই করেছে বলে তারা গণতন্ত্রের মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝে। কথায় বলে তেলা মাথায় তেল দেওয়া, কারণ যার মাথায় তেল আছে সে জানে তেলের কি মাহাত্ম্য, কাঙাল জানে না। বৃটিশরা ভারতে যে কটা জিনিস চালু করে গেছে তার কোনটার মূল্যই আমরা বুঝি না। যেমন বৃটিশরা দিয়ে গেল Freedom of press, কিন্তু এখন যার যেমন ইচ্ছে হল ছেপে দিচ্ছে। গণতন্ত্র! যে দেশের মানুষের শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই তারা ঠিক করবে দেশের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন! কোন কিছু পাওয়ার জন্য যে তপস্যার দরকার ছিল, যে আত্মত্যাগের দরকার ছিল, সেটাই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়ার পর মাথাটা গেছে ঘুরে। যারা পাঁচ হাজার সাত হাজার বছর ধরে গোলামী করে এসেছে তাকে হঠাৎ করে বলে দেওয়া হল আজ থেকে তুমি রাজা, তার তো মাথা ঘুরে যাওয়ারই কথা। সেইজন্য যে কোন সমাজকে হঠাৎ যদি তুলে দেওয়া হয় তাহলে সেই সমাজের সর্বনাশ হয়ে যাওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না।

সুদামা এটাই বলতে চাইছেন, আমি দরিদ্র, গরীব, আমাকে যদি শ্রীকৃষ্ণ কটি টাকা দিয়ে দিতেন তখন আমার মাথাটা ঘুরে যেত। শ্রীকৃষ্ণ আমার মঙ্গল চিন্তা করেই কিছু দেননি। দরিদ্র অকিঞ্চন লোক একটা আশা

নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছেন, তাও আবার নিজের স্ত্রীকে প্রসন্ন করার জন্য এখানে আসা। স্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন – আপনার কাছে অনেকবার শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহপাঠী ছিলেন আর আপনার সাথে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল, আপনি যদি তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের দুরবস্থার কথা বলেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। যাই হোক নানান রকম চিন্তা ভাবনা করতে করতে সুদামা বাড়ি ফিরছেন।

কিন্তু যখন নিজের বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছেছেন, দেখেন কোথায় তাঁর সেই জীর্ণদশা প্রাপ্ত ছোট্ট কুটির? তার জায়গায় দেখছেন বিশাল রাজপ্রাসাদ, আর তাতে দাস দাসী, আর এই সেই অনেক কিছু হয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রীকেও দেখছেন দামী দামী অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পতিদেবতাকে সম্ভাষণ করার জন্য, তিনিও দেখতে অপ্সরাদের মত সুন্দরী হয়ে গেছেন। সুদামা তো অবাক, এটা কি হল! তখন উনি বলছেন 'এই হচ্ছে ভগবান, তাঁকে আমি একটু চিড়ে দিলাম আর তার বদলে তিনি এত কিছু দিয়ে দিলেন! ভগবানকে যখন কেউ অনেক কিছু দেয় তখন তিনি সেটাকে অল্প একটু মনে করেন, কিন্তু যখন কেউ ভক্তি ভালোবাসা নিয়ে সামান্য কিছু দেয় তখন তিনি সেটুকুকেই বিরাট মনে করেন। কিন্তু আমার যে এখন এই ঐশ্বর্য হয়েছে এতে ভালো করে বুঝতে পারছি আমার পতন হবেই হবে। যাদের টাকা পয়সা হয়ে যায় তাদের যেমন পতন হয় আমারও পতন হবে। *তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। মহানুভাবেন গুণালয়েন বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গ।।১০/৮১/৩৭।।* হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমার এসব কিছুই লাগবে না। আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমার প্রেম, সৌহার্দ্য, সখ্যতা পাই, এছাড়া আমার আর কিছু চাই না। আমার যেন এসবে কোন রকম আসক্তি না আসে। এই বলে তিনি পুরো অনাসক্ত ভাবে, তাঁর স্ত্রী কি ভোগ করছে না করছে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে, আলাদা ভাবে থেকে একমাত্র ভগবানের আরাধণা করে যেতে লাগলেন। ভগবানের ঐশ্বর্য পেলে অনেকের গোলমাল হয়ে যেতে পারে বলে যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তাদের ভগবান কিছু দিতে চান না। বাংলায় একটা কথাই আছে – যে করে আমার আশ আমি কর তার সর্বনাশ। জগতের কোন কিছুর প্রতি যদি ভালোবাসা এসে যায় তাহলে ভক্তের জীবন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সুদামা ছিলেন ব্রাহ্মণদের মধ্যে উত্তম, সম্পদ পেয়ে গেছেন কিন্তু সেদিকে তাঁর কোন দৃষ্টি নেই, সব কিছুকে উপেক্ষা করে অনাসক্ত ভাবে জীবন কাটাতে থাকলেন। এটা গেল শ্রীকৃষ্ণের একটা দিক, এত দিন তিনি যুদ্ধ করেছেন, অসুর দৈত্য বধ করলেন, এখন তিনি যে কীভাবে কৃপা করেন সেটাকে এখানে দেখান হল।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সাথে গোপ ও গোপিকাদের মিলন

শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবকুল এখন দ্বারকাতে আছেন। সেই কতদিন আগে গোকুল থেকে চলে এসেছেন, তারপর আর গোপীদের সাথে কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই। সেই সময় একবার সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে। বলছেন সূর্যগ্রহণ হওয়া এত অশুভ যে, কি যে হবে কেউ বলতে পারে না, হয়তো মহাপ্রলয়ও হয়ে যেতে পারে। আগে থেকেই জানতেন যে সূর্যগ্রহণ হতে যাচ্ছে। গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি আর তার হিসেব এনাদের জানা ছিল। যদিও বলা হয় বরাহ মিহির চারশ বা পাঁচশ খ্রীস্টাব্দে প্রথম অফিসিয়ালি অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, আর এরকম এরকম হলে ছায়া পড়ে বলে গ্রহণ হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, পাশ্চাত্যে এই ধারণাটা এলো গ্যালিলিওর সময়, মানে এত বছর পর। বরাহ মিহির পুরো গণনা করে বলে দিয়েছিলেন। ভারতে যা কিছুই হয় সব পরম্পরা হয়ে আসে, পুরাণের সময়তেও এনারা গণনা করে বলতে পারতেন যে কত বড় গ্রহণ হবে। সেইভাবেই তাঁরা বলে দিতে পেরেছিলেন যে ঐ দিন বিরাট পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হতে যাচ্ছে, আরও যেটা বলা হয় যে যখনই পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয় তারপরেই নাকি পুরো বিশ্বে একটা বিরাট ঝামেলা হয়। কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধটা হয়েছিল, এই সূর্যগ্রহণের ঠিক পরেই হয়েছিল। কিছু দিন আগে একটা তালিকা বেরিয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে কবে কবে সূর্যগ্রহণ হয়েছে আর তার পরে পরে বিশ্বে কি কি ঝামেলা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এইভাবেই হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বছরেই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সূর্যগ্রহণ হয়।

যাদবরা ঠিক করল, কুরুক্ষেত্রের কাছে সমন্তপঞ্চক নামে এক তীর্থভূমি ছিল, সেখানে সবাই সূর্যগ্রহণের দিন গঙ্গা নদীতে অবগাহন করবেন। সমন্তপঞ্চকের মাহাত্ম্য হল, পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়কুল নিধন করছিলেন তখন সেই সময় তিনি এই সমন্তপঞ্চকে পাঁচটি বড় বড় কুণ্ড কুণ্ড নির্মাণ করে ক্ষত্রিয়েদের রক্তে দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই জায়গাটি পবিত্রস্থান রূপে গণ্য করা হয়ে আসছে। তাছাড়া এখানে অনেক মুনি-ঋষি, মহাত্মারা অনেক তপস্যা করেছেন। কুরুক্ষেত্র তখনও বিখ্যাত হয়নি। গ্রহণ মানেই অশুভ কিছু হতে চলেছে। পূতসলিলা গঙ্গা কাছ দিয়েই প্রবাহিত, সবার বিশ্বাস যে গ্রহণের সময় এই সমন্তপঞ্চকে এসে স্নান করলে সব দোষ কেটে যায়। আকবর বাদশাও সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে চলে আসতেন। আকবর রাজনীতিটা খুব ভালো বুঝতেন, বিশেষ করে রাজধর্ম কি করে চালাতে হবে ভালো জানতেন। হিন্দুদের সবাইকে খুশী রাখতে হবে, সূর্যগ্রহণের সময় তিনি কুরুক্ষেত্রে গিয়ে বসে থাকতেন। সবাই ঠিক করল সমন্তপঞ্চক তীর্থে গিয়ে আমরা গঙ্গায় স্নান করব। শুধু মথুরা বৃন্দাবন থেকেই নয়, পুরো ভারতের লোকজন কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম আসছেন দ্বারকা থেকে। নন্দবাবা এখনও গরু চড়ান, তিনিও নন্দরানী আর বৃন্দাবনের সব ব্রজবাসী ও গোপীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে হাজির হয়েছেন কৃষ্ণ বলরামকে দেখবেন বলে। সেখানে তাদের মিলন হয়েছে। নন্দবাবা থেকে শুরু করে সবার সাথে অনেক দিন পর পরস্পর দেখা হয়েছে, সবাই সবাইকে আলিঙ্গন করছেন। আবার হস্তিনাপুর থেকে কুন্তি, অর্জুনরাও সবাই এসেছেন। রোহিণী ও দেবকীর সাথে যশোদার অনেক দিন দেখা হয়নি। দেখা হতেই এক অপরকে জড়িয়ে ধরেছেন। যশোদার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে তাঁদের কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। রোহিণী আর দেবকী যশোদাকে বলতে লাগলেন – হে যশোদারানী! আপনি ও ব্রজেশ্বর নন্দবাবা আমাদের যা উপকার করেছেন এই প্রতিদান কেউ কোনদিন দিতে পারবে না। জগতে এমন অকৃতজ্ঞ অতি বিরল যে আপনাদের উপকারকে ভুলে যাবে। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম নিজের বাবা-মার মুখ দেখেনি, সেই সময় আপনি ও নন্দবাবা আমাদের এই দুই নয়নমণিকে রক্ষা করেছিলেন। এঁদের লালন-পালন করেছেন, ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন আর এই দুই ভাইকে কত আনন্দে রেখেছিলেন। আপনার প্রতি আমরা দুজন চিরদিন কৃতজ্ঞ। আপনারই ঠিক ঠিক পরম ঋষি, একবারও নিজেদের কথা না ভেবে অপরের সন্তানকে আপনারা বুকে টেনে নিয়ে বড় করেছেন। হে নন্দরানী আপনারা সত্যই মহানুভব।

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলছেন – *গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমোলং পরিরভ্য সর্বাস্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্।।১০/৮২/৪০।* শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পরম প্রিয়তম আর জীবনের সর্বস্ব। তাঁরা চাইতেন আমি যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের পাতা পড়তেই থাকে, সেইজন্য তাঁরা এই চোখের পাতাকে যিনি নির্মাণ করেছেন সেই বিধাতাকেই দোষ দিতেন। বিধাতা কেন এই চোখের পাতা বানিয়েছেন, চোখের পাতা থেকে থেকেই পড়ে যায় আর ততক্ষণের জন্যও আমি কৃষ্ণকে দেখতে পাই না। বিধাতার কারণেই আমি অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পারছি না। নিমেষ মাত্র পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে চোখের আড়ালে চলে দিতে চাইছেন না গোপীরা। কিন্তু চোখ তো মাঝে মাঝেই বন্ধ করতে হচ্ছে, সেটাও গোপীদের সহ্য হচ্ছে না। এতদিন পর, সেই রাসলীলার পরে পরমপ্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আবার গোপীরা দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে কি গভীর ভালোবাসা, এই ভালোবাসাকে কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। বলছেন – নয়নপথ দিয়ে গোপীরা তাঁদের প্রেমস্বরূপ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে সেইখানেই তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। বৃন্দাবনে যে রাসলীলা করেছিলেন সেই রাসলীলা এখানে করা যাবে না, সবার সামনে শ্রীকৃষ্ণকে তো আলিঙ্গন করতে পারবেন না, তাই তাঁরা তাঁদের নয়নপথ দিয়ে নিয়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে নামিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করছেন। হৃদয়ে আলিঙ্গন যখন করছেন তখন গোপীরা তাঁরই চিন্তায় তন্ময় হয়ে গেছেন। বলছেন, যোগীরা যাঁরা নিরন্তর ধ্যানের অভ্যাস করেন তাঁরাও এই রকম তন্ময়তা লাভ করতে পারেন না। যোগশাস্ত্রের শেষ কথা চিত্তবৃত্তি নিরোধ, তখন চিত্তে কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না, চিত্ত তখন সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যরহিত হয়ে যায়। কিন্তু গোপীদের মত এই তন্ময়তার ভাব যোগীদেরও হয় না। শ্রীকৃষ্ণও দেখছেন গোপীরা সবাই তন্ময় হয়ে গেছেন,

তাঁদের মনে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের কী গভীর ভালোবাসা, কৃষ্ণ ছাড়া তাঁরা আর কিছু ভাবতেই পারছেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সব গোপীদের আলাদা করে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন। আলাদা করে নিয়ে তিনি সবাইকে আলাদা আলাদা ভাবে নিজের আলিঙ্গন প্রদান করে সবার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। এখানেও কিন্তু আমরা শ্রীরাধার কোন বর্ণনা পাই না। গোপীরা এখন সব বড় হয়ে গেছেন, তাঁদের সবাইর ছেলেপুলে হয়ে গেছে, এমন কি কারুর কারু নাতি-নাতনিও হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ তখনও মজা করছেন, পুরনো ভালোবাসা কিনা *অপি স্মরণ নঃ সখাঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া। গতাংশ্চিরায়িতাঞ্ছক্রপক্ষক্ষপণচেতসঃ।।১০/৮২/৪২।* 'হে সখি, আমাদের স্বজন-সম্বন্ধীদের কাজ করার জন্য ব্রজভূমি থেকে আমাদের চলে আসতে হয়েছিল। তোমাদের মত প্রেয়সীদের এত ভালোবাসা ছেড়ে শত্রু দমন করতে আমাদের নেমে পড়তে হল, আর শত্রু দমনের জন্য তোমাদের মত প্রেমিকাদের আমাদের ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। আমার জন্য এ কি নিদারুণ দুঃখের কথা!' বলছেন 'এতদিন আমরা প্রাণপাত করে শুধু লড়াই করে গেছি, কতবার আমাদের মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা এত দিনে তোমাদের আমার কথা একবারও একটুও কি মনে পড়েছে'? এখানে শ্রীকৃষ্ণ মজা করার জন্য উল্টো করে গোপীদের ওপর যেন দায় চাপিয়ে দিচ্ছেন। যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের প্রাণবল্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণই গোপীদের ছেড়ে চলে এসেছেন। যে চলে যায় সে ভুলে যায়, যে থেকে যায় সেই মনে রেখে কষ্ট পায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ মজা করে গোপীদের জিজ্ঞেস করলেন। আবার বলছেন 'তোমাদের মনে কি কোন শঙ্কা জেগেছিল যে আমি অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছি, আমি তোমাদের ভুলে গেছি? কিন্তু এই রকম শঙ্কা করো না, কারণ ভগবানই একমাত্র সমস্ত রকম সংযোগ আর বিয়োগের কারণ'। দুজনকে যখন কাছে নিয়ে আসা হয় তার কারণ ভগবান আবার দুজনকে যখন আলাদা করে দেন, তারও কারণ ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন, আমি যে তোমাদের সাথে এতদিন ছিলাম সেটা ভগবানের জন্যই, আর এখন আমি তোমাদের থেকে যে আলাদা হয়ে গেছি সেটাও ভগবানের জন্যই। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে গোপীদের আনন্দ দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বায়ু যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা ও ধুলিকণাকে সংযুক্ত করে আবার খুব স্বচ্ছন্দে বিযুক্তও করে দেয়, তাদের ইচ্ছা মত কিছু হয় না। ঠিক তেমন জগতের সব কিছুর স্রষ্টা ভগবান এই জগতের প্রয়োজনেই সকলের সাথে সংযোগ ও বিয়োগ করে থাকেন।

গোপীদের অদ্বৈত জ্ঞান লাভ

এরপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের কথা বলছেন 'হে সখিরা! তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি সেই ভালোবাসাই আছে, যে ভালোবাসার দ্বারা মানুষ অমৃতত্ব পেয়ে যায়। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন – ঈশ্বরের প্রতি এই ভালোবাসা, প্রেম, ভক্তি লাভ করলে মানুষ তৃপ্ত হয়ে যায়, অমৃতত্ব পেয়ে যায়। অমৃতত্ব পেয়ে যাওয়া মানে, অমর হয়ে যাওয়া। এর পর আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে না। অমৃতত্ব পেলে মানুষ যেমন পূর্ণকাম হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভগবানের প্রতি ভালোবাসা এলে মানুষ পূর্ণকাম হয়ে যায়। যে কোন ধর্মে যাঁরাই ভগবানকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন তাঁরাই পূর্ণকাম হয়ে গেছেন। *অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোহন্তরং বহিঃ। ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ।।১০/৮১/৪৬।* সমগ্র জগৎ পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী হয়েছে। প্রথমে আসে আকাশতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব থেকে বায়ুতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব থেকে অগ্নিতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব থেকে জলতত্ত্ব। কিন্তু সব কিছুর মূলে আকাশ, এই আকাশই আবার সব কিছুর বাইরে ও ভেতরে ওতপ্রোত হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ঠিক তেমনি আমি হলাম সব কিছুর আদি, আর সব কিছুতে আমিই ওতপ্রোত হয়ে আছি। গ্রীকদের মধ্যেও এই ধারণাটা পাওয়া যায়, তাঁরা এটাকে ঈথার বলতেন। আগেকার দিনে যত ধর্মীয় দর্শন আছে সেখানেও এই ধারণাটাকে ঈথার বলেই বলা হয়েছে। আইনস্টাইন পরে প্রমাণ করলেন ঈথার বলে কিছু নেই। আবার অনেক আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঈথারকে মেনে নিলে বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষাকে সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ঈথার বলতে ওনারা যেটা বোঝান, সেটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম জিনিস। যেমন মন সূক্ষ্ম, মন থেকে আরও সূক্ষ্ম আকাশ। আকাশ থেকে মনেরও সৃষ্টি। সেইজন্য শাস্ত্রে যে আকাশের কথা বলা হয়েছে আর বিজ্ঞান যাকে ঈথার বলছে এই দুটো এক জিনিস নয়। আকাশ থেকেই সব কিছুর

উৎপত্তি আবার সব কিছুর মধ্যে আকাশ ওতপ্রোত হয়ে আছে। যেমন উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুতে সমুদ্রে শুধু বরফ ভাসছে। সেই বরফের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা হয়ে আছে, সেই ফাঁকা জায়গাতে আবার জল জমে আছে। এখন যে বরফটা রয়েছে তার বাইরে জল, কারণ সে সমুদ্রের মধ্যে ভাসছে, তার ভেতরেও জল আর সে নিজেও জল। ঠিক তেমনি এই আকাশতত্ত্ব দিয়েই সব কিছু তৈরী, যে জিনিসটা তৈরী হয়েছে তার মধ্যেও আকাশ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সমস্ত প্রাণীর অন্তরে জীব হয়ে আমিই আছি, অথচ আমি সব কিছুর বাইরে ভগবান। পঞ্চভূতের যে খেলা চলছে সেটাও আমি, তার ভেতরে যে অন্তর্যামী সেটাও আমি, তার বাইরে যে অবিনাশী সত্তা ভগবান সেটাও আমি। তোমরা এই জিনিসটা ভালো করে বুঝে নিয়ে আমাকেও তোমরা সেই ভাবে অনুভব কর।

শুকদেব বলছেন – এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপদেশ দিলেন, তখন সেই উপদেশকে বার বার স্মরণ করতে করতে তাঁদের জ্ঞান উৎপত্তি হয়ে গেল। ঈশ্বরই আমার একমাত্র সম্বল, এই ভাবকে যিনি অবলম্বন করে নিয়েছেন তিনি আধ্যাত্মিকতার এক উচ্চতম অবস্থায় চলে গেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রায় নিরানব্বুই শতাংশ শেষ হয়ে গেছে। এরপর 'ভগবানই একমাত্র আশ্রয়' এই কথাতে 'আশ্রয়'টা পাল্টে দিয়ে যখন 'আছেন' শব্দটা নিয়ে আসবেন তখনই পূর্ণজ্ঞান হয়ে যাবে। প্রথম ধাপ 'ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয়' দ্বিতীয় ধাপে 'আশ্রয়' শব্দটা খসে গিয়ে 'আছেন' শব্দ এসে যাবে, ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, এই বোধ এসে যাওয়া মানেই পূর্ণজ্ঞান। গোপীদের ক্ষেত্রে তাঁরা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন, এখানেই শতকরা নিরানব্বুই ভাগ সাধনা সমাপ্ত হয়ে গেল, দ্বিতীয় ধাপে যখন জ্ঞান হয়ে গেল তখন বলছেন শ্রীকৃষ্ণই আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই, এখানেই তাঁদের পূর্ণজ্ঞান হয়ে গেল। আমাদের মত সাধারণ মানুষের সমস্যা হল, মুখে আমরা যতই বলি ঈশ্বরই আমার একমাত্র আশ্রয় কিন্তু আমরা ভরসা করি আমাদের স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের উপর, নিজের ঘর-বাড়ি, নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে। ঈশ্বরই আমার একমাত্র আশ্রয়, ঈশ্বরকেই আমি একমাত্র ভালোবাসি এগুলো আমাদের মুখের কথাতেই থেকে যায়, এই ভাব আমাদের মধ্যে আসে না। আমরা কি কখন ভাবতে পারি যে খুন করছে সেও যেমন ঈশ্বরের একটি রূপ আর যাকে খুন করছে সেও ঈশ্বরের আরেকটা রূপ? কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেলে সত্যিকারে এটাই দেখে, আমিই খুনী আর আমিই খুন হয়েছি। এটাই অধ্যাত্মের শেষ কথা। ভক্তিশাস্ত্রে বলে ঈশ্বরই সব কিছু করছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। আর জ্ঞানীরা বলেন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

মজার ব্যাপার হল ভাগবতে পুরো পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে গোপীদের রাসলীলা বর্ণনা করা হয়েছে, আর তার আগে একটি অধ্যায়ে চীরহরণের কাহিনী বলা হয়েছে। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা কীভাবে তিল তিল করে জমাট বাঁধছিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভাবের কীভাবে রূপান্তর হচ্ছিল তার বর্ণনা করতে ভাগবতের ছটি অধ্যায় লেগেছে। আর সেখান থেকে গোপীদের যে জ্ঞান উৎপত্তি হল সেটাকে মাত্র দুটো শ্লোকে নামিয়ে দিলেন। ঈশ্বরকে যে ভালোবেসে ফেলেছে আর বলছে ঈশ্বরই আমার একমাত্র অবলম্বন, তার আধ্যাত্মিক লড়াই শেষ। সেখান থেকে ছোট্ট একটা ধাপ বাকী থেকে যায়, ঈশ্বরই সব। ইংরাজীতে খুব সহজে বলা যায়, প্রথম ধাপে – God alone is my shelter আর দ্বিতীয় ধাপে my shelter খসে পড়ে যায়, তার মানে God alone is। বাংলাতে 'ঈশ্বরই আমার সব' আর শেষে 'আমার' শব্দটা খসে গিয়ে থাকে 'ঈশ্বরই সব'। সাধনা হল 'ভগবানই আমার সব কিছু' এই ভাবটাকে দৃঢ় করা। এর পরের ধাপটা 'ভগবানই সব কিছু' এই ভাবটা আর সাধনার দ্বারা হয় না, যেদিন তাঁর কৃপা হবে সেদিনই হবে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিজেই বলছেন – আমি সব। যেদিন তাঁর উপর গভীর ভালোবাসা এসে যাবে, তখন তিনি একদিন আশ্রয়টা মুছে দেবেন। আমি তোমার আশ্রয় কি করে হবো, আমিই তো সব। আশ্রয় বললে বলতে হবে আশ্রয়ের বাইরেও কিছু আছে, ভগবান তখন বলে দেবেন, আমার বাইরে কিছু নেই, বাইরে যেটা আছে সেটাও আমি। ছুরি নিয়ে আমাকে একজন মারতে আসছে, তখন আমি দেখছি ঈশ্বরই আমার একমাত্র রক্ষক। তারপর যেদিন তাঁর কৃপা হবে সেদিন ঠাকুর দেখিয়ে দেবেন যে ছুরি নিয়ে মারতে আসছে সেও তিনি। অদ্বৈত জ্ঞানে সত্যি সত্যি এই রকমটিই দেখেন। স্বামীজী বর্ণনা দিচ্ছেন – পওহারী বাবার ঘরে বিষধর সাপ এসেছে। পওহারী

বাবা বলছেন 'আমার প্রিয়তমর কাছ থেকে দূত এসেছেন'। শেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের বললেন 'আমিই সব', এটা শোনার পর গোপীদের সূক্ষ্ম শরীরটা বিনষ্ট হয়ে গেল, তার মানে গোপীদের আর কোন দিন জন্ম নিতে হবে না। এই সূক্ষ্ম শরীরই নতুন নতুন ভোগের জন্য মৃত্যুর পর বিভিন্ন যোনিতে গিয়ে শরীর ধারণ করে। এরপর কোন কর্ম গোপীদের কোন বন্ধন তৈরী করতে পারবে না। এই সংসার একটি পাতকূয়া, এই সংসার রূপ পাতকূয়া থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে অবলম্বন করা। এই হল গোপীদের কি ভাবে জ্ঞান প্রাপ্তি হয়েছিল তার বর্ণনা।

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ

এরপর আসছে পিতা বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দান। বসুদেব অনেকের কাছে, বিশেষ করে বড় বড় ঋষি মুনিদের কাছে শুনেছেন যে, তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ কেউ নন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। আর বসুদেব নিজেও শ্রীকৃষ্ণের অনেক আশ্চর্যজনক কীর্তি দেখেছেন। অন্য দিকে বসুদেবের মনে পড়ল কংসের কারাগারে বন্দী থাকার সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দিয়েছিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে এক সঙ্গে কাছে পেয়ে তাঁদের সম্বোধন করে বলছেন – *কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কর্ষণ সনাতন। জানে বামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ।।১০/৮৫/৩।* হে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ! হে মহাযোগী সঙ্কর্ষণ! আমি জানি তোমরা সনাতন। এই জগতের আধার, নির্মাতা, নির্মাণ সামগ্রী সবটাই তোমরা, তোমরাই এই জগতের কারণস্বরূপ। আমি জানি তোমরা হলে অভিন্ন ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, মুক্তির কারণও তোমরা। এইভাবে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করে যাচ্ছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব ও কীভাবে সৃষ্টি হয় তার এক বিশাল বর্ণনা করে বসুদেব খুব সুন্দর ভগবানের স্তুতি করছেন।

বসুদেব স্তুতি করার পর শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর বলছেন *বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে। যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ।।১০/৮৫/২২।* 'হে পিতা! আমি আর বলরাম তো আপনার পুত্র, আর আপনি এত যে কথা বললেন মনে হচ্ছে আপনি আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান দিতে চাইছেন! তবে আপনি যখন বলেছেন তখন এটা ঠিকই যে, আপনি নিজে, আমি, আমার অগ্রজ বলরাম, দ্বারকাবাসীরা, সম্পূর্ণ জগৎ সবই ব্রহ্মরূপ। সব কিছু ব্রহ্মরূপ বোধ করাই কর্তব্য'। বসুদেব এতক্ষণ বেদান্তের বিরাট লম্বা এক বর্ণনা করেছেন। আসলে বসুদেব এত দিন ঋষিদের মুখে, পণ্ডিতদের মুখে যা যা শুনে এসেছেন, তাতে তাঁর বুদ্ধিতে একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে। বুদ্ধির এই ধারণার পর এবার ভগবান হঠাৎ একদিন কৃপা করে বুদ্ধির এই ধারণাকে পাল্টে দিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। বুদ্ধিতে বোধগম্য করারও একটা মূল্য আছে। গোপীরা শুধু ভালোবাসার জোরেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বসুদেবের বুদ্ধিতে একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে, কারণ ঋষিদের সঙ্গ করে করে তাঁদের কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সব শুনে বলছেন, বাবা! আপনি ঠিকই বলছেন, আপনি, আমি, দাদা বলরাম, দ্বারকাবাসী আর পুরো জগতে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *অহং যূয়মসবার্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃশ্যাঃ সচরাচরম্।।১০/৮৫/২৩।* হে পিতা! আত্মাই একমাত্র আছেন, আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু মায়ার দরুণ তিনি নানান রূপে দেখাচ্ছেন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ, তিনি নিজেকে নিজেই দেখেন অথচ তিনি দৃশ্য হয়ে আছেন। যেমন একটা বোতল, বেদান্তের দৃষ্টিতে বোতলটাও ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু বোতলকে দেখার জন্য অনেক কিছু লাগবে, আলো লাগবে একজন দ্রষ্টা লাগবে ইত্যাদি। কিন্তু তিনি হলেন শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি স্বয়ং প্রকাশ, তাঁকে দেখার জন্য কোন আলোর দরকার হবে না, তাঁর নিজের চৈতন্য আছে। আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বরের ব্যাপারে এটাই আশ্চর্যের। অথচ এই বোতলটা সেই শুদ্ধ চৈতন্য ঈশ্বরেরই অঙ্গ কিন্তু জড় বলে দেখাচ্ছে। এটাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবকে বলছে, জগতের সব কিছু তাঁর নিজের স্বরূপ অথচ আলাদা দেখাচ্ছে, কি আশ্চর্য! একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই যদি থাকেন তাহলে তাঁর বাইরে তো আর কিছু থাকার কথা নয়, অথচ আমি আলাদা আপনি আলাদা, আমরা সবাই সবাইকে আলাদা আলাদা দেখাচ্ছি। এটাই মায়া। তিনি নিত্য অথচ সব কিছু অনিত্য,

এই বোতলের জন্ম হয়েছে, কিছু দিন থাকবে, তারপর একদিন বোতলটা নাশ হয়ে যাবে, অথচ বোতলটাও ব্রহ্মস্বরূপ। নিত্য কিন্তু দেখাচ্ছে অনিত্য রূপে। তিনি নির্গুণ অথচ দেখাচ্ছেন সগুণ, ব্রহ্ম তো নির্গুণ কিন্তু সবুজ বোতল, এর আকৃতিটা গোল লম্বা, তার মধ্যে জল, বাতাস ইত্যাদি।

তখন শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন *এবং ভগবতা রাজন্ বসুদেব উদাহৃতম্। শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তূষ্ণীং প্রীতমোনা অভূৎ।।১০/৮৫/২৬।* হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইসব কথা শুনে বসুদেব নানাত্ব বুদ্ধিকে ত্যাগ করে আনন্দে বিভোর হয়ে নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে মৌন ও নিঃস্পৃহভাবে অবস্থান করলেন। এখানে আমরা ক্রমপর্যায়ে কীভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্মেষ হয় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। প্রথমে আত্মার সম্বন্ধে বসুদেবের বৌদ্ধিক জ্ঞান ছিল। দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের মুখে আত্মার ব্যাপারে সেই কথাই শুনলেন। তৃতীয় ধাপে বসুদেব নানাত্ব বুদ্ধিকে ত্যাগ করলেন। চতুর্থ ধাপে বসুদেব মৌন অবলম্বন করলেন, অর্থাৎ বসুদেবের বাণীর বিরাম হয়ে গেল। পঞ্চম ধাপে নিঃসঙ্কল্প, মন সঙ্কল্প শূন্য হয়ে গেল। শেষ ধাপে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। গোপীদেরও একই জিনিস হয়েছিল, কিন্তু বসুদেবের অন্য ভাবে হয়েছে। প্রথমে ঋষিদের কাছে শাস্ত্রের কথা শুনে বসুদেবের একটা ধারণা তৈরী হয়েছিল। সেই ধারণাকে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ় করে দিলেন। ধারণা দৃঢ় হতেই বসুদেবের মন অন্য স্তরে চলে গেল। অন্য স্তরে গিয়ে বসুদেব নানাত্ব বুদ্ধিটা ছেড়ে দিলেন, নানাত্ব বুদ্ধি মানে সব কিছুক আলাদা আলাদা দেখা, এই নানাত্ব বুদ্ধিটাকে ত্যাগ। নানাত্ব বোধটাও একটা বুদ্ধি আবার একত্ব বোধটাও বুদ্ধি দিয়েই হয়। যেখানে নানাত্ব নেই সেখানে কথা কি করে বেরোবে! যেখানে নানাত্ব নেই সেখানে মনে সঙ্কল্প কি করে উঠবে! তাই মন মৌন হয়ে গেল, মন সঙ্কল্পশূন্য হয়ে গেল। তার মানেই পূর্ণতা, পূর্ণতা মানেই মন শান্ত, শান্ত মানেই আনন্দ। এইভাবে বসুদেবের ব্রহ্মজ্ঞান হল।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নানা রকম কাহিনী আছে, এতক্ষণ আমরা সুদামার কাহিনী, গোপীদের কাহিনী ও বসুদেবের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করলাম। এরপরেও অনেক কাহিনী আসে, যেমন মিথিলার শ্রুতদেব নামে এক ব্রাহ্মণের কাহিনী আসে। ভগবানের লীলার অনুধ্যান করার জন্য এই রকম অনেক লীলা কাহিনী ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক ভক্ত কবি ও ঋষিরাও শুধু ভগবানের লীলাকে নিয়ে বর্ণনা করেছেন, যেমন সুরদাস শুধু শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে আধার করেই তাঁর গীত রচনা করে গেছেন। ভাগবত সেই তুলনায় অন্য রকম। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সেই সব লীলাকেই বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে আধার করে মানুষের মনে একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ধারণা করিয়ে দেওয়া যায়।

<u>বেদস্তুতি</u>

এরপর একটা খুব সুন্দর অধ্যায় আসে, এই অধ্যায়কে বলছেন বেদস্তুতি। এখানে দেখাচ্ছেন সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদ কীভাবে ভগবানের স্তুতি করে। বেদস্তুতি ভাগবতের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখানে খুব উচ্চস্তরের একটা আলোচনা করে দেখানো হচ্ছে বেদ কীভাবে ভগবানকে দেখেন। ভাগবতের ব্যাখ্যাকার শ্রীধরস্বামী বেদস্তুতির যে ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও খুব কঠিন ব্যাখ্যা, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চমানের ব্যাখ্যা। বেদস্তুতিকে ঠিক ঠিক ধারণা করে নিলে বোঝা যায় ভাগবত কত গভীর শাস্ত্র। ভাগবতের বেদস্তুতি আমাদের সবারই অন্তত একবার পড়া দরকার। রাসলীলার যেমন একটা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে, যেটা না ধরতে পারলে রাসলীলার অন্য অর্থ এসে পুরো গোলমাল পাকিয়ে দেবে। বেদস্তুতি ঠিক তার উল্টো এখানে যা আছে সব পরিষ্কার আর সরাসরি ভাবে আছে। কিন্তু একেবারে ঘোর বেদান্তের কথা বলা হয়েছে। তাই বেদস্তুতির কবিতা যেমন কঠিন আর এর তত্ত্বগুলি বোঝা আরও কঠিন।

হিন্দুদের মোটামুটি সবারই একটা ধারণা যে ভগবান নির্গুণ নিরাকার। অনেকেই নির্গুণ নিরাকার শব্দটা শুনেছে, কিন্তু সাধারণ জীবনে এর প্রয়োগ একেবারেই দেখা যায় না। হিন্দুদের ভগবান একটাই – নির্গুণ নিরাকার। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য যে, কিছুটা খ্রীশ্চানিটির জন্য, কিছুটা ইসলামের জন্য আর কিছুটা আমাদের মূঢ় বুদ্ধির জন্য সব হয়ে গেছি সগুণ সাকারবাদ, আমরা ভুলেও গেছি যে হিন্দুরা আসলে নির্গুণ নিরাকারবাদী। যারা মন্দ বুদ্ধি সম্পন্ন তারা নির্গুণ নিরাকার কি জিনিস বুঝতে পারেনা, আর সগুণ সাকারকে তুখোড় বুদ্ধিমানরা

যুক্তি তর্ক দিয়ে কেটে উড়িয়ে দেয়। দুটোতে এই সমস্যা আসে। সেইজন্য হিন্দুরা একটা মাঝামাঝি জায়গা বার করেছে। যাদের বুদ্ধি প্রখর আর দর্শনাদি তত্ত্বে বলিষ্ঠ তাদের জন্য উপনিষদ, আর যাদের বুদ্ধি কম আর দর্শনের তত্ত্ব বোঝার অতটা ক্ষমতা নেই তাদেরকে একটু ভক্তি এনে সগুণ সাকারে নামিয়ে দিয়েছ।

হিন্দুরা যে দৃষ্টিতে বেদকে দেখে আর খ্রীশ্চান ও ইসলাম তাদের বাইবেল ও কোরানকে যে দৃষ্টি নিয়ে দেখে, এই দুটো দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে। বাইবেল, কোরান এবং বেদে যা আছে সবই ভগবানের কথা। কোরান আল্লার কথা, সেইজন্য ইসলামে কেউ বলতে পারবে না যে আমি কোরানকেও অতিক্রম করে গেছি। বাইবেলের ক্ষেত্রে, খ্রীশ্চানরা যীশুকে বলছে লোগোস, লোগোস মানে word, - in the beginning there was word, the word was with the God and the word was God। বাইবেল এখান থেকেই শুরু হয়। প্রথমে ছিল শব্দ, শব্দ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, আর শব্দই ঈশ্বর। যীশুকে বলা হয় one with that logos, তাহলে বেদ, বাইবেল আর কোরান, যে তিনটে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এই তিনটেই সমান হয়ে গেল, কারণ বেদ ভগবানের নিঃশ্বাস, মানে ভগবানের কথা, ভগবানের বাইরে সে কিছুই বলছে না। যেমন কথামৃত, ভগবানের কথা। কিন্তু একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। যে কোন আধ্যাত্মিক সাধক, বিশেষ করে হিন্দুরা বলবে যখন সাধনা করতে করতে প্রথম যেটাকে পার করে যেতে হবে তা হল - বেদের পারে চলে যেতে হবে - *তত্ত্ববেদা অবেদা ভবতি*। যখন কেউ ঐ অবস্থায় চলে যাবেন তখন বেদ সেখান থেকে অনেক নীচে পড়ে থাকে। ঠাকুর বলছেন এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। কোন মুসলমান কিন্তু বলতে পারবে না, আমার অনুভূতি কোরানকে ছাড়িয়ে গেছে, তাহলে তার খুব বিপদ হয়ে যাবে। একজন খ্রীশ্চান বলে দেখুক তো আমার অনুভূতি বাইবেলকে ছাড়িয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম থেকে তাকে বার করে দেবে। হিন্দুদের মজাটা হচ্ছে, তারা বলবে প্রথমে বেদ ছিল, যাই সৃষ্টি হচ্ছে সব বেদ থেকে হচ্ছে। অথচ আধ্যাত্মিক সাধনা করে করে যখন এগিয়ে যায় তারপরেই বলে আমি বেদকে পার করে গেছি। হিন্দুদের এই বিপরীত ধারণাকে বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিণ। আর এটাই হিন্দু ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। ইসলাম আর খ্রীশ্চানদের কাছে কোরান ও বাইবেল শেষ কথা। হিন্দুদের কাছে বেদ শেষ কথা নয়। কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে বেদ, বাইবেল আর কোরান নিজের নিজের ধর্মের কাছে সমান। অথচ হিন্দুরা সাধনার একটা অবস্থায় গিয়ে বেদকে নীচে নামিয়ে দেয়। কেন করে দেয়? এইখানে ভাগবতে বেদস্তুতির এই অধ্যায়ে এটাকেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞেস করছেন *ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ। কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে।।১০/৮৭/১।* 'আপনার কথা শুনে আর অন্যান্য ঋষিদের বাক্য শ্রবণ করে আমার যা ধারণা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, যাঁকেই ভগবান বলা হচ্ছে, সেই ভগবান সৎ ও অসৎ এই দুটোরই পারে'। সৎ আর অসৎ এই দুটো শব্দই দুটো ক্ষেত্রে দুটো অর্থে ব্যবহার করা হয়। সেইজন্য কি পরিপ্রেক্ষিতে সৎ বা অসৎ শব্দ আসছে সেটা জানার পর সেই অনুসারে এই দুটো শব্দের অর্থ নির্ধারণ করতে হবে। এইভাবে যদি অর্থ নির্ধারণ না করা হয় তাহলে পুরো শাস্ত্রকেই আমরা গুলিয়ে ফেলব, মনে হবে শাস্ত্র এক জায়গায় এক কথা বলছে অন্য জায়গায় অন্য কথা বলছে। সৎ মানে যেটা আছে আর অসৎ মানে যেটা নেই। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই নিত্য বাকি সব অনিত্য। সেদিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলে বলতে হবে একমাত্র যিনি আছেন তিনিই ঈশ্বর। সেইজন্য সৎ বলতে কখন কখন বোঝাবে ঈশ্বর। আর অসৎ বলতে বোঝায় যেটা নেই। তাহলে নেই কোনটা? মায়া, সেইজন্য অসৎএর অর্থ মায়া। সৎ ও অসৎকে এইভাবে একটা অর্থ করা হল। কিন্তু বেদান্তে যেটা প্রায়ই আসে, ভাগবতেও যেটা আসবে, মহাভারতেও আসে, সেখানে সৎ মানে যেটা আছে। কোথায় আছে? পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেটাকে ধরা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই সৎ বলা হচ্ছে। আর ইন্দ্রিয় যেটাকে ধরতে পারছে না, সেটাকে বলছেন অসৎ। ইন্দ্রিয় দুটো জিনিসকে ধরতে পারেনা, যে জিনিসটা নেই। যে জিনিসটা নেই সেটা একটা শব্দমাত্র, তাকে ইন্দ্রিয় কি করে ধরবে! কি রকম শব্দমাত্র? আকাশকুসুম, ইন্দ্রিয় আকাশকুসুমকে কীভাবে ধরবে, এর নাম আছে কিন্তু বস্তু বলে আদপে কিছু নেই। তাই আকাশকুসুম হয়ে গেল অসৎ। অন্য দিকে মায়াকেও জানা যায় না, তাই মায়াও অসৎ। যে জিনিসটা ত্রিকালে নেই আর কোন দিন

হবেও না, পরে এনারা এর একটা নতুন শব্দ দিয়ে নাম দিলেন অলীক। অলীক মানে, যেটা শব্দ মাত্র, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, কিন্তু বন্ধ্যাপুত্র বলে কিছু হয় না, এটাই অলীক, অলীক মানে যেটা নেই আর কোন দিন হবেও না। কিন্তু শাস্ত্রে যখন ব্যবহার কর হয় তখন এই দুটো শব্দকেই নিয়ে আসা হয়, সৎ আর অসৎ। কখন সৎ শব্দের ব্যবহার হয় সচ্চিদানন্দের সৎ শব্দ দিয়ে, ঈশ্বর সৎ। কিন্তু যখনই বলা হয় তিনি সৎ অসৎএর পারে তখন সেটা সচ্চিদানন্দের সৎ নয়। তখন সৎ এর অর্থ হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে দুটো জিনিস এসে যাবে, একটা হয়ে যাবে অলীক, আরেকটা অর্থ হবে মায়া, যে সব কিছুকে জন্ম দিয়েছে। মায়াকে নিয়ে আবার অনেক রকম সিদ্ধান্ত চলে। কখন মায়াকে সৎ বলছে, কারণ মায়াই আছে, মায়া থেকেই সব জন্ম নিচ্ছে। মায়াকে কখন আবার অসৎ বলছে কারণ মায়া বলে কিছু নেই। আবার কখন সখন মায়াকে ব্যাখ্যা করে সৎ অসৎ থেকে বিলক্ষণ একটা জিনিস বলছে, আছে আবার নেই। যেমন নাম আর রূপ, নাম-রূপ আছে আবার নেই। মেয়েরা গয়না পড়ে, গয়না একটা নাম আর তার নানান রকম রূপ আছে, কানের দুল, হাতের বালা ইত্যাদি। কিন্তু সোনার দৃষ্টিতে দেখলে তখন নাম-রূপ থাকবে না, সোনাই আছে। তাই মায়া আছে আবার নেই, এই দুটো অর্থেই চলে। উপনিষদে যখন বলা হয় সৃষ্টি সৎ থেকে হয়েছে কিংবা যখন বলছেন অসৎ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তখন এর অর্থ বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ভাবে করতে হয়। যখনই বলা হবে ভগবান সৎ, তখন পরিষ্কার অর্থ হবে ভগবানই আছেন ভগবান ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু যদি শাস্ত্র বলে ভগবান সৎ অসৎএর পারে – তখন এই সৎএর অর্থে বলতে হবে ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। ভগবানকে যদি ইন্দ্রিয় দিয়ে না জানা যায় তাহলে তো ভগবান বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানীরা তাই বলছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র বলে দিচ্ছে ভগবান অসৎ নন। ভগবান কেন অসৎ নন? তিনি আকাশকুসুমের মত অলীক কোন বস্তু নন, তিনিই একমাত্র আছেন।

পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন করছেন তার ঠিক ঠিক অর্থ হল – ভগবান কার্য ও কারণ এই দুটোরই পারে। কার্যটা কি? এই দৃশ্যমান জগৎ, সৃষ্টিতে যা কিছু দেখছি সেটাই জগৎ। এই জগতের কারণ কি? মায়া। দুটোরই পারে ভগবান। এখানে অসৎ বলতে বোঝাচ্ছেন যেটা সৎ এর মা, তাকে দেখা যাবে না, কিন্তু আছে। *নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ*, পরীক্ষিৎ বলছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু আছে সবটাই সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটের মিশ্রণ। ভগবান এই তিনটে গুণের পারে নির্গুণ। শাস্ত্রের এই সব কথা ধারণা করতে অনেক সময় লাগবে। শুনতে শুনতে ভেতরে একটা সংস্কার তৈরী হয়। কোন এক ধর্মীয় সেমিনারে একজন খুব বিখ্যাত বয়স্ক পণ্ডিত শাস্ত্রের কয়েকটি বিষয়ের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানে অল্প বয়সী এক মহিলা পণ্ডিতকে একটা প্রশ্ন করেছেন, পণ্ডিত তার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। মহিলা দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন, পণ্ডিত তারও কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলেন, তৃতীয় প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন তখনই পণ্ডিত মহিলাটিকে প্রশ্ন করছেন 'আপনি কি দর্শনের ছাত্রী'? মহিলাটি বললেন 'না'। 'আপনি কি সংস্কৃত জানেন'? বললেন 'না'। 'তাহলে বছরের পর বছর শাস্ত্রের কথা শুনে শুনে আগে কর্ণশুদ্ধি হোক, সংস্কার তৈরী হোক, তারপর বুঝতে পারেবেন এই প্রশ্ন হবে কি হবে না'। প্রথমে শুনে শুনে একটা সংস্কার তৈরী করতে হয়, এরপর সাধনা করতে করতে সংস্কারকে পাকা করতে হবে তারপরে ঈশ্বরের কৃপায় হঠাৎ একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জীব বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদের চোখের পাপড়ির মধ্যে কোটি কোটি ছোট্ট জীবানু বাস করে, ইংরাজীতে এদের নাম mites। আমাদের শরীর থেকে যে ঘাম জাতীয় যা কিছু বেরোয় সেটাই এরা খাওয়া-দাওয়া করে, ওরই মধ্যে ওদের নিজেদের মধ্যে বিয়েথা হচ্ছে, লড়াই ঝগড়া হচ্ছে, মারামারি করছে, মারা যাচ্ছে, জন্মাচ্ছে। এই ব্যাপারটা অনবরত হয়েই চলেছে। এটাই যখন একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় তখন আমাদের চোখের পাতাটা চুলকাতে ইচ্ছে করে। বিছানার চাদরে শত শত কোটি জীবানু থাকে, আমাদের শরীর থেকে যে চামড়া খসে খসে পড়ছে সেটাই তাদের প্রধান খাদ্য। সেইজন্য বিছানার চাদর নিয়মিত না পাল্টালে নানা রকম চর্মরোগ হবে। ঠিক সেই রকম পায়ের একটা আঙুলের নখের মধ্যে যে ময়লা জমছে তার মধ্যে পুরো একটা ব্রহ্মাণ্ডের মত সৃষ্টি চলতে থাকে। আমার পায়ের আঙুলের নখের জীবানুগুলো যদি আমাকে নিয়ে আলোচনা করতে থাকে তাহলে তারা কি কোন দিন আমাকে জানতে পারবে? কোন দিনই পারবে না। ভগবানের সাথে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক এই রকম। ভগবানের পায়ের আংঠার যে নখ, সেই নখের যে নখাগ্র,

সেই নখাগ্রের মধ্যে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আমাদের কি হচ্ছে, কি না হচ্ছে সেই ভগবান বেচারী তার টেরও পান কিনা সন্দেহ। ভগবানের কাছে আমাদের অস্তিত্ব হল আমার পায়ের আংঠার নখাগ্রে শত শত কোটি জীবানুর মত। এটাই বাস্তব। মূল কথা হল ভগবান তিন গুণের অতীত। এই তিন গুণই, সত্ত্ব, রজো ও তমো আবার সৃষ্টিকে ধরে রাখে। *ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে,* ব্রহ্মকে যে আকার ইঙ্গিতে নির্দেশ করবে সেটাও সম্ভব নয়। যেমন, বাচ্চাকে আকাশে চাঁদ দেখানোর সময় আঙুল দিয়ে চাঁদের দিকে নির্দেশ করে বলে এটাকে চাঁদ বলে। চাঁদকে তো তখন ছুঁয়ে দেখানো হচ্ছে না, আকার ইঙ্গিতে দেখানো হচ্ছে। কবিতাতেও আকার ইঙ্গিতে একটা ভাবকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ভগবান হলেন অনির্দেশ, ইন্দ্রিয় দিয়ে তো তাঁকে জানা যাবেই না, ইশারা করে বলবেন তাও সম্ভব নয় এতই অতীত তিনি। অতীত মানে, তিনি তো সর্বব্যাপী।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করছেন, যিনি নির্গুণ, যিনি নিরাকার, যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে শ্রুতি কি করে ব্যাখ্যা করবে? অথচ আপনি বলছেন বেদ নাকি ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করে? এখানেই তো বৈপরিত্য এসে গেল। যে কোন কথা, যে কোন ব্যাখ্যা সেই জিনিষেরই হতে পারে যেটা এই তিন গুণের মধ্যে আছে। কিন্তু ভগবান গুণাতীত, তাহলে বেদ কী করে তাঁর ব্যাখ্যা করতে পারবে? হিন্দুরা বলছে বেদ ভগবানের কথা, আর বেদই শেষ কথা, কিন্তু বেদ এই তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ। আকার ইঙ্গিতেও ভগবানের কথা বলা বেদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবান গীতাতেই বলছেন *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জুন*, পরিষ্কার বলছেন বেদ এই তিনটে গুণের মধ্যে বাঁধা। শুধু বেদই নয়, যে কোন শাস্ত্রই সত্ত্ব, রজো ও তমোর মধ্যে আবদ্ধ। এখন আল্লাই বলুন, গড বলুন, শ্রীরামকৃষ্ণই বলুন, তিনি হলেন তিনটে গুণের পারে। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ কীভাবে জানা যাবে? লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে জানা যাবে? কখনই না, লীলাপ্রসঙ্গও তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ। ঠিক তেমনি যদি কোন পণ্ডিতকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় পুরাণ শাস্ত্রটা কি? তিনিও বলবেন ওটা তো *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা*। যে তিনটে গুণের মধ্যে সে কি করে গুণাতীতের কথা বলবে? নির্গুণের স্বরূপ মন, বুদ্ধি, শব্দ, ক্রিয়া এগুলোর বাইরে। তাহলে বেদ, কোরান, বাইবেল ভগবানের বর্ণনা কি করে করবে? উপনিষদেও বলছে – *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,* মন তাঁকে বুঝতে না পেরে সেখান থেকে ফেরত চলে আসে। ঠাকুর বিদ্যাসাগর মশাইকে বলছেন 'সব শব্দ এঁটো হয়েছে, ব্রহ্ম শব্দ উচ্ছিষ্ট হয়নি'। কিন্তু বেদ ব্রহ্মেরই আলোচনা করছে। একদিকে বলছে ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করা যায় না, অথচ বেদ ব্রহ্মের কথা বলছে, contradiction এসে গেল। ইসলাম যতই বলুক কোরান আল্লার কথা, কিন্তু ওরা যদিও মানতে চাইবে না যে কোরান আল্লার শেষ কথা যতই হোক আল্লার বর্ণনা কোরান করতে পারবে না। সম্ভবই নয়, যদি বর্ণনা করে দেয় তাহলে আল্লা হয়ে যাবেন সগুণ সাকার। হিন্দুরা ভালো করেই জানে বেদ ব্রহ্মের স্বরূপ কোন দিন বর্ণনা করতে পারবে না। তাহলে বেদ ও ব্রহ্মের কি সম্পর্ক? আমরা ব্রহ্মের ব্যাপারে কোথা থেকে জানতে পারি? বেদে বলা হয়েছে। কিন্তু বেদ হল শব্দ আর ব্রহ্ম শব্দের পারে। তাহলে শব্দ দিয়ে শব্দের পারের জিনিসকে কি করে জানা যাবে? এটাই মূল প্রশ্ন। এবার শুকদেব এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু করছেন। উত্তর দেওয়ার সময় শুকদেব ভগবানের স্বরূপ আর বেদের স্বরূপ এই দুটোকে নিয়েই আলোচনা করছেন।

প্রথমে শুকদেব বলছেন *বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মনেহকল্পনায় চ।।১০/৮৭/২।* ভগবান একদিকে নির্গুণ নিরাকার কিন্তু অন্য দিকে তিনি সর্বশক্তিমান আর তিনি সকলগুণনিধান, সমস্ত গুণের খনি। শ্রুতি মানে বেদ ভগবানের বর্ণনা ঠিক স্পষ্ট ভাবে করে না, কিন্তু বর্ণনা যেটা করে সেটা সব সময় যিনি সগুণ তাঁরই বর্ণনা করে, নির্গুণের কথা বলে না। যেই বলা হবে ভগবান করুণাময়, তিনি দয়াবান, তিনি কৃপাসিন্ধু ইত্যাদি তখনই সগুণ ঈশ্বরে চলে এল। শুকদেব বলছেন, বেদ যেটাই বলছে সেটাই সগুণের ব্যাখ্যা। কিন্তু পরীক্ষিৎ, তুমি যদি ভালো করে বিচার কর, প্রথমে বেদের কথাকে অবলম্বন করবে, তারপর তোমার বুদ্ধিকে অবলম্বন করে বেদের কথাকে খুব ভালো করে বিচার করবে তখন দেখবে একটা জায়গায় এসে বুদ্ধি থেমে যাবে, তখন দেখবে বেদের বক্তব্যের তাৎপর্যটা তোমার সামনে ভেসে উঠবে, যেটা ভেসে উঠবে দেখবে সেটা নির্গুণ নিরাকার। বেদের বক্তব্যের তাৎপর্য একটা জিনিষের দিকে ইঙ্গিত ইশারা করছে, সেটা নির্গুণ নিরাকারের দিকেই করা হয়েছে। শুকদেব এখানে খুব সূক্ষ্ম যুক্তির কথা বলছেন,

এই সূক্ষ্ম যুক্তিটা না ধরতে পারলে পরীক্ষিৎএর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কেউ এসে তর্ক করতে পারে আমি কি করে জানবো যে বিচার করলে তাৎপর্যটা নির্গুণ বেরোবে? তখন এনারা বলবেন, তুমি বিচার করে আগে দেখোই না। শাস্ত্রে এই বিচারটাও করা হচ্ছে। যে কোন শাস্ত্র, বেদ, বাইবেল, কোরান যাই হোক তাঁরা যে ভগবানের ব্যাখ্যা করছেন সেটা সব সময় সগুণ সাকার ঈশ্বরের বর্ণনাই করছেন। এবার সেই ব্যাখ্যাকে বিচার করতে বলছেন। কিন্তু আমার বিচার এক রকম হবে, আপনার বিচার আরেক রকম হতে পারে। বিচার আলাদা আলদা হবেই, কারণ আমাদের মন শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে যদি বিচার করা হয় তখন তার অর্থ সব সময় চলে যাবে নির্গুণ নিরাকারের দিকে।

শ্লোকের পরের লাইনে বলছেন, *মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মহেহকল্পনায় চ*, ভগবান তাই বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃষ্টি করলেন যার সাহায্যে মানুষ ভগবানের স্বরূপ জানতে পারে। প্রাণের দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করছে। মানুষ যদি মরেই যায়, তাহলে তো সে আর ভালো কাজ করতে পারবে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণের দ্বারা মানুষ শাস্ত্রে যে ভগবানের কথা আছে সেই কথা পড়তে পারবে ও শুনতে পারবে, এইভাবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভগবানের কথা তার ভেতরে যাচ্ছে। মন দিয়ে ভগবানের কথা মনন করতে পারছে আর বুদ্ধি দিয়ে নিশ্চিত করে শ্রুতির তাৎপর্য বার করবে। এই যা কিছু আছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এর সব কিছু ঈশ্বরই বিধান করেছেন। আর মহাবাক্যে যে কথা বলা হয়েছে – বেদে চারটে মহাবাক্য, (১) *অহং ব্রহ্মাস্মি* (২) *তত্ত্বমসি* (৩) *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* আর (৪) *অয়মাত্মা ব্রহ্ম*, শুকদেব এই চারটি মহাবাক্যকে চিন্তন করতে বলছেন। আবার অন্য দিকে বলছেন ব্রহ্ম কি জিনিস মুখে বলা যায় না। বেদ যে বলছে অহং ব্রহ্মাস্মি, সে তো শুধু ইঙ্গিত ইশারা করছে, কারণ উপনিষদ কখনই বলতে পারবে না যে ব্রহ্ম জিনিসটা কি। কিন্তু যখন প্রথম বার শুনে নিল *অহং ব্রহ্মাস্মি*, এর পর বিচার করতে শুরু করবে। বিচার করতে করতে একটা সময় এটাই স্পস্ট হয়ে গিয়ে তার জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে যাবে। জ্ঞান উপলব্ধির পর যা হবে সেটাই বেদ ইশারা করেছিল। এই মহাবাক্য কোত্থেকে জেনেছি? *অহং ব্রহ্মাস্মি* বা *তত্ত্বমসি*র কথা কোথায় পাওয়া যাবে? শ্রুতিতে পাওয়া যাবে, মানে শ্রুতি ইঙ্গিত করেছিল, এর চেয়ে বেশী সে কিছু করেনি। মানে সগুণ ছাড়া নির্গুণের ব্যাখ্যা কি করে করবে? যার কোন গুণ নেই তার কথা বর্ণনা করাই যায় না, কি করে করবে, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু নির্গুণ ব্যাপারে যে কথাগুলো বলেছে সাধনার করার পরে যখন তোমার উপলব্ধি হবে একমাত্র তখনই তুমি বোধে বোধ করতে পারবে। কিন্তু নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকার যাই হোক না কেন, যদি কোন উপলব্ধিই নাই হয়, তাহলে তার কোনই মূল্য নেই। কেউ বলে দিল, ঈশ্বর এই রকম। এখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার এই ঈশ্বরকে কি কেউ দেখেছে, কেউ অনুভব করেছে, কেউ উপলব্ধি করেছে? না, আগেও কেউ করেনি, এখনো কেউ করছে না, আর কেউ কোন দিন উপলব্ধি করতেও পারবে না। তাহলে তোমার কথার কি দাম রইল? এই উপলব্ধির লাভটা কি?

যদি আমি বলি বিল গেটস্ আমারই ছদ্মনাম হচ্ছে। কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে যে এটা আমার ছদ্মনাম নয়? আমি বলছি মাইক্রোসফটস্ কোম্পানিটা আমারই। আপনি বললেন ‘ও, তাই, ঠিক আছে পাঁচটা টাকা দিন তো’। আমি বলব ‘ঐ টাকা কাউকে দেওয়ার জন্য তো নয়, আপনাকে দেওয়া যাবে না’। ‘ও তাই, ঠিক আছে একটা চেকে বিল গেটস্এর সই করুন তো দেখি ঐ চেকটা চলে কিনা’। ‘আমি কেন চেকে সই করে আপনাকে দেখাতো যাবো’? ‘আচ্ছা ঠিক আছে, তা, আপনি এত কাঙালের মত থাকেন কেন’? ‘আমি স্বেচ্ছায় থাকছি’। এবারে আপনি প্রমাণ করুন আমি বিল গেটস্ নই। কেউই করতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে কি সবাই আমাকে বিল গেটস্ বলে মেনে নেবে? আপনি বলবেন আমার নিকুচি করেছে তোমাকে বিল গেটস্ বলে মানা। একটা পয়সা দেওয়ার তোমার মুরোদ নেই, আর তুমি বিল গেটস্!

যে ভগবানকে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না, সেই ভগবানকে নিয়ে আমার কি হবে! তার মানে কেউ উপলব্ধি করেছেন বলেই অনেক মানছে। কোথা থেকে উপলব্ধি করে? শ্রুতি বাক্য শুনেই হয়। শ্রুতি বলে দিয়েছে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* – এই সব তিনিই। এই বাক্যকে চিন্তন করতে করতে হঠাৎ এক দিন পরিষ্কার হয়ে যায়। সেইজন্য শ্রুতি যদিও প্রত্যক্ষভাবে বলে না কিন্তু ইঙ্গিতে বলে, সেই কারণে কেউ যদি বলে বেদ যখন

ভগবানের কথা বলতেই পারবে না, তাহলে বেদ পড়ব কেন? এই কারণেই পড়তে হবে – তুমি গুরুর মুখে শ্রুতির বাক্য শুনে নিলে, তারপর তাকে মনন করবে, নিদিধ্যাসন করবে, ধ্যান করবে তখন তোমার পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তুমি আদপেই না কর তাহলে তোমার কিছুই হবে না। একটা উপমার সাহায্যে বোঝালে ভালো বুঝতে পারবেন – পোল ভল্ট খেলাতে একটা পোল নিয়ে অনেক উঁচু পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। পোলটাকে নিয়ে দৌড়াতে থাকে, পাঁচিলের কাছে এসে পোলটাকে ভর দিয়ে সে লাফ দিয়ে পোলটাকে ছেড়ে দেয়। পোলটা কিন্তু তাকে পাঁচিল পার করাচ্ছে না, পোলটা তাকে সাহায্য করে। পোলের সাহায্য যদি সে না পায় তাহলে সে পাঁচিল ডিঙ্গোতে পারবে না। আবার লাফ দেওয়ার মুহূর্তে যদি সে পোলটা ধরে রাখে তাহলেও সে ডিঙ্গোতে পারবে না, একটা মুহূর্তে পোলটা ছেড়ে দিতে হয়। বেদ ঠিক তাই। বেদকে ধরেই লাফটা মারতে হয়, তারপর একটা অবস্থায় গিয়ে বেদকে ছেড়ে দিতে হয়। তখনও যদি সে বেদকে ধরে রাখে তাহলে আর পার করতে পারবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। ঠাকুরকেই নয়, সবাইকেই ছাড়িয়ে যেতে হবে। যে কোন উপলব্ধিই মানে বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু যদি প্রথমে না ধরে রাখে তাহলে কিন্তু এগোতেই পারবেন না। সেইজন্য কি হচ্ছে? যখন বিচার করা হয় তখন দেখা যায় বেদ তাঁরই কথা বলছে। আমরা মানব জীবন কেন পেয়েছি? যাতে এই বিচারটা করতে পারি। ভগবান সেইজন্য এই মানব শরীরে প্রাণ দিয়েছেন, শরীরের যদি প্রাণই না থাকে তাহলে সে কি করে বিচার করবে! প্রাণের সাথে তিনি ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, কান, চোখ, মুখ দিয়েছেন, যাতে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করতে পারি, ঈশ্বরীয় কথা অধ্যয়ন করতে পারি, ঈশ্বরের বাইরে তাই কোন কথা বলতে নেই। এইভাবে ঈশ্বরীয় কথা ভেতরে গেল। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই কথার বিচার করার জন্য ভগবান আমাদের মন দিয়েছেন আর বুদ্ধি দিয়ে একেবারে নিশ্চিত করছি – হ্যাঁ এটাই ঠিক। কি ঠিক? ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। অবস্তু যা কিছু আছে সব ফেলে দাও, ফেলে দিয়ে শুধু ধরে রাখ এই আপ্ত বাক্যকে, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। ঈশ্বর আমাদের এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম শাস্ত্র মানেই সাকার নিরুপক, শাস্ত্রে যা কিছু বর্ণনা আছে সবই সগুণ সাকার ঈশ্বরের কথা। মুসলমানরা সব থেকে বেশী মূর্তি পূজার বিরোধী, কিন্তু তাদের কথাতে সবই সগুণ সাকারের কথা। এই সমস্যা হিন্দুদেরও আছে, কিন্তু ঋষিরা বলছেন সেইজন্য ভগবান তোমাকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়েছেন। এবার তুমি যখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়ে শাস্ত্রের কথা ভেতরে ঢুকিয়ে মনন-চিন্তন করবে, বিচার করবে তখন দেখবে সেই সগুণ সাকারের স্বরূপ নির্গুণ নিরাকার। শুকদেব তাই বলছেন, পরীক্ষিৎ! তুমি ঠিক প্রশ্নই করেছ। বেদ সগুণ সাকারের কথাই বলছে, নির্গুণ নিরাকারের কথা কি করে বলবে? কিন্তু তুমি যেটা শুনবে সেটা সগুণ সাকারের কথাই শুনবে। গরু ঘাস খাচ্ছে, খড় খাচ্ছে। সেই ঘাস খড় গরুর ভেতরে গিয়ে দুধ হয়ে বেরিয়ে আসছে। সেই দুধকে যখন মেশিনে দেওয়া হবে তখন সেখান থেকে মাখন বেরিয়ে আসবে। তোমার যে শরীর, মন, বুদ্ধি এগুলো হল মেশিন। এই মেশিনে বেদের দুধরূপ সগুণ সাকার কথাগুলোকে মন্থন করলে মাখনরূপ নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বর বেরিয়ে আসবেন। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশে আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ছেড়ে দিতে হয়। মন, বুদ্ধি রূপ মেশিন যদি প্রস্তুত না থাকে দুধকে মন্থন করা যাবে না, সম্ভবই নয়। সেইজন্য বলছেন এর জন্য শুদ্ধ ইন্দ্রিয়, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির দরকার। শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে মন্থন করার পরে দেখে তিনি সগুণ সাকার নন, তিনি নির্গুণ, তিনিই আছেন। সেইজন্য নিজের মনকে শেষ গুরু বলা হয়।

তারপর শুকদেব বলছেন *সৈষা হ্যুপনিষদ্ ব্রাহ্মী পূর্বেষাং পূর্বজৈর্ধৃতা। শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্ যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ।।১০/৮৭/৩।* ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদ সমূহে যা বলা হয়েছে সেটাই ব্রহ্মের বাস্তব স্বরূপ। উপনিষদ আবার বেদেরই অঙ্গ। অনেক আগের আগে সনক সনন্দনাদির মত ঋষি মুনিরাও আত্মনিশ্চয় দ্বারাই ধারণা করেছেন শ্রুতি কি বলতে চাইছে। ঠিক তেমনি যে কোন মানুষ যখন শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রুতির এই মূল বাক্যগুলিকে ধারণ করে সে তখন ঋষিদের মতই জ্ঞান লাভ করবে। সেইজন্যই সব মহাপুরুষরা বার বার বলে গেছেন কোন ধর্মশাস্ত্রে কোথাও কোন বিরোধ নেই। ভগবান যীশু আত্মজ্ঞান লাভের পর যা বর্ণনা করছেন, তিনিও সেই নির্গুণ নিরাকার ভগবানের কথাই বলছেন, মহম্মদও নির্গুণের কথা বলছেন, বেদ সেই নির্গুণ

ঈশ্বরের কথাই বলছেন, ভগবান বুদ্ধও একই কথা বলছেন। কিন্তু নির্গুণকে যখন শব্দের মাধ্যমে ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে তখন গোলমাল হবেই, কিছু করার নেই। কারণ যাঁকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, তাঁকে শব্দ দিয়ে নামানো হচ্ছে। তাই সবারই সাধনা হল সগুণ সাকারকে পেছনের দিকে ঠেলে ফেরত নিয়ে যাওয়া। পেছনের দিকে ফেরত নিয়ে যাওয়া মানে? শ্রুতির ওই শব্দটুকু নিয়ে নিজের মন-বুদ্ধিতে ঢুকিয়ে বিচার করে বুঝতে হবে এই শব্দের প্রতিপাদ্য কি। এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য শুকদেব আগেকার ঋষিদের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসছেন, বলছেন তাঁরাও ঠিক এই পদ্ধতিতেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ঠাকুরকে আমরা অবতার বলছি, তিনি ভগবান, সব ঠিক আছে, কিন্তু তাঁকেও আমাদের ঋষির মত দেখতে হবে। ঠাকুরও গুরুমুখে শাস্ত্রমুখে শাস্ত্রের কথা শুনেছেন, শোনার পর শুদ্ধ মন দিয়ে বিচার করেছেন। তিনিও সেই একই উপলব্ধি পেয়েছিলেন, যে উপলব্ধি শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলেন, সনকাদি ঋষিরা যে উপলব্ধি পেয়েছিলেন। কারুর উপলব্ধিতে কোন তফাৎ নেই। শুকদেব কিন্তু খুব ধীরে ধীরে নিজের মনের উপর বেশী জোর দেওয়ার দিকে পরীক্ষিৎকে ইঙ্গিত করে দিলেন।

এখন অনেকের মনে যদি প্রশ্ন আসে সৃষ্টির আগের মুহূর্তে ঠিক কি হচ্ছে? আর সৃষ্টির আগে যে এটাই হবে এর প্রমাণ কোথায়? একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, একটা অবস্থার পর কোন প্রশ্ন করা চলতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্যকে গার্গি যখন বারবার প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, এটার পরে কি, ওটার পরে কি, তখন যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে বলছেন 'গার্গি, এরপর যদি তুমি না বুঝে শুনে প্রশ্ন কর তাহলে তোমার মুণ্ড ধর থেকে সহস্র খণ্ডিত হয়ে পড়ে যাবে'। এটাই আমাদের স্বভাব, আমরা যখন ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন নিয়ে কথা বলি তখন পাশ্চাত্যের চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতিকেই অনুসরণ করি। আগে আগে ছিল, যারা দর্শন নিয়ে কথা বলতেন তখন তাঁরা বলতেন এটা সত্যি কথা, কারণ এই কথা সক্রেটিস বলেছেন, এ্যরিস্টটল বলেছেন, প্লেটো বলেছেন। সেখান থেকে পরে এসে গেল নৈয়ায়িকরা, মানে Logicians, তারা বলছে – can it be placed in logic, can it be reduced to logic? যদি না হয়, তাহলে এই কথার কোন দাম নেই। ফালতু কথা। এই নিয়ে খুব মজার একটা কাহিনী আছে।

চোখের সামনে যদি কিছু দেখি, ধরুন একটা গাছ আছে, এখন logically যদি প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে গাছ নেই, তাহলে গাছ নেই, অথচ আমার সামনেই গাছ দাঁড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্যে এমন একটা সময় গেছে যখন ঠিক এভাবেই logically প্রমাণ করা হত। Naked King নামে একটা খুব নামকরা গল্প আছে, এক রাজা খুব অহঙ্কারী আর বোকা ছিল। যারা অহঙ্কারী তারা সত্যি সত্যিই বোকা হয়, অহঙ্কারী মানেই বোকা। এদের থেকে কাজ আদায় করা খুব সোজা, শুধু তার অহঙ্কারকে একটু তুলে দিতে হবে, যদি কেউ তুলে দিতে পারেন তাহলে যে কোন জিনিস তিনি তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারবেন।

Naked kingএর কাহিনীতে এই অহঙ্কারের কথাই বলছে। রাজাকে এসে দর্জি বলছে আপনাকে এমন একটা সুন্দর জামা তৈরী করে দিচ্ছি, এর মত এত সুন্দর ডিজাইনের পোষাক পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ গায়ে দিতে পারেনি। আর এই পোষাক আপনাকেই মানাবে, পৃথিবীতে এই পোষাক পড়ার যোগ্যতা আপনারা ছাড়া আর কারুর নেই। তবে এর একটাই সমস্যা হয়, যার বাবা মা দুশ্চরিত্র তারা কিন্তু এই পোষাকটা দেখতে পাবে না। তারপর তো সেই দর্জি রোজ এসে রাজার মাপ নিচ্ছে, এই করছে, সেই করছে। আসলে কিছুই করছে না, আর লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব দিয়ে খালি টাকা নিয়ে যাচ্ছে। যেদিন জামা তৈরী হয়ে গেছে সেদিন এসে রাজাকে জামাটা পড়াতে এসেছে। জামা টামা কিছুই নেই, পুরো ফাক্কাবাজী। দর্জি এসে রাজার শরীর থেকে সব পুরানো পোষাক খুলে নিয়ে নতুন পোষাকটা পড়াচ্ছে কিন্তু কোন পোষাকই তো নেই। পোষাক পড়াতে যেমন যেমন কায়দা করে, দর্জিও ঠিক ঐরকম কায়দা করে রাজাকে পোষাক পড়াতে লাগল। রাজা দেখছে কিছুই নেই, অথচ ভয়ে কিছু বলতে পারছে না, অহঙ্কারী কিনা। যদি বলি পোষাক দেখতি পাচ্ছি না তাহলে আমার বাবা মা দুশ্চরিত্র হয়ে যাবে। চারিদিকে খবর হয়ে গেছে। মন্ত্রী এসেছে, দেখছে রাজা উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে 'কি মন্ত্রীমশাই, পোষাকটা কেমন'? মন্ত্রী বলছে 'উঃ কি দারুণ দেখতে হয়েছে'। তারপর একে একে অন্যান্য মন্ত্রীরা এসেছে, সেনাপতিরা এসেছে, সবাই দেখছে রাজা উলঙ্গ

দাঁড়িয়ে আছে অথচ সবাই বলছে রাজা কি দারুণ পোষাক পড়ে আছে। আমি যদি বলি রাজার পোষাক দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আমার বাবা মা দুশ্চরিত্র, সেইজন্য সব্বাই বলছে কি দারুণ পোষাকই না রাজা আজ পরিধাণ করেছেন। এইবার রাজাকে শোভাযাত্রা করে শহর পরিক্রমায় বার করান হয়েছে। পুরো শহরে খবর হয়ে গেছে রাজা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে রাস্থায় পরিক্রমা করতে বেরিয়েছেন। আর সব্বাই ভয়ে বলছে ‘বাঃ কি দারুণ হয়েছে, যেমন রঙ, তেমন ডিজাইন, আর মুকুটের সঙ্গে কেমন মানান সই হয়েছে’। একজন বলছে ‘জামার রঙটা কেমন নীল রঙের’। আরেকজন বলছে ‘নীল রঙ! কি বলছ তুমি, কেমন হলুদের আভা বেরোচ্ছে’। শোভাযাত্রা চলেছে, এক জায়গায় একটা বাচ্চা বাবার হাত ধরে দেখতে এসেছে। রাজাকে দেখেই বাচ্চাটা চেঁচিয়ে বলছে ‘বাবা, বাবা, রাজাতো উলঙ্গ’। একমাত্র যে অবোধ শিশু, সেইই চেঁচিয়ে বলছে Daddy, Daddy, the King is naked. বাকী সবাই ভয়ে বলছে ‘রাজা কি দারুণ পোষাক পড়েছে আজ’।

এটাই আমাদের আসল সমস্যা। প্রথমে দার্শনিকরা একভাবে বলে দিলেন, তারপরে এল যুক্তিবাদীরা, যুক্তিবাদীরা একটা বলে চলে গেল তারপর এল প্রযুক্তিবাদী বিজ্ঞানীরা তারা এসে বলল – If it is verified scientifically and experimentally it is valid otherwise it is not. তারপরে সেখানে এসে গেলেন আমাদের বড় বড় গণিতজ্ঞরা – if it is formulated mathematically it is correct, otherwise it is all rot. সব ধাপ্পা, একেবারে পরিষ্কার ধাপ্পা। যখনই কোন জিনিসকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে থাকবে, আচ্ছা এটা কেন, ওটা কেন, সেখানে কিছু পরে দেখবে সে আর দাঁড়াতে পারছে না। সৃষ্টির তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে ঠিক এই সমস্যাটাই আসে, পঞ্চাশটা প্রশ্ন করতে শুরু করে দেবে। আমাদের ঋষিরা জানতেন একটা জায়গার পরে এই নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করা যায় না। পেছনের দিকে এভাবে যাওয়া যায় না, একটা জায়গায় দিয়ে আমাদের থামতে হবে। Logiciansরাই নিয়ে এলো এই argument, একটা অবস্থার পর আর প্রশ্ন করা যাবে না। এটাই যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে বলছেন। Logiciansদের এই সমস্যা থাকবেই, তার পেছনে কে ছিল, তার পেছনে কি ছিল। এর খুব সহজ একটা logic হল – মুরগি না হলে ডিম হবে না, ডিম না হলে মুরগি হবে না, আবার মুরগি আর ডিম কখনই একসাথে হতে পারে না। যদি মুরগি না থাকে তাহলে ডিম কোথা থেকে এল, যদি ডিম না থাকে তাহলে মুরগি কোত্থেকে এলো? তার মানে মুরগিও নেই ডিমও নেই। কিন্তু মুরগি আর ডিম তো আমার চোখের সামনেই রয়েছে। এখন একে কীভাবে প্রমাণ করবে। কিন্তু এভাবেই আমাদের logic কাজ করে।

এটাই মূল সমস্যা, আমরা কখনই বলতে পারি না সৃষ্টি কীভাবে এলো। এনারা সেইজন্য প্রথমে নিয়ে এলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে। তারপর দেখছেন ব্রহ্মাকে এনেও সমস্যা মিটছে না, তখন নিয়ে এলেন নির্গুণ নিরাকার। নির্গুণ নিরাকারে তাঁরা কীভাবে এলেন? সেটার জন্য একটা ধাপ দিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে বলছেন ব্রহ্মার যখন একশ বছর আয়ু শেষ হয়ে যায় তখন সব কিছু লয় হয়ে যায়, মানে এইভাবে লয় প্রলয় হচ্ছে। তাতেও যখন হচ্ছে না, তখন বলছে ভগবান এই রকমই করতে থাকেন, যখনই তাঁর ইচ্ছা হয় প্রলয় হয়, সৃষ্টি হয়। তার মানে আর এর চেয়ে বেশী জানতে চেও না, প্রশ্ন করো না, কেননা তুমিও বুঝবে না আর আমিও উত্তর দিতে পারব না, কারণ এর কোন উত্তর নেই। আমরা এটুকু জানি যে আমরা এখানে আছি, আর এখান থেকে বেরোন যায়, এইটা তোমাকে আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি। বেলুড় মঠের গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে আছি, নৌকা আছে, তুমি ওপারে কীভাবে যাবে সেটা আমি তোমাকে বলে দেব, নৌকা আছে এর সাহায্যে তুমি ওপারে যেতে পারবে কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করো গঙ্গা কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কোথায় যাচ্ছে, কতদিন এইভাবে গঙ্গা থাকবে? তাহলে আমি বলব আমি এগুলো জানিনা, আমি জানি কীভাবে ওপারে যাওয়া যায়, এর চেয়ে বেশী কিছু আমার কাছে জানতে চেয়ো না।

আমি যদি মাঝিকে জিজ্ঞেস করি ‘ওহে ভাই, তুমি তো অনেক দিন ধরে এই গঙ্গা পারাপার করছ, তুমি কি জানো এই গঙ্গা কোথা থেকে আসছে’? ‘অত শত আমি জানিনা বাপু’। ‘আরে এটাও জানো না যে গঙ্গা গঙ্গোত্রি থেকে আসছে! তুমি কি গেছো কখন সেখানে’? ‘না বাবু আমি কখন নামই শুনিনি তা যাবো কীভাবে’। ‘তাহলে তোমার নৌকাতে চেপে আমার কোন কাজ নেই’। আমাদের ধর্মটা ঠিক এটাই। ধর্ম বলে

দেয় এই হল নদী, এই নৌকা আছে, এতে করে তুমি ওপারে যেতে পারবে, অন্যেরাও পার হয়ে গেছে, তুমিও পারবে পার হতে। কিন্তু যেই মুহুর্তে এটা কোথা থেকে এসেছে এটা কোথায় যাবে প্রশ্ন করতে শুরু করবে সেই মুহুর্তেই নানান সমস্যা এসে যাবে, আর তোমার যে নানা রকম বিপদ, দুঃখ-কষ্ট আছে সেগুলোকে আরো দীর্ঘায়িত করে দেবে। এনারা তাই একটু বলে দিচ্ছেন এই কারণে যে তুমি যদি একটু কিছু না জানো তাহলে তোমার মন অশান্ত হয়ে এই প্রশ্নের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। সেইজন্য এনারা দু-চারটে কথা বলে দেন।

এরপর শুকদেব পরম্পরার একটা প্রাচীন গাথা পরীক্ষিৎকে বলছেন। বাচ্চাদের যেমন ভূত-প্রেত-ডাইনির গল্প বলা হয়, ঠিক তেমনি কিছু আধ্যাত্মিক গল্প আছে, আধ্যাত্মিক গল্পকে বলা হয় গাথা। গাথাগুলো যখন বৃহৎ আকারের হয়ে যেত তখন ঋষিরা এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে দিতেন। এগুলোই পরে পৌরানিক কাহিনী রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। পুরাণ যদিও অতি পুরনো অথচ সব সময় নতুনের মত। পুরনো এবং পরম্পরাতে আছে কিন্তু একেবারে নতুনের মত, পুরাণে নতুন কোন কথা বলা হয় না। এই ধরণের অনেক গাথাকে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ ও ব্যাসদেব মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। একবার নারদ বিভিন্ন লোক ঘুরতে ঘুরতে নারায়ণ ঋষি, যিনি ভগবানেরই একটা রূপ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বদ্রিকাশ্রমে এসেছেন। সেখানে নারদ নারায়ণ ঋষিকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলেন, পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন শুকদেবকে করেছেন। প্রথমে শুকদেব পরীক্ষিৎএর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, এরপরে তিনি এই উত্তরটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা পৌরানিক গাথা নিয়ে আসছেন। নারদ একবার সাক্ষাৎ নারায়ণ ঋষিকে এই প্রশ্নটাই করেছিলেন। সেই সময় ওই পবিত্র স্থানে আরও অন্যান্য ঋষিরাও উপস্থিত ছিলেন। নারায়ণ ঋষি নারদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনিও আবার আরেকটা প্রাচীন কাহিনী নিয়ে আসছেন। নারায়ণ ঋষি বলছেন – হে নারদ! অনেক কাল আগে, তুমি তখন অন্য শরীরে ছিলে, অন্য একটা জায়গায় ঠিক এই প্রসঙ্গে নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছিল। পুরাণের এটাই বৈশিষ্ট্য, গাথার মধ্যে গাথা, আবার সেই গাথার মধ্যে আরেকটি গাথা।

নারায়ণ ঋষি বলছেন – সেই আলোচনার সময় সেখানের ভগবানের সামনে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমাররা রয়েছেন; এই চার কুমারদের সাথে ভগবান আলোচনা করছেন বেদ আর ভগবানের মধ্যে কি সম্পর্ক। তখন সনন্দন এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলছেন – রাজা যখন রাত্রির অবসানে নিদ্রা থেকে জাগরিত হন, তখন বন্দী, চারণ এনারা এসে প্রভাতী সুর সহযোগে রাজার সুখ্যাতির স্তুতি ও বন্দনা গান করে রাজাকে নিদ্রা থেকে জাগরিত করেন। নিজের প্রশংসা শুনে যদি ঘুম ভাঙে তখন এমনিতেই শরীর চাঙা হয়ে যায়। যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে পুরো মহাপ্রলয় হয়ে যায়, যখন সৃষ্টি বলে কিছুই থাকে না, তখন ভগবানই একমাত্র থাকেন কিন্তু তিনি তখন কারণ সলিলে যোগনিদ্রায় অবস্থিত থাকেন। কত দিন ভগবান এই যোগনিদ্রায় থাকেন তার বর্ণনা কোথাও নেই। কারণ তখন কাল, যে সময়কে মাপে, তারই নাশ হয়ে যায়। কালেরই যদি নাশ হয়ে যায় তাহলে কে বলতে পারবে ভগবান কতদিন যোগনিদ্রায় থাকবেন। কিন্তু যখন যোগনিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার সময় আসে, অর্থাৎ যখন সৃষ্টি আবার শুরু হতে যাবে তখন শ্রুতিরা এসে ভগবানকে যোগনিদ্রা থেকে তোলেন। পৌরানিক গাথা অমূর্তকে মূর্ত করে দেয়, মূর্তকে অমূর্ত করে দেয়। ভগবান এবার জাগ্রত হবেন, এবার তাঁর সৃষ্টি কার্য শুরু হবে। সৃষ্টির জন্য একটা patern চাই, একটা ঋতম্ চাই, যেটাকে আধার করে সৃষ্টির কার্য চলবে। এই ঋতম্ কোথা থেকে আসবে? বেদ থেকে আসবে। এবার সৃষ্টি শুরু হতে যাচ্ছে, সেটা যেভাবেই হয়ে থাকুক, এনারা এই জিনিসটাকে কাব্যিক আঙ্গিকে বর্ণনা করছেন। ভগবান আছেন আর তাঁর সৃষ্টি আছে, কিন্তু মাঝখানে এই যে এত বড় ব্যবধান, যিনি নির্গুণ নিরাকার সেখান থেকে দুম্ করে একটা সৃষ্টি এসে যাবে, এই বোতল বেরোবে, গ্লাশ বেরোবে, মানুষ, জীব-জন্তু, গাছপালা বেরিয়ে আসবে, এটা কি করে হবে! সেইজন্য তাঁরা মাঝখানে নিয়ে আসেন বেদকে। সৃষ্টি তো দুম্ করে হবে না, একটু একটু করে তিল তিল করে হবে। সেইজন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিরা নিজেদের অনুভূতি ও কল্পনার আশ্রয় করে বলছেন – যখন সময় হয় তখন শ্রুতিগণ, এখানে বেদ শব্দ না বলে বলছেন শ্রুতি, এই শ্রুতিগণ ভগবানের কাছে যান এবং সম্রাটকে যেভাবে ঘুম থেকে জাগানো হয় ঠিক তেমনি শ্রুতিরা ভগবানকে ঘুম থেকে তোলেন। কি ভাবে? স্তুতি করে। তারা গিয়ে ভগবানের স্তুতি করে ভগবানকে ঘুম থেকে তোলেন। স্তুতিতে ভগবানের মধ্যে একটা চনমনে ভাব জেগে ওঠে।

একটা আখ্যায়িকার মাধ্যমে সনন্দন এই কথা বলছেন। শ্রুতিরা কি স্তুতি করেন? স্তুতি করে তাঁরা ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করতে থাকেন। অন্য ধর্মে এই ধারণা পাওয়া যাবে না। কারণ তিনটে বড় ধর্ম, জুহুদি, ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে সৃষ্টি একবারের মতই হয়, একবার সৃষ্টি হয়ে গেছে, এই সৃষ্টির নাশ হয়ে যাবে, খেলা শেষ, আর সৃষ্টি হবে না। হিন্দু ধর্মে এই জিনিস নেই, এখানে সৃষ্টি চক্রাকারে চলতে থাকবে।

তবে আমরা যেন কখনই ভুলেও ভাবি না যে ভগবান ঘুমোচ্ছেন আর ঘুম থেকে উঠছেন। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন সাপ কখন কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে থাকে কখন এঁকে-বেঁকে চলতে থাকে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস, তিনি কখন নিষ্ক্রিয়, কখন সক্রিয়, তিনি কখন শান্ত কখন ক্রিয়াশীল। ঈশ্বরের ক্রিয়াশীল অবস্থাকে বলা হয় সৃষ্টি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, শান্ত তখন প্রলয়। সেইজন্য অনেকে বলেন একটা জায়গায় প্রলয়, আরেকটা জায়গায় সৃষ্টি চলছে, সব সময় কোথাও না কোথাও কিছু হচ্ছে। হয়তো হচ্ছে, নাও হতে পারে, আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু কবিরা যখন বর্ণনা করেন তখন এইভাবে বলেন – ঈশ্বরের যে অঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে একটা নিয়ম চাই, বেদ এই নিয়ম বা ঋতম্‌কে নিয়ে আসে। শ্রুতিরা তখন এভাবে ভগবানের স্তুতি করে বলেন *জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ। অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ।।১০/৮৭/১৪।* সম্রাটের ঘুম ভাঙানোর সময় সম্রাটের চরিত্রকে আধার করেই স্তুতি করা হয়, ঠিক তেমনি ভগবানের গুণকে আধার করেই ভগবানের স্তুতি করে বেদ ভগবানকে ঘুম থেকে তুলছেন – হে অজিত! আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনার উপর কেউ বিজয় পেতে পারে না। আপনার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। কারুর সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় জয় দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করতে হয়। জয় হল শেষ কথা, আপনার সমকক্ষ আরে কেউ নেই। ভগবানের সমকক্ষ আরে কেউ নন, সেটাই শ্রুতি স্তুতিতে বলছেন। হে প্রভু! আপনি *দোষগৃভীতগুণাং ত্বমসি যদাত্মনা*, সমস্ত ঐশ্বর্য আপনার মধ্যেই রয়েছে। আমাদের ঐশ্বর্য পেতে গেলে আমাদের বাইরে থেকে অর্জন করে নিয়ে আসতে হয়। ভগবানের ক্ষেত্রে সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁরই মধ্যে সব সময় পূর্ণ রূপে বিদ্যমান। শ্রুতি বলছেন, আপনার এই মায়া, যে মায়াকে আশ্রয় করে আপনি যোগনিদ্রায় শুয়ে আছেন, যে মায়া বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণীকে বিমোহিত করে রেখেছে, আপনি সেই মায়ার বিনাশ করুন। এই কথার মাধ্যমে আসলে সাধারণ মানুষকে, ঈশ্বর কি রকম, ঈশ্বর কি করেন তারই একটা ভাব ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রুতি বলছেন, এই জগতে যত সাধনা, জ্ঞান, ক্রিয়াদির সামর্থ্য আছে, এর সব কিছুকে আপনিই প্রবুদ্ধ করেন। শ্রুতি প্রথমে ভগবানকে বলছেন – ঈশ্বর সমস্ত ঐশ্বর্যে সর্বদা পূর্ণ, দ্বিতীয় বলছেন ঈশ্বর মায়াধীশ – মায়াকে অবলম্বন করে তিনি যোগনিদ্রাতেও থাকেন আবার সৃষ্টিও করেন। তৃতীয় বলছেন – জগতে যত সাধনা, জ্ঞান, ক্রিয়া শক্তি আছে, সমস্ত শক্তিকে ঈশ্বরই জাগ্রত করেন। ঈশ্বরের শক্তি যদি না থাকে কখনই কোন ক্রিয়া হবে না। সৃষ্টি যদি হয়ে যায় সেটা জড় হয়ে পড়ে থাকবে। যত রকমের সাধনা আছে, সমস্ত সাধনা ঈশ্বরের শক্তিতেই হয় আর যত রকমের জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান ঈশ্বরের শক্তিতেই প্রাপ্ত হয়। মায়া কখন ঈশ্বরের বাইরে থাকবে না, ঠাকুর বলছেন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। ঈশ্বরের বাইরে কোন কিছুই নয়, সেইজন্য মায়াও ঈশ্বরের। শ্রুতি এরপর চতুর্থ কথা বলছেন, খুব সুন্দর বলছেন আপনি না মেটালে আপনার এই মায়াকে কেউ মেটাতে পারবে না। এই যে এতগুলো কথা বলা হল তিনি ঐশ্বর্যবান, তিনি মায়াধীশ, তিনিই সব কিছুকে জাগ্রত করেন, তিনি কৃপা না করলে মায়ার পারে যাওয়া যাবে না, এই কথাগুলোর প্রমাণ কি? বেদ বলছে আমরাই এর প্রমাণ, আমরা জানি।

মানুষ কীভাবে জ্ঞান লাভ করে? সব থেকে সহজ হল প্রত্যক্ষ – এই বোতলকে আমরা চোখের সামনে দেখছি, সেইজন্য এটা আছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখছি মাঠ ভেজা, বুঝলাম যে বৃষ্টি পড়েছে, অনুমান প্রমাণ। তারপর তৃতীয় শ্রুতি প্রমাণ – বেদে আছে, শাস্ত্রে আছে তাই এটা সত্য। অনেকে বলতে পারে আমি বেদ মানি না। তখন তাকে বলতে হয়, আপনাকে মানতে হবে না, এসব আপনার জন্য নয়, আপনি অজ্ঞানে আছেন অজ্ঞানেই থাকুন। আগামীকাল যদি কেউ বলে আমি আপনার অনুমান প্রমাণকে মানিনা, প্রত্যক্ষ ছাড়া আমি কিছু মানব না। তা মানতে হবে না, ক্ষতি আপনারই হবে। একজনের পাঁচটার জায়গায় চারটে ইন্দ্রিয় আছে, যার চোখ নেই, সে বলবে আমি সূর্য বলে কিছু মানিনা। কেন? আমিতো দেখতে পাচ্ছি না। জ্ঞান আহরণের

অনেক পথ ও উপায় আছে। এখন আপনি নিজেকে যেখানে ধরে রেখেছেন সেইখানেই বদ্ধ থাকবেন। শ্রুতি বলছে আমরা হলাম প্রমাণ। শ্রুতি তাই বলছে – প্রভু আপনি জাগুন, জাগুন, জেগে জীবের যে বন্ধন এই বন্ধনকে মুক্ত করে দিন। এইখানে হিন্দু দর্শনের পুরো তত্ত্বটাকে তুলে ধরা হয়েছে।

এই শ্লোকের তাৎপর্য হল, ঈশ্বরের স্বরূপ যদি জানতে হয়, ঈশ্বরের ব্যাপারে যদি জানতে হয় তাহলে আমাদের বেদকেই অবলম্বন করতে হবে। বেদ মানে যে কোন ধর্মগ্রন্থ। এখানে শ্রুতি ঈশ্বরের যে স্বরূপ নিরুপণ করেছে এটাই সত্য। আমাদের নিজের মন থেকে বিচার করে যদি কোন কিছু দাঁড় করাই সেটা সিদ্ধ হবে না। ঈশ্বরের কি স্বরূপ, ঈশ্বর কি করেন, ঈশ্বর কি করেন না এই জিনিসগুলো একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায়, বেদ ছাড়া আর কোন ভাবে জানা যায় না। এই কথা বলার পরেই শ্রুতিরা বলছেন, আমরা কিন্তু আপনার ঠিক ঠিক স্বরূপের বর্ণনা করতে পারি না, আমাদের পক্ষে সম্ভবই না। এর আগে আমরা দীর্ঘ আলোচনায় বলেছিলাম বেদ আসলে সগুণ সাকার ভগবানের বর্ণনাই করে, বেদ নিজেও সেই কথাই এখানে বলছেন, আপনার স্বরূপের বর্ণনা করতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু আপনিই যখন নিজের মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে সগুণ রূপ ধারণ করেন, যখন আপনি লীলা করেন আবার যখন লীলাকে টেনে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রকাশ করেন, তখনই আমরা আপনার যৎসামান্য বর্ণনা করতে সক্ষম হই। তার মানে সৃষ্টি যখন হয়, সৃষ্টি যখন স্থিতিতে অবস্থান করে আর সৃষ্টি যখন লয় হতে যায়, ঈশ্বরের এই তিনটে অবস্থাকেই বেদ একমাত্র বর্ণনা করতে পারে। খুব সহজ উপমা হল, এক অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে একজন নৌকা নিয়ে ভেসে চলেছে, চারিদিকে অনন্ত জলরাশি, সেই জলরাশির মধ্যে হঠাৎ একটা জায়গায় জল জমে বরফের আকার নিয়েছে, বরফটা কিছুক্ষণ স্থিত হয়ে থাকল, তারপর আবার গলে জল হয়ে সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে লীন হয়ে গেল। জল থেকে বরফ হয়ে যাচ্ছে তার বর্ণনা করা যাবে, বরফ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকছে তার বর্ণনা করা যাবে আবার বরফ গলে জল হচ্ছে তারও বর্ণনা করা যাবে। কিন্তু সেই বরফ যখন সম্পূর্ণ গলে জলরাশির মধ্যে একাকার হয়ে গেল, সেই অনন্ত জলরাশির আদি নেই অন্ত নেই, চিন্তা করতে গেলেই হারিয়ে যাচ্ছে, তখন কি করে আর বর্ণনা করবে! শ্রুতি বলছেন আপনার এই তিনটে অবস্থার সামান্য একটু বর্ণনা করতে আমরা সমর্থ হই।

শ্রুতি আবার বলছেন – এটা ঠিকই যে আমরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ আদি দেবতাদের বর্ণনা করেছি কিন্তু আমাদের যত ঋচা আছে, যত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা আছেন এঁরা সম্পূর্ণ জগতকে ব্রহ্মস্বরূপেই দেখেন। বেদের বক্তব্য হল, আমরা অনেক দেবতাদের বর্ণনা করেছি ঠিকই কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হল জগতকে ব্রহ্মস্বরূপে বর্ণনা করা। কারণ যখন সব কিছুর লয় হয়ে যায়, সৃষ্টির লয় হয়ে যায়, দেবতাদের লয় হয়ে যায় তখন একমাত্র আপনিই থাকেন। সৃষ্টির সব কিছুতে বিকার হয় কিন্তু আপনাতে কোন বিকার হয় না, আপনি অবিকারী। আপনি যদি অবিকারীই হন তাহলে জগতের সৃষ্টি কি করে হবে? এগুলো হল খুব উচ্চস্তরের তাত্ত্বিক প্রশ্ন। ঈশ্বরকে একদিকে বলছেন তিনি অবিকারী, তাহলে যে সৃষ্টি হল আবার তার লয়ও হল, এখানেই তো বিকার এসে গেল। তখন এর উত্তরে বলছেন – না! এই সৃষ্টিটা প্রতীতি মাত্র। ভগবান যদি বিকারী হয়ে যান তাহলে তিনি মানুষের মত হয়ে যাবেন। কোন দ্বৈতবাদীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভগবান যে সৃষ্টি করেছেন এই সৃষ্টির উপকরণ তিনি কোথা থেকে এনেছেন, তাঁর বাইরে থেকে, না তাঁর ভেতর থেকে। যদি বাইরে থেকে এনে থাকেন তাহলে ভগবানের বাইরে কিছু আছে, ভগবানের ভেতর থেকে যদি এনে থাকেন তাহলে তিনি বিকারী হয়ে যাবেন। দু-দিক দিয়েই দ্বৈতবাদীরা আটকে যান, কিন্তু তাঁরাও তাঁদের মত একটা উত্তর দিয়ে দেন। সেইজন্য বাধ্য হয়ে বলতে হয় সৃষ্টিটা প্রতীতি হয়। প্রতীতি মানে, আমরা যেমন কল্পনা করি সেই রকম প্রতীতি নয়, এ খুব উচ্চমানের প্রতীতি। বেদ তাই বলছেন, ইন্দ্র বলুন, মিত্র বলুন, বরুণ বলুন আসলে আপনি ছাড়া কিছুই নেই, যা কিছু আছে সব প্রতীতি মাত্র। সেইজন্য আমরা ইন্দ্রাদি দেবতাদের বর্ণনা করে যাবতীয় যা কিছু বলি বস্তুত সব আপনারই বর্ণনা করি। শ্রুতি বলছেন, যত দেবতা আছেন তাঁরা কেউ আপনার থেকে পৃথক নন। বিভিন্ন দেবতাদের কথা বলতে গিয়ে আমরা আপনারই আলাদা আলাদা মূর্তির বর্ণনা করছি।

কেউ যদি প্রশ্ন করে এগুলো জেনে আমাদের কি লাভ, আমাদের কি কাজে লাগবে? এইসব ধর্ম কথা তো সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য, সংসারীদের জেনে কি লাভ? এর উত্তরে প্রথমে বলতে হয় জ্ঞানের জন্য জ্ঞান

লাভ। জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। দ্বিতীয়, এ জ্ঞান আমার উত্তরাধিকার। ঠাকুর্দার সম্পত্তি যখন ভাগ হয় তখন আমরা আমাদের অংশটা খুব ভালো করে জেনে নিই যাতে কোন কিছু বাদ না চলে যায়। আমাদের পূর্বজরা এই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, এই জ্ঞানের আমি উত্তরাধিকারী। তৃতীয়, জ্ঞান অর্জন করতে করতে মস্তিষ্কের বিচার করার ক্ষমতার পরিধিটা বিস্তার করে। একটা পুরনো ধারণা আছে, যারা বেশী ভাষা জানে তারা বেশী বুদ্ধিমান হয়। অনেকের আবার নতুন নতুন ভাষা শেখাটাই একটা শখ। ঠিক তেমনি জ্ঞান অর্জন করাটাও অনেকের শখ, এতে মস্তিষ্কের ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পায়। একই ধরণের কাজের মধ্যে থেকে থেকে মস্তিষ্ক একটা গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে, জ্ঞানচর্চা এই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। জ্ঞানচর্চার চতুর্থ দিক হল, শাস্ত্রের জ্ঞানচর্চায় আমাদের অন্তর্জগতে একটা রূপান্তর হয়। অন্তর্জগতের রূপান্তরের ফলে আমাদের রাগ-দ্বেষ-ক্রোধ-লোভ এগুলো কমে যায়। আমাদের যে নানা রকমের সমস্যা, তার থেকে হতাশার ভাব, সব এই রিপুর প্রভাবেই আসে, এগুলো কমে যাওয়ার ফলে সমস্যাও কমে যায়। পঞ্চমতঃ, এই চারটের ফলে আমাদের কার্য ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। ঠিক ঠিক ধর্ম পালন করলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটেই আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তাই যারা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করবে তাদের অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা, সাথে সাথে ভোগের ক্ষমতাও সংযমিত হয়ে উচ্চমানের হয়ে যায়। পশুর মত ভোগের লিপ্সা আর থাকে না। যাঁরা রীতিমত গভীর ভাবে শাস্ত্রচর্চা করেন তাঁদের যদি হিন্দী সিনেমার গান-বাজনার আসরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। শাস্ত্রচর্চা করে করে মস্তিষ্ক এমন এক উচ্চস্তরে চলে যায় যে তখন হাল্কা জিনিসগুলো তিনি আর নিতে পারবেন না। মন যখনই কোন উচ্চ চিন্তা নিয়ে থাকে মন তখন শান্ত হয়ে যায়। শান্ত মন সব সময়ই শক্তিমান। তার থেকেও যেটা বেশী মূল্যবান তা হল, আমরা জানি বা নাই জানি, আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান। আমার বাস্তবিক স্বরূপের জ্ঞান হয়তো আমি এই জন্মে নাও পেতে পারি, কিন্তু এই জ্ঞানচর্চার ফলে আমরা কিন্তু ধীর পদক্ষেপে অজান্তেই সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যত আমরা শাস্ত্রচর্চা করছি তত আমাদের ভেতরের আবর্জনা নিঃশব্দে কখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতেও পারছি না। কারণ আমাদের ভেতরে এত আবর্জনা জমে আছে যে, যখন পরিষ্কার হতে শুরু হয় তখন বোঝাও যায় না। ভাগবত পুরাণ কিন্তু আদপেই সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, মূলতঃ সংসারীদের জন্যই এই সব শাস্ত্র রচিত হয়েছে।

ঋষি-মহাত্মাদের কোন কষ্ট নেই, সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। আবার যারা টাকা আয় করতে পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদেরও কোন কষ্ট নেই। কিন্তু যাদের চেতনা একটু জেগে গেছে তাদেরই কষ্টের শেষ নেই। যারা মনে করে ভোগটাই জীবনের সব কিছু, আমাকে টাকা উপার্জন করতে হবে, নতুন গাড়ি চাই, নতুন বাড়ি চাই, পুরো সংসারটাকে নিজের মুঠোর মধ্যে নিতে চাইছে, যখন পারছে না তখন গলায় দড়ি দিচ্ছে, এরা সবাই পশুর মত জীবন-যাপন করছে। কিন্তু পশুর মধ্যে যে কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা আবার এদের মধ্যে নেই। কুকুর খেতে খুব ভালোবাসে কিন্তু আগামীকাল সে কি খাবে তার জন্য আগে থেকে কোন সঞ্চয় করে না। মানুষ থাকছে কুকুরের মত কিন্তু তার চিন্তা আছে আগামীকাল কি খাবে, তাই সঞ্চয় করে। কুকুরের মত যদি ভোগ করতে চাও তাহলে পুরোপুরি কুকুরের মতই হও, কিন্তু সেটাও হবে না। কুকুর যখন তখন মৈথুন করে বেড়ায় না কিন্তু মানুষের সব সময় এটা লাগবে, না পেলেই অশান্তি। তাই তুমি যদি পশুর মত পুরোপুরি হয়ে যাও তোমার তো আর কোন সমস্যাই থাকবে না। মানুষ কোনটাই পুরোপুরি নিতে পারছে না বলেই এত অশান্তি। ধর্মশাস্ত্র পাঠ করলে এই অশান্তি গুলো কেটে যায়। শাস্ত্র আমাদের বলে দিচ্ছে, যতটা তোমার ভোগের দরকার তার বাইরে তুমি যাবে না। এই অশান্তি গুলো কেটে গেলে ভেতরে একটা শক্তি জাগ্রত হয়ে ধীরে ধীরে সেই শক্তিটা বাইরে বিস্তার করতে থাকে, বাইরে বিস্তার করলে সমাজেও শান্তি আসবে, সমাজে শান্তি এলে পুরো দেশও উপকৃত হবে। সেইজন্য সবারই আধ্যাত্মিক চর্চা করা খুব দরকার।

যখনই আমরা একটা বিষয়ের উপর কোন কিছু শুনতে বা জানতে থাকি তখন সেই বিষয়কে নিয়ে মনে নানান রকমের প্রশ্ন ওঠে। ধর্মশাস্ত্র সব কিছুকে নিয়েই আলোচনা করে, সেইজন্য কোন কোন জিনিস শুনতে ভালো লাগে না, কোন জিনিস আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। ভাগবতের এই অংশে যে আলোচনটা চলছে এই অংশটাও সবাই বুঝতে পারবে না, অনেকের কাছে বিরক্তিকর মনে হবে, আবার রাসলীলা, কংস

বধ এগুলোতে তারা আবার খুব মজা পাবে। ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার জন্য শাস্ত্রকে সব রকম জিনিস নিয়েই চলতে হয়, কিন্তু মূল হল আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনাটা জাগিয়ে দেওয়া।

বেদ স্তুতির মাধ্যমে ভগবানের বিভিন্ন গুণের বর্ণনা করছেন – হে ভগবন্! আপনার ভজনা করে, আপনারই কথা মত চলে জীব এই জীবনেই কৃতকৃত্য হয়ে যায়। যারা আপনার ভজনা করে না তারা কামারশালার হাপরের মত জড় বস্তু হয়ে শুধু নিঃশাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে। হে প্রভু! তত্ত্বদর্শি ঋষিরা আপনার উপাসনার অনেক পথের কথা বলে গেছেন, তবে হৃদয়ে উপাসনা করাই আপনাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রুতি বলছেন *দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমোহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ। ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ।।১০/৯৭/২১।* হে ভগবন্! আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা বা বোঝা অত্যন্ত কঠিন কার্য। রমণমহর্ষির কাছে কেউ যদি উপদেশ নিতে যেত উনি বলতেন আগে বিচার কর 'আমি কে'। তুমি কে বিচার করতে থাকো, এছাড়া আর কোন সাধনা নেই। আমি কে আমি জানি না! সবাই নিজের নিজের আমিকে জানে। কিন্তু ঠিক ঠিক আত্মতত্ত্ব, আমি কে, এই জানাটা খুব কঠিন। ভাগবতেই বলছেন, বেদ স্তুতি করে ভগবানকে ঘুম থেকে তুলছেন, এটা এতই কঠিন যে মানুষকে তাঁর লীলা আস্বাদ করানোর জন্য ভগবানকে বিভিন্ন অবতার হয়ে আসতে হয়। গীতায় বলছেন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম বেড়ে যায় তখন ভগবান অবতার হয়ে আসেন। কিন্তু ভাগবত বলছেন পরমাত্মতত্ত্ব বোঝা অত্যন্ত কঠিন সেইজন্য ভগবান বিভিন্ন অবতারত্ব গ্রহণ করেন, যাতে মানুষ তাঁর দিব্য ও অমৃতসম লীলাগুলি আস্বাদ করে চেতনাটা জাগাতে পারে। যেমন নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করা হচ্ছে। এই দৃশ্যটা যদি কোথাও অনুষ্ঠিত হয় বয়স্কদের হয়তো খুন, রক্ত ভালো নাও লাগতে পারে কিন্তু বাচ্চাদের খুব ভালো লাগবে। কাহিনীর মাধ্যমে বাচ্চাদের মধ্যে একটা চেতনা ঢুকছে, তার সাথে প্রহ্লাদের চরিত্রটাও পেয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অবতার ভগবান গ্রহণ করেন যাতে মানুষ পরমাত্মতত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবে বুঝতে পারে। আর ভগবানের লীলা কথা এতই মধুর যে মানুষের চেতনাকে এক অন্য স্তরে নিয়ে চলে যায়। লীলা আস্বাদন করে অনেক ভক্ত বলেন আমার মুক্তি লাগবে না, ভগবানের ভক্তিই আমার একমাত্র কাম্য। এর ভালো দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ, তিনি মুক্তি চান না, ভগবানের নাম, শুধু হরি নাম করে যেতে চাইছেন। তিনি তাই করে যাচ্ছেন, ঘুরে ঘুরে সবাইকে হরি নাম শুনিয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতে একটা সিদ্ধান্ত আছে, যেখানে ভক্ত বলছেন আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই। এগুলো এতো উঁচু কথা যে আমরাও ধারণা করতে পারি না যে, ওই অবস্থায় পৌঁছেও আস্বাদ করার মত বোধ থাকে কিনা। কিন্তু ঠাকুরও বলছেন আমি আস্বাদ করতে চাই। শ্রুতি তাই ভগবানের স্তুতি করে বলছেন, আপনার অবতার লীলার আস্বাদন এমনই আনন্দের যে, যারা ঘর-গৃহস্থি করছে, তারাও নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে যায় এই আনন্দকে পাওয়ার জন্য।

আসলে ভগবানের লীলার আস্বাদ যার হয়নি সে এই আনন্দের জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারবে না। স্বামীজী এর উপমা দিচ্ছেন – একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছে একটা বাচ্চা মেয়ে এসেছে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী দূরবীন নিয়ে এটা সেটা দেখছেন, নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। মেয়েটি জিজ্ঞেস করছে 'আপনি এগুলো দিয়ে কি করছেন?' তখন বিজ্ঞানী বলছে আমি গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করছি। মেয়েটি তখন বলছে এই পড়াশোনা করে কি জিঞ্জার ব্রেড পাওয়া যাবে? প্রফেসর বলছেন, না সেটা তো পাওয়া যাবে না। তাহলে তো এই পড়াশোনার কোন কাজেরই নয়। এখন জিঞ্জার ব্রেড পাওয়া যাবে না বলে কি প্রফেসর গ্রহ, নক্ষত্রের চর্চা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবেন? সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সহ সমস্ত রকমের উচ্চতম জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা ঠিক এই বাচ্চা মেয়েটির মত। আমার এই জ্ঞান হলে আমি কি আরও বেশী টাকা উপার্জন করতে পারবো? না, তাতো হবে না। তাহলে এটা আমার কোন কাজে লাগবে না। জর্জ বার্ণার্ড'শ খুব সুন্দর লিখছেন – লেখক কে হতে পারে? সবাই তো লিখে যাচ্ছে, কিন্তু লেখক তো কেউ হচ্ছে না। বলছেন, যে না খেয়ে মরছে, তার স্ত্রীর একটি সন্তান হয়েছে। স্ত্রী বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, সেই দুধ বাচ্চার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বাজারে বিক্রী করছে, বিক্রী করে যেকটি টাকা পাবে সেই টাকা দিয়ে কালি কিনবে, সেই কালি দিয়ে সে সাহিত্য রচনা করবে। এই রকম যার বুকের পাটা আছে সেই লেখক হতে

পারবে, আর কেউ হতে পারবে না। হে লেখক! তুমি কি প্রস্তুত আছে? এই লেখার জন্য তোমাকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হবে। তুমি কি প্রস্তুত? ভবিষ্যতে কোন দিন তোমার এই লেখা স্বীকৃতি পাবে না। তুমি কি প্রস্তুত? এই লেখার জন্য তোমার সর্বস্ব চলে যাবে। এই স্তরের মানসিকতা যদি থাকে তবেই সে লেখক, তবেই তার ওই লেখাটা লেখার যোগ্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতই দেখা যায়। তাই আজকে যেটা লেখা হচ্ছে আগামীকাল সেই লেখাটা ডাস্টবীনে চলে যাচ্ছে।

ভগবানের আনন্দ আস্বাদ করতে হলে আগে এই মানসিকতার দরকার। ভগবানের সেই আনন্দ একবার আস্বাদ করে নিলে জগতের সমস্ত সুখ-ভোগ নাম-যশ সব খড়কুটোর মতে মনে হবে, তার থেকে আরও মারাত্মক হল ভবিষ্যৎ বলে তার আর কোন বোধই থাকে না। মানুষ সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজী আছে কিন্তু আগামীকাল আমার কি হবে, এই দুশ্চিন্তাকে সে ছাড়তে পারে না। বাড়িটাই আমার সব থেকে নিরাপত্তার জায়গা, আমার একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় তো আছে! সে কামিনী-কাঞ্চন ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের নিরাপত্তার ভাবনাটা ছাড়তে পারে না। একজন মানুষ যখন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায় একমাত্র তখনই সে ওই আশ্রয়টা ত্যাগ করে চলে যায়। আমরা অতি সাধারণ লোক, এখানে আমাদের কথা আনছেন না। যাঁরা ভগবানের আনন্দকে আস্বাদ করেছেন তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে। যাঁরা ভগবানের আনন্দের একটু সামান্য কণা আস্বাদ করেছেন, তাঁরা ঘর গৃহস্থীর মত যা কিছু নিরাপত্তা আছে সেটাকেও ছেড়ে দেন। আমরা সবাই এত শাস্ত্র কথা শুনছি, পড়ছি কিন্তু আমরাও তো ছাড়তে পারছি না, আবার যারা স্ত্রী, পুত্র, নাতি-নাতনী নিয়ে আনন্দে আছে তারা তো ছাড়তেই পারবে না। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্র কথা শুনছেন, পড়ছেন তাঁদের সংসার থেকে আনন্দ পাওয়াটা আগের থেকে কমে যায়। তাঁদের এখন সাধুসঙ্গ ভালো লাগে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চা করতে ভালো লাগছে। কিন্তু আটকাচ্ছে কোথায়? ভবিষ্যতের নিরাপত্তা অভাবের ভয়ে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবানের আনন্দ যিনি পেয়ে গেছেন, তিনি এই চিন্তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যান। এই কথাই শ্রুতি ভগবানকে বলছেন আপনার লীলা আস্বাদন এমনই আনন্দের যে, যারা ঘর-গৃহস্থি করছে, তারাও এই আনন্দ পাওয়ার জন্য নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে যায়।

শ্রুতি বলছেন – হে প্রভু! বড় বড় বিচারশীল যোগীরা মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে হৃদয়ে আপনারই উপাসনা করেন আর আপনার দর্শনও পান। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে, যাঁরা আপনাকে বৈর ভাবে সাধনা করছেন তাঁরাও সেই আপনার দর্শন লাভে ধন্য হয়ে যায়। মূল কথা যেভাবে, আর যে করেই হোক ঈশ্বরের চিন্তন করা। আরও মজার ব্যাপার, সাধারণ স্ত্রীরা আপনাকে ভালোবাসে পরিচ্ছিন্ন পুরুষ রূপে। পরিচ্ছিন্ন মানে, আমার ভগবানের শরীর এই রকম, তাঁর এই রকম সুকোমল আজানুলম্বিত বাহুযুগল, তাঁর মুখশ্রী এই রকম সুন্দর, এইভাবে চিন্তা করতে করতে ভগবানকে পুরুষ রূপে ভালোবেসে ফেলে। ভাগবতের বক্তব্য হল, বেশীর ভাগ রমণীরা যখন ভগবানে ভক্তি করে তখন কোথাও তাদের মনে তিনি আমার স্বামী এই ভাবটা চলে আসে। শ্রুতিরা এই কথাই বলছেন – আপনার মদনমোহন রূপে কামভাবে আসক্ত হয়েও যে মেয়েরা আপনাকে প্রেম ভক্তি ভালোবাসা ঢেলে দিচ্ছে তারাও সেই পরমপদ লাভ করছে। এখানে কিন্তু গোপীদের কথা বলা হচ্ছে না। কারণ, পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেছেন, শুকদেব অনেক আগেকার নারায়ণ ঋষির কাহিনী বলছেন, নারায়ণ ঋষি নারদকে আরও আগেকার এক কাহিনী বলছেন, সেই কাহিনীতে সনন্দন বলছেন শ্রুতিরা যখন ভগবানকে যোগনিদ্রা থেকে জাগ্রত করেন তখন তাঁরা কীভাবে স্তুতি করে জাগ্রত করেন সেই কাহিনী বলছেন। গোপীদের তখন জন্মই হয়নি। শ্রুতি এই কথাই এখানে বলছেন যদি কোন নারী আপনাকে কাম ভাবেও ভালোবেসে, কিন্তু মন প্রাণ আপনাতেই ঢেলে দিচ্ছে। এটাই মধুর ভাব। যে ভাব নিয়েই থাকুক না কেন, মন-প্রাণ দিয়ে ভগবানের চিন্তা করে যাচ্ছে কিনা। সেইজন্য ঠাকুর বার বার বলছেন একটা ভাবকে আশ্রয় করতে। সখ্য, দাস্য, সন্তান, মধুর, শান্ত যে কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে একমাত্র তাঁরই চিন্তন করে যেতে হবে। কেউ যদি কামভাবেও আসক্ত হয়ে ভগবানকে ভালোবাসে, নারায়ণের এত সুন্দর শরীর, তাঁর মত সুপুরুষ আর কে আছেন, এই ভাব নিয়েও যদি কেউ ভগবানকে ভালোবাসে সেও সেই পরমপদ পেয়ে যাবে। শ্রুতি এখানে যে ভাবকে উল্লেখ করেছেন, পরবর্তি কালে গোপীদের ক্ষেত্রে এই ভাবকেই দেখানো হয়েছে।

শ্রুতি এই শ্লোকে বিভিন্ন দর্শনের নানান রকমের মত নিয়ে আসছেন, *জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং বিপণমৃতং স্মরন্ত্যুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ। ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে।।১০/৮৭/২৫।* কিছু কিছু মানুষ মনে করে এই জগৎ অসৎ, কিন্তু এর উৎপত্তি হয় আপনার থেকে। কিছু লোক বলেন দুঃখ যেটা আসে এটাও সদ্‌রূপ, মানে দুঃখটা সত্যিকারের। ভগবান বুদ্ধ যেমন বলছেন দুঃখ আছে। বলছেন, দুঃখ সমূহের বিনাশ হলে মুক্তি লাভ হয়। অনেকে মনে করেন আত্মা অনেক, আমার মধ্যে আত্মা, আপনার মধ্যে আত্মা, এই রকম আত্মা অনেক। কিছু লোক মনে করে কর্ম দিয়ে স্বর্গ পাওয়া যায়, এটাই সত্য। আবার বলছেন, আত্মা ত্রিগুণময় অর্থাৎ আত্মার মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ আছে, এটা অজ্ঞান থেকে হয়। আপনি এই অজ্ঞানের পারে। যত রকম ধর্ম আছে, যত দর্শন আছে সবটাই খুব কায়দা করে এই শ্লোকে তুলে দিয়েছেন। তুলে এনে দেখাচ্ছেন ভেতরে যিনি আত্মা আছে তাঁর সাথে পরমাত্মার কোন তফাৎ নেই, দুটো একই – এটাই শ্রুতির বক্তব্য। আত্মা আর পরমাত্মাকে ভিন্ন মনে করলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে, আর আত্মা ও পরমাত্মাকে যদি অভেদ মানা হয় তখন আবার স্বর্গ, নরক এগুলো যুক্তিতে দাঁড়ায় না। এই জিনিসটাকেই এখানে আলোচনা করে বলছেন আত্মা আর পরমাত্মা অভেদ। তাই স্বর্গের কামনা করা, দুঃখকে চিরস্থায়ী মনে করা এগুলো অজ্ঞানজনিত চিন্তা। ভাগবত যদিও ভক্তিশাস্ত্র কিন্তু এখানে ঘোর অদ্বৈতকে নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। এখানে ভক্তি আর অদ্বৈতের সাথে কোথায় মিল আছে দেখানোর জন্যই এই অধ্যায়কে আনা হয়েছে।

শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করার পর হৃদয়ে ধারণা করে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন। তাই শাস্ত্রের কথা বার বার শুনে যেতে হয়। ভৌতিক বিদ্যার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয় না, একবার শুনে বুঝে নিলেই হয়ে যায়। কিন্তু শাস্ত্রের কথা শুনে বুঝে নিলেই হবে না, শাস্ত্র বাক্য অনুযায়ী আমাদের জীবনকে সংগঠিত করতে হয়। শাস্ত্রের অনুরূপ জীবনকে সংগঠিত করতে করতে যখন শাস্ত্রের কথার মত শরীর, মন, বাক্য হয়ে যাবে তখন শাস্ত্রের কথাগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করবে। এটাই লৌকিক বিদ্যা আর আধ্যাত্মিক বিদ্যার মধ্যে বিরাট ফারাক তৈরী করে দেয়। সেইজন্য শাস্ত্রে একই কথা বার বার বলা হয়। এখানে যেমন উপমা দিয়ে দেখানো হচ্ছে বেদ যেন ভগবানকে ঘুম থেকে তুলছেন, আসলে এগুলো সাধারণ মানুষদের জন্য। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্বগুলো বুঝতে পারে না, শুনতেও আগ্রহী নয়, অথচ সৃষ্টির ব্যাপারে সবাই অনুসন্ধিৎসু। সেইজন্য তাদের এই অনুসন্ধিৎসুতার ক্ষুধা নিবারণের জন্য একটা কাহিনীর অবলম্বন করতে হয়। ভাগবতের বেদস্তুতিও ঠিক তাই, একটা কাহিনীর মাধ্যমে অদ্বৈত দর্শনের গূঢ় তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসছেন।

বেদস্তুতিতে একটার পর একটা বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলিকে বলে যাচ্ছেন। তার মধ্যে যেমন একটা শ্লোকে বলছে *ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরস্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ। বর্ষভুজোহ-খিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ।।১০/৮৭/২৮।* আপনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় থেকে আলাদা। আপনার কোন কান নেই, নাক নেই, চোখ নেই অথচ আপনিই এই সব কিছু। অন্তঃকরণের যা কিছু শক্তি, আর যা কিছু বাহ্যকরণের শক্তি সব আপনার মধ্যেই বিদ্যমান। করণ মানে যন্ত্র, হাতিয়ার। অন্তঃকরণ হল মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার আর বাহ্যকরণ হল হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি। এইজন্য কোথাও কোথাও বলা হয় ভগবান সর্বগুণ সর্বশক্তি সম্পন্ন। এখন যদি হাত পাওয়ালা ঠাকুর হয় তখন তাঁর অনেক সমস্যা। হাত পা হলে হাতে পায়ে ব্যাথাও হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এগুলো তাঁর কিছুই নেই। সেইজন্য দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়, একটা দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর কিছুই নেই, তাঁর ইচ্ছা মাত্রই সব কিছু হয়ে যায়। মানুষ এগুলো কিছুই বুঝতে পারেনা, তাই গীতায় বলে দিচ্ছে *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্‌,* তাঁর হাত পা, চোখ, নাক, কান সব জায়গাতেই আছে। মানুষ এটাও বুঝতে পারেনা, যেখানে হাত সেখানেই চোখ কি করে হয়, তখন হাজার হাত কালী বানিয়ে দেয়, মা কালীর হাজারটা হাত, মা দুর্গার দশটা হাতে কাজ হচ্ছে না, এখন হাজারটা হাত বানিয়ে দিল। বলছেন – যেমন ছোট ছোট রাজা বা জমিদাররা খাজনা আদায় করে মূল রাজাকে দেন, আপনি ঠিক তেমনি, আপনাকে কিছু করতে হয় না। খাজনা আদায় করার জন্য আপনাকে যেতে হয় না, এর জন্য ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ দেবতারা আছেন, ছোটখাটো অনেক দেবতারা আছেন,

তারাই সব আপনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আপনি এর সব কিছুর পারে। যখন সৃষ্টি হয় তখন প্রকৃতি আর পুরুষই থাকেন মানে চৈতন্য আর জড় থেকেই সৃষ্টির শুরু হয়। হে ভগবন্ এই দুটো আপনারই রূপ, আপনিই প্রকৃতি আপনিই পুরুষ। কিন্তু মানুষ করে কি প্রকৃতির যে স্বভাব, প্রকৃতির যে গুণ সেটা পুরুষের উপরে আরোপিত করে দেয়, আর পুরুষের স্বভাব প্রকৃতির উপরে নিয়ে আসে। কি রকম? যেটা জড় সেটাকে চেতন মনে করে আর চেতনকে জড় মনে করে। মন বুদ্ধি জড় কিন্তু আমরা এদের চেতন মনে করছি। গঙ্গাতে অনেক সময় জলে বুদ্বুদ হয়, কিন্তু জল আর বুদ্বুদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? কিছুই তফাৎ নেই। একই জল, যখন জলে বাতাস ঢুকে যায় তখন বুদ্বুদ হয়ে যায়। বাচ্চারা যেমন জলের বুদ্বুদ আর জলকে আলাদা দেখে ঠিক তেমনি আমাদের সংশয়ের জন্য প্রকৃতি ও পুরুষকে আলাদা দেখি। মূল কথা হল ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। যেমন সমস্ত নদী সমুদ্রে গিয়ে মিলে যায়, বিভিন্ন ফুলের মধু যেমন মৌচাকে গিয়ে এক হয়ে যায়, ঠিক তেমনি, যা কিছু আছে সব ঘুরে ফিরে প্রভু আপনাতেই মিশে যায়।

আরেকটি শ্লোকে শ্রুতিরা বলছেন *ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনাদনুমতিওমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে। অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈর্বিতথমনোবিলাসমৃতমিতাবষন্ত্যবুধাঃ।। ১০/৮৭/৩৭।* হে ভগবন্! এই জগৎ সৃষ্টির আগেও ছিল না, প্রলয়ের পরেও থাকবে না। সুতরাং স্থিতিকালে পরমাত্মাতে যা কিছু দেখাচ্ছে এটা মিথ্যাই প্রতীত হয়। যে জিনিস আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না, অথচ এই দুটোর পারে নিত্য বলে একটা বস্তু আছে, তাহলে তো এই জগৎটা মিথ্যাই হয়ে যায়। যেমন সমুদ্র, সমুদ্রে অনবরত ঢেউ উঠছে, ঢেউ একটা সময় জন্ম নিচ্ছে, জন্ম নিয়ে কিছু মুহুর্ত স্থায়ী হয়ে আবার সমুদ্রেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যিনি সমুদ্রকে প্রকৃষ্ট রূপে জানেন, সমুদ্রের কি স্বভাব, সমুদ্রের কি কার্য, তাঁরা জানেন সমুদ্রই সত্য তার ঢেউটা মিথ্যা। ঢেউ যে নেই তা নয়, ঢেউ ভালো মত আছে। আমাদের সমস্যা হল, যখনই মিথ্যা শব্দটা নিয়ে আসা হয়, তখন আমরা মনে করি মিথ্যা মানে স্বপ্ন, অলীক। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা কখনই জগৎকে আকাশকুসুমের মত অলীক মনে করেন না। তাঁরা বলেন ঢেউ আছে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, কিন্তু ঢেউয়ের সত্তা ক্ষণিক, স্থায়ী নয়। বাস্তবিক সত্তা সমুদ্রের, সমুদ্র আর তার ঢেউ অভেদ কিন্তু ঢেউ কখন সমুদ্র নয়। আমাদের কাছে জগৎকে বেশী সত্য বলে মনে হয়। আমাকে কেউ যদি একটা হাজার টাকার নোট দেয় আমি সেই নোটকে খুব সামলে রাখবো। কিন্তু যদি জানতে পারি হাজার টাকার নোটটা নকল, আর পুলিশ খুঁজছে কাদের কাছে নকল নোট রয়েছে। তখন আমার চেষ্টা হবে নকল নোটটাকে যত তাড়াতাড়ি অন্য কারুকে গচিয়ে দেওয়া। নকল নোট বেশী পাচার হয় মন্দিরের প্রণামী বাক্সে। শুধু নকল টাকার ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন নকল জিনিসকে মানুষ তাড়াতাড়ি নিজের থেকে ঝেড়ে ফেলে অন্যের কাছে গচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা এই পুরো জগৎকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছি, শুধু স্ত্রী-পুত্র পরিবার নয়, সব কিছুতেই আমাদের আসক্তি। যখন প্রতীত হয়ে যাবে সব কিছু মিথ্যা, ক্ষণিক, আজ আছে কাল থাকবে না, তখন কি হবে? তৎক্ষণাৎ ফেলে দাও। তৎক্ষণাৎ ফেলা যদি নাও হয়, সর্বশক্তি দিয়ে যে আঁকড়ে রেখেছে সেটা একটু আলগা হয়। একটু আলগা হওয়া মানে জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায়। সংসারীরা নিজের স্ত্রী-পুত্রকে স্নেহ করে, প্রমোশনকে স্নেহ করে কারণ জগৎ তার কাছে বিরাট সত্য, মৃত্যুটা আরও সত্য, মৃত্যুর নাম শুনলে আঁৎকে ওঠে। একটা মিথ্যাকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এই আঁকড়ে ধরাটা একটু ঢিলে না করলে সবাইকে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে। শাস্ত্র ঠিক এই কাজটা করে, যে জগৎকে এত সত্য বলে মনে হচ্ছে, জীবনকে এত সত্য বলে বোধ হচ্ছে, এই বোধটা আস্তে আস্তে কাটাতে থাকে। শাস্ত্র তাই ঘুরে ফিরে একটা কথাই বার বার বলে যাবে, পরমার্থ সাধনই জীবনের উদ্দেশ্য, কারণ ঈশ্বর ছাড়া, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। যা কিছু প্রতীত হচ্ছে সব তাঁরই অভিব্যক্তি। এই গ্লাশ আছে, বোতল আছে, এগুলো সবই আছে, কেউ না বলছে না। কিন্তু এগুলো নাম ও রূপ, নাম-রূপটাই মায়া। সেই কথাই বেদ স্তুতি করে বলছেন *বিভাতি মৃষৈকরসে*, পুরো জগৎটা যেন এক রসে স্থির ভাবে রয়েছে, কিন্তু তা নয়। যখন কেউ নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যান, বলে তখন তাঁর সুখ অনুভব হয়, সুখ ছাড়া অন্য কিছু অনুভব হয় না। এতেই বোঝা যায় দুটো আলাদা – সমাধি অবস্থায় যে চেতনা আর জাগ্রত অবস্থার চেতনা এই দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে।

স্তুতি করতে করতে শেষে এক জায়গায় বলছেন *যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা দুরধিগমোহসতাং হৃদি গতোহস্মৃতকণ্ঠমণিঃ। অসুতৃপযোগিনামুভয়তোহপ্যসুখং ভগবন্ননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ ভবতঃ।।১০/৮৭/৩৯।* হে ভগবন্! মূল কথা বিষয়-বাসনাকে নির্মূল করা, বিশেষ করে যারা সাধু, সন্ন্যাসী, তপস্বী, যে একবার ঠিক করে নিল শুধু ঈশ্বরের জন্য আমি সংসার ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তারপরেও যদি ভোগে চলে যায়, নাম-যশের পেছনে ছুটতে থাকে তখন তার আর দুর্গতির শেষ হয় না। যেমন কোন লোক গলায় মালা পড়ে আছে আর সে চারিদিকে মালা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাধারণ লোকের কথা না হয় বাদ দিন, কিন্তু যাঁরা সাধুপুরুষ, সাধনা করতে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা যদি তারপরেও আপনার দিকে মন না দেন, আপনাকে পাওয়ার চেষ্টা না করেন, এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ান, তাঁদের মত নিকৃষ্ট জীবন আর কারুর হতে পারে না। সেইজন্য একবার যে আপনার কথা শোনার পর আপনার কথা জেনে নিয়ে ঠিক করে নিল যে আমি এবার ধর্ম পথকে অবলম্বন করলাম, এরপর তার আর বিচলিত হওয়া ঠিক হবে না।

বেদস্তুতিতে কাহিনীর ভেতরে কাহিনী চলছিল, যেখানে প্রথমে নারদ আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কথা হচ্ছিল। এইসব কাহিনী হয়ে যাওয়ার পর নারদ শেষে বলছেন *নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে। যো ধত্তে সর্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ।।১০/৮৭/৪৬।* দেবর্ষি নারদ বলছেন – ভগবন্! আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, আপনার কীর্তি পরমপবিত্র, আপনি যে কাজ করছেন এই কাজের কোথায় কোন ধরণের মল নেই, *অমলকীর্ত্তয়ে*। আপনি সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য পরমকল্যাণ। পরমকল্যাণ সব সময় নিজেরই হয়, নিজের মোক্ষের চেষ্টা। নারদ বলছেন, আপনি প্রাণীকুলের পরম কল্যাণের জন্য ও মোক্ষ দানের জন্য, মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলাবতার ধারণ করেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কলাবতার বলছেন। কোথাও আবার শ্রীকৃষ্ণকে অবতারীও বলা হয়েছে, অবতারী মানে যেখান থেকে সব অবতাররা আসেন। আবার বৈষ্ণবরা বলেন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কিন্তু এখানে নারদ শ্রীকৃষ্ণকে কলাবতার বলছেন। যাঁরা অনেক সাধনা করেছেন, অনেক শাস্ত্র পড়ে পড়ে যুক্তি বিচার করার মত একটা শক্তি যখন আসে তখন শাস্ত্রের অনেক খ্যাঁচ খোঁচ ব্যাপার নজরে পড়ে যায়। এখানে যেটা বলছেন আবার তারই বিপরীত কথা অন্য জায়গাতে বলা হচ্ছে। এর থেকে বেরোবার উপায় হল, নিজেকে আগে অনুভূতির স্তরে নিয়ে যাওয়া। অনুভূতির পর সেও যখন অপরকে বলতে যাবে তখনও এই একই উল্টোপাল্টা কথা এসে যাবে। কারণ যিনি অখণ্ড তাঁকে যখন খণ্ড দিয়ে পার করান হয় তখন গোলমাল হবেই। কোল্ডড্রিঙ্কসে যে স্ট্র ব্যবহার করা হয়, ওই রকম দুটো সরু পাইপকে চোখে লাগিয়ে যদি কাউকে বোম্বে হাইওয়েতে ট্রাক চালাতে বলা হয়, তখন তার যে অবস্থা হবে, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তাঁর কথা যে বলতে যাবে, তারও ঠিক ওই ড্রাইভারের মত অবস্থা হবে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে যখন শাস্ত্রের মাধ্যমে নামিয়ে আনা হয় তখন সেই হাইওয়েতেই চলছে কিন্তু চোখে সরু পাইপ লাগানো। সেইজন্য শাস্ত্রের সব কথা না মেলাটাই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, না কলাবতার, না অবতার আমরা এর কি বুঝবো। যে ধ্যান করে দেখেছে সেই জানতে পেরেছে। তবে এখানে নারদ কলাবতার বলছেন। অবতার কেন আসেন? দেবর্ষি নারদ বলছেন মানুষের যেটা পরম কল্যাণ, অর্থাৎ মোক্ষ দানের জন্যই ভগবান অবতার হয়ে আসেন। তিনি রাবণ, কংস বধ করার জন্য অবতার হয়ে আসেন না। ভগবানের অবতার হয়ে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে মুক্তির দিকে এগিয়ে দেওয়া, এটাই পরমকল্যাণ। মুক্তি কি, পরম কল্যাণ কি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। সেইজন্য বলে দেওয়া হয়, ভগবান রাবণকে বধ করেছেন। রাবণ কে? বিরাট বড় রাক্ষস তার দশটি মাথা কুড়িটি হাত। এবার বোঝা গেল ভগবানের কী ক্ষমতা। বোকা মুর্খদের জন্য ভগবানের কথা বলতে গেলে এভাবেই বলতে হয়। কিন্তু এইভাবে বলতে বলতে শাস্ত্র হাঁপিয়ে ওঠে, কতক্ষণ আর দম বন্ধ করে রাখবে, তাই মাঝে মাঝে আসল কথাগুলো বেরিয়ে আসে।

সব বলার পর শুকদেব আবার বলছেন *যোহস্যোহৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোহব্যক্তজীবেশ্বরো যঃ সৃষ্টৈদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শান্তি তাঃ। যং সংপদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরম্।।১০/৮৭/৫০।* 'হে পরীক্ষিৎ ভগবানই এই সৃষ্টির সঙ্কল্প করেন'। ভাগবত এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করছেন '*উৎপ্রেক্ষক*', উৎপ্রেক্ষককে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা

যায়। একটা অর্থ হল তিনি এই সৃষ্টির সঙ্কল্প করেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি। কিন্তু পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে না, তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করছেন, নাকি তিনি সঙ্কল্প করছেন, নাকি এসব কিছুই নয় তিনি উৎপ্রেক্ষক মানে তিনি আছেন বলেই এই জগতের সৃষ্টি হচ্ছে। সবাই জানে ঈশ্বর যদি না থাকেন তাহলে সৃষ্টি আসবে না! ভৌতিকবাদীরা এই কথা মানবে না, কিন্তু এখানে তাদের কথা আনাই হচ্ছে না, তাদের কথাই বলা হচ্ছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এই শ্লোকে বলতে চাইছেন, জগতের কেন সৃষ্টি হয়? ভগবান এর উৎপ্রেক্ষক, তাঁর সঙ্কল্পেই সৃষ্টি হয়। শুধু তাই না, সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্য এই তিনটে অবস্থাতে তিনিই একমাত্র থাকেন। যেমন সমুদ্র, সমুদ্রে ঢেউ উঠছে, কিন্তু আদিতেও সমুদ্র, অন্তেও সমুদ্র আর মাঝখানে যে ঢেউ উঠছে সেটাও সমুদ্রই। এই স্টীলের গ্লাশটা যখন ছিল না তখন এটা ইস্পাত ছিল, গ্লাশটা যখন নাশ হয়ে যাবে তখনও ইস্পাত থাকবে আর এখনও ইস্পাতই আছে। আমরা শুধু নাম-রূপ নিয়ে মারামারি করছি, ওকে বড় গ্লাশ দাও, আমাকে সুন্দর গ্লাশটা দাও, এই গ্লাশটা দেখতে ভালো না, কিন্তু সবই ইস্পাত। আমার দরকার গ্লাশ, গ্লাশের দরকার জল খাওয়ার জন্য। জল খাওয়ার সময় আর দেখছি না এই গ্লাশটা দেখতে বড় না ছোট, সুন্দর না খারাপ, জল খাওয়া নিয়ে আমার কথা। তাহলে জগতটা তো মায়া, জগতের কোন দরকার নেই। না, জগতেরও দরকার আছে। জগৎ মিথ্যা না সত্য সেটা পরে আসছে, তার আগে আমি আছি এটাতো পরিষ্কার সবাই দেখছি। কিন্তু এই নাম-রূপ থেকে বেরোন যাবে কি করে? তখন প্রথমে বলবেন, তুমি জগৎকে সত্য বলে মনে করছ তাই ফেঁসে আছ। তাহলে জগৎকে মিথ্যা কি করে মনে করব? আগে তুমি তোমার দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির ব্যাপারে সজাগ হও। সজাগ হয়ে তোমার ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযম করে ঈশ্বরীয় কথা শুনবে আর ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করবে। সাথে সাথে ঈশ্বরীয় কথা যা শুনেছ সেইসব কথা মনন করবে। মনন করে করে বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরীয় কথাকে নিশ্চিত করবে। তখন ঈশ্বরীয় তত্ত্বটা তোমার সামনে ভেসে উঠবে। এবার তোমার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হবে।

শুকদেব বলছেন মানুষ গাঢ় নিদ্রাতে যেমন সব কিছু হারিয়ে ফেলে, দেহবোধ, আমি বোধ, মন, বুদ্ধি সব গাঢ় নিদ্রাতে হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনি মানুষ যখন তার নিজের মনকে পুরোপুরি ঈশ্বর তত্ত্বে দিয়ে দেয়, তখন জগতের যত আজেবাজে জিনিস আছে, ভয়, মোহ, অজ্ঞান সব চিরদিনের মত নাশ হয়ে যায়। সুষুপ্তিতে যেমন আমাদের সব কিছু খসে পড়ে যায়, জ্ঞান হলে ঠিক সেইভাবে সব খসে পড়ে যায়। সুষুপ্তির সঙ্গে শুধু একটাই পার্থক্য, সুষুপ্তি থেকে জাগ্রত অবস্থায় চলে এলে দেহবোধ, অহংবোধ, ভয়, মোহ, অজ্ঞান যেমন আবার চলে আসে, জ্ঞানের পরে এই জিনিস গুলি আর ফিরে আসে না। শুকদেব শেষে বলছেন প্রকৃতি আর জীব এই দুটোরই স্বামী তিনি। আমার ভেতরে যিনি জীব আছেন তিনি তাঁরও স্বামী আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও তিনি স্বামী। ভগবানের উপর মায়ার কোন প্রভাব পড়ে না। সমুদ্রে যতই ঢেউ উঠুক পড়ুক তাতে সমুদ্রের কিছু আসে যায় না। এই হল ভগবানের স্বরূপ। এখানে অবশ্য শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন তার আগে নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলছিলেন আর তারও আগে চলছিল বেদস্তুতি, তিনটে স্তরে একই অধ্যায় চলেছে।

শিব ভক্ত ও বিষ্ণু ভক্ত প্রসঙ্গে পরীক্ষিতের প্রশ্ন

এরপর পরীক্ষিৎ একটা দুটো প্রশ্ন করছেন। তার মধ্যে একটা খুব মজার প্রশ্ন করছেন *দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্। প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্।।১০/৮৮/১।* এই শ্লোকটি খুব মজার শ্লোক, আমরা মেনে চলছি যে ভাগবত পুরাণ ব্যাসদেব রচনা করেছেন। যেহেতু শুকদেব এই কাহিনী বলছেন তাহলে ব্যাসদেব হয়তো পুরোটা লেখেননি, ব্যাসদেবের পরেও হয়তো কিছু লেখা হয়েছে। বর্তমান কালের পণ্ডিতরা বলছেন ভাগবত আরও পরের দিকে রচিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রশ্নটাই এই শ্লোকের মাধ্যমে উঠে এসেছে। হে শুকদেব! এই জগতে প্রায়শই দেখা যায় যারা ভগবান শিবের আরাধনা করে, তারা যেই হোক দেবতা হতে পারে, মানুষ হতে পারে, অসুর হতে পারে, তারা সবাই ধনী হয়ে যায়। কিন্তু লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর উপাসকরা প্রায়শই ধনী ও ভোগী হয় না, তাদের কাছে খুব বেশী টাকা-পয়সা থাকে না। অথচ শিব আর বিষ্ণু দুজনেই আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত স্বভাবের। শিব হলেন সর্বত্যাগী, তাঁর ভক্তরা সব ধনী আর ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি, সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক কিন্তু তাঁর ভক্তরা সব কাঙাল, গরীব। যদিও এইভাবে

পুরোটাই সাধারণীকরণ করে দেওয়া যায় না, কিন্তু একেবারে যে ভুল তাও নয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর এক শিষ্য বৃন্দাবনে থাকতেন, সারদিন জপ-ধ্যান করতেন আর ভিক্ষা করে রুটি নিয়ে এসে ভগবানকে নিবেদন করতেন আর নিজেও সেই ভোগ খেতেন। অনেকদিন পর ভগবান স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলছেন কতদিন আমি এই শুকনো রুটি খাবো, একটু নুন তো দিতে পারো। তিনি বললেন ঠিক আছে, আরও দু-ঘর না হয় ভিক্ষা করবো। পরের দিন থেকে আরও দুই ঘরে নুন ভিক্ষা করতে শুরু করলেন। বেশ চলছে, রোজই রুটি আর নুন, নুন আর রুটি, ভগবানকেও খাওয়াচ্ছেন নিজেও খাচ্ছেন। কিছুদিন যাওয়ার পর ভগবান আবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলছেন, এই শুকনো রুটি আর নুন কদ্দিন ধরে খাবো, একটু ক্ষীরের যদি ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি ভগবানকে বলছেন, এতটা আমার দ্বারা হবে না। এত সেবার যদি আপনার দরকার তাহলে আপনার কোন বড়লোক ভক্তকে বলুন তিনি এসে আপনার সেবা করে দেবেন, আমার দ্বারা হবে না। স্বপ্নেই ভগবান বলছেন আমার এত এত বড় বড় ধনী ভক্ত কিন্তু তারা কেউ আমাকে খেতেই দেয় না। তারপর ভগবান দক্ষিণ ভারতের কোন বড়লোক ভক্তকে স্বপ্নে দেখা দিলেন, সেই ভক্ত বৃন্দাবনে রঙ্গনাথনন্দজীর মন্দির তৈরী করলেন, যার সাতটি প্রবেশ দ্বার আর মন্দিরে প্রতিদিন গোবিন্দের বিরাট ভোগরাগের আয়োজন হয়। সেইজন্য বলা যাবে না যে বিষ্ণুর ভক্তরা সবাই কাঙাল হন। আবার শিব হলেন সন্ন্যাসীর আদর্শ, অন্য দিকে শিবের মত স্বামী পাওয়ার জন্য ভারতের সব মেয়েরা শিবের মাথায় জল ঢালে।

শুকদেব তখন পর পর অনেক কিছু বলার পর শেষে বলছেন, ঠিকই শিবের এই একটা সমস্যা আছে। তবে কি জান, তোমার ঠাকুর্দা যুধিষ্ঠির যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন সেই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলেন। শুকদেব দেখাতে চাইছেন এটা খুব পুরনো সমস্যা। যাই হোক সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।।১০/৮৭/৮।* শ্রীকৃষ্ণ এখানে যে কথাগুলো বলছেন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় এগুলো শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বাক্য নাকি ভক্তদের উৎসাহিত করার জন্য বলছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, আমি যার উপর অনুগ্রহ করি *হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ শনৈঃ*, তৎক্ষণাৎ নয়, ধীরে ধীরে তার সমস্ত ধনসম্পদ অপহরণ করে নিই। বাংলায় একটা কথাই আছে, যে করে আমার আশ আমি তার করি সর্বনাশ, এই প্রবাদ এই শ্লোক থেকেই এসেছে। হিন্দীতেও এই ধরণের একটা কথা আছে যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, এই মহাত্মার শ্রীচরণ যেখানেই পড়বে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ তারপর বলছেন শুধু ধনসম্পদ অপহরণ করেই আমি ছেড়ে দিই না, এরপর তার যত সম্বন্ধীরা আছে তারা সবাই আস্তে আস্তে তাকে ছেড়ে চলে যায়। মানুষের এটাই স্বভাব যে চাকে মধু নেই সেই চাকে মৌমাছি কেন থাকতে যাবে। আমার কাছে এখন টাকা-পয়সাই নেই কে আসবে আমার কাছে!

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, স্বজন-সম্বন্ধীরা একবারও ভাবে না এই লোকটির মনের কি দুরবস্থা। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে, When you lough the world loughs, when you cry, you cry alone। যখন তুমি হাসবে জগৎ তোমার সঙ্গে হাসবে, তুমি যখন কাঁদবে তুমি একাই কাঁদবে। জগতের এটাই নিয়ম। আপনার আমার মন, আবেগকে নিয়ে কেউ ভাববে না। সন্ন্যাসীর মুখ সব সময় হাস্যবদন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিণ্ণঃ স্যাদ্ ধনেহয়া। মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্।।১০/৮৮/৯।* যখন দেখে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তখন সে চেষ্টা করে আরও কীভাবে অর্থোপার্জন করে এই দুরবস্থার পরিবর্তন করতে পারা যায়। মহাভারতে মাঙ্কি গীতায় ঠিক এই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। কীভাবে আরও কিছু টাকা রোজগার করা যায়, সেই চেষ্টা করতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তখন আমি তার সব উদ্যমকে বিফল করে দিই। সব রকম চেষ্টা করে মানুষ যখন দেখে কোন ভাবেই কিছু হচ্ছে না, তখন আমার যারা ভক্ত তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে শুরু করে। এতদিন সে বিষয়ীদের সঙ্গে মেলামেশা করছিল, স্বজন-বান্ধব সব বিষয়ী, বিষয়ীরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন যারা ভক্ত তাদের সাথে সংযোগ করিয়ে দিই। ভক্তদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার পর যখন তাদের সঙ্গ করতে থাকে তখন আমি তার উপর কৃপা করি। কৃপা করার পর কি হয়? *তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্। অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ।।১০/৮৮/১০।*

আমার কৃপা পেতেই আমার প্রতি তার ভক্তি হতে শুরু হয়। সেই ভক্তির আনুকুল্যে সে ধীরে ধীরে অদ্বয় ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দের স্বরূপের দিকে এগোতে শুরু করে। শুধু এগোতেই শুরু করে না, সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি পর্যন্ত তার হয়ে যায়। ভগবান যখন কারুর উপর অনুগ্রহ করেন প্রথমেই তার সর্বনাশ করে দেন। সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার পর তার যত স্বজন-বান্ধব সবাই তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখনও কিন্তু সে ছাড়ে না, অবস্থার উন্নতির জন্য, নাম-যশের জন্য নানা রকমের চেষ্টা করে যায়। তখন তিনি আরও বিঘ্ন এনে সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। যখন দেখে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, তখন যারা ভগবানের ভক্ত তাদের কাছে ঘুর ঘুর করতে শুরু করে। ভক্তদের সাথে বন্ধুত্ব হতে থাকল। এর পরে ভগবান কৃপা করতে শুরু করেন। তার কাছে যখন ভগবানের কৃপা আসতে শুরু হয় তখন তার ভেতরে জ্ঞান, ভক্তি জাগতে থাকে। তখন জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুতে পেয়েই সে সন্তুষ্ট থাকে।

আধ্যাত্মিক পুরুষদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় তাঁরা জীবনে এমন এমন দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন শুনলে আমরা আঁৎকে উঠবো। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর শরীর চলে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীমাকে কি নিদারুন কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল, ভাতের উপর শাক জুটছে না, ছেঁড়া শাড়ি গিট্ বেঁধে পড়ছেন, আবার তিনি নাকি জগজ্জননী লক্ষ্মী। রাজরাজেশ্বরীর এই অবস্থা! সীতা, আরেকজন রাজরাজেশ্বরী, রাবণের বন্দী হয়ে অনাহার অনিদ্রায় স্বামীর বিরহে দিন কাটাতে হয়েছে। স্বামীজী নিবেদিতাকে চিঠিতে বলছেন Tell me how much you have suffered and I will tell you how great you are। ভগবানের কামারশালায় হাতুড়ির পেটাই না হলে কেউ মহৎ হবে না, যে যত ভগবানের হাতুড়ির ঘা খেয়েছে সে তত মহৎ হয়েছে। আমরা একটা সুখী জীবন, আরামের জীবন যাপন করে যাচ্ছি, এটাকে হাতুড়ি পেটা করা হবে ভাবলেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠি। জীবনকে মসৃণ ভাবে নিয়ে যাওয়া আর জীবনে মহৎ হওয়া এই দুটো একসঙ্গে কখনই চলতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ যেন খুব মজা করে বলছেন – আমি যখন হাতুড়ি পেটাই শুরু করি লোকগুলো তখন ছিটকে অন্য দিকে চলে যায়। অন্য দেবতারা আবার আশুতোষ, তাঁরা অতি অল্পেই বিগলিত হয়ে যান। বিগলিত হয়ে তাঁরা তাদের ধনসম্পদ দিয়ে দেন। তখন কি হয়? *ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ। মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে।।১০/৮৮/১১।* দেবতারা শীঘ্র সন্তুষ্ট হয়ে গিয়ে তাদের সব কিছু দিয়ে দেন। রাজ্য দিয়ে দেন, টাকা-পয়সা দিয়ে দেন। যেমনি সব কিছু পেয়ে যায় তখনই তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়, ঔদ্ধত্য এসে যায় আর উম্মত্ত হয়ে ওঠে। ঔদ্ধত্য মানে, লঘু গুরু কোন জ্ঞান নেই সবার সামনেই অভদ্র আচরণ করতে থাকে। মা মেয়েকে ঘরটা ঝাড় দিতে বলল, মেয়ের ইচ্ছে নেই, কিন্তু মা বলেছে বলে কোন রকমে ঝাঁটাটা বুলিয়ে দিল। এটাকে বলে পিশুনি বৃত্তি, পিঠ পেছনে অবাধ্য। এই মেয়েকে শোধরানো যাবে। কিন্তু মেয়েকে ঝাড়ু দিতে বলতেই মেয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে মার মুখের উপর বলে দিচ্ছে – আমি কেন ঝাঁট দিতে যাবো, এটা তো তোমার কাজ। এটাই ঔদ্ধত। একে আর শোধরানো যাবে না। এরপর কিছু বলতে গেলে বলবে – আমি স্পষ্টবাদী, যা বলার মুখের উপর বলে দিই। যারা নিজেদের স্পষ্টবাদী বলে জাহির করে, বুঝে নিতে হবে অবাধ্য থেকে সে ঔদ্ধতে পৌঁছে গেছে, আর ওকে বাঁচানো যাবে না। ভগবান শংকর অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান, সেইজন্য তাঁকে আশুতোষ বলা হয়। তাই শিবের যারা আশীর্বাদ পেয়ে যায় তারা টাকা-পয়সা, রাজ্য সব পেয়ে যায়। সব পাওয়ার পর এবার তারা মত্ত প্রমত্ত হয়ে পড়ে। *বিস্মরন্ত্যবজানতে*, যে ভালো করেছে, মঙ্গল করেছে এরপর তাকেই ভুলে যায়, তাকেই আবার শেষ করতে এগিয়ে আসে। মা-বাবা সন্তানকে কত কষ্ট করে বড় করে, বড় হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর সেই বাবা-মার দিকেই সন্তানের দৃষ্টি থাকে না।

<u>ভস্মাসুরের কাহিনী</u>

শুকদেব এবার পরীক্ষিৎকে বলছেন *শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ।।১০/৮৮/১২।* ভাগবতেই এক আধ বার ব্রহ্মার কথা আসে। হে পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিনজনেই অভিশাপ আর বর প্রদানে সক্ষম। কিন্তু ব্রহ্মা আর মহেশ্বর অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে

সঙ্গে সঙ্গে বর দিয়ে দেন, আবার একটুতেই অসন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপও দিয়ে দেন। তবে আমরা যতটুকু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি তাতে ব্রহ্মা অভিশাপ দিয়ে দেন সাধারণতঃ দেখা যায় না, কিন্তু বর দিয়ে দিতে তাঁকে অনেকবার দেখা গেছে। শিবের নামে বলা হয় তিনি ক্ষণেই রেগে যান আর অভিশাপও দিয়ে দেন, আবার অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়ে দেন। কিন্তু বিষ্ণু এরকম নন। শিব যাকে তাকে বর দিয়ে নিজেই অনেক ঝামেলায় পড়ে যান। এই নিয়ে অনেক কাহিনীও আছে। এখানে ভস্মাসুরের কাহিনীটা পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন। ভস্মাসুরের আসল নাম ছিল বৃকাসুর। বৃকাসুর শিবের এমন তপস্যা করেছে যে শিব এসে বলছেন, অনেক হয়েছে বাবা! বলো তুমি কি চাও। বৃকাসুর বলছে – আমাকে বর দিন যার মাথায় আমি হাত রাখবো সে যেন ভস্ম হয়ে যায়। শিব তথাস্তু বলে দিয়েছেন। এবার বৃকাসুর বর পেয়েছে, পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রথমেই সে শিবের মাথায় হাত রাখতে গেছে। শিব তখন মরি বাঁচি করে পালিয়েছেন। বৃকাসুরও পেছনে পেছনে তাড়া করে চলেছে। শেষে শিব ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বলছেন আমাকে বাঁচান। বিভিন্ন পুরাণে এই কাহিনীটা পাল্টে যায়। এখানে দেখাচ্ছেন, বিষ্ণু এক ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে নিয়েছেন। অন্য পুরাণে আছে বিষ্ণু এক কামিনীর রূপ ধারণ করেছিলেন। ভাগবতে অবশ্য বিষ্ণু ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে দেখছেন বৃকাসুর দৌড়ে যাচ্ছে। তিনি বৃকাসুরকে দাঁড় করিয়ে জল-টল খেতে দিলেন। জল-টল খাইয়ে জিজ্ঞেস করছেন আপনি কোথায় দৌড়ে যাচ্ছিলেন। বৃকাসুর বলছে শিব যে বর দিয়েছেন সেটাকে আমি যাচাই করার জন্য শিবের মাথায় হাত রাখতে যাচ্ছিলাম। বিষ্ণু শুনে বলছেন – আরে আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! আপনি জানেন না! দক্ষ প্রজাপতির সঙ্গে ঝামেলার পরেই ওনার পিশাচ ভাব হয়ে গেছে। এখন তো তিনি পিশাচদের সম্রাট, ওই সব বর-টর কিছু নেই ফালতু ফালতু আপনাকে বর দিয়েছে। ওর তো কিছুই ক্ষমতা নেই, এমনি বলে দিয়েছে। ব্যাঙ্কে এক সময় অনেক টাকা ছিল, এখন আর কোন টাকা নেই, কিন্তু একটা চেক লিখে দিয়েছে, সেই চেক ভাঙাতে গিয়ে দেখে চেক বাউন্স করেছে। এও ঠিক তাই। শিবের এখন ক্ষমতাই নেই, কিন্তু তাও বর দিয়ে যাচ্ছে। আর অতই যদি পরীক্ষার করার থাকে তাহলে নিজের মাথায় হাত রেখেই যাচাই করে নিন। ব্রহ্মচারীর কথায় বৃকাসুর খুব আপসেট হয়ে মাথায় হাত দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে গেল।

ভৃগু কর্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা

এরপর আরেকটি মজার কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। স্বামীজী ঘণ্টাকর্ণের গল্প বলতেন। ঘণ্টাকর্ণের এমনই ইষ্টপ্রীতি ছিল যে অন্য কোন দেবতার নাম সহ্য করবে না বলে কানের মধ্যে ঘণ্টা বেঁধে রাখতো। দেখা যায় যাঁরা বিষ্ণুর ভক্ত তাঁরা শিবের ভক্তদের সহ্য করতে পারে না, শিবের ভক্তরা আবার বিষ্ণুকে সহ্য করবে না, ব্রহ্মার ভক্তরা ব্রহ্মা ছাড়া আর কারুর নাম নেবে না। সরস্বতী নদী ভারতের অতি প্রাচীন নদী, এখন আর সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, বলে গুজরাতের দিকে সরস্বতী নদী চলে গেছে। বেদের ঋষিরা সবাই সরস্বতী নদীর ধারে সন্ধ্যা বন্দনাদি করতেন। একবারে সরস্বতী নদীর ধারে একটা বড় যজ্ঞ হচ্ছিল, সেখানে অনেক ঋষিমুনিদের সমাগম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ লেগে গেছে। সেখানে ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুও উপস্থিত ছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে কে মহৎ এই নিয়ে কোন মীমাংসা হচ্ছে না। তখন সবাই মিলে ব্রহ্মাপুত্র ভৃগুকে বললেন – আপনি গিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন তো কে মহৎ। আপনি ফিরে এসে যা বলবেন সেটাই আমরা মেনে নেব।

ভৃগু প্রথমে বাবার কাছে, অর্থাৎ ব্রহ্মার কাছে গেছেন। ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ভৃগু বাবাকে প্রণামও করলেন না, স্তুতিও করলেন না। ব্রহ্মার তিনি মানসপুত্র হতে পারেন কিন্তু তিনি তো তাঁর বাবা। পুত্রের আচরণে ব্রহ্মা ভেতরে ভেতরে খুব রেগে গেছেন – আমাকে প্রণাম করলো না! কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হল, আমরই তো সন্তান। নিজের ক্রোধকে প্রশমিত করে নিয়েছেন। অরণি মন্থন করে যে অগ্নির সৃষ্টি হয় তাকে যেমন জল দিয়ে নির্বাপিত করা হয়, সেই রকম ব্রহ্মার ভেতরে যে ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠেছিল সেটাকে তিনি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা দাবিয়ে দিলেন। ভৃগু বুঝে গেলেন, আমি প্রণাম করলাম না বলে বাবা মনে মনে রেগে গেছেন।

সেখান থেকে তিনি গেলেন কৈলাসে মহাদেবের কাছে। পুরাণের দৃষ্টিতে ভৃগু মহাদেবের থেকে বয়সে বড়, কারণ সৃষ্টিতে ভৃগু নাকি মহাদেবের আগেই এসে গিয়েছিলেন। ভৃগুকে দেখে শিবের খুব আনন্দ, আনন্দ

তিনি দুই হাত প্রসারিত করে ভৃগুর দিকে এগিয়ে এসেছেন আলিঙ্গন করবেন বলে। ভৃগু শিবকে আলিঙ্গন তো করলেনই না, উপরন্তু শিবকে বলে দিলেন 'আপনি লোক ও বেদমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন তাই আপনি আলিঙ্গনের অযোগ্য'। আসলে দক্ষ প্রজাপতির সাথে শিবের অনেক ঝামেলা হয়ে যাওয়ার পর থেকে অনেকে শিবের নামে এই ধরণের কথা বলতে শুরু করেছিল। যাই হোক, ভৃগুর কথা শুনে শিব প্রচণ্ড রেগে গিয়ে নিজের ত্রিশূল তুলে ভৃগুকে মারতে গেছেন। তখন সতী দেবী স্বামীর পায়ে পরে অনেক অনুনয়-বিনয় করে শিবের ক্রোধকে শান্ত করে ভৃগুকে কোন রকমে শিবের ত্রিশূল থেকে রক্ষা করলেন। এবার ওখান থেকে ভৃগু বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করার জন্য বৈকুণ্ঠে গেছেন। ভগবান বিষ্ণু তখন লক্ষ্মীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। ভৃগু সোজা গিয়ে শায়িত বিষ্ণুর বুকে সজোরে পদাঘাত করেছেন। পদাঘাত হতেই বিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কোল থেকে হুড়মুড় করে উঠে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি করে বিছানা থেকে নেমে এসে মাথা অবনত করে হাতজোড় করে বলছেন 'হে ব্রহ্মন্! আপনি একটু খবর দিলেন না যে, এই বৈকুণ্ঠধামকে পবিত্র করার জন্য আপনি আসছেন! আমি এইভাবে শয়ন করে আছি দেখে আপনি আমার বুকে পদাঘাত করলেন। আপনি ঋষি, আপনার পদযুগল কত কোমল আর আমার এই বুক পাথরের মত, এই বুকে বজ্রাঘাতেও কিছু হয় না, আপনার নরম পায়ে না জানি কত আঘাত লেগেছে, দেখি দেখি আপনার পদযুগলে কতটা আঘাত লেগেছে। হে প্রভু! আপনার অভ্যর্থনা করতে পারিনি বলে আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। হে মহর্ষি! আপনার পাদোদক সমস্ত তীর্থকে পবিত্র করে, আপনার চরণের পদচিহ্ন আমার বুকে লেগে রয়েছে, এই পদচিহ্ন আজ থেকে চিরস্থায়ী হয়ে গেল, এরপর লক্ষ্মী আমাকে ছেড়ে কোন দিন কোথাও যেতে পারবে না।

রহিম হিন্দী ভাষার খুব নামকরা কবি ছিলেন। মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দু শাস্ত্রকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর একটা খুব সুন্দর দোঁহা ছিল, যার বাংলা অর্থ হল যাঁরা বড় তাঁদের ধর্মই হল ক্ষমা করা, ছোট যারা তারা তো দুষ্টুমি করবেই। ভৃগু যখন বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করলেন তাতে বিষ্ণুর কি এলো গেলো। তিনি এতই মহৎ যে এগুলো তাঁর কাছে যেন কিছুই নয়। মা, দিদিমা, ঠাকুরমার বুকে নাতি-নাতনীরা কত খেলা করে, তাঁরাও কত আনন্দ অনুভব করেন। বিষ্ণুও যেন মনে করছেন তিনি যেন দিদিমা আর ভৃগু যেন ছোট শিশু। আগে বলা হয়েছিল যে, শিবের নামে বলা হয় তিনি ক্ষণেই রেগে যান আর অভিশাপও দিয়ে দেন, আবার অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়ে দেন। কিন্তু বিষ্ণু সেরকম নন। এই কথাটা বোঝাবার জন্য তাঁরা ভৃগুর এই কাহিনীটা বললেন। গল্প বলার প্রবণতা মানুষের মধ্যে প্রথম থেকেই আছে। ভগবানকে নিয়েও অনেক গল্প তৈরী হয়েছে। এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আমাদের পরম্পরাতে ছড়িয়ে আছে। পুরাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত কাহিনীগুলোকে সংগ্রহ করে একটা মূল কাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের রানীদের কৃষ্ণ-বিরহে রাতের বিলাপ

এরপর পরীক্ষিৎ আবার প্রশ্ন করছেন শ্রীকৃষ্ণের যত রানী ছিলেন তাঁরা সবাই কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখছেন। কুররি এক ধরণের পাখী যারা রাত্রিবেলা ডাকে। শ্রীকৃষ্ণের রানীরা রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পাওয়ার জন্য দুঃখ করে বলছেন *কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। বয়মিব সখি কচ্চিদ্ গাঢ়নির্ভিন্নচেতা নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন।।১০/৯০/১৫।* হে কুররি! এতো রাত হয়ে গেছে। জগৎ নিস্তব্ধ, সমস্ত প্রাণী নিদ্রামগ্ন। আর যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনিও তাঁর অখণ্ড সত্তাকে গুপ্ত করে নিদ্রা গমন করেছেন। আর তোমার চোখে ঘুম নেই! রাতের পর রাত জেগে তুমি বিলাপ করে যাচ্ছ! এমন তো হয়নি, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যমধুর রূপদর্শন করে তোমার হৃদয়ও আমাদের মতন বিদ্ধ হয়ে গেছে? এই রাতে কার চোখে ঘুম আসবে না? যার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলছে। তোমারও হৃদয়ে কি কৃষ্ণপ্রেমের আগুন লেগেছে? হিন্দীতে একটা নামকরা দোঁহা আছে – প্রথম প্রহর মে হর কই জাগে, প্রথম প্রহরে সবাই জাগে। দ্বিতীয় প্রহর মে ভোগী, ভোগীরা দ্বিতীয় প্রহরে, রাত্রি নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকে। তৃতীয় প্রহর মে ডাকু তস্কর, তৃতীয় প্রহরে মানে বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত যত চোর ডাকাতরা জেগে থাকে। ঔর চতুর্থ প্রহর মে যোগী, আর তিনটের পর থেকে যোগীরা জেগে থাকেন। কুররিকে রানীর যেটা বলছেন এটা দ্বিতীয় প্রহরে।

কুররি থেকে সরে এসে এবার রানীরা সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলছেন *ভোঃ ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ। কিং বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ প্রাপ্তাং দশাং ত্বং চ গতো দুরত্যয়াম্।।১০/৯০/১৮।* হে সমুদ্র! তোমার তো তর্জন-গর্জনের শেষ নেই। তোমার চোখে ঘুম নেই? তুমি তো বিরাট, তোমার মধ্যে তো গাম্ভীর্যতা থাকার কথা। যাঁরা বড় তাঁরা স্বভাবে গম্ভীর হয়ে যান। বলছেন, তোমারও মনে হচ্ছে জেগে থাকার রোগ ধরেছে। এমন তো নয়, শ্যামসুন্দর তোমার ধৈর্য, গাম্ভীর্য আদি স্বাভাবিক গুণ হরণ করে নিয়েছেন! কারণ শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকায় সমুদ্রের ধারে বাস করছেন। তাতেই কি আমাদের মত তুমি এমন ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছ, যার কোন ওষুধ নেই?

ঠাকুর বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপধ্যায়কে জিজ্ঞেস করলেন জীবনের উদ্দেশ্য কি। বঙ্কিম বাবু উত্তর দিলে আহার নিদ্রা ও মৈথুন। টাকা-পয়সার চিন্তা, আহার আর মৈথুনের বিঘ্ন হলেই মানুষ রাত্রিতে জেগে থাকে, রাত জাগার এছাড়া আর কোন কারণ নেই। যাঁরা সাধক বা যাঁরা শ্রেয়োর পথ অবলম্বন করেছেন তাঁরা আহার, নিদ্রা ও মৈথুন এগুলোক যজ্ঞ রূপে পরিবর্তন করে দেন। আমি যা খাচ্ছি, আহরণ করছি, নিদ্রা যাচ্ছি, বিবাহ করছি সব যজ্ঞ রূপে আহুতি দিচ্ছি, এইভাবে যখন সব কিছু যজ্ঞ রূপে নেওয়া হয় তখন কি হয়? *যজ্ঞশিষ্টাঃশনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ,* সমস্ত পাপ পরিষ্কার হয়ে যায়। রানীরা বলছেন হে সমুদ্র! তোমার এই যে ব্যাধি যার কোন ওষুধ নেই, নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ তোমার স্বাভাবিক গুণগুলো কেড়ে নিয়েছেন। জাগতিক বিরহ আর ঈশ্বরের বিরহে কি হয় এই দুটোকে মিলিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে। এরপরেই দশম স্কন্ধ শেষ হয়ে যায়। একাদশ স্কন্ধ মূলতঃ যদুবংশ নাশের উপরেই আধারিত।

একাদশ স্কন্ধ

দশম স্কন্ধ ও একাদশ স্কন্ধের মূল তফাৎ

ভাগবত শুরুর প্রথম দিকে ব্যাস-নারদ সংবাদ ছিল, যেখানে নারদ ব্যাসদেবকে বলছেন, মহাভারতে আপনি সব কিছুর বর্ণনা করেছেন কিন্তু ভগবানের ভগবদ্ তত্ত্বের আলোচনা করা হয়নি, সেইজন্য আপনার মনে শান্তি নেই। একাদশ স্কন্ধে পুরো ভগবদ্ তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, সেইজন্য কুরুক্ষেত্রে কি হয়েছে, অর্জুনের সঙ্গে কি সম্পর্ক এগুলোকে একেবারেই ছুঁয়ে দেখেননি, দু-একটা কথা বলে বেরিয়ে গেছেন। ভাগবতের একমাত্র কাজ মানুষকে কিভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিকে নিয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণকে আধার করে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার নানান জিনিস ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। দশম আর একাদশ স্কন্ধের মধ্যে সব থেকে বড় একটা পার্থক্য হল, দশম স্কন্ধকে বলা হয় ভাগবতের প্রাণ। কারণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব গ্রন্থেই পাওয়া যাবে কিন্তু প্রেমা ভক্তির এমন বৃহৎ বর্ণনা আমরা কোথাও পাই না, যেমনটা রাসলীলাতে পাওয়া যায়। একাদশ স্কন্ধে যে তত্ত্বগুলো আছে এই তত্ত্বগুলো আমরা অন্য শাস্ত্রেও পেয়ে যাব, কিন্তু এর কাহিনীগুলো আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অন্য দিকে দশম স্কন্ধের যে তত্ত্ব, এটাও আর কোথাও পাওয়া যাবে না, সেইজন্য দশম স্কন্ধকে ভাগবতের প্রাণ বলছেন। কিন্তু একাদশ স্কন্ধকে ভাগবতের আত্মা বলা হয়। প্রাণ জীবন দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু অধ্যাত্মের একমাত্র লক্ষ্য হল সন্ন্যাসের যে শেষ আদর্শ, সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করা, অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই যে চারটে পুরুষার্থ, এর শেষ পুরুষার্থ মোক্ষতে প্রতিষ্ঠিত করা। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের এটাই একমাত্র কাজ। দশটি স্কন্ধের পর ভাগবত একাদশ স্কন্ধে এসে পুরোপুরি বেদান্তে ঢুকে যায়। এখানেও অনেক কাহিনী আছে, শ্রীকৃষ্ণের যেমন কাহিনী আছে তার সাথে অন্যান্য কাহিনীও আছে। কিন্তু অধ্যাত্ম বলতে যেটা, তত্ত্ব জিনিস যেটা সেটা একাদশ স্কন্ধে দেওয়া হয়েছে। দশম স্কন্ধ আর একাদশ স্কন্ধের এটাই বিরাট তফাৎ, দশম স্কন্ধ হল রাসলীলা যেখানে প্রেমা ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে আর একাদশ স্কন্ধ পূর্ণ জ্ঞান। দশম স্কন্ধে যখন রাসলীলার মাধ্যমে প্রেমা ভক্তির কথা বলছেন, সেখানে দেখাচ্ছেন যখন পূর্ণ ভক্তির উদয় হয় তখন সাধক কেমন হয়ে যায়, এই জিনিসটাই একাদশ স্কন্ধে আসবে যখন একজন পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে যান তাঁর আচরণ তখন কেমন হয়। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, আমাদের জন্য কোন স্কন্ধটা বেশি দরকার? আমাদের দুটোই দরকার। আমরা সবাই

এখন হলাম সোনার টুকরো। কিন্তু ওর মধ্যে এক ফোটা জলও ধরবে না। জল যদি ধরাতে হয় তাহলে ঐ সোনার টুকরোকে হাতুড়ি দিয়ে আগে পেটাতে হবে, সোনা এমন এক ধাতু যাকে যত পেটানো হবে তত সে পাতলা হবে, লোহা বা অন্য ধাতু ভেঙে যাবে, সোনা কখনই ভাঙবে না। সোনাকে যত পেটাতে থাকবে তত পাতলা হতে থাকে, যত পাতলা হতে থাকবে তত তার পাত্রতা বাড়বে, পাত্রতা যত বাড়বে তত তাতে বেশি জল ধরবে। আমরা এখন সবাই সোনার টুকরো, এর মধ্যে এক ফোটা জলও ধরবে না অর্থাৎ এক বিন্দু জ্ঞানও ধরবে না, এক বিন্দু ভক্তিও ধরবে না। কিন্তু সোনার টুকরো, স্বামীজীও বলছেন, each soul is potentially divine। Potentially divine, কিন্তু kinetic, manifestationএ তাই জিরো। আমরাও সোনার টুকরো, কিন্তু কোন কাজে আসছে না, কারণ সোনার টুকরোকে পেটাই করা হয়নি। ঠাকুর বলছেন, এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে! এই যে এখন আমাদের শাস্ত্রের কথা শোনার ইচ্ছা জেগেছে, এবার পেটাই শুরু হল। সেইজন্য আমাদের সবটাই লাগবে, একাদশ স্কন্ধের জ্ঞানের কথাও শুনতে হবে, দশম স্কন্ধের ভক্তির কথাও শুনতে হবে। শুনতে শুনতে যখন বিরাট আধার হয়ে যাবে, তখন সাধনা শুরু হবে। একটা মাটির ডেলা এমনিই পড়ে আছে, সবাই পা দিয়ে মাড়িয়ে যায়। কুমোর ঐ মাটির ডেলাকে নিয়ে গিয়ে হাতুড়ি মারতে শুরু করে। হাতুড়ি মেরে মেরে ডেলা একেবারে যখন গুড়ো হয়ে গেল, তারপর জল দিয়ে ওটাকে ঠাসতে শুরু করে। দলাই মালাই করার পর তাকে চাকে বসিয়ে আচ্ছা করে ঘোরায়। ঘোরাবার পর ওকে রোদে শুকোতে দেয়। মাটিটা ভাবছে এবার আমি বাঁচলাম। বেশ কয়দিন আরাম করার পর ওকে তুলে নিয়ে আগুনে দিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে একেবারে লাল হয়ে গেল, এরপর চিত্রকারী করে মঙ্গলঘট বানিয়ে দিল। এবার তার মন্দিরের সামনে বা ঠাকুরের সামনে থাকার যোগ্যতা অর্জন হল, তখন সে ঈশ্বরের পূজার যোগ্য হয়। আমাদের মাটির ডেলাতে এখনও হাতুড়ি পড়াই শুরু হয়নি, আর আমরা মনে করছি এখনই আমরা পূর্ণকুম্ভ হয়ে গেছি। পূর্ণকুম্ভ হতে এখনও কত দেরী, হাতুড়ি পেটানো হবে, ডেলা থেকে পাউডার হবে, দলাই মলাই হবে, চাকে ঘোরানো হবে, রোদে শুকনো হবে তারপরে আগুনে পোড়ানো হবে। এই যে আমরা এখানে জ্ঞান ভক্তির কথা শুনতে কত কষ্ট করে আসছি, সবে হাতুড়ি পড়তে শুরু হল। তাই সবটাই এখন শুনে যেতে হবে, একাদশ স্কন্ধে জ্ঞানের কথা শুনতে হবে, দশম স্কন্ধের ভক্তির কথাও শুনতে হবে। শুনতে শুনতে ধারণা করার শক্তি বাড়ে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ধারণা শক্তি বাড়বে না। মুর্খদের দ্বারা ধর্ম ও আধ্যত্মিকতা সাধন কক্ষণই হয় না। যে কোন সিদ্ধ পুরুষকে যদি আমরা দেখি, তাঁদের প্রত্যেকেরই তুখোড় বুদ্ধি। সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে ধর্মতত্ত্ব, শাস্ত্রের কথা ধারণা করা যায় না। সেইজন্য সাধুসঙ্গ করতে হয়।

যদুবংশের উপর ঋষিদের অভিসম্পাত

একাদশ স্কন্ধ শুরু হয় যেখানে ঋষিরা যদু বংশকে অভিশাপ দিচ্ছেন। একাদশ স্কন্ধ শুরু হওয়া মানে, শ্রীকৃষ্ণ এবার লীলাসংবরণ করবেন। এখানে খুব বেশি লীলার কথা নেই। একেবারেই যে নেই তা নয়, কিছু কিছু লীলাকাহিনীকে ছুঁয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ছুঁয়ে যখন যাচ্ছেন, এক একটা ছোট্ট জিনিসকে যখন আনছেন, সেখানেও পুরো অধ্যায়ে ধর্মের কথা, অধ্যাত্মের কথাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। ভাগবতের এটাই কাজ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থকে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে অবলম্বন করে মানুষের কাছে তুলে দেওয়া। প্রথমের দিকে খুব সংক্ষেপে কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধের কথা বলছেন। এত সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কি ভূমিকা ছিল তারও কোন বর্ণনা নেই। একাদশ স্কন্ধের শুরুতে বলা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করিয়ে আমি পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়ে দিয়েছি। পুরাণের এটা একটা খুব প্রচলিত রীতি, বেশির ভাগ পুরাণের শুরুতে দেখা যায় অসুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পৃথিবী গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মাকে গিয়ে বলছেন, আমি আর এই পাপের ভার বহন করতে পারছি না, আপনি এর কিছু একটা বিহিত করুন। অথবা এমন কিছু হয়ে গেছে যে দেবতারা আর আসুরিক শক্তির সাথে পেরে উঠছেন না, তখন তাঁরা এর তার কাছে গেলেন। তখন ভগবান পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য নিজে অবতীর্ণ হন। এটা খুবই মজার জিনিস, আজকে আমরা যেভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানি তাতে কয়েকটা লোক মরে গেলে কি ভূভার কমে যাবে? বায়োলজির দিক থেকে না হওয়ারই কথা। পৃথিবীর যে মোট ওজন সেখানে কিছুই হবে না, জীবন্ত মানুষগুলো

মৃত হয়ে যাবে, তারা যেটা খেত সেই খাওয়াটা বন্ধ হয়ে অন্য দিকে তারাই খাদ্য হয়ে যাবে। পৃথিবীর ওজন কোন দিনই পাল্টাবে না। আমরা মনে করি ভগবান এসে অনেক দুষ্ট লোককে মেরে দেন বলে পৃথিবীর ভার কমে যায়। কিন্তু তাতে পৃথিবীর ওজন কমবে না। এখানে ওনারা সূক্ষ্ম ভাবে ভাবছেন, সূক্ষ্ম ভাবে ভাবা মানে, পৃথিবীতে যে আত্মাগুলো আছে, তাদের যে পাপ, সেই পাপে পৃথিবীতে পাপের বোঝা এত বেড়ে যায় যে সাধারণ মানুষের অনেক কষ্ট, দুর্দশা হতে শুরু হয়। আগেও ছিল এখনও আছে, দু চারটে গুণ্ডা বদমাইশ লোক জগতে চিরদিনই থাকে। আগে এরা লুকিয়ে থাকত, এখন এরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক একটা স্ক্যামে কত হাজার হাজার কোটির দুর্নীতিতে নেতারা সব জড়িয়ে আছে, তাদের ছবি রোজ খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে। চোর, বদমাইশ, গুণ্ডা এরা অন্ধকার জগতের লোক, এদেরকে বলাই হয় অন্ধকারের শক্তি। এদের কথাই এখন খবরের কাগজে আসছে, সম্মান দিয়ে টিভির পর্দায় নিয়ে আসছে, এমপি হচ্ছে, মন্ত্রী হচ্ছে, এগুলো হল পাপ। এদের বিনাশ না হলে সাধারণ মানুষ খুব কষ্ট পায়। শক্তির সঙ্গে শক্তির যখন সঙ্ঘাত হয় তখন কখন অশুভ শক্তির দমন হয়, কখন শুভ শক্তির দমন হয়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে ভগবান যখন আসেন তখন তিনি খুঁজে খুঁজে অশুভ শক্তির ধারক গুলোকে নাশ করে দেন। তাতে যে সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে তা হয় না, কিছু দিন পর আবার যে কে সেই। ফুলের বাগান যতই পরিষ্কার করুক, কিছু দিন পর আবার আগাছাতে বাগান ভরে যাবে। যাই হোক এখানে বলছেন মহাভারতের যুদ্ধ করিয়ে ভগবান ভূভার কমিয়ে দিয়েছেন। কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে যারা ঔদ্ধত ছিল তারা সবাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মারা গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন যদুবংশীরা আমার নিজের বংশ কিন্তু এরাও খুব ঔদ্ধত হয়ে উঠেছে, এদের নাশ না হলে জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এখন এই বংশের হাতে প্রচুর শক্তি। সমস্ত শক্তি একটা জাতির মধ্যে কেন্দ্রিভূত হওয়াটা কখনই জগতের পক্ষে শুভ নয়, এদেরও নাশ হওয়া দরকার। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমের দিকে গান্ধীজী বলেছিলেন, কংগ্রেসের কাজ হয়ে গেছে এবার কংগ্রেসকে তুলে দাও। কিন্তু নেহরু দেখলেন, সারা জীবনের আমার এত পরিশ্রম একদিনেই শেষ হয়ে যাবে! তাই উনি কংগ্রেস রেখে দিলেন, আর যত গোলমালের মূল হয়ে গেল কংগ্রেস। নাম পাল্টালেও কিছুই হত না, কংগ্রেসের সব লোক একটা জায়গাতেই যেত, এরাই শাসন করত। আসলে যে শুভ শক্তি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, ঐ শুভ শক্তি যদি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক শক্তি না হয় তার মানে ওটা সত্ত্বগুণের শক্তি। আর সত্ত্বগুণের শক্তি রজো গুণে বা তমো গুণে পাল্টাতে বেশি সময় লাগে না। ঠাকুর বশিষ্ঠ মুনির নামে বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। কারণ যিনি জ্ঞানী তিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, সত্ত্বগুণী শুভ কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু যে কোন সময় তিনি রজোগুণী হয়ে যেতে পারেন বা তমোগুণী হয়ে যেতে পারেন, তার মানে লোভ, মোহ এগুলো তাঁর মধ্যে যে কোন সময় এসে যেতে পারে। যিনি বিজ্ঞানী তিনি শুভ ও অশুভ দুটোকেই পার গেছেন। যখন অশুভ শক্তিকে শুভ শক্তি নাশ করে, এই শুভ শক্তি কিছু দিন পর নিজেও অশুভ শক্তি হয়ে যেতে পারে, এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। যার জন্য দেখা যায় অনেক সময় কোন রাজনৈতিক নেতারা এসে শুভ শক্তি রূপে দাঁড়িয়ে যায়। কদিন পর দেখা যায় তারাই অশুভ শক্তি রূপে দাঁড়িয়ে সব রকম দুর্নীতি, জোচ্চুরি করে যাচ্ছে। কিন্তু যিনি শুভ ও অশুভের পারে, যাঁরা একবারে পাক্কা সন্ন্যাসী, তাঁদের কোন পরিবর্তন হবে না। যেমন রাজা জনক, তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন, তিনি রাজ্য পরিচালনা করছেন অথচ কোন প্রভাব তাঁর উপর পড়ছে না।

শ্রীকৃষ্ণ জানেন যদুবংশের লোকেরা ঔদ্ধতের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, কারণ যদুবংশের সদস্যরা জানে ভগবান স্বয়ং আমাদের রক্ষা করছেন। কিছু দিন আগে একটা গাড়ির ছবি কাগজে বেরিয়েছিল, গাড়ির সামনে হিন্দীতে লেখা 'পূর্ব বিধায়ক পুত্র'। আগে কখনো এমএলএ ছিল, তার ছেলের গাড়ি, সেই গাড়িরই ভিআইপি স্ট্যাটাস। পূর্ব বিধায়ক পুত্রের যদি এত ঔদ্ধত স্বভাব হয় তাহলে বিধায়ক পুত্র কত ঔদ্ধত হবে? আর যিনি বিধায়ক তার কি অবস্থা হবে? তবে সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে বিধায়ক পুত্রের তেজ বেশি হয়। কোন এক মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর গাড়ি ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে চালাতে গিয়ে পুলিশ ধরলে ভাইপো পুলিশকে চোখ রাঙিয়ে বলছে, জানিস না আমি কে! যদুবংশের ছেলেদেরও এই রকম তেজ বেড়ে গিয়েছিল আর প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল। তখন শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন *এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ। শাপব্যাজেন*

বিপ্রাণাং সংজহ্নে স্বকুলং বিভুঃ।।১১/১/৫।। ভগবান দেখলেন এদেরকে রাখা ঠিক হবে না, এদের সবাইকে সংহার করে দিতে হবে, তিনি তখন ব্রাহ্মণের অভিশাপকে নিমিত্ত করে নিজের যদুবংশকেই নাশ করে দিলেন। এখানে ভগবানকে শুকদেব বলছেন, *সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ*। সত্যসঙ্কল্প এই শব্দটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এই শ্লোকটিকে নিয়েছি।

সত্যসঙ্কল্প শব্দের ব্যাখ্যা

ঈশ্বর সব সময় সত্যসঙ্কল্প হন। এই ধরণের কথা আমাদের মত সাধারণ লোকেদের বোঝাবার জন্য নানা রকমের কাহিনী আদি রচনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো ধারণা করা সত্যিই কঠিন। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, চৈতন্য হওয়াতে তিনি সবটাই জানেন। সব জানেন বলে সব জায়গাতেই তাঁর কান, সব জায়গাতেই তাঁর চোখ। শাস্ত্রের একটা জায়গায় এক শিষ্য প্রশ্ন করছেন, ভগবান কি কথা কন? বলছেন, হ্যাঁ তিনি কথা কন, কারণ তিনি সব কিছু জানেন। তিনি চৈতন্য কিনা তাই সবটাই তিনি জানেন। চৈতন্য মানে যাঁর মধ্যে চেতনা আছে। আমাদের শরীর ঐ চৈতন্যেরই একটু ক্ষীণ প্রকাশ। টিউব লাইটে সামান্য একটু বিদ্যুৎ প্রবাহ যাচ্ছে, তাতেই টিউবের ভেতরের গ্যাস জ্বলে উঠছে, মনে হয় পুরো টিউবলাই বিদ্যুৎ শক্তিতে ভরে আছে। কিন্তু তা নয়, খুব সামান্য একটু ইলেক্ট্রিসিটি যাচ্ছে। আমাদের সবারই ভেতরে সামান্য একটু চেতনা আছে, ওই চেতনা সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে তাই আমরা হাত নাড়ছি, পা দিয়ে চলছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে বোধ হয় এটা আমি, এই বোধটাও হয় চৈতন্য থাকার জন্য। চৈতন্যের মহাসমুদ্র যিনি তিনিই ভগবান, আমি আর তিনি আলাদা কিছু না, একই। যেমন অগ্নি আর অগ্নির স্ফুলিঙ্গ কখন আলাদা হয় না, অগ্নিও যা স্ফুলিঙ্গও তাই। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকে কখন নাশ করতে পারে না বা অনেক কিছুই করতে পারে না, কিন্তু অগ্নি আর স্ফুলিঙ্গ এক। ঠিক তেমনি ঈশ্বর আর জীব এক আবার আলাদা। আমি কোন দিক থেকে দেখছি সেটার উপর নির্ভর করে। স্ফুলিঙ্গ কখন সমগ্র অগ্নিকে জানতে পারবে না, কিন্তু অগ্নির মূলকে জানতে পারবে। যে কোন জীব ঈশ্বরের যে মূল বা সার সেটাকে জানতে পারবে। কি জানে? *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমি সেই ব্রহ্ম। স্ফুলিঙ্গ জানে আমি সেই অগ্নি, আমিও যা অগ্নিও তাই। কিন্তু কোন দিক থেকে জানে? মূল, অগ্নির যে মূল সেই দিক থেকে এক। কিন্তু অগ্নির বাহ্য প্রকাশ আর স্ফুলিঙ্গের বাহ্য প্রকাশ কখনই এক হবে না। আমি আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ কোন দিন এক হব না।

শুদ্ধ চৈতন্যকে কোন কিছু জানতে হয় না। জানা জিনিসটা ঠিক কি? আমরা এখানে সবাই বসে আছি, এই গ্লাশকে আমরা সবাই দেখছি, গ্লাশকে দেখার পর গ্লাশকে জানলাম, বলছি এই গ্লাশটা ইউনিভার্সিটির। জানার মধ্যে কয়েকটি জিনিস যুক্ত থাকে, প্রথম আমি নিজে, দ্বিতীয় এই গ্লাশ, তৃতীয় জানার জন্য যে ক্রিয়া। সেইজন্য বলা হয় যে কোন কার্যে তিনটে জিনিস যুক্ত থাকে, কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। এই তিনটে জিনিস যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোন ক্রিয়া সম্পাদন হবে না। তাই বলছেন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান। একজন জ্ঞাতা আছেন, তিনি জানছেন, আরেকটা হল জ্ঞেয়, যেটাকে জানা হচ্ছে, এখানে গ্লাশ আর জ্ঞান, জানার যে পদ্ধতি। ভগবানের ক্ষেত্রে ভগবানের বাইরে তো কিছু নেই, তাই কোন object নেই, object নেই তাই subjectও নেই। আমরা সব সময় মনে করি আমি দ্রষ্টা আর আমি এই গ্লাশকে দেখছি, তেমনি ভগবানও আমাদের দেখছেন, তিনি আমাদের হৃদয়ে আছেন, কেউ বলে তিনি আকাশে বসে আছেন, কেউ বলে তিনি সব জায়গাতেই আছেন আর আমাদের দেখছেন। তাহলে তো ভগবান কর্তা হয়ে গেলেন, ঈশ্বরই কর্তা। কর্তা হলেই কর্ম হবে, কর্ম হলেই ক্রিয়া হবে। কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া তিনটে হয়ে যাওয়া মানেই এবার জগৎ চলবে। না, এভাবে হয় না, ঠাকুর যে বলছেন ঈশ্বরই কর্তা, সেখানে তিনি অন্য অর্থে বলছেন। ঈশ্বরই একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ, ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই। যেমন একটা জিনিস নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারে না, আমার ডান হাত দিয়ে আমি সব কাজ করতে পারি, জগতের সব জিনিসকেই ধরতে পারব কিন্তু আমার ডান হাতকে ধরতে পারব না। শাস্ত্রে বলছেন *স্বক্রিয় অবিরোধঃ*, নিজের উপর ক্রিয়ার বিরোধ হয়ে যায়, চোখ সারা জগতকে দেখে বেড়ায় কিন্তু নিজেকে দেখতে পায় না। ভগবান ছাড়া তো কিছু নেই, তাহলে ভগবান কাকে দেখবেন, কারণ object বলে কিছু নেই। আর কারকের যে দ্বিতীয়া হয়, যেমন আমি রুটি খাচ্ছি, আমি আলাদা রুটি আলাদা।

তেমনি ভগবান আলাদা আর জগৎ যদি আলাদা হয় তাহলে এবার ভগবান কিছু করবেন, কিন্তু ভগবান ছাড়া তো কিছু নেই, তিনি কার উপর কাজ করবেন? কারুর উপরেই কাজ করবেন না, কারণ তিনি হলেন eternal subject, eternal subject মানে হল, তিনি subject আর object দুটোরই বাইরে। কিন্তু আমি আপনি সাধারণ অবস্থায় জানছি যে আমার একটা শরীর আছে, শরীরের ভেতর আত্মা আছেন, তিনি অন্তর্যামী। যদি আমরা কল্পনা করি, যদিও এটা ভুল কল্পনা, শুধু বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। একটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ যেন আমার ভেতরে আছে, সেই স্ফুলিঙ্গ আর বৃহৎ দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই, এই দুটো এক।

Main property চৈতন্যের, চৈতন্য মানে চেতনা, চেতনা মানে জ্ঞান। এই জ্ঞান ভগবানের সব সময়ই আছে। গীতায় ভগবান বলছেন, *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।* ভগবান সবটাই জানেন, ভূতকাল জানেন, বর্তমানকাল জানেন আর ভবিষ্যতকাল জানেন। সেইজন্য ভগবান কখন সত্যবাদী হন না, ভগবান সব সময় সত্যসঙ্কল্প। কারণ তিনি সবটাই জানেন কিনা। যিনি ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবটাই জানেন তাহলে তাঁকে কেন আর সত্যবাদী হতে হবে! সত্যবাদী কে হন? যিনি সময়ের সীমাতে আবদ্ধ। গান্ধীজী সত্যবাদী ছিলেন, ঠাকুর সত্যসঙ্কল্প ছিলেন। আমরা যেমন বলি ঠাকুর সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যদি সত্যসঙ্কল্পের অর্থে বলা হয়, তাহলে ঠিক আছে; তা নাহলে এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। যখন বলা হয় সত্যে প্রতিষ্ঠিত তখন সত্যসঙ্কল্প এই অর্থেই বলা হয়। ঠাকুর সত্যসঙ্কল্প, তিনি সবটাই জানে, তিনি জানেন নরেন শিক্ষা দেবে, তিনি জানেন কেশব সেনের মধ্যে যেটা এক কলা, সেটাই নরেনের ভেতরে আঠারো কলা। এটা কি শিষ্যর প্রতি গুরুর কোন উচ্ছ্বাস? একেবারেই তা নয়। তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত তিনটেই জানেন।

সত্যসঙ্কল্পের অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তিনি যেটা ভেবে নিয়েছেন, মুখে বলা দূরে থাক শুধু ভেবে নিলেন তখন সেটাই হবে। কারণ যা করার একমাত্র সচ্চিদানন্দই করেন, চৈতন্য ছাড়া আর কারুর কোন কিছুর করার ক্ষমতাই নেই। কাউকে যদি বলা হয় তোমার মস্তিষ্ক মৃত কিন্তু তোমার শরীরটা এখনও পনের কুড়ি বছর সক্রিয় থাকবে, আর দ্বিতীয় হল মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকবে কিন্তু তোমার শরীরটা নির্জীব হয়ে থাকবে, দুটোর মধ্যে একটা নিতে হবে, তুমি কোনটা নেবে? মস্তিষ্ক সক্রিয় কিন্তু শরীর নিষ্ক্রিয় অনেক মানুষই আছে। স্টিফেন হকিং এত বড় বিজ্ঞানী তিনি এভাবেই আছেন। আর মস্তিষ্ক মৃত কিন্তু শরীর সক্রিয়, এই নিয়ে কত আলোচনা চলছে, এমন মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ, ইঞ্জেকশান দিয়ে শেষ করে দাও। তার মানে, শরীরের কোন দাম নেই, কিন্তু আমাদের কখনই মনে হয় না যে শরীরের কোন দাম নেই। আমার শরীর নিষ্ক্রিয় হয়ে যাক কিন্তু মস্তিষ্কটা সক্রিয় থাকুক, কেন বলছেন? কারণ চৈতন্যের বোধ আমাদের সবারই ভেতরে আছে, চৈতন্যই আসল বাকি সব ফালতু। আমাদের সবার শরীরের পেছনে চৈতন্য আছে বলেই শরীর চলছে। কোমায় চলে গেলে শরীরটা আর থাকবে না, শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানেও কি করে দশ বছর ধরে অনেকে বেঁচে থাকছে? ডাক্তারী বুদ্ধি ঐ শরীরটাকে চালাচ্ছে, সেখানেও একটা চৈতন্যের খেলা এসে যাচ্ছে। চৈতন্যই সব কিছু চালান, কারণ তাঁর কাছে সবটাই জানা আছে, তিনি সত্যসঙ্কল্প। তিনি যখন বলে দিলেন এটা হবে তখন ওটাই হবে, কারণ তাঁর ভবিষ্যতটাও জানা আছে কিনা। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলে দিলেন, তোমার আর কোন চিন্তা নেই তুমি যাও আনন্দ কর, বালি শেষ। তার মানে বালি শেষ, আর কারুর কিছু করার নেই। সেখানে কোন প্রশ্নই আর আসবে না, তিনি বালিকে লুকিয়ে মারলেন নাকি আড়াল থেকে মারলেন। তিনি সত্যসঙ্কল্প, বলে দিয়েছেন বালি শেষ, ওখানেই বালি শেষ। বলেনওনি, শুধু মনে মনে চিন্তা করে নিলেন বালি শেষ, তাতেই বালি শেষ। যিনি সত্যসঙ্কল্প তাঁর ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন আদপেই ওঠে না। ঈশ্বর মানে যিনি শাসন করেন, তিনি শুধু সত্যসঙ্কল্পই নন তিনি ঈশ্বরও, তিনি সর্বসামর্থ আর সর্বজ্ঞ। তিনি সর্বসামর্থ আর সর্বজ্ঞই নন, তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞ আর যাঁর সব শক্তি আছে। যেমন শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীরটা একটা জড় পদার্থের মত পড়ে থাকে, এই শরীরকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না, ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দ বা ঈশ্বর না থাকলে সব অনীশ্বর হয়ে যাবে, অনীশ্বর মানে যার কোন অস্তিত্বই নেই। শুকদেব বলছেন, ভগবান শুধু ঠিক করে নিলেন এই যদুবংশের সংহার করতে হবে। তিনি সত্যসঙ্কল্প, যদুবংশ সংহারের বাকি সব কিছুর প্রস্তুতি হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ শুধু অপেক্ষা করে আছেন। দ্বারকার কাছে পিণ্ডারাক্ষেত্র নামে একটা তীর্থস্থান আছে, এখনো এই তীর্থক্ষেত্র আছে। ঋষিরাও তাঁদের যোগশক্তিতে জেনে গেলেন ভগবান আর বেশি দিন থাকবেন না, সেইজন্য বড় বড় সব ঋষিরা একত্র হয়ে পিণ্ডারাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা, অসিত, কণ্ব, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক বড় বড় মহাত্মারা আছেন। সমাজে মানুষ যখন ঔদ্ধত হয় প্রথম তার আক্রোশটা পড়ে ধর্মের উপর। ধর্মের উপর আক্রোশ মানে, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণদের উপর প্রথম আঘাতটা গিয়ে পড়ে। সেই সময় যদুবংশও খুব উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তাদের আত্মসংযম অনেক কমে গিয়েছিল। বড় বড় সব যুদ্ধ জয় করেছে, এদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত আর কেউ নেই, শ্রীকৃষ্ণের ছত্রছায়া রয়েছে, আর কে সামলাবে! বড় বড় ঋষি, মহাত্মাদের উপরও এদের শ্রদ্ধাদি কমে গিয়েছিল। এই ধরণের সমস্যা একটা সময় সব সমাজেই আসে, যখন অযোগ্যদের হাতে অনেক টাকা পয়সা মজুত হয়ে যায় আর অতিরিক্ত ক্ষত্রিয় স্বভাবের প্রভাবে রজোগুণ বেড়ে গিয়ে শক্তির মদমত্ততায় অন্ধ হয়ে যায়। তখন ঋষি, মুনি, যারা ঈশ্বরের পথে আছেন, যাদের কাছে টাকা পয়সার সম্বল নেই, ক্ষত্রিয় বলের সম্বল নেই, এঁদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার প্রবণতাটা বেড়ে যায়।

একদিন যদুবংশীর যুবকরা জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে মেয়ে সাজিয়েছে। জাম্ববানের মেয়ে জাম্ববতী, তাকে শ্রীকৃষ্ণ বিয়ে করেছিলেন। জাম্ববান শ্রীরামচন্দ্রের সময় থেকেই ছিলেন, তাঁর সাথে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়েছিল, এটাও একটা বিরাট লম্বা কাহিনী। জাম্ববতীর কাহিনী আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি। অন্যান্য পুরাণে আছে যে জাম্ববতীর সন্তান হচ্ছিল না। জাম্ববতী খুব দুঃখ করে শ্রীকৃষ্ণকে একদিন বললেন, আপনার সব স্ত্রীদেরই সন্তান আছে আমারই কোন সন্তান হল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ শিবের সাধনা করলেন, শিবের সাধনা করে জাম্ববতী থেকে শ্রীকৃষ্ণের যে সন্তান হয় তার নাম সাম্ব। এই কাহিনী আবার অন্য পুরাণের, অন্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে আবার বেশি গুরুত্ব দেবে না। সাম্ব দেখতে খুব সুন্দর ছিল। এতই সুন্দর ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য স্ত্রীরা, সাম্বের সৎমায়েরাই সাম্বের উপর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাতে আবার শ্রীকৃষ্ণ খুব চটে গিয়ে সাম্বকে কিসব অভিশাপ দিয়ে দিলেন। তবে এটা ঠিক যে, সাম্বের মধ্যে অনেক রকম গোলমাল ছিল। যেখানেই যেত একটা কিছু কাণ্ড করে বসত। একটা কাহিনীতে আছে একবার কোথায় গিয়ে দুর্যোধনের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তাকে অপহরণ করে পালিয়ে গেছে। কৌরবরা প্রচণ্ড রেগে গেছে, সাম্বকে ওরা বন্দী করে নিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে আবার তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। যা হয়ে থাকে, এখনকার দিনে ক্ষমতাবানদের ছেলেমেয়েরা যা করে বেড়ায়, ঐ পূর্ব বিধায়ক পুত্রের মত কীর্তি করে বেড়াচ্ছে, এই জিনিস শুধু আজকেই নয়, সব কালেই আছে। এবারে সাম্বকে নিয়ে যদুবংশের ছেলেরা ঋষিদের সাথে মস্করা করতে গেল। এই কাহিনীটা কোন কোন শাস্ত্রে অন্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন একটা কাহিনীতে আছে, একটা মুশলকে একজন যাদবের পেটের মধ্যে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে ঋষিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাগবতে মুশল-টুশল কিছু নেই, সাম্বকে এমনি মেয়ে সাজিয়ে ঋষিদের কাছে নিয়ে গিয়ে বলছে 'হে ব্রাহ্মণ দেবতারা! এই মেয়েটি গর্ভবতী, আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ওর সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। মেয়েটির খুব ইচ্ছে যে তার একটি ছেলে হোক। তা যাই হোক, এখন এর সময় এসে গেছে, আপনারা তো সর্বজ্ঞ, আপনারা একটু বলে দিন এর ছেলে না মেয়ে হবে'। এদের কাণ্ড দেখে ঋষিরা প্রচণ্ড রেগে গেছেন, কারণ এতে তাঁদের সর্বজ্ঞত্ব বিদ্যাকে অপমান করা হচ্ছে। তখন একজন ঋষি, ঠিক কোন ঋষির মুখ থেকে এই কথা বেরিয়েছিল তাঁর নাম ভাগবতে উল্লেখ নেই, তিনি রেগেমেগে বলছেন 'ওরে মুর্খের দল! এ একটা মুশল প্রসব করবে, আর ওই মুশল তোদের কুলের নাশ করে দেব'। এখানে বলছেন, ঋষি যে নিজের ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে বললেন তা নয়, ভগবানের প্রেরণাতেই বলেছেন। যাদবরা তখন ঘাবড়ে গেল, যতই মজা করুক, ঋষিদের অভিশাপ কিনা। তখন কাপড় চোপর সরিয়ে দেখে সত্যিই একটা মুশল রয়েছে কাপড়ের মধ্যে। অন্যান্য গ্রন্থে আছে যে আগে থেকেই মুশলটা কাপড় দিয়ে পেটে জড়ানো ছিল। কিন্তু ভাগবতে তা নেই, এখানে সাম্বকে এমনিই মেয়ে সাজিয়ে সাধুদের কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করছে, মেয়েটি আসন্ন প্রসবা আপনার বলুন তো এর ছেলে না মেয়ে হবে। সাধু বলে দিলেন এর পেটে থেকে একটা মুষল বেরোবে। আর তাই হল অলৌকিক ভাবে মুষলটা চলে এসেছে।

এটাই ভাগবতের বৈশিষ্ট্য, ভাগবত আমাদের ঋষি, মহাত্মাদের মহত্ত্ব দেখানোর জন্য তাঁদের কিছু ক্ষমতা দেখিয়ে দিল। অতি সাধারণ ভাবে দেখানো হলে এই মহত্ত্বটা থাকবে না। মানুষ সিদ্ধাই, অলৌকিক এগুলো বেশী পছন্দ করে। রাজা উগ্রসেন থেকে অন্যান্য যাঁরা বড়রা ছিলেন সবাই এই খবর শোনার পর খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। সবাই খুব ভয় পেয়ে বলছেন এক্ষুণি এটাকে টুকরো টুকরো করে পিষে একেবারে বালি করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক। এরা তখন মুশলটাকে ঘসে ঘসে একেবারে গুঁড়ো করে সমুদ্রে ফেলে দিল। সব শেষে যে টুকরোটা অবশিষ্ট ছিল সেটাকেও সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পরে লোহার সেই কণাগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ে আবার সমুদ্রের কিনারায় চলে এসেছে। কিছুদিন পরে দেখা গেল সেখানে সব পাট গাছের মত বড় বড় ঘাস জন্মেছে। আর সব কটা ঘাসের ডগায় লোহার টুকরো লাগান, এটা অবশ্য পরে জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের কাছে ঋষিদের অভিশাপের খবর পৌঁছাল, তিনি বুঝে গেলেন যদুবংশের নাশ হতে আর বেশী দেরী নেই। শুকদেব বলছেন *ভগবাঞ্জ্ঞাতসর্বার্থ ঈশ্বরোহপি তদন্যথা। কর্তুং নৈচ্ছদ্ বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত।।১১/১/২৪।* শ্রীকৃষ্ণ যদি চাইতেন ঋষিদের অভিশাপকে তিনি খণ্ডন করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেই কাজ করলেন না। কেন করলেন না? ভগবান হলেন কালরূপী, গীতাতেও অর্জুনকে ভগবান বলছেন *কালোহস্মি লোকক্ষয় প্রবৃদ্ধো*, লোকক্ষয়ের নিমিত্তে তিনিই মৃত্যুরূপ ধারণ করে আসেন, মৃত্যুও তিনি। ভগবান যদুবংশকে রক্ষা করতে চাইবেন না, কারণ যে ব্রাহ্মণরা অভিশাপ দিয়েছেন তাঁরা ঈশ্বরের শক্তিতেই অভিশাপ দিয়েছেন, অভিশাপ যদি না কার্যকর হয় তাহলে ঈশ্বরের কথাকেই খণ্ডন করা হয়ে যাবে। সেইজন্য দেখা যায় ঋষিরা কোন অভিশাপ দিয়ে দিলে ভগবান কখন তা খণ্ডন করেন না। অনেক সময় চেষ্টা করেন অভিশাপ থেকে যাতে মঙ্গলজনক কিছু বেরিয়ে আসে।

এখানে এসে ভাগবতে এই কাহিনীকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাগবতে যে কাহিনীটা নেই সেই কাহিনী হল, যদুবংশের সবাইকে নিয়ে একদিন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে পিকনিক করতে গেছেন। পিকনিকে সবাই মদ খেয়ে মত্ত হয়ে আছে। তার মধ্যে সাত্যকি আর কৃতবর্মার সাথে খুব সামান্য একটা কিছু নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। মহাভারতের যুদ্ধে সাত্যকি পাণ্ডবদের দিকে ছিল আর কৃতবর্মা কৌরবদের পক্ষে ছিল। ভগবান জানতেন আজ এদের সবইকে সংহার করতে হবে, সেইজন্য পিকনিকে কাউকে কোন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে দেননি। দুজনে প্রথমে একটু কথা কাটাকাটি হল, সেখান থেকে বচসা শুরু হল, বচসা থেকে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গেল। হাতাহাতি হতে হতে সবাই এবার সমুদ্রের পারে যত লম্বা পাট গাছের মত হয়ে ছিল সেগুলো এক এক করে তুলতে শুরু করল, গাছের ডগায় সব লোহার টুকরো লাগা আছে। ঐ নিয়ে এক অপরকে মারতে শুরু করে দিয়েছে, সেখানে তো কেউই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে যায়নি, খানাপিনা মস্তি করতেই গিয়েছিল। কিন্তু ঐ গাছের তীরের ফলার মত লোহার টুকরোর আঘাতে যদুকুলের সবাই এক অপরকে মেরে ওখানেই যদুবংশ শেষ হয়ে গেল।

ভালজাক্ ছিলেন ফরাসীর একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস লিখেছেন, তার মধ্যে একটা গল্প আছে 'The Donkey's Skin', এক যুবক ছেলে, চাকরী-বাকরি নেই, হাতে টাকা-পয়সাও নেই, শরীরটাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। খুব হতাশায় সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। একজন বুঝতে পেরে গেছে ছেলেটি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। লোকটি ছেলেটিকে গিয়ে ধরে বলছে 'দাঁড়াও! আমার দোকানে ভারত থেকে এই চামড়ার কার্পেট এসেছে, এই কার্পেটটা তুমি বাড়িতে নিয়ে যাও, আর এই কার্পেট তোমার সব ইচ্ছে পূর্ণ করে দেবে। কিন্তু যত ইচ্ছে পূর্ণ করতে থাকবে তত এর সাইজ ছোট হয়ে আসবে, যেদিন এর সাইজটা জিরো হয়ে যাবে সেদিন তুমি মরে যাবে'। ছেলেটি বিশ্বাস করতে পারলো না, শুনেই হাঃ হাঃ করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে ছেলেটি লোকটিকে নিয়ে একটা হোটেলে গেছে, হোটেলে গিয়ে লোকটির গল্প করল। বলার পরেই ছেলেটি বলছে 'এই লোকটির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এক্ষুণি, এই মুহুর্তে পাঁচ মিনিটের মধ্যে, এখানে আমার কাছে এক কোটি টাকা চলে আসবে, আমার জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে আসবে' ইত্যাদি বলে গেল। বলতেই দেখে লোকটির কাছে যে চামড়ার কার্পেটটা ছিল সেটা কমে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। ছেলেটির কথা শুনতেই হোটেলের একটি খদ্দের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করছে আপনার কি নাম বলুন তো।

ছেলেটি নাম বলল। খদ্দেরটি নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, তাই আবার জিজ্ঞেস করছে কি নাম বললে ভাই? ছেলেটি আবার নাম বলতেই খদ্দেরটি বলছে – 'আরে! আমি তো তোমাকেই এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার এক কাকা ভারতে ছিলেন, তিনি মারা যাওয়ার পর একটা উইল করে গেছেন যাতে তিনি বলে গেছেন এই এক কোটি টাকা আমি রেখে গেলাম, আমার বংশের যদি কেউ বেঁচে থাকে তাকেই যেন এই টাকা দেওয়া হয়। তা আমি খোঁজ নিয়ে নিয়ে দেখেছি এই বংশে তুমিই একমাত্র জীবিত, সেই থেকে এই এক কোটি টাকার চেক নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই নাও তোমার এক কোটি টাকার চেক'। ছেলেটি বলেছিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক কোটি টাকা যেন চলে আসে। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টাকা এসে গেল। ছেলেটি এবার ভয় পেয়ে গেছে। এতক্ষণ ওর মৃত্যু ভয় ছিল না, যেই টাকা এসে গেল মৃত্যু ভয়টাও এসে গেছে। ছেলেটি এখন আতঙ্কিত। যাই হোক এখন ওর মুখ থেকে যে ইচ্ছাটাই বেরিয়ে আসছে সেটাই ফলে যাচ্ছে আর চামড়ার সাইজটাও ছোট হয়ে আসছে। এরপর বেচারা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। চামড়াটাকে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, পুড়লো না। ল্যাবোরটরিতে পাঠালো যদি পরীক্ষা করে জানা যায় এটা কি দিয়ে তৈরী, গবেষকরা বুঝতে পারল না কি দিয়ে তৈরী। শেষে ছেলেটি তাদের বড় একটা খামার বাড়ি ছিল, সেখানে একটা কুয়োর মধ্যে চামড়াটাকে ফেলে দিয়ে এসেছে। উঃ বাঁচা গেল, আর চোখের সামনে আমাকে এই চামড়াটা দেখতে হবে না। কপাল এমন, ছেলেটির মালি পরের দিনই গাছে জল দেবে বলে কুয়োতে বালতি ডুবিয়েছে, বালতির সাথে চামড়ার টুকরোটাও উঠে এসেছে। টুকরোটা নিয়ে দৌড়ে সে মালিকের কাছে ছুটে এসেছে। স্যার! আপনার অনেক জিনিষের উপর আগ্রহ আছে, এই একটা বিচিত্র জিনিস পেলাম আপনার ভালো লাগবে মনে করে নিয়ে এলাম। আবার চামড়াটা ঘুরে তার কাছে এসে গেছে। কিন্তু বিরাট চামড়াটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত মারা যায়। কিন্তু তার মৃত্যুটাও অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। একজন লোক ছেলেটিকে বন্দুক নিয়ে তার সাথে লড়াই করতে চ্যালেঞ্জ করেছে। ছেলেটি তাকে বলছে 'ভাই! তুমি আমার সাথে লড়াই করতে এসো না। তুমি যদি আমাকে সামনে থেকেও গুলি চালাও আর আমি যদি উল্টো দিকে গুলি চালাই তাও তোমার গুলি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না; আর আমার গুলিতে তুমি মরবে। কিন্তু মাঝখান থেকে আমার জীবনের আয়ুটা কমে যাবে। তাই বলছি তুমি লড়াই করতে চেও না'। লোকটি মনে করছে ছেলেটি তাকে বোকা বানাতে চাইছে, সে শুনবে না। যাই হোক শেষে লড়াই শুরু হল। লোকটি গুলি চালিয়েছে, কিন্তু কীভাবে গুলিটা ছেলেটির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর ছেলেটি অন্য দিকে গুলি চালিয়েছে, কিন্তু কীভাবে গুলি অন্য জায়গায় ধাক্কা খেয়ে সোজা ওর বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর দেখে চামড়াটা আরও ছোট হয়ে একেবারে একটা ঘাসের টুকরোর মত হয়ে গেছে। ছেলেটি তো আতঙ্কিত হয়ে গেছে। যাই হোক, চামড়াটাও শেষ হয়ে যেতে ছেলেটিও মারা গেল। কোথায় একটা কুয়ার মধ্যে চামড়াটা ফেলে দিয়েছিল, তার মালি, যে মালিকের কাছে কখন আসে না, সে সেখান থেকে তুলে একট উৎকট চামড়া দেখে মালিকের কাছে নিয়ে এল।

মুষলের ছোট্ট টুকরোটা তারা সমুদ্রের গভীরে ফেলে দিয়ে এল। পরের কাহিনীতে দেখানো হচ্ছে একটা মাছ সেই টুকরোটাকে গিলে ফেলেছে। সেই মাছকে একটা জেলে ধরেছে। মাছ থেকে সেই টুকরোটা এক জেলে পেয়েছে। লোহার টুকরোটা জেলে ফেলে দিয়েছে। সেই লোহার টুকরোটা একজন কামার মিস্ত্রি দেখতে পেয়ে তাই দিয়ে একটা তীর বানালো। সেই তীরটা গেলে আবার জরা নামে এক ব্যাধের হাতে। সেই ব্যাধ জঙ্গলে শিকার করতে এসেছে। তার আগে যদুবংশ শেষ হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ একটা গাছের তলায় শুয়ে আছেন। তাঁর গোলাপী রঙের পায়ের নখে আলো পড়ে চিকচিক করছে। ব্যাধ মনে করল হরিণ ওখানে শুয়ে আছে আর তার চোখটা চিকচিক করছে। ব্যাধ তীর চালিয়ে দিল। তীর এসে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিদ্ধ হয়ে গেল। তাতেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পার্থিক শরীর ত্যাগ করতে হল। আর বাকিদের শ্রীকৃষ্ণের আগেই মরতে হয়েছে।

নারদ কর্তৃক বসুদেবকে রাজা জনক ও নয়জন যোগীশ্বরের সংবাদ জ্ঞাপন

এরপরেই ভাগবতে খুব বিখ্যাত অধ্যায় আসে। শ্রীকৃষ্ণের বাবা বসুদেব তখনও বেঁচে আছেন। যদিও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে মেলানো যায় না, কারণ এই ঘটনার সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স একশোর কাছাকাছি হওয়ার

কথা, তখনও শ্রীকৃষ্ণের বাবা বেঁচে থাকবেন আর একেবারে সজাগ, যাঁর বয়স তখন খুব কম করেও একশো তিরিশ বছর হয়ে যাওয়ার কথা। পুরাণের এটাই দুর্বলতা, সময়, কালের ব্যাপার যখন আসে তখন বাস্তবের সাথে কিছু মিল পাওয়া যায় না। এসব দিকে বেশি নজর দিতে নেই, কারণ শাস্ত্রের কাজ আমাদের মনকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া। যাই হোক বলছেন, বসুদেব একদিন বসে আছেন সেই সময় দেবর্ষি নারদ এসেছেন। নারদকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করার পর বসুদেব খুব সুন্দর কথা বলছেন *ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাম্। কৃপাণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্।।১১/২/৪।।* সাধু সন্ন্যাসীরা সব কিছুই মানুষের মঙ্গলের জন্য করেন। সাধুরা যে খাওয়া-দাওয়া, হাঁটাচলা যা কিছু করেন সবটাই অপরের মঙ্গলের জন্য করেন, নিজের স্বার্থ কোথাও জড়িয়ে থাকে না। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে ভগবানের বর্ণনা করার সময় বলছেন, অবতার রূপ ধারণ করে যে তিনি লীলা করেন, সেখানে ভগবানের নিজস্ব কোন প্রয়োজন থাকে না, কোন কামনা-বাসনা থাকে না, কোন উদ্দেশ্য পুর্তি থাকে না, কোন কর্তব্য বোধে প্রেরিত হয়ে কিছু করেন না, তিনি যা কিছু করেন একমাত্র জীবের মঙ্গলের জন্যই করেন। ভগবানের চিন্তন করে করে সাধুরাও ভগবানের স্বভাব পেয়ে যান। সেইজন্য বলা হয়, যাঁকে দেখে আমাদের মনে ঈশ্বরীয় কথা মনে পড়ে বুঝতে হবে তিনি একজন সাধু। যদি কোন সাধুকে দেখে আমাদের মনে সন্তাপ আসে, ক্রোধ হয় তাহলে বুঝতে হবে সে প্রকৃত সাধু নয়, সাধুর ভেক ধারণ করে আছে। ঈশ্বরের চিন্তন করে করে সাধুরা ঈশ্বরের সত্তা পেয়ে যান। ঠাকুরও বলছেন, যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। ঈশ্বরের চিন্তা করলে ঈশ্বরের সত্তা পেয়ে যায়। ঈশ্বরের প্রধান সত্তা কি? নিজের কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু তিনি যা কিছু করেন সবটাই জীবের মঙ্গলের জন্য করেন। সাধুরাও ঠিক তাই, তাঁদের সব কিছুই জীবের মঙ্গলের জন্য। এখানে এক এক করে বলছেন, দেবতাদের উদ্দেশ্যে যারা স্তুতি করে তাঁরাও তাদের ভালো করে দেন, কিন্তু দেবতারাও অনেক সময় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু সাধুরা কখনই কারুর দুঃখের কারণ হতে পারেন না। ঈশ্বরের চিন্তা করলে মানুষ যেমন মৃত্যু ভয় থেকে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি সাধু পুরুষদের সাথে কথা বললে মানুষ ভয় থেকে বেরিয়ে আসে।

বসুদেব শেষে বলছেন 'হে সুব্রত, আপনি আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন, যাতে এই ভয়াবহ জন্ম-মৃত্যু চক্র রূপ সংসার থেকে আমি যেন মুক্তি পেয়ে যাই। জন্ম-মৃত্যু রূপী সংসারের সব থেকে বড় সমস্যা এখানে দুঃখও সুখের একটা বিচিত্র রূপ ধারণ করে আসে, দুঃখ একটা মোহের রূপ ধারণ করে আসে। দুঃখ কখন দুঃখ রূপেই আসে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় সরাসরি দুঃখ হয়ে আসে না, সুখের নানান রূপ ধারণ করে দুঃখ আসে, আর সেই সুখকে পেয়ে মানুষ মুগ্ধ হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। এর থেকে বেরোবার পথ আপনি আমাকে বলে দিন'। দুঃখ দুটি রূপে আসে – দুঃখের প্রথম রূপ, যখন দুঃখ দুঃখ রূপেই আসে আর দুঃখের দ্বিতীয় রূপ, দুঃখ যখন সুখের রূপ নিয়ে আসে। সংসারে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। জীবনে যখনই কারুর সাংসারিক সুখ চলে, তখন আমাদের জেনে নিতে হবে এই সুখ তাকে বিপদে ফেলতে বাধ্য, শুধু কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। যে জিনিস মানুষকে সুখ দিচ্ছে, ওটাই তাকে এমন মার মারবে যে তাকে সারাটা জীবন কাঁদিয়ে ছাড়বে, তা সে স্ত্রী হোক, সন্তান হোক, ধন-সম্পদই হোক। আমরা মেনে নিতে চাই না। ঠাকুর বলছেন, সবাই নিজের মাগের সুখ্যাতি করে। নিজের স্ত্রীর সুখ্যাতি সবাই করে, কারণ সবাই ওখানে সম্মোহিত হয়ে আছে। জগতের এটাই এক আশ্চর্যের, গহনা, মহান দুঃখ সব সময় সুখের মুখোস পরে সামনে আসে।

দুঃখ যেমন সুখের রূপ ধরে আসে তেমনি শত্রুতাও অনেক সময় বন্ধুর রূপ ধারণ করে আসে। মানুষ দুটোর একটাকেও ধরতে পারে না। এই শত্রুদের মানুষ কি করে মোকাবিলা করতে পারবে! সুখ যখনই আসে জানবেন ওর সাথে দুঃখও গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে। দুঃখের সাথে লড়াই করা কিছুই না, সেই তুলনায় সুখকে উপেক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। হিন্দু ধর্মের দুঃখের এই ধারণা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে এসেছে। বৌদ্ধ ধর্মে শুধু দুঃখ আর দুঃখ, তারা শুধু দুঃখ নিয়েই বলে। যারা খাওয়ার জুটছে না, তাদের সরাসরি দুঃখ। আর যাদের প্রচুর ভালো ভালো খাবার আছে তাদের সুখ রূপে আসছে, কিন্তু বেশী খাওয়া-দাওয়া করে যে শরীরে রোগ-ব্যাধি আসছে তখন সেই সুখটাই দুঃখে পরিণত হচ্ছে। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন 'ভাই! এই সংসারে সুখের গন্ধ মাত্র নেই'। বসুদেব দেবর্ষি নারদকে বলছেন 'আপনি আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিন যাতে আমি

এই মহাদুঃখ রূপ সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে পারি’। সংসারের দুঃখ-সাগর থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায়, পরমার্থ সাধন। কেমন আছেন? কাউকে এই প্রশ্ন করলে বেশীর ভাগ মানুষই উত্তর দেন ‘ভালোই আছি’। কেউ বলবে ‘মোটামুটি ভালোই চলছে’। একজন মহারাজ ছিলেন তাঁকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করত ‘মহারাজ কেমন আছেন’? তিনি সব সময় উত্তর দিতেন ‘ভালো-মন্দ মিশিয়ে’। কিন্তু আসল উত্তর কেউ দেয় না, কেউ বলে না যে ‘ভাই! জগতে কে ভালো আছে? এখানে সুখ বলে কিছু নেই’। কারণ জগৎ-সংসারে সুখের গন্ধ মাত্র নেই। যেটা আমার সুখ মনে হচ্ছে কিন্তু সেটাও দুঃখেরই একটি রূপ। ঝড় আসার আগে মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বইতে থাকে, মিষ্টি বাতাস মানে ঝড়ের পুর্বাভাস। মানুষ এই মিষ্টি মিষ্টি বাতাসে মোহিত হয়ে বুঝতে পারে না যে এই মিষ্টি মিষ্টি সুখের পেছনে কি ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আসছে।

জাপানে সুনামির উপর একটা কাহিনী আছে। সুনামি আসার আগে বলে সমুদ্রের জল নাকি অনেক দূর পর্যন্ত নেমে যায়। জাপানে কোন এক উৎসবে গ্রামের লোকেরা সমুদ্রের ধারে জড়ো হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে তারা দেখছে সমুদ্রটা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র দূরে সরে যেতে দেখে গ্রামের লোকদের খুব মজা লাগছে, এমনিতেই সমুদ্রকে পিছিয়ে যেতে তারা কখনো দেখেনি, তারপর সমুদ্রের বালিতে অনেকে ছোট ছোট সামুদ্রিক জীব দেখতে পাচ্ছে। ওদের মধ্যে এক বুড়ো চাষী ছিল, বয়স হয়ে গিয়েছিল বলে নামতে পারেনি। সেই সময় বৃদ্ধ চাষীর মনে পড়ল আমি যখন ছোট ছিলাম তখন একবার এই রকম সমুদ্র পিছিয়ে গিয়েছিল, আর তারপরেই সমুদ্রের সেই বিশাল ঢেউ অনেক দূর পর্যন্ত সব জনবসতিকে ধ্বংস করে গ্রাস করে নিয়েছিল। মনে পড়ে যেতেই বৃদ্ধ এখন এদের সবাইকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু ডাকবে কি করে! তখন বৃদ্ধ চাষী তার নাতিকে বললো আমাদের ধানের যে গাদা আছে ওতে আগুন লাগিয়ে দে। সব লোক দূর থেকে দেখছে সমুদ্রের পাড়ে একটা খড়ের বাড়িতে আগুন লেগেছে। ওদের মনে পড়ে গেলে ওখানে এক বুড়ো চাষী থাকে, তাকে বাঁচাতে হবে, সবাই সমুদ্র ছেড়ে পাড়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিল। সমুদ্রের পাড়ে পাহাড়ের উপর ছিল ওই খড়ের গাদা। সব দৌড়ে এসে পাহাড়ে উঠে গেছে। সবাই দেখছে বুড়ো চাষিটি নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলো বুড়ো চাষীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে আহা আপনার খড়ের গাদায় আগুন লেগে গেল! চাষী বলছে ‘আমার গাদায় কি আগুন দেখছো, পেছনের দিকে তাকাও যেখান থেকে তোমার দৌড়ে এসেছো’। সবাই দেখছে যেখানে ওরা খেলার জন্য নেমেছিল সেখানে এক বাঁশ জল।

আসল কথা হল সুখ যেটা আসছে সেটাও একটা অন্য রূপ নিয়ে আসে। এই যে সবাই বলে আমাকে সুখ-দুঃখের পারে নিয়ে চল, সুখ কোথায় যে সুখের পারে নিয়ে যাবে, সবটাই তো দুঃখ, তাই বলতে হয় দুঃখের পারে। সেইজন্য বলা হয় পরামার্থ সাধন করতে। পরমার্থ সাধন করলে কি সব দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যাবে? দুঃখ কখন চলে যাবে না, কিন্তু দুঃখের বোধ থাকবে না। মানুষের যে কোন দুঃখ, তা সেই দুঃখ যে রকমেরই হোক না কেন, এর প্রথম লক্ষণই হল প্রথমের দিকে খুব ভালো লাগবে। বসুদেবের জীবনেও কত দুঃখ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হবে কিন্তু তাঁকে বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হল। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আস্বাদন থেকেও তিনি বঞ্চিত। বড় হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এখানে ওখানে ছুটতে হচ্ছে পাশবিক শক্তি ও অধর্ম বিনাশের জন্য। তারপর মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে আসতে হল। এখানেও কত অশান্তি, চোখের সামনে ঋষিদের অভিশাপে তাঁর সব জ্ঞাতিকুলকে মরতে দেখলেন। তাই দেবর্ষি নারদকে বলছেন ‘অনেক হয়েছে, দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। এবার আমাকে বলুন এই দুঃখের পারে আমি কীভাবে যাবো’। মানুষ জানে এই জিনিসটা আমার কাছে দুঃখের, আমার পক্ষে ক্ষতিকর তা সত্ত্বেও মানুষ ওর মধ্যেই ফেঁসে থাকে। আমরা সবাই জানি এই মোহ, এই সুখ আমার জীবনের পক্ষে এক পরম বিপদ, কিন্তু তাও আমরা সারা জীবনব্যাপী সুখের পেছনে দৌড়ে যাচ্ছি, এটাই আশ্চর্যের। এর কারণটা কি?

বেদান্ত মতে বহির্জগৎ বলে কিছু নেই, যা আছে সব আমাদের ভেতরেই আছে। আমি যখন আপনাকে দেখছি বা আপনি যখন আমাকে দেখছেন, আমি বা আপনি কাকে দেখছি বা দেখছেন? আপনি বলবেন, আপনাকে দেখছি। আপনি আমাকে কি করে দেখবেন, আপনার হাত দিয়ে আমাকে যে ভাবে ধরবেন সেইভাবে চোখ দিয়ে ধরে আপনি আমাকে ভেতরে নিতে পারছেন না। আমি এখানে বসে আছি, আমার শরীরে আলো

পড়ছে, আলোর প্রতিফলন আপনার চোখে পড়ছে, চোখের রেটিনাতে আমার একটা ইমেজ তৈরী হচ্ছে, ঐ ইমেজ অপ্টিকাল নার্ভ দিয়ে ইলেক্ট্রিকাল সিগন্যালস হয়ে মস্তিষ্কে যাচ্ছে। শুধু সিগন্যাল ছাড়া আর কিছু যাচ্ছে না। সেই সিগন্যাল দিয়ে আপনার মনে একটা আইডিয়া তৈরী হয়ে গেল যে আমি এখানে বসে আছি। তার মানে আপনি কাউকে পছন্দ করুন আর অপছন্দই করুন, যেটাই করছেন মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালস ছাড়া কিছু নেই। আপনাকে যখন কেউ ইমেল পাঠাচ্ছে বা ফোনে কথা বলছে, সেখানেও ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালস ছাড়া কিছু নেই। তাহলে আপনি যাকে ভালোবসেন তখন কাকে ভালোবাসছেন। অবজেক্টিভ ভালোবাসাতে কিছু হয় না, যা হয় সব ভেতর থেকেই হয়। এই জগতে যা কিছু আছে সবই সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ বলে কিছু থাকে না। যে কোন মানুষই হল three dimensional representation of certain ideas, কতকগুলো আইডিয়ার ত্রিমাত্রিক আকৃতি, আর কিছু না। যখন পেইন্টিং করা হয় তখন ওটাই হয়ে যায়, two dimensional representation of certain ideas, আর ঐটাই যখন ভাস্কর্য হয় তখন three dimensionalএ চলে যায়। Living beingএর ক্ষেত্রে three dimensional হয় কিন্তু ওটাকে শুধু living representation বলা হয়। আমি আর আমার আইডিয়া সব সময় এক, কোন তফাৎ নেই। আমার যে আইডিয়া আমি তাই, এটাকে খুব ভালো করে আগে ধারণা করে নিতে হবে, তা নাহলে এসব শাস্ত্র আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না। আমার মনের যে বিচার আর আমি, আপনারও মনের যে বিচার আর আপনি এক। এই বিচারের জগৎ থেকে বেরিয়ে ভাবের জগতে প্রবেশ করার যে লড়াই, এই লড়াইটা যে কোন মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক। ঠাকুরের খুব বিখ্যাত উক্তি, যেমন ভাব তেমন লাভ। আর আমি আপনি কি? যেমন বিচার তেমন আপনি। আমাদের অস্তিত্ব আর আধ্যাত্মিক জীবন বা যে কোন জীবন, এটা হল শুধু বিচার থেকে ভাবে যাত্রা। আমাদের মনে এক গুচ্ছ বিচার রয়েছে, তার মধ্যে ভালোবাসাও একটা বিচার। ভালোবাসা তো রয়েছে আমাদের ভেতরে, কিন্তু বাইরে ভালোবাসার যখন সঠিক অবজেক্ট আসে, এবার ভেতরের বিচারগুলো আমাদের সাথে খেলা করতে করতে আমাদের আনন্দ দিতে থাকে। যাকে ভালোবাসে তার কথা চিন্তা করলে তার মুখে কেমন একটা হাসি ফুটে ওঠে, স্বপ্নেও যদি তাকে দেখে তার খুব ভালো লাগে। এরকম কেন হয়, যাকে ভালোবাসছে সে তো তার কাছে নেই?

আমেরিকার একটা ঘটনা, একটা মেয়ে তার সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে কি একটা কারণে দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্তানটি মারা যায়। ডাক্তার বলে দিল, মেয়েটি কোন দিন আর মা হতে পারবে না। মেয়েটি এমন পাগল হয়ে গেলে যে ওকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিতে হল। মহিলাটি শিক্ষিত আর খুব রূপসী, কিন্তু মাথাটা পুরো বিগড়ে গেছে। এই ঘটনার যিনি লেখক তিনি একদিন ওখানে ডাক্তারের কাছে বসে আছেন, সেই সময় মহিলাটি এসে বলছে 'ডাক্তারবাবু জানেন, কাল রাতে আমি এক যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছি, তারা দুজনেই দেখতে কী সুন্দর'। মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে বলছেন 'তাই নাকি, বেশ বেশ, খুব ভালো খবর দিলেন, দারুণ ব্যাপার'। মহিলাটা আনন্দ করতে করতে চলে গেল। তখন ডাক্তার ভদ্রলোককে বলছেন 'আমি হয়ত ওষুধ দিয়ে ওর এই জিনিসটাকে মাথা থেকে নামিয়ে দিতে পারি, কারণ এটা ওর পুরো কল্পনা, ওর কোন দিন সন্তানই হবে না। কিন্তু আমি ভাবছি, ওর চিন্তার জগতে কাল রাতে ওর যে দুটো সন্তান হল, আর রোজই আমাকে এসে এই খবরটা দিয়ে যায়, এতে তার আর যাই হোক আনন্দেই আছে। ওকে যদি ওষুধ দিয়ে এই জগতে নিয়ে আসি সে বেচারী হতাশায় শুধু কাঁদতেই থাকবে। এটা ঠিক করছি কি না ভুল করছি আমি বুঝতে পারছি না'। মহিলাটির কিছুই হয়নি, সে কি করে আনন্দ পাচ্ছে? আসল কথা, সব আনন্দ আসে ভেতর থেকে, বাইরে থেকে কোন আনন্দ আসে না। তার মানে আমার যা আনন্দ, আমার যা দুঃখ সবটাই আমার বিচার। বিচারের জগতে যখন দুঃখের পরিমাণ বেড়ে যায়, সেটা দুঃখ রূপে আসুক বা সুখ রূপেই আসুক, যেমন মদ খেয়ে খুব আনন্দ লাগে, তারপর নেশার ঘোর যখন কেটে যায় তখন ঐ hangoverটা যেতে চায় না।

তখন ভাব জগৎ থেকে জিনিস গুলো আসতে শুরু হয়। দু রকমের ভাব আসে, একটা বিচারেরই ভাব, যেখানে বলে আমি আর এই রকমটি করব না, দ্বিতীয় হল, আধ্যাত্মিক ভাব, আমাকে এবার ঈশ্বরের দিকে এগোতে হবে। এবার এই যে বিচার থেকে ভাবের জগতে যাত্রা এই যাত্রাটা অত্যন্ত কঠিন। অনেকে আছে যারা

নৌকায় চাপতে খুব ভয় পায়, ঠিক তেমনি একটা বিচার থেকে যখন ভাবের জগতে যাবে, সে জানে ওটা অনেক ভালো কিন্তু তাও যেতে পারবে না। কারণ তার বাস্তবটা হল বিচারের জগৎ, এবার ধীরে ধীরে ঐ ভাবকে বিচারে রূপান্তরিত করতে হয়, যার প্রতিমূর্তি হল সে নিজে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই আর কিছু জানি না। তার মানে তিনি হলেন সেই ভাবের প্রতিমূর্তি যাঁর কাছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তার আগে তিনি যখন অল্প বয়সের ছিলেন, ঠাকুর অবতার আমরা মেনেই চলছি, কিন্তু যেভাবে আমরা মানুষকে বিচার করি, সেইভাবে দেখতে গেলে তিনি একজন সাধারণ গ্রামের ছেলে, চাকরির জন্য দাদার সাথে কলকাতায় এসেছেন। সেখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে ভাবের জগতে ঢুকছেন। এই বিচার থেকে ভাবের যাত্রা এটা বাস্তবিকই খুব কষ্টসাধ্য। কারণ বিচারটাও ভেতরের আর ভাবটাও ভেতরের। বিচার হল বাস্তবিক আমি, যে জিনিসটাকে মনে হচ্ছে এটা ভুল এটা আমার করা উচিত নয়, আমাকে বলতে হবে আমি এটা করব না। যদি এটা খসে যায় তাহলে বুঝতে হবে আমি কোন দিনই ঐ বিচারের মূর্ত রূপ ছিলাম না। যদি একবারে না যেতে চায় তাহলে বুঝতে হবে আমি ঐ বিচারের মূর্ত রূপ, আমাকে এখন অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। নাতিকে আমি খুব স্নেহ করি, যেখানেই যাই সেখানেই নাতির কথা মনে পড়ে যায়। নাতিকে ছেড়ে শাস্ত্রের কথা শুনতে আসতে পারি না। আমি তো বুঝতে পারছি নাতিকে ছেড়ে আমি শাস্ত্রের কথা শুনতে আসতে পারছি না। স্নেহ বলে যে জিনিসটা আছে, আমি হলাম তার মূর্ত রূপ। এই স্নেহের পারে যাওয়ার জন্য আমাকে এখন অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। স্নেহকে আমি একবারে কাটাতে পারব না, কিন্তু যেটা আমি নই সেটার ব্যাপারে আমি একবারে পেরে যাব। আগেকার দিনের একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ, অজান্তায় তার মুখে গরুর মাংস লেগে গেল, ব্রাহ্মণ বলবে আর জীবনে ঐদিকে যাব না, ওর ধারে কাছেও কোন দিন যাব না। ব্রাহ্মণের ধাতেই নেই, গরুর মাংস খাওয়ার মূর্ত রূপ নয়। লাটু মহারাজ গ্রামে থাকার সময় লোকেদের তাড়ি, মদ খেতে দেখেছেন, তাঁরও সংস্কারে হয়ত তাড়ি খাওয়ার ব্যাপারটা ছিল। ঠাকুরের কথা শুনে তিনি সেই পাড়া দিয়েই আর আসছেন না যেখানে মদ বিক্রি হচ্ছে। তার মানে তিনি তাড়ি বা মদ খাওয়ার মূর্ত রূপ নন। ঠাকুর কামারপুকুরে আছেন, রোজ সকালে উঠে জিজ্ঞেস করছেন, আজ তোমাদের কি রান্না হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর মনে হল, সকালে উঠে এসব কি করছি, শুধু খাওয়ার কথা, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে দিলে। তৎক্ষণাৎ ত্যাগ মানেটা কি? ঠাকুর বলছেন মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না, তিনি তো চৈতন্য সত্তার মূর্ত রূপ, জগতের কোন কিছুই কোন পরিস্থিতিতে তাঁর আইডিয়া হতে পারে না। এগুলো হল ভাসমান আইডিয়া, কোন রকমে এসে গেছে, উনি ধরলেন, এই ধরারও কোন মূল্য নেই, ধরেই সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছেন, এটাই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ, এটা তাঁর স্বভাবেই নেই। কিন্তু আমরা হলাম জগতের এই ধরণের জিনিসের মূর্ত রূপ। দীক্ষা নিয়েই ভক্তরা এসে বলে, আমার জপ হতে চায় না, জপ করতে বসলেই মনটা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। জপ না হওয়াটাই স্বাভাবিক, হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ঠাকুর বলছেন, বেদান্তের বিচার করতে করতে আমার এমন অবস্থা যে পেটের ব্যামো হয়ে গেল, শুধু মলই বেরিয়ে যাচ্ছে, ভাবছি এত মল ভেতরে জমে আছে! একজন সাধু এসে ঠাকুরকে দেখে বলছেন, এর শরীর তো অস্তিচর্মসার হয়ে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেও বেদান্তের বিচার চলছে। এটাই বলে দিচ্ছে যে ঠাকুর হলেন বেদমূর্তি, বেদান্তের রূপ। বার্ণাড'শ বলছেন, যদি কেউ লেখক হতে চায় তাকে কি রকম হতে হবে, কল্পনা কর তোমার বাড়িতে খাওয়ার কিছু নেই, তোমার নবজাত শিশু কাঁদছে, তোমার স্ত্রী শিশুকে স্তন পান করাতে যাচ্ছে আর সেই সময় বাচ্চার মুখটা সরিয়ে বুকের দুধটা নিয়ে নিলে, সেই দুধ নিয়ে বাজারে বিক্রি করলে, সেই পয়সা দিয়ে দোয়াতের কালি আর কাগজ কিনল, সেই কালি দিয়ে এবার তুমি সাহিত্য রচনা কর, এই দম যদি থাকে তাহলেই তুমি লেখক হতে পারবে। আধ্যাত্মিকতা মানেই তাই, কবির দাস বলছেন, নিজের বাড়িতে আগুন লাগাবার মত তোমার দম আছে, তাহলে আগুন লাগাও, লাগিয়ে এবার ঈশ্বরের পথে এসো, তা নাহলে এই পথ তোমার জন্য নয়।

আমরা তাহলে কিসের যোগ্য? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায় ঠাকুরকে বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য আহার, নিদ্রা, মৈথুন। বঙ্কিমচন্দ্র একটুও ভুল বলছেন না, কারণ রোটি-কাপড়া ঔর মকান্ এর বাইরে আমরা আর কিছু ভাবতেই পারি না। আমরা সবাই এই তিনটের মূর্ত রূপ। এই বিচার থেকে যখন ভাবে যাবে, বড়দের কাছে,

সাধুদের কাছে এরকম পাঁচটা কথা শুনেছি, শুনতে ভালোই লাগে, ভাবছি আমিও এই পথে নামব। নামলেই তো হবে না। এই যে বসুদেব বলছেন, সুখের রূপ ধরে দুঃখ যখন আসে তখন আমাদের কত অশান্তি, এর থেকে আমরা কিভাবে বেরোতে পারি? কোন দিন বেরোতে পারবে না। ওর মধ্যেই সবাই থাকবে, ঠাকুর বলছেন গুটি পোকা রেশমের গুটির মধ্যেই থাকবে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, নর্দমার পোকাকে যদি নর্দমা থেকে বার করে ভালো জলে রাখা হয় ও ওখানেই মরে যাবে। ঠাকুরও বলছেন, গুবরে পোকাকে ভাতের হাড়িতে রেখে দিলে হেদিয়ে হেদিয়ে মরে যাবে, এটাই বাস্তব। কিন্তু যাঁরা এখন শাস্ত্রের কথা শুনতে আসছেন বা এখানে যে বসুদেবের কথা বলছেন, এনারা ধর্মের কিছু কথা শুনেছেন, বুঝতেও পারছেন আমার দুঃখ-কষ্ট আছে। তাহলে এখন উপায় কি, আপনি একটা উপায় করুন যাতে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। আরে ভাই আপনি বেরোতে পারবেন না। আপনাকে ধীরে ধীরে লড়াই করে যেতে হবে। ইংলিশে একটা কথা বলা হয় sudden conversion, আরে sudden conversion, বলে কিছু হয় নাকি! স্বামীজীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি ঈশ্বরের পথে কেন এলেন, উনি এর কী উত্তর দেবেন। যাদেরই sudden conversion হয় তারাই গোলমেলে লোক হয়। ভাগবত যে হাজার হাজার পাতা জুড়ে যা যা বলছে, এগুলোকে যেমন যেমন অধ্যয়ন করবে, একটু একটু করে ধারণা হতে থাকবে, এরপর ভেতরে গিয়ে টিপ টিপ করে বৃষ্টি ফোটার মত পড়ে জমা হবে, তারপর সে নিজের যে ভাবকে বেছে নিয়েছে, সেই ভাব এবার ধীরে ধীরে তার প্রকৃতিতে আসতে শুরু হবে, এরপর তার সংস্কার পাল্টাতে শুরু হবে। নারদ এরপরে যা বলছেন তার সারমর্ম হল, পারে যাবার একটাই পথ – ভগবানের নাম করে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

গীতায় ভগবান প্রত্যেক কাজের তিন রকম অনুভূতি ও ফলের কথা বলছেন। প্রথম হল – কাজ করার সময় বাজে লাগবে আর কাজের ফলটাও বাজে। যেমন যারা ড্রাগস্ নেয়, ইঞ্জেকশন নিয়ে ড্রাগ নিচ্ছে প্রথমেও ব্যাথা যন্ত্রণা লাগছে আর তার ফলটাও বাজে। দ্বিতীয় – প্রথমের দিকে খুব ভালো লাগবে কিন্তু তার ফলটা খুবই বাজে। দৈনন্দিন জীবনে এই ধরণের কাজই আমরা বেশী করি। যেমন মদ খাওয়া। মদ যখন খায় তখন খুব ভালো লাগে, মজা লাগে। বেশ কিছু বছর খাওয়ার পর দেখে শরীর, মন ও আর্থিক অবস্থা, তিনটেরই সর্বনাশ হয়ে গেছে। তৃতীয় – প্রথমের দিকে খুবই কষ্টকর আর করতেও মন লাগে না, কিন্তু পরে এর ফল খুবই ভালো। তাই বলছেন – যখন কাজ করা হয় তখন এই ভাবেই করতে হয়। যাঁরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছেন, কত কষ্ট সাধ্যের ব্যাপার, এত খেটে খুটে নিজের পয়সা খরচ করে এখানে শাস্ত্র পড়তে আসছেন, কিন্তু এর একটা ফল অবশ্যই আছে। আর এর ফলটা যখনই আসবে সেটা মিষ্টি লাগবে।

যাই হোক, বসুদেবের প্রশ্ন শুনে নারদ প্রথমেই বলছেন *সম্যগেতদ্ ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ। যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্।।১১/২/১১।* হে বসুদেব! আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন, আপনার এই প্রশ্ন ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধীয়। বসুদেবের প্রশ্ন ছিল জন্ম-মৃত্যু চক্র রূপ এই সংসারের মহাদুঃখের পারে কীভাবে যাওয়া যাবে। এর একটাই পথ পরমার্থ সাধন। দেবর্ষি বলছেন আপনার প্রশ্নটি ভাগবত ধর্মের উপর আধারিত, এই ভাগবত ধর্ম সমস্ত বিশ্বের প্রাণ ও পরম পবিত্র। যোগশাস্ত্রে, জ্ঞানশাস্ত্রে, ভক্তিশাস্ত্রে যা কিছু বলা হয়েছে, আগেকার দিনে সবটাকে মিলিয়ে ভাগবত ধর্ম বলা হত। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে যে ভক্তির কথা বলছেন সেই ভক্তিকে ভাগবত ধর্ম বলা হচ্ছে, আর ভাগবতে 'ভাগবত ধর্ম' এই শব্দের অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে। ইদানিং কালের পণ্ডিতরাও এই শব্দকে তাঁদের আলোচনায় প্রচুর ব্যবহার করেন, তাঁরা দেখাতে চাইছেন ভাগবত ধর্ম যেন নতুন একটা আলাদা ধর্ম। ভাগবত ধর্ম ঠিক ভক্তি নয়, এই ভক্তিতে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সব কিছুই মিশে আছে। পণ্ডিতরা এও বলছেন যে, গীতাও ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্মের মূল কেন্দ্র হলেন ভগবান। পরবর্তিকালে জ্ঞান, ভক্তি, যোগকে আলাদা আলাদা পথের দৃষ্টিতে দেখা শুরু হয়। ভাগবতে কিন্তু সেইভাবে এগুলোকে দেখা হয়নি, পরমার্থ সাধনই হল ভাগবত ধর্ম। ভাগবত শব্দ এসেছে ভগবান থেকে, ভাগবত ধর্ম হয় যে ধর্মে ভগবান, ভক্ত, ভাগবত ও ভক্তি এই কটি জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের ধারণা যে ভাগবতে শুধু শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী আর শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু এটা যে ভাগবতের খুব ছোট্ট অংশ বেশির ভাগ লোকই জানে না। ভাগবত হল পুরাণ, এতে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণই

পাওয়া যাবে। এই পাঁচটি লক্ষণ দিয়ে পাঁচটি জিনিসকে জানা যায়, সৃষ্টি থেকে স্থিতি, স্থিতি থেকে লয়, স্থিতিতে কোন কোন বংশ ছিল, সেই বংশগুলো কিভাবে চলেছে, এই জিনিসগুলোকে পুরাণের আলোচনাতে থাকবে। ভাগবত পুরাণে এই পাঁচটিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর তার সাথে পুরাণের যে বৈশিষ্ট্য, দেবী দেবতাদের চরিত্রকে আধার করে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের শিক্ষা দেয়। বিষ্ণু পুরাণে যেমন আমরা ভাগবত পুরাণকে পাই তেমনি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অধ্যাত্ম রামায়ণ আছে আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী আছে, প্রত্যেক পুরাণেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু ভাগবতের যে প্রাণ তা হল রাসলীলা, যার কথা আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি। প্রেমা ভক্তি অর্থাৎ ভক্তির চূড়ান্ত মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, এই জিনিসটাকে একটা বাস্তবিক রূপে দেখানো হয়েছে, এর এত উচ্চমানের বর্ণনা অন্যান্য কোন গ্রন্থেই পাওয়া যাবে না। পুরাণের বাকি জিনিসগুলো অন্যান্য পুরাণেও আছে, কিন্তু ভাগবতের মূল বৈশিষ্ট্যই হল ভক্তি। ভাগবতে জ্ঞানেরও কথা আছে, ভক্তিরও কথা আছে, জ্ঞান ভক্তির সমন্বয়ের কথাও আছে, সবই আছে কিন্তু ভক্তিই প্রধান। ভক্তি থাকলে ভগবান আসবেন, ভক্তি থাকলে ভক্ত থাকবে আর ভক্ত থাকলে তার যে ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম আসবে।

ভাগবত ধর্মের ব্যাপারে দেবর্ষি বলছেন, ভাগবত ধর্ম এমনই যে *শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি।।১১/২/১২।* নারদ ভাগবত ধর্মের কথা খুব সংক্ষেপে বলছেন। ভাগবত ধর্ম এমনই যে, কেউ যদি ঘোর সংসারী হয়, যার ভেতরটা বিষে পূর্ণ, জগতের শত্রু, এই ধরণের মানুষও যদি কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, বাণী দিয়ে উচ্চারণ করে, মনে স্মরণ করে, হৃদয়ে গ্রহণ করে বা কেউ পালন করতে যাচ্ছে তার অনুমোদন করে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। অনুমোদন করা মানে, স্ত্রী হয়তো বেলুড় মঠে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসতে চাইছে। স্বামীর কাছে অনুমতি নিতে গেছে, স্বামী শুনে বলে দিলেন 'এতো খুব ভালো কাজ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে নিশ্চয়ই যাবে'। বলছেন, এইটুকু অনুমোদন করাতেই তৎক্ষণাৎ স্বামী পবিত্র হয়ে গেল। এগুলোকে বলা হয় গ্রন্থস্তুতি। দেবর্ষি বলতে চাইছেন, যারা অত্যন্ত পতিত তারাও ভাগবত ধর্মের কথা শ্রবণ করলে, মুখে উচ্চারণ করলে স্মরণ করলে, হৃদয়ে গ্রহণ করলে পবিত্র হয়ে যায়, আর যারা ভক্ত তাদের আর কি কথা। গীতাতেও ঠিক এই কথা বলছেন, সেইজন্য গীতার ধর্মকেও ভাগবত ধর্ম বলা হয়। ঈশ্বরীয় কথা যে মানুষ শোনে, বলে, পালন করে, ধ্যান করে তারা একেবারে অন্য ধরণের, কোন কিছুর সাথেই তাদের তুলনা হয় না। ভাগবত ধর্ম একেবারেই অন্য জিনিস, ভাগবত ধর্ম পালন করে অন্য ধরণের শান্তি আসে, ভেতরে অন্য ধরণের শক্তির স্ফুরণ হয়। মানুষের মনের চিন্তাশক্তি ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটাই পুরো পাল্টে যায়।

নারদ বসুদেবকে বলছেন আপনার প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দিচ্ছি না, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। মহাভারত, পুরাণের মত শাস্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্যই হল একটা কাহিনী থেকে আরেকটা কাহিনীতে চলে যাওয়া। কেউ কিছু প্রশ্ন করলে সরাসরি উত্তর না দিয়ে কোন ঋষি বা রাজার কাহিনী নিয়ে আসবেন, সেই কাহিনীতে আবার যখন কেউ প্রশ্ন করছেন তখন তার উত্তর দিতে গিয়ে আরেকটা কাহিনীতে চলে যাবেন। এত কাহিনীর মধ্যে ঘুরপাক খাবেন যে মূল কাহিনীটাই হয়তো মাথা থেকে হারিয়ে যাবে। এখানে নারদ নয়জন যোগীর কথা বলছেন। ভারতবর্ষে যোগীদের প্রথা চিরদিনই ছিল। একবার নজন যোগীর সাথে নিমি রাজার যে কথা হয়েছিল নারদ সেটাই বসুদেবকে বলতে যাচ্ছেন। এই নয় জন যোগী তাঁরা তাঁদের অনুভূতি অভিজ্ঞতার কথা রাজা নিমিকে বলেছিলেন, সেটাই নারদ এখানে বসুদেবকে বলছেন। ভাগবতের এটি একটি খুবই মূল্যবান অধ্যায়, সবারই ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পর পর কয়েকটি অধ্যায় অধ্যয়ন করা দরকার।

এই নয় জন যোগী তাঁরা গিয়েছিলেন নিমি রাজার কাছে। নিমি ছিলেন মিথিলার রাজা, বিদেহরাজ, তিনি বিদেহ হয়ে গিয়েছিলেন, দেহ থাকতেও দেহবোধ ছিল না। সেই থেকে তাঁর রাজ্যের নাম হল বিদেহ রাজ্য। আর সেখান থেকে প্রচলিত হল যারাই মিথিলার রাজা হবে তাদেরকে বলা হবে বিদেহরাজ, সীতার নামও তাই বিদেহী। তাঁরা সবাই ব্রহ্মজ্ঞানী হবেন, মিথিলার যাঁরা রাজা হন তাঁদের সবাইকে জনক বলা হয়।

মিথিলার প্রথম দিকের একজন রাজার নাম নিমি। নিমি রাজার কাছেই নজন যোগীশ্বর, যোগীশ্বর মানে যাঁরা যোগে শ্রেষ্ঠ, তাঁরা এলেন। যোগীরা সবাই ছিলেন ঋষভ মুনির সন্তান। যোগীদের সাথে আলাপ করার সময় নিমি রাজা যোগীদের এই কথাই বলছেন, আপনারা ধর্মের দুটি কথা বলুন। নজন যোগীই পৃথক ভাবে নিজের নিজের উত্তর দিয়ে গেছেন। নজন যোগীর কথা বলা সম্ভব নয়, তাই আমরা কয়েকজন যোগীর কথাই বলছি।

নিমি রাজা প্রথম যোগীশ্বর, যাঁর নাম কবি, তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, আত্যন্তিক ক্ষেম কি? ক্ষেম মানে রক্ষণ করা আর যোগ মানে একটা জিনিসকে পাওয়া আর সেই জিনিসটাকে ধরে রাখাকে বলে ক্ষেম। জগতের যে কোন জিনিস, টাকা-পয়সা, মান-সম্মান পাওয়া তেমন কঠিন নয়, কিন্তু ওটাকে ধরে রাখা খুব কঠিন। আত্যন্তিক ক্ষেম, যেটাতে সব থেকে শুভ হয় অর্থাৎ জিনিসটা যদি থাকে আর দিনে দিনে তার বৃদ্ধি হয় তবেই সেটাতে মঙ্গল। আত্যন্তিক ক্ষেম কি বলতে গিয়ে প্রথম যোগীশ্বর বলছেন *মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্। উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ।।১১/২/৩৩।।* ঈশ্বরের ভক্ত জানেন আমার হৃদয়ে ভগবানের নিরন্তর বাস, সেইজন্য তাঁর ভগবানের নিত্যনিরন্তর উপাসনা চলতে থাকে, এটাই আত্যন্তিক ক্ষেম। হৃদয়স্থ ঈশ্বরের নিত্যনিরন্তর উপাসনাই আত্যন্তিক ক্ষেম। মানুষের শুভ এর থেকে বেশি আর কিছু হতে পারে না। ঠাকুর যখন বলছেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, এরও একই অর্থ। মানব জীবন অতি দুর্লভ, মানব জীবন পাওয়ার পর যদি ঈশ্বরের চিন্তন করে তখন এর থেকে মানবের আর ভালো কিছু হয় না। তার সাথে বলছেন, *উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ*, যাদের মধ্যে উদ্বিগ্ন আছে আর যাদের মধ্যে অসদ্বস্তুর প্রতি অহংতা মমতা আছে, যার জন্য তারা খুব কষ্ট পাচ্ছে, তারাও যদি বিচার করে আস্তে আস্তে তাদের এই উদ্বিগ্নতা আর অহংতা মমতা কমে যায়। বলছেন যদি নিত্যনিরন্তর ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। কোন ঈশ্বরের, বেলুড় মঠের মন্দিরে যে ঠাকুর বসে আছেন সেই ঠাকুরের? না সেই ঠাকুরের না, যে ঠাকুর আমার হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান, তাঁর যদি উপাসনা করা হয় তখন মন ধীরে ধীরে নির্মল হয়ে যায়। মনের মধ্যে যে নানান রকমের উদ্বেগ চলছে, গীতায় বলছেন *আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ*, আশা পাশের বন্ধন সবাইকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে, এগুলো আস্তে আস্তে সত্যিই কমে যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের সাধনা কি রকম? একজন লোক মাথায় ধামাতে খই নিয়ে যাচ্ছিল। কিছু খই বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। যে খইগুলো উড়ে যাচ্ছে সেগুলো তার কাছে ক্ষতি। বাতাসে উড়ে কোথায় ছড়িয়ে যাচ্ছে সেগুলো আর কুড়িয়ে আনা যাবে না। তখন সে খালি বলে যাচ্ছে 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'। পুরো খইকেই যদি গোবিন্দায় নমঃ করে দেয় তাহলে সবাই প্রসাদ বলে খাইয়ে দিতে হবে, লাভ কিছুই থাকবে না। আর যে খই উড়ে যাচ্ছে সেগুলোকে তো তুলতে পারবে না, সেইজন্য বলছে উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। আমাদের পুরো সাধনা হল 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ'। ছেড়া ফাটা যে নোটগুলোকে চালাতে পারবে না সেগুলো ঠাকুরের প্রণামী বাক্সে যাবে, সব থেকে সস্তার ফল, সস্তার সন্দেশ ঠাকুরের ভোগে দেবে, সব থেকে সস্তার ধুতি গুরুপ্রণামে দেবে। এরপর ঠাকুরকে গিয়ে বলবে, ঠাকুর তুমি আমাদের দেখ, আমি যেন ভালো থাকি, আমার ছেলেমেয়েরা যেন ভালো থাকে, আমাদের যেন কোন অসুখবিসুখ না হয় ইত্যাদি। ঠাকুরের মত আহাম্মক তো আর কেউ নেই তিনি শুধু আমাদের ঝামেলা গুলো মেটাতে থাকবেন। নিত্যনিরন্তর উপাসনা যদি হয় তাতেও মানুষ কি ফল পায়? উদ্বিগ্নটা শুধু চলে যায়, তাছাড়া আর কিছু হয় না। শাস্ত্রে কোথাও বলছে না যে ঈশ্বরের নাম করলে দুটো টাকা-পয়সা হবে, সব ঝামেলা মিটে যাবে। গীতায় বলছেন, আর্ত, অর্থার্থি, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী এই চার ধরণের মানুষ ভগবানের চিন্তন করে, কিন্তু বলছেন না যে তাদের বিরাট কিছু হয়ে যাবয়ে। তবে যাদের মনের স্থিতি আছে তাদের কাজের ক্ষমতাটা অনেক বেড়ে যায়, তাতে তার কিছু হলেও হতে পারে। ঠাকুর সাধনা করলেন, সিদ্ধ হলেন, স্বামীজী সাধনা করলেন, তিনিও সিদ্ধ হলেন, আজ বেলুড়ে মন্দির হয়েছে, কত লোক আসছে তাতে বেলুড়ের লোকেদের কত স্বাচ্ছন্দ এসেছে। মুরিওয়ালা থেকে শুরু করে চাওয়ালা সবাই এখানে বসে রোজগার করছে। যার মনের একটা সাম্য অবস্থা এসে গেছে, স্থিতি এসে গেছে, এবার জাগতিক নিয়মেই তার আশাপাশে অনেক কিছুই শুভ হয়ে যাবে, এর সাথে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। আর সাধারণ মানুষ কখনই ধর্মের কাজ করতে চাইবে না, সেইজন্য প্রলোভন দিয়ে তাকে বলা

হয়, তোমার চাকরি হচ্ছে না, ভগবানের নাম কর হয়ে যাবে। যাদের মধ্যে ভক্তি সুপ্ত ছিল সেই ভক্তিটা তাদের জেগে গেল। এখানে এটাই বলছেন, আত্যন্তিক ক্ষেম, মানুষের জন্য যেটা সব থেকে শুভ, তাদের জন্য এর থেকে শুভ কিছু হয় না। আধ্যাত্মিক ক্ষেম হল নিজের মন বুদ্ধিকে ঠিক করে রাখা। কিভাবে ঠিক করে রাখে? মনে কোন আবেগকে জমতে দেওয়া যাবে না, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, উদ্বেগ কোনটাই না। এর সব কটিকেই আটকে দেওয়া যায় মানুষ যদি ঈশ্বর চিন্তন করে। এখন সে জপ দিয়েই ঈশ্বর চিন্তন করুক, ধ্যান দিয়েই ঈশ্বর চিন্তন করুক আর পূজন দিয়েই করুক। একমাত্র কাজ শুধু ঈশ্বর চিন্তন, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া আর কিছুর জন্য চিন্তন থাকবে না। টাকা-পয়সা সব কিছুরই দরকার আছে, কিন্তু একবার এই পথে নেমে দেখুক, মন থেকে উদ্বেগকে নামিয়ে দেখুক, তখন জগতের সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যাবে। জাগতিক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছুরই প্রতি নিষ্ঠা আছে, এই নিষ্ঠাটাই যদি একটু ঈশ্বরের প্রতি দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে জীবনে শান্তি আসবে, এটাই পরম মঙ্গল, এটাই আত্যন্তিক ক্ষেম।

প্রথম যোগীশ্বর আরও বলছেন *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীসাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।১১/২/৩৭।।* যারা ঈশ্বর থেকে বিমুখ হয়ে যায়, ঈশ্বর চিন্তন যদি না করে, তখন সব থেকে বড় যে ক্ষতি হয় তা হল, নিজের যে স্বরূপ সেই স্বরূপের বিস্মৃতি হয়ে যায়। প্রথমটা বললেন, ঈশ্বরের নিত্যনিরন্তর উপাসনা করার কথা। দ্বিতীয় বলছেন, উপাসনা না করলে মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলে যায়। আর যখন নিজের স্বরূপ ভুলে যায় তখন বিপর্যয় হয়ে যায়। বিপর্যয় মানে, মিথ্যা জ্ঞান, তার মধ্যে ভুল জ্ঞান এসে যায়। আমার স্বরূপ হল ঈশ্বর, আমার বাস্তবিক স্বরূপ ঠাকুর। ঠাকুরই একটা খোলসকে ধারণ করে নিজে ভিতরে বিরাজমান। সন্তান রূপে, দাস রূপে বা যে কোন রূপ যেটা আমার ভালো লাগে সেই রূপ দিয়ে আমি ঠাকুরের সাথে এক। কিন্তু ঈশ্বরের সত্তা তো সংসারী লোক হবে না, মানুষ তো কখন বেড়ালের বাচ্চাকে জন্ম দেবে না, মানুষকেই জন্ম দেব। তাহলে ঈশ্বরের সন্তান তো ঈশ্বরই হবে, না হয় ছোট ঈশ্বর হবে। কিন্তু ঈশ্বরের আর ছোট ঈশ্বর বড় ঈশ্বর হয় না, চৈতন্য পুরুষ হয়। এই কথা সব শাস্ত্রেই বলছেন। কিন্তু আমাদের কি কখন মনে হয় যে আমি ঈশ্বরের সন্তান? আমাদের মধ্যেই কেউই নেই যে, যে একটি বারের জন্যও বলিনি আমি ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান তো মানুষ হবে না, ঈশ্বরের সন্তান ঈশ্বরই হবে। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি কারণ আমাদের নিত্যনিরন্তর উপাসনা নেই বলে সেই স্মৃতি হারিয়ে গিয়ে বলছি আমি মানব সন্তান। এটাই বিপর্যয়, মানে মিথ্যা জ্ঞান হয়ে যায়। মিথ্যা জ্ঞানে মনে হয় আমি মানুষ, আমি এই দেহ, এটা আমার, সে আমার প্রিয়, ও আমার শত্রু। এটাই এর আগে আগে বিচার নিয়ে বলার সময় বলা হয়েছিল, we are three dimensional representation of bundle of ideas আর সেখান থেকে আরেকটা হল ভাব, যেটা সত্য। সত্য হল আমি ঈশ্বরের সাথে এক, বিচার হল আমি দেহ, ইন্দ্রিয় সুখেই আমার সুখ, যাকে ভালোবাসি তার সুখেই আমার সুখ। এই বিস্মৃতি যেই এসে গেল, দুঃখের সাগরে ভেসে গেল, আর দুঃখের শেষ থাকবে না। সেইজন্য সেটাতে যদি আমার অনেক পতন হয়ে গিয়েও থাকে, তাহলেও যে মুহূর্তে আমি ভাবতে শুরু করব, *অহমেবাসমেবাগ্রে*, চতুঃশ্লোকী ভাগবতে যেখানে বলছেন, আমিই আছি, আমিই ছিলাম, আমিই থাকব বা এই দুটি কথা যেটাকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, নিত্যনিরন্তর ঈশ্বরের চিন্তন করলে অবসাদ কেটে যায় আর নিত্যনিরন্তর চিন্তনটা না রাখলেই আসক্তিটা দেহ আর গেহতে গিয়ে আটকে যায় আর ওতেই তন্ময় হয়ে যায়।

মানুষ যখন কোন কিছুতে তন্ময় হয়ে যায় তখন তার আশেপাশের কোন কিছুতেই হুঁশ থাকে না। ঠাকুর হলধারীর বাবার ব্যাপারে বলছেন, রামলীলা চলছিল, যাত্রা দেখতে দেখতে এত তন্ময় হয়ে গেছেন যে, কৈকেয়ীকে দেখে ওখানেই খড়ম দিয়ে মারতে গেছেন, তাকে আর আটকানো যাচ্ছিল না। ঠাকুরের নিজেরও তাই ছিল, তিনিও সব কিছুতে তন্ময় হয়ে যেতেন। আমরা কি তন্ময় হতে পারি? আমরা সব সময় তন্ময় হয়ে রয়েছি। ঠাকুরও তন্ময় হয়ে আছেন আর আমরাও সবাই তন্ময় হয়ে আছি, শুধু ঠাকুর ভাবে আর আমরা অভাবে। ঠাকুরের ঈশ্বরের প্রতি যে আসক্তি ঐ একই আসক্তি আমাদের শরীরের প্রতি আর ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি। এতে অসুবিধার কি আছে? কোন অসুবিধা নেই, শুধু তন্ময় হওয়ার যে ফলগুলো হয়, যেমন হলধারীর বাবা

এমন তন্ময় যে কৈকেয়ীকে খড়ম দিয়ে মারতে গেলেন। আমাদেরও একই জিনিস হয়, ছোটবেলায় স্কুলের ভয়, পড়াশোনার ভয়, যৌবনে অন্যান্য সমস্যা, বলদের মত খাটতে হয় আর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তো হয়েই গেল, জরা-ব্যাধি নিয়ে পড়ে আছে, তীর্থের কাকের মত পড়ে আছে বৌমা কখন একটু চা দেবে, রুটি দেবে। নিজের শরীরে আমরা এমন তন্ময় হয়ে আছি, নিজের পারিপার্শ্বিক সব কিছুতে, যা কিছু হচ্ছে ওটার সাথে তন্ময় হয়ে আছি। এগুলো শুধু শুনলে বোঝা যায় না, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। শাস্ত্র বার বার বলছেন, অবতার পুরুষরা বার বার এসে বলে যাচ্ছেন, ঋষিরা বলছেন তুমি চৈতন্য স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপের কাছে জগতের সব কিছু দৃশ্যের মত। সিনেমার পর্দায় যেমন দৃশ্য ভেসে ভেসে আসে, ঠিক তেমনি আমাদের এই শরীর, আমাদের যে বিভিন্ন অবস্থা, আমাদের মনের যত আবেগ এগুলো সব সিনেমার দৃশ্যের মত। আর আমরা সবাই ঐ দৃশ্যে তন্ময় হয়ে গেছি। এটাকে একদিনে কাটানো যাবে না, সবাই এই কথা বলছেন, কিন্তু কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। শুরুটা কিভাবে করা হবে? গুরু বলে দিয়েছেন জপধ্যান করতে, কিন্তু জপে কিছু হয় না, জপ হল ধীরে ধীরে নিজের ইষ্টের সাথে পরিচিত হওয়া, ইনিই আমার ইষ্ট। এরপর এটাকে বোধ করতে হয় যে, তিনি সৃষ্টির আগেও ছিলেন, সৃষ্টির পরেও থাকবেন আর সৃষ্টির মাঝখানেও তিনিই আছেন, তিনিই আমার স্বরূপ। ওখান থেকে ধীরে ধীরে এগোনটা শুরু হয়।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ, অভিনেবেশ মানে মানুষ কখনই মরতে চায় না। আর বলছেন *ঈশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ*, স্মৃতির বিপর্যয় হয়ে যায়। কখন বিপর্যয় হয়ে যায়? *ঈশাদপেতস্য*, ঈশ্বরকে যদি নিত্যনিরন্তর মনে না রাখা হয়, তার থেকে অভিনিবেশ আসে, নিজের শরীরের প্রতি আসক্তি, সেখান থেকে আসে ভয়। হুট্ করে একদিনে তো এই অভিনিবেশ, ভয়, আসক্তি এগুলোকে কাটানো যাবে না। তাই নিজের যিনি গুরু, যে কোন গুরু, যিনি মন্ত্র দিয়েছেন বা যাঁর কাছে আধ্যাত্মিক রাজ্যের খবর জানা গেছে, সেই গুরুকে পরমেশ্বর জ্ঞানে দেখা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র নিয়েছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে কি বুঝবেন! কেন, তাঁর মুর্তি আছে। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করলে ঐ মুর্তিরই কথা আসবে, কিন্তু যদি জীবন্ত গুরু থেকে শুরু করা হয় আর জীবন্ত গুরু থেকে ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে যাওয়া হয় তখন সেটা অনেক সহজ পথ হয়ে যায়। আর ভগবানই সব কিছু হয়েছেন, তাহলে ভগবান তো গুরুও হয়েছেন। সেইজন্য বলছেন *গুরুদেবতাত্মা*, গুরুকেই যদি ভক্তিপূর্বক আরাধনা করা হয়, সেখান থেকেই শুরু হয়ে ধীরে ধীরে আসক্তিটা কমে যায়। বাড়িতে ভালো যা কিছু হল, গুরুকে এনে নিবেদন করা হল, কোন শুভ কিছু হল গুরুর কথা মনে পড়ল। গুরু জীবন্ত কিনা, এই দৃষ্টি নিয়ে চললে তাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে। যাঁরা মঠের দীক্ষিত তাঁদের কত সৌভাগ্য, কারণ রামকৃষ্ণ মিশনের গুরু মানে তো প্রেসিডেন্ট মহারাজ নন, এখানে সজ্ঝই গুরু, যিনি প্রেসিডেন্ট তিনিই সবার গুরু, যিনি সন্ন্যাসী তিনিই সবার গুরু। কোন সন্ন্যাসীকে যদি কেউ ভালোবাসে তিনিই তখন তার গুরু। সে এখন ভালো-মন্দ যা কিছু করছে তাঁর কথা ভাবছে। এবার কিন্তু তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে শুরু হয়েছে। ভালোবাসা দুই রকমের হয়, একটা হল ভালোবাসা আরেকটা হয় পূজা। ভালোবাসা আর পূজা দুটো প্রায় একই। ভালোবাসাতে কি হয়, আমি যাকে ভালোবাসি সে যেন শুধু আমার জন্যই থাকে, আমাকেই যেন তাঁর সময় দেন, এই ভাবটা থাকে। এটা ভুল কিছু না, মানুষ মাত্রই চায় যে ইনি আমার জন্যই থাকবেন। পূজোতে কি হয়, তুমি সবারই জন্য আছ আমার জন্যও আছ। এখানে প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলুন, সন্ন্যাসী বলুন সবাইকে দেবতা বুদ্ধিতে পূজোর ভাব নিয়ে ভালোবাসতে হয়। যোগীশ্বর এটাই বলছেন, কার উপর এই দেবতা বুদ্ধি নিয়ে যাচ্ছে এটা কোন ব্যাপার নয়, যিনি মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছেন, যিনি অধ্যাত্ম বিদ্যা দিয়েছেন, কোন একজনকে, যাঁকে ভালো লাগছে, তাঁকে যদি দেবতা বুদ্ধিতে দেখা হয়, তখন আসক্তিগুলো কমতে শুরু করে।

আরেকটি শ্লোকে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে। গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।।১১/২/৩৯।।* পর পর কয়েকটি শ্লোকে, বিশেষ করে উনচল্লিশ আর চল্লিশ নম্বর শ্লোকের যে ভাব, এই ভাবের প্রতিফলন আমরা কথামৃতেও পাই। ঠাকুর খুব মন দিয়ে ভাগবত শুনতেন। এই শ্লোকে বলছেন, এই জগতে ঈশ্বরের অনেক কাহিনী আছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, তাঁর কত লীলার কথা, শ্রীরামের কথা, ঠাকুরের কথা আর শিবের কাহিনী, বিষ্ণুর কাহিনী,

পুরাণ এইজন্যই রচিত হয়েছে যাতে ঈশ্বরের অনেক কাহিনী থাকে। *জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে*, তাঁর জন্ম, কর্ম সবটাই দিব্য আর সব লোকেই এই ধরণের প্রচুর কথা আছে। এগুলোকে কি করতে হয়? *গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ*, যত রকমের ঈশ্বরের নাম, আর সেই নামের যে অর্থ, তাঁর লীলাকাহিনী, *বিলজ্জো*, লজ্জা ত্যাগ করে, ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের নামে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় করতে নেই, ভগবানের নাম করবে, শ্রবণ কীর্তন করবে তাতে লজ্জা সঙ্কোচ কিসের! ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হয়ে থাকবে, তাঁর নামগুণগান করবে আর এইভাবে থেকে কোন কিছুর প্রতি, কোন বিশেষ ব্যক্তি, কোন বিশেষ বস্তু ও কোন বিশেষ স্থানের উপর আসক্তি না রেখে অনাসক্ত জীবনযাপন করবে, এতেই তার মঙ্গল। আর তার সাথে *এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জ্ঞাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।১১/২/৪০।।* প্রথমে বলেছিলেন, তোমার মনে উদ্বিগ্ন আছে, রাগদ্বেষ আছে, এগুলোকে কাটাতে নিত্যনিরন্তর ঈশ্বরের চিন্তন কর আর যদি না কর তাহলে তোমার দেহ গেহতে আসক্তি হয়ে যাবে, তুমি সারা জীবন কাঁদতেই থাকবে। যদি তোমার এর থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছে হয় তাহলে প্রথমে একজন গুরুকে অবলম্বন কর, গুরুকে দেবতার বুদ্ধিতে চিন্তন করে করে মনটাকে ঐদিকে নিয়ে যাও, তারপর ঈশ্বরের উপর যে এত কথা, কাহিনী আছে সেগুলোকে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করে শ্রবণ মনন কর আর অপরকেও শোনাও। এই করতে করতে তোমার নামকীর্তনের প্রতি অনুরাগ জন্মাবে। নাম করতে করতে নামে রুচি আসবে, নামে রুচি আসা মানে এবার ঈশ্বরের প্রতিও অনুরাগ আসবে। আমরা বলি বটে love at first sight কিন্তু love at first sight কখনই হয় না, love at first sight সব সময়ই গোলমেলে ব্যাপার। কিন্তু ভালোবাসাটা যদি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে এবার তার প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হল। ভগবানের নামের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা নাম নিয়ে যাচ্ছে, ওতে কিছুই হবে না, যেমন শুষ্ক ছিল তেমন শুষ্কই থেকে যাবে। কিন্তু যখন ঈশ্বরীয় কথা শুনছে, ভাবছে, বিচার করছে তারপর হঠাৎ একদিন দেখল নামের প্রতি ভালোবাসা জেগে গেল। নামের প্রতি ভালোবাসা জেগে গেলে জীবনটাই তখন অন্য রকম হয়ে যাবে। *জ্ঞাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ*, যখন এই রকম হয়ে গেল তখন সে তার আশেপাশের লোকেদের থেকে উপরে উঠে যায়, সে আর সাধারণ লোক থাকল না। নামে রুচি মানে ঈশ্বরের নামের প্রতি ভালোবাসা জন্মে গেছে। শুধু জপ করে গেলেই যে নামে রুচি আসবে, তাঁর অর্থের প্রতি আস্থা এসে যাবে তা হয় না। কিন্তু করতে করতে কখন যে হয়ে যাবে তার ঠিক নেই। বৈধী ভক্তি করতে করতে কখন যে সেই ভক্তি প্রেমা ভক্তিতে চলে যাবে কেউ বলতে পারবে না। যখন হয়ে যাবে তখন কি হবে? *হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ*, কখনো সে উচ্চ হাস্য করতে থাকবে, দম্ভপূর্বক নয়, স্বভাবেই মত্ত হয়ে ভেতর থেকে হাসি বেরিয়ে আসতে থাকে আবার কখন হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দেবে। আবার কখনো জোর গলায় ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করে দেবে আবার কখন সে মধুর স্বরে তাঁরা নামগুণকীর্তনে তন্ময় হয়ে যাবে। আবার কখনো তার প্রিয়তম ঈশ্বরের রূপ দর্শন করে তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্য নৃত্য পরায়ণ হয়ে পরে। আর যারা তার কাছাকাছি থাকবে তাদের সব শুভ হয়ে যাবে। চৈতন্যের চিন্তন মানুষকে অমর করে দেয়, তার আশেপাশে যারা থাকবে তারাও শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, নিজেদের ধন্য মনে করে।

আবার বলছেন, *খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ।।১১/২/৪১।।* এই যা কিছু আছে, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, অগ্নি, জল, পাহাড়, নদী সব কিছুকে তখন ভগবানের শরীর বলে বোধ হয়। বেদের পুরুষসূক্তমেও ঠিক এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি দেখেন এই সব কিছু ভগবানেরই রূপ, আকাশে তারার রূপে, মানুষ রূপে, এই মাইক্রোফোন রূপে ভগবানই আমার সামনে আসছেন, তাই তিনি সবাইকে ভগবান রূপে প্রণাম করেন। এর মধ্যে কোন ঢং ঢাং থাকে না, এটা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই এসে যায়। আর বলছেন, *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।১১/২/৪২।।* মানুষ যখন খাওয়া-দাওয়া করে তখন তার তিনটে জিনিস একসাথে হয়, তুষ্টি, পুষ্টি আর ক্ষুধা নিবৃত্তি। খাওয়া-দাওয়া করলে মানুষের মনে একটা সন্তুষ্টির ভাব হয়, তার শরীরের পুষ্টি

হয় আর ক্ষুধা নিবারণ হয়, এই তিনটে একই সাথে হয়। ঠিক তেমনি, মানুষ যখন ভগবানকে ভালোবাসে, তাঁর নামের প্রতি যখন রুচি হয় তখন তারও তিনটে জিনিস হয়, ভগবানের প্রতি প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়, ভগবানের স্বরূপের অনুভব হয় আর প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তুর প্রতি বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয়। এই হল প্রথম যোগীশ্বর নিমি রাজাকে যে উত্তর দিলেন। পরের যোগীশ্বর বলবেন ভক্ত কাকে বলে, আর যাঁরা উত্তম ভক্ত তাঁদের চরিত্র, তাঁদের ব্যক্তিত্ব কি রকম। নিমি রাজা দ্বিতীয় যোগীশ্বর, যাঁর নাম হরি, তাঁকে প্রশ্ন করছেন –

অথ ভাগবতং ব্রুত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্। যথা চরতি যদ্ ব্রুতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ।। ১১/২/৪৪।। রাজা নিমি প্রশ্ন করছেন, আপনি অনুগ্রহ করে ভগবদ্ভকের লক্ষণগুলি বলুন, তাঁর ধর্ম কি, স্বভাব কেমন, তাঁর আচরণ কেমন, তিনি যখন কথা বলেন তখন কী কথা বলেন আর কোন লক্ষণের জন্য তিনি ভগবানের প্রিয়পাত্র হন? গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ করে তেরো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত একজন উত্তম ভক্তের চরিত্র কেমন হয় সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একই জিনিস এখানেও আলোচনা করছেন, তবে অন্য ধরণের। পয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ আর সাতচল্লিশ এই তিনটে শ্লোকে যোগীশ্বর উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত আর সাধারণ ভক্তকে নিয়ে আলোচনা করছেন। যখনই কিছু বলা হয় তখন শ্রেষ্ঠ থেকে শুরু করা হয়, অনেক সময় দেখা যায় সাধারণ থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এটাকে বলে অরুন্ধতি ন্যায়, মূল জিনিসে যাওয়ার আগে তার থেকে সাধারণ জিনিসকে ধরবে, স্থূল থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের যে পরম্পরা তাতে মূল কথা আগেই বলে দেন, তারপর ওখান থেকে তার আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলোকে নিয়ে বলতে থাকেন। যোগশাস্ত্র প্রথমেই বলে দিচ্ছে *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*, যোগ মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, শেষ কথা প্রথমেই বলে দেওয়া হল। এবার তোমার যদি আগ্রহ হয় তাহলে বাকিটা শোন, আর আগ্রহ না থাকলে শুনতে হবে না। গীতাতেও প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে উচ্চতম আদর্শকে রেখে দিলেন। উচ্চতম আদর্শ দেওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন অর্জুন ধরতে পারছে না, তখন আরেকটু নীচে থেকে শুরু করলেন। ঈশোপনিষদেও শুরুই হয় ঈশাবাস্যমিদং সর্বং দিয়ে, প্রথমেই শেষ কথা বলে দিলেন। যোগীশ্বরও প্রথমে উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলছেন –

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।১১/২/৪৫।। ভগবানের ভক্তকে এখানে ভাগবত বলছেন, যিনি ভক্ত তাঁকে ভাগবত বলা হচ্ছে। *সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ*, যিনি সর্বভূতে দেখছেন ঈশ্বরই আছেন, সেই ঈশ্বর যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক তিনি তাঁর নিজের আত্মা রূপেও দেখছেন। ভাষ্যকাররা বলছেন, একমাত্র তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, এই ভাবকে বজায় রেখে জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন। গীতায় ভগবান বলছেন *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।* কিন্তু ভগবান বলছেন জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। যিনি ঠিক ঠিক জ্ঞানী তিনিই একমাত্র ভগবানের ভক্ত হন। আচার্য বার বার বলছেন জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি না হওয়ার অর্থ কি? আসলে অজ্ঞানটাই বন্ধন, সেখানে ঈশ্বরে ভক্তি করলে কি করে মুক্তি হবে ভাবছেন! আমরা যেটা সাধন করছি সিদ্ধিও সেটাই হবে। যিনি ঠাকুরকে ভগবান বলে মানছেন, জানছেন, ঠাকুর রূপে সাধনা করে যাচ্ছেন, তারপরে দেখবেন ঠাকুরই সব হয়ে আছেন, তাছাড়া আর কিছু নেই। বেদান্তে ঠিক ঠিক জ্ঞান বলতে বোঝায় আত্মাই আছেন। এখন বলা হয়, তিনি চাইলে ভক্তকে তাঁর স্বরূপ জানিয়ে দিতে পারেন, এগুলো তাত্ত্বিক ব্যাপার, আমাদের এর মধ্যে নেমে লাভ নেই। কিন্তু যদি বিচার করতে নামে, তখন দেখবে আত্মা আর ঠাকুরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এখানে এটাই বলছেন, আমাদের ভেতরে আত্মা যিনি আছেন, যাঁর সাধনা আমরা করছি, যখন কেউ জপধ্যান করে, সাধনা করে যখন ধ্যানের গভীরে যায় তখন তিনি নিজের ভেতরে চৈতন্য জ্যোতির দর্শন করেন। এই জিনিসগুলো ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যত দিন ধারণা না হয় তত দিন শাস্ত্রও বুঝতে পারব না। সেইজন্য আমাদের লেগে থাকতে হয়। কোন কিছু জানার ব্যাপারে দুটি জিনিস লাগে, একটা হল জ্ঞাতা, যিনি জানছেন আর আরেকটি হল জ্ঞেয়, যেটাকে জানা হয়। আমি এখন মনে করছি আমি জ্ঞাতা আর এই জগতটা আমার জ্ঞেয়, সেইজন্য আমি জানি আমি আলাদা জগৎ আলাদা। এখানে আমাদের কারুর কোন সন্দেহ নেই। ভালোবাসায় বলে আমি আর তুমি কি আলাদা, তোমার

আমার ভেদ মিটে গেছে। এগুলো সব মুখের কথা, একটু স্বার্থে ঘা লাগুক সব ভেদ উড়ে গিয়ে আমি তুমি এসে যাবে। আমি তোমাকে দেখছি, আমি তোমাকে জানছি এই বোধ মানুষ মাত্রেই থাকে, যার জন্য আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য শুরুই করছেন এই জিনিস দিয়ে, অস্মদ্ প্রত্যয় আর যুস্মদ্ প্রত্যয় সব সময়ই থাকবে। আমি তুমি বোধ প্রত্যেকটি মানুষের থাকে, প্রত্যেকটি জীবের থাকে। একটা সাপও জানে যে ব্যাঙ আমার খাদ্য, সাপও জানে আমি নিজেকে খাবো না, সেও জানে আমি আলাদা আমার খাদ্য আলাদা। আমরা যখন জানছি আমি আলাদা আর ঐ কেঁচো আলাদা, তাহলে আমাদের সাথে কেঁচোর আর কোথায় তফাৎ থাকল! কোন তফাৎ নেই। সেও জানে আমাকে বাঁচতে হবে, সেও জানে আমাকে আহার, নিদ্রা, মৈথুনে নামতে হবে, আমরাও তাই জানি। তার বাইরে তো আর কিছু নেই, আমাদের সাথে কেঁচোর তো এমনিতে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু কোথায় তফাৎ? জ্ঞানে তফাৎ হয়ে যায়। আমাদের আমি বোধ আছে আর তার সাথে জগৎ বোধ আছে। যদি কিছু সুকৃতি থাকে, যদি কোন পূণ্য কর্ম করা থাকে, বৌদ্ধদের জাতক কাহিনীতে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, কিভাবে খুব সাধারণ স্তর থেকে সংগ্রাম করে করে জীবাত্মা উপরের দিকে যেতে থাকে। একটু একটু করে সুকৃতি জমতে থাকে, সেখান থেকে সে ব্রাহ্মণ হয় জন্ম নিচ্ছে, ভিক্ষু হচ্ছে, তারপর এইভাবে শেষে ভগবান বুদ্ধ হয়ে জন্মাচ্ছেন, তারপর তাঁর মুক্তি হয়ে যাচ্ছে। কিছু সুকৃতি থাকলে মানুষ ধর্ম পথে আসে, তখন সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে দেখা হয়। সুকৃতি যদি আরও ভালো হয় তখন সে আরও বড় মহাত্মার কাছে যাবে। তখন তার শাস্ত্রের কথা শোনার সুযোগ আসে, শাস্ত্র শুনতে শুনতে জানার আগ্রহ হয়। যার একটু আগ্রহ এসে গেল, আমাকে জানতে হবে এর মধ্যে কি আছে, সে এবার এক সাজ্ঞাতিক লোক হয়ে গেল। যেমন একটা পাখির শাবক মাটি ছেড়ে উড়তে শিখে গেল তার থাকটাই পুরো পাল্টে গেল। যাদের শাস্ত্রের কথা শুনতে ভালো লাগছে, তার থাকটাই পাল্টে গেছে। আমরা নিজেদেরকে ভুলিয়ে রেখেছি যে আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। আমরা বলি বটে যে, আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, কিন্তু কিছুই বিশ্বাস নেই। ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়ে গেলে কি জীবন আর এই রকম চলবে? ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়ে গেলে জীবন অন্য রকম হয়ে যাবে। তখন ধ্যান ধারণা হবে, ঐ যে ধ্যান ধারণা হবে তখন ওর টাইপটাই পুরো আলাদা হয়ে যায়। যার হয় সে নিজেই তখন বুঝতে পারবে। ঠাকুর বলছেন, একজন সদ্য বিবাহিতা মেয়েকে তারই এক কুমারী বন্ধু জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁরে স্বামী সুখ কেমন? বিবাহিতা মেয়েটি বলছে, তোর বিয়ে হোক তখন তুইও বুঝতে পারবি। ঐ ভক্তিটা কেমন, যখন হবে তখন বুঝতে পারবে, অন্যকে কেউ বোঝাতে পারবে না। ততক্ষণ তুমি লেগে থাক, খুব করে সাজগোজ করতে থাক, যেদিন তোমাকে কারুর পছন্দ হবে, বিয়ে করবে তখন বুঝবে স্বামী সুখ কাকে বলে। এছাড়া আর কোন গতি নেই, শুনে যেতে হবে। কিন্তু যেদিন কেউ বুঝে যাবে, আরে তাই তো এগুলো সব সত্য, তখন সে সব কিছু বন্ধ করে ঠাকুরের নাম-ধ্যানে নেমে পড়বে। নাম-ধ্যান করতে করতে মন এবার একাগ্র হতে শুরু হবে। মনের একাগ্রতা একটা স্তরে যেই চলে যাবে তখন সে যাঁর উপরই ধ্যান করে থাকুক, তখন সেটা আর পুত্তলিকা বা ছবি হয়ে থাকবে না, তখন পুরোপুরি সজীব আর জ্যোতির্ময় দেখবে। জ্যোতির্ময় বললে আমরা সব সময় জাগতিক আলোর কথা ভাবি, কিন্তু এই আলো জাগতিক আলো নয়, চৈতন্যময় জ্যোতি দেখে। না দেখা পর্যন্ত কারুকে বুঝিয়ে বলা যাবে না যে, এই জ্যোতির্ময় জাগতিক কোন আলো নয়। আমরা একটা মানুষকে দেখে বুঝতে পারি যে সে জীবন্ত না মৃত। একটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে আর একটা গাড়ি দৌড়াচ্ছে, আমি কি বুঝতে পারব না যে এটা ঘোড়া আর এটা গাড়ি? আমরা বুঝতে পারি একটা জীবন্ত আর একটা মেশিন। আমরা জানি এটা জাগতিক আলো, কিন্তু ধ্যানের গভীরে যে জ্যোতি দর্শন হয় সেটা আর কখনই জাগতিক আলো থাকে না।

দেখা যায় বেশির ভাগ সাধক ওখানেই থেমে যান। কিন্তু তারপরেও যাঁরা এগোতে থাকেন তাঁরা একটা অবস্থায় গিয়ে দেখেন আমার ভেতরে যে চৈতন্য এই চৈতন্য সবারই ভেতরে আছে। তখন তাঁর অনুভব হয়, এতদিন যাঁকে আমি ঈশ্বর মনে করতাম তিনি আমার ভেতরে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করছেন আর তিনিই জগতের মালিক। তিনি তিনি শব্দটা যখন বলা হচ্ছে, এই শব্দটা কিন্তু একেবারেই ভুল। প্রথম আমরা যেখানে এই আলোচনাটা শুরু করলাম, আমি আর এই জগৎ, এই দুটো আলাদা, এই জগতে যাই হয়ে যাক আমার

তাতে কিছু আসে যায় না। আমার বাড়িটা পুড়ে যায় তাতে আমার কিছু হবে না, একটু দুঃখ হয়ত হবে কিন্তু ক্ষমতা থাকলে আমি আবার একটা বাড়ি দাঁড় করিয়ে দেব। এই জগতে এমন কোন জিনিস নেই যেটা আমার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি থাকলে সব জুটে যাবে। যখন এই জ্যোতির জ্ঞান, চৈতন্যের জ্ঞান হয়, তখন সে অবাক হয়ে বলে হে ভগবান এ আমি কি করছিলাম, আমিই তো এই চৈতন্য জ্যোতি আর এই শরীরটা তো দেখছি জগতেরই একটা অংশ, বাস্তবিক তাঁরা এটাই দেখেন। একটা বাচ্চা ছেলে নিজের জামা আর নিজের মধ্যে তফাৎ করতে পারে না, ঠিক তেমনি আমরা আমার শরীর আর আমার মধ্যে তফাৎ করতে পারি না। একটা ছোট্ট শিশু নিজেকে আর তার মাকে আলাদা করতে পারে না, এক বোধ থেকে, ধীরে ধীরে বোধটা আলাদা হয়ে যায়। আমার যিনি আসল আমি, যিনি চৈতন্য, যিনি সব কিছু জানতে পারেন, যিনি সব কিছুর বোধ করেন, এই জগতকে অনুভব করছেন, যাঁর মধ্যে সব ক্ষমতা, সেটা কিন্তু এই শরীর মন নয়। কিন্তু আমরা জানি আমি শরীর, আমি মন। ধ্যানের গভীরে যখন যেতে শুরু হয়, যার বিরাট লম্বা পদ্ধতি, তখন দেখে আমি বাস্তবিক হলাম জীবাত্মা, এই জগৎ যেমন আমার কাছে বাহ্যিক বস্তু, শরীরটাও আমার কাছে বাহ্যিক বস্তু। কিন্তু পরে তিনি দেখেন সবার ভেতরেও সেই একই আত্মা।

প্রথমে দেখেন আমি চৈতন্য আর এই শরীরটা জগৎ। উত্তম ভক্ত যিনি, তিনি যখন আরও এগিয়ে যান তখন তিনি দেখেন চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই আর চৈতন্যের উপরে নামরূপের একটা মিথ্যা খেলা চলছে। ঠাকুরও বলছেন, দেখছি সবই সচ্চিদানন্দ, লেটো গালে হাত দিয়ে বসে আছে, দেখছি সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছে, লেটো ঘাড় নাড়ছে, দেখছি তিনিই ঘাড় নাড়লেন। শরীর গুলোকে দেখছি, ঢেউয়ের উপর যেন বালিশ ভাসছে। আবার বলছেন, বালিশের যেমন খোল হয় শরীরটাও সেই রকম খোল, ভেতরে তুলো ভরা। এই ধরণের অনেক উপমা আলাদা আলাদা জায়গায় ঠাকুর দিয়ে গেছেন। ঠাকুর আমাদের বোঝাতে চাইছেন, তিনি শুদ্ধ আত্মা ছাড়া কিছু দেখছেন না। আর ভালো মন্দ যা কিছু দেখছেন সবটাই দেখছেন তিনি। এটা যে কোন তাত্ত্বিক বিশ্বাস বা যুক্তিতর্ক দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান হচ্ছে তা নয়, এটাই সম্পূর্ণ উপলব্ধ সত্য, এটাই বাস্তবিক। একটা বাচ্চার কাছে জগৎ এক রকম দেখায়, বড়দের কাছে আরেক রকম দেখায় আর বৃদ্ধ লোকের কাছে জগৎ অবসাদময় মনে হয়। কিন্তু সত্য হল পরমব্রহ্ম।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্, তিনি দেখছেন তাঁর বাস্তবিক সত্তাটা নারায়ণের, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেও বাস্তবিক সত্তা নারায়ণের, সেই নারায়ণই সমস্ত জগতের নিয়ামক। তাই কোথাও তিনি উচ্চনীচ ভেদ দেখছেন না। গীতায় ভগবান বলছেন *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।* খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ যাঁর মধ্যে বিদ্যা আছে আর বিনয়ও আছে তাঁর মধ্যে যেটা দেখছেন আর হাতি, গরু, চণ্ডাল, কুকুর তাদের মধ্যেও সেই এক জিনিস দেখছেন, কোথাও কোন আলাদা কিছু নেই। গীতা উপমা দিয়ে বলছেন, উপমা নিচ্ছেন বোঝানোর জন্য। সত্যিকারের যেটা দেখেন সেটা হল সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দের মহাসমুদ্র। আর সচ্চিদানন্দের এমন শক্তি, ওটাই যেন একটা খোলস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন জল, জলের এমন একটা শক্তি, যে শক্তিতে জল কোথাও কোথাও বরফ হয়ে গেছে। আর ঐ জলেই বরফ হয়ে টাপুর টুপুর করে নড়ছে। মানুষগুলো কি, সেই সচ্চিদানন্দই কিভাবে একটা বিচিত্র পদ্ধতিতে বরফ রূপী মানুষের আকৃতি নিয়ে নেন, ওর মধ্যেই টাপুর টুপুর চলতে থাকে। মরে গেলে তার সূক্ষ্ম শরীরটা থেকে যাবে, তখনও টাপুর টুপুর করবে। সূক্ষ্ম শরীর আরেকটা স্থূল শরীর নিয়ে নেবে, তখনও টাপুর টুপুর চলবে। জ্ঞান হয়ে যাওয়া মানে পুরো বরফটা গলে আবার জল হয়ে গেল। বলছেন, যিনি ভগবান তিনি আত্মস্বরূপ, তিনিই আছেন। গানে যেমন বলা হয়, তিনিই আধার, তিনিই আধেয়, সেখানেও একই কথা বলা হচ্ছে। গান শুধু শুনে গেলে হয় না, নির্জনে নিজেকে সব কিছু থেকে আলাদা করে ধারণা করার চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে দেখছেন, বলির যে খড়্গা, যে ছাগকে বলি দেওয়া হবে, হাড়িকাঠ, যেটাতে রেখে বলি দেওয়া হবে আর বলি দেওয়াটা সবই সচ্চিদানন্দ, এরপর কে কাকে মারবে। এই একই কথা গীতায় ভগবান বলছেন, *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। কিন্তু এটা তাঁরা বাস্তবিক দেখেন তাত্ত্বিক কিছু দেখেন না, আমাদের কাছে পুরোটাই তাত্ত্বিক, আমাদের কাছে এটা একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। তাঁদের কাছে একেবারে প্রত্যক্ষ, তখন নিজের ব্যাপারেও

ওনাদের কিছু আসে যায় না। জ্ঞানীর হাত যদি কেটে যায় তাতেও তাঁর কিছু এসে যায় না। কারণ সচ্চিদানন্দকে দেখার জন্য, মন, ইন্দ্রিয় কোনটাই দরকার হয় না। যা কিছু জানার সব চৈতন্যই জানেন, আমাদের ক্ষেত্রে জানাটা হয় বুদ্ধির মাধ্যমে, কিন্তু তখনও তিনিই জানছেন, আত্মা ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন বুদ্ধির মাধ্যমে জানার ব্যাপারটা উড়ে যায়। যেমন কেউ ঘরের বাইরে আছে, আমি তার সাথে ফোনে কথা বলছি। কথা বলতে বলতে তিনি ঘরের মধ্যে এসে গেলেন, তখন ফোনে কথা বলার আর প্রয়োজন হবে না। আত্মা যদি আত্মার সাথে কথা বলেন তখন কি দিয়ে কথা বলবেন? বুদ্ধির মাধ্যমে কথা বলেন। কিন্তু যিনি আমনে সামনে হয়ে গেছেন তিনি কি দিয়ে কথা বলবেন? কোন মাধ্যমই লাগবে না। বুদ্ধি হল সেলফোন, যে রিসিভও করে আবার কথা প্রদানও করে। এগুলো উপমা, জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য বলা হল। চৈতন্যই একমাত্র জানেন, বোঝেন। যিনি আত্মা তিনিই ভগবান, তিনিই সব কিছুর ভেতরে রয়েছেন। আমি আপনি বাস্তবে তিনি, কিন্তু এই বোধ নেই বলে জগতটা চলছে। এটাই বলছেন, যিনি উত্তম ভক্ত তিনি জেনে গেছেন। জেনে গিয়ে তিনি কি করেন? কিছুই করেন না, ঐ ভাবেই থাকেন। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলতে গিয়ে ভগবান এটাই বলছেন, *প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে*, আত্মার মধ্যে আত্মা মস্ত হয়ে আছেন, তাঁর আর কিছু লাগে না। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, যে মিছরির পানা খেয়েছে তার কি আর চিটে গুড়ের পানা ভালো লাগবে! যিনি আত্মার আনন্দ পেয়ে গেছেন জগতটা তাঁর কাছে খড়কুটোর মত বোধ হয়, তখন তিনি কি আর জাগতিক কোন কিছুর সাথে নিজেকে জড়াতে চাইবেন। এরপর মধ্যম ভক্তের কথা বলছেন –

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।। ১১/২/৪৬।। সাধক জীবনে যাঁরা একটু এগিয়ে গেছেন এবার তাঁদের কথা বলছেন। আগের শ্লোকে তাঁদের কথা বলা হল, যাঁরা উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। এই অবস্থায় সবাই যেতে পারেন না, কিন্তু আমাদের সকলের উদ্দেশ্য ওই উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছান। যতক্ষণ ঐ অবস্থায় না যাবে ততক্ষণ ঈশ্বর দর্শনও হবে না, আর মুক্তিও হবে না। শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে চারটে শব্দ আছে, প্রেম, মৈত্রী, কৃপা আর উপেক্ষা আর আগের লাইনে এর বর্ণনা করছেন। মধ্যম ভক্তের মধ্যে এই চারটি ভাব থাকে। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রেম, ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। এই ভাব যখন কোন মানুষের মধ্যে প্রবল থাকে, তখন ঈশ্বরকেই সে একমাত্র ভালোবাসে, ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। মধ্যম ভক্ত ঈশ্বর ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসবে না। *তদধীনেষু*, ভগবানের যাঁরা ভক্ত তাঁদের প্রতি মৈত্রী ভাব। মধ্যম ভক্ত বন্ধুত্ব করেন তাঁর ভাবের লোক আর যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত তাঁদের সাথে। মৈত্রী মানে সঙ্গে থাকার ইচ্ছা। ইদানিং খবরের কাগজে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে, ঠাকুরের ভক্ত পরিবার। তার মানে তিনি চাইছেন, ভক্ত পরিবারের সাথেই যেন আমাদের সম্বন্ধ হয়। আর কৃপা, *বালিশেষু*, যাদের জীবনে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট চলছে তাদের প্রতি মধ্যম ভক্তের করুণার ভাব থাকে। শেষে *দ্বিষৎসু চ উপেক্ষা*, ভগবানের প্রতি যাদের দ্বেষ তাদেরকে উপেক্ষা করেন। তাদের কথা শুনবেন না, অথবা তাদেরকে এড়িয়ে চলবেন। ঠাকুর যখন ভক্তদের সাথে যেতেন তখন পাড়ার চ্যাংড়ারা বলত পরমহংসের দল চলে প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক। ওখানে কি আর করবেন, উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে। এই যে চারটে ভাব, প্রেম – ঈশ্বরের প্রতি, মৈত্রী – ঈশ্বরের ভক্তের প্রতি, কৃপা – গরীব-দুঃখীদের প্রতি আর উপেক্ষা – ঈশ্বরের প্রতি যাদের দ্বেষ। এই চারটি ভাব যদি কারুর মধ্যে থাকে, বুঝতে হবে তিনি মধ্যম ভক্ত। শুনলে মনে হয় এরাই তো উত্তম ভক্ত। কিন্তু তা না, তাহলে উত্তম ভক্ত কি করবে?

উত্তম ভক্ত ঈশ্বরে কি আর প্রেম করবেন, ঈশ্বরই তাঁকে প্রেম করেন। গীতাতেই ভগবান বলছেন *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যাতি*। আমি কি আমার হাতকে প্রেম করি? কেন প্রেম করব, হাত তো আমারই অঙ্গ, গীতাতেই আবার বলছেন, আমি তার আত্মা সে আমার আত্মা, এরপর কে কাকে ভালোবাসবেন! আপেক্ষিক ভাবে বলতে গেলে ওটাই শ্রেষ্ঠতম, ওর ধারে কাছে আর কিছু আসবে না। কারণ ভগবান ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছু নেই। উত্তম ভক্ত কখনই ভক্ত আর অভক্তের তফাৎ করবেন না। ঠাকুর বলছেন, ভক্তের গাঁজাখোড়ের স্বভাব, এক গাঁজাখোড় আরেক গাঁজাখোড়কে দেখলে কোলাকুলি করে, অন্য কাউকে দেখলে

পালিয়ে যায়। এগুলোই মধ্যম ভক্তের লক্ষণ। উত্তম ভক্তের কাছে এসব কোন ব্যাপারই না। একটা ফড়িংএর পেছনে একটা বাচ্চা কাঠি গুঁজে দিয়েছে, দেখে জ্ঞানী হাসছেন, দেখেছ! নারায়ণ নারায়ণের কী অবস্থা করেছে! ওকে যে করুণা করবেন, কোন কিছুই আর তাঁর মনে হবে না। শ্রীমা বলছেন, শরতও আমার ছেলে আমজাদও আমার ছেলে। একজন ভক্ত, আরেকজন অভক্ত, এ হিন্দু, সে মুসলমান ঐ ভেদ দৃষ্টি উত্তম ভক্তের কখনই থাকবে না। শ্রীমাকে আমরা জগজ্জননী বলতে পারি কিন্তু ভক্তির দিক থেকে শ্রীমাও ভক্ত। ঠাকুর অবতার, কিন্তু তিনিও বার বার বলছেন, আমি মা কালীর ভক্ত। ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলতে গিয়ে তাঁর তিনটি অবস্থার কথা বলছেন, অন্তরদশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা। বাহ্যদশাতে সাধারণ ভক্ত, অর্ধবাহ্যদশা যখন তখন মধ্যম ভক্ত। অন্তর্দশা হয়ে গেলে উত্তম ভক্ত। অন্তর্দশাতে যদিও সমাধিবান হন, কিন্তু অন্তর্দশার যে প্রভাব হয়, ঐ প্রভাবই উত্তম ভক্ত বানায়, তখন তিনি *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ*, নিজের আত্মাতেই তিনি হারিয়ে আছেন। অর্ধবাহ্যদশায় গান করছেন, নৃত্য করছেন। আর পুরো বাহ্যদশায় নেমে এলে তাঁর মধ্যে সাধারণ ভক্তের ব্যবহার চলতে থাকে। কিন্তু অবতার পুরুষরা বেশিক্ষণ বাহ্যদশায় থাকতে পারেন না, ঠাকুর যেমন কথায় কথায় সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। আর আমরা অর্ধবাহ্যদশাদির কথা সমাধির দৃষ্টিতে বলছি, কিন্তু তাঁর মনের অবস্থার কথা আমরা জানি না, কারণ দেখছি কথা বলতে বলতে অন্তর্দশাতে চলে যাচ্ছেন। শেষে বলছেন *দ্বিষৎসু চ*, যে ভগবানকে দ্বেষ করে তাকে উপেক্ষা করেন, তাকে এড়িয়ে চলেন। জ্ঞানী পুরুষ, যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত তাঁরা কখনই এড়িয়ে চলবেন না। জগাই মাধাইকে নিয়ে যে গান, মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে বলছেন, মেরেছিস কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না, এই ভাব প্রত্যেক জ্ঞানীর মধ্যে, প্রত্যেক উত্তম ভক্তের মধ্যে থাকবে। মহাপ্রভু যে জগাই মাধাইকে কোল দিলেন, এটা কোন কাহিনী নয়, এটাই বাস্তবিক আর প্রত্যেক জ্ঞানী ও উত্তম ভক্তের এটাই স্বভাব। পওহারি বাবার ঘরে বিষধর এসেছে, পওহারি বাবা বলছেন, আমার প্রিয়তমর দূত এসেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর দেখছেন, যেখানে পাতা ফেলা হয়েছে সেখানে কুকুরও খাচ্ছে আর জ্ঞানী সেখান থেকে নিয়ে খাচ্ছে আবার কুকুরকে জড়িয়ে ধরে খাচ্ছে। কারণ তাঁর কাছে কোন ভেদ দৃষ্টি নেই। কিন্তু মধ্যম ভক্তের এই ভেদটা থাকবে। সাধারণ ভক্তের কথা বলছেন –

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।। ১১/২/৪৭।। সাধারণ ভক্ত ভগবানের খুব ভালো করে পূজা করবে, মন্দিরে যাবে, ভোগ চড়াবে, জপধ্যান করবে কিন্তু ঠাকুরের ভক্তের বাইরে যারা সাধারণ লোক আছে তাদের সেবা, যত্ন, পূজা করবে না। ঠাকুরের তিথি পূজার দিন সকালবেলা স্নান করে মন্দিরে লাইন দিয়ে এসে মঙ্গলারতি দেখবে, সব রকম উপাচারই আছে, নিষ্ঠা নিয়ে প্রণাম করছে তার সাথে ভলেন্টিয়ারদের সাথে ঝগড়া করছে কেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে দেবে না। দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের কি ধস্তাধস্তি, সবাইকে ঠেলে নিজে এগিয়ে গিয়ে মা কালীর দর্শন করবে। মা কালীর দর্শন করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, কাঙালীরা ভিক্ষা চাইছে, তাদের বলছে, আমি কি এখানে টাকা বিলোতে এসেছি নাকি। এদের কথাই এখানে বর্ণনা করছেন। ঠাকুর বলছেন, জগতের সব সুখ কি তোমরাই ভোগ করবে, সাধুরা কি কিছুই ভোগ করবে না! লোকেদের মনে একটা ধারণা যে সাধু হয়ে গেছে ব্যস্ তার আর কিছু লাগবে না। সাধুদেরও একটা শরীর আছে, সেই শরীরের জন্যও কিছু দরকার হয়, তাদেরকে কে দেবে? কাঙালীদের কে দেবে? মুসলমানদের একেবারে কড়া নিয়ম, যা উপার্জন করবে তার আড়াই ভাগ দান করতেই হবে। হিন্দুদের অনেক উচ্চমানের ভক্ত আছেন যাঁরা উপার্জনের চার ভাগের এক ভাগ দানে দিয়ে দেবেন। এটাই এখানে বলছেন, সাধারণ ভক্ত ভক্তি খুব করবে, ঈশ্বরের কাছে যাওয়া, পূজা করা, নিয়ম মেনে উপাচারাদি পালন করা সবটাই খাঁটি, কোথাও ফাঁকিবাজি নেই, কিন্তু তার বাইরে সব ফাঁকা, না আছে সাধারণ লোকেদের প্রতি ভালোবাসা, না আছে গরীব কাঙালীদের প্রতি করুণা, না আছে সাধুদের প্রতি প্রীতি। বেশির ভাগ ভক্তই এই শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। ঠাকুরের প্রতি ভক্তি আছে ঠিকই কিন্তু তারপরে ঈশ্বরের যে সৃষ্টি, তাদেরও যে সেবা পূজার দরকার আছে, তাদের প্রতিও যে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ, এই ভাবটা নেই।

উত্তম ভক্তের আরও কয়েকটা লক্ষণের কথা বলছেন, *ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।১১/২/৫০।।* যাঁর মনে বিষয়ভোগের লালসা, কর্মপ্রবৃত্তি আর এর

মূল যে কামনা, সেই কামনার বীজটাই নষ্ট হয়ে গেছে, যিনি একমাত্র ঈশ্বরের ভাবেই বিরাজ করেন, তিনি উত্তম ভগদ্ভক্ত। আমরা যে কর্ম করি এই কর্ম অনেক প্রকারের হয়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। পূজা, অর্চনা, জপধ্যান তাছাড়া স্নান, খাওয়া এগুলো নিত্যকর্ম। বিশেষ দিনে যে পূজা অর্চনা করা হয় তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে, নিমিত্ত থেকে নৈমিত্তিক এসেছে, শ্রাদ্ধাদি কর্ম, উপনয়ন, ঠাকুরের জন্মতিথি পালন এগুলো নৈমিত্তিক কর্ম। শাস্ত্র বলছেন একমাত্র নিত্যকর্ম আর নৈমিত্তিক কর্মই করবে, এর বাইরে আর কিছু করবে না। দ্বিতীয় শ্রেনীর কর্ম হল কাম্য কর্ম, আমি জীবনে একটা কিছু চাইছি, ঐ চাওয়ার পুর্তির জন্য যে কাজগুলো করতে হচ্ছে সেগুলোকে বলছেন কাম্য কর্ম। যে ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করতে চাইছে, সন্তান চাইছে সে তাই বিবাহ করে। বিবাহকে কেউ নিত্যকর্ম রূপে নেয় না, পেছনে একটা কামনা আছে সেইজন্য বিবাহ করছে। *ন কামকর্মবীজানাং*, কাম্য কর্মের বীজটাই উত্তম ভক্তের নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর আসে নিষিদ্ধ কর্ম, শাস্ত্রে যে কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছে সেই কাজ করার কোন প্রশ্নই উঠছে না, এই কাজ করবেই না। আরেক ধরণের কর্মকে বলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, জীবনে জান্তা অজান্তায় অনেক দোষযুক্ত কর্ম করেছে, ঐ দোষ স্খালনের জন্য লোকেরা তীর্থে যায়, কিংবা বিশেষ বিশেষ দিনে উপোস করে। আমরা জানি না অজান্তায় কত কি ভুল কাজ করেছি, আগের আগের জন্মেও কত গোলমাল করেছি। হিন্দুরা বলে, এই জীবনে যদি তোমার কোন দুঃখ থাকে তাহলে তোমার এই জন্মেই হোক বা আগের আগের জন্মে হোক অনেক দোষযুক্ত কর্ম করা আছে। তোমাকে তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, সারা জীবনই প্রায়শ্চিত্ত করতে থাক। সারা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করলে শুদ্ধি হয়ে যায়। শুদ্ধি হবে কি হবে না জানা নেই, কিন্তু মন অনেক নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। ঐ নিয়ন্ত্রিত মনই আবার আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করে।

উত্তম ভক্ত চাইলেও তাঁর দ্বারা কোন কাম্য কর্ম হবে না, কারণ তাঁর কামনা-বাসনার বীজটাই পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভুর নামে বলছেন, তাঁর জিহ্বাতে চিনি রেখে বাতাস দিচ্ছেন ফুর ফুর করে চিনি উড়ে যাচ্ছে। ঠাকুর আবার বলছেন, তেঁতুলের আচারের নাম শুনলেই জিভে জল আসে, এই দেখ আমারই জিভে জল চলে এসেছে। ঠাকুরের জিভে জল আসছে মানে তিনি ভক্তদের দেখাতে চাইছেন বলে আসছে, তিনি না চাইলে আসবে না। একবার মথুরবাবুর মনে হল, ব্রহ্মচর্যটাই বাবার মাথার গণ্ডগোলের কারণ। এই সমস্যা আমাদের অনেক পুরনো সমস্যা, মাথা খারাপ হওয়ার একটা প্রধান কারণ নাকি নারীসঙ্গ না পাওয়া। বেশির ভাগ মেয়েদের মাথা খারাপ হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ পুরুষের সঙ্গ না পাওয়া। পরীক্ষা করেই এখন এই কথা বলা হচ্ছে। নিউরোলজিক্যাল ভাবে আজ প্রমাণিত যে শরীরের সম্পর্ক যদি না হয় মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। মথুরবাবুরও ঐ ভাবলেন, ঠাকুরের মাথাটা ঐ কারণেই গোলমাল করছে। মথুরবাবুও ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন কলকাতার নামকরা নর্তকীদের কাছে, সেখানে গিয়ে যদি তিনি একটু স্বাভাবিক হয়ে যান। ঠাকুরও গেছেন, না করলেন না। ঠাকুরকে যে যা করতে বলছে তাতেই তিনি রাজী হয়ে যান, কিন্তু মনটা সব সময় পুরোপুরি ঈশ্বরে। সেইজন্য নর্তকীদের দেখে ঠাকুর মা মা করতে করতে সমাধিতে চলে গেলেন। নর্তকীরা আবার মথুরবাবুর উপর চটে গেল, একজন সাধুপুরুষকে নষ্ট করার জন্য আমাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এই যে কাম্য কর্ম হবে, একটা মেয়েকে দেখে মনে যে বিকার আসবে, ঐ জিনিসটা চিরদিনের মত উত্তম ভক্তের নাশ হয়ে গেছে। কথামৃতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, দক্ষিণেশ্বরে হলধারী ঠাকুরকে বলছেন, তুই এদের এঁঠো পাতা তুললি! তোর ছেলেমেয়েদের বিয়ে হবে কি করে? ঠাকুর শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন, বেদান্ত পড়ে তোমার এই বুদ্ধি! আমার আবার ছেলেমেয়ে হবে! ঠাকুরের কি প্রখর বোধ! শুধু যে তাঁর কামের বীজ দগ্ধ হয়ে গেছে তাই না, তিনি ধরেই নিয়েছেন যে তাঁর আশেপাশে যারা শাস্ত্র পড়াশোনা করেছে তারাও এই জিনিসটা বুঝবে। হলধারী রীতিমত শাস্ত্র চর্চা করা লোক, সে বুঝছে না বলে ঠাকুরের কষ্ট হচ্ছে। *ন কামকর্মবীজানাং*, তাঁর কোন কাম্য কর্ম থাকবে না। পরমহংস, সন্ন্যাসীদের নিত্যকর্ম বলেও কিছু থাকে না, তাঁরা সব কিছুর পারে চলে যান। কাম্য কর্মটা খুব সহজে ধরা পড়ে, নিত্যকর্মটা অত ধরা পড়ে না। মাস্টারমশাই প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন, সন্ধ্যাবেলা, মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করছেন, আপনার বুঝি এখন সন্ধ্যাবন্দনার সময়। ঠাকুর তখন একটা ভাবের অবস্থা থেকে সমাধির অবস্থায় যাচ্ছেন, তিনি হাল্কা করে

বললেন, ও কিছু না। ঠাকুরের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মও খসে গেছে। আর তার সাথে বলছেন *বাসুদেবৈকনিলয়ঃ*, নিলয় মানে আশ্রয়, ভগবানই একমাত্র আশ্রয়। মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি কিছু জানি না, ঠাকুর বার বার বলছেন। যে কোন অবস্থায়, যা কিছু হয় দৌড়ে মায়ের কাছে চলে যাচ্ছেন, হাতে লেগেছে মায়ের কাছে দৌড়ে যাচ্ছেন, নরেন কি বলেছে তাতে কোন সন্দেহ হয়েছে দৌড়ে মায়ের কাছে যাচ্ছেন। যে কটি শ্লোকের এখানে আলোচনা চলছে কথামৃতে এর সবটাই আমরা প্রতিফলন পেয়ে যাব। ঠাকুরের কথা আর ভাগবতের এই ধরণের কথা কথামৃতে মিলেমিশে রয়েছে।

আবার বলছেন, *ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ। সজ্জতেহস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।।১১/২/৫১।।* ঠাকুর অনেকবার অষ্টপাশের কথা বলছেন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শীল, জাতি, কুল, মান, জুগুপ্সুতা এই জিনিসগুলো। বলছেন, যিনি ভক্ত তাঁর জন্ম, কর্ম, বর্ণ, আশ্রম, জাতি এই জিনিস গুলোর আসক্তি কেটে যায়। হৃদয়রাম ঠাকুরকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখছে ঠাকুর কাপড়চোপড় খুলে পৈতেটাকে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন। মামা এ তুমি কি করছ, পৈতেটা কেন ফেলে দিলে? ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ জাতি, কুল এই বোধ থাকে ততক্ষণ সাধনা হয় না। কাপড়টা খুলে রেখেছ কেন? দেহের সাথে বোধ থাকলেও সাধনা হয় না। এগুলো আমাকে আপনাকে করতে হবে না। ঠাকুর বলছেন, আমি ষোল আনা করেছি তোরা এক আনা কর। ঠাকুর যেটা শুনতেন সেটাকে একেবারে আক্ষরিক ভাবে পালন করতেন, একেবারে শেষ পর্যন্ত করে ছাড়তেন, কোন কিছুই বাকি রাখতেন না। সামান্য একটু অহঙ্কারও যদি থাকে, কোথাও সামান্যতম যদি আসক্তি থাকে সেখানে সম্ভব নয় যে সে ভগবানের দিকে যাবে। সেইজন্য সেটাকে একেবারে চূড়ান্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছেন, একটু যদি জাত্যাভিমান থাকে, বর্ণাশ্রমের প্রতি যদি আসক্তি থাকে আর জন্ম কর্ম এগুলোর শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিপন্য করার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে উত্তম ভক্ত কোন দিন হতে পারবে না।

আচার্য শঙ্কর কাশীতে গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছেন, চণ্ডাল মাংসের ভাড় নিয়ে আসছে দেখে আচার্য বলছেন, দূর হ অপসাররে চণ্ডাল, রে চণ্ডাল পথ থেকে দূরে সরে যা। চণ্ডাল বলছে, আমি যদি আত্মা হই তাহলে আমি কোথায় সরব আর আমি যদি দেহ হই তাহলে আমি তো জড়, জড় সরবে কি করে? এগুলো কাহিনী, বেদান্তের সিদ্ধান্ত গুলোকে বোঝানর জন্য এই গল্প গুলো লাগে। যিনি *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ*, এই শ্লোকের ভাষ্য লিখছেন আর সেখানে তিনি চণ্ডালকে বলবেন দূর হ অপসার রে চণ্ডাল! কিন্তু এই কাহিনী গুলোকে রাখতেই হয়, কারণ প্রত্যেক মানুষের জীবন মিথ্ লাগে। মিথ্ মানে কাহিনী যেটা সত্য নয় কিন্তু একেবারে যে মিথ্যা তাও না। একটা কোন নীতি বা আদর্শকে আধার করে আমরা অনেক মিথস্ তৈরী করি। ঐ মিথস্ যদি না থাকে তাহলে আমাদের জীবন চলবে না। যেমন আমি মানছি ঠাকুর অবতারবরিষ্ঠ, এটাও কিন্তু মিথ্। মিথ্ মানেই যে কাহিনী হবে তা নয়, মিথ্ মানে একটা বিশ্বাস। স্বামীজী বলে দিয়েছেন ঠাকুর অবতারবরিষ্ঠ, তাই আমার কাছে এটাই সত্য। কিন্তু যারা ঠাকুরের ব্যাপারে জানে না বা যারা কৃষ্ণ ভক্ত বা রাম ভক্ত, তাদেরকে বললে তারা আমার উপর হাসবে। মিথস্ যদি না থাকে তাহলে কেউই জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষের মিথ্ থাকে, প্রত্যেক সমাজের মিথ্ থাকে, প্রত্যেক পরিবারের মিথ্ থাকে, প্রত্যেক ধর্মের মিথ্ থাকে এমনকি প্রত্যেক দেশের তার নিজস্ব একটা মিথ্ থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক কার্ল জুং মিথের উপর অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন আর এর উপর প্রচুর বইও লিখেছেন। আচার্য শঙ্করের এই ধরণের যত কাহিনী আছে এগুলো সবই মিথস্। মিথস্ না রাখলে কাহিনী কখনই বলিষ্ঠ হবে না আর ভেতরেও ঢুকবে না। যাই হোক, এই কটি শ্লোকে বলতে চাইছেন, ভগবানের প্রিয় হওয়ার জন্য এই কটি জিনিসের দরকার। যাঁর বোধ হয়ে গেছে আমি শুদ্ধ চৈতন্য আর যা কিছু আছে যেটা বুদ্ধি গ্রাহ্য সেটাই জগৎ, যুস্মদ্ প্রত্যয়। আমার শরীরটাও বুদ্ধির গ্রাহ্য, আমার বুদ্ধিটাও বুদ্ধির গ্রাহ্য সেইজন্য এটাও যুস্মদ্ প্রত্যয়। যুস্মদ্ মানে তুমি আর অস্মদ্ মানে আমি, প্রত্যয় মানে বোধ। যুস্মদ্ প্রত্যয় মানে সংসার আর অস্মদ্ প্রত্যয় মানে আমি বোধ। এই বোধ সবারই আছে, শুধু একটা ছোট্ট তফাৎ হল অস্মদ্ বলতে আমি শরীর মনকে বুঝি। জ্ঞানী পুরুষ আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দেখেন, শুদ্ধ চৈতন্যই আমি আর এই দেহটাও যুস্মদ্ প্রত্যয়। তাই যদি হয়ে তাহলে এর কি সিদ্ধান্ত বেরোবে? তখন দেখা যাবে, এখানে উত্তম ভক্তের যা কিছু আলোচনা হচ্ছে, সবটাই নিজে থেকে

নিজের জায়গায় খাঁচে খাঁচে বসে যাচ্ছে। কারণ দেখছেন আমিই সেই শুদ্ধ চৈতন্য, চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। তখন আরেকটা জিনিস হয়, দ্বৈত ভাবটা আর থাকে না। দ্বৈত ভাব মানে, ঈশ্বর একজন আর তাঁর সৃষ্টি আরেকটা। কিন্তু ঐ অবস্থায় ঈশ্বর আলদা আর তাঁর সৃষ্টি আলাদা এই বোধটা থাকে না, তখন দেখেন ঈশ্বরই সৃষ্টি হয়েছেন। ঈশ্বরই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই দুরবস্থা কেন? তখন বলবেন মায়ার জন্য এই অবস্থা। তাহলে মায়া জিনিসটা কি, আর এই মায়ার পারে কিভাবে যাওয়া যাবে? এবার তৃতীয় যোগীশ্বর এই ব্যাপারে বলবেন।

তৃতীয় যোগীশ্বরের নাম অন্তরীক্ষ। নিমি রাজা তৃতীয় যোগীশ্বরকে প্রশ্ন করছেন, *পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্। মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ।।১১/৩/১।। পরস্য বিষ্ণোরীশস্য*, ভগবানের জন্য ‘পর’ শব্দটা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, ভাগবতেও ব্যবহার হয় আর গীতাতেও হয়। গীতা আর ভাগবতে ব্যবহার হওয়ার জন্য পুরাণ শাস্ত্রে ‘পর’ শব্দের প্রচুর ব্যবহার হয়। পর ভগবানেরই একটা নাম, পর মানে দূরে। যখন বলা হয়, তুমি পর হয়ে গেলে, তার মানে তুমি দূরের হয়ে গেলে। ভগবানকে পর বলা হয় তার কারণ, আমাদের মন যত দূর চিন্তা করতে পারে ভগবান তারও পারে। খুব সংক্ষেপে এই চিন্তা করাকে তিনটে শব্দে বলা হয়, কাল (time), মহাকাশ (space) ও কার্য (causation), যেখানেই কালের ব্যাপার আছে, যেখানেই মহাকাশের ব্যাপার আছে আর যেখানে কার্যের ব্যাপার আছে, এটাই মনের এলাকা। মন যেটাকে নিয়েই চিন্তা করুক বা ভাবুক, এই তিনটের বাইরে কখনই যেতে পারে না, এই তিনটের মধ্যেই মন আবদ্ধ থাকে। মন যখনই কোন জিনিসকে ধরে সেটাকে সে ক্রিয়ার মাধ্যমে ধরে, মন নিজেই আবার ক্রিয়াবান, মন ক্রিয়াবান তাই একমাত্র ক্রিয়াকেই মন ধরতে পারে, তার বাইরে যেতে পারে না। যখনই ক্রিয়া হবে তার জন্য একটা space লাগে, space না থাকলে ক্রিয়া হবে না, আর তার time লাগবে। কারণ ক্রিয়া মানেই এই ক্ষণ থেকে এই ক্ষণে যাচ্ছে। আমরা সময়কে ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড দিয়ে মাপি। আগেকার দিনে সেকেণ্ডের হিসাব ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঋষিরা সেকেণ্ডের ডিভিশন করে রেখেছিলেন। সেকেণ্ডের এত ডিভিশন ছিল যে, ওনারা এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগ করে দিয়েছিলেন। বিদেশীরা প্রথম এসে এইসব দেখে হাসাহাসি করত, একটা সেকেণ্ডকে যদি হাজার ভাগ করা হয় সেটা কি কাজে লাগে। কিন্তু ঋষিদের কাছে হিসাব ছিল, যেমন চোখের পাতা পড়ছে, পাতা বন্ধ হয়ে খুলতে তো এক সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগে, চোখের পাতা পড়াটাকে তো মাপতে হবে। ওনাদের সেকেণ্ডের যে সব থেকে ক্ষুদ্রাংশ ছিল সেটাকে কখন বলতেন কলা, আবার কখন বলতেন কাষ্ঠা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই বলছেন, *কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ*। কলা, কাষ্ঠা সেকেণ্ডের সব থেকে নীচে যায়, সেকেণ্ডের প্রায় হাজার ভাগ। এদিকে বিজ্ঞানে এখন ন্যানো সেকেণ্ড এসে গেছে, এক সেকেণ্ডের কত কোটি ভাগ।

যে কোন event যত fast হোক, চোখের পলক পড়া, সেটাও কালে আবদ্ধ। আবার অন্য দিকে ঋষিদের হিসেবে মানুষের একশ বছর আয়ু, সেটা হল দেবতাদের একটা দিন, এই হিসাবে দেবতাদের একশ বছর আয়ু, সেটা আবার ব্রহ্মার একটা দিন, এই ভাবে হিসাব করলে একের পিঠে তেরোটা শূন্য দিলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে সেটা হবে ব্রহ্মার আয়ু। এতে দেখানো হচ্ছে, তুমি যত দিনই বেঁচে থাকো না কেন, তুমি কালে আবদ্ধ। অন্য দিকে সময়ের সব থেকে যত ক্ষুদ্র ভাগই হোক সেটাও কালে আবদ্ধ। যেটাই কালে আবদ্ধ সেটাই মনে আবদ্ধ, যেটাই মনে আবদ্ধ সেটাই ঈশ্বরের এলাকার বাইরে। ঈশ্বরের এলাকা মানেই মনের বাইরে। কাল, space, কার্য এগুলো ভগবানের সাধারণ রূপ। গীতায় যে ভগবান অপরা প্রকৃতি বলছেন, এটাই অপরা প্রকৃতি আর ভগবানের পরা প্রকৃতি হল ভগবানের চিদানন্দ রূপ। সেইজন্য ভগবানের একটা নাম পর। গীতায় বলছেন, ভক্ত কে? যিনি *মৎচিত্ত মৎপরঃ*। সাধারণ ভাবে লোকেরা মুখে না বললেও মনে মনে জানে ভগবানই শ্রেষ্ঠ। আচার্য শঙ্কর বলছেন, একজন তরুণ একজন তরুণীতে আসক্ত, তার চিত্ত ঐ তরুণীর প্রতি লেগে আছে, কিন্তু সেও জানে ভগবান ঐ তরুণীরও উপরে, কিন্তু চিত্তটা পড়ে আছে তরুণীতে। আধ্যাত্মিক হওয়া মানেই *মৎচিত্ত* অর্থাৎ ভগবানে পুরো মন দিয়ে দেওয়া আর *মৎপরঃ*, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের উপরে আর কেউ নেই। আমাদের উল্টোটা হয়, আমরা আগে ঠাকুরের কাছে যাই, তারপর দেখি কার ক্ষমতা আছে, তারপর তার কাছে

যাই। মানুষের এটাই স্বভাব। আমরা মুখে যাই বলে থাকি না কেন, ঈশ্বরের সত্তাকে মানা আর মানার পর সেই অনুসারে জীবন চালানো অসম্ভব। যাদের প্রচুর সুকৃতি আছে তাদেরই ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা আসে, তাছাড়া ঈশ্বরে নির্ভরতা আসে না। আমাদের একটা লম্বা চাহিদার তালিকা আছে, সেই তালিকা নিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হাজির হই। এভাবে কি আধ্যাত্মিক জীবন হয়, কখনই হয় না। ঈশ্বরে যাঁর ভক্তি আছে, যিনি ঠিক ঠিক মনে করেন ঈশ্বরই পরঃ, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর শরণাগতি হবেই হবে। যার মধ্যে পূর্ণ শরণাগতি নেই, আহার, নিদ্রা, সব কিছুতেই ঈশ্বরের উপর পুরোপুরি নির্ভরতা নেই, সে এখনও আধ্যাত্মিকতা থেকে অনেক দূরে। আমাদের তো দুটি মাত্র পথ, জ্ঞানের পথ আর ভক্তির পথ। জ্ঞান পথ মানে উপনিষদে বা যোগশাস্ত্রে যে পথের কথা বলছেন, যদি ঐ পথ নেওয়া হয় তখন আমি আছি আর আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে, আমাকে জো সো করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান পেতে হবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান পেয়ে গেলে সংসারের শোক মোহ চলে যাবে। আর আমি যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য লড়াই করে যাচ্ছি বা আত্মজ্ঞানের জন্য, তখন আমার আশেপাশে আগুন জ্বলবেই, আগুন জ্বলা কখনই থামবে না।

যবে থেকে ভারতের রেকর্ডেড ইতিহাস জানা যায় ভারতবর্ষে শুধু মারামারি আর কাটাকাটিই লেগে আছে। মুসলমানরা ভারতে আসার পর থেকে কাটাকাটিটা রুটিন মাফিক হয়ে গেল। ভারতে কোন সময় ছিল আমরা শান্তিতে ছিলাম? কখনই শান্তি ছিল না। এরপর বৃটিশরা এসে দুদিক দিয়ে হিন্দুদের পিষতে থাকল আর এখন পলিটিসিয়ানরা খুনোখুনি, দুর্নীতি করে যাচ্ছে। তার মধ্যেও ভারতের আধ্যাত্মিক পুরুষদের আগমন থেমে থাকেনি, যাঁদেরকে আমরা অবতার পুরুষ বলে জানি। চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন, পরেও আসবেন। বক্তব্য হল, যে জিনিসকে যে ভালোবাসে, যেমন রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন, তাঁর আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার দিকে তাঁর মন নেই, তিনি কবিতা লিখে যাচ্ছেন। ঠিক তেমনি যাঁদের যোগশাস্ত্রে বা উপনিষদে বিশ্বাস তাঁরাও জানেন জগৎ এভাবেই চলবে, আমাকে জো সো করে আমার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যাদের অত বুকের পাটা নেই, তারা ভগবানকে মানবে। যারা ভগবানকে মানবে তারা একটাই সাধনা করবে। ভক্তিতে একটাই সাধনা হয়, দ্বিতীয় কোন সাধনা হয় না, ঈশ্বরে শরণাগতি। ঠাকুর বেড়াল ছানার উপমা দিচ্ছেন। বেড়ালের বাচ্চা কিছুই জানে না, তার চোখটাও বন্ধ, শুধু মিউ মিউ করে যাচ্ছে আর মা তাকে কখন বিছানায় রাখছে, কখন হেঁসেলে রাখছে। ঠিক এই ভাবটাই ভক্তদের হয়। ভক্ত জানে তিনি পরঃ, ভগবানই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান, তিনি সৎস্বরূপ, তিনিই আছেন, অতীতেও তিনিই ছিলেন, বর্তমানেও তিনিই আছেন আর ভবিষ্যতেও তিনিই থাকবেন। অন্য দিকে এই জগতটা নশ্বর, শুধু একদিক দিয়ে মরছে আরেক দিয়ে জন্মাচ্ছে, জন্ম আর মৃত্যুর খেলাই চলছে। যাকে ভালোবাসছে দুদিন পর সে মরে গেল বা কিছু হয়ে গেল আর সে অসহায় হয়ে হা হুতাশ করে যাচ্ছে

তিনি চিৎস্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ। চারিদিকে মুর্খতা ছাড়া কি আর কিছু আছে! দিনরাত সবাই অনর্গল বকর বকর করেই যাচ্ছে, কি বলছে নিজেই জানে না। মানুষ যদি মানুষ না হয়ে গাড়ি হত কত যে দুর্ঘটনা হত ভগবানই জানেন। অথচ কথাতে একটুও দম নেই, না আছে পড়াশোনা, না আছে চিন্তা ভাবনা, না আছে কোন ধ্যান ধারণা। একদিকে ভগবান চৈতন্য স্বরূপ আর তাঁর জগতটা মুর্খদের দিয়ে ভরা। ভগবান হলেন আনন্দস্বরূপ, আর তার সন্তানদের চোখে মুখে দুঃখের কালিমা লেপন করা। জগতটা ভগবানেরই স্বরূপ, ভগবান যিনি সৎ, চিৎ আনন্দ স্বরূপ, কিন্তু তাঁর জগতে শুধু নিরানন্দ, শুধু দুঃখ আর দুঃখই, তিনি চিৎস্বরূপ অথচ জগতে সব মুর্খের দল, তিনি সৎ অথচ জগতে কোনটাই চিরস্থায়ী নয়, আজ যেখানে সমৃদ্ধি কাল সেখান অসমৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। সৎ, চিৎ, আনন্দ ভগবানের পরা রূপ, অপরা রূপ হল এই জগৎ, এটাই অপরা প্রকৃতি। যিনি পরা প্রকৃতি, যেটা তাঁর স্বরূপ তাঁর এই দুরবস্থা, এটাই মায়া। নিমি প্রশ্ন করছেন, ভগবান বিষ্ণুর মায়া বড় বড় মায়াবীদেরও মোহিত করে ফেলে দেয় অথচ বলছেন ভক্ত তাঁকে দেখতে পায়। স্বামীজী বলছেন মা যে সন্তানকে এত ভালোবাসে, সেই সন্তান বড় হয়ে বদমাইশ, অবাধ্য হয়ে যায়, মদ খায়, টাকা চুরি করে, মাকে মারে তবুও মা সন্তানকে ছাড়তে পারে না, এটাই মায়া। এগুলো যে শুধু সাধারণ লোকেদের মধ্যেই দেখা যায় তা নয়। বরঞ্চ পশুপাখিদের মধ্যে মায়া কম দেখা যায়, তারাও তাদের সন্তানের চিন্তা তত দিনই করে যত দিন

ওরা নিজে থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারে। ডানা গজিয়ে যাওয়ার পর মার কাছে দানা খেতে গেলে বাচ্চাকে সে ঠোকরায়। মানুষ সারা জীবন ধরেই সন্তানকে দেখে যাচ্ছে। নিমি তাই বলছেন, হে ভগবন্! আপনি কৃপা করে আমাকে মায়ার স্বরূপের ব্যাপারে একটু বলুন, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

এর আগেও অনেকবার মায়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, এখনও করা হবে আবার পরেও করা হবে। মায়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না, মায়ার ব্যাপারে কাউকে বোঝান যায় না, মায়াকে শুধু অনুভব করা যায়। বেদান্তে আলো অন্ধকারের উপমা নেওয়া হয়, সচ্চিদানন্দকে যদি আলোর মত দেখা হয় আর মায়াকে যদি অন্ধকার রূপে দেখা হয় তাহলে কিছুটা বোঝা যায়। আলোকে যদি অন্ধকার ঢেকে দেয় তখন হয় আলোকে দেখা যাবে না, আর নয়তো আলোর স্বরূপ বিকৃত হয়ে যাবে। এবার যদি কেউ বলে আমি মায়াকে জানতে চাই, তার মানে সে অন্ধকারকে জানতে চাইছে। অন্ধকারকে জানতে গেলে অন্ধকার দিয়ে জানা যাবে না। অন্ধকারকে দেখতে চাইছে, অন্ধকারকে তো দেখা যাবে না। কারণ যে কোন জিনিসকে দেখার জন্য আলো দরকার। দেখার জন্য আলো নিয়ে এলে তখন আর অন্ধকার থাকবে না। আলো নিয়ে এলে অন্ধকার নেই, আর অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে দেখা যাবে না। আমরা বলতে পারি অন্ধকার মানে আলোর অভাব। কিন্তু আলোর অবভাবটা কে বলবে? সেই আলোর অভাব বলতে পারবে যে আলো দেখেছে। কিন্তু আমাদের তো সচ্চিদানন্দের জ্ঞান হয়নি, আমরা কি করে বলব যে এখানে জ্ঞানের অভাব। আলো আর অন্ধকারকে জ্ঞান আর মায়ার উপমা নেওয়া হয়েছে। মায়াতে ঠিক এই সমস্যাই হয়। যিনি মায়াতে আছেন, মায়া দিয়ে মায়াকে কখনই জানা যাবে না। যখন সচ্চিদানন্দের জ্ঞানের আলো নিয়ে আসা হল তখন দেখে মায়া বলে কিছু ছিলই না। একটা জিনিসকে দেখার জন্য একটা বস্তু লাগে, আলো লাগে আর চোখ লাগবে। এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটা না থাকলে দেখা জিনিসটা হবে না। অন্ধ কি তাই বলে দেখতে পায় না? অন্ধ তার mental images দেখে, বাইরের বিষয় দেখতে পায় না। আর বস্তু যদি না থাকে, তারপরেও যদি সে দেখে তাহলে তাকে পাগলা গারদে পাঠাতে হবে। শেষে আলো না থাকলে কখনই সে দেখতে পারবে না। অন্ধকারে যদি কোন জিনিস থাকে সেটাকে দেখার জন্য তাকে আলো জ্বালতে হবে, বস্তু আছে, আলো এসে গেল আর চোখে প্রতিফলন হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকারকেই যদি দেখতে হয়, ধরা যাক অন্ধকার একটা object আর আমার চোখ আছে এই objectকে দেখার জন্য আমার দরকার আলো। কিন্তু আলো জ্বাললে কি আর অন্ধকার থাকবে? অন্ধকারই থাকল না। হয় আমার জ্ঞান আছে নয়তো অজ্ঞান আছে, দুটো তো এক সঙ্গে থাকতে পারে না। হয় সচ্চিদানন্দের জ্ঞান আছে আর নয়তো সচ্চদিনন্দের অজ্ঞান বা মায়া আছে। এটা একটা উপমা, একটা তত্ত্ব বা সত্যকে বোঝাবার জন্য উপমা হল আকার ইঙ্গিতে বোঝানর একটা নিকৃষ্ট পদ্ধতি, সেইজন্য কখনই উপমাকে মূল জিনিসের সাথে মেলাতে যেতে নেই। বলছেন, যেমন অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে জানা যায় না, ঠিক তেমনি যিনি মায়াতে আছেন তিনি মায়াকে জানতে পারবেন না।

কিন্তু অজ্ঞানকে বা মায়াকে যদি নাই জানা যায় তাহলে তো বুঝতে হবে ওটা নেই। বলছেন, না, মায়া আছে। তাহলে জানবে কি করে? একটা বোধ হয়, শুধু অনুভব করা যায়। যেমন এই পাখার বাতাস, পাখার বাতাসকে আমরা দেখতে পারছি না, কিন্তু গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে সেটা দিয়ে আমরা বোধ করি যে বাতাস চলছে। ঠিক তেমনি, আমরা এক রকম চাইছি, তার জন্য সব চেষ্টাও সেই রকম করা হচ্ছে, অথচ জিনিসটা সেই রকম হচ্ছে না। মা ছেলেকে ভালোবাসছে, ছেলেটা মদ খেয়ে এসে মাকে পিটিয়ে যাচ্ছে, মা তবুও ছেলেকে ছাড়তে পারছে না। একটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবেসেছে, ছেলেটি দিনের পর দিন তার উপর অত্যাচার করে যাচ্ছে, চাইলেই সে ছেলেটিকে ছেড়ে চলে যাতে পারে, কিন্তু পারছে না, এটাই মায়া। যত বড় ওস্তাদই হোক, যার শরীর আছে তার কোথাও না কোথাও একটু মায়া থাকবেই। আমরা হয়ত উপমা দেব, হনুমানজী এই রকম ছিলেন, শুকদেব এই রকম ছিলেন। এগুলো কাহিনী, কাহিনীতে কি হয় আর কি হয় না আমাদের জানা নেই আর তাঁদের জীবনে সত্যি কি হয়েছিল আমরা জানি না। ঠাকুরের কোথাও যাওয়ার ছিল, ঠাকুর বললেন, রামলালের খুড়িকে জিজ্ঞেস কর। মা বলে পাঠালেন, গিয়ে কাজ নেই। ঠাকুর খুব দুঃখ করেই হোক বা অন্য ভাবেই হোক, তিনি বলছেন, আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী কিন্তু আমার মাগ বললে গিয়ে

কাজ নেই, আর যাওয়া হল না, আমারই এই অবস্থা তাহলে সংসারীদের কী অবস্থা! ঠাকুর পরমহংস, তিনিই এই কথা বলছেন। সেখানে আমার আপনার কী অবস্থা ভাবা যায়! মায়ার একটু আঁচ থাকবেই। আমরা যাকে ভালোবাসি, আমরা তাকে ছাড়তে পারব না, এটাই মায়া। নিমি রাজা এটাই বলছেন, যাঁরা বড় বড় মায়াবীদ তাঁরাও এই মোহিনী মায়ার জালে পড়ে যান। যে মনের জগতে আছে, স্থান, কাল আর কার্য এই তিনটের মধ্যে যে আছে, সে ঐ মায়ার মধ্যেই আছে। ঠাকুর বলছেন, অবতারও শক্তির আণ্ডারে। শক্তি বলতে মায়াকেই বলছেন, অবতারও মায়ার অধীন। সেখানে আপামর জনসমুদ্র মায়ার মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাবে এতে আশ্চর্যের কি আছে! কিছু দিন আগে স্ত্রীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একজন ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছে। মেয়েটিও এমন বদমাইশ যে সে সব কিছু নথিপত্র সরিয়ে দিয়ে নিজের শ্বশুর শাশুড়ির উপর দোষ চাপিয়ে দিয়েছে। পরে অবশ্য ধরা পড়েছে। এবার ভেবে দেখা যাক মায়া কি। লোকটি কি সাংঘাতিক মুর্খ, ঘোর মায়ার জালে ফেঁসে আছে, মায়াতে কেমন মোহিত হয়ে আছে। বাজারে গিয়ে তর্ক করে সব্জীওয়ালার কাছে আমরা দরদাম কমাই। যে আমার ক্ষতি করে তাকে দুটো টাকাও আমি দেব না, যে আমার সব কিছু লুটেপুটে নিচ্ছে, সব দিক দিয়ে সব সময় আমার ক্ষতিই করে যাচ্ছে, তাকে আমার সব থেকে বাজে জিনিসটাও দেব না। আর যে এত অত্যচার করছে, এত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে তাকেই সবচেয়ে মূল্যবান যে বস্তু, তার জীবনটাই দিয়ে দিচ্ছে, এটাই মায়া। মানুষের কাছে নিজের জীবনের থেকে আর কোন কিছুই মূল্যবান হতে পারে না। এই দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষের সাধন হবে। এই দেহ চলে গেলে আর তো এই দেহ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে চোখ বুজলেই সব শেষ। মানুষের জীবন থেকে মূল্যবান আর কিছু আছে! মেয়েটা আমার ক্ষতি করছে, তার জন্য গলায় দড়ি যে দেবে তার থেকে মুর্খ আর কে হতে পারে! মুর্খ তো নয়, এটাই মায়া। সে মনে করছে এখানে আমার আনন্দের তো কিছু নেই, যদি মরে গিয়ে অন্য কোথাও কিছু হয়। কোথাও কিছু নেই, সবটাই মায়ার রাজ্য, এটাই মায়া, যিনি বোঝেন তিনি বোঝেন, যিনি বুঝবেন না তিনি বুঝবেন না। আর যাঁরা বোঝেন তাঁরাও বেরোতে পারেন না, অসহায় হয়ে ছটফট করে। হে যোগীশ্বর আপনি আমাকে এই মায়ার স্বরূপটা একটু বলুন।

তখন তৃতীয় যোগীশ্বর অন্তরীক্ষ বলছেন, *এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ। সসর্জোচ্চাবচান্যাদঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে।।১১/৩/৩।।* এই মায়া অনির্বচনীয়, বচনীয় মানে যেটাকে বর্ণনা করা যায় আর অনির্বচনীয় মানে যেটাকে বর্ণনা করা যায় না। যেমন এর আগে বলা হল অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে জানা যায় না, আর আলো নিয়ে এলে অন্ধকার থাকে না। তাহলে মায়াকে জানা যাবে কিভাবে? বলছেন কার্য দিয়ে মায়াকে জানা যায়। কার্য যদি না থাকে জানা যাবে না। ঠাকুর বলছেন, জল হেললে দুললেও জল, শান্ত থাকলেও জল। জল যখন শান্ত থাকে বোঝা যাবে না যে এখানে জল আছে কি নেই। এই নিয়ে মহাভারতে খুব মজার ঘটনা দেখানো হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের যে রাজমহল তৈরী হল সেখানে যে জায়গায় জল আছে এমন ভাবে জল রাখা হয়েছে যে দুর্যোধন বুঝতেই পারছে না যে এখানে জল আছে, আবার যেখানে জল নেই সেখানে মনে করছে জল আছে। জলের হেলা দোলাটা কার্য, এই কার্য দিয়ে বোঝা যায় যে এখানে জল আছে। জলের মধ্যে যে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, ঐ প্রতিফলন যখন আসে তখন মাটি আর জলের প্রতিফলন পাল্টে যায়। কিন্তু পুরো স্ফটিকের একটা পুকুর যদি থাকে আর তাতে যদি জল ভরে দেওয়া হয় তাহলে আর বোঝা যাবে না যে জল আছে। নির্গুণ ব্রহ্মকেও সেই রকম জানা যাবে না, জানাকে আমরা যে অর্থে বুঝি। কিন্তু তাঁর কার্য দিয়ে তাঁকে বোঝা যায়। ঠিক তেমনি বাতাসকেও জানা যাবে না, বাতাসের কার্য দিয়ে তাকে জানা যায়। যোগীশ্বর বলছেন, আদিপুরুষ পরমাত্মা যে শক্তি দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, শুধু সৃষ্টিই করেন না, এর মধ্যে যত দেবতারা আছেন, মানুষ আছে সবাই নানান রকমের বিষয়ভোগের দিকে দৌড়াচ্ছে। আবার তাদের মধ্যেই কেউ কেউ আছে যারা মোক্ষের দিকে এগোতে শুরু করে। যে শক্তিতে ভগবান এই সব কিছু করছেন, এই শক্তিরই নাম মায়া। সেইজন্য শক্তি আর মায়া আলাদা কিছু নয়। এটাকেই বেদান্তে বলছেন নাম আর রূপ। যারই নাম আর রূপ এসে গেল সেটাই মায়া। নাম আর রূপ আনার জন্য একটা শক্তি দরকার, সেটাই শক্তি বা মায়া। কিন্তু বাস্তবে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, সেইজন্য বলছেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। তিনটেই ঠিক, যখন বলছেন

যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর, এটাও ঠিক। যদি বলে যা কিছু দেখছি এটা শক্তির খেলা, এটাও ঠিক। আর যখন বলছেন, যা কিছু দেখছি সবই মিথ্যা শুধু নাম আর রূপের খেলা, তখন এটাও ঠিক। সবটাই ঠিক, সংসারে যা কিছু আমরা দেখছি, এর কোন কিছু দিয়েই এটাকে তুলনা করা যায় না। এই জিনিসটাকেই বোঝাবার জন্য দড়িতে সাপ, অন্ধকারে আলো এই ধরণের নানা রকম উপমা নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কোন উপমাই পুরোপুরি খাপে খাপে বসবে না। কিন্তু জিনিসটাকে ধারণা করতে সাহায্য করে।

একবার যদি মায়ার ধারণা হয়ে যায় তখন এই সব শাস্ত্র বুঝতে অনেক সহজ হয়ে যায়। আর শাস্ত্র যতক্ষণ না বুঝতে পারবে ততক্ষণ তার বুদ্ধির বিকাশ হবে না। বুদ্ধির বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কোন সাধনই হবে না। তুখোড় বুদ্ধি না হলে জীবনে কোন সাধনাই হবে না। তুখোড় বুদ্ধি মানেই অধ্যয়ন আর চর্চা। সেইজন্য তৈত্তরীয় উপনিষদে গুরু শিষ্যকে শিক্ষা সমাপনন্তে গৃহে ফিরে যাওয়ার সময় শেষ উপদেশ দিয়ে বলছেন, *স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং প্রমদিতব্যাম্*, স্বাধ্যায় কখন বন্ধ করবে না, আর *প্রবচন*, আলোচনা, চর্চা এগুলোকে কখনই বন্ধ করবে না। তুখোড় বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে ধর্মের কথা, শাস্ত্রের কথা কখনই ধারণা করা যাবে না। আমাদের এইটুকু চিন্তা করতে হবে, এই জগৎ হল যিনি ঈশ্বর তাঁর মায়ার কার্য। ঈশ্বর আর ঈশ্বরের যে শক্তি বা মায়া এটা আলাদা কিছু নয়। এরও উপমা নেওয়া হয়, সমুদ্রের জল দক্ষিণ মেরু বা উত্তর মেরুতে গিয়ে বরফ হয়ে গেছে। ঐ বরফের নানান রকমের আকৃতি, প্রত্যেকটি আকৃতি এক অপরের থেকে আলাদা। তাদের যদি বোধ থাকে তখন সিংহ বলবে আমি সিংহ আর শেয়াল বলবে আমি শেয়াল, কিন্তু যিনি জানেন তিনি জানেন যে দুটোই বরফ। এই দুটো বরফের আকৃতিকে যদি জলে ফেলে দেওয়া হয় তখন আর কোন আকৃতিই থাকবে না, জলই থাকবে। এই যে জল থেকে বরফ হচ্ছে এটাই যেন নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মে এসে গেলেন। আর বরফ থেকে যখন একটা আকৃতি নিচ্ছে তখন সেটাই হয় সগুণ ব্রহ্মের কার্য। সগুণ ব্রহ্ম এসে গেলে শক্তি এসে গেল, শক্তি তাঁর তখন আর potential থাকল না, kinetic হয়ে গেল। শক্তি দুই রকমের হয়, একটা potential energy আরেকটা kinetic energy, একটা পাথরকে যদি উপরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন ওর potential energy এসে গেল, যখন নামতে শুরু করে তখন kinetic energy এসে যায়। ঠিক তেমনি শক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে যখন আছে তখন potential, যখন জগতে কার্য করে তখন সেটাই kinetic শক্তি হয়ে যায়। যখন kinetic form এসে যায় তখন তাকে বলছেন মায়া। কিন্তু ঘোর বেদান্তী যখন বরফের সিংহ ও শেয়ালকে দেখছেন তখন তিনি জানেন ওটা জল ছাড়া কিছু না। এবার শুধু একটু কল্পনা করুন, একট বরফের সিংহ তাড়া করছে একটা বরফের শেয়ালকে, সেই তাড়া করাটাও হচ্ছে একটা শক্তির জোরে। তাকে যদি কেউ বলে, ঐ যে সিংহটা শেয়ালের পেছনে দৌড়াচ্ছে ওটা আসলে বাষ্প, যে বাষ্পকে দেখা যায় না। সাধারণ অবস্থায় কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। অথচ জল থেকেই বরফ হয় আর জল থেকেই বাষ্প হয়। যিনি ফিজিক্স কেমেস্ট্রি জানেন তিনিই বলতে পারবেন বাষ্পও যা আর ঐ বরফের সিংহও তাই। ঠিক তেমনি যাঁর সচ্চিদানন্দের জ্ঞান হয়ে গেছে তিনি জানেন সচ্চিদানন্দও যা আর মানুষের আকৃতি, শেয়ালের আকৃতি সবই এক। বলছেন, এটাই মায়া।

বেদান্তে এর অনেক পরিভাষা আছে, ভক্তি বা তন্ত্রের অনেক পরিভাষা আছে, কিন্তু মূল কথা বেদান্ত মতেই চলুন আর ভক্তি পথেই চলুন, এনাদের কাছে যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই সত্য, চৈতন্য থেকে পরিবর্তন হয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে এই জগতও সত্য। কিন্তু সচ্চিদানন্দ থেকে যে পদ্ধতিতে জগৎ হয় এটাই মায়ার মারফত হয়। এই মায়াকে যাই বলুন, শক্তি বলুন, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলুন, ম্যাজিক বলুন যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু যে পদ্ধতিতে হয় এটাকেই বলে মায়া। এত কিছু বলতে পারার একটাই কারণ, মায়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। চৈতন্য ইন্দ্রিয় মনের পারে, তিনি এখন ইন্দ্রিয় মনের এলাকায় এসে গেলেন। তিনি ইন্দ্রিয় মনের এলাকায় এসে গেলেন এই কথাও যখন বলছি তখন বিচার করেই বলছি। কিন্তু আমি যখন বিচার করছি তখন মনের এলাকাতেই বিচার করছি। মনের যত দূর যাওয়ার ক্ষমতা ততটুকুই মন বলতে পারবে, কিন্তু চৈতন্য মনের এলাকার বাইরে। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের, চৈতন্য কিভাবে আবার আমাদের সবার ভেতরে ঢুকে গেছেন, যে জায়গাটায় ঢুকছেন, ওটার ব্যাপারে আমরা কি করে বলব! আমরা সবাই মনের রাজ্যে আবদ্ধ, আমরা কি করে

জানব ওটা কি করে হচ্ছে? জানার কোন পথই নেই। অখণ্ড আর এই দ্বৈতের জগতকে তাই মেলানো অসম্ভব। যখন অখণ্ডের কথা ভাবছি, ঈশ্বরের কল্পনা করছি তখনও আমার মন দিয়েই ভাবছি। কিন্তু কার্য দিয়ে জানা যাচ্ছে। যিনি অনন্ত সচ্চিদানন্দ তিনিই এই জগৎ রূপে দেখাচ্ছেন, জগতটাই তাঁর কার্য।

ভগবানের সৃষ্টি এই জগৎ, সৃষ্টি ভগবান থেকে আলাদা কিছু নয়, তিনিই আবার সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে যান। এই ধারণাটাও খুব জটিল। কুম্ভকার কুম্ভ সৃষ্টি করে, কুম্ভকার আলাদা কুম্ভ আলাদা। কিন্তু সৃষ্টিতে তা হয় না, সৃষ্টিতে যেটা সৃষ্ট হয়েছে সেটাতে আবার সৃষ্টিকর্তা ঢুকে যান, তার মানে তিনি আর তাঁর সৃষ্টি এক। মায়ার দৃষ্টিতে দেখলে বোঝায় যে তিনিই আছেন তিনিই এই রকম দেখাচ্ছেন। যেমন প্রোজেক্টরের আলোর সামনে একটা রীল রেখে দেওয়া হল। প্রোজেক্টরের আলো রীলের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে পর্দার উপর ছবি হয়ে পড়ছে আর তাতে যুদ্ধ হচ্ছে, লোকজন দৌড়াচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে নানান রকম জিনিস চলতে থাকে। কিন্তু ওখানে আছে একটা ছোট্ট রীল আর তার পেছনে আছে আলো। আলো সরিয়ে দিলে তখন আর কিছুই হবে না, রীলকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন শুদ্ধ আলো এসে পর্দার উপর পড়ছে। আলোটাই সচ্চিদানন্দ আর রীলটা প্রকৃতি বা মায়া। সচ্চিদানন্দের আলোর সামনে মায়া যখন এসে পড়ে তখন একের পর এক দৃশ্য আসতেই থাকে, ঐ দৃশ্যের মধ্যে আমি আপনি সবাই আছি, অথচ সেই সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। সাধারণ মানুষ এত কিছু বুঝতে পারে না, তাই খুব সহজ ভাবে বলছেন ভগবান নিজের শক্তি দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি করেন। জগৎ সৃষ্টি করে তিনি তার মধ্যে ঢুক যান, মানুষের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন, পশুপাখিদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন আর প্রত্যেকটি কণা থেকে কণাতে তিনি প্রবিষ্ট হয়ে যান। এ্যটমের মধ্যেও তিনি আছেন, এ্যটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন প্রোটন আছে তার মধ্যেও তিনি আছেন। ইলেক্ট্রন প্রোটনের পরেও যদি অন্য কিছু আসে তাতেও তিনি থাকবেন। তাহলে ঈশ্বর ছাড়া কি আর কিছু আছে? তিনিই আছেন, তাঁরই শক্তিতে তিনি ইলেক্ট্রন প্রোটন হয়ে দেখাচ্ছেন, তিনি এ্যটম হয়ে দেখাচ্ছেন, এ্যটম গুলো যখন মিশছে সেই জড় রূপে তিনিই দেখাচ্ছেন।

আমাদের তো বলে দেওয়া হল ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, সচ্চিদানন্দই একমাত্র আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এতে একটা বিরাট সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভবনা এসে যায়। একটা সম্ভবনা হল, মানুষ কোন অন্যায় করে বলবে, সবই তো ঈশ্বর, আমিও সেই ঈশ্বর, সুতরাং আমার অন্যায়টাও ঈশ্বর করেছেন। এই গোলমালটা প্রায় সবারই হয়। আরেকটা হল, ঠাকুর খুব সুন্দর গল্প বলছেন, গুরু শিষ্যকে বলছেন সবই নারায়ণ। শিষ্য একদিন একটা পাগলা হাতিকে আসতে দেখে ভাবছে, গুরু বলে দিয়েছেন সবই নারায়ণ, এই হাতিও নারায়ণ। মাহুত হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, পাগলা হাতি আসছে সবাই পালাও। শিষ্য নড়ছে না, সে তো জানে হাতিও নারায়ণ, ওখানেই হাতিকে প্রণাম করছে। হাতি শিষ্যকে শুঁড়ে পেচিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। সব থেকে বড় গোলমাল এটাই হয়। ক্ষত বিক্ষত শিষ্যকে গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। গুরু বলছেন, পাগলা হাতি আসছে দেখেও তুমি সরে গেলে না কেন? শিষ্য বলছে, আপনিই তো বলেছিলেন সবই নারায়াণ। গুরু তাকে বলছেন, মাহুত নারায়ণ তোমাকে তো সাবধান করে দিয়েছিল, তুমি মাহুত নারায়ণের কথা কেন শুনলে না। তার মানে, তফাৎ করার ক্ষমতাটা হয়নি। এখানে বক্তব্য হল, যিনি দেখেন সবই ঈশ্বর, তাঁর ক্রিয়াকলাপ আচরণ সব পাল্টে যায়, চরিত্রটাই পুরো পাল্টে যায়। তিনি জানেন হাতিও নারায়ণ, মাহুতও নারায়াণ, মাহুত নারায়ণের কথা শুনতে হয়। আরও বাজে হল অন্যায় কাজ করা, এক কামুক লোক একটা মেয়েকে বলল আমি তোমাকে সাক্ষাৎ দেবী দেখছি, এবার পুরো মন ঐ মেয়ের উপর গিয়ে পড়বে। টাকা-পয়সাও তো ঈশ্বরেরই রূপ। পুরো জিনিসটাই এলোমেলো হয়ে ভুলভ্রান্তিতে জীবনটা অশান্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

সেইজন্য আগেকার দিনে বেদান্ত সাধারণ লোকেদের শুনতে দেওয়া হত না। বেদান্ত শোনার আগে বিরাট শুদ্ধির দরকার। সব থেকে আগে দরকার শরীরের শুদ্ধি, মনের শুদ্ধি, তারপর আসে কঠোর সাধনা, গুরুর সঙ্গ, সাধুসঙ্গ, বিরাট লম্বা পদ্ধতি। কিন্তু মানুষকে তো ধর্ম শেখাতে হবে। সেইজন্য প্রথমেই বলে দেওয়া হয়, যেটা শুভ, যেটা সৎ, যেটা সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ আগে সেখানে ঈশ্বরকে দেখতে শেখ। মত্ত হাতি ভয়ঙ্কর হয়ে তেড়ে আসছে, সেখানে তো সত্ত্বগুণের কিছুই নেই, তাকে কখনই ভগবান বলে মনে করা যাবে না। গীতার দশম অধ্যায়ে শুভ জিনিসগুলোর বর্ণনা করে ভগবান বলছেন, এগুলোতে আমার প্রকাশ। তাহলে বাকি গুলোতে

কি প্রকাশ নেই? সবেতেই ঈশ্বরের প্রকাশ আছে। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষ শক্তির পূজারী, সে সৌন্দর্যের পূজা করে, বিদ্যা, সম্পদের পূজা করে, সেইজন্য তাকে বলা হয়, যেখানে শুভ জিনিস দেখবে সেখানেই তিনি আছেন। এই ভাবে ধাপে ধাপে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু যারা ঘোর বেদান্তী, অল্প বয়স থেকেই যারা এই পথে তৈরী হয়েছে, তাদেরকে বলে দেওয়া হবে সবই তিনি। তাদের তখন হাতি নারায়ণ মাহুত নারায়ণ এই ধরণের গোলমাল হবে না, হাতি আমাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারবে না। তাদের তখন একটাই উদ্দেশ্য থাকে, আমাকে যে সত্যের কথা বলা হল, এই সত্যকে আমাকে উপলব্ধি করতে হবে। ঠাকুর এখানে মুর্খ শিষ্যদের কথা বলছেন। আচার্য শঙ্কর বলছেন, যে উত্তম শিষ্য তাকে একবার বললেই বুঝে নেয়, মধ্যম শিষ্যকে একবার এদিক দিয়ে আরেকবার ওদিক দিয়ে, অনেক কাহিনী দিয়ে বোঝাতে হয়, তারপর সে বুঝে নেয়। আর অধম শিষ্যকে যেটা গুরু বোঝাবেন সে তার বিপরীত বুঝবে। বিপরীত যাতে না বুঝে নেয় সেইজন্য গুরু সব সময় শুরু করেন শুভ জিনিস দিয়ে।

এটাকেই বর্ণনা করে বলছেন, *গুণৈর্গুণান স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ। মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মনমিহ সজ্জতে।।১১/৩/৫।।* আমাদের ভেতরে যিনি চৈতন্য সত্তা আছেন, তিনি আছেন বলেই আমর বোধ করছি আমি হলাম অমুক ব্যক্তি, অমুকের বাবা, অমুকের সন্তান ইত্যাদি, আমি জানি আমি এই দেহ নই আর আমি যখন মারা যাব, আমার দেহটা পড়ে থাকবে, সবাই বলবে এটা অমুকের দেহ। হাসপাতালে কেউ মারা গেছে, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবরা ফোনে জিজ্ঞেস করে, বডি এসে গেছে? তিনি প্রধানমন্ত্রীই হন আর মুখ্যমন্ত্রীই হন, যিনিই হন বলা হয় বডি এসে গেছে? বডি আসার পর বডি ছুলে অশুদ্ধি হয় যায়, বাড়িতে জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান করতে হয়। অথচ দুদিন আগে তাঁকে দেখার জন্য, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য, কোলাকুলি করার জন্য পা ছুঁয়ে প্রণাম করার জন্য চাপরাশি থেকে আমলা, আমলা থেকে মন্ত্রীরা, মন্ত্রী থেকে দলের ছোট থেকে বড় নেতারা দৌড়াদৌড়ি করত। জীবিত আর মৃতের এই তফাৎ কেন হয়? কিছু তো একটা আছে, যার একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য এতদিন ছুটে যেত আর এখন ছুলে অশৌচ হয়ে যাচ্ছে। এই দুটোর মধ্যে কোথাও একটা বিভাজন রেখা আছে। বয়োলজিস্টরা যাই বলুক, আমরা জানি ভেতরে এক চৈতন্য সত্তা আছেন, এই চৈতন্য সত্তাকে বলে জীবাত্মা। জীবাত্মা মানে প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করে আছেন। কুকুর, বেড়ালের মধ্যেও জীবাত্মা আছে, আমার আপনার সবারই মধ্যে জীবাত্মা আছে। আবার জড় রূপে যা কিছু আছে সেখানে জীবাত্মা রূপে নেই কিন্তু এনার্জি রূপেই আছে। যত নীচের দিকে যাওয়া হবে সেখানে আর জীবাত্মা রূপে গ্রহণ করা হয় না। যেমন ধান, গম এগুলোকে জীবাত্মা রূপে গ্রহণ করা হয় না, তর্কের খাতিরে আমরা নিয়ে যেতে পারি। ব্যাকটেরিয়াতে তাও জীব আছে কিন্তু ভাইরাসকে পুরোপুরি এনার্জি রূপে দেখা হয়। জীব বলতে আমরা জানি জীবনের স্পন্দন। জীবাত্মা = পরমাত্মা = আত্মা = ব্রহ্ম, জীবাত্মাও যা পরমাত্মাও তাই, পরমাত্মাও যা আত্মাও তাই, আত্মা যা ব্রহ্মও তাই, কোন তফাৎ নেই। তফাৎটা হয় একাত্মকরণে, যখন দেহের সাথে নিজেকে একাত্ম মনে করছেন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলছেন, আর যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে একাত্ম মনে করছেন তখন বলছেন পরমাত্মা আর যখন কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে নেই, শুদ্ধ রূপে আছেন তখন তাঁকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলেন। নিজেকে শরীরের সাথে যখন জড়িয়ে রাখছি তখন মনে করছি এই শরীরটা আমার, তখন ওটাকেই আমরা জীবাত্মা বলি। যার জন্য আমরা মরতে চাই না। মৃত্যু এসে যখন টেনে নিয়ে যাবে তখন শরীরটা পড়ে থাকবে, কদিন পর আরেকটা শরীর ধারণ করব, তখন আবার ঐ শরীরের সাথে জড়িয়ে যাব, ঐ শরীরকে আর ছাড়া যাবে না। জীবাত্মা যখন যে দেহে থাকে তখন ঐ দেহের প্রতি পূর্ণ আসক্তি থাকে। ঐ দেহ যেমনই হোক, রোগা হোক, রোগগ্রস্ত হোক, মোটা হোক, কুৎসিত হোক, ঐ শরীরকে আর ছাড়তে চাইবে না। যখন নিজের শরীরের প্রতি ঘেন্না হয়ে যাবে তখন আর ঐ শরীরের মধ্যে থাকতে চাইবে না, জীবাত্মা ঐ শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। জীবাত্মাকে বার করার জন্য শরীরের ক্ষতি করতে হয়, দুর্ঘটনায় ক্ষতি হয়, হার্ট ফেল করা মানে শরীরটার ক্ষতি হয়ে গেল, শরীরের ক্ষতি করে না দেওয়া পর্যন্ত জীবাত্মা শরীর ছাড়বে না। ঋষি মুনিরা আবার নিজের ইচ্ছায় শরীরকে ছেড়ে দেন, যখন দেখলেন এই শরীর দিয়ে আমার আর কাজ চলবে না, ধ্যানে বসলেন, শক্তিটা টেনে নিলেন আর শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এভাবে একমাত্র উচ্চমানের মহাত্মারাই শরীর

ছাড়তে পারেন। বলছেন, জীবাত্মা শরীরের সাথে একাত্ম বোধ করে নেওয়ার পর তখন সে নানা রকম কর্ম করে, কখন ভালো কর্ম করে আবার কখন মন্দ কর্ম করে। এইভাবে সে শুভ অশুভের সাথে জড়িয়ে যায়, ভালোকে ভালোবাসতে চায়, যার থেকে কষ্ট পায় তার কাছ থেকে সরে আসতে চায়।

এইসব বলে বলে বর্ণনা করছেন কিভাবে প্রলয় হয় আর নানান জিনিস হয়। সব বলার পর বলছেন, সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয় এটাই মায়ার কার্য। *এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী। ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।।১১/৩/১৬।।* ত্রিবর্ণা, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি আর সংহার করেন, এটাই মায়া। মায়া কি করছে? সেই সচ্চিদানন্দ, সেখান থেকে এই জীবজগৎ এসেছে। আর যিনি শুদ্ধ আত্মা, দেহে বাস করেন, তিনি নিজেকে দেহের সাথে একাত্ম বোধ করে নেন, এটাই মায়া। নিমি রাজা মায়ার সব শুনে বলছেন, *যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ। তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতম্।।১১/৩/১৭।।* মায়ার ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম কিন্তু এই মায়ার পারে কিভাবে যাবে বলুন। এখানে দুটো বিষয়, একটা হল যাদের দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, দ্বিতীয় বিষয় *স্থূলধিয়ো*, যাদের স্থূল বুদ্ধি, এরা মায়ার পারে কিভাবে যেতে পারবে? তার আগে বলছেন *দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ*, মানুষ মাত্রেই দেহে আত্মবুদ্ধি হয়। এই বিষয়টা শুধু ভাগবতেই না, প্রত্যেক শাস্ত্রেই ঘুরে ঘুরে আসে। আত্মা মানে আমি, এই আমি বোধ সবারই থাকে, এই জগতে কেউ নেই যার এই আমি বোধটা নেই। একটা ছোট্ট পিঁপড়েরও আমি বোধ থাকে, মারতে গেলে সেও একটা মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করবে। তার মানে, সে মরতে চাইছে না, আমি বোধটা আছে বলেই মরতে চাইছে না, আমি মরতে চাই না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে একটা পিঁপড়ে আর মানুষের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ একটা পিঁপড়েরও আত্মবুদ্ধি দেহের সঙ্গে যুক্ত, আমরা আমি বলতে আমার দেহকেই বুঝি, সবাই বলে আমার দেহ, আমার প্রাণ। মানুষের দেহবুদ্ধি থাকবে না তা কখনই হয় না। আমি কে? আমি দেহ। এটাই একেবারে প্রাথমিক বোধ, আর যারই এই বোধ আছে আমি দেহ তাকেই বলছেন স্থূলধি, মাথা মোটা, ভাগবতই এই কথা বলছেন। তাহলে এত শাস্ত্র কার জন্য? শাস্ত্র বোঝার মত এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি কারুরই নেই, সবারই তো দেহবোধ আছে। দেহে আত্মবুদ্ধি সবারই থাকবে, কদাচিৎ কখন কেউ কেউ থাকেন যাঁদের দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে না। শাস্ত্রের কথা তাঁদের যদি বলা হয় তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবেন। গরু, কুকুরও নিজের সদ্যোজাত বাচ্চার সাথে এক বোধ করে। একটা বাছুর জন্ম দেওয়ার পর বাছুরের কাছে কেউ গেলে গরু তাকে গুতিয়ে দেবে, কারণ বাছুরের সাথে তার আত্মবুদ্ধি হয়ে আছে। পোষা কুকুরও তার সদ্য বাচ্চার কাছে গেলে কামড়াতে আসবে। কিছুক্ষণ পর ঐ আত্মবুদ্ধিটা কমতে কমতে স্বাভাবিক হয়ে যায়। কখন সখন দেখা যায় যারা অত্যন্ত মুর্খ তারা নিজের ধন সম্পদকে মনে করে এটাই আমি, টাকা-পয়সা বা সম্পত্তি চলে গেলে এরা গলায় দড়ি দিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, শেয়ারে প্রচুর টাকা ঢেলে সব ডুবে গেল, আর গলায় দড়ি দিয়ে দিল, তার মানে টাকার সাথে সে আত্মবুদ্ধি করে নিয়েছে। আবার অনেকে নিজের সম্মানের সাথে নিজের আত্মবুদ্ধিকে জড়িয়ে নেয়, সেটা অবশ্য একটু অন্য ধরণের হয়ে যায়। কিন্তু দেহের সাথে আত্মবুদ্ধি হল সার্বজনীন। কদাচিৎ কখন দেখা যায় যাঁরা অন্য রকম। শুকদেব বারো বছরের যুবক, জন্ম নিয়েই দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। মেয়েরা জলাশয়ে স্নান করছিল, শুকদেবকে দেখে তাদের লজ্জাবোধ হল না। শুকদেবকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যাসদেব কিছুক্ষণ পরে তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ে যাচ্ছেন তখন মেয়েরা নিজেদের বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করছেন। সেই দেখে ব্যাসদেব বলছেন, সেকি আমার যুবক ছেলে যাচ্ছিল তখন তোমাদের কোন লজ্জা বোধ হল না আর আমি বয়স্ক মানুষ আমাকে দেখে তোমাদের এত সঙ্কোচ! মেয়েরা বলছে, আপনার ছেলের মধ্যে নারী পুরুষের বোধ নেই, কিন্তু আপনার পুরো মাত্রায় নারী পুরুষের ভেদ বোধ আছে। তার মানে শুকদেবের মধ্যে দেহবোধ ছিল না। এটা কাহিনী, কাহিনী হলেও ইতিহাসে আমরা শুকদেবের যে বর্ণনা পাই তাতে দেখা যায় যে শুকদেবের কখনই দেহে আত্মবুদ্ধি ছিল না। নরেন যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন, পরে ঠাকুর অন্যদের নরেনের সম্বন্ধে বলছেন, যার বর্ণনা আমরা লীলাপ্রসঙ্গে ও স্বামীজী জীবনীতে পাই, ঠাকুর বলছেন, দেখলাম পুরোটাই তার অন্তর্দৃষ্টি, দেহের কোন বোধ নেই। দেহের কোন বোধ নেই ঠাকুর এই বাক্যটাই ব্যবহার করছেন। নরেন যখন জিজ্ঞেস করলেন, মশাই! আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তখন ঠাকুর বলছেন,

দেখেছি বইকি তোকেও দেখাতে পারি। বিশ্বের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে কোন গুরু কোন শিষ্যকে কোন দিন বলেননি যে, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তোকেও আমি দেখাতে পারি। বিশ্বের ইতিহাসে আমরা তাই একটিও দৃষ্টান্ত পাই না যে, গুরু আর শিষ্য দুজন একই সাথে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন, একমাত্র ঠাকুর ও স্বামীজীর ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। সাধনার আগেই ঠাকুরেরও দেহবোধ ছিল না, স্বামীজীরও ছিল না। আচার্য শঙ্কর বলছেন, উত্তম শিষ্যকে একবার বললেই তার জ্ঞান লাভ হয়ে যায়, অল্প বয়সে আমাদেরও বিশ্বাস হতে চাইত না, একবার শুনেই কি করে জ্ঞান লাভ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরে স্বামীজী ঠাকুরের এই ঘটনা পড়ার পর বিশ্বাস হয়, ঠাকুর যেটাই বলছেন সঙ্গে সঙ্গে নরেনের জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, তা নাহলে কখন সখন ছুঁয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে নরেনের জ্ঞান হয়ে গেল। কিন্তু আর সব জায়গায় দেখা যায় সবাইকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। কিন্তু কাঠখড় পোড়ালেও, ঐ পোড়াতে পোড়াতে দেহবোধটা চলে যায়, খুব হাল্কা মত একটা বোধ থাকে।

মঠের অনেক মহারাজদেরও দেহবোধ পুরোপুরি চলে যেতে দেখা যায়। স্বামী শিক্ষানন্দ মহারাজ ছিলেন, বয়স হয়ে গিয়েছিল, পেটের ও অন্য অনেক কিছুর সমস্যা ছিল। ওনাকে বলা হল সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উনি সঙ্গে সঙ্গে না করে দিলেন, আর কিসের চিকিৎসা! ওনার শরীরের কষ্ট অন্যরা চোখে দেখতে পারছেন না। অথচ শরীরটা চলে যাবে তার ঠিক আগে একজন মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ আপনার তো খুব কষ্ট হচ্ছে। উনি খুব অবাক হয়ে বলছেন, কিসের কষ্ট, আমি শুদ্ধ আত্মা, আমি ব্রহ্ম। এটাই সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রথম লক্ষণ, যে দেহ আমাদের এত প্রিয়, সেই দেহের প্রতিই কোন হুঁশ থাকে না। এগুলো বোঝার জন্য নিয়মিত কথামৃত পড়তে হবে, পড়ার পর চিন্তন করতে হবে। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, সীতার অন্বেষণে হনুমান লঙ্কায় গেছেন, অশোক বাটিকায় সীতাকে দেখতে পেলেন, সীতাকে দেখছেন কত দুঃখে পড়ে আছেন কিন্তু যে দেহ মানুষের এত প্রিয় বস্তু সেই দেহের প্রতি সীতার এতটুকু আত্মবুদ্ধি নেই, তাঁর সব কিছু শ্রীরামে পড়ে আছে। যাঁরা অবতার পুরুষ হন তাঁদের কাছেও দেহ প্রিয়, সিদ্ধপুরুষদের কাছেও দেহ প্রিয়, কিন্তু তাঁদের দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না, তাঁদের আমি বোধটা কখনই দেহের সাথে থাকে না।

স্বামীজী তখন নিউইয়র্কে আছেন, ওনার ঘরে টাইপিস্ট টাইপ করে যাচ্ছেন আর স্বামীজী ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন। দেওয়ালে একটা আয়না লাগানো ছিল। মহিলা এক মন দিয়ে টাইপ করে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখছেন স্বামীজী দেওয়ালের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলা নিজের স্মৃতিকথায় লিখছেন, আমি ভাবছি এবার স্বামীজীর অহঙ্কারের বেলুনটা চুপসে যাবে। স্বামীজী সুপুরুষ ছিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অন্য দিকে চলে এসেছেন। আবার একটু পরেই ঘুরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আয়নাতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছেন। মহিলাটি আবার টাইপ বন্ধ করে দেখছেন যে স্বামীজী আয়নার দিকে তাকিয়ে আছেন। মহিলা ভাবছেন, এই বুঝি স্বামীজী বলবেন, আমাকে দেখতে কত হ্যাণ্ডসাম্ লাগছে। এই ভাবে তিন চার বার আয়নাতে মুখ দেখা হয়ে গেছে, এরপর স্বামীজী মহিলাকে বলছেন, জানো, আমি অনেক করে মনে করার চেষ্টা করছি আমি দেখতে কেমন, যেমনি আয়না থেকে সরে যাচ্ছি আর মুখটা মনে থাকছে না, যতক্ষণ আয়নার সামনে আছি ততক্ষণই আমার মুখের আকৃতি মনে থাকছে। এই হল দেহাত্মবুদ্ধির অভাবের প্রকৃত দৃষ্টান্ত। এর আগেও স্বামীজীর অনেক দেহাত্মবুদ্ধির অভাবের দৃষ্টান্ত পাই। দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করছেন, সব মশা স্বামীজীকে ঢেকে দিয়েছে, মনে হচ্ছে স্বামীজী কম্বল মুরি দিয়ে ধ্যান করছেন। স্বামীজীর দেহ বোধটা তখন চলে গেছে। কিন্তু এখানে দেহবোধের কথা হচ্ছে না, কারণ যিনি অবতার তাঁর সাময়িক দেহবোধ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি, আমি বলতে আমরা কি বুঝছি, আমরা সব সময় নিজের দেহকেই আমি মনে করি। যদি বলি আমি আমার আমিকে মন বুদ্ধি অহঙ্কারের সঙ্গে এক মনে করি, তাহলে কেউ যদি বলে তোমার একটা ঠ্যাং খোড়া করে দেওয়া হবে তখন কি আমি আমার চিন্তার জগতে থাকতে পারব? কখনই আর থাকা যাবে না। কিন্তু যাঁরা সাধনার পথে যান তাঁরা এসব গ্রাহ্যই করবেন না, হ্যাঁ তিনি জানেন শরীরের কিছু হয়ে গেলে সাধনায় অনেক অসুবিধা হবে। যাঁরা খুব উচ্চমানের কবি বা চিন্তক হন, তাঁদেরও দেহবোধটা থাকে না। যাদের দেহবোধ আছে তারা বড় কাজ করতে পারে না, তার কবিতা ভালো হবে না, তার চিত্র ভালো হবে না। আলেকজাণ্ডারের মত যুদ্ধ জয় করবে, কয়েকটা মানুষের গলা কাটবে, তার বেশি কিছু করতে পারবে না।

ভ্যান গগ্ খুব নামকরা চিত্রকর ছিলেন, তাঁর জীবনী পড়লে মনে হবে তিনি একজন বদ্ধ পাগল, পাগল না হলে কি আর এত বড় প্রতিভাবান চিত্রকর হওয়া যায়! তিনি যখন একটা ছবি আঁকাকে নিয়ে থাকতেন, দিন নেই রাত নেই সারাক্ষণ ঐ ছবিকে নিয়ে পড়ে আছেন, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, ঘুম নেই, ঐ ছবি ছাড়া আর কিছুই তিনি জানেন না। চার পাঁচ দিন ধরে এভাবে চলত। অনেক দিন পর যখন ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে যেতে তখন তিনি একদম অবসন্ন হয়ে পড়ে যেতেন। তাঁর একজন প্রিয় গণিকা ছিল, ঐ সময় তিনি তার কাছে চলে যেতেন। একদিন মেয়েটি ভ্যান গগ্কে বলছে, তোমার কান কী সুন্দর, ইচ্ছে করে নিজের কাছে সব সময়ের জন্য রেখে দিই। ভ্যান গগ্ সোজা নিজের ঘরে গেলেন, একটা ছুরি নিয়ে নিজের একটা কান কেটে ঐ রক্তাক্ত কান হাতে করে এনে মেয়েটিকে বলছেন, তোমার খুব পছন্দ, এই নাও সেই কান। মেয়েটি ঐ দেখে চিৎকার করে উঠেছে। চিৎকার শুনে আশেপাশের সব লোক দৌড়ে এসেছে। ভ্যান গগ একটা কান নিয়েই বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেন। এই ধরণের বড় বড় শিল্পী, কবিদের দেহাত্মবুদ্ধি নেই। আমরা বলব, এটাতো সাংসারিকতা, সাংসারিকতাই হোক, নিজের একটা কান কেটে দেওয়া, তাও একটা বেশ্যাকে! আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি এটা চাইলে, ঠিক আছে এটাই নিয়ে নাও। কী মারাত্মক ব্যাপার! এই ব্যক্তিই যদি আধ্যাত্মিক স্তরে চলে যান তাঁর কি হবে ভেবে দেখুন! এ জিনিস কল্পনাই করা যায় না। ভ্যান গগের এটা কোন কাহিনী নয়, তাঁর জীবনী এটা। বিখ্যাত কবি শেলীর বাড়িতে একদিন পার্টি হবে, সব বড় বড় ভিআইপি অতিথিরা আসবেন। শেলী সমুদ্রে স্নান করে ঘরে এসেছেন। সবাই পার্টিতে জড়ো হয়ে আছে, শেলীর স্ত্রীও সেখানে কাজে ব্যস্ত। ওর মধ্যেই শেলী পুরো উলঙ্গ অবস্থায় এসে স্ত্রীকে ডেকে বলছেন, I cannot find my suit, where it is। স্ত্রী বলে দিয়েছিল ঘরে তোমার স্যুট রাখা আছে ঐ স্যুট পরে পার্টিতে আসবে, স্ত্রী তাঁর খুব দেখাশোনা করত। ঘর ভর্তি ভিআইপি অতিথি, ওনার হুঁশও নেই যে কিছুই পোশাক পড়া নেই। আইনস্টাইনেরও একই অবস্থা, দু পায়ে দু রঙের মোজা পড়ে বেরিয়ে গেছেন, কোনও হুঁশই নেই। এনারা হলেন যাঁরা বুদ্ধির জগতে গিয়ে দেহাত্মবুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলছেন, আধ্যাত্মিক জগতের যাঁরা তাঁদের কি হবে! এখানে নিমি বলছেন, এই জিনিস তো আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও এটাই প্রাথমিক শর্ত। তাহলে বাকিদের কি উপায় হবে? তখন চতুর্থ যোগী যাঁর নাম প্রবুদ্ধ, তিনি খুব সুন্দর কথা বলছেন।

কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ। পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্।। ১১/৩/১৮।। একটাই পথ, দিনরাত বিচার করা, এই যে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর আসক্ত আর অন্যান্য বন্ধনাদিতে আসক্ত জীবকে সুখের প্রাপ্তি আর দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কত কিছু করতে হয়, অথচ সব কর্মের ফলগুলো বিপরীত হয়ে যায়। আমরা সবাই জীবনে কত কিছুর জন্য কত চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিভাবে জীবনে একটু সুখ আসে, কিভাবে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দেখা যায় চেষ্টা করতে গিয়ে তার ফল সব সময়ই উল্টো হয়। আমাদের কাছে ব্যাপারটা খুব বিসদৃশ মনে হবে, কিন্তু এটাই বাস্তব। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, বাবা-মা বলে ছেলের একটা বিয়ে দিয়ে দিই, সংসার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে এসে একটা গাছ পাবে, যার ছাওয়াতে একটু জিরোতে পারবে। যারা বিয়ে করে তারাও ভাবে একটা মেয়ের কাছে গিয়ে সুখ পাবে। শুধু টাকা রোজগার করে টাকা জমানোর জন্য মানুষ কাজ করে না। যারা শুধু টাকা জমানোর জন্যই রোজগার করছে, বিয়েথা করেনি, সন্তান নেই, কারুর দায়ীত্ব বহন করতে হয় না, কিন্তু তাও উন্মাদের মত টাকা আয় করে টাকা জমিয়ে যাচ্ছে, বুঝবেন তার মানসিক ব্যাধি আছে। সাধারণ অবস্থায় যারা বিয়েথা করেছে তারাই এটা করে, স্ত্রীকে খুশি করবে, সন্তানাদি হবে, তাদেরকে খুশি করবে, সন্তানের বিয়ে হওয়ার পর বউমা বা জামাইকে খুশি করতে চাইবে। আর সব সময় চেষ্টা করবে যে সুখটা আছে সেটাকে কিভাবে ধরে রাখা যায় আর দুঃখ যেটা আসছে সেটাকে কি করে ঠেকানো যায়। গীতায় ভগবান বলছেন *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ*, জ্ঞানী পুরুষ আর অজ্ঞানী পুরুষের এখানেই তফাৎ। জ্ঞানী দুঃখেও উদ্বিগ্ন হন না আর সুখেও কোন স্পৃহা থাকে না। অজ্ঞানীদের কি হয়? একটা ভাষ্যে খুব মজার একটা কথা বলছেন, যাঁরা জ্ঞানী তাঁদেরও দুঃখ হয়, যাঁরা জ্ঞানী তাঁদেরও সুখ হয় আবার যারা অজ্ঞানী তাদেরও দুঃখ হয়, যারা অজ্ঞানী তাদেরও সুখ হয়। তাহলে জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে তফাৎ কোথায় রইল? জ্ঞানীদের কাছে যখন দুঃখ আসে তখন তিনি জানেন যে আমার কপালে দুঃখ

ছিল তাই এসেছে, এখানে আমার কিছু করার নেই, মুখ বুঝে দুঃখকে গ্রহণ করে নিতে হবে। সুখ যখন আসে তখন জ্ঞানী বলেন, কপালে ছিল তাই এসে গেছে, এই নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই, সুখ সুখের মত আসছে, দুঃখ দুঃখের মত আসছে। অজ্ঞানীর যখন দুঃখ আসে তখন বলে, আমি শেষ, আমার মত অভাগা আর কে আছে, শেষ পর্যন্ত আমার কপালে এই দুর্ভাগ্য ছিল, হে ভগবান! আমাকে রক্ষা কর। একবার এই মন্দিরে দৌড়াবে, আরেকবার সেই মন্দিরে দৌড়াবে, আজকে এই বাবাজী, কাল সেই ফকিরের, পরশু ঐ নেতার কাছে গিয়ে হত্যে দেবে। দুঃখ যা পাওয়ার সে তো তা পাবেই তার সাথে এগুলো অতিরিক্ত দুঃখ সে পায়। অজ্ঞানীর যখন সুখ আসে তখন সে বলবে, আমি ধন্য, আমার মত সুখী এই জগতে কে আছে, হে ঠাকুর! এই দিন যেন আমি আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাই। অজ্ঞানী আর জ্ঞানীর এটাই তফাৎ। জ্ঞানীরা তাহলে কি করেন? আমার এই কর্তব্য, এর বেশি আমি আর কিছু করছি না। এরপর তাঁর কাজের কেউ প্রশংসাই করুক আর নিন্দাই করুক ওদিকে জ্ঞানীর কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী দুজনের কাছেই সুখও আসে দুঃখও আসে, দুঃখ এলে জ্ঞানী দুঃখকে আটকাবার চেষ্টা করেন না, আর সুখ এলে ধরে রাখার চেষ্টা করেন না। তিনি জানেন সুখ, দুঃখ নিজের মত আসে নিজের মত চলে যায়, আমার কিছু করার নেই।

দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা করাটা কেমন? যেমন উট কাঁটা গাছ খায়, মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ে তবুও সে কাঁটা গাছ খাওয়া ছাড়তে চায় না। কুকুর যখন শুকনো হাড় চিবোয় তখন তার নিজের মুখ থেকেই রক্ত বেরোয় আর মনে করছে হাড়ের কী স্বাদ, তখন আরও বেশি করে চিবোয়। আমার যেটাকে আনন্দ মনে করছি, ঐ আনন্দের পেছনে যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তার কথা যদি একটু ভাবি তখন ঐ আনন্দটাও বিস্বাদ হয়ে যাবে। উপমা দিচ্ছেন, টাকা-পয়সা উপার্জন করা কি কঠিন পরিশ্রম সাপেক্ষ। যদি কোন রকমে ধন-সম্পদ পেয়েও যায়, এই ধন-সম্পদ মৃত্যুর স্বরূপা, তার কারণ ধন-সম্পদের জন্য এত রকমের ঝামেলা আসতে শুরু করে যে মানুষের আত্মবিস্মৃতি হয়ে যায়, নিজেকেই সে ভুলে যায়। টাকা আয় করতেও দুঃখ, যখন আসে তখনও দুঃখ, সব সময় দুশ্চিন্তা এই বুঝি হাত থেকে টাকা বেরিয়ে গেল, চোর ডাকাতে নিয়ে যাবে, আর যখন চলে যায় তখনও দুঃখ। টাকা যখন নেই তখনও দুঃখ, যখন আছে তখনও দুশ্চিন্তা এই বুঝে কেউ চেয়ে নেবে, আর চলে গেলেও দুঃখ। টাকা-পয়সাতেই এই অবস্থা হয় আর পুরুষ নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা হয়। যোগীশ্বর বলছেন ধন-সম্পদের কথা বিচার কর। আমরা এখানে তিন-চার হাজার আগেকার কথা আলোচনা করছি, তখন আর ব্যাঙ্ক, এলআইসি এত কিছু ছিল না, তাই টাকা-পয়সা না বলে ধন-সম্পদ বলছেন। বলছেন ধন-সম্পদ অর্জন করা কত কঠিন, কত কষ্ট করে অর্জন করতে হয়েছে, যখন ধন-সম্পদ থাকে তখন আবার অশান্তি, চুরি-ডাকাতির ভয়, রাজার ভয় মানে ইনকাম ট্যাক্সের ভয়, আর হাত থেকে যখন চলে যায় তখন আরেক অশান্তি। টাকা উপার্জনে পরিশ্রম, টাকা থাকলে উদ্বেগ আর টাকা চলে গেলে হতাশা এসে গ্রাস করে। যোগী বলছেন, কোন রকমে মানুষের কাছে যদি ধন-সম্পদ চলে আসে তখন এই ধন-সম্পদই আত্মার জন্য মৃত্যু স্বরূপ হয়ে যাবে। ধন-সম্পদ আর আত্মজ্ঞান কখনই এক সঙ্গে চলতে পারে না। মানুষ ধন-সম্পদ অর্জন করলেই নিজের স্বরূপকে ভুলে গিয়ে যত রকমের অনিত্য ও বিনাশধর্মী বস্তুকে জুটিয়ে নেয়। গাড়ী-বাড়ি জুটিয়ে নেবে, স্ত্রী-পুত্র জুটিয়ে নেবে, বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নেবে। সবটাই অনিত্য ও বিনাশশীল। একটা একটা করে বিনাশ হতে থাকে আর কাঁদতে থাকে।

এটা খুবই পরিতাপের যে, লোকেরা মনে করে যারাই ধর্ম পথে আসে তারা সব অপদার্থ, তারা কিছু পারে না। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের সাথে একবার কয়েকজন সাধুদের দেখা হল, সাধুরা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, লঙ্কা মে কৌন রাজ করতা হ্যায়। মহারাজ বললেন ইংরেজ সরকার। সাধুরা রেগে গেল, নহি! বিভীষণ রাজ করতা হ্যায়। সাধুদের নামে এখনও এই জিনিসটা প্রচলিত হয়ে আছে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, সাধুটি কেমন, তখন বলা হয়, লঙ্কা মে বিভীষণ রাজ করতা হ্যায়, মানে বলতে চাইছেন মুর্খ, কোন পাণ্ডিত্য নেই। কিন্তু এটাই কেউ বুঝতে চায় না যে, ধর্ম বোঝার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। লোকেরা ভাবে বয়স থাকতে সব ভোগ করে নাও, বুড়ো বয়সে গিয়ে ধর্ম কর্ম করা যাবে। বুড়ো বয়সে কি আর কিছু হয়! কম বয়সেও শুরু করতে হলে প্রচণ্ড সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। মোটা বুদ্ধি মানে, যারা নিজের স্বার্থ, কামিনী-কাঞ্চন

ভোগের বাইরে তারা আর কিছু বুঝতে পারে না, নিজের দেহ ছাড়া আর কিছু জানে না। একটা কুকুর যেমন নিজের আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের বাইরে কিছু জানে না, মানুষ মাত্রই এই তিনটের বাইরে আর কিছু জানে না। একটা তফাৎ অবশ্য আছে, কুকুর, বেড়াল বাচ্চা হওয়ার কিছু দিন পর তার কাছে আর আসতে দেয় না, মানুষ সারা জীবনই তার বাচ্চার বোঝা বয়ে বেড়ায়, এছাড়া আর কোন তফাৎ নেই। এটাই মানুষের স্বভাব, এই স্বভাব নিয়েই তাকে চলতে হয়, এটাকেই বলে স্থূল বুদ্ধি, গোদা বাংলায় মোটা বুদ্ধি।

তাহলে কি আমরা সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দেব? ছাড়ব কি ছাড়ব না, এই নিয়েই আলোচনা চলছে। নিমি রাজা এই নিয়েই যোগীশ্বরকে প্রশ্ন করছেন, স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা তাহলে কি করবে? ঈশ্বর দর্শন, সর্বভূতে আত্মদর্শন এগুলো তো সম্ভব নয়। আপনি আমাকে সহজ কিছু উপায় বলুন। তখন যোগীশ্বর প্রবুদ্ধ এই কথাগুলো বললেন, বিচার করতে হয়, সুখের আশায় সারা জীবন দৌড়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোথাও এতটুকু সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখ ছাড়া জীবনে কি আর কিছু আছে! গীতায় বলছেন, *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, যে অশান্ত তার কোথা থেকে সুখ আসবে। অশান্ত কে থাকে? যার চিত্ত সমাহিত নয়। সমাহিত চিত্ত কার হয়? যে ধ্যান করে। যতক্ষণ একটা জায়গায় মনকে নিয়ে স্থির করা না হবে ততক্ষণ মন সমাহিত হবে না। সমাহিত না হলে মন শান্ত হবে না, মন শান্ত মন না হলে সুখ কোথা থেকে আসবে! অথচ সুখের সন্ধানে সবাই দৌড়াচ্ছে। কোথায় সুখ পাবে, সব সময় হস্তচপল, বাকচপল, পদচপল, যার হাত, পা, মুখ এত নড়ছে তার মন কত নড়ছে ভেবে দেখুন। কেন এত নড়ে? ধ্যানটুক নেই বলে। মানুষ কার ধ্যান করে? যাকে ভালোবাসে তার ধ্যান করে। ভালোবাসাই শিখলো না, কার ধ্যান করবে! ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শিখল না, আত্মতত্ত্বকে ভালোবাসতে শিখল না, ধ্যান করবে কি করে! মানুষ স্ত্রী, পুত্রকে ভালোবাসে, তারই ধ্যান করে। স্ত্রী, পুত্র জগতের বস্তু ঠিকই, মন ওতেই একাগ্র, কিন্তু জগতের বস্তুতে মন একাগ্র হলে মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য থাকবে, সেইজন্য সমাহিত চিত্ত হয় না। স্বাভাবিক ভাবে তাই স্ত্রী পুত্র থেকে যে সুখ আসে এই সুখ প্রকৃত শান্তি দেয় না।

এখানে শব্দটা হল মিথুনীচারিণাং। সংসারী কে? যার মধ্যে মৈথুনের ভাব আছে, তার মানে তারাই সংসারী যাদের স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক আছে। মৈথুন করছে কি করছে না সেটা গুরুত্ব নয়, কিন্তু এক অপরের সাথে বন্ধনে জড়িয়ে আছে। এই ধরণের মানুষ সব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে কীভাবে দুঃখকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় আর একটু সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়। দুঃখকে দূরে রাখা আর সুখকে কাছে রাখার জন্য তাকে সারা জীবন ধরে কত রকম কর্ম করতে হয়। দুঃখ পাওয়ার জন্য কেউ কোন কাজ করে না। যারা আত্মহত্যা করে তারাও সুখ পাওয়ার জন্যই আত্মহত্যা করে, সে মনে করছে এই দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না, গলায় দড়ি দিয়ে দিলে এই দুঃখ কষ্টের যন্ত্রণার হাত থেকে শান্তি হয়ে যাবে। যোগীশ্বর বলছেন, সবাই দুঃখের নিবৃত্তি আর সুখপ্রাপ্তির জন্যই কাজ করে। কিন্তু দেখা যায় কীভাবে যেন কর্মের সব ফল বিপরীত হয়ে যায়। সুখের বদলে দুঃখই পায় আর দুঃখ নিবৃত্তি হওয়ার বদলে বাড়তেই থাকে। তিনি বলছেন যারাই সুখ পাওয়ার জন্য কাজ করে তারাই দুঃখ পায়। যারা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কিছু করে, কিছু দিন পরে দেখে যে তার দুঃখ আরও বেড়ে গেছে। যারাই দেহের সম্পর্কে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে, স্ত্রী ও পুরুষ এই ভেদ বুদ্ধি যাদের মধ্যে আছে তারা অনেক বড় বড় কর্ম করে। যত বড় কর্মই তারা করুক না কেন, কোন কর্মই তাদের সুখ দেয় না, সবটাই দুঃখেরই আকর। সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী যারাই দেহের সম্পর্কে বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষ এই ভাব নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে তাদেরই এই দুরবস্থা হয়।

ভগবান বুদ্ধও দুঃখের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ঠাকুর শব সাধনার কথা বলতে গিয়ে বলছেন – শব সাধনায় মাঝে মাঝে শব মুখটা হাঁ করে, তখন মুখের মধ্যে চাল ভাজা, ছোলা ভাজা ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়। আমাদেরও সেই একই অবস্থা। সংসারটাও একটা শবসাধনা। সংসারে আমরা সব সময়ই কষ্ট পাচ্ছি। যখন কষ্ট পেতে পেতে হাঁপিয়ে উঠি তখন প্রকৃতি একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে দেয়, যাতে আরো চলতে পারে। একটু মিষ্টি দিয়ে দিলো, ব্যস্! ঐটুকু পেয়েই আবার সে দৌড়াতে থাকে।

সবাই ছোটবেলায় যখন পড়াশুনা করতে চাইত না, তখন বাবা মা, দাদা দিদিরা বলত – বড় হলে আফশোস করবি। অথচ দেখা যায় তারাই বড় হয়ে কত উঁচু জায়গায় পৌঁছে যায়। পঞ্চাশোর্ধ বছরের কাউকে যদি বলা হয় আপনার জীবনের বাচ্চা বয়স থেকে আজ পর্যন্ত যে কোন পাঁচটি বছর আরেকবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আঁতকে উঠে প্রথমেই বলবেন 'না! আমি জীবনের কোন পাঁচ বছর ফিরে পেতে চাই না'। বেশীর ভাগ লোকই 'না'ই বলবে। এর তাৎপর্যটা কি? মানে, যদি সামগ্রিক ভাবে নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে সবারই দুঃখের শেষ নেই। এখানে এটাই বলছেন। যখন পিছন ফিরে তাকাব, আমি যখন খাটছিলাম, আমি যখন কাজ করছিলাম তখন আমি কি পেয়েছিলাম, দেখব দুঃখ বেড়েছে কিন্তু দুঃখ কখন লাঘব হয়নি। তখন কি হয়, তখন আর ইচ্ছে হয় না কর্মে জড়িয়ে পড়ার। একবার যে বুঝে যাবে যে আমি যত কাজ করছি ততই আমার দুঃখ কষ্টের বোঝা বেড়েই চলে, সেকি আর কাজকর্মে আর নিজেকে জড়াতে চাইবে?

প্রথমে তাই বিচার করতে হয় এই জগতে কোন সুখ নেই। তারপরে বিচার করতে হয়, *এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্মনির্মিতম্। সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্।।১১/৩/২০।।* খুব ছোট্ট শ্লোক কিন্তু এর ব্যাখ্যা বিরাট। যদিও এই জিনিসগুলো বর্তমানে অতটা প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও সংক্ষেপে এটাকে একটু বোঝা দরকার। বেদান্তে বলা হয় বেদান্ত অধ্যয়ন করার জন্য কে যোগ্য? অর্থাৎ বেদান্ত অধ্যয়নের অধিকারী কে? বেদান্ত কার জন্য? বলছেন, *ইহামুত্রফলভোগবিরাগ*, *ইহ* আর *অমুত্র*, অর্থাৎ এই জগতের ভোগ আর মৃত্যুর পরে যে ভোগ, *ফলভোগবিরাগ*, আমার কোন ভোগই লাগবে না। এই জগতে আমাদের যে ফলভোগ হয় মোটামুটি কামিনী, কাঞ্চন আর নামযশ দিয়েই হয়। এটাকেই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে বলবেন। কিন্তু মূলে গিয়ে এই তিনটেই দাঁড়িয়ে যায়, কামিনী, কাঞ্চন আর যশ। লোকে আমাকে মানুক জানুক, আমার কথা যেন সবাই মানে, বাড়িতেও যেন আমার কথা মানে, অফিসে যেন আমাকে সবাই মানে, এমনকি পাড়ার দূর্গাপূজার কমিটিতে আমার নাম যেন ঠিক জায়গায় থাকে, যখন বস্ত্র বিতরণ হবে তখন যে ছবি নেওয়া হবে সেই ছবিতে আমি থাকছি কিনা, এটা না থাকলে মানুষ মরে যাবে। অনেকে ভাববে লোকটা এসব কি করছে? কিছুই করছে না, এগুলোতে তার আমিত্বটা সামনে আসে। ভাগবত হল একেবারে আদর্শ ভক্তিশাস্ত্র, যদিও ভাগবতের ভক্তিকে জ্ঞানমিশ্রিত বলে। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের জেনে রাখা দরকার, ধর্মে কোন ধরণের চালাকি চলে না, ধর্মে কোন শর্টকাট পদ্ধতি নেই, ধর্মে কোন ধরণের ফাঁকিবাজি একেবারেই চলে না। যারা সহজ পথের কথা বলে তাদের একেবারেই বিশ্বাস করতে নেই। যে বাবাজীদের কাছেই যাক, যে আখরাতেই যাক না কেন, সবাই কত রকম আশ্বাস দেয়, তোমার এই ভালো হবে, সেই ভালো হবে। কিন্তু ঠাকুরের কাছে যদি কেউ আসতে চায় প্রথমেই তাকে বলে দেওয়া হয়, বাপু তোমাকে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এখানে আসতে হবে। এখানে কোন কিছু পাওয়া তো দূরের কথা, যেটুকু তোমার আছে সেটুকুও ছেড়ে দিতে হবে। তার মানে প্রথমেই বলে দিচ্ছেন এখানে কিছু পাওয়া যাবে না, এরপর যদি ঢুকতে চাও তাহলে এসো। আর যারাই বলে দিচ্ছে তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী করে দেবে, চোখকান বুজে বুঝে নিতে হবে যে স্রেফ বোকা বানাবার ব্যবসা ফেঁদেছে। ধর্মের প্রথম শর্টকাটটা হল কি করে আমার ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ হবে, ইন্দ্রিয় সুখ মানেই টাকার দরকার, টাকা ছাড়া ইন্দ্রিয় সুখ হবে না, তাই কামিনী কাঞ্চন দরকার। কিন্তু একটা বয়সের পরে সবারই মনে হয় মৃত্যুর পর কোথায় যাব, কিভাবে থাকব। ভারতীয় মানসিকতায় ছোটবেলা থেকেই স্বর্গসুখের ব্যাপারটা তৈরী করে দেওয়া হয়। সেইজন্য বলা হল ইদানিং কালে এটা তত প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু একশ বছর আগে পর্যন্ত লোকেরা স্বর্গ, নরক এগুলোকে নিয়ে খুব চিন্তা করত। কিন্তু তাও একটা বয়সের পর মনে হয় যে, শরীরটা চলে যাবে, তারপর আমি কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে থাকব। নিজের ব্যাপারে অতটা হয়ত ভাবছে না, কিন্তু খুব প্রিয়জন যদি মারা যায় তখন ভাবে সে কোথায় আছে, স্বর্গেই হয়ত আছে। আমাদের মূল গ্রন্থ বেদ, আর বেদ দাঁড়িয়েই আছে স্বর্গের ধারণার উপরে। যদি স্বর্গের ব্যাপার না থাকে তাহলে বেদ হবে না। যদিও বেদে অন্যান্য যে সুখ তার কথা আছে কিন্তু মূল হল স্বর্গপ্রাপ্তি। সেইজন্য নানান রকমের যজ্ঞযাগ ছিল, কিছু যজ্ঞ ছিল যেখানে যজ্ঞের উদ্দেশ্য থাকত আমি যেন এই জিনিসটা পাই। আবার কিছু যজ্ঞ ছিল, যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ, কোন রাজা সারা জীবন যুদ্ধ জয় করে করে মনে করল আমি পুরো ভারত জয় করে নিয়েছি। এবার তাকে দেখাতে হবে আমি সারা ভারতের রাজা

হয়েছি। তখন তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হত, একটা অশ্বকে ছেড়ে দেওয়া হবে, সেই অশ্ব এক বছর ধরে সব রাজ্যে ঘুরে বেড়াবে। ঘোড়া সব রাজ্য ঘুরে আসার পর এবার যজ্ঞ হবে, তখন সব রাজা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করা হত আর প্রচুর দান করা হত। মানে দেখানো যে আমি শুধু ক্ষমতাবানই নই, আমি দানধ্যানেও একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ঠিক তেমনি রাজসূয় যজ্ঞ আছে, বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ আছে, এই যজ্ঞ গুলো হল thanks giving, আমি যে একজন শ্রেষ্ঠ রাজা হয়েছি দেখিয়ে দিলাম। আবার অন্য ধরণের যজ্ঞ আছে যেখানে কিছু প্রত্যাশা নিয়ে করছে, এই যজ্ঞ করলাম আমি যেন রাজা হতে পারি। কিন্তু মানুষ জানে সবাই রাজা হতে পারবে না, এই জন্মে যদি নাও হতে পারি পরের জন্মে হব, কিন্তু স্বর্গে সবাই যেতে চায়। ভাগবত পুরাণ যে সময় রচিত হয়েছে সেই সময় স্বর্গে যাওয়াটা একটা বিরাট কিছু ছিল, যদিও ইদানিং কালে এই জিনিসটা অনেক কমে গেছে, কিন্তু আমরা প্রায়ই বলে থাকি মৃত্যুর পর আমি বৈকুণ্ঠলোকে যাব, রামকৃষ্ণলোকে যাব, স্বর্গ বলতে আগে যা বোঝাত সেই আইডিয়াটা আস্তে আস্তে চলে গেছে। সেইজন্য এখানে বলছেন, তুমি বিচার করে দেখো, মৃত্যুর পর তুমি বলছ তুমি স্বর্গে যাবে। কিন্তু স্বর্গে গিয়েও তোমার শান্তি নেই। স্বর্গেরও তারতম্য আছে, উচ্চ স্বর্গ, নিম্ন স্বর্গ এসব আছে, সেখানে আবার ইন্দ্র রাজা, তিনি তোমার থেকে বড়। হিন্দুদের যে স্বর্গ এই স্বর্গ আমাদের এই ভৌতিক জগতেরই সম্প্রসারিত একটা জগৎ। পৃথিবীর দুঃখের বড় আকার হল নরক আর পৃথিবীর সুখের বড় আকার স্বর্গ। এই আইডিয়াটা বেদেই ছিল, কিন্তু পরের দিকে যে ঋষিরা এলেন তাঁরা এই আইডিয়াটাকে সরাতে শুরু করলেন। যার জন্য গীতায় বলছেন *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*, যতগুলো ভুবন আছে, এই চতুর্দশ ভুবনের মধ্যেই সবাই ঘুরপাক খায় বা মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো*, যত রকম লোক আছে এগুলোকে ভালো করে বিচার কর, তার মানে কোন লোক নেই যেখানে যাওয়া যেতে পারে। মহাভারতেও এই ধরণের বিভিন্ন লোক নিয়ে অনেক বিচার নিয়ে এসেছেন, সেখানেও দেখান হয়েছে এসব লোক কোথাও নেই। তার মানে, বৈকুণ্ঠলোক বা রামকৃষ্ণলোক এই ভৌতিক জগতের সম্প্রসারিত জগৎ নয়। স্বর্গলোক বলতে যেভাবে বোঝায় বৈকুণ্ঠলোক, রামকৃষ্ণলোক সেই অর্থে লোক নয়, এটা হল আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের একটা অবস্থা। আমাদের এখানে যেমন দুটো অস্তিত্ব আছে, ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব। ভৌতিক অস্তিত্বের সম্প্রসারণ হল স্বর্গ আর বৈকুণ্ঠলোক হল আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সম্প্রসারণ। আরও আশ্চর্যের যে, ইসলামে যে জন্নতের কথা বলা হয়, এই জন্নত কিন্তু পুরোপুরি আধ্যাত্মিক অস্তিত্বেরই সম্প্রসারণ। কিন্তু মোল্লারা এই জন্নতকে টেনে জাগতিক ক্ষেত্রে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন ওদের যে স্বর্গের আইডিয়া, এটা ঠিক কোরাণের জন্নত নয়। আমাদের যেমন সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য ইত্যাদি আছে এই আইডিয়া কোরাণেও আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিজেকে আহার নিদ্রা মৈথুনের বাইরে দেখতে পারে না, যার ফলে জন্নতে এখন কেউ যদি যায় সে বাইশটি করে হুরি পাবে, হুরি মানে পরী। আর প্রত্যেকের বয়স পঁচিশ বছর, তাদের আবার মলমূত্র বিসর্জন হয় না। যে কোন ধর্ম দুটো স্তরে চলে, একটা হল যাঁরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান আর দ্বিতীয় স্তর চলে বাকি সব সাধারণ লোকেদের মধ্যে। সাধারণ লোকেদের স্তরে যে ধর্ম চলে সেখান এইসব উদ্ভট ধারণা গুলোকে চলে। আলোচ্য শ্লোকে এই ধারণাগুলোকে আটকাচ্ছেন, এই জগতের যে ফল সেটাকে ভালো করে বিচার কর আর মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে যে সুখ ভোগের চিন্তা করছ, যেটা বেদের ধর্ম, সেটাকেও বিচার করে ত্যাগ কর। আমাদের বেদেও বিশ্বাস নেই, স্বর্গেও বিশ্বাস নেই, আমাদের কাছে এই জীবন আছে, আনন্দ করে জীবনকে ভোগ কর, আর দেখ একটা বয়সের পর জীবনে যেন কষ্ট না আসে। সবাই বলে, হে ঠাকুর কষ্ট দিয়ে ফেলে রেখো না, সময় হলে এমনিই তুলে নিও। এটাই স্বর্গের ধারণা। আর মৃত্যুর পর কি হয় আমাদের জানা নেই, যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে যেন রামকৃষ্ণলোকেই যেতে পারি। এগুলো সব মুখের কথা। আসলে বর্তমান কালে আমরা অসহায় ভাবে সবাই কেমন ভৌতিকবাদী হয়ে যাচ্ছি।

সেইজন্য বলছেন স্বর্গের কামনাও করতে নেই। ওখানেও হিংসা, বিদ্বেষ লেগে আছে। স্বর্গেও যেসব রাজা, দেবতারা আছেন তাদের এক অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। মূল প্রশ্ন ছিল যাদের দেহাত্মবুদ্ধি আছে তারা কীভাবে দেহত্মবুদ্ধি থেকে বেরিয়ে আসবে? প্রথমে বলছেন বিচার করুন যে আমি এই সংসারে কাজ করে কি পেলাম। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলছেন – দেখছো তো সবই তো মরে যায়, তোমার মার

কত সন্তান হয়েছিল, তারা মরে যাওয়াতে তোমার মা কত কষ্ট পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন বলছেন – সবই কি মরে যাবে! তখন ঠাকুর শুনে বলছেন – ওরে বাবা! ভেতরে কত কি আছে।

আমরা যদি একবার আমাদের ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকিয়ে ভাবি, জীবনে আমি কি পেয়েছি, কি হারিয়েছি, কি সুখ পেয়েছি, কি দুঃখ পেয়েছি, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখা যাবে শুধুই হারিয়ে বসে আছি। এখানে আমাদের জীবনের সামগ্রিক চিত্রটা আনতে হবে, খণ্ডাংশ নিলে হবে না। এটাই তাদের জন্য প্রথম পদক্ষেপ, বিচার করে দেখছি সামগ্রিক ভাবে দুঃখের বোঝাই শুধু জমেছে। দ্বিতীয় বলছেন শুধু এই জগতেই নয়, স্বর্গেও সেই একই পরিস্থিতি। তাহলে আমি কি করব? এরপরে তৃতীয় বক্তব্য বলছেন, যা কিনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদান্তে বলছে '*ইহমুত্রফলভোগবিরাগ*'। আধ্যাত্মিক পথে কে যেতে পারে? সেইই যেতে পারবে যে এই জগতের সুখ, আর এর পরের জগতে সুখের প্রতি বৈরাগ্য এসেছে। এই জগতে আমার আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই, স্বর্গে গিয়েও আমার আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই। এই দুটোর একটার মধ্যেও যদি সামন্যতম দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলেই সর্বনাশ। চতুর্থ বলছেন, নিত্যানিত্য বিবেক, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল জানার নাম নিত্য ও অনিত্য বিবেক। কিন্তু সব থেকে বেশী গুরুত্ব হল দেহ বোধ থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র ইচ্ছা থাকা। যদি বলে, আমার মন কিন্তু এখনও ভোগ থেকে বেরোয়নি, কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে মুক্তির কথা, ঈশ্বরের দর্শনের কথা জেনেছি, আমার খুব ইচ্ছে হয় আমার মন যাতে ঐদিকে যায়। এখানে আসছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। যদু বংশের সবাই ঔদ্ধত হয়ে উঠেছিল, ঋষিদেরও তারা সম্মান করছে না। এই ধরণের ঔদ্ধত মনোভাব থাকলে হবে না। আমার মনোভাব হবে, আমার ভেতরে একটা তীব্র আকাঙ্খা এসেছে, কিন্তু আমি পথ পাচ্ছি না। আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

তখন কি করতে হবে বলছেন – সাহায্যের জন্য তুমি প্রথমেই একজন গুরুর শরণে যাও। সেই গুরু কেমন হবেন? মুণ্ডকোপনিষদ বলছেন *সমিৎপাণি শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, গুরুর কাছে যখন যাবে তখন হাতে দক্ষিণা নিয়ে যাবে, আর গুরু কিরকম হবেন? বলছেন *শ্রোত্রিয়ম্*, তিনি বেদ জানেন, শাস্ত্র পারগ, আর বলছেন *ব্রহ্মনিষ্ঠম্*, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া আর কোন কিছুতেই তাঁর মন নেই ব্রহ্মেই পুরো নিষ্ঠাটা দিয়ে রেখেছেন। এই রকম গুরুর কাছে গেলে তিনি তখন কি করবেন? শাস্ত্রে কি বলছে আর আমার নিজের অনুভূতি কি বলছে, এই দুটোকে মিলিয়ে ঠিক সেই মতো যথার্থ কথাগুলো আমাকে বলে দেবেন – এই হল সত্য, এখন তুমি এর অনুশীলন কর, করতে করতে তুমি নিজেই সব বুঝে যাবে। প্রথম কথা, মুক্তি লাভের ইচ্ছে থাকা চাই, দ্বিতীয় এই জগত আর পরলোকের সমস্ত রকম সুখ ভোগের বাসনাকে ত্যাগ করতে হবে আর তৃতীয় গুরুর সান্নিধ্যে আসতে হবে। যাকে তাকে গুরু করলে হবে না, প্রথম তিনি শাস্ত্র জানেন কিনা, আর দ্বিতীয় তাঁর ব্রহ্মে নিষ্ঠা আছে কিনা, গুরুর এই দুটো লক্ষণ অবশ্যই থাকতে হবে। এই রকম গুরুর সান্নিধ্যে আসতে হবে, তাঁর সান্নিধ্যে আসার পর তিনি যা যা বলবেন পর পর তা অভ্যাস করে যেতে হবে।

সেখান থেকে শুরু হবে ভাগবত ধর্ম। এর আগেও আমরা ভাগবত ধর্মের উপর আলোকপাত করেছি। ভাগবত পুরাণের বৈশিষ্ট্যই হল বার বার ভাগবত ধর্মকে সামনে নিয়ে আসবেন। এখানে ভাগবত ধর্মকে বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবত ধর্মে এটাই বলা হয়ে, যে জিনিসটাকে অভ্যাস বা অনুশীলন করলে আমরা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারি। উপনিষদে এতো বিস্তৃত ভাবে বলা নেই। বেদেও এতো বিশদ ভাবে বলা নেই। তন্ত্রে কিন্তু বিস্তৃত ভাবে বলা আছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে বিশদ ভাবে বলা আছে এভাবে আসন পাতবে, এই ভাবে পা ধোবে, এইভাবে মন্ত্র জপ করবে, এইভাবে নৈবেদ্য দেবে ইত্যাদি। ঠিক সেই রকম এখানেও ভাগবত ধর্মে একটা একটা করে ক্রমপর্যায়ে বলা হয়েছে।

যে কোন বহির্জগতের আকর্ষণে মানুষ নিজের স্বরূপকে ভুলে যায়। অর্থ সম্পদ বেশী হয়ে গেলেই মানুষ যত নাশমূলক বস্তুকে নিজের কাছে জড় করে নেয়। এখানে অর্থ বা সম্পদকে খারাপ কিছু বলছেন না, কিন্তু বলছেন অর্থ হলেই মানুষ যত নাশবান বস্তুকে জুটিয়ে নেয়। যেমন বেশ কিছু টাকা হলেই কেউ একটা বাড়ি বানাবে, গাড়ি কিনবে, ভালো মোবাইল ফোন রাখবে। এগুলো সবই নাশমূলক বস্তু। বাড়ি করলে তার

রক্ষণা-বেক্ষণ আছে, ট্যাক্স ভরতে হবে, আজকে এখানটা ভেঙে গেছে, গাড়ী, মোবাইলও তাই, আজকে এটা খারাপ হবে কাল সেটা খারাপ হবে। গাড়ির ইনস্যুরেন্স দিতে হবে, মোবাইল চুরি হয়ে যেতে পারে। যন্ত্রণা তার বাড়তেই থাকবে। এত কিছুর দিকে মনটা ছড়িয়ে যায় যে সে তার আত্মজ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরে যেতে থাকে। যদিও কখন সখন এদের মন যদি একটু ধর্মের দিকে যায় তখনও তারা চিন্তা করতে থাকে মৃত্যুর পর স্বর্গে কি করে সুখ পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বর্গসুখেরও বিনাশ আছে এটা তারা বোঝে না।

বলছেন যতক্ষণ কর্মের ফল পুরো না হয়ে যায় ততক্ষণ কিন্তু এই শরীর চলতে থাকবে। আর যে কর্মের জন্য যে শরীর পাওয়া বা যে লোক পাওয়া, সেই কর্ম শেষ হয়ে গেলে সেই শরীর বা সেই লোক থেকে আবার তার পতন হয়ে যাবে। এগুলোই খুব ভালো করে বিচার করতে। আমরা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আধ্যাত্মিকতাকে বোঝার জন্য দরকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি, ঐ সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে বার বার বিচার করা যাবে না। ঠিক আছে তোমার এখনও সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয়নি, এই স্থূল বুদ্ধি দিয়েই অন্তত একটু বিচার করে দেখ, এই যে তুমি স্ত্রী, পুত্র, স্বামীর পেছনে যে দৌড়াচ্ছ এতেও সুখ নেই, এটাকে বন্ধ কর। আর মৃত্যুর পর যে স্বর্গসুখের কথা চিন্তা করছ, এটাও বন্ধ কর। তাহলে এরপর কি করবে?

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপমাশ্রয়ম্।। ১১/৩/২১।। ইহামুত্রফলবিরাগ হয়ে গেলে এরপর গুরুর শরণ্ নাও। গুরুর ব্যাপারে দুটো শব্দ বলছেন, *শাব্দে* আর *পরে*। *শাব্দে* মানে শব্দ, শব্দ মানে বেদ, বলা হয় যত শব্দ আছে সব বেদ থেকেই বেরিয়েছে, গুরু যেন বেদে পারঙ্গম্ হন। বেদ পারঙ্গম্ মানে যে বেদ মুখস্ত করেছেন তা নয়, তিনি বেদের মর্মটা জানেন। ইদানিং কালে আমরা যে গুরুদের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছি তাঁরা কি সবাই বেদে পারঙ্গম্? বর্তমান কালে কথামৃতই বেদ, কথামৃত জানলেই বেদ জানা হয়ে যায়। কারণ বেদের যা কিছু বক্তব্য সব কথামৃতে আছে। তাছাড়া উপনিষদ ও গীতাও যদি ঠিক ঠিক জানা থাকে তাহলেও তাঁকে বেদে পারঙ্গম বলা যাবে। তবে কথামৃত পূর্ণাঙ্গ, বেদের যা সার তা উপনিষদে আছে, বেদ উপনিষদ কি বলতে চান তা গীতাতে আছে আর বেদ, উপনিষদ ও গীতা কি বলতে চান তা কথামৃতে আছে। আরও যদি একটু পারঙ্গম চান, কথামৃতের সাথে স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে। শুধু শব্দ জানলে হবে না, শব্দের পেছনে যে জ্ঞান আছে সেটাকেও জানতে হবে। *পরে* মানে পরমব্রহ্ম, ঈশ্বরের জ্ঞান যেন ঠিক ঠিক থাকে। গুরুর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে কিনা বা ঈশ্বরের জ্ঞান ঠিক ঠিক আছে কিনা আমরা কি করে জানব? এখানেই সমস্যা, কারণ ঈশ্বর দর্শন যাঁর হয়েছে একমাত্র তিনিই জানেন যে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, বাকিরা কিছুই বুঝতে পারবে না। সেইজন্য ঈশ্বর দর্শনকে বলা হয় স্বসংবেদ্য, বেদ মানে জানা, যাঁর ঈশ্বর জ্ঞান হয়েছে তিনি ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। এই কারণে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক পথে মানুষকে বোকা বানানো অনেক সহজ। কোন উপায় নেই জানার। কিন্তু ঠাকুর একটাই উপায় বলছেন, সাধুকে দিনে দেখবে রাতে দেখবে। সাধু হয়ে দিনরাত এর ওর সাথে ঝগড়া করছে, যদি বলা হয় আপনি তো সাধু, কেন এত ঝগড়া করেন, সাধু বলছেন, আমার বাইরেরটা দেখবে না, ভেতরটা তৈরী, পবিত্রতা, সাধুত্ব সব ভেতরে। কিন্তু তা না, সাধুর বাইরেও যা ভেতরেও তাই, দুটোই সোনা। দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির থেকে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আসত। একদিন ঠাকুর বার বার খোঁজ নিচ্ছেন, প্রসাদ এলো কিনা। যোগীন মহারাজ ব্যাপারটা দেখছেন, মনে মনে ভাবছেন। যত যাই হোক বামুন কিনা, লোভটা ছাড়তে পারছেন না। আমরা জানি না ঠাকুর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন কি ছিলেন না, কিন্তু মানুষের কিছু কথা, ব্যবহার দেখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকও বলে দিতে পারেন লোকটি কি রকম, তার মনে কি চিন্তা উঠছে। সাধু মহাত্মাদের বুদ্ধি এমনিতেই খুব তীক্ষ্ণ হয়, তাঁরা খুব সহজেই সব কিছু বুঝে নিতে পারেন যে জিনিসটা এই রকম হতে যাচ্ছে। আমরা মুর্খ তাই মনে করি তিনি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। যোগীন মহারাজের ক্ষেত্রে কোন অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপার নেই, সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার। যোগীন মহারাজ বাইরে থেকে এসেছেন, দাঁড়িয়ে দেখছেন ঠাকুর ছটফট করছেন। ঠাকুর তখন যোগীন মহারাজকে বলছেন, দেখো রানী রাসমনী এই মন্দির করেছিলেন এতে দুটো সাধু সেবা, কাঙালী সেবা হবে, আর এরা সব নিজেদের রাঁঢ়দের খাইয়ে দেয়, সেইজন্য ভাবছি আমার বরাদ্দটা ঠিকঠাক ভাবে এলে রানী রাসমনীর পয়সাটা একটু তো কাজে লাগল। ঠাকুরের মত

লোককে যোগীন মহারাজ পরীক্ষা করছেন, নরেন পরীক্ষা করছেন। ঠাকুরই আবার যোগীন মহারাজকে বলে দিচ্ছেন সাধুকে দিনে দেখবি রাতে দেখবি তবে গিয়ে সাধুকে চিনবি। এর বাইরে সাধুকে চেনার কোন উপায় নেই। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাই বিরাট সুবিধা, কারণ রামকৃষ্ণ মিশনে কেউ ব্যক্তি গুরু হন না, এখানে সঙ্ঘই গুরু। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বিভিন গুরুর জন্মদিন পালন করাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন আর ঠিক করে দিলেন সবার গুরুর জন্মদিন ঐ একটা দিন গুরুপূর্ণিমাতেই পালন করা হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের গুরু একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের কথা কখন প্রেসিডেন্ট মহারাজ, কখন ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ আবার কখন সাধু সন্ন্যাসীদের মুখ দিয়ে আসছে। দীক্ষা মন্ত্র, যে মন্ত্র দিয়ে জপ করা হয়, তা একমাত্র প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট বা যিনি ভারপ্রাপ্ত তিনিই সেই মন্ত্র দেন। সেইজন্য এখানে আমার গুরু বেদ জানেন কিনা, তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন কিনা এসব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। জানার তো দরকার নেই, তোমার গুরু তো স্বয়ং ঠাকুর। স্বামীজীর গুরু যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন, তেমন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যাঁর কাছ থেকেই কেউ দীক্ষা নিন, তাঁর গুরুও শ্রীরামকৃষ্ণ। সমগ্র রামকৃষ্ণই সঙ্ঘই আমাদের গুরু, আর শাস্ত্রে গুরুর যা যা বর্ণনা করছেন, তার সবটাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আছে।

এখানে গুরুর বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বলছেন, গুরু তোমাকে বেদের কথা বোঝাতে পারবেন। আর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে কিনা যদি বুঝতে চাও তখন দেখবে *নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্,* তাঁর ইন্দ্রিয়গুলো শান্ত হয়ে গেছে, তার সাথে জাগতিক কোন কিছুতে তাঁর কোন আগ্রহ থাকে না। যদি দেখ তাঁর চিত্তে চাঞ্চল্য আছে, পাঁচ রকম কাজে ও কথায় নিজেকে জড়িয়ে রাখেন, তাহলে বুঝবে কিছু গোলমাল আছে। একবার স্বামী গম্ভীরানন্দ কোন সেন্টারে গেছেন, মহারাজ এমনিতেই খুব কড়া ছিলেন। সেখানে একজন মহিলা এসেছেন, পাশে অন্যান্য মহারাজরাও আছেন। মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে মহারাজকে বলছেন, মহারাজ আমার নাতীর শরীর খুব খারাপ। মহারাজ বলছেন, ডাক্তার দেখাও। মহিলা বলছেন, দেখাচ্ছি, তাও সারছে না। তাহলে আরও ভালো ডাক্তার দেখাও। মহিলা তাও বলে যাচ্ছেন, অনেক ডাক্তার দেখান হয়েছে তাও ভালো হচ্ছে না। মহারাজ তখন বলছেন, তাহলে আমি কি করব? এই যে চিত্ত প্রপঞ্চ, যখন প্রপঞ্চটা থাকবে না তখন পঞ্চাশটা জিনিসে প্রবৃত্ত হয়ে আছে। তোমার নাতির শরীর খারাপ, তার বাবা আছে, মা আছে, আরও অনেকে আছে, তুমি অত অস্থির হয়ে কী করবে, তার সাথে সাধুদেরও উদ্বিগ্ন করতে চাইছ। যে সাধুরা ভক্তদের বেশি খবরা খবর নেয়, ভক্তদের ভালো মন্দে খুব আগ্রহ দেখায়, বুঝতে হবে তার চিত্তে প্রপঞ্চ লেগে আছে। সাধুরা ভক্তদের সাথে অবশ্যই দেখা করবে, কথাও বলবে, কিন্তু সব কথাই ঘুরে ঘুরে ঠাকুরের দিকে যাবে।

এই ধরণের গুরুর কাছে গিয়ে কি করতে হবে? *তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।।১১/৩/২২।।* এই রকম গুরুর সান্নিধ্য লাভ হলে গুরুকে নিজের প্রিয়তম আত্মা মনে করবে। আত্মা মানে, যেখানে আমি ভাবটা আসে। এর আগে এই নিয়ে আমরা অনেক লম্বা আলোচনা করেছি, মানুষ নিজের দেহকেই সব থেকে ভালোবাসে, সেইজন্য দেহকে আত্মা মনে করে। আবার যে নিজের সন্তানকে খুব ভালোবাসে, সে মনে করে আমার সন্তানই আমার আত্মা। কিন্তু তা নয়, গুরু যিনি, তাঁকে মনে করবে ইনি আমার প্রিয়তম, ইনি আমার দেবতা, ইনিই আমার আরাধ্য। আমাদের কাছে দেহ হল প্রিয়, তাই দেহ দেবতা, দেহটাই আরাধ্য, দিনরাত দেহের যত্ন নিচ্ছি, এই তিনটেকে সরিয়ে ওখানে গুরুকে বসিয়ে দিতে হয়, তখন গুরুই আমার প্রিয়, গুরুই আমার দেবতা, গুরুই আমার আরাধ্য। এরপর গুরুর কাছে হরি কথা অর্থাৎ ভাগবত কথা, ঈশ্বরের কথা শিক্ষা নেবে আর ধীরে ধীরে মনকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এগুলো করতে গেলে প্রথম কি করতে হবে? *সর্বতো মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গং চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ং চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্।।১১/৩/২৩।।* সবার আগে নিজের শরীর, নিজের পরিবার, সন্তান থেকে মনকে একটু সরাতে হয়। শরীর ও সন্তানাদির প্রতি আসক্তি একটু কমাবার পর ভগবানের যাঁরা ভক্ত তাঁদের কাছে শিখতে হয় ভগবানকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়। এরপর সমস্ত প্রাণীজগতের উপর কিভাবে যথাযোগ্য দয়া করতে হয়, সবার প্রতি মৈত্রীভাব কিভাবে আনতে হয় আর নিজের ভেতর যাতে নিষ্কপটতা আসে, এগুলো শিখতে হয়। মাছ মাংস খেতে গেলে আমাদের জীব হত্যা করতেই হয়, সেখানেও দেখতে হয়

যে মনে যেন কোন হিংসার ভাব না থাকে, আর আমার খাওয়ার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই যেন জীব হত্যা হয়। যোগশাস্ত্রেও বলছেন, মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা আর মুদিত। সবারই প্রতি মৈত্রীর ভাব, যেখানে দুঃখ কষ্ট দেখবে সেখানে করুণার ভাব, শত্রুরও যদি কোন কষ্ট হয় সেখানেও করুণার ভাব নিয়ে আসতে হয়। যেখানেই কোন শুভ কাজ হচ্ছে দেখা যাবে, সেখানে আনন্দ প্রকাশ করতে হয়, আর যেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু খারাপ হচ্ছে সেখানে উপেক্ষা করে ওখান থেকে সরে আসতে হয়। জগতে চলার সময় এই চার রকমের ইমোশানস্ আমাদের মধ্যে সব সময় আসতে থাকে। জগতে চলতে গিয়ে দেখা যাবে কোথাও সুখ, কোথাও দুঃখ, কোথাও ভালো কাজ হচ্ছে আবার কোথাও বা বাজে কাজ হচ্ছে। এই চার ধরণের পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে? যেখানেই সুখ সেখানেই মৈত্রীর ভাব, যেখানেই দুঃখ সেখানেই করুণার ভাব, যেখানে পূণ্য সেখানেই আনন্দ প্রকাশ করা, মুদিত আর যেখানে কিছু গোলমাল হচ্ছে দেখা যাবে সেখানে উপেক্ষা। এগুলো অনুশীলন করতে হয় এর সাথে ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, অন্তর বাহির সব শুদ্ধি, তিতিক্ষাদি করতে হয়।

সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।।১১/৩/২৫। যাঁরা ঠিক ঠিক পণ্ডিত হন, এখানে পণ্ডিতের অর্থ মানে শাস্ত্রজ্ঞ নয়। গীতাতে পণ্ডিতের অর্থ যাঁদের বুদ্ধি সব সময় আত্ম বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত, আত্মা ছাড়া যাঁরা কিছুই দেখেন না একমাত্র তাঁরাই ঠিক ঠিক পণ্ডিত, এনারা কখন অনাত্ম বিষয়ের দিকে মনকে যেতে দেন না। অর্থাৎ অনিত্য বস্তুকে পাওয়ার কোন চেষ্টা করেন না। মানুষ যখন ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পথের দিকে এগোতে শুরু করে তখন তাকে, যেটাই দেশ, কাল ও বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ সব কিছুকেই একমাত্র আত্মস্বরূপ দেখতে হয় কিংবা সেই ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি রূপে দেখতে হয়। ঈশাবাস্যোপনিষদে ঠিক এই কথাই বলছেন *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ*। জগতে যা কিছু আছে সবই ভগবানেরই রূপ। যা কিছু দেখছি সবই সচ্চিদানন্দ সাগরের এক একটা ঢেউ। এই বাড়িটা আমার বাড়ি, এটা আমার গাড়ি এই ভাবটা রাখতে নেই। ঈশ্বর এই বাড়ি দিয়েছেন এখন এখানে আছি, কাল ঈশ্বর এখানে রাখবেন কি রাখবেন না আমি জানিনা।

এখানে গৃহস্থ আর সন্ন্যাসী কেমন ভাবে থাকবে বলা হল। সর্বত্র সেই চৈতন্যরূপী আত্মাকে ও ঈশ্বরকে দর্শন করতে হবে। বলছেন গৃহস্থ সাধারণ পবিত্র শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করবে আর সন্ন্যাসীর কপালে যা আসছে, ভালো মন্দ যেটাই আসছে সেটাই ধারণ করবে। বর্তমান যুগে স্বামীজী সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে দেওয়াতে সঙ্ঘ থেকেই সন্ন্যাসীদের জামা কাপড় এসে যায়। কিন্তু আগেকার দিনের সন্ন্যাসীদের কে দেবে? তাই যা জুটত সেটাই তাঁরা নির্লিপ্ত ভাবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু গৃহস্থদের বলা হচ্ছে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করতে। রাত্রের বাসি কাপড় মানেই অপবিত্র বস্ত্র। প্রত্যেক দিন ধৌত বস্ত্র, অর্থাৎ গতকাল যে বস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেটাকে না ধুয়ে পরিধান করবে না। এই কথাগুলো সেই গৃহস্থদের বলা হচ্ছে, যারা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে চাইছে। যারা খুব দামী দামী পোষাক ব্যবহার করে, আর দামী পোষাক রোজ রোজ কাচাকাচি করা যায় না, অত দামী পোষাক নষ্ট হয়ে যাবে, তখন মায়া লাগে। তার মানে সে এখনও জাগতিক বস্তুর প্রভাবে পড়ে আছে। শাস্ত্রে অবশ্য বলা আছে একমাত্র পশমের বস্ত্র কখন অপবিত্র হয় না। আধ্যাত্মিক পথের যারা যাত্রী তাদের সব সময় শুদ্ধ পবিত্র থাকতে হবে।

যে সব শাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রাপ্তির বর্ণনা আছে সেই সব শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখাতে হবে আর শাস্ত্র শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণ করার পর মৌন অবলম্বন করতে হবে। যতক্ষণ মন শান্ত না হচ্ছে ততক্ষণ কোন মানুষই আধ্যাত্মিক পথে আসতে পারেনা। মন শান্ত করার প্রথম ধাপ হল বাক্‌সংযম। বাকসংযের দ্বারা মন যখন শান্ত হয় তখন আধ্যাত্মিক ভাবগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সব সময় খিঁচখিঁচানি লেগেই আছে, প্রত্যেকটি ব্যাপারে মানুষ খিটখিটে হয়ে পড়ছে – রান্না নিয়ে খ্যাচামেচি, বিছানা নিয়ে মেজাজ গরম, বাড়িতে কাজের লোক আসেনি, কাজের লোকে এসে বাসন ঠিক মত পরিষ্কার করছে না সব কিছুতে খিচখিচানি লেগেই আছে। সব সময় সংসারেই মন পড়ে আছে। এরা আর কি করে ঈশ্বর চিন্তা করবে আর কি করেই বা আধ্যাত্মিক পথে আসবে! সেইজন্য সংসারের সব কাজকর্মকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখতে হয়। এবার এই নিয়মের মধ্যে যখনই চলা শুরু করবে তখনই মন আস্তে আস্তে শান্ত হতে থাকবে।

শ্রীকৃষ্ণ যদি চান তিনি এক্ষণে পাপরাশি নাশ করে দিতে পারেন। পাপের সম্বন্ধে কথা উঠলেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে পাপ জিনিসটা কি। ঠাকুর এক কথায় পাপের খুব সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন – যে কাজ করার পর মন খুঁত খুঁত করে সেটাই পাপ কর্ম। মনই শেষে গুরু হয়ে যায়। বেদান্তের দৃষ্টিতে যে কোন কর্মই পাপ, পাপ মানে বন্ধন। যে কোন কর্মই বন্ধন সৃষ্টি করে। সেইজন্য বেদান্ত বলছে তোমাকে পাপ-পূণ্যের পারে যেতে হবে। তুমি যদি মনে কর রোজ সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের আরতি না করে আমি মনে শান্তি পাইনা, তখন বুঝতে হবে ওটাও তোমার জন্য বন্ধন। বলছেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হলে এক্ষণে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বদলে যে কোন ভগবানের নাম নিলে একই কথা হবে। স্বামীজী এটাকেই পাল্টে দিয়ে করে দিলেন আত্মা, আত্মদর্শন হলে সব পাপ-পূণ্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন*। স্তুপিকৃত কাঠের মধ্যে একটা জ্বলন্ত দেশলাই ফেলে দিলে মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত কাঠ ভস্মিভূত হয়ে যাবে। আমাদের ভেতরে ভালো-মন্দের কত কোটি কোটি কর্মের সংস্কার জমে আছে আর এই সংস্কার গুলো একবার এদিকে আরেকবার অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে আরও সংস্কার জড়ো করতে থাকতে। যতক্ষণ মানুষ আত্মচিন্তন না করছে ততক্ষণ এই সংস্কার কমবে না। সেটাই এইখানে বলতে চাইছেন। সেইজন্য বলা হয় সব সময় ঈশ্বরের নাম স্মরণ-মনন করে যেতে হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মানে যে কোন চৈতন্য সত্তার কথাই বলা হচ্ছে। মুসলমানরা আল্লার কথা মনে করবে। খ্রীশ্চানরা নিজের ইষ্টের কথা মনে করবে।

স্মরন্ত স্মারয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিম্। ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।।১১/৩/৩১। এইভাবে সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন রূপ সাধন করতে করতে অন্তরে প্রেমাভক্তির উদ্রেক হয়। ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর শরীরে কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। *পুলকাং তনুম্* – পুলক শরীর ধারণ করেন। সাধারণ মানুষের শরীর কামতনু, কাম দিয়ে তৈরী। জন্ম থেকে জ্ঞান হওয়া অবধি আমাদের কাম ছাড়া আর কিছু নেই, এটা চাই সেটা চাই, চাওয়ার পরিসীমা নেই। এই চাওয়া-পাওয়াটাই কাম, কাম মেটাতেই এই শরীর। কিন্তু এই মানুষই যখন ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন তার শরীরটাই পাল্টাতে শুরু হয়। তখন এই শরীরকে বলছেন পুলক তনু। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি উদয় হলে তার আলাদা একটা শরীর তৈরী হয়। এই স্থূল শরীর দিয়ে কখনই ঈশ্বর দর্শন হবে না, ঈশ্বর দর্শনের জন্য এই শরীর তৈরীই নয়। ঈশ্বর দর্শনের জন্য আলাদা চোখ দরকার পড়ে, ঈশ্বরের কথা শোনার জন্য আলাদা কর্ণের দরকার, সব আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয় তৈরী হবে। ঠাকুরের কথা শুনে একজন ভক্ত হাসছেন। হাসি দেখে ঠাকুর বলছেন – না গো সত্যি বলছি, শরীরের সব ইন্দ্রিয়ই পাল্টে যায়। তখন সে ঈশ্বরের নানা রকম লীলার কথা চিন্তা করে, ভাবতে শুরু করে, তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই সে কখন হাসে, কখন কাঁদে। এসব বলার পর শেষের দিকে খুব সুন্দর বলছেন *ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।১১/৩/৩২।।* তখন একটু ঈশ্বরীয় কথা কানে এলেই শরীর পুলকিত হয় আর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝে ঈশ্বরের অদর্শন জনিত বিরহে এমনই কাতর হয়ে যায় যে, বলতে শুরু করে এখনও ঈশ্বরের দর্শন কেন পেলাম না, বলতেই চোখের জলে বুক ভেসে যায়। ঈশ্বরের ভাবে বিভোর হয়ে এই হাসছে, এই কাঁদছে, কখন ভাবের ঘোরে ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে থাকে, কখন ঈশ্বরের কোন লীলা বা তত্ত্ব চিন্তনে বিভোর হয়ে থাকে, কখন আবার আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করে, ইষ্টকে যেন সুখী করার চেষ্টা করছে। কথামৃত পড়লে এগুলো খুব ভালো বোঝা যায়। ভাগবতের এই অধ্যায়ে ভক্তির নানা রকম লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই ভক্তিও পরা ভক্তি নয়। এখান থেকেই মন উচ্চ ভাবে চলে যায়, তখন কখন হাসে, কখন কাঁদে, এই লক্ষণগুলো দেখা যায়। জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামীজীকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তিনি নিজেকে বলতেন Friend of Swami Vivekananda। বেলুড় মঠের গেস্ট হাউসে এসে থাকতেন। একদিন এক মহারাজ তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন উনি দরজা বন্ধ করে স্বামীজীর ছবির সামনে বিভোর হয়ে জোর নৃত্য করে চলেছেন, স্বামীজীকে খুশি করছেন। অথচ স্বামীজীর শরীর কবে চলে গেছে, এই ঘটনা ১৯৩০ সালের আর স্বামীজী দেহ ছেড়েছেন ১৯০২ সালে।

যে মহারাজ এই দৃশ্য দেখেছিলেন তিনি জীবনে ঐ দৃশ্য ভুলতে পারেননি। এগুলোই হল সত্যিকারের ঈশ্বরীয় ভাব। খ্রীশ্চানদের মধ্যেও এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আছে। ঠাকুর বলছেন এসব ভাবের বিষয়, সময় না হলে শুনে কিছু বোঝা যায় না, তবে শুনে রাখতে হয়। এই অবস্থায় মানুষ যখন পৌঁছে যায় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রেমাভক্তিতে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। একমাত্র তখনই সে মায়াকে পার করতে পারে।

জগতের সমস্ত মানুষ তিনটে জিনিষের প্রতি ছুটছে – কামিনী, কাঞ্চন আর ক্ষমতা। কেউ যদি আমার সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে, কিংবা কটূ কথা বলে থাকে, একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সে কিন্তু কামিনী, কাঞ্চন আর ক্ষমতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আমি এখন চৈতন্যসত্তাকে উপলব্ধির লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক যাত্রা পথের একজন পথিক। আমার মধ্যে যে শক্তি আসবে সেটা সরাসরি চৈতন্যসত্তার। তাই তার সাথে আমার আর কিসের লড়াই। আমাদের দুজনের পথটাই পুরো বিপরীত হয়ে গেছে। সে যদি এসে বলে আমিও আধ্যাত্মিক পথে চলতে চাই। তখন তাকে বলা হবে, ভাই! তুমি এখন বিকারের রোগী, তোমার জ্বরটা আগে কমতে দাও। কামিনী, কাঞ্চন ও পদ-মর্যাদার ভারটা আগে হাল্কা কর, তারপর কথা হবে। যখন হাল্কা করবে তখন কি কি করতে হবে একটা পর একটা বলে দেওয়া হবে। এর মধ্যে আছে সাধুসঙ্গ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধু মুখে শাস্ত্র শ্রবণ, শাস্ত্রের কথা মনন, নির্জনবাস ইত্যাদি। এগুলো করার পর ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদয় হবে। তখন বিধিপূর্বক ভক্তি করতে শুরু করবে। বৈধি ভক্তি করতে করতে ঈশ্বরের প্রতি তার ভালোবাসা জন্মাবে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবার পর সে নিজের ভাবরাজ্যেই বিচরণ করতে শুরু করবে। সেখান থেকে প্রেমাভক্তির উদয় হয়। প্রেমাভক্তি থেকে মাঝে এক একবার ঈশ্বরের কোন রূপ দর্শন হচ্ছে, মাঝে মাঝে কোন অনুভূতি হচ্ছে। এগুলো হতে হতে ভাব পাকা হয়। ভাব পাকা হলে দেখে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই। যেহেতু এটা ভাগবত তাই শ্রীকৃষ্ণের কথা আসছে, অন্য গ্রন্থে ভগবানের অন্য নাম আসবে।

যখন ঠিক করে নিলে আমি ভাগবত ধর্মে যাব, ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভের জন্য আমাকে যা করতে হবে আমি সেইভাবে এগোব। গুরু পাওয়া গেল। এরপরে এক এক করে তাকে কিছু কিছু জিনিস অনুশীলন করতে হবে। তার মধ্যে যেমন প্রথমে বলছেন শরীর, সন্তান, সম্পত্তি, সম্ভোগ এগুলোর প্রতি অনাসক্তি – গীতায় বলছেন, *অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, আমাদের শাস্ত্রে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা আছে। ভগবানের প্রতি মানুষ কীভাবে এগোয়? গীতাতে ভগবান খুব মূল্যবান একটা উপদেশ দিচ্ছেন- পুত্র, স্ত্রী, ঘরবাড়ি এগুলো প্রতি যে তোমার তীব্র আসক্তি রয়েছে সেটাকে ত্যাগ কর আর *অনভিষঙ্গঃ*, এর মানে কখনই মনে করো না যে এটা আমারই, ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তোমার ব্যাথা হতে শুরু করল, এই জিনিসটা যেন না হয়। গীতার মত ভাগবতেও এটাকেই ভগবানের পথে প্রথম পদক্ষেপ বলছেন।

ভাগবত ধর্মের দ্বিতীয় পদক্ষেপের ক্ষেত্রে বলছেন – যারা ঈশ্বরের ঠিক ঠিক ভক্ত তাদের কীভাবে ভালোবাসতে হয় শেখার প্রয়োজন আছে। যার জন্য ঠাকুর বৈষ্ণব অপরাধের কথা বলতে গিয়ে বলছেন যারা ঈশ্বরের ভক্ত তাদের প্রতি কখন বিদ্বেষ ভাব রাখতে নেই। ঈশ্বরের ভক্তের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব কক্ষণ আনতে নেই। আমি যদি জেনে যাই এই মানুষটি ঠাকুরের ঠিক ঠিক ভক্ত, তাঁর প্রতি আমার একটা মৈত্রীর ভাব, শ্রদ্ধার ভাব আনতে হবে। ঠিক ঠিক ভগবানের ভক্তের প্রতি কি রকম আচরণ হবে সেটা অবশ্যই সবাইকে শিখতে হবে। তৃতীয় বলছেন – ভক্ত ভক্তের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে ও ভক্তের বিপদে আপদে ভক্তের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। হিন্দুদের মধ্যে এই জিনিসটার বড্ড বেশী অভাব। হিন্দুদের মতো এত আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপরতার ভাবে আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আর কি কি শিখবে – সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, মৈত্রী, বিনয়। এই গুণগুলি নিষ্কপট ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনের অঙ্গ করে নিতে হবে। প্রথমে নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি, যেমন কোন রামভক্ত যদি কোথাও রামভক্তে দেখে তার খুব আনন্দ হবে, একটা বিশেষ প্রেমের ভাব আসবে। এই ভালোবাসাটাই ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভক্তদের প্রতিও প্রসারিত হয়ে ধীরে ধীরে সমস্ত প্রাণীকুলের প্রতি বিস্তার করতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে নিজেকে শৌচে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে – পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, স্নানাদি নিয়মিত করা।

হিন্দুরা এই শৌচের উপর যেভাবে জোর দেয় অন্য কোন ধর্মে এই রকম জোর দেওয়া হয় না। হিন্দুদের কাছে শৌচ খুব গুরুত্ব। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হল, গ্রহণ ছেড়ে যাওয়ার পর সব চলে গেলে নদীতে স্নান করতে। গ্রহণ একটা অপবিত্র পরিস্থিতি, তাই স্নান করে মলিনতা দূর করে পবিত্র করে নিল নিজেকে।

বাইরে থেকে যেমন অপবিত্রতা আসে, আমাদের ভেতরেও অনেক অপবিত্রতা আছে, ছল, কপটতা ইত্যাদি। ভেতরে এই অপবিত্রতাকে পরিষ্কার করার জন্য এখানে একটা বিরাট তালিকা দেওয়া হয়েছে, এক একটা শ্লোকেই অনেক রকমের ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, প্রাণায়াম করা, জপ করা ইত্যাদি। ভেতরে অনেক রকমের অপবিত্রতা, মলিনতা থাকার জন্য প্রথমেই আমাদের ধ্যান হয় না। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন পবিত্রতা একটু বাড়তে শুরু করল, সেই সময় যখন ধ্যানের মধ্যে লীলা চিন্তন, রূপ চিন্তন করতে শুরু করে, তখন ধ্যান একটা বিশেষ মাত্রা পায়, ধ্যানের মধ্যে একটা অপূর্ব আনন্দানুভূতি হতে থাকে, এই আনন্দের সামান্য একটু আস্বাদ যদি হয়ে যায় তখন তাকে আরো বেশী বেশী করে পাবার আকাঙ্খা বাড়ে।

এই ভাবে চিন্তা করতে করতে একটা সময়ে তার মনে হয় এখনও তো ভগবানকে পেলাম না, কি করি, কোথায় যাব, কাকে জিজ্ঞেস করি, কে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে – এই সব ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল আসতে শুরু হয়ে যায়। আবার কখন কখন কি হয়, ভগবান যিনি সর্বশক্তিমান তিনিই কিনা রাসলীলা করার সময় গোপীদের ভয়ে লুকিয়ে পড়েন। এসব চিন্তা করলে তখন হাসি পেয়ে যায়, যিনি সর্বশক্তিমান তিনি গোপীদের, নিজের প্রেমিকাদের ভয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছেন ভাবলেই তো হাসি পেয়ে যাবে। মনের মধ্যে এই ধরণের নানান ভাবের খেলা চলতে থাকে। কথামৃতেও ঠিক এই ধরণের বর্ণনা আছে, ঠাকুর প্রায়ই ভাবরাজ্যে চলে যাচ্ছেন আর থেকে থেকে হাসছেন, কিংবা হঠাৎ একটু চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঠাকুরের ভাব আর ভাগবতের এখানে যা বলা হল, দুটো একই জিনিস। তিনি আর এই জগতে নেই, ভাবরাজ্যে চলে গেছেন। মা যেমন নিজের ছোট শিশুকে অত্যন্ত স্নেহ করে, মা একা একা কোথাও যাচ্ছে, যেতে যেতে তার বাচ্চার কোন হাসির কাণ্ড মনে পড়ল, তখন মা নিজের মনেই হাসছে, কিংবা বাচ্চার কোন কষ্টের কথা মনে পড়ে গেল, মা তখন নিজের মনেই ঘাবড়ে গেল। জাগতিক ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হয়। ভক্তের এই ধরণের ভাব যখন খুব গভীর হয়ে যায়, তখন তাকে অনেক কিছুই করতে দেখা যায়, কখন গান করছে, কখন নৃত্য করছে, কখন হাসছে, কখন বা কাঁদছে। শেষে ভক্ত ঈশ্বরের সান্নিধ্যেই শান্তি লাভ করে একেবারে চুপ মেরে যায়, জগতের কোন কিছুর প্রতিই তার আর কোন দৃষ্টি থাকে না।

চতুর্থ যোগীর সাথে নিমির আলোচনা চলছে। যোগী বলছেন 'যারা ভাগবত ধর্মকে এইভাবে গ্রহণ করে, গ্রহণ করে পালন করে, তারাই একমাত্র মায়ার রাজ্য পার করতে পারে'। কীভাবে পার করে? যিনি প্রভু, ভগবান, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তিনি তাঁরই হয়ে যান, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যান, কারণ সে নিজেকে পুরোপুরি তাঁর কাছে বিলিয়ে দিয়েছে, *মায়ামেতাং তরন্তি তে*। তার মানে, যে অতি সাধারণ লোক, সেও যদি বলে আমিও মায়াকে পেরোতে চাই, সেও পেরোতে পারবে। কীভাবে? যেভাবে বলে দেওয়া হল। প্রথমে ঈশ্বরকে তুমি সত্যিই পেতে চাইছ কিনা ভালো করে দেখ, তাঁকেই আমার চাই। দ্বিতীয় একটু বিচার করে দেখ জগতে তুমি জীবনভর প্রাণান্তক পরিশ্রম করে কি পেলে। তৃতীয় স্বর্গাদির দিকে কোন আকর্ষণ রাখবে না, বর্তমান যুগে অবশ্য স্বর্গাদির কোন গুরুত্ব নেই, আকর্ষণও নেই। চতুর্থ তুমি একজন গুরুর সন্ধান করে তাঁর সমীপে নিজেকে নিয়ে যাও। গুরু সেই হবেন যিনি শাস্ত্র জানেন আর শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করেছেন। একবার গুরু পেয়ে যাওয়ার পর এবার গুরুর কথামত সেইভাবে অনুশীলন করতে শুরু করে দাও। কিরকম অনুশীলন – প্রথমে নিজেকে আর জাগতিক কিছুতে জড়িয়ো না, অনাসক্তির ভাব নিয়ে এসো, দ্বিতীয় শুদ্ধিকরণ – নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এরপর বিনয়, পবিত্রতা, প্রেম, ভালোবাসা সহ ঈশ্বরের চিন্তন করতে হবে। তারপর সবার প্রতি প্রেম ভালোবাসা আনতে হবে, অপরের কষ্ট দেখলে তার কষ্টের লাঘব করার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে করতে করতে দেখা যাবে একদিন কখন সে কোথায় উঠে গেছে।

একদিনে এগুলো কিছুই হয় না, গীতায় বলছে *শনৈঃ শনৈঃ*। অন্য রকমও হয়, লালাবাবু বড় জমিদার ছিলেন, এক সময় প্রচুর দুষ্কর্ম করেছিলেন। একদিন বিকেলবেলা তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পাশেই ছিল ধোপার ভাটিখানা। মেয়েকে বাবা বলছে 'অনেক বেলাতো হলো বাসনায় কখন আগুন দিবি'। বাসনা মানে, আগেকার দিনে কলাগাছের ছাল পুড়িয়ে সাবান তৈরী হত, যে পাত্রে পোড়ান হত তাকে বাসনা বলে। ধোপার কথা লালাবাবুর কানে গেল 'অনেক বেলাতো হল বাসনায় আর কখন আগুন দিবি' ব্যস্ উনি ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন আর গাড়োয়ানকে বললেন গাড়িটা বাড়িতে ফেরত নিয়ে যেতে। ওখানেই তিনি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সোজা বৃন্দাবনে চলে এলেন, পরে তিনি বিরাট মহাত্মা হয়ে গেলেন। এটাকে বলে হঠাৎ আধ্যাত্মিক রূপান্তর, একটা কথা শুনল আর সেখান থেকেই সে ঈশ্বরের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করে দিল। এই ধরণের ঘটনা খুব কম দেখা যায়। বাকী সবারই আধ্যাত্মিক রূপান্তর ধীরে ধীরে হয়, তিল তিল করে এগোতে থাকে। কিন্তু সব সময় লেগে থাকতে হবে, একটু হাল ছাড়লে চলবে না।

স্বামীজীর জীবনে একটা ঘটনা আছে। তিনি তখন হিমালয়ের পথে চলেছেন। চলতে চলতে দেখেন এক বৃদ্ধা আর হাঁটতে পারছে না। তখন স্বামীজী তাকে পেছনে ফেলে আসা পথ দেখিয়ে বলছেন 'দ্যাখো মা, তুমি এতটা পথ হেঁটে এলে বাকী পথটাও তুমি হেঁটে চলে যাবে'। এই যে স্বামীজী বলে দিলেন তুমি এতটা পথ হেঁটে এসেছো, তার এমন উৎসাহ এসে গেল যে, এরপর বৃদ্ধা বাকী পথটাও উঠে এলো। আধ্যাত্মিক জীবনেও যদি কেউ পেছনের দিকে তাকায়, তখন সে দেখবে কোথায় ছিলাম আর এখন কোথায় চলে এসেছি। তিল তিল করেই তো এতটা পথ এসেছি। এইভাবে আরও কত এগিয়ে যাব। অবশ্য যদি এই সংগ্রামটা ধরে রাখতে পারে। যেখানে বন্ধ করে দেবে সেখানেই থেমে যাবে। আবার যদি সংগ্রাম শুরু করে তখন ওখান থেকেই সে আবার শুরু করবে। এটাই আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য।

এটা ঠিকই যে ঈশ্বরের সাথে এক হওয়ার কথা, শুধু আমাদের মুখের কথা। বেশির ভাগ মানুষের গুরুজনদের মুখে শুনে, বাড়ির একটা সংস্কারের প্রভাবে আর বিভিন্ন সাধু মহাত্মাদের কথা শুনে শুনে ধর্মের ব্যাপারে, ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা কৌতুহল জাগে। কিন্তু ঈশ্বরের সাথে যে একটা গভীর সম্পর্ক তৈরী হবে সেটা আর হয় না। সেইজন্য প্রথম অবস্থায় জোর করে এই পথে লেগে থাকতে হয়, লেগে থেকে অনেক রগড়াতে হয়। ব্যাকুলতা ঠাকুরের সাধনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই ব্যাকুলতা আমাদের কোন ভাবেই আসতে চায় না। গীতায় ভগবান বলছেন, *অভ্যাসেন কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন তু গৃহ্যতে*। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে একজন জিজ্ঞেস করছেন উপায় কি। ঠাকুর তখন বলছেন, কেন গীতায় অভ্যাস যোগের কথা বলছেন। আমাদের মধ্যে অনেকে দুর্বলতা রয়েছে সেগুলোকে চেষ্টা করে করে কমাতে হবে আর যে শুভ জিনিস গুলো আছে সেগুলোকে অনুশীলন করে বাড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা হল আলস্য, মনের স্থবিরতা। বিচার করলে দেখা যাবে কামিনী-কাঞ্চন আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়, কারণ সবাই অল্প বিস্তর সংসার থেকে বিরক্ত হয়ে আছে, আর একটা বয়সের পর মানুষের ভোগের স্পৃহাটাও কমে যায়। কিন্তু তাও এই পথে আসতে চায় না, চাইলেও এগোতে পারে না। এর একটাই কারণ অলসতা।

এসব কথা বলার পর এবার সাধনার কথা বলছেন। যখন ঐ ভাবের অবস্থায় এসে যায় তখন স্থিতিশীলতা অবস্থার দিকে এগোতে শুরু করে, এটাও কিন্তু পরা ভক্তি নয়। পরা ভক্তির মত মনে হয়, কিন্তু পরা ভক্তিতে জিনিসটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। যোগীশ্বর বলছেন, সাধক যখন ধ্যানের গভীরে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পান তখনই তিনি শান্তি পান, আর যখন সান্নিধ্য পান না, তখন তাঁর মনটাও চঞ্চল হয়ে যায়। এই প্রেমা ভক্তির উদয় হলে কি হয়? তখন বলছেন *ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া। নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্।।১১/৩/৩৩।।* ভাগবত ধর্মের শিক্ষা পাওয়ার পর প্রেমা ভক্তির উদয় না হলে আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় না। প্রেমা ভক্তি মানে ঈশ্বরের ভাবে নিরন্তর ডুবে থাকা, কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকবে না। সাধুরা তাই বলেন, সব সময় যদি তুমি ঈশ্বরের চিন্তনে ডুবে থাক তোমার মধ্যে সাংসারিকতা কোথা থেকে ঢুকবে, ঢোকার সুযোগই নেই। এনারাই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ, ঈশ্বর চিন্তন এনাদের টানা চলে। সাধারণ মানুষ পারে না, যাতে পারে সেইজন্য বৈধী ভক্তি করতে বলা হয়, এত জপ, এত পূজা, এত

অর্চনা করতে বলা হয়। কিন্তু বৈধী ভক্তিতে একটা বড় সমস্যা হল, মানুষ কিছু দিন পরে যান্ত্রিক হয়ে যায়, বৈধী ভক্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থেকে যায়, প্রত্যেক ধর্মেই এই সমস্যা আছে। মাঝে মাঝে অবতাররা এসে বৈধী ভক্তির এই কাঠামোকে নাড়া দিয়ে আধ্যাত্মিক ভাবকে আবার সামনে নিয়ে আসেন, কিন্তু পরে ওটাও একটা উপাচার হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ভাগবত হল তাদেরই জন্য, যারা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছে। কিছু তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ভাগবত নয়। তুমি কি তোমার জীবনকে কাজে লাগাতে চাও? তাহলে ভাগবতে যা বলছে সেগুলোর অনুশীলন করে যাও।

ধর্মকে মানুষ কাপড়ের মত ব্যবহার করে। সবার জীবনেই তিন রকমের কাপড় থাকে। একটা কাপড় মানুষ বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে, যেমন মেয়েরা বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় বিশেষ দামী শাড়ি পড়ে যাবে, ফিরে এসে সেই শাড়িকে খুব যত্ন করে ভাঁজ করে তুলে রাখবে। বেশির ভাগ ভক্ত এই রকম, দীক্ষা নিল, দীক্ষা নেওয়ার পর মন্ত্রটা তুলে রেখে দেয়, বিশেষ দিনে ঠাকুরের জন্মতিথি বা নিজের জন্মদিনে ঠাকুরের কাছে যাবে, মন্দিরে প্রণাম করবে আর সেদিন খুব করে জপ করবে। দ্বিতীয় হল ফ্যাশানেবল পোষাক, ফ্যাশান শোতে পড়ে ঘুরে বেড়াবে, লোকে খুব প্রশংসা করবে, কিন্তু কোন কাজের না, ঐ পোষাক পড়ে ঘর সংসার করা যায় না। দূর্গা পূজা, কালী পূজা, নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ দিনে বিরাট আয়োজন করবে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে অনেক কিছু করবে, কিন্তু ওসব কোন কাজে লাগে না। উৎসব শেষ ধর্মও শেষ। আবার কিছু পোষাক আছে নিয়মিত আমরা ব্যবহার করছি, বাইরে যাওয়ার সময় ব্যবহার করছি, ঘরেও ঐ ধরণের পোষাক পড়ি। এই পোষাকই ঠিক ঠিক কাজে লাগে। ধর্মকেও ঠিক সেই ভাবে মানুষ ব্যবহার করে, অনেকে আছে যারা ধর্মকে বিশেষ ভাবে। আবার কিছু কিছু লোকের কাছে ধর্ম মানে, ঢাক ঢোল পেটাতে হবে, বলি হবে, হৈ হুল্লোড় হবে। কিন্তু যাঁরা ধর্মকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে নামিয়ে এনেছেন, তাঁদেরই জীবন এগোয়, বাকিদের এগোয় না। ভাগবত এটাই বলছেন, তুমি যদি ভাগবত ধর্মকে নিজের জীবনে কাজে লাগাতে চাও তাহলে কি কি করবে পর পর বলে দেওয়া হল। আমরা যে একেবারেই কিছু জানি না, বুঝি না তা নয়, কথামৃত পড়ছি, গীতা পড়ছি, উপনিষদ পড়ছি কিন্তু কিছুই হয় না। ভাগবত এখানে আরও বিস্তারিত করে বলে দিল।

এরপর রাজা নিমি যোগীশ্বরদের জিজ্ঞেস করছেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা সবাই পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনারা আমাকে বলুন, যাঁকে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়, সেই পরমাত্মার স্বরূপ কেমন? নিমি রাজার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন পঞ্চম যোগীশ্বর, যাঁর নাম পিপ্পলায়ন্। তিনি বলছেন *স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্ বহিশ্চ। দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র।।১১/৩/৩৫।।* ভগবান এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নিমিত্ত কারণ আর উপাদান কারণ। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনটে অবস্থাতেই তিনি এক থাকেন, বেদান্তে যার নাম অবস্থাত্রয় বিচার। এখন আমরা জানছি যে আমরা আছি, আমরা সবাই এখন জাগ্রত, এই জাগ্রত অবস্থাকে বলে প্রথম অবস্থা। এরপর আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্নে বহির্জগৎ নেই, কিন্তু মনের মধ্যে নানান রকম দৃশ্য আসছে, অনেক কিছু ঘটছে। এই দৃশ্যগুলো কোথা থেকে আসছে, কে এগুলোকে অনুভব করছেন? এই নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথা বলেন, এটা দ্বিতীয় অবস্থা। তৃতীয় অবস্থা সুষুপ্তির অবস্থা, গভীর নিদ্রায় চলে গেল, সেখানে আর কোন কিছু নেই। গভীর নিদ্রা থেকে ফেরত আসার পর একটা বোধ থাকে, আমি খুব সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম কিন্তু আমার কিছু মনে নেই, এটাকে বলছেন অভাব বোধ, আমার কিছু মনে নেই, এই বোধ হয়। আমার কিছু মনে নেই, এই জ্ঞান কিন্তু থাকছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই টেবিলে কি হাতি আছে? আমি বলব, না হাতি নেই। তার মানে হাতি নেই এই জ্ঞান আমার আছে। এখানে একটা বস্তুর অভাব, সেই অভাবের জ্ঞান হচ্ছে। সেইজন্য বেদান্তে অভাবটাও জ্ঞানের একটি পথ, যেটা দিয়ে জানা যায়। সুষুপ্তি অবস্থায় একটা জ্ঞানের পথ খোলা থাকে, যেখানে বলছে, আমি গভীর নিদ্রায় ছিলাম, আমার কিছু মনে নেই। ভগবান এই তিন অবস্থার পারে, এই তিন অবস্থার পারের অবস্থাকে বলে তুরীয় অবস্থা। প্রথম তিনটেকে বলে অবস্থাত্রয়, চতুর্থকে বলে চত্যুরীয় বা তুরীয়। তুরীয় মানে পারে, পারে মানে যিনি জাগ্রত অবস্থাকে দেখছেন, তিনি স্বপ্নাবস্থাকেও দেখেন আর সুষুপ্তি অবস্থাকেও দেখেন কিন্তু তিনি

নিজে এই তিনটে অবস্থারই পারে। যিনি জাগ্রত থাকছেন, স্বপ্নে যাচ্ছেন, সুষুপ্তিতে যাচ্ছেন, যেটার উপর কিছু ঘটছে, মানে মনের অবস্থা। কিন্তু তিনটেকেই যিনি দেখছেন তিনি এই তিনটে অবস্থারই পারে।

ঘোর বেদান্তীরা এই তিন অবস্থার বিচার করতে করতেই সারা জীবন কাটিয়ে দেন, তাঁদের কাছে সাধনা মানে অবস্থাত্রয় বিচার। ঠাকুর যে বলছেন, মা আমাকে শুষ্ক জ্ঞানী করিস না, ঠাকুর এই ঘোর বেদান্তীদের কথাই বলছেন। যেমন তোতাপুরী, তিনি অবস্থাত্রয় বিচারমার্গী, নেতি নেতিতে এটাই করেন। জাগ্রত, স্বপ্ন, আর সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থা। তিনটেকেই ত্যাগ করে মনকে সব সময় তাঁর উপর রাখ যিনি এই তিন অবস্থার পারে। যোগীশ্বর বলছেন, নারায়ণ হলেন এই তিন অবস্থার পারে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার তিনি সাক্ষী আর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনটিও তিনি করেন। যিনি আমাদের ভেতরে আত্মা রূপে বিরাজমান, তিনিই সব কিছুর সাক্ষী, তিনিই নারায়ণ।

খুব সুন্দর উপমা দিয়ে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছেন, অগ্নি থেকেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি, কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিকে প্রকাশিত করতে পারে না, দহন করতে পারে না, অগ্নির সামনে স্ফুলিঙ্গের কোন দাম নেই, ঠিক তেমনি নারায়ণ থেকেই সব কিছুর জন্ম, সব কিছু নারায়ণেরই রূপ কিন্তু কোন কিছুই নারায়ণকে মেপে নিতে পারে না। এই জিনিসটাকে ধারণা করি সত্যিই খুব কঠিন। খুব সহজে যদি বোঝান হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, আমাদের ডান হাত দিয়ে জগতের সব কিছুই ধরে নিতে পারি, কিন্তু নিজের ডান হাত দিয়ে ডান হাতকে কোন দিন ধরতে পারব না। কর্তার উপর ক্রিয়ার সব সময়ই নিতান্ত অভাব থাকে, কর্তার উপর ক্রিয়া হয় না। কর্তা আর কর্মের দ্বিতীয়া, দ্বিতীয়ার উপর কর্ম হয়, কর্ম যেখানে হয় সেখানে ক্রিয়া জড়িয়ে থাকবে। কিন্তু কর্তার উপর কখনই ক্রিয়া হতে পারে না। যিনি ঈশ্বর, যিনি আত্মা তিনি সনাতন কর্তা, তিনি সনাতন সাক্ষী, সেইজন্য তাঁর উপর কখনই ক্রিয়া হয় না। এই যে আমরা জানছি, এই জানাটা আসলে কে জানছেন? জানছেন একমাত্র আত্মা, সেইজন্য আত্মাকে কোন দিন জানা যাবে না। কথা কে বলান? আত্মাই কথা বলান, সেইজন্য আত্মাকে দিয়ে কিছু বলানো যাবে না। জগতকে যে আমরা বুঝছি জানছি, এই জানাটা কে জানছেন? আত্মাই বুঝছেন, জানছেন, তাই আত্মাকে কোন দিন বোঝা যাবে না, জানা যাবে না। যেমন চোখ সব কিছুকে দেখতে পারে কিন্ত চোখ নিজেকে কখনই দেখতে পারবে না। ঠিক তেমনি আত্মা, যাঁর জন্য সব কাজ হচ্ছে, ঐ কর্ম দিয়ে আত্মার কিছু করা যাবে না। যেমন একটা খড়্গ জগতের সব কিছুকেই দ্বিখণ্ডিত করে দিতে পারবে, কিন্তু খড়্গ নিজেকে খণ্ডিত করতে পারবে না। আত্মা সবাইকে জানেন, কিন্তু আত্মাকে কোন দিন জানা যাবে না, আত্মাই সনাতন জ্ঞাতা, নারায়ণই সনাতন জ্ঞাতা।

যখন নেতি নেতি করে বিচার করা হচ্ছে, সেখানেও তখন একটা অভাবের ব্যাপার থাকে। ভগবানের ব্যাপারে যখন বলা হয়, তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না, সেখানেও তখন নেতি নেতি আছে, কিন্তু ঐ নেতি সেখানে অভাব জ্ঞান রূপে নেই, যত রকম বাধক আছে নেতি নেতিতে সেগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যেখানেই জ্ঞানের ব্যাপার আসে, আমি চোখ দিয়ে একটা দৃশ্য দেখছি, এই যে দৃশ্যের জ্ঞান হচ্ছে, এখানে জ্ঞানের একটা পদ্ধতি জড়িয়ে আছে, যেটা দিয়ে আমাদের বুদ্ধি ধরে নেয়। যেমন আমি এই গ্লাশ দেখছি, আলো গ্লাশের উপর পড়েছে, ঐ আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে গেল, গ্লাশের আকৃতি তৈরী হল, সেখান থেকে মস্তিষ্ক এমন ক্রিয়া করে যার জন্য আমি এই গ্লাশকে জানছি। এগুলো হল যে বস্তু গুলোকে আমি দেখছি। কিন্তু এমন কোন অবস্থা হয় যেখানে কোন বস্তু নেই, তখন কি হয়? তখনও অভাব রূপে জানা হয়, অভাব রূপে জানা ব্যাপারটা এই জন্যই কঠিন যে, এই অভাব বোধ এটাও যে একটা জানার পদ্ধতি এই নিয়ে আমাদের ষড়দর্শনে নিজেদের মধ্যে প্রচুর বিবাদ আছে। কেউ বলছেন, অভাব পুরোদমে জানার একটা পদ্ধতি, অন্যান্যরা বলবেন, অভাব বোধ জ্ঞানের পদ্ধতি হতে পারে না, এই নিয়ে বেদান্তীরা এক রকম যুক্তি নিয়ে আসবেন, আবার অন্যান্যরা অন্য ধরণের যুক্তি নিয়ে আসবেন, নানান রকমের যুক্তিতর্ক চলতে থাকে। কিন্তু অভাব বোধটাও জানার একটা পদ্ধতি, বেদান্তের কাছে অভাব বোধ প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। যদি অভাব জানার একটা পদ্ধতি না হয়ে থাকে তাহলে বেদান্ত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যাবে। বেদান্ত দর্শন বলে

কিছু থাকবে না, অন্যান্য দর্শনের সাথে মিশে যাব। এই অভাব বোধই যে জানার একটা পদ্ধতি, এটাই বেদান্তকে অন্যান্য দর্শন থেকে আলাদা করে রেখেছে।

যদি অভাব একটা জানার পদ্ধতি হয়, নেতি নেতি যখন করা হচ্ছে, তখনও কিন্তু জানার একটা উপায় আছে। আমি যদি বলি এখানে হাতি নেই, তখন এই বলার মধ্যে একটা positive knowledge জড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনি আমি বলছি এই বোতল ঈশ্বর নয়, মন ঈশ্বর নয়, বুদ্ধি ঈশ্বর নয়, এই যে নেতি নেতি করা হচ্ছে এখানে কি অভাব জড়িত? বেদান্ত বলছেন, না, কারণ অভাব একটা প্রমাণ। এই প্রমাণ মানে, যেটা দিয়ে একটা জিনিসকে জানা যায়। কিন্তু নেতি নেতি, যার অর্থ অভাব, এখানে অভাব প্রমাণ জড়িত হয় না। কারণ নেতি নেতিতে অভাব প্রমাণ যদি জড়িত হয়ে যায় তাহলে ভগবানকে প্রমাণ দিয়ে বাঁধা হয়ে যাবে। যে কোন জানার পদ্ধতি দিয়ে ভগবানকে যদি জানা যায় তাহলে তিনি আর ভগবান থাকবেন না। যে ভগবানকে আমি জেনে গেলাম, যে ভগবানকে আমি ব্যাখ্যা করে দিলাম, সেই ভগবান আর ভগবান থাকবেন না, কারণ ভগবানই সনাতন কর্তা, তিনিই একমাত্র যা কিছু জানার জানছেন। যিনি একমাত্র জানছেন, তাঁকে আমরা কি করে জানব! জানা মানেই বুদ্ধি দিয়ে জানা, কিন্তু বুদ্ধি তো জড়, তাই প্রশ্নই নেই যে বুদ্ধি ভগবানকে জানতে পারবে। এখানে যোগীশ্বর বলছেন, ঈশ্বরকে জানার একটাই পথ, সেই পথ হল নেতি নেতি পথ। আমরা জগতে যা কিছু জানছি, বলব এটা নয়, কিন্তু যেটা আছে সেই জায়গাতে ইতি ইতিও হয় না, নেতি নেতিও হয় না, সেইজন্য ঐ জায়গাতে গিয়ে তিনি চুপ মেরে যান। কারণ তখন তিনি বোধে বোধ করেন। বোধে বোধ করা মানে, যিনি জানেন তিনিই জানেন, বাকি সব কিছু তাঁর খসে পড়ে গেছে। বিচার করতে করতে, নেতি নেতি করতে করতে গিয়ে যে জায়গাতে থেমে যায়, মানে আর নেতি বলারও কিছু নেই, সেই জায়গাতে অনুভূতি হয়। ঠাকুরের প্রথমের দিকের সাধনা সেখানে তিনি নেতি নেতি সাধনাই করছেন, জগতের যা কিছু সম্বল সব কিছুই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। নেতি নেতি ছাড়া সাধনা হয় না।

ইতি ইতি যে সাধনা সেখানেও নেতি নেতি সাধনা জড়িয়ে আছে, জাগতিক যা কিছু আছে সবটাই খসে পড়ে যাবে। মানুষকেও তখন মানুষ দেখছেন না, মানুষ খসে গিয়ে সেখানে ঈশ্বর এসে যান। মীরাবাঈকে একজন এসে বলছে 'আপনি তো সবাইকে কৃষ্ণ দেখেন, আমাকেও তো কৃষ্ণ দেখছেন'। মীরাবাঈ বলছেন 'হ্যাঁ দেখছি'। লোকটি বলছে 'আমি তাহলে কৃষ্ণ, আমি আপনার সাথে শয়ন করতে চাইছি'। মীরাবাঈ সঙ্গে সঙ্গে বলছেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো এখানেই আসুন আমরা শুয়ে পড়ি'। লোকটি বলছে 'এত লোকের সামনে! আপনি কী বলছেন'! মীরাবাঈ খুব সুন্দর কথা বলছেন 'আমি তো এদেরও কৃষ্ণ দেখছি, কৃষ্ণের সামনে কৃষ্ণের সাথেই শয়ন করব এতে আপত্তির কি আছে'! মীরাবাঈও এখানে নেতি নেতি করছেন, নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই নেতি হয়ে খসে পড়ে গেছে, নারী পুরুষের কোন বোধই নেই। মীরাবাঈ বৃন্দাবনে গেছেন, সেখানে একজন বড় বাবাজীর সাথে দেখা করবেন। বাবাজী বলে পাঠালেন, আমি কোন নারীর সঙ্গে দেখা করি না। মীরাবাঈও বলে পাঠালেন, বৃন্দাবনে জানি একজনই পুরুষ আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ, বাকি সবাই নারী, এই দ্বিতীয় পুরুষ আবার কোথা থেকে এসে গেল! নেতি নেতি মানে, ঈশ্বর বাদে যা কিছু আছে তার অস্তিত্ব নেই, ইতি ইতি মানে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে assert করা, দৃপ্ত ভাবে ঘোষণা করা। ইতি ইতি যে করছেন, আসলে ওটা নেতি নেতিরই একটা ধাপ। একটা ভালো জিনিস দেখছি, মন ঐদিকে চলে যাচ্ছে, ঐ জিনিসটাকে সরিয়ে সেখানে একটা দিব্য ভাব নিয়ে আসা হচ্ছে, যদিও মনে হবে ইতি ইতি কিন্তু এখানেও সেই নেতি নেতিই চলছে, বস্তু অর্থাৎ ঐ জিনিসটাকে নেতি নেতি করে সরিয়ে দেওয়া হল।

বলছেন নেতি নেতিতেও জ্ঞানের সত্তা লাগানো থাকে, কিন্তু নেতি নেতি জিনিসটা তা নয়, নেতি নেতি মানে যেখানে গিয়ে মনটা থেমে যাচ্ছে। কারণ অভাব জ্ঞানটাও একটা জ্ঞান। নারায়ণ হলেন যেখানে মনের গতি থেমে যায়, বাণীর স্ফুরণ বন্ধ হয়ে যায়, শুধু বোধে বোধ হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে কোথায় বোধ করেন? আমরা মনে করছি মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বোধ করছেন। ঠিকই, কিন্তু ঐ মন এমন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গিয়ে আত্মার সাথে এক হয়ে গেছে, মন আর আত্মাকে আলাদা ভাবে তফাৎ করা যায় না। মুশকিল হল আমাদের ধারণা বেদান্ত একটা তাত্ত্বিক জিনিস, কিন্তু বেদান্ত কোন থিয়োরীর জিনিস নয়, বেদান্ত এমন একটা

জিনিস যেটাকে চব্বিশ ঘন্টা অনুশীলন করতে হয়। সেইজন্য বেদান্তকে বাক্য দিয়ে, ব্যাখ্যা করে কিছুতেই অপরকে বোঝানো যায় না, যতক্ষণ না বেদান্তের সাধনা করা না হবে ততক্ষণ এগুলোকে কেউ ধারণা করতে পারবে না। সেইজন্যই বলা হয় বেদান্ত কোন theoretical knowledge নয়, practiceএর জিনিস। অনুশীলনে নামলে সব জিনিস চটপট পরিষ্কার হয়ে যাবে। Theoryতে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিছু বুঝতে পারবে না, সবটাই তখন শব্দের খেলা চলে। যার জন্য আচার্য শঙ্করের পর যত বেদান্তীরা এসেছেন আর এখন যত বেদান্তীরা আছেন, যাঁরা বেদান্ত পড়ান এনাদের বলাই হয় মায়াবাদী, যাঁরা শুধু মায়াকেই ব্যাখ্যা করতে থাকেন। ফলে যাঁরা পড়ান তাঁরাও confused আর তাঁদের ছাত্ররা আরও confused হয়ে যায়, কিছুই ধারণা করতে পারে না। এখানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, ধারণা করার জন্য বলা হচ্ছে।

প্রমাণ মানে একটা জিনিসকে কিভাবে জানা হয়, ইংরাজীতে বলা হয় Method of knowledge। জানার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে, খুব নামকরা প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন জিনিসকে জানাকে বলছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দ্বিতীয় অনুমান প্রমাণ, যেখানে যুক্তি দিয়ে একটা কিছুকে জানা হয়। তৃতীয় শাস্ত্র দিয়ে জানা। চতুর্থ উপমান প্রমাণ, একটা জিনিসকে তুলনা করে জানা, যেমন আমি সিংহ কখনো দেখিনি, চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখতে যাব। আমাকে বলে দেওয়া হল, দেখবে হলদে রঙের শরীর, কুকুরের মত চেহারা, হাড়ির মত মুখ, ঘাড়ে চুল আছে ইত্যাদি। সিংহের কোন ধারণা নেই, কিন্তু সিংহের ব্যাপারে এত বর্ণনা শোনা হয়ে গেছে যে দেখলেই বলে দেব, আরে এটাই তো সিংহ। সঙ্গে সঙ্গে সিংহের জ্ঞান হয়ে গেল। সিংহের জ্ঞান আমাকে কে দিল? আমাকে যে বলেছে সে অন্য ধরণের জিনিস বলেছে, যে জিনিসটা দেখছি তার সাথে অনেক অমিল, কিন্তু তাও জ্ঞান হয়ে গেল, এটাকেই বলে উপমান প্রমাণ। পঞ্চম অর্থাপত্তি প্রমাণ, কিছুটা বলা হয়েছে আর কিছুটা বলা হয়নি, যেটুকু জানা গেছে সেটুকু দিয়ে বাকিটা যেটা বলা হয়নি সেটার ব্যাপারে উপসংহার করে নেওয়া হয়। যেমন বলা হল, মোটা দেবদত্ত দিনে খায় না। তাহলে মোটা কি করে হল? তার মানে রাত্রে খায়, অর্দ্ধেকটা বলেছে বাকি অর্দ্ধেকটা বলেনি। মোটা বলেছে, দিনে খায় না বলেছে, রাতে খায় কি খায় না সে ব্যাপারে কিছু বলেনি। এটাকে বলে অর্থাপত্তি প্রমাণ। ষষ্ঠ আর শেষ প্রমাণ হল অভাব প্রমাণ। এই হল ষট্প্রমাণ। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, ষট্প্রমাণ দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। কেন জানা যায় না? কারণ ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, শাস্ত্র দিয়ে জানা যায় না, উপমানও হবে না, কারণ ঈশ্বরের সাথে কারুর তুলনা হবে না, আর ঈশ্বরের ব্যাপারে অর্দ্ধেকটা বলবে বাকি অর্দ্ধেকটা বলবে না, এই রকমও হবে না। সেইজন্য তাঁর ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। শেষে থেকে যায় অভাব প্রমাণ, অভাব প্রমাণ খুব সাংঘাতিক। কারণ সাধনাতে নেতি নেতি যে জিনিসটা থাকে তার সাথে অভাব প্রমাণের সাযুজ্য আছে। এনারা তাই বলছেন, নেতি নেতি জিনিসটা অভাব প্রমাণের অভাব নয়। কারণ নেতি জিনিসটা যদি অভাবের মধ্যে এসে যায় তাহলে ঈশ্বর জানা হয়ে গেল, ঈশ্বর প্রমাণের মধ্যে এসে গেলেন। ঈশ্বর যদি প্রমাণের মধ্যে এসে যান তাহলে তাঁর অনন্তত্বটাই শেষ হয়ে যাবে আর তার সাথে ঈশ্বর চৈতন্য, ঈশ্বর সাক্ষী, ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরে এর কোনটাই আর খাটবে না। এখানে যোগীশ্বর নিমি রাজাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, নেতি নেতিকে তুমি প্রমাণ রূপে নিও না, নেতি নেতি সরানোর অর্থে বলা হচ্ছে। এটাকেই যদি নিজের উপর নিয়ে আসা হয়, স্বয়ং নারায়ণই অন্তর্যামী হয়ে আমার ভেতরে আছেন, তখন আমি তাঁকে কিভাবে জানব? বলছেন জাগ্রত অবস্থায় যে কাজ করছে সে তিনি নন। তাহলে কি তিনি স্বপ্নাবস্থায় সব কিছুর সৃষ্টি করছেন? সেটাও তিনি নন। তাহলে সুষুপ্তি অবস্থায় আমার যে কিছু বোধ থাকছে না, সেখানে কি তিনি? না, ওখানে অভাব জড়িয়ে আছে, কারণ আমি জানি যে রাত্রিবেলা আমি যে ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমার কোন হুঁশ ছিল না। এই যে তিনটে অবস্থার পরিবর্তন, একটা থেকে আরেকটায় যাচ্ছে, এই পুরো জিনিসটা একটা ক্যানভাসে আলোছায়ার মত উঠছে নামছে, সেই ক্যানভাসটাই সেই অন্তর্যামী যিনি সবটাই জানেন। জাগ্রতকেও তিনি সাক্ষীর মত দেখে যাচ্ছেন, স্বপ্নকেও সাক্ষীর মত দেখছেন, সুষুপ্তিকেও সাক্ষীর মত দেখছেন। তিনি দেখছেন বলেই সুষুপ্তিতে যে অভাব বোধ যেটার জন্য আমাদের একটা বোধ হয় যে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম কিন্তু আমার কিছু মনে নেই। মূল কথা ভগবান হলেন সনাতন সাক্ষী, তিনিই কর্তা তিনিই সাক্ষী রূপে সবাইকে দেখছেন। যেমন নারায়ণ সমষ্টি

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন, ঠিক তেমনি আমার আপনার যিনি অন্তর্যামী তিনিও ব্যষ্টিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আমাদের সবার এই তিনটে অবস্থা আছে, এই তিনটে অবস্থাও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মত। তিনি আছেন বলেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয় আর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিও তিনি আছেন বলেই হয়। নারায়ণই সেই শুদ্ধ চৈতন্য, সচ্চিদানন্দ, তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, তিনি নিজের মায়া দ্বারা এই সব কিছুর সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। আর নারায়ণই আমার আপনার অন্তর্যামী রূপে আমাদের শরীর, মন, মনের অবস্থার সাক্ষী।

নিমি রাজার যখন বয়স কম ছিল সেই সময় তিনি তাঁর বাবার সামনে চারজন ঋষি কুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনৎ কুমারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নৈষ্কর্ম্য জিনিসটা কি। ঋষি কুমাররা সর্বজ্ঞ ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নিমি রাজার প্রশ্নের উত্তর দেননি। প্রায়ই একটা কথা বলা হয়, যিনি প্রশ্ন করেন তাঁর একটা পাত্রতা থাকা দরকার। প্রশ্ন করা মানে, আমার যে জ্ঞানের এলাকা আমি সেই এলাকা থেকে এক পা বাইরে যেতে পারি। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা দু চারটে কথা এদিক ওদিক থেকে শুনে নিয়েছি আর আরও অনেক কিছু জানার ইচ্ছে করে, সেইজন্য আমরা অনেক রকম প্রশ্ন করে থাকি। যাঁরা জানেন তাঁরা হয়ত উত্তর দেবেন না বা হেসে উড়িয়ে দেবেন বা এমন কথা বলবেন যেটাকে আমরা সিরিয়াসলি নিয়ে নেব। ঠাকুরও মজা করে বলছেন, একজন এসে আমাকে বলল, মশাই আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন তো। পাত্রতা মানে প্রশ্ন করার অধিকার, অধিকার মানে তার প্রস্তুতি আছে কিনা। আমাদের বেশির ভাগেরই প্রস্তুতি নেই, প্রস্তুতি নেই বলে পাত্রতা নেই, পাত্রতা নেই কিন্তু প্রশ্ন করে ফেলি। রাজা নিমির ঠিক এই সমস্যা ছিল। পরবর্তি কালে যোগীশ্বররা বলছেন, তখন তোমার বয়স কম ছিল বলে ঋষি কুমাররা তোমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। ঠাকুরের কাছে অনেকে এসে উদ্ভট সব প্রশ্ন করতেন, ঠাকুর উত্তর দিতেন কিন্তু তাদের মনের মত, অনেক সময় আবার পাশ কাটিয়ে যেতেন। একটা বাচ্চা ছেলে এসে ঠাকুরকে বলছে, মশাই! শুনেছি আপনি নাকি উপদেশ দেন, আমাকেও দুটো উপদেশ দিন। ঠাকুর রামলাল দাদাকে ডেকে বলছেন, ওরে রামলাল তাকের উপর কিছু উপদেশ রাখা আছে ওখান থেকে একে দুটো উপদেশ দেতো। রামলাল তাক থেকে দুটো সন্দেশ বাচ্চাক দিলেন। বাচ্চাটি সন্দেশ খেয়েছে, ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, কি কেমন লাগছে উপদেশ? বাচ্চাটি বলল, খুব মিষ্টি। ঠিক আছে, এবার এসো। আমরাও বেশির ভাগ সময় উপদেশ চাই না, আসলে সন্দেশ চাইছি। নিমি রাজা প্রশ্ন করছেন নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি কি, যেখানে মানুষ নিষ্কর্মা হয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক জীবনে জ্যোতি দর্শন, ঘন্টাধ্বণি শ্রবণ, স্থূল চোখে ঈশ্বর দর্শন এগুলোর কোন দাম নেই। আধ্যাত্মিক জীবনে কেউ এগোচ্ছে কিনা তার একমাত্র পরীক্ষা হয় শোক আর মোহ থেকে সে বেরিয়ে এসেছে কিনা। এটা হল প্রথম, এরপর বাকিগুলো পর পর চলতে থাকবে। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীর কাছে কোন বই থাকে না, কিন্তু জ্ঞানের সব কথা তাঁর মুখে। ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে গেছে কিনা তার প্রথম লক্ষণ হল তাঁর আর কোন কর্তব্য বোধ থাকে না, তখন কে স্বামী, কে স্ত্রী, কে সন্তান সব উড়ে যাবে। ঠাকুরের যখন সাধনার তোড় চলছে সেই সময় ঠাকুরেরও কোন বোধ ছিল না। পরের দিকে ছিল, তখন তিনি ভাব মুখে থাকতেন, কিছুটা ঐদিকে কিছুটা এই দিকে থাকতেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। কর্তব্য বোধ না থাকা মানে তাঁর কোন কর্তব্য নেই, কর্তব্য না থাকা মানে তাঁর কোন কর্ম নেই, কোন কর্ম না থাকা মানেই নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিই জ্ঞানের একমাত্র লক্ষণ। গ্রাম দেশে চায়ের দোকানে বুড়োগুলো সারাদিন বসে থাকে, কোন কাজ করে না। এদের কি নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি হয়ে গেছে?

এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিসকে বুঝতে হবে, যে জিনিসগুলো ষষ্ঠ যোগীশ্বর আবির্হোত্র বলছেন। তিনি এবার বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করছেন নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিটা কি। আমরা যা কিছু কর্ম করছি, সব রকম কর্মকে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে শ্রেনীভাগ করে তার বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা খুব প্রচলিত শ্রেনীবিভাগ আছে তাতে সমস্ত কর্মকে তিনটে শ্রেনীতে বিভাগ করা হয়েছে – কর্ম, অকর্ম আর বিকর্ম। কর্মের এই পরিভাষাগুলো খুব জটিল ব্যাপার, তার কারণ যেমন অকর্মকে একটা শাস্ত্রে একটা অর্থে নিচ্ছে আরেকটা শাস্ত্রে অন্য অর্থে নেওয়া হয়। এখানে আমাদের একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার, আগে থেকে যে জিনিস

গুলোর ব্যাপারে আমাদের জানা আছে বা ধারণা করে রেখেছি সেগুলোকে কখনই শাস্ত্রে লাগানো যাবে না। যে শাস্ত্র যখন অধ্যয়ন করছি তখন ঐ শাস্ত্র অনুযায়ী সব ঠিক আছে, যেমন ভাগবতে অকর্মের অর্থ এক রকম হয় আবার গীতাতে অকর্মের অর্থ অন্য ভাবে করা হয়েছে। সংস্কৃতের এই সমস্যা, একই শব্দকে অনেক সময় দুটো বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হয়। ভাগবতে তিন রকম কর্মের কথা বলছেন। কর্ম মানে যে কর্ম শাস্ত্র আমাদের করতে বলে দিয়েছে, অকর্ম মানে শাস্ত্র যে কর্ম করতে নিষেধ করছে, বিকর্মের অর্থ শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করা, অর্থাৎ পাপ কর্ম। গীতাতে আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমটা হল কর্ম, যেটা সবাইকে করতে হয়। এর মধ্যে প্রথম হল নিত্যকর্ম, নিত্যকর্ম সব সময় শাস্ত্র নির্দেশিত, যে কর্মগুলো আমাদের রোজ করতে হবে। পরিবার বা বংশ অনুযায়ী নিত্যকর্ম একটু পাল্টে যায়। যেমন যারা বংশ পরম্পরায় শিব ভক্ত, তাদের বলে দেওয়া হয়েছে তুমি রোজ শিবের পূজা করবে, আবার যারা বেদ মতে চলে তাদের হয়ত বলে দেওয়া হয়েছে তুমি দিনে তিনবার এইভাবে পূজা করবে, যারা কৃষ্ণভক্ত তাদের হয়ত বলছেন প্রত্যেক দু ঘন্টায় এই রকম করবে। সে যাই হোক না কেন, নিত্যকর্ম সবাইকে রোজ করতে হবে। নিত্যকর্মকেই পরের দিকে এনারা আরও সুনির্দিষ্ট করে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণায় নিয়ে এলেন, পাঁচটি যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থকে রোজ করতে হয়। প্রত্যেক হিন্দুকেই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হয়, পঞ্চ মহাযজ্ঞ যে করে না সে হিন্দু নয়।

প্রথম যজ্ঞ হল আধ্যাত্মিক চিন্তন/শাস্ত্র পাঠ, সবাইকেই রোজ করতে হবে। যারা বৈষ্ণব তারা বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করবে। দ্বিতীয় পূজা অর্চনা, পূজা অর্চনা আবার যে পরিবারের যে পরম্পরা সেই অনুসারে করা হয়। তৃতীয় পিতৃসেবা, পিতৃসেবা মানে বংশের যারা গত হয়ে গেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে একটু অন্নজল দেওয়া। চতুর্থ অতিথিসেবা, রোজ কোন অতিথিকে কিছু না কিছু সেবা করতেই হবে। যদি অতিথি না পাওয়া যায় তাহলে অতিথিসেবার নামে কিছু পরিমাণ অর্থ আলাদা করে রেখে দিতে হবে। পরে কোন সাধুবাবা বা কোন ভিখারী এলে তাকে সেটা দান করে দেওয়া। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, বাড়িতে যা কিছু রান্না করা হত তার থেকে একজনের মত খাবার আলাদা করে বাড়ির বাইরে রেখে দেওয়া হত। অতিথি আসুক আর নাই আসুক ওটা আলাদা করে রেখে দিতে হবে। পঞ্চম প্রানীসেবা, রোজ গরু, কুকুর, বেড়াল, পাখি এই ধরণের কোন প্রানীকে খাওয়াতে হবে। যাদের বাড়িতে গরু আছে, সেই গরুকে রোজ ঘাস, খড়, জল দেওয়াটা এর মধ্যে পড়ছে না, নিজে যতটুকু খাবে তার থেকে প্রানীদের জন্য একটু আলাদা করে সরিয়ে রাখা। নিত্যকর্মে এই পাঁচটি কর্ম রোজ করতে হবে। নিত্যকর্মের পর আসে নৈমিত্তিক কর্ম, নৈমিত্তিক মানে নিমিত্ত। বিশেষ দিনে বা বিশেষ উপলক্ষে যে কর্ম করা হয় তাকে বলে নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন বাড়িতে উপনয়ন হবে, বিবাহ হবে, শ্রাদ্ধ হবে বা শরৎকালে দূর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা, তখন বিশেষ ভাবে পূজার আয়োজন করা হয়। অথবা কোন একটা মানত ছিল, সেই মানত পূরণ হওয়ার যে পূজা করা হয় সেটাও নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে পড়ে। নিত্যকর্ম আর নৈমিত্তিক কর্ম প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গৃহস্থরা এই দুটো কর্মকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না, তখন তারা তৃতীয় একটা কর্মে নামে, তাকে বলে কাম্য কর্ম। আমাদের নানান রকমের চাহিদা আছে, ভোগ করতে চাইছি, টাকা-পয়সা চাইছি, সন্তান চাইছি, সন্তানের সুখ চাইছি, এই চাহিদা পূরণের জন্য অনেক কাজকর্ম করতে হয়, ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি আমার বাড়ির সবাই যেন ভালো থাকে, আমার এটা যেন হয়ে যায়, এই কর্মকে বলে কাম্য কর্ম। চতুর্থ একটা কর্ম হয় তাকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আবার দু রকমের হয়, একটা হল, আমি হয়ত কোন দোষ করেছি, আমিও জানছি যে আমার দ্বারা দোষ হয়ে গেছে, তখন শাস্ত্র মতে বা কোন সাধুবাবা কিছু বিধান দিয়ে কোন কর্ম করতে বলে দিলেন, আমিও সেই অনুসারে কিছু কর্ম করে দিলাম, তাতে আমার মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্বিতীয় আরেকটা প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হল, জান্তা অজান্তায় আমরা অনেক দোষ করছি, সেইজন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কিছু কিছু কর্ম করতে হয়, যেমন একাদশী ব্রত, গায়ত্রী পুরশ্চরণ বা পূর্ণিমা অমবস্যায় উপবাস করা বা তীর্থে গিয়ে অনেকে মস্তক মুণ্ডন করে নেয়, এগুলো সবই প্রায়শ্চিত্ত কর্মের মধ্যে পড়ে। পঞ্চম ও শেষ কর্ম হল নিষিদ্ধ কর্ম, নিষিদ্ধ কর্মকে কোথাও বিকর্ম বলে আবার কোথাও অকর্মও বলে। শাস্ত্র মতে এই পাঁচ রকমের কর্মই হয়।

ভাগবতে বলছেন, কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। কর্ম বলতে চারটি কর্মকেই বলছেন, নিত্যনৈমিত্তিক, কাম্য আর প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন এই কর্ম তুমি করবে। অকর্ম মানে নিষিদ্ধ কর্ম, এই এই কর্ম করবে না। বিকর্ম মানে শাস্ত্র নির্দেশিত কর্মের উল্লঙ্ঘন করা, গুরুদেব বলে দিয়েছেন সূর্যোদয়ের আগে গাত্রোত্থান করে স্নান করে জপ করবে। কিন্তু আমরা সূর্যোদয়ের পরেও লেপ মুরি দিয়ে নাক ডাকছি। এটা নিষিদ্ধ কর্ম নয়, শাস্ত্রে সকালে ঘুমোতে নিষেধ করেনি, কিন্তু আমাকে যেটা করতে বলে দেওয়া হয়েছে সেটাকে লঙ্ঘন করছি। ভাগবত এখানে বলছেন, বিকর্ম মানে কর্মের লঙ্ঘন। গীতাতে আবার অন্য ভাবে বলছেন, গীতাতে কর্ম মানে চারটে কর্ম, নিত্যনৈমিত্তিক, কাম্য আর প্রায়শ্চিত্ত কর্ম আর বিকর্ম মানে পাপ কর্ম, লঙ্ঘনকে ওনারা নিষিদ্ধের মধ্যেই গণ্য করেন আর অকর্মের মানে, কাজ করছে কিন্তু কাজটা কাজের মত দেখাচ্ছে না। গীতার দর্শন পুরো আলাদা। এখানে ভাগবতে যেভাবে বলতে চাইছেন আমরা সেই ভাবেই আলোচনা করছি।

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মকে বেদ দুটো শব্দে বলে দিচ্ছেন, বিধি আর নিষেধ। বিধি আর নিষেধ মানে, এই এই কাজ করবে আর এই এই কাজ করবে না। কিন্তু এই কাজটা করবে কি করবে না, এটা কে ঠিক করবে, আর কিভাবে ঠিক করা হবে? একটা কাজ নৈতিক না অনৈতিক কে ঠিক করে দেবে? আর সার্বজনীন মূল্যবোধ বলে কিছু আছে কি নেই? এই নিয়ে বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীরা যখন চারিদিকে নৃশংসতা করে বেড়াচ্ছিল, সেই সময় জুহুদের একটা বড় দল, প্রায় একশ লোক গোপনে জার্মানদের হাতে থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। সেই দলে এক যুবতী ছিল, তার কোলে একটি ছয় মাসের বাচ্চা। সেই সময় বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করেছে। কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেই নাৎসী বাহিনী তাদের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলবে। এখন এরা কি করবে? এতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচাতে বাচ্চার মুখ বন্ধ করবে কি করবে না? বাচ্চার মুখ বন্ধ করার একটাই পথ, গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। এগুলোকেই বলে ধর্ম সঙ্কট। ঐ গ্রুপের সবাই তখন আলোচনা করল, একজন মরবে নাকি একশ জন মরবে। তখন ওরা বাচ্চার গলা টিপে মেরে একশ জন লোকে প্রাণে বেঁচে বেরিয়ে গেল। এই ঘটনাটাই পরের দিকে খুব নামকরা আলোচ্য বিষয় হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তি কালে এই ঘটনাকে নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। দেখা গেল যারা ঠিক করেছিল বাচ্চাটাকে মেরে ফেলার তাদের বেশির ভাগ লোক আর তার মা পাগল হয়ে গিয়েছিল। যখনই দুটো ধর্মে সজ্ঘাত হয়, তখন কোন ধর্মটা পালন করা হবে, এই নিয়ে বিরাট সমস্যা হয়। যদি কাউকে খুন করা হয় তখন তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, আবার যদি যুদ্ধভূমিতে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের মারলে তখন তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হয়। এখানে এটাই বলছেন, বিধি আর নিষেধ কখন লৌকিক ভাবে ঠিক করা যায় না। এর বিধান সব সময় বেদ দিয়ে থাকেন। একমাত্র বেদই বিধি আর নিষেধ নির্ণয় করেন। বেদ যখন বলে দিচ্ছে এটা করবে আর এটা করবে না, ওটাকে আমরা কেন মানব বা তার ভিত্তি কি? বেদ যে কথাগুলো বলছে তার কিছু তো একটা আধার থাকতে হবে। তখন আমাদের বেদের পেছনে যে দর্শন আছে তাকে বুঝতে হবে।

বেদের বিধি ও নিষেধকে আধার করেই মনুস্মৃতি হয়েছে, কিন্তু এখন বেদের বিধি নিষেধ বা মনুস্মৃতির বিধি নিষেধ কেউ মানছে না। এখন একমাত্র চলে ভারতীয় পেনাল কোড আর ভারতীয় সংবিধান। ভারতীয় সংবিধান বলছে, ভারত এক অখণ্ড দেশ, এর অখণ্ডতা ও প্রভুত্ব রক্ষার জন্য, প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য নিয়মকানুন তৈরী করব। সবাই বলবে, আমার বাক্ স্বাধীনতা আছে। এবার আমি বলতে শুরু করলাম, অমুক সম্প্রদায়ের লোকেরা বদমাইশ। অমুক সম্প্রদায়ের লোকেরাও বলবে, আমাদের বাঁচার অধিকার আছে, তোমরা আমাদের উপর পীড়ন করছ। সংবিধানে দুটোই আছে, বাক্ স্বাধীনতাও আছে আবার এও আছে যে কারুর ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কেউ কিছু বলতে পারবে না। এবার আমরা কোনটা করব? যদি বলি অমুক ধর্মের লোকেরা বদমাইশ, সঙ্গে সঙ্গে তারা বলবে তুমি আমার ধর্মে আঘাত দিয়েছ। এরপর আমাকে জেলে পুরে দেবে। আমার তো তাহলে বাক্ স্বাধীনতা থাকল না। সত্যিকারের এই সমস্যা হয়। একমাত্র বেদ বলে দেয় বিধি নিষেধ কেন। বেদ বলছে, কোরাণ বলছে বা বাইবেল বলছে যখন বলছি, তখন আসলে কে বলছেন? যাঁরা ধর্মীয় গুরু হন বা যিনি অবতার পুরুষ হন, তাঁদের মন শুদ্ধ পবিত্র। ঠাকুর যখন নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি এইটি করবে, সেখানে প্রথম কথা হল ওখানে তাঁর কোন স্বার্থ ভাব নেই। কিন্তু যাঁরা সংবিধান রচনা

করেছেন আর এখনও যাঁরা সংবিধানের সংশোধন করে যাচ্ছেন তাঁরা কিন্তু কেউই স্বার্থ ভাবনার উর্ধ্বে নন, তাঁরা ক্ষমতায় থাকতে চান। ক্ষমতায় থাকার জন্য ভোট পেতে হবে, ভোট পাওয়ার জন্য পাঁচজনকে খুশী করতে হবে। অবতার পুরুষদের এসব সমস্যা ছিল না, তাঁদের শুদ্ধ পবিত্র মন, তাঁরাই বেদ, কোরাণ, বাইবেলে বলছেন। কিন্তু তাঁদের আধারটা কি? যখন তাঁরা কিছু বলছেন, তার একটা কিছু আধার তো থাকতে হবে। যাঁরা সংবিধান রচনা করছেন তাঁদের আধার ছিল, এই দেশ অখণ্ড, এর অখণ্ডতা যেন বজায় থাকে আর এখানে যেন কোন গোলমাল দানা না বাঁধতে পারে। কিন্তু ওনাদের আধারটা খুব সহজ ছিল, সেই আধার হল – ঈশ্বরই আছেন, তুমি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক, কিন্তু তুমি ভুলে গেছ।

মানুষ কোন কিছু ভুলে গেলে কি করে? হাওড়া স্টেশনে চারজন গেছে, একজন ভিড়ে হারিয়ে গেল। বাকি তিনজন তখন কি করবে? খোঁজাখুজি শুরু করে দেবে, এক নম্বর প্ল্যাটফরমে খুঁজবে, সেখানে না পেলে দু নম্বর প্ল্যাটফরমে, সেখানে না পেলে তিন নম্বর, চার নম্বর সব প্ল্যাটফরমেই খুঁজবে, দরকার হলে সাউথের প্ল্যাটফরমেও গিয়ে খুঁজবে, দৌড়াদৌড়ি করে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর হঠাৎ দেখে যেখানে মালপত্র রাখা ছিল সেখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে একটু হয়ত গালাগাল দেবে, কিন্তু তারপর আনন্দে এবার নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবন মানেই তাই, আধ্যাত্মিক জীবনে শুধু একটাই তফাৎ হয়, আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। কাকে খুঁজবে? ভগবানকে কেউ এখানে খোঁজে না, সবাই নিজেকেই খুঁজছে। নিজের ইচ্ছাতে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে, এটাই অজ্ঞান, এটাই মায়া। নিজেকে হারিয়ে এবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় খুঁজছে? যাকে ভালোবাসে সেখানে খুঁজছে। আমরা যাকে ভালোবাসি আসলে আমরা নিজের অজান্তায় সেখানে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। বস্তুত মানুষ কখনই কাউকে ভালোবাসে না, একমাত্র সে নিজেকেই ভালোবাসে। এই জগতে সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কেউ হয়নি যে অপরকে ভালোবাসে। কিন্তু স্বামীজী মানুষ মাত্রকেই ভালোবেসে ছিলেন। সেখানেও কিন্তু স্বামীজী নিজেকে ভালোবাসছেন, আমাদের সাথে স্বামীজীর তফাৎ এইটুকু যে, স্বামীজী নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক দেখতেন, তাই ভালোবাসতেন। আমেরিকায় থাকা কালীন এক বাড়িতে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনি গেছেন, বাড়ির দরজা যে খুলেছে সে ভেবেছে নিগ্রো, স্বামীজীকে ঢুকতে দেয়নি। তিনি নির্বিকার চিত্তে ওখান থেকে চলে এসেছেন। সেলুনে চুল কাটতে গেছেন, সেলুনের লোক স্বামীজীকে নিগ্রো মনে করে চুল কাটতে অস্বীকার করল। উনি কাউকেই বলছেন না যে আমি নিগ্রো নই। পরে ওনার পরিচিতরা বললেন, আপনি বললেই পারতেন আমি নিগ্রো নই। স্বামীজী তখন বললেন, আমি কাউকে ছোট করে বড় হতে আসিনি। এই জগতে স্বামীজীর কাছে কেউ ছোট নয়, তিনিই সব হয়েছেন, শুধু মানুষই না সমস্ত সৃষ্টিটাই তাঁর, স্বামীজী ঐ জায়গাতে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছেন। স্বামীজী মানুষ জ্ঞানে কাউকেই সেবা করছেন না, শিব জ্ঞানে জীব সেবা করছেন। মানুষ একমাত্র নিজেকেই ভালোবাসে, কিন্তু ভুল জায়গায় খুঁজে বেড়াতেই সবার জীবন চলে যায়। ছোটবেলা থেকেই আমরা ভুল জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, কখন মায়ের মধ্যে খুঁজছি, কখন বাবাতে খুঁজছি, কখন বন্ধুত্বে খুঁজছি, কখন প্রেয়সীতে, কখন স্বামীতে, কখন সন্তানে, কখন বইতে, কখন লেখাতে, কখন জ্ঞানার্জনে, কখন সৃজনশীল কাজে, কখন গভীর চিন্তনে, কখন গভীর ধ্যানে, কখন কল্পনায় ঈশ্বরকে দর্শন করে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। খোঁজার জন্য এই দৌড়ঝাপ কবে থামবে? নিজেকে না জানা পর্যন্ত এই দৌড়ঝাপ চলতেই থাকবে। যখন নিজেকে জেনে যাবে তখন দৌড়ঝাপ থেমে গিয়ে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি হয় যাবে।

এই দৌড়ঝাপের কিছু নিয়ম তো থাকতে হবে। হাওড়া স্টেশনে তিনজন মিলে একজনকে যে খুঁজছে, খোঁজার জন্য তারা তো রেললাইনে নেমে গিয়ে লাফালাফি করতে পারবে না। বিধিটা কি? প্ল্যাটফরমে খুঁজতে পার। নিষেধ কি? রেললাইনে নেমে খুঁজতে পারবে না। আবার রাজধানী এ্যক্সেপ্রেসে লেখা থাকে প্ল্যাটফরম টিকিট নিয়ে ট্রেনে ওঠা যাবে না, সেটাও নিষেধ। বেদ ঠিক তাই করছেন, তুমি নিজেকে যখন খুঁজছ খুঁজে যাও, খুব ভালো করেই খুঁজে বেড়াও। তোমাকে কেউ কোন দিন বোঝাতে পারবে না যে তুমি নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছ, তুমি একটা মুর্খ, তুমি একটা আহাম্মক। যেখানেই তুমি ভালোবাসা খুঁজে যাচ্ছ আসলে তুমি নিজেকেই খুঁজছ, কারণ অজান্তায় তুমি ভুলে গেছ যে তুমিই সেই তুমি। বৃহদারণ্যকে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, সেখানে

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রী সংবাদে মৈত্রী যাজ্ঞবল্ক্যকে আত্মার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। যাজ্ঞবল্ক্য এক এক করে বলে যাচ্ছেন, মানুষ নিজের সন্তানকে ভালোবাসে সন্তানের জন্য নয়, সন্তানের মধ্যে সে নিজের ছবি দেখে, মানুষ নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে, সুবর্ণকে ভালোবাসে, ধন-সম্পদকে ভালোবাসে। কেন ভালোবাসে? ঐ বস্তুর জন্য সে কখনই ভালোবাসে না, কারণ সে ঐ বস্তুতে নিজের আত্মাকে দেখে তাই ভালোবাসে। অজ্ঞানী একটা সীমিত জিনিসে নিজের আত্মাকে দেখে আর জ্ঞানী অসীমে নিজের আত্মাকে দেখেন, জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর এইটুকুই তফাৎ, আর কোন তফাৎ নেই।

পাশ্চাত্য দর্শনে subjectivism ও objectivism এই দুটো মত চলে। Objectivism মানে, আমরা কোন কিছুকে যে সম্মান দিই, সেটা দিই ঐ জিনিসটার জন্য। আর subjectivism মানে, সেখানে তোমার নিজের projection। আয়ন র‍্যাণ্ড একজন খুব নাম করা লেখিকা, উনি objectivisimএর উপর মোটা মোটা উপন্যাস লিখেছেন। এ্যারিস্টটলও, যিনি খুব নামকরা দার্শনিক, তিনিও objectivismএর প্রবক্তা ছিলেন। হিন্দুদের চিন্তা জগতে objectivism জিনিসটা কোন দিনই দাঁড়াতে পারেনি আমরা চিরদিনই subjectivismএ ছিলাম। যাজ্ঞবল্ক্য যা বলছেন এটাই subjectivismএর রূপ, মানুষ যখন কাউকে ভালোবাসে তখন ঐ বস্তুর জন্য ভালোবাসে না, ঐ বস্তুর মধ্যে নিজের আত্মাকেই দেখে, সেইজন্য ভালোবাসে। এই পেনকে আমি ভালোবাসি, আপনি বলবেন, তুমি এই পেনকে ভালোবাস কারণ এই পেনে ভালো লেখা যায়। একেবারেই তা নয়, এই যে ভালো লেখা জিনিসটা, ভালো, এটাই আমার স্বভাব, সেইজন্য আমি পেনটা ভালোবাসি। কিছু কিছু মানুষ আছে শুধু কাঁদতেই ভালোবাসে, দুঃখটাই তার ভালোবাসা, নিজের আত্মাকে দুঃখের সাথে জড়িয়ে রেখেছে।

এই যে হারিয়ে যাওয়া, যেখানে মানুষ নিজেকে সীমিত দেখছে, সীমিত বস্তুর মধ্যে নিজেকে যে খুঁজছে, তার মানে আত্মার যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ থেকে মানুষ সরে গেছে। এবার তাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, দৌড়াদৌড়ি করা মানেই বিধি আর নিষেধ। অনেক সময় বিধির উল্লঙ্ঘন করে দিচ্ছে। বিধি নিষেধ করতে করতে কোথাও গিয়ে তার মধ্যে একটা চেতনা জাগতে শুরু করে। তখন সে বোঝে, আরে আমি এত কেন দৌড়াচ্ছি, কার জন্য, কিসের জন্য দৌড়াচ্ছি? এবার আস্তে আস্তে সে এগোতে শুরু করে। এখান থেকে সবারই প্রতি তার ভালোবাসা ছড়িয়ে যেতে থাকে কিন্তু তখনও কিছু কিছু দায়ীত্ব বোধ থেকে যায়। ঠাকুর বলছেন, যাদের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করার সময় হয়ে গেছে সংসারকে তাদের পাতকুয়া বোধ হয় আর সম্বন্ধীদের মনে করে কালসাপ। ঠাকুর মজা করার জন্য এই কথা বলছেন না, বাস্তবিক এই রকমই হয়, নিজের লোকদের সত্যিকারের কালসাপ আর সংসারকে পাতকুয়া বোধ হয়। আমরাও সবাই বলতে পারি, এখানে ভাগবত কথা শুনছি, বাড়িতে জপধ্যান করছি কই আমাদের তো এখনও স্বামী, স্ত্রী, সন্তানকে কালসাপ মনে হচ্ছে না। না হওয়ারই কথা, অনেক সুকৃতীর ফলে আজকে আমরা এখানে শাস্ত্র কথা শুনছি, অত্যন্ত সৌভাগ্য কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একদিনেই সব কিছু হয়ে যাবে না। এইভাবে সুকৃতি হতে হতে একটা জন্মে এই বোধ জাগবে। ঠাকুর আবার বলছেন, ঈশ্বরের দিকে পুরো মন যার চলে যায় তখন তিনিই তার সুবিধা করে দেন, কেউ হয়ত তার সংসারের দায়ীত্ব নিয়ে নিল। যেমন যেমন ধ্যানের গভীরে যায় তেমন তেমন তার দায়ীত্ব বোধটা কমে যায়। কর্ম আর আত্মজ্ঞান একেবারে সরাসরি যুক্ত। যে যত বেশি কাজে জড়ায় বুঝতে হবে তার তত বেশি আত্মজ্ঞানের ঘাটতি, এটা একেবারে সার্বভৌম নিয়ম, কোথাও এর কোন ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না।

ভাগবতে এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করছেন – পরোক্ষবাদ, তবে আজকের দিনে এই ধরণের থিয়োরি চলে না। পরোক্ষবাদ মানে, বলা হচ্ছে একটা কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্য। ঋষি বলছেন – *পরক্ষোবাদো বেদহয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।*১১/৩/৪৪। বাচ্চাদের যেমন মিষ্টি খাবার বা কোন প্রলোভন দেখিয়ে কিছু জিনিষের শিক্ষা দেওয়া হয় বা ওষুধ খাওয়ান হয়। আচার্য শঙ্করও বলছেন বাচ্চারা দুধ খেতে চায় না, বাচ্চারা আবার মাথায় চুল আর ফরসা হওয়াটা খুব পছন্দ করে। মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ার সময় বলে 'বাবা! দুধ খেয়ে নাও তাহলে তোমার চন্দ্রিমা হবে আর চটি বর্ধন হবে'। অর্থাৎ তুমি ফরসা হবে আর তোমার চুল তাড়াতাড়ি বড় হবে। তখন দুধটা খেয়ে নেয়। বেদের ঋষিরা

জানতেন, মানুষ মাত্রই দুর্বল, কাম, ক্রোধ, লোভের জ্বালায় মানুষ অহরহ দগ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদেরকে সব কিছু ছেড়ে ধর্মে নামিয়ে দেওয়া বা ধ্যান করতে বসিয়ে দেওয়া যাবে না, মাথায় বিকৃতি এসে যাবে। ভাগবত অনেক প্রাচীন গ্রন্থ, তখনকার দিনে বেদ যা বলছে সেটাকেই সবাই পালন করত, তোমাকে কর্ম করতে বলা হচ্ছে, তুমি কর্মই করবে, ভাগবতও এখানেও তাই কর্মের কথাই বলছেন। ঋষি এখানে বলছেন বেদের যত রকম কর্মের কথা বলা হয়েছে, সব কর্মের একটাই উদ্দেশ্য, যারা অনভিজ্ঞ এবং অজ্ঞান তাদের প্রলোভন দিয়ে ভালো কাজের দিকে প্রবৃত্ত করা। বেদ সব কিছুতেই বলবে তুমি যজ্ঞ কর। সন্তান চাই? যজ্ঞ কর। শত্রুকে মারবে? যজ্ঞ কর। বৃষ্টি চাই? যজ্ঞ কর। ভালো ফসল চাই? যজ্ঞ কর। এই কারণে সাধারণ লোক মনে করে জীবনের উদ্দেশ্য হল যজ্ঞ করা। সেই থেকে হিন্দুদের সমগ্র জীবনকে যজ্ঞ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। বেদের সময় চৌষট্টি রকম সংস্কার ছিল। পরে স্মৃতি কমিয়ে ষোলটা করে দিল। তন্ত্র আবার আরও কমিয়ে দশটি সংস্কারে নামিয়ে দিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবটাই সংস্কার। জন্ম হলে যজ্ঞ, উপনয়ন হলে যজ্ঞ, বিয়ে হলে যজ্ঞ, মৃত্যু একটা যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ একটা যজ্ঞ সবটাই যজ্ঞ। এগুলো যদি না করা হয় তাহলে মানুষ আরও স্বার্থপর হয়ে উঠবে। মানুষ মাত্রই স্বার্থপর, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। এই স্বার্থপরতা একটু কমাবার জন্য দশটি সংস্কার কর্ম দিয়ে মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলিত করে দেওয়া হল। এর বাইরে গৃহস্থদের আবার পঞ্চ মহাযজ্ঞ করতে হয়। গৃহস্থ যদি নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ করে তাতেই তার সব হয়ে যাবে। স্বামীজী দেখলেন বর্তমান যুগে ধর্মকর্মের জায়গায় কতকগুলো কুসংস্কার মূলক কর্ম করা হচ্ছে, বেদের কর্মও বন্ধ হয়ে গেছে, আর মানুষ মহা স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। তাই তিনি দেশমাতৃকার সেবা, সমাজ সেবাকে সবার সামনে আদর্শ রূপে রেখে দিলেন। এতে মানুষ একটু নিঃস্বার্থ হবে, এই আদর্শকে সামনে রাখার এটাই স্বামীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেবা তুমি কীভাবে করবে? শিব জ্ঞানে জীব সেবার ভাবে। স্বামীজীর এই আদর্শকে সামনে রেখে এখন কেউ যদি বলে সেবাই ধর্ম, তাহলে সেটা আবার শাস্ত্রের বিরুদ্ধে চলে যাবে। সেবা কি করে ধর্ম হবে! সেবার ধর্ম হল বেদের ধর্মের মত। মানুষ কোন কাজ না করলে তমোগুণের আশ্রয়ে চলে যাবে। নিজের খাওয়া-পড়া ছাড়া আর কোন দিকে মানুষ তাকায় না। বেদ তাই বলল তুমি যজ্ঞ-যাগ কর তাহলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। মরার পর না হয় আমি স্বর্গে যাব কিন্তু এখানে আমার কি হবে? বেদ তখন বলছে এখানেও তোমার অনেক লাভ হবে। যজ্ঞ করলে এখানেই তোমার সন্তান প্রাপ্তি হবে। এইভাবে বেদ মানুষকে উচ্চ আদর্শের দিকে টেনে নিয়ে আসছে। সারা জীবনই যদি যজ্ঞ-যাগ করতে থাকে তাতে তার কিছু না কিছু উন্নতি হবে। স্বামীজী ঠিক এটাই করলেন কিন্তু ভাষাটা পাল্টে দিলেন। তিনি বেদের যজ্ঞকে অন্য ভাবে নিয়ে গিয়ে বললেন তুমি দেশের সেবা কর। আরও নীচে এসে বললেন গরীবের সেবা কর, দরিদ্র নারায়ণের সেবা কর। উচ্চ স্তরে গিয়ে বললেন নিষ্কাম কর্ম কর। নিষ্কাম কর্মই শেষ কথা। স্বামীজীই সবার জন্য একটাই ধর্ম করে দিলেন, যেটা বেদও করতে পারেনি, কারণ বেদেও সন্ন্যাসীদের বলছেন তোমার বেদের পারে যাও। কিন্তু স্বামীজী বলে দিলেন – না! সন্ন্যাসীও নিষ্কাম কর্ম করবে। যে গৃহস্থ সেও নিষ্কাম কর্ম করবে। ছাত্র, যুব, বয়স্ক সবাই নিষ্কাম কর্ম করবে। এই নিষ্কাম কর্মের দ্বারা গৃহস্থরা অর্থোপার্জন করতে পারবে আর সন্ন্যাসী মুক্তি পাবে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা যার যেমন উদ্দেশ্য সেটাই পাবে।

ঋষিও সাবধান করে দিচ্ছেন – বেদের উদ্দেশ্য কখনই কর্ম নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ স্বভাবত মহা স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতার মনোভাব থেকে এদের বার করে আনতে হবে। সেইজন্য বেদ যজ্ঞ-যাগের দিকে মানুষকে টেনে আনল। ঋষি বলছেন *নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মেজ্ঞোহজিতেন্দ্রিয়ঃ। বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুপৈতি।।*১১/৩/৪৫। মানুষ স্বাভাবিক ভাবে অজ্ঞানী এবং অজিতেন্দ্রিয়। অজ্ঞ কারা? যারা কামিনী, কাঞ্চন আর পদমর্যাদার দিকে দৌড়াচ্ছে। এথেন্সে থেইলস্ নামে একজন দার্শনিক ছিলেন। সব সময় উচ্চ চিন্তন নিয়ে থাকেন। তখন এথেন্স বস্তুতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত ছিল। পুরো এথেন্সের লোকেরা থেইলস্‌কে পাগল মনে করত। থেইলস্ ভাবলেন এথেন্সবাসীদের একটা শিক্ষা দিতে হবে। দার্শনিকরা যদিও জাগতিক ব্যাপার থেকে সরে থাকেন কিন্তু তাঁরাও তুখোড় বুদ্ধি রাখেন। উনিই তখন সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপারে একটা ধারণা দিয়েছিলেন আর নদীতে কখন বন্যা আসতে পারে তার কতকগুলি আভাস তিনি

দিতেন। এথেন্সে প্রচুর আঙুর চাষ হত। গত তিন বছর ধরে আঙুর চাষ খুব খারাপ হয়েছিল। উনি নিজে হিসেব করে দেখলেন এই বছর আঙুর চাষ খুব ভালো হবে। এই ব্যাপারে তিনি কাউকে কিছু বললেন না। তিনি তাঁর দিদির কাছ থেকে কটি টাকা ধার করে ঐ এলাকার আঙুরের রস পেষাই করার যত কল ছিল সব কটা বেশী দামে ভাড়া করে নিলেন। ওখানে আঙুরের রস থেকে মদ তৈয়ার করা হত। লোকে হাসতে শুরু করেছে, এরাই দার্শনিক, যাদের মাথায় কোন বুদ্ধি নেই। একেই আঙুরের চাষ নেই তার উপর আবার আঙুর পেষাই কল বেশী টাকায় ভাড়া নিয়েছে। সেই বছর বাম্পার আঙুরের ফলন হয়েছে। এত আঙুর হয়েছে যে লোকে আঙুর সামলাতে পারছে না। যেখানেই রস পেষাই করতে যাচ্ছে দেখছে থেইলস্ ভাড়া করে নিয়েছে, একটি মেশিনকেও বাদ দেননি। প্রত্যেক বছর সবাই যে টাকায় ভাড়া নিত, এই বছর তিনি সোজা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। লোকের আর অন্য কোন রাস্থাও নেই। ঐ এক সিজনে তিনি লক্ষপতি হয়ে গেলেন। যত টাকা রোজগার হল সব টাকা নিয়ে দিদিকে দিয়ে বলল 'দ্যাখো দিদি! যতটা আমাকে বোকা মনে কর আমি অতটা বোকা নই। আমার এই টাকা-পয়সাতে আগ্রহ নেই সব টাকা তোমাকে দিয়ে দিলাম'। এরপর আবার কাঙালীর মত থাকতে শুরু করে দিলেন। একজন সন্ন্যাসী শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পেয়েছেন, অন্য এক সন্ন্যাসী ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ কম্প্যুটার বিজ্ঞানী, একজন নতুন ব্রহ্মচারী মহারাজ ইংরাজীতে পিএইচডি। কিন্তু এনারা ত্যাগের আদর্শে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাই বলে এনার কেউ মুর্খ নয়। কাঙালীদের সাথে এনাদের এক করে দিতে নেই। কিন্তু যারা কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে ছুটছে তারা অজ্ঞ আর তার সাথে অজিতেন্দ্রীয়, একটুও সংযম নেই। একটু ভোগের সামগ্রী দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা থেকে লালা পড়তে শুরু করে। এরা কি করে? *বিকর্মণ্য হ্যধর্মেণ*। এরা বেদোক্ত কর্মকে ত্যাগ করে দেয় আর অধর্মের আচরণ করতে শুরু করে দেয়। বিকর্ম মানে বেদ যে কর্মগুলো করতে বলেছে সেই কর্মগুলো না করা, এটাই অধর্ম। বেদ বলছে রোজ স্নান করে পবিত্র হবে, রোজ জামা-কাপড় কাচবে, অতিথি কাঙালীকে খাওয়াবে। বেদের সব কর্মই শুদ্ধির জন্য করতে বলা হয়েছে। যারা বেদের এই কর্মগুলো ত্যাগ করে দেয় এরা মৃত্যু থেকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে, মানে জন্মাচ্ছে মরছে, জন্ম নিচ্ছে আবার মরছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা তাঁর বাবাকে বলছেন *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*। মানুষ ধান গম শষ্যের মত জন্মাচ্ছে মরছে, এর নামই হল মৃত্যুধর্মা। পুরো সৃষ্টিটাই মৃত্যুধর্মা। জড় শক্তিতে রূপান্তরিত হবে শক্তি আবার জড়ে রূপান্তরিত হবে। জীবন্ত মানুষ মরবে, মরা মানুষ জন্মাবে। এর মধ্যেই পুরো জগৎ ঘুরপাক খাচ্ছে। যারা শুদ্ধির পথ নিয়ে নিয়েছে তারা ধীরে ধীরে জন্ম-মৃত্যুর পারের দিকে এগোতে শুরু করে।

রাজা নিমির এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আরকেজন ঋষি ক্রোধের ব্যাপারে বলছেন। যারা যোগের পথে ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছেন তাঁরা সব কিছু সহ্য করে নেন – *ক্ষ্যৎত্রীট*, ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে জয় করে নেন, ঠাণ্ডা-গরম সহ্য করে নেন। আর যে দুটি সব থেকে বিপজ্জনক, রসনেন্দ্রিয় আর জননেন্দ্রিয় – খাওয়ার ইচ্ছা আর সন্তান উৎপত্তির ইচ্ছা, এই দুটিকেও তাঁরা জয় করে নেন। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয়, সাধু সন্ন্যাসীরা সব কিছুকে জয় করে নেন কিন্তু কোন না কোন সময় এই দুটোর যে কোন একটা বা দুটোতেই আটকে যান। ঋষি বলছেন, এনারা সব কিছুকে জয় করে নেন কিন্তু হঠাৎ এক সময় এমন ক্রোধ বৃত্তিতে অবশ হয়ে যান যে তাতেই তাঁর এত দিনের কঠোর তপস্যার ফল নাশ হয়ে যায়।

প্রশ্ন হল, যাদের কামনা, ভোগের ইচ্ছা এখনও যায়নি, মন আর ইন্দ্রিয় বশে নেই, এদিকে ভগবানের ভজনাও করে না, এদের কি গতি হয়? ঋষি এখানে একটা খুব লম্বা বর্ণনা দিচ্ছেন। সংক্ষেপে বক্তব্য হল, যারা একেবারে মূঢ়ঃ, পাথরের মত, এদের কোন কষ্ট হয় না। যারা আদিবাসী, যাদের চেতনা এখন জাগ্রত হয়নি, এরা আনন্দেই থাকে কারণ এদের কোন চিন্তা ভাবনা নেই। পশুভাবাপন্ন লোকেদের কোন চিন্তা নেই এরা দিব্যি আনন্দে থাকে। অন্য দিকে যাঁদের কৈবল্য প্রাপ্তি হয়ে গেছে তাঁরাও মহা আনন্দে আছেন। কিন্তু এই দুজনের মাঝখানে যারা আছে, যাদের চেতনাটা জেগে গেছে, পুরোপুরি মূঢ় নয় অন্য দিকে জ্ঞানও হয়নি, এরা ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটের মধ্যে সব সময় আবদ্ধ হয়ে থাকে। এক মুহুর্তের জন্যও এরা শান্তি পায়না, এরাই আত্মঘাতী। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন *যে কে চাত্মহনো জনাঃ*। আত্মহত্যা কারা করে? শাস্ত্র মতে যারা

গলায় দড়ি দিচ্ছে, ট্রেনের তলায় গলা দিচ্ছে তারা নয়। যারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করেনি তারাই আত্মহন্তা। যারা ধর্ম, অর্থ আর কামের মধ্যে ঘুরপাক করছে এরাই আত্মহন্তা। অর্থ আর কাম হল কামিনী-কাঞ্চন আর ধর্ম হল আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথা অনুসারে ধর্ম কর্ম করে যাচ্ছে, এরা একটু তাও উন্নত কিন্তু এরাও ধর্মের চক্রে পড়ে আছে। অর্থ আর কাম যেমন বন্ধনে রেখে দেয়, ঠিক তেমনি ধর্মও বন্ধনে ফেলে দেয়, বলাই হয় ত্রৈবর্গিকা। বন্ধন থেকে বাঁচে কারা? যাঁরা একমাত্র আত্ম চিন্তন নিয়েই থাকেন। বিভিন্ন যোগীরা এক এক করে নিমি রাজাকে অনেক রকম কথা বলে যাচ্ছেন।

ব্রহ্মাদি দেবতা কর্তৃক্ত ভগবানের কাছে স্বধাম প্রত্যাগমনের প্রার্থনা

ব্রহ্মা একদিন শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বলছেন *যদুবংশেহবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম। শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো।।*১১/৬/২৫। 'হে পুরুষোত্তম! যদুবংশে আপনি অবতীর্ণ হওয়ার পর একশ পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এখন একশ পঁচিশ বছর বয়স। এটা অবশ্য ভাগবতের মত, শ্রীকৃষ্ণের এখন বয়স হয়ে গেছে। ব্রহ্মা তাই বলছেন হে প্রভু! যে উদ্দেশ্যে আপনার এই অবতারত্ব গ্রহণ সেই হিসাবে আপনার সব কাজই হয়ে গেছে এবার আপনার স্বধামে ফিরে চলুন। পুরাণের কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় যে অবতাররা সহজে মর্ত্যধাম ছেড়ে যেতে চান না। ঠাকুর বলছেন – বরাহ অবতার নিজের সন্তানাদি ছেড়ে বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যেতে চাইছিলেন না। তখন শিব এসে ত্রিশুল দিয়ে বরাহ অবতারের শরীরটা চিড়ে দিতেই তিনি হি হি করে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণকেও ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু! ধরাধামে আপনার সব কাজ হয়ে গেছে এবার স্বধামে ফেরত চলুন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণকে পঞ্চাশ বছরে ধরাধাম ছেড়ে চলে যেতে হল। শ্রীকৃষ্ণ আর ঠাকুরের দেহ ছাড়ার মধ্যে একটা তফাৎ দেখা যায়। ঠাকুরও জানতেন যে তাঁর সময় হয়ে গেছে, সেইজন্য সব কিছু তিনি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, যাতে এরা সবাই একত্র থেকে একটা সঙ্ঘ দাঁড় করাতে পারে, তাঁর কাছ থেকে এরা যে শিক্ষা পেয়েছে সেই শিক্ষার যেন এখানেই সমাপ্তি না হয়ে যায়। শেষের দিকে তিনি নরেনকে সবার দলপতি করে বলে দিলেন, এদেরকে তুই দেখবি। একটা হতে পারে, কঠিন ব্যাধিতে তাঁর শরীরটা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল, তাতে তিনি হয়ত মনে করছেন আমার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা আলাদা ব্যাপার, ঠাকুরও জানতেন যে তাঁর সময় হয়ে গেছে। এমন কি শ্রীমা তারকেশ্বর ধামে হত্যে দিলেন, ফিরে আসার পর ঠাকুর মজা করে বলছেন, কিছু হল? তার মানে বলতে চাইছেন কিছুই হয়নি, তিনি জানেন সব শেষ। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও তাই, কারণ সিদ্ধ পুরুষ যখন দেহ ছাড়েন আর সাধারণ মানুষ যখন দেহ ছাড়েন তখন দুটোতে কিছু কিছু তফাৎ থাকে। সাধারণ মানুষ যখন মৃত্যুর দিকে এগোয় তখন তাদের সংসারের মায়া ছেড়ে যেতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। ঠাকুর বলছেন, সংসারীরা মৃত্যুশয্যায় শুয়েও বলে, প্রদীপের সলতেটা কমিয়ে দে, তেল পুড়ছে। সিদ্ধ পুরুষের সাথে সাধারণের মানুষের এটা একটা বড় তফাৎ। সিদ্ধ পুরুষ জানেন আত্মার জন্মমৃত্যু নেই, আর তিনি এটাও জানেন যে তিনি সেই আত্মা। ঠাকুরের শরীর চলে যাওয়ার পর শ্রীমা যখন খুব ভেঙে পড়েছেন তখন ঠাকুর শ্রীমাকে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত করে বলছেন, আমার তো কিছু হয়নি, এ ঘর আর সে ঘর। সিদ্ধ পুরুষরা জীবনকেও ভালোবাসেন না, মৃত্যুকেও ভালোবাসেন না। আত্মজ্ঞানী শরীর ছাড়ার সময় জানেন, এই শরীর দিয়ে যা কাজ করার হয়ে গেছে, এখন শরীর থাকলেও কি আর না থাকলেও কি, এই শরীরের আর কোন দরকার নেই। সাধারণ মানুষ যখন মারা যায় তখন যমরাজ তাঁর দূতদের পাঠান নিয়ে আসার জন্য, আর বিশিষ্ট কেউ মারা গেলে তখন যমরাজ নিজেই আসেন নিয়ে যেতে। সাবিত্রীর স্বামী সত্যবানকে নিতে যমরাজ নিজেই এসেছিলেন। যিনি বিশেষ সিদ্ধ পুরুষ, তাঁদের জন্য সেই লোক থেকে বিশেষ দূতেরা আসেন। কিন্তু ভগবান যখন নিজে দেহ ছাড়বেন তখন ব্রহ্মাকেই সাক্ষাৎ আসতে হচ্ছে। ব্রহ্মাকে তাই এখন আসতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি বলছেন, আপনি ভগবান, আপনি এই দেহ ধারণ করে কত কি করলেন।

এখানে আবার অবতার তত্ত্ব জড়িয়ে আছে। অবতার তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় খুব সংক্ষেপে বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, ভগবানের জন্মও দিব্য আর তিনি যে কর্ম করেন সেটাও দিব্য। দিব্য মানে, জগতে যা কিছু আছে সবই কর্মের বিধান দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু অবতারের কোন

কিছুই কর্মের বিধানে প্রেরিত হয় না। আমাদের আগে আগে যে জন্ম হয়েছে, সেইসব জন্মে যা যা কর্ম করেছি সেই কর্ম আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। অবতারের ক্ষেত্রে তা হয় না। দ্বিতীয়তঃ আমরা এখন যা কিছু কর্ম করছি, আগে আগে আমাদের যত কর্ম করা আছে, সেই কর্মগুলোই ভবিষ্যতে আমাদের দিয়ে কর্ম করায়, অবতারের ক্ষেত্রে তা হয় না। খুব সহজ উপমা, একজন কয়েদীকে বাইরে নিয়ে এলে তাকে পুলিশ সব সময় ঘিরে রাখে, পুলিশ যেদিকে যাবে কয়েদীকে সেই দিকেই যেতে হবে। ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও পুলিশ সব সময় ঘিরে রাখে, রাষ্ট্রপতি যেদিকে যাবেন পুলিশকে সেই দিকে যেতে হবে। আমরা হলাম কয়েদী, কর্ম আমাদের ঘিরে রেখেছে, কর্ম আমাদের যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের সেইদিকে যেতে হবে, কারুরই কিছু করার নেই। অবতার হলেন রাষ্ট্রপতি, প্রকৃতি, কর্ম সব তাঁর পেছনে পেছনে চলে, কেউই তাঁর ধারে কাছে আসতে পারবে না। ঈশ্বর হলেন অনন্ত, শুধু অনন্তই নন, তার সাথে তিনি অনন্তজ্ঞানবান, ঈশ্বরের জ্ঞানের কোন সীমা হয় না। ফলে মায়া তাঁকে বাঁধতে পারে না। আমি আপনি সবাই সেই অনন্তের সন্তান, অনন্তের সন্তান মানে আমরাও অনন্ত। আমাদের ক্ষেত্রে যে কোন কারণেই হোক, মায়া আমাদের অনন্তের ভাবকে আবৃত করে রেখেছে। আবৃত থাকার ফলে আমরা আমাদের স্বরূপকে ভুলে গেছি। স্বরূপ ভুলে যাওয়ার জন্য মায়া আমাদের নাচাতে থাকে। ঈশ্বর এক মুহুর্তের জন্যও নিজের স্বরূপকে ভোলেন না। তাই অনন্তের জন্ম কখনই সীমিত হতে পারে না। আমাদেরও কখন জন্ম হয় না, জন্ম শরীরের হয়। কিন্তু আমরা নিজেদের শরীরের সাথে একাত্ম করে ভাবছি আমি শরীর, তাই আমাদের জন্ম হয়। ভগবান জানেন আমি এই শরীর নই, সেইজন্য তাঁর কখনই জন্ম হয় না। তিনি যে কর্ম করেন সেই কর্মফলের প্রতি তাঁর কোন প্রত্যাশা থাকে না। কর্মফল মানে, মানুষ যে কাজই করে সেই কাজের পেছনে তার একটা প্রত্যাশা থাকে, আমি এই ফল চাই। ভগবানের কোন প্রত্যাশা থাকে না। তিনি যে কর্ম করছেন তার ফল তাহলে কোথায় যাবে? খুব সহজ ভাবে বলা হয়, জগতের কল্যাণে যায়। দিব্য কর্ম বলতে আসলে বলতে চাইছেন, কোন কর্মফলে তিনি লিপ্ত হন না। কর্মফলে লিপ্ত না হওয়া মানে তাঁর কোন প্রত্যাশা থাকে না। রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে দেখছি রাস্থায় একটা কলার খোসা পড়ে আছে, আমি পা দিয় খোসাটা সরিয়ে দিলাম, আমার এখানে কোন প্রত্যাশা নেই। এখানে কর্মফল আমাকে স্পর্শ করবে কি করবে না? এখানেও কর্মফল আমাকে স্পর্শ করবে। কিভাবে স্পর্শ করে? যতই নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা হোক না কেন, মনে একটা ছাপ পড়বে। হয় বাহ্যিক ফল একটা পাবে আর তা নাহলে চরিত্র গঠনে লেগে যাবে। যেমন পড়াশোনা করা, পরীক্ষার জন্য যদি পড়ে তাহলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবে আর পরীক্ষার জন্য যদি না পড়ে তাহলে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। অবতারের ক্ষেত্রে এর কোনটাই হয় না। কারণ তাঁর চরিত্র সব সময় পূর্ণ হয়েই আছে, তাঁর জ্ঞানও সব সময় পূর্ণ হয়ে আছে। মাস্টারমশাই ঠাকুরকে মাটিতে ছবি এঁকে বোঝাচ্ছেন সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ কিভাবে হয়। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর বলছেন, থাক বাপু, আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে। পূর্ণ জ্ঞানে বসে আছেন বলে কিছুই তাঁর ভেতরে ঢুকছে না। মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে মনকে একাগ্র করতেই তিনি সচ্চিদানন্দের ধ্যানে চলে গেলেন। ঠাকুর পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কিনা। যিনি পূর্ণ জ্ঞানে অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানে, আত্মার জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে আছেন তাঁর কাছে আর জাগতিক জ্ঞান চলে না। সেইজন্য ঈশ্বরের বা যিনি অবতার, তাঁর চরিত্র, জ্ঞান কোন কিছুরই আর growth হয় না। তাঁর কাছে যদি টাকা-পয়সা এসে যায় তাতেও কিছু আসে যায় না, এটা হল একটা বড় তফাৎ। আমাদের বলা হয় তুমি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হও, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা মানে আমাদের চরিত্র পাল্টাচ্ছে, অবতারের চরিত্র পাল্টায় না। সেইজন্য ঈশ্বরের জন্মটাও দিব্য আর তিনি যা কর্ম করেন সেটাও দিব্য। আমাদের ক্ষেত্রে কর্ম আমাদের টেনে নিয়ে আসে, কর্ম আমাদের দিয়ে কাজ করায়। তাই কর্মের জন্য আমাদের মৃত্যুটাও অবধারিত। ঈশ্বর ও অবতারের ক্ষেত্রে তা হয় না, কারণ তিনি জন্ম মৃত্যুর বাইরে। ঠাকুর বলছেন অবতারও শক্তির আণ্ডারে, তার মানে অবতারেরও অন্যান্য দেহধর্মীর মত ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই হবে। কিন্তু তাঁর মধ্যে কর্মের কোন প্রভাব পড়বে না। সময় হয়ে গেলে তিনি ধরাধাম ছেড়ে স্বধামে ফিরে যান।

বেদে বলে মানুষের একশ বছর আয়ু, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ভাগবত একটু বাড়িয়ে বলছেন তিনি একশ পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একশ পঁচিশ বছর বেঁচে থাকলে অর্জুনও একশ পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন,

কারণ দুজনে প্রায় সমবয়সী ছিলেন। যাই হোক, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, হে প্রভু! যদুবংশে অবতাররূপে আগমনের একশ পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আপনার আর এমন কোন কর্ম অবশিষ্ট নেই যা চরিতার্থ করার জন্য আপনার আর এখানে অবস্থান করার প্রয়োজন আছে, আপনি আপনার পরমধামে ফিরে চলুন। এখানে একটা কথা বলা দরকার, কিছু ঘোর কট্টর বেদান্তী ছাড়া কেউই ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ধর্মকে কল্পনা করতে পারে না। ঈশ্বর মানেই তাঁর একটা থাকার জায়গা থাকতে হবে, ঈশ্বর মানে তাঁর একটা শরীর থাকতে হবে, ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের এই ধরণের কতগুলি অবধারণা আছে। কিন্তু তা নয়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বব্যাপী, এই সর্বব্যাপীত্ব ঈশ্বরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যিনি সর্বব্যাপী তিনি একটা জায়গায় কি করে থাকবেন! সেইজন্য এগুলোকে নিয়ে বেশি প্রশ্ন করতে নেই, বেশি প্রশ্ন করলে মানুষের মনে বিভিন্ন রকম সংশয় সৃষ্টি হবে। কিন্তু উপনিষদ গীতা পড়া থাকলে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম তাঁকে যখন মায়ার আবরণের মধ্যে দেখছি তখন তিনি ঈশ্বর রূপে দেখান। ঈশ্বরেরই বিশেষ প্রকাশ বিভিন্ন রূপে, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি। তখন শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকবেন? বিষ্ণুলোকে থাকবেন। শিব শিবলোকে থাকবেন, এতে কোন বিবাদ নেই।

ব্রহ্মার কথা শুনে তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার সব কাজ হয়ে গেছে। আমার কাজ হল সমস্ত আসুরিক শক্তির নাশ করা কিন্তু এই যদুবংশ মদোন্মত্ত হয়ে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। যদুবংশের নাশ না হতেই আমি যদি চলে যায় তাহলে এরা মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করবে। এদেরও বিনাশের সময় হয়ে এসেছে, আর মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার'। হিন্দু ধর্মের ধারণার মূল হল, এই জগতে ভালো মন্দ সবারই স্থান আছে। কিন্তু এ ভালো এ মন্দ, এর বিচার কে করবে? আমার আপনার understandingএ নির্ধারিত হয় এ ঠিক এ ভুল। আসলে ভালো মন্দ বলে কিছু নেই। নিজের বাড়ির লোকদের সবাই সাংঘাতিক ভালোবাসে, কেউই চায় না আমার স্বামী বা স্ত্রী মারা যাক, আমার বাবা বা মা মারা যাক। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে নিজের বাড়ির বাইরের লোকেদের প্রতি কারুরই একটুও করুণা থাকে না। অথচ আশ্চর্যের, যখন কাজে কর্মে যাচ্ছে সেখানে নিজের যারা লোক তাদের প্রতি করুণা থাকে না, কিন্তু অপর লোকদের উপর করুণা থাকে। যেমন একজন স্কুল শিক্ষক, নিজের স্কুলের শিক্ষকদের প্রতি হিংসা, ঈর্ষা, মারামারি আছে, অন্য স্কুলের শিক্ষকরা সবাই দারুণ। নিজের প্রফেশানের লোকদের প্রতি হিংসার ভাব, তার মানে ভালো মন্দ বলে কিছু নেই। যাকে নিজের মনে করে তার প্রতি ভালোবাসা, যাদের পর মনে করে তাদের প্রতি ভালোবাসা নেই। এই ব্যাপারে দেবতা, অসুর, মানুষ, পশু সবাই এক। সিংহী নিজের বাচ্চাকে মুখে এক ভাবে ধরে আর যখন শিকার করে তখন আরেক ভাবে ধরে, কিন্তু ঐ একই মুখ, একই দাঁত, শুধু ব্যবহারটা পাল্টে যায়। দেবতা, অসুর, মানুষও তাই, যখন নিজের লোকেদের ধরে তখন এক ভাবে ধরে, যখন পর ভেবে ধরে তখন অন্য ভাবে ধরে। আমাদের ঋষিরা এই জিনিসগুলো অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তাঁদের কাছে ভালো মন্দ বলে কিছু নেই। এই জগতে সবারই স্থান আছে। একটা জঙ্গল, সেই জঙ্গলে সব কিছুই আছে, হরিণও আছে, বাঘও আছে, অজগর সাপও আছে, হাতিও আছে। হরিণের পেছনে বাঘ দৌড়াচ্ছে, বাঘের পেছনে শিকারী দৌড়াচ্ছে, ইঁদুরের পেছনে সাপ দৌড়াচ্ছে, সাপের পেছনে নেউল দৌড়াচ্ছে। সব কিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্য আছে, ঐ ভারসাম্যটা যদি বিগড়ে যায় তখনই বিপদ। অস্ট্রেলিয়ার একটা অঞ্চলের আদিবাসীরা চাষ আবাদই করে। র‍্যাটল স্নেক নামে এক ধরণের বিষাক্ত সাপের কামড়ে প্রতি বছর ঐ অঞ্চলে প্রচুর লোক মারা যায়। সাপের উপদ্রবে অতীষ্ঠ হয়ে ওরা একটা বিশেষ প্রক্রিয়া শুরু করল যাতে এই সাপ গুলোকে মেরে ফেলা যায়। তারপর দেখা গেলে, সাপের জন্য আগে মানুষ মারা যেত আর সাপ মরে যাওয়ার পর এখন ফসলের হানি হতে শুরু হয়ে গেল। সাপেরা এতদিন বড় বড় ইঁদুর গুলোকে খেয়ে নিত, সাপ নিধন হয়ে যাওয়ার পর ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে গেছে, যা ফসল হয় সব ওরাই খেয়ে নেয়। এবার ইঁদুরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্ষেতের চারিদিকে বিদ্যুৎএর ফেন্সিং করে দিল। ইঁদুর গুলো ফেন্সিংএর নীচে সুড়ঙ্গ করে ফসল গুলো নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রকৃতি তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়াকে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। পৃথিবীর জনসংখ্যা আটশ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, এত বিশাল জনসমুদ্রকে কে সামলাবে! ভারসাম্য বিগড়ে গেছে, প্রলয় আসছে বলে, কেউ আটকাতে পারবে

না। পৃথিবীর সেই শক্তিই নেই যে এই বিশাল জনসংখ্যার ভরণপোষণ করবে। পুরাণের যে কাহিনীগুলো, তাতে এটাই সাবধান করে দিচ্ছেন। আমরা বলে দিচ্ছি অসুর, কিন্তু কিসের অসুর, ভারসাম্য যে কারণে নষ্ট হচ্ছে ওই কারণটাকে নাশ করে দাও। এখন বনসম্পদ যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে, জঙ্গলের সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তাতে বন্যপ্রাণীরা সবাই মারা যাচ্ছে। বন্যপ্রাণীরা, বানর, হাতি, গণ্ডার এরা সবাই প্রার্থনা করছে, হে ভগবান বিষ্ণু! এই মানবজাতি হল অসুর জাতি, প্রভু তুমি এসে এদের নাশ কর। প্রভুও আসছেন, সাইক্লোন রূপে আসছেন, বন্যা রূপে আসছেন, ভূমিকম্প রূপে আসছেন, মহামারী রূপে আসছেন। ঋষিরা অনেক আগেই উপলব্ধি করলেন ভালো মন্দ বলে কিছু নেই, এখানে সবারই স্থান আছে। আমাদের আশা আকাঙ্খা, লোভ, এগুলো দিয়ে ঠিক হয় ভালো কোনটা মন্দ কোনটা। যখন ওর ব্যাঘাত ঘটতে শুরু হয়, তখন ভগবানকে অর্থাৎ কোন শক্তিকে আসতে হয়, যিনি সব কিছুকে আবার ব্যালেন্সে এনে দেন, ভগবান হলেন ঐ balancing factor। অসুররা প্রচণ্ড শক্তিমান, আর মারাত্মক অহঙ্কারী, কাউকেই গ্রাহ্য করে না; অসুরদের প্রভাব বাড়লে জগতের ভারসাম্য নষ্ট হবেই। আগেকার দিনে জঙ্গলে যদি বাঘ নরখাদক হয়ে যেত শিকারীরা ঐ বাঘকে মেরে দিত। শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছেন, আমার সব অসুর নিধন হয়ে গেছে ঠিকই, তবে আমার নিজের যদুবংশের লোকগুলো অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে, আমার ছত্রছায়ায় আছে বলে কিছু করতে পারছে না। আমি চলে গেলেই এরা তখন ধরাকে সরা মনে করবে, আর চারিদিকে অত্যাচার করে বেড়াবে। এদেরকেও শেষ করা না পর্যন্ত আমার কাজ শেষ হবে না। আমার নিজের বংশকে আমাকে নিজেই নাশ করতে হবে। অবতারের এটাই একটা মজার ব্যাপার, তিনি যা করেছেন যদি দরকার হয় তিনি নিজেই সেটার নাশ করে দেন।

যদুবংশের উপর ঋষিদের অভিশাপের কাহিনী আমরা আগেই বলেছি। জাম্ববতির গর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণের এক সন্তান হয়েছিল, তার নাম ছিল শাম্ব। ঋষিরা দ্বারকায় এসেছেন। যদুকুলের ছেলেরা শাম্বকে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের মত সাজিয়ে ঋষিদের কাছে গিয়ে মজা করে জিজ্ঞেস করছে ‘এই মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা আপনারা বলুন এর ছেলে না মেয়ে হবে। এর খুব ইচ্ছা যে এর একটি সুন্দর ছেলে হোক’। ঋষিরা প্রচণ্ড রেগে গেছেন, কারণ এরা ঋষিদের সাথে মজা করতেই এসেছে। ঋষিরা বললেন ‘এর পেট থেকে মুষল বেরোবে আর ওই মুষলই তোমাদের বংশকে নাশ করবে’। ঋষিদের অভিশাপ শুনে যদুকুলের ছেলেরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। এরা তখন সেই মুষলটাকে ঘষে ঘষে টুকরো টুকরো করে সমুদ্রের ধারে ফেলে এসেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ে সেগুলো আবার তীরে ফেরত চলে এসেছে। আর সেখান থেকে বড় বড় শণ ঘাস দাঁড়িয়ে গেছে। আর ছোট টুকরো যেটা অবশিষ্ট ছিল সেটাকে আবার একটা মাছ খেয়ে নিয়েছে। সেই মাছকে আবার একটা জেলে ধরেছে। মাছের পেট থেকে মুষলের টুকরো বেরোতে জেলে সেটাকে ফেলে দিয়েছে। সেটাকে আবার একটা ব্যাধ নিয়ে গিয়ে তীরের ফলায় লাগিয়েছে। এইভাবে যদুবংশ নাশের প্রস্তুতি হয়ে গেল। এই কাহিনীগুলো শুধু কাহিনীই নয়, এই ধরণের কাহিনীগুলো একটা বাস্তব জিনিসকে ইঙ্গিত করে। আমরা মনে করছি আমরাই সব কিছু করছি, কিন্তু তা নয়, আমাদের উপরেও আরেকজন আছেন যিনি সব কিছু আগে থাকতেই বন্দোবস্ত করে রাখছেন। যদুবংশ নাশের প্রস্তুতি কি মুনি ঋষিদের অভিশাপেই শুরু হয়ে গেল? না, যবে থেকে যদুবংশ শুরু হয়েছে তবে থেকেই তার নাশেরও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। যে কোন সৃষ্টিতেই তার বিনাশের কাহিনীটা আগেই লেখা হয়ে থাকে। আমরা যেদিন জন্ম নিয়েছি সেদিনই আমাদের মৃত্যুটাও লেখা হয়ে গেছে। প্রত্যেক প্রাণীর জিনের মধ্যে লেখা আছে সে এতদিন বাঁচবে। বিজ্ঞানীরা এখন মোটামুটি হিসাব করে বলে দিচ্ছেন, কোন প্রাণী কত দিন বাঁচবে। তবে তার সাথে অন্যান্য আরও অনেক গুলো ব্যাপার জড়িত থাকে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলছেন ‘এদের নাশ হতে আর বেশী দেরী নেই, বিনাশ শুরু হয়ে গেছে। এদের নাশ হয়ে গেলেই আমি মর্ত্যধাম ছেড়ে চলে যাব’।

ব্রহ্মা আর অন্যান্য দেবতারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন। সবাই দেখছেন দ্বারকাতে নানান অশুভ ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, যা কিনা একটা বিরাট বিনাশের আভাস দিচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ জানেন এদের নাশের সময় হয়ে গেছে, তিনি দ্বারকাবাসীর সবাইকে ডেকে বললেন ‘চল আমরা সবাই মিলে প্রভাস তীর্থে যাই, কারণ আমাদের উপর মুনি ঋষিদের অভিশাপ লেগেছে, প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে প্রভাস তীর্থে যাওয়াটাই ঠিক। কারণ এর আগে দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে চন্দ্রকে যখন যক্ষ্মা রোগ গ্রাস করতে উদ্যত

হয়েছিল তখন চন্দ্র প্রভাস ক্ষেত্রে স্নান করে পাপজনিত রোগ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। চলুন আমরাও প্রভাস তীর্থে গিয়ে স্নান করব'। শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভিমত ব্যক্ত করার পর যদুবংশের সবাই এককথায় প্রভাস তীর্থে যাওয়ার জন্য রাজী হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে সেই সময় উদ্ধব একান্তে এসে শ্রীকৃষ্ণকে সুন্দর কয়েকটি কথা বললেন। এই অংশকে ভাগবতে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ, আবার উদ্ধব গীতাও বলে। ভাগবতের এগুলোকে সবাই আখ্যায়িকাই বলে, কিন্তু রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায়কে বলা হয় ভাগবতের পঞ্চপ্রাণ আর ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ ভাগবতের আত্মা। সব শাস্ত্র একই কথা বলে, বেদ যা বলে উপনিষদও তাই বলে, পুরাণও তাই বলে। ভাগবতেকে যদি শরীর মনে করা হয় তাহলে এই অংশটা তার আত্মা। উদ্ধব গীতায় ভগবান উদ্ধবের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মূলত ভাগবত ধর্মের কথাই বেশি করে বলছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ/উদ্ধব গীতা

উদ্ধব বলছেন, হে যোগেশ্বর! আপনি ভগবান, আপনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর! আপনি যদি চাইতেন ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে আপনি খণ্ডন করে দিতে পারতেন। কিন্তু আপনি তেমন কিছু করলেন না। আমি বুঝতে পেরেছি যে এবার আপনি যদুবংশের সংহার করবেন, যদুবংশের নাশ হওয়া মানে আপনিও আর এই ধরাধামে থাকতে চাইছেন না। আপনি আমার চোখের আড়ালে চলে যাবেন ভাবলেই আমার মন আপনার বিরহে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। আপনি চলে গেলে আপনাকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব! হে প্রিয়তম! আপনাকে ছাড়া আমার পক্ষে ক্ষণার্ধ সময় কাটানোও অসম্ভব। আপনি আমার জীবনসর্বস্ব, হে প্রভু আপনি আমাকেও আপনার সাথে আপনার ধামে নিয়ে চলুন। উদ্ধব বলতে চাইছেন, আপনি স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছেন, কিন্তু আমার তো সেই ক্ষমতা নেই যে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে দেব, আপনি কৃপা করুন যাতে আমার শরীরটাও চলে যায়। উদ্ধব খুব সুন্দর কথা বলছেন, হে প্রিয়তম কৃষ্ণ! আপনার এই শরীরে আপনার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যত লীলা হয়েছে, এই লীলা মানব জাতির জন্য পরম কল্যাণকর। আপনার এই অমৃতোময় লীলার শ্রবণ যে আস্বাদ করেছে তার জগতের সব বস্তুর প্রতি লালসার নাশ হয়ে যায়। আপনার সব কিছুর সাথে আমাদের মন জুড়ে রয়েছে, আপনিই আমাদের আত্মা, আমাদের প্রাণ। আমি আপনাকে কি করে ছেড়ে থাকব ভাবতেই পারছি না, আপনি আমাকেও নিয়ে চলুন। উদ্ধব শেষ করার আগে বলছেন *বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ।।১১/৬/৪৭।।* 'আমিও জানি মায়াকে অতিক্রম করা যায় না, বড় বড় ঋষি মহাত্মারাও মায়াকে পার করতে পারেন না। মায়ার গণ্ডিকে পেরনোর জন্য অতি বড় মুনি-ঋষিরাও আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করেন। সন্ন্যসীরা জ্ঞান লাভের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করে দেন, অধ্যাত্ম বিদ্যার্জনের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন, এইভাবে তাঁরা একেবারে বিশুদ্ধ নির্মল হৃদয়ের হয়ে যান, শান্ত চিত্তে নৈষ্কর্ম্য অবস্থাতে স্থিত হয়ে একমাত্র তাঁরাই আপনার ব্রহ্মরূপে পরিচিত ধাম প্রাপ্ত করতে পারেন। কিন্তু আমরা তো কর্মমার্গে আবদ্ধ হয়ে আছি। সে যেই হোক সংসারে থাকলেই, কামনা থাকবে, অভাব বোধ থাকবে আর জ্বালা থাকবে। সেইজন্য সংসারে সবাইকে কর্ম করতে হয়। কর্ম করতে গিয়ে কিছু শুভ কর্ম হয় তার সাথে অশুভ কর্মও হয়। কর্ম করলেই কর্মের ফল হবে, কর্মফল হলেই ঐ ফল থেকে আবার কর্ম হবে'। আমরা যতই বলি নিষ্কাম ভাবে কর্ম করছি কিন্তু চরিত্রের উপর যে ছাপ ফেলছে সেটা যাবে কোথায়! একজন ডাক্তার একজন সন্ন্যাসীকে বলছে, আপনি সন্ন্যাসী সমাজসেবা করছেন, আমিও ডাক্তারি করে সমাজসেবা করছি। সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, তফাৎ আছে, আমি পকেট ভরি না, আপনি আপনার পকেট ভরেন। এই জিনিস সংসারের সবারই মধ্যে কম বেশী রয়েছে। যারাই সংসারে আছে কিছু না কিছু কর্মে জড়াবেই, কর্মে জড়ালেই চরিত্রে ছাপ পড়বেই। খুব যাঁরা বিচক্ষণ তাঁরাই একমাত্র বুঝতে পারেন যে আমরা কর্মমার্গে ফেঁসে আছি। ঈশ্বরকে যদি জানতে হয় তাহলে ত্যাগ ছাড়া হবে না। ঈশ্বর জ্ঞান আর ত্যাগ এই দুটো একেবারে সমান অনুপাতে চলে। ত্যাগ যত বাড়বে ঈশ্বরের জ্ঞান হওয়ার সম্ভবনা তত বাড়বে। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর বই ছাড়া আমি কিছু জানি না। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, সুতোয় একটু আঁশ থাকলে ছুচের ভেতরে প্রবেশ করানো যাবে না। উদ্ধব এটাই বলছেন আমরা তো কর্ম মার্গে ফেঁসে আছি।

উদ্ধব আবার বলছেন *স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ। গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্।।১১/৬/৪৯।।* 'হে প্রিয়তম! আপনি চলে গেলে আমরা কি করে থাকব! আপনার কথা বার বার স্মরণ করব, মানুষের মত আপনি যে লীলা করেছে, সেই লীলার চর্চা করব'। ভগবান তো মানুষ নন, কিন্তু লীলাটা মানুষের মত করেন। উদ্ধব বলছেন, আপনার ভক্তদের সাথে আপনার গুণ ও লীলার চিন্তন করব তার সাথে আপনি যা যা কথা বলেছেন, আপনার হাবভাব, আপনার মিষ্টি হাসি, আপনার করুণা মাখা দৃষ্টি এগুলোকে সব সময় স্মরণ করব। আশা করি এভাবেই আমরা দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করে যেতে পারব। ভাগবত পড়ে আমরা যা বুঝি তাতে বোঝা যায় যে উদ্ধব একজন জ্ঞানী পুরুষ। উদ্ধবের এই বোধ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। কিন্তু জ্ঞানীও ভয়তরাসে, কারণ জ্ঞানীরা তখনও সত্ত্ব, রজো ও তমোর সীমাকে পেরিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু উদ্ধব বুঝে গেছেন আমাকে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কি করে বেরিয়ে আসবেন! তাঁর স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, তাদের ভালো মন্দে জড়িয়ে আছেন, সেইজন্য জ্ঞানীরাও বেরোতে পারেন না। উদ্ধব কিন্তু ভালো করে বুঝে গেছেন যে আমাকে মায়ার পারে যেতে হবে। তিনি বলছেন, আপনার কথা চিন্তা করতে করতে মায়াকে পার করে যেতে পারব। এটা সত্যি দেখা যায়, জীবনে কাউকে যদি আমরা ভালোবাসতে পারি, খুব গভীর ভালোবাসা, ঐ ভালোবাসাই আমাদের অনেক দুর্বলতাকে কাটিয়ে দেবে। আমাদের জীবনের অভিশাপ হল আমাদের মধ্যে সেই ভালোবাসাটাই নেই, কোন কিছুর প্রতি সেই ভালোবাসা নেই। স্বামীজী বন্ধুত্বের ব্যাপারে বলছেন, a man can realize God through true friendship যদি একজনের প্রতিও সত্যিকারের ভালোবাসা হয়, সেই ভালোবাসা তাকে ভগবান পর্যন্ত নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের সেই ভালোবাসাই নেই, স্বার্থ ছাড়া জীবনে কিছু নেই। সেইজন্য উদ্ধব বলছেন, হে কৃষ্ণ! আপনাকে ভালোবাসি কিনা, আপনার কথা চিন্তা করে করে জীবনের সব ঝঞ্ঝা ঝামেলাকে পেরিয়ে যেতে পারব, এই ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু থাকবে শুধু আপনার বিরহের অসহ্য জ্বালা। সেইজন্য বলছি আপনি আমাকে ত্যাগ করে যাবেন না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। এখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দিতে শুরু করেছেন, তারপর তিনি ধীরে ধীরে চব্বিশ গুরুর কাহিনীতে চলে যাবেন। আমরা সেই অবধূতের কাহিনী যিনি তাঁর জীবনের যে চব্বিশ জন গুরুর কথা বলছেন, সেটাকে নিয়ে আলোচনা করব।

উদ্ধবের কথা শোনার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে। ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেহভিকাঙ্ক্ষিণঃ।।১১/৭/১।।* হে উদ্ধব! তুমি যে যদুবংশের নাশের কথা বললে তোমার অনুমান ঠিকই, আমিও তাই করতে চাই আর ব্রহ্মা, শংকর ও ইন্দ্রাদি দেবতারাও এসে বললেন আমার সময় হয়ে গেছে, এবার আমি যেন স্বধামে গমন করি। এটা ঠিকই যে ভগবান সব নিয়মের ঊর্ধ্ব, তাঁর উপর কোন জোর চলে না, তবে আমাদের হিন্দু ধর্মের ধারণা অনুসারে সর্বশক্তিমান ভগবান যদি দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন, তখন এই শক্তি বা মায়ার এলাকায় যা যা নিয়ম আছে সব নিয়ম তাঁকেও মানতে হবে। শক্তির এলাকায় ব্রহ্মাই সবার উপরে, তিনি আদিকর্তা, আর ব্রহ্মা সবারই আয়ু নির্ধারিত করে দেন, অবতারের আয়ুও ঠিক করে দেন। ভগবান আর অবতারের একটা বড় তফাৎ হল, ভগবান সব জায়গাতেই বিদ্যমান, কিন্তু তিনি যখন কোন পার্থিব দেহকে অবলম্বন করেন, ঐ দেহ যে মানব দেহই হতে হবে তা নয়, যেমন মীন অবতার, কূর্ম অবতারের কাহিনী আছে, তখন তাঁর আয়ু মোটামুটি ঐ রকমই থাকবে যেমনটি ঐ প্রজাতির থাকে। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে ভগবানের জন্ম, কর্ম সব কিছুই দিব্য, তাঁর মৃত্যুটাও দিব্য। দিব্য কেন বলা হয় তার বিশদ আলোচনা আমরা এর আগে করে এসেছি। আমাদের জন্ম, মৃত্যু, সব কিছুই আগের আগের কর্ম দ্বারা প্রেরিত হয়ে থাকে, ভগবানের ক্ষেত্রে তা হয় না, সেইজন্য ভগবানের সব কিছুকে দিব্য বলা হয়। শুধু ভগবানেরই নয়, যিনি জীবনমুক্ত হয়ে গেছেন, যিনি জ্ঞানী তাঁরাও যখন ঠিক করেন এবার আমি যাব, তিনি শরীর ছেড়ে চলে যান। তাঁকে তখন কেউ আটকাতেও পারবে না, আর তার আগেও তাঁকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ তাঁর একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকে। ভাগবত গ্রন্থ ভক্তদের গ্রন্থ, ভক্তদের গ্রন্থ হওয়ার জন্য এই জিনিসগুলোকে আরও মাধুর্য সহকারে বিস্তারিত ভাবে রাখা হয়। এখানে ব্রহ্মা এসে বললেন আপনার যাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু ঠাকুরের জীবনে আমরা উল্টোটা পাই। মা তারকেশ্বরে হত্যে দিয়ে ঠাকুরের

যাওয়াটাকে যেন আটকাতে চাইছিলেন, কিন্তু ঠাকুর হেসে বলে দিলেন, ওসবে কিছুই হবে না; আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমি চললাম।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, দেবতাদের প্রার্থনায় আমি যে কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলাম, সেই কাজও আমি করে দিয়েছি। পৌরাণিক যে মত, যে মতে অবতারতত্ত্ব আসছে, বড় বড় মনীষীরা এই মতকেই বলেন ভাগবত ধর্ম। অবতারতত্ত্ব নিয়ে আমরা এর আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। অবতারতত্ত্ব যে পুরোপুরি হিন্দু ধর্মের মত তা নয়, কারণ হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদে অবতারতত্ত্ব নেই, তন্ত্র মতেও অবতারতত্ত্ব নেই, যাঁরা শিবের উপাসক তাঁদেরও অবতারতত্ত্ব নেই। অবতারতত্ত্ব ভাগবতের একটা বিশেষ ধর্ম, যাকে বলছেন ভাগবত ধর্ম বা পৌরাণিক ধর্ম। বেদেই একটি মন্ত্রে বলছেন, ইন্দ্র মায়ার দরুণ অনেক রকম রূপ ধারণ করেন, আবার বিষ্ণুও অনেক রকম রূপ ধারণ করতে পারতেন। এখান থেকেই ধীরে ধীরে একটা ধারণা পরিপক্কতা লাভ করল, যেখানেই বিশেষ শক্তি সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বরের এই প্রকাশ থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলা শুরু হল, তিনি অবতীর্ণ হন। এখন এটাই একটা বলিষ্ঠ মত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, ঠাকুর আবার এই মতের অনুমোদন দিয়ে গেছেন। এরপর থেকে অবতারবাদ বা অবতারতত্ত্ব হিন্দু ধর্মের একটি বলিষ্ঠ মত হয়ে গেছে। ভগবান তো এমনি এমনি অবতীর্ণ হয়ে যাবেন না, কাউকে প্রার্থনা করতে হবে আমরা খুব সঙ্কটে আছি, আপনি এসে আমাদের পরিত্রাণ করুন, কারণ ভগবান তিনি নির্বিকার, কোন কিছুতেই হস্তক্ষেপ করবেন না। আমাদের বোঝার জন্য এটাই বলা হয়, যেখানে শক্তির বিশেষ প্রকাশ সেখানে ভগবান নিজেই সেটা। এখন ভগবান কিভাবে এলেন আমরা জানি না। একটা প্রচলিত মত হল ভক্তের কামনা পূরণ করার জন্য ভগবানের আগমন। ভগবানকে আমরা যে কোন রূপেই নিতে পারি, যে রূপকে ভালোবাসে সেই রূপের চিন্তা করলেও তাঁর আস্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবান মানব দেহে যে লীলা করেন সেই লীলাকে ভক্ত আস্বাদ করতে চায়। কারণ মানব দেহে ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ সবই হয়, তার আনন্দটাও তাই আলাদা। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, শুধু ধারণা করে কি হবে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন চাই। বলার পরে আবার বলছেন, শুধু কি দর্শন, তাঁর স্পর্শন, বাক্যালাপ পর্যন্ত হয়। ঈশ্বরকে সব রূপে সব ভাবে সম্ভোগ করা। একটা পুরনো বিতর্ক চলে আসছে যে, ঈশ্বর চৈতন্যময়, তাঁকে কি দর্শন, স্পর্শন করা যায়, তিনি কি প্রার্থনা শোনেন? কিন্তু যাঁরা ভক্তি পথের পথিক তাঁরা চিরদিনই মেনে আসছেন হ্যাঁ হয়। জ্ঞানমার্গীরা আবার এসবে নজর দেন না, সচ্চিদানন্দ, যিনি চৈতন্যস্বরূপ তাঁর সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য, আমার আর কিছু লাগবে না।

উদ্ধবকে স্নেহ মমতার বন্ধন ছিন্ন করে ঈশ্বরে সমাহিত চিত্ত হওয়ার উপদেশ

ভগবান অবতার রূপে এমনি এমনি আসবেন না, কাউকে প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা তখনই করে যখন কোন গোলমাল হয়, যখন ভক্তির হানি হয় বা আসুরিক শক্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ এসব শক্তির বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মাদি দেবতারাও প্রার্থনা করেছিলেন, যে কাহিনী প্রথমের দিকে বলা হয়েছে। উদ্ধবকে বলছেন, আমি যে কাজের জন্য এসেছিলাম, সব কাজই হয়ে গেছে, থেকে গেছে শুধু যদুবংশ, ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভেতর থেকে এমনিতেই যদুবংশ ভস্ম হয়ে গেছে, আর কয়েক দিনের ব্যাপার, বাইরে থেকেও যদুবংশের নাশ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর বলছেন *ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে। জনোঽধর্মরুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে।।১১/৬/৫।।* 'হে উদ্ধব! মর্ত্যধাম ছেড়ে আমার চলে যাওয়ার পর তুমি আর এখানে বেশি দিন থেকো না'। যাঁরা ভক্তি ভাব নিয়ে থাকেন তাঁদের কাছে এটা এক বিরাট সমস্যা। অবতারকে যিনি প্রচণ্ড ভালোবেসেছেন, তাঁকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না। কারুর খুব প্রিয়জন মারা গেলে আমরা অনেক সময় বোকার মত তাকে বলি, শোক করে কি হবে জগতটা এই রকমই। যার উপর আমার ভালোবাসাটা দিয়ে রেখেছি তাকে তো আমার পাশে চাই। তিনটে জিনিস খুব দুর্লভ, মানব জীবন, মহাপুরুষের আশ্রয় আর মুক্তির ইচ্ছা। ঠাকুরের তখন শেষ অবস্থা, স্বামীজী গুরুভাইদের বলছেন 'দেখ ভাই, এর পর আমরা মনুষ্য জন্ম অবশ্যই পাব, মুক্তির ইচ্ছাও থাকবে কিন্তু মহাপুরুষের আশ্রয় আর পাওয়া যাবে না, ঠাকুরকে আর পাওয়া যাবে না, সেইজন্য যা করার তাড়াতাড়ি করে নাও'। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, প্রেম করলে যা হয়, ভক্তিতেও ঠিক তাই হয়। সন্তান যদি মারা যায় মায়ের আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে না বা খুব প্রিয়জন কেউ

যদি মারা যায় তখনও বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকে না। সেখানে ঈশ্বরের অবতারের প্রতি যে ভালোবাসা, ঐ ভালোবাসা এতই গভীর যে অবতারের শরীর চলে গেলে সে আর থাকতে চায় না। দ্বিতীয় উদ্ধবকে বলছেন, কলি যুগে অনাচার প্রচণ্ড বেড়ে যাবে সেইজন্য বলছি তুমি আর বেশি দিন এখানে থেকো না।

পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু। ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ বিসদৃগ্ বিচরস্ব গাম্।।১১/৬/৬।।* হে উদ্ধব! মৃত্যু তোমার হাতে নেই। অবতার পুরুষ, জীবনমুক্ত, জ্ঞানীদের ছাড়া মৃত্যু কারুরই নিজের হাতে নেই। আর জীবনে তোমার যা কিছু করার করে নিয়েছ, অবতারের সঙ্গ করলে, অবতারকে ভালোবাসলে, অবতারকে ভালোবাসার পর আর তুমি কার সাথে ঘর করতে পারবে! ভাগবতে উদ্ধবের জীবনের বর্ণনা আমরা বিস্তারিত ভাবে পাই না, পরিবর্তি কালে অনেকে নিজে থেকে কাহিনী বানিয়ে দিতে পারেন, তবে আমরা জানি তখনকার দিনে সবাই বিয়েথা করতেন আর সন্তানাদির জন্ম দেওয়া একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল; তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উদ্ধবেরও নিশ্চয় স্ত্রী সন্তনানাদি ছিল আর বন্ধুবান্ধবও থেকে থাকতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু*, যাকেই তুমি নিজের স্বজন মনে করছ, যাদের তুমি আত্মীয় মনে করে নিজের খুব ঘনিষ্ঠ মনে করছ, সবারই প্রতি তোমার মোহ, মমতাকে ত্যাগ করে, সবার সাথে যে নিজেকে একাত্ম বোধ করে রেখেছ, এই একাত্ম বোধটা এবার পুরোপুরি ছাড়। সব কিছু থেকে মনকে সরিয়ে এনে *ময্যাবেশ্য*, আমাতে তোমার মনকে সন্নিবিষ্ট কর আর সবার প্রতি সমান দৃষ্টি রেখে এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাক। আধ্যাত্মিক জীবন কেমন হবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একটা দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে দিলেন।

আমরা যতই এসব কথা শুনি না কেন আমাদের মন কখনই এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে চায় না। মানুষের মনকে যদি দুদিক থেকে দেখা হয়, যোগশাস্ত্রের দিক থেকে দেখলেও তাই আর নিউরো বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলেও তাই। নিউরো বিজ্ঞানের মতে আমাদের মস্তিষ্কে যে শত শত কোটি কোটি নিউরোনস্ আছে তার মধ্যে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার নিউরোনস্ অনবরত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে চলেছে। ধ্যানে বসে আছি, জপ করছি বা চুপচাপ বসে আছি তখন নিউরোনস্ গুলো টিউবলাইটের স্টার্টারের মত নাচতেই থাকে। মনটা রাখব কোথায়, একটা কোথাও তো মনকে রাখতে হবে, মস্তিষ্ক ফায়ারিং করেই যাবে। যোগদৃষ্টিতে মনের মধ্যে হাজার রকমের বৃত্তি অনবরত উঠছে, বৃত্তি আর মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য একই জিনিস, দুজনের ভাষাটা শুধু আলাদা। যোগশাস্ত্রে পাঁচ রকমের বৃত্তির কথা বলছেন, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু দেখছি, শুনছি সেগুলো মস্তিষ্ককে নাড়াতে থাকবে, কল্পনায় যা কিছু আছে সেগুলো অনবরত আসতেই থাকবে, মিথ্যা কল্পনা আসতে থাকবে, স্বপ্ন রূপে আসতে থাকবে আর সব থেকে বাজে স্মৃতি রূপে আসতে থাকবে। মস্তিষ্কের কাছে সবটাই সমান, আপনাকে সামনা সামনি দেখাও যা, আপনার চিন্তা করাও তাই, স্বপ্নে আপনাকে দেখাও তাই, মস্তিষ্কের কাছে কোন তফাৎ বোধ হবে না। যাকে আমরা ভালোবাসি সে যদি আমার সামনে থাকে তখন মস্তিষ্ক প্রচণ্ড ফায়ারিং করতে থাকবে, তার কথা মত আমাকে ওঠবোস করতে হবে। বাড়িতে যদি ছয় সাত মাসের ছোট শিশু থাকে, ঐ শিশুর কথা মত তার দাদু ঠাকুরমাকে নাচতে হয় তার বাবা মাকেও ওর কথা মত নাচতে হয়, বাড়ির রুটিনটাই ঐ শিশুর কথা মত হয়ে যায়, আর এই রুটিন বাচ্চার মোটামুটি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত চলে। শুধু আপনার আমার বাড়ির এই কাহিনী নয়, সারা বিশ্বে এই একই কাহিনী চলছে। বাড়ির সবারই জীবন ঐ শিশুকেন্দ্রিক হয়ে যায়। শুধু এই শিশুকেন্দ্রিকই নয়, যাকে আমরা ভালোবাসব আমাদের জীবনটাও তার কেন্দ্রিক হয়ে যাবে। জীবন কোন পরিস্থিতিতেই নিজের ইচ্ছা মত চলে না। এটাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলতে চাইছেন 'তোমার যেই থাকুক, স্ত্রী, পুত্র, নাতি, বন্ধুবান্ধব এদের থেকে তুমি বেরিয়ে এসো। শুধু বেরিয়ে এলেই হবে না, *ময্যাবেশ্য*, আমাতে মনটা লাগাও, এই যে আমি শ্রীকৃষ্ণ, সাক্ষাৎ অবতার, তোমার যে আত্মা, তোমার যে আমিত্ব তার সাথে ঈশ্বর বা আত্মা বা অবতারের কোন তফাৎ নেই। হে উদ্ধব! আমি যতদিন ছিলাম ততদিন ঠিকঠাক চলে গেছে, এখন তো আমি চললাম এবার তুমি নিজেকে সামলাও'। নিজেকে সামলাবে কিভাবে? প্রথম হল তুমি যাদের এতদিন তোমার প্রিয়জন ভেবে এসেছে তাদের স্নেহের নিগঢ়বন্ধনকে আগে ছিন্ন কর। প্রিয়জন বলে কেউ হয় নাকি এই জগতে!

মার্কণ্ডেয় পুরাণে একটা কাহিনী আছে, একটা শিশু জন্ম নিয়েই মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মা জিজ্ঞেস করল 'তুমি হাসছ কেন'? শিশুটি একটা বেড়ালকে দেখিয়ে বলছে 'ওই বেড়ালটা ওখানে বসে আছে, আমি ভাবছি বেড়ালটা যদি আমাকে খেয়ে নেয় এক্ষুণি আমার সব কষ্টের শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বেঁচে থাকলে সারা জীবন তুমি আমাকে চুসে যাবে সেই ভেবে আমি হাসছি। আমার কাছে বেশি বিপজ্জনক কে? তুমি নাকি বেড়ালটা'? বাস্তবিক তাই, এই সংসার হল কে কার থেকে কতটা চুসে নিতে পারার খেলা, স্বামী স্ত্রীকে চুসছে, স্ত্রী স্বামীকে চুসছে, বাচ্চা মাকে চুসছে, মা সন্তানকে চুসছে, সবাই সবাইকে চুসে যাচ্ছে। যারা ওস্তাদ তারা ওর মধ্যেই নিজের পথ বার করে বেরিয়ে যায়, এরাই জ্ঞানী, এরাই ভক্ত, এরাই মুক্ত হয়ে যায়। ঠাকুর এর উপর কত উপমা দিচ্ছেন, গুটি পোকা ইচ্ছে করলে গুটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু নিজে বানিয়েছে কিনা তাই কি করে বেরিয়ে আসবে! আবার বলছেন উট কাঁটা ঘাস চিবোয় মুখ দিয়ে রক্ত বেরোয়, কিন্তু তাও কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়তে পারে না। 'হে উদ্ধব! প্রথমে তুমি এটাকে ছাড়, ছেড়ে কি করবে, এই মনকে তো কোথাও তোমাকে রাখতে হবে, তা নাহলে তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, তাই তুমি ঈশ্বরে মন সন্নিবিষ্ট কর। সংসারে যদি থাক সবাই তোমার হাড়গোড় চুসে চুসে খাবে, সংসার থেকে বেরিয়ে এলে একা একা থাকার জন্য মন তোমাকে চুসে চুসে খাবে'। বেশির ভাগ সন্ন্যাসীর তাই মাথা খারাপ হয়ে যায়। কারণ মনের চাঞ্চল্য তো চলে যায়নি, কিন্তু ঐ মনকে যদি ঈশ্বরে লাগিয়ে দেওয়া যায় তখন ঈশ্বর তোমাকে শরীরের দিক দিয়ে চুসবে না, মনের দিক থেকেও চুসবে না। ঠাকুরকে দেখে একজন বলছে, ঈশ্বরের চিন্তা করে করে উনি বেহেড হয়ে গেছেন। ঠাকুর শুনে বলছেন, তুমি জড়ের চিন্তা করে ঠিক আছ আর আমি চৈতন্যের চিন্তা করে বেহেড হয়ে গেছি! যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত হতে চাইছেন তাঁদের জন্য এখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে একটা খুব মূল্যবান উপদেশ দিলেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধকে ভাগবতের আত্মা এই জন্যই বলা হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পর পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকে খুব মূল্যবান কথা বলছেন।

***মায়ামনোময়ম্*, জগৎ মনের বিলাস মাত্র**

পরের শ্লোকে বলছেন *যদিদিং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহ্যমাণাং বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্।।১১/৭/৭।।* 'এই জগতে যা কিছু তুমি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে দিয়ে জানছ, মনে মনে যা কিছু ভাবছ, যা কিছু জানছ সবটাই বিনাশশীল, সবটাই মনের বিলাস, স্বপ্নবৎ, সবই মায়া মাত্রম্'। এখানে শব্দটা হল *মায়ামনোময়ম্*, মায়া শব্দকে বোঝা, কিন্তু মায়া জিনিসটাকে জানা খুব কঠিন। বেদান্তের বিভিন্ন দর্শনের শাখাতে মায়াকে বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করা হয়েছে। তবে আচার্য শঙ্কর যা বলছেন, স্বামীজীও বলছেন আর ঠাকুরও বার বার বলছেন, তা হল ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অনিত্য। যেটাই অনিত্য সেটাই মায়া। অনিত্য কি? জগতের যে কোন বস্তু যদি দেশ, কাল আর বস্তু এই তিনটেতে পরিচ্ছিন্ন হয় সেটাই অনিত্য। দেশ মানে স্থান, কাল মানে সময় আর বস্তু, এই তিনটের মধ্যে যদি কোন কিছু বাঁধা হয়ে থাকে সেটাই অনিত্য। যেমন আমি এই চেয়ারে বসে আছি, আমি আপনার চেয়ারে বসে নেই, তার মানে আমি স্থান বা দেশ আবদ্ধ। একদিন আমার জন্ম হয়েছিল, একদিন মারা যাব, আমি কালে আবদ্ধ হয়ে গেলাম। আমি আর এই মাইক্রোফোন আলাদা, তার মানে আমি এই মাইক্রোফোনে নেই। তার মানে আমি দেশেও আবদ্ধ, কালেও আবদ্ধ আর বস্তুতেও আবদ্ধ, আমি ঘোর মায়া। যদি এমন কোন জিনিস থাকে যেটা সর্বব্যাপী, যেমন বাতাস সর্বব্যাপী, কিন্তু যদি মেনেও নিই বাতাস দেশে সর্বব্যাপী, কালেও যদি মেনে নিই সর্বব্যাপী কারণ তার আগে আমরা জানি না। কিন্তু বস্তুতঃ সর্বব্যাপী নয়, কারণ বায়ু জল নয়, এখানেই বায়ু সীমিত হয়ে গেল। যেটাই সীমিত সেটাই মায়া। বেদান্তে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা হল মনোবিলাস। প্রথম প্রথম এই ধরণের শব্দ আমাদের উদ্ভট মনে হতে পারে। কিন্তু বেদান্তের বিচারে এটাই সত্য। খুব সহজ উপমা দিয়ে বোঝান যেতে পারে। এই পেন আমরা দেখছি, আমাদের কাছে পেন একটা বস্তু। কিন্তু আমরা কি করে এই পেনকে জানছি? পেনে আলো পড়ছে, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ছে, চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে একটা অনুভূতি হচ্ছে, মস্তিষ্কে পেনের একটা আকার তৈরী হয়ে গেল, পেনটা মস্তিষ্কেরই একটা চিন্তা। এই পেন আমাদের কাছে একটা চিন্তা মাত্র। যদি পেনকে সরিয়ে দিয়ে পেনের কল্পনা করতে বলা হয়, তখনও আমরা পেনের একটা

কল্পনা করতে পারব। স্বপ্নে যদি দেখি তখনও কল্পনা করতে পারব, শেষ পর্যন্ত সবটাই মস্তিষ্কের খেলা। যে জিনিসটাই মস্তিষ্কের মধ্যে ঘোরে সেই জিনিসটাই সীমিত, সেটাই মায়া। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু জানা যায়, মনের মধ্যে যা কিছু ভাবা হচ্ছে সবটাই মায়া। ঈশ্বর জ্ঞান এই মন দিয়ে হয় না। পরে যখন এই বিষয়টা আসবে তখন আবারও আলোচনা করা হবে। ঈশ্বর হলেন অনন্ত, সর্বব্যাপী; দেশ, কাল, বস্তু কোন কিছুতেই তিনি আবদ্ধ নন, সেইজন্যই তিনি অসীম, অনন্ত। উদ্ধবকে বলছেন, তুমি একবার এই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা কর, যে কোন জিনিস যেটা দেশ, কাল ও বস্তুতে সীমিত থাকে সেটাই মায়া। যেটাই মায়া সেটাই তোমার মনের বিলাস, মনের খেলা, এর বেশি কিছু নয়। আর যেটাই মনের খেলা সেটার জন্য তুমি কেন এত অস্থির হচ্ছ! যদি বিচার করা যায়, ছোটবেলায় আমরা খেলনার জন্য, মিষ্টির জন্য কত চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করেছি, তার জন্য বড়দের কাছে কত বকা খেয়েছি, মার খেয়েছি। আজ এই বয়সে ঐ জিনিসগুলোর আমাদের কাছে আর কোন গুরুত্ব নেই। আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে যা কিছু করেছি এখন তার কোন মূল্য নেই। আজকে এই বয়সে যা কিছু করছি, আমাদের যদি দীর্ঘ জীবন থাকত, তখনও আজকের এই জিনিসগুলোর কোন গুরুত্ব থাকত না। আর যদি আমরা এটাকে পুনর্জন্ম রূপে দেখি, তাহলে তো কোন কিছুরই গুরুত্ব থাকে না। এই জন্মে আজকে একটা বাড়িতে আছি, পরের জন্মে আরেকটা বাড়িতে অন্য লোকদের সাথে থাকব, তার পরের জন্মে আবার অন্য বাড়িতে অন্য লোকেদের সঙ্গে থাকতে হবে। তাহলে এত লাফালাফি, নাচানাচি কি নিয়ে করছি!

ভগবান মানুষকে সব কিছুই দেন, ক্ষমতা দেন, বুদ্ধি দেন, শুদ্ধ চৈতন্য দেন কিন্তু তার সাথে বোকামটাও দিয়ে দেন। ঐ বোকামর জন্য আমরা সবাই সবাইকে জড়িয়ে আছি। ইংরাজীতে খুব নামকরা একটা প্রবাদ আছে, Catching the tiger by its tail বাঘের লেজ দিয়ে বাঘ ধরা। একটা লোক জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে যেতে দেখে একটা খুব সুন্দর রঙিন দড়ি পড়ে আছে, ধরতেই ধড়মড় একটা বাঘ লাফিয়ে উঠেছে। বাঘের লেজটা ধরে আছে, এখন ওটা ধরবে না ছাড়বে বুঝতে পারছে না। ধরেও রাখতে পারছে না, কতক্ষণ আর ধরে রাখবে। আর ছেড়ে দিলেই বাঘ খেয়ে নেবে। এই জগতটা হল বাঘের লেজ, আমরা সবাই বাঘের লেজ ধরে আছি। বাঘ দৌড়াচ্ছে আমরাও দৌড়াচ্ছি, বাঘ থামলে আমরাও থামছি। কারণ আমরা জানি লেজ ছেড়েছি কি মরেছি। কে বলেছে লেজ ধরে রাখতে? এটাই এখানে বোঝাতে চাইছেন, সবাই বাঘের লেজ ধরে লাফালাফি করে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে ছাড়তে হবে, কিন্তু কোন জায়গাতে ছাড়বে সেটা নিজেকেই ভাবতে হবে। যে করেই হোক প্রাণ বাঁচাও, ঐ লেজ ধরে রাখা যাবে না। মুশকিল হল মনকে কোথাও তো রাখতে হবে, তা নাহলে পাগল হয়ে যাবে, হতাশা এসে যাবে, আত্মহত্যার দিকে চলে যাবে। সামর্থ থাকতে থাকতেই তাই সরে আসতে হয়। কিন্তু হয় না, আচার্য শঙ্কর তাই বলছেন *বালস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।।* বাল্যাবস্থায় মানুষ খেলায় মগ্ন থাকে, যৌবনে সে তরুণীতে গিয়ে আসক্ত হয় আর বৃদ্ধ হয়ে গেলে চিন্তামগ্ন হয়ে যায়, পরমব্রহ্মে কারুরই মন লগ্ন হয় না, জগতে তাই এত দুঃখ। এগুলো বোঝার চেষ্টা কর। স্বজন থেকে কেন সরে আসতে বলছেন? তোমার স্বজনদের চোখ দিয়ে দেখছ কিনা? হ্যাঁ দেখছি। স্বজনদের মিষ্টি কথা কান দিয়ে শোন কিনা? হ্যাঁ শুনি। তার মানেই এটা মায়া, চোখ দিয়ে যা দেখছ, কান দিয়ে যা শুনছ, সবটাই মায়া। এই মায়ার বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসো। তাই বলে মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তানকে কি পথে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যাবে? কখনই না। তোমার দায়ীত্ব এদের দেখাশোনা করা। দায়ীত্ব পালন হয়ে যাওয়ার পর বেরিয়ে এসো। কিন্তু আমরা কেউই বেরোতে পারি না, সবাই সবাইকে চুসবে। ভগবান এখানে এই কথা সাধারণ লোকদের বলছেন না, বলছেন উদ্ধবকে। গীতাতেও ভগবান যুধিষ্ঠিরের মত সত্ত্বগুণী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব থাকতেও উপদেশ দিলেন অর্জুনকে। কারণ উদ্ধব, অর্জুন এনারা উত্তম শিষ্য, বললে বুঝবে, সেই অনুসারে কাজ করবে আর ভালো প্রচার হবে।

<u>শান্তি কার হয়?</u>

ভগবান উদ্ধবকে বলছেন *পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্। কর্মাকর্মবিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা।।১১/৭/৮।।* অসংযত চিত্ত বা সমাহিত চিত্ত শব্দ শাস্ত্রে বার বার আসবে। গীতাতেও

বলছেন সুখ কোথা থেকে আসে? সুখ শান্তি থেকে আসে। শান্তি কার হয়? যার সমাহিত চিত্ত। সমাহিত চিত্ত মানে, একটি বস্তুতে মনকে একাগ্র করা। যাদের একটা জিনিসে গিয়ে মন একাগ্র হয়ে যায়, সেখান থেকে মন শান্ত হয়ে যায়। যার মন যত শান্ত সে তত সুখী। যাদের অসমাহিত চিত্ত তারা পাগলের মত অনেক কিছু দেখতে থাকে। যেমন খাঁজ কাটা গ্লাশে আলো পড়লে অনেক আলো দেখায়, আমাদের মস্তিষ্ক হয়ে গেছে এখন খাঁজ কাটা গ্লাশের মত। একটা লেন্স যদি শত শত লেন্স হয়ে যায় তখন সেখানে শত শত প্রতিবিম্ব দেখাবে, ভ্রান্ত চিত্তও তাই। ভ্রান্ত চিত্ত মানেই সে নানান কিছু দেখে। কিন্তু ঠাকুর বা ঠাকুরের মত মহাপুরুষরা শুধু সচ্চিদানন্দকেই দেখছেন। ঠাকুরের নিজের লোকেরা ঠাকুরকে পাগল ঠাওরালো। কিন্তু শাস্ত্র অন্য কথা বলছেন, যে নানান দেখে সেই অস্বাভাবিক, যে এক দেখে সেই স্বাভাবিক। আমাদের সবারই ভ্রান্ত চিত্ত, যেমন চোখে যদি দোষ হয়ে যায় তখন সে একটি বস্তুকে দুটো করে দেখে। নামকরা ক্রিকেটার মনসুর আলি খান পাতৌদির একটা চোখ দুর্ঘটনায় ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে ক্রিকেট খেলতে যখন নামতেন তখন তিনি দুটো বল দেখতেন। ফার্স্ট বোলাররা ঐ স্পিডে বল করছে সেখানে তিনি দুটো বল দেখছেন। তারপর প্র্যাক্টিস করে করে দেখলেন দ্বিতীয় বল যেটা দেখছেন সেটাই আসল বল, প্রথম বলটা মিথ্যা। তিনি তখন দ্বিতীয় বলটাতে মনকে একাগ্র করতে শুরু করলেন। তাঁর ব্রেনের কী আশ্চর্য পাওয়ার, ক্রিকেট জীবনে তিনি সেঞ্চুরি করেছেন, ক্যাপ্টেন ছিলেন, ম্যাচ জিতেছেন, সারা জীবন কিন্তু দুটি বল দেখে গেলেন। চোখের দোষে তিনি একটা বলকে দুটো দেখছেন, তেমনি মস্তিষ্কে গোলমাল হলে এই জগতে বহুত্ব দেখায়। এটাই ভাগবতের বক্তব্য।

মস্তিষ্কের দোষ হলে আমি কাউকে ভালোবাসব, কাউকে ভালোবাসব না। ভালোবাসা আর ভালো না বাসা অনুসারে কর্মগুলিও সেই রকম হয়ে যাবে। ভালোবাসা আর ভালো না বাসাই রাগ আর দ্বেষ, যেখানে রাগ সেখানে এগোনর জন্য আমাকে এক ধরণের কর্ম করতে হবে, যার প্রতি দ্বেষ তার থেকে সরে আসার জন্য অন্য ধরণের কর্ম করতে হবে। যখন কর্ম হবে তখন কিছু কর্ম শাস্ত্র সম্মত হবে আবার কিছু কর্ম হবে যেগুলো শাস্ত্র সম্মত নয়। আবার কিছু কিছু কর্ম আছে, যে কর্মগুলোকে করতে শাস্ত্র নিষেধ করে দিয়েছে, তাও সেই কর্ম করছি। বিশ্বামিত্র সাধনা করছেন, অপ্সরা মেনকাকে চোখে পড়তেই তাঁর মন নড়ে গেল, কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন যে আমি সাধনায় আছি, তিনি নিষিদ্ধ কর্ম করে বসলেন। ভাগবত বলছেন, মন যদি অসমাহিত থাকে তখন এই রকমই হয়। যাকেই দেখবে নানা রকমের কর্মে নিজেকে জড়াচ্ছে, বুঝবে সে অসমাহিত চিত্ত। তাহলে যাঁরা পূর্ণ সমাহিত চিত্ত তাঁরা কি কাজ করেন? ঠাকুরের নামে স্বামীজী স্তোত্র রচনা করে বলছেন *অদ্বৈততত্ত্ব সমাহিত চিত্ত*। মূল কথা, তাঁর কর্ম খসে যায়, কর্ম বলে তাঁর আর কিছু থাকে না। যদিও কিছু কর্ম করেন সেটাও তাঁর কাছে কর্ম বলে বোধ হয় না। কর্মে যেমন একজন কর্তা থাকে, কর্মের দ্বিতীয়া থাকে, তার ক্রিয়া থাকে, এই ধরণের কোন বোধ থাকে না, তখন তাঁদের কাছে সবটাই এক হয়ে যায়। যেখানেই মনে হচ্ছে এটা শুভ কর্ম, এটা অশুভ কর্ম, এটা নিষিদ্ধ কর্ম, কারুর প্রতি ভালোবাসা আছে, কারুর প্রতি বিদ্বেষ আছে, বুঝতে হবে সেখানেই অসমাহিত চিত্ত। সংসারী লোকেদের এটাই হয়, নিজের বাড়ির লোকেদের প্রতি সাংঘাতিক ভালোবাসা, বাড়ির বাইরের লোক মরুক বাঁচুক তাতের আমার কিছু যায় আসে না। সংসারে সবারই এই মানসিকতা। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোও তাই করছে, নিজের পার্টির লোকদের আকাশে পৌঁছে দিচ্ছে আর বিরোধী পার্টির লোকেদের পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারছে। এটাই আমাদের স্বভাব, যাকে ভালোবাসি তার জন্য প্রাণ দিয়ে দেব, যাকে ভালোবাসি না সে মরে গেলেও তার দিকে তাকাবো না। ঋষিরা জানতেন এদের মধ্যে ভেদ বুদ্ধি প্রবল, মন অশুদ্ধিতে ভরা, কামনা-বাসনার পোকা মাথায় গিজগিজ করছে, এদের ধ্যান করতে বললে পারবে না, এদের জপ হবে না, সেইজন্য শাস্ত্র এদের কর্মের বিধান দিয়ে দিলেন। তোমরা কাজ করে যাও। কি কাজ করবে? বেদ বিহিত কর্ম, যজ্ঞ কর, দান কর, এই করে করে আস্তে আস্তে মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা কর। সাধুদের এক আলোচনা সভায় একজন সাধু এই কথাই বলছিলেন, ঠাকুরের ভক্তদের আমরা কথামৃতের কথা বলে যাচ্ছি, উপদেশ দিচ্ছি কথামৃত থেকে, কিন্তু কথামৃত হল বেদ, খুব উচ্চমানের সাধকদের জন্য। সাধারণ গৃহস্থ ভক্তদের জন্য যে কর্মের বিধান, পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে, নিজের জীবনের সব কাজকে যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন করবে, এগুলোর দিকে আমরা কেউ ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি না।

আমরা মনে করছি হয় আমাদের স্বার্থপর জীবন আর তা নাহলে একেবারে সমাধিলব্ধ জীবন, তাই কি কখন হতে পারে! আমি ধ্যানে যখন যাব সরাসরি আমি সমাধিবান পুরুষ হয়ে যাব আর সমাধি থেকে যখন নেমে আসব তখন স্বার্থপর জীবন। এই জিনিস কি কখন হয়! কোথাও কোন শাস্ত্রে নেই। এই দুটোর মাঝখানে যে আরও অনেক ধাপ আছে সেটাকে কে দেখাবে? স্বামীজী তাই বার বার বলছেন অপরের সেবা কর। শাস্ত্র যে গৃহস্থদের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান দিলেন, কেন দিলেন? তুমি তোমার স্বার্থপরতা থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে এসো। এতে তোমার মন শুদ্ধ হবে, মন শুদ্ধ হলে তবেই তুমি ধীরে ধীরে জপধ্যান করতে পারবে। সাধু সঙ্গ করতে করতে নিঃসঙ্গ হয়, স্বার্থপরতা কমে। নিঃসঙ্গ যখন হয় তখন ধীরে ধীরে নির্মোহ হয়, মোহটা কমে। আর নির্মোহ হয়ে গেলে, সব মোহের যখন নাশ হয়ে গেলে তখন সে জীবনমুক্ত হয়ে যাবে। এখানে কত ধাপের কথা বলছেন, মানুষ এগুলো বুঝতেই চায় না। বেদ তাই প্রথমেই বলে দিলেন, বৈদিক কর্ম করতে করতে আগে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সরে এসো। সরে আসার পর শাস্ত্রে যে রকম বলেছে সেই রকম করো, শাস্ত্রের বাক্য উল্লঙ্ঘন করতে নেই।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ। আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং মষ্যধীশ্বরে।।১১/৭/৯।।* হে উদ্ধব! এগুলোকে বুঝে নিয়ে প্রথমে তুমি তোমার ইন্দ্রিয়কে জগত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসো। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে একই কথা অন্য ভাবে বলছেন, *নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।।১/২/২৪।।* দুশ্চরিত্র থেকে যে সরে আসেনি তার দ্বারা জ্ঞান লাভ হবে না, দুশ্চরিত্র থেকে সরে আছে কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল তার দ্বারাও হবে না। আর যার মন চঞ্চল, পাঁচটা জিনিসকে নিয়ে ভেবে যাচ্ছে, এই দুঃখের কথা ভাবছে, এই সুখের কথা ভাবছে, এদের দ্বারাও কিছু হবে না। শেষে বলছেন, সমাহিত হয়ে গেলেই হয়ে যাবে না, কি জানি বাপু ঈশ্বর দর্শন হবে কি হবে না, কবে জ্ঞান লাভ হবে, এই ধরণের চিন্তনও যদি হয় তাহলেও কিছু হবে না। *প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ*, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি আত্মা তিনিই মন দিয়ে সব কিছু দেখছেন। মন যখন চঞ্চল তখন তিনি নিজেকেই চাঞ্চল্য রূপে দেখেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, হে উদ্ধব আগে তোমার মনকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসো। সরিয়ে এনে এবার বোঝার চেষ্টা কর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার আত্মাতেই জড়িয়ে আছে, জগৎ তোমার আত্মারই বিস্তার। আর এই আত্মা সেই সর্বাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন। এই জায়গাটা আমাদের পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন, কিন্তু যতক্ষণ না বোঝা যাচ্ছে ততক্ষণ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন এগোবে না। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, সবই ব্রহ্ম বা *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমি সেই ব্রহ্ম, আমরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় শুনে থাকি। এই জগতের যে বিস্তার, এই বিস্তারটা কোথায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথাও তো আছে, কিন্তু কোথায় আছে? পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় spaceএ, এই spaceটা কোথায়? প্রকৃতিতে। প্রকৃতি কোথায় অবস্থিত? সেই আত্মার মধ্যে। তার মানে, সমগ্র জগতের বিস্তার সেই আত্মার মধ্যেই এসে গেল। সেই আত্মা কোথায়? সেই আত্মাই তো তোমার অন্তর্যামী। তাহলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথায়? তোমারই ভেতরে। নানান রকম কাহিনী দিয়ে এটাকে বোঝানর চেষ্টা করা হয়। কাক ভুষণ্ডী মানছেন না যে শ্রীরামচন্দ্র সেই পরমব্রহ্ম, তিনি পরীক্ষা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে বসেছেন। শ্রীরামচন্দ্র বালক, তিনি হাতটা এগিয়ে দিলেন কাককে ধরার জন্য। কাক উড়ে পালিয়ে গেল, শ্রীরামচন্দ্রের হাত সেখান পর্যন্ত চলে গেল। কাক ভুষণ্ডী সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রীরামচন্দ্রের হাতার নাগাল থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য ঘুরে এলেন। এবার শ্রীরামচন্দ্র হাত দিয়ে কাককে ধরে নিয়েছেন। ধরে তিনি কাক ভুষণ্ডীকে গিলে ফেললেন। গিলে ফেলার পর কাক ভুষণ্ডী দেখছেন তিনি যে বৃক্ষের ডালে বসে ছিলেন, সেখানেই বসে আছেন। এই কাহিনীর এটাই তাৎপর্য, ঈশ্বরের বাহির অন্তর বলে কিছু নেই। হে উদ্ধব তুমি যা কিছু দেখছ সব তোমারই বিস্তার। পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর কথা বলছেন।

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্। আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে।।১১/৭/১০।। 'হে উদ্ধব! যদি তুমি একবার বুঝে যাও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার আত্মারই বিস্তার, তখন এই জগৎ তোমাকে আর কিছু করতে পারবে না, কোন বাধা-বিঘ্ন তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না'। আমাদের প্রধান প্রধান ইমোশানস্ হল শোক, মোহ, দুঃখাদি। মোহ, একটা কিছু পেতে চাইছি, এরই বিস্তার কাম, ক্রোধ, লোভ, এরই

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিস্তার হল ভয়, মৃত্যু ভয়, হারানোর ভয়, নানা রকমের ভয়। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা এই শোক মোহ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু কি করে বেরোবে! যতই মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান পড়, যতই ওষুধ খাও এই শোক মোহ থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। ভয়, দুঃখ, শোক এই ইমোশানস্ গুলো শেষ পর্যন্ত মাত্র একটা উপায়েই যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমারই বিস্তার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভালো যা কিছু হচ্ছে তোমার জন্য হচ্ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মন্দ যা কিছু হচ্ছে তোমার জন্যই হচ্ছে। কেউ চুরি করছে, সেটাও তোমার জন্য, কেউ ডাকাতি করছে, সেটাও তোমার জন্য, কেউ কাউকে খুন করছে, সেটাও তোমার জন্য। তোমাকে যে সুখ দিচ্ছে তুমিই ঐ রূপে তোমাকে সুখ দিচ্ছ, তোমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে সেখানেও তুমিই ঐ রূপে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছ। খাওয়ার সময় জিভটা দাঁতের কামড়ে পড়ে যায়, জিভের তখন কি কষ্ট। কে কাকে কষ্ট দিল, তুমিই তোমাকে ব্যাথা দিয়েছ। তুমি কি বলবে, দাঁত আমার জিভকে কামড়েছে, নোড়া দিয়ে দাঁতটাকে ভেঙেই ফেলব। সন্ন্যাস মন্ত্রে আছে *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে,* আমার থেকেই পুরো জগৎ বেরিয়েছে। একটু পরেই আমরা সবাই এখান থেকে বেরিয়ে যে যার বাড়ি চলে যাব, বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে যদি পাঁচ মিনিট একটু ভাবি, ঐ যে রিক্সাওয়ালা যাচ্ছে ওটা আমারই রূপ, অটোওয়ালা, টোটোওয়ালা সবাই আমারই রূপ, বাসের যে ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার এরাও আমারই রূপ, বাসে বসার জায়গা পায়নি কিন্তু যারা বসে আছে ওরা আমারই রূপ, আমি তো বসেই আছি, কিছুক্ষণের জন্য আমাদের পুরো ধারণাটাই পাল্টে যাবে। একদিন পাঁচ মিনিটের জন্য ভাবলাম, দ্বিতীয় দিনও পাঁচ মিনিট ভাবলাম, তৃতীয় দিন থেকে পাঁচ মিনিট থেকে সাত মিনিট, এই করে করে বাড়াতে বাড়াতে দেখা যাবে আমার মধ্যে কখন অজান্তে ঐ একাত্ম ভাব সব সময়েই বিরাজ করছে। তখন আর কারুর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকবে না, কারুর প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ ভাবও থাকবে না। আমিও যা আমার হাতও তাই, হাতকে আমি দূরেও নিয়ে যেতে চাই না, কাছেও আনতে হয় না। জগতের প্রতি ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গীই হয়ে যায় যখন দেখে এই জগৎ আত্মারই বিস্তার। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, এই রকম হয়ে গেলে কোন বিঘ্নই তোমাকে আর পীড়িত করতে পারবে না। এটা ঠিকই যে ঐ অবস্থায় যেতে অনেক সময় লাগে, একদিনে হয় না। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ শিষ্য, তাঁকে তিনি এই কথা বলতেই পারেন।

পরের শ্লোকেও খুব সুন্দর কথা বলছেন *দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধায় নিবর্ততে। গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ।।১১/৭/১১।।* যিনি দোষ আর গুণ এই দুটি বুদ্ধির পারে চলে যান, তিনি দুঃখ, শোক আর ভয়ের পারে চলে যান। দুঃখ, শোক, ভয় এই জিনিসগুলো একমাত্র যায় অদ্বৈত বুদ্ধিতে। অদ্বৈত বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কারুর সাধ্যি নেই যে, দুঃখ, শোক, ভয়কে সরিয়ে দেবে। তোমার এই লোভ, মোহ, শোক, দুঃখ, ভয়, চোখের জল কেউ দূর করতে পারবে না। হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে তোমার দুঃখ কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না। তোমার দুঃখ একমাত্র তুমিই বুঝতে পারবে। কিভাবে বুঝতে পারবে? যখন বুঝতে পারবে, যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, যার জন্য তুমি চোখের জল ফেলছ সে তোমারই রূপ। ছয় মাসের শিশু এমন ভাবে হাত-পা ছুড়ল যে মায়ের ব্যাথা লেগে গেল, মা এখন কি করবে, ছয় মাসের ছেলেকে কি মা মারবে না বকবে, মা জানে এই শিশু আমারই রূপ। গর্ভে বাচ্চা পা ছুড়তে থাকে, মা কি করবে, মা জানে তারই অঙ্গ। যখন দেখে নিল জগতের সব কিছু আমারই অঙ্গ, তখন কার প্রতি তার দোষ বুদ্ধি থাকবে আর কার প্রতিই বা তার গুণ বুদ্ধি থাকবে! এই ভাব এসে গেলে তখনই মানুষ সব রকম কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, তার আর বেতালা পা পড়ে না। এই ধরণের মানুষ তখন শুধু শুভ কর্মই করেন, অশুভ কর্ম করার চিন্তাও তাঁর মাথায় আসবে না। কিন্তু শুভ কর্ম যখন করেন তখন এই কর্ম করলে এই এই ভালো হবে, এই ভালো জিনিসটা পাবো, এই গুণ বুদ্ধিতে কোন কর্ম করেন না। তাঁর স্বভাব বালকের মত হয়ে যায়। বালকের যেমন কোন দোষ গুণের বোধ থাকে না, তাঁরও কোন রকম দোষ বোধ ও গুণ বোধ থাকে না। তিনি যে দোষ বুদ্ধিতে কোন কিছু করছেন না তা নয়, আর গুণ বুদ্ধিতে কিছু করছেন তাও নয়, স্বভাবেই দাঁড়িয়ে যায়। হে উদ্ধব! যতক্ষণ না তোমার বুদ্ধি এই ভাবে অটল না হয়ে যায় ততক্ষণ শাস্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি হবে না, অর্থাৎ তোমার জ্ঞান উপলব্ধি হবে না। জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের পরিণতি হল দোষ বুদ্ধি ও গুণ বুদ্ধির নাশ। দোষ বুদ্ধি এবং গুণ বুদ্ধির নাশ আর আত্মজ্ঞান একই জিনিস। এই জিনিস একদিনে

কারুরই হবে না, অনুশীলন করে যেতে হয়। যত অনুশীলন করবে তত মন শান্ত হবে, মন যত শান্ত হবে তত জপধ্যান হবে, যত জপধ্যান হবে তত মন শান্ত হবে। যত মন শান্ত হবে তত আমি আত্মা এই বোধ স্পষ্ট হবে বা আমি ঠাকুরের সাথে এক বা শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক, এই বোধের দিকে তত এগোবে। যত ঐদিকে এগোবে তত মন শান্ত হবে। আমাদের সব শাস্ত্রের মূল এটাই।

তুমি মানছ কি তোমার জীবনে অশান্তি আছে, জীবনে ক্লেশ, দুঃখ আছে? হ্যাঁ আছে, উপায় কি আমায় বলুন। উপায় এটাই, উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ যা যা বললেন। এই যে কর্মের সাথে, জিনিসের সাথে, মানুষের সাথে তোমার জড়ানো, এই জড়ানোটা বিচার করে আগে বন্ধ কর। যে বলে আমি মানুষকে ভালোবাসি, যে বলে আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারি না, আমি কাজ করতে করতেই মরে যেতে চাই, এদের দিকে তাকাতে নেই, এরা সবাই দু পয়সার লোক। যার আত্মজ্ঞান হয়নি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজেরই বিস্তার মনে করতে পারছে না, সে কি করে মানুষকে ভালোবাসতে পারবে! আমাদের মনে অদম্য ইচ্ছা আমাকে সবাই মানুক, জানুক, বিরাট করে কালীপূজা করব, মন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধন করাতে হবে, খবরের কাগজে মন্ত্রীর সাথে আমারও ছবি বেরোবে। এদের দ্বারা কি কোন দিন আত্মজ্ঞান হবে, কোন দিনই হবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি যদি না হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতি মানেই দিব্য একত্বের ভাব, এই একত্বের দিকে যদি না এগোয় কেউ তার চোখের জল কোন দিন মুছে দিতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এটাই বলছেন, হে উদ্ধব! আমি তো এই ধরাধাম ছেড়ে চললাম, তোমাকে যা যা বললাম এগুলো যদি না কর তাহলে তোমাকে জীবনে প্রচুর কষ্ট ভোগ করতে হবে। সব কিছুর বন্ধনকে ছিন্ন করে আমাতে মন সমাহিত না করলে দুঃখ তোমার কোন দিন ঘুচবে না, কোন দিন শান্তি পাবে না।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই মূল্যবান উপদেশ শোনার পর উদ্ধব বলছেন 'আমার কিছু দোষ আছে'। উদ্ধব স্বীকার করছেন যে তাঁর কিছু দোষ আছে, 'আপনার মায়ার প্রভাবে আমার মধ্যেই 'আমি আমার' ভাব আছে আর আমিও স্ত্রী, পুত্র, সম্পদে নিমজ্জিত। তবে আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগল, আর আপনি যে সন্ন্যাসের উপদেশ দিলেন এই সন্ন্যাসের তত্ত্ব আমার মত একজন সেবককে এমন ভাবে বোঝান যাতে আমি অনায়াসে সাধনা করতে সমর্থ হই। হে ভগবন্! চারিদিকে দুঃখের দাবাগ্নির তাপে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি, আপনি ভগবান, একমাত্র আপনিই আমাকে উপদেশ দিয়ে এই দাবাগ্নি থেকে বার করতে পারেন, আমি আপনার শরণাগত'। এখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে অনেক কিছু বলছেন, যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অবধূতের চব্বিশ গুরু।

অবধূত ও তাঁর চব্বিশ গুরু

প্রথম থেকে আমরা বলে আসছি ভাগবতের দুটি অংশ, প্রথম অংশে আসে রাসলীলা, রাসলীলার এই অংশ ভাগবতের প্রাণ আর দ্বিতীয় অংশ হল এই একাদশ স্কন্ধ। স্বামী ভূতেশনন্দজী বলতেন একাদশ স্কন্ধ যেন ভাগবতের আত্মা। একাদশ স্কন্ধের আবার চব্বিশ গুরুর প্রসঙ্গ যেন আরও তার সারভূত। চব্বিশ গুরুর এই অধ্যায় খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। চব্বিশ গুরুর প্রসঙ্গের পুরোটাই আধ্যাত্মিক ব্যাপার কিন্তু অন্যান্য অনেক কিছু যেমন মনোবিজ্ঞানেরও অনেক কিছু এর মধ্যে মিশে আছে। এর যতটা আমরা জীবনে লাগাতে পারব ততটাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আর না লাগাতে পারলেও কোন অসুবিধা নেই, ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখা ভালো। এখানে অবধূতের নাম দত্তাত্রেয়। দত্তাত্রেয়কে অনেকেই ভগবানের অবতার রূপে গণ্য করেন, অনেকে তাঁকে সিদ্ধ যোগী মনে করেন। কিন্তু দত্তাত্রেয় শুকদেবেরই মত কোন কিছুতে জড়িয়ে ছিলেন না। দত্তাত্রেয়র চব্বিশ জন গুরু ছিল। কথামৃতে প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর একাধিকবার অবধূতের চব্বিশ গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন। ঠাকুর বলছেন অবধূতের চব্বিশ জন গুরু ছিল, তার মধ্যে চিল ও মৌমাছিকেও গুরু করেছিলেন। এদের থেকে কি শিক্ষা পেয়েছিলেন সেটাও ঠাকুর বলছেন। চিল ও মৌমাছি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রচলিত কাহিনী ঠাকুর তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় বলেছেন যেগুলো অবধূতের চব্বিশ গুরুর কাহিনীতে একটু অন্য ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে

অবধূতের কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটে অধ্যায়কে একত্রে বলা হয় *অবধূতোপাখ্যান*। যে কোন আধ্যাত্মিক পিপাসু ব্যক্তির কাছে অবধূতোপখ্যান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আসুন আমরা অবধূতের চব্বিশ গুরুর সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিই আর অবধূত তাঁর চব্বিশ গুরুর কাছে যা যা শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করি যাতে আমরাও আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে আরও পরিপুষ্ট করে চরম লক্ষ্য পথের যাত্রাকে তরান্বিত করতে পারি। অবধূতোপখ্যানের একটা প্রেক্ষাপট আছে। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই আমরা ধীরে ধীরে আলোচনাকে মূল বিষয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কথা শুনে বলছেন *প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ। সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ।* /১১/৭/১৯। যারা এই লোকের সম্বন্ধে, এখানে লোক মানে স্বর্গাদি লোকের কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যারা শুধু এই লোকের ব্যাপারে বিচার ও চিন্তা-ভাবনা করে। কি রকম চিন্তা-ভাবনা? এই জগৎটা কি? কোথা থেকে আর কীভাবেই বা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে? আমি কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? আমি এখানে কি করতে এসেছি আর কি করছি? এই ধরণের প্রশ্ন নিয়ে যারা বারবার চিন্তাভাবনা করতে থাকে তাদের কি হয়? *সমুদ্ধরন্তি*, তারা এই সংসারের জাল কেটে বেরিয়ে আসে। আচার্য শঙ্কর বলছেন *কস্ত্বং কোহং কুত আয়াতং কা মে জননী কো মে তাতঃ। ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্।।* তুমি কে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কে আমার জননী, কে আমার পিতা – এগুলোকে যদি বারবার চিন্তা করা হয় তখন ধীরে ধীরে জগতের প্রতি আসক্তিটা নাশ হতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এই যে বলছেন *লোকতত্ত্ববিচক্ষণাৎ*, লোকতত্ত্বের বিচার, এই জগতে কি আছে এটাকে বিবেকশক্তি দিয়ে বিচার।

লোকতত্ত্বের বিচার শুধু যে বিবেকবান পুরুষরাই করছেন তা নয়, যারা ভোগের মধ্যে আছে, সিনেমার হিরো হিরোইন থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদরা সবাই লোকতত্ত্বের বিচার করছে। তারা বিচার করছে এই জগৎটাই সত্য, যে করেই হোক, লোক ঠকিয়ে, চুরি করে, কায়দা করে, খুন জখম করিয়ে আমাকে উচ্চপদে পৌঁছে ক্ষমতা অর্জন করে জগৎকে ভোগ করতে হবে। একজন খুব নামকরা লোকসভার সদস্য কোন দুর্নীতিতে ধরা পরার পর পরিষ্কার বলছে 'আমরা যারা লোকসভার সদস্য হয়েছি কেউই রামকৃষ্ণ মিশন আর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী নই যে আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে দেশ সেবা করতে এসেছি। আমরা কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি এর থেকে বেশী আমাদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করতে নেই'। এদের কাছে পরিষ্কার আমি এই জগতে কেন এসেছি? লুটপাট করতে। কিন্তু জগতের বাস্তবিক সত্তাকে যদি চিন্তা করতে শুরু করে তখন জগতের সব কিছুর প্রতি তার আসক্তি কমতে শুরু করবে। তার আগে মণীষীরা বলবেন তোমার শরীর, মনের প্রতি তোমাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই দেহ যদি না থাকে তাহলে তো তুমি কিছুই করতে পারবে না। কিছু না করতে পারলে আধ্যাত্মিক সাধনা করবে কি করে! দেহকে সুস্থ সবল রাখতে হলে খাওয়া-দাওয়া চাই, বাসস্থান চাই। তার জন্য আবার অর্থ জোগাড় করতে হবে। অর্থের ব্যবস্থা করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে। বিয়ে করতেও কেউ বারণ করছে না। ঠাকুর বলছেন একটা দুটো সন্তানের পর স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোনের মত থাকবে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। জগতে বেঁচে থাকার জন্য ন্যুনতম যেটুকু দরকার সেটুকু পর্যন্ত একটা সীমা টেনে দিতে হয়। কিন্তু যদি অশান্তি চাও তাহলে জগৎ সত্য বলে ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়।

উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে লোকতত্ত্বের কথা বলার পর বলছেন 'হে উদ্ধব! আমিই জগতের সব কিছুর স্রষ্টা। জগতে যা কিছু দেখছ সব কিছুর নির্মাতা আমি। কিন্তু সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই একাগ্রচিত্ত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন'। মানুষ যদি চায় তাহলে যে কোন জিনিসকে একাগ্র চিত্তে চিন্তা করতে পারে আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুদ্ধি সম্পন্ন, যেটা অপ্রয়োজনীয় সেটা কচকচ করে কেটে সার জিনিসটাকে ধারণা করার ক্ষমতা। ঠাকুরও বলছেন মানুষ কি কম গা! সে ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারে। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলছেন 'হাতি এত বড় জীব কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারেনা'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারে আর আমার যে বাস্তবিক স্বরূপ, যেটা মন বুদ্ধির পারে, সেই স্বরূপকেও তারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারে'।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন এই ব্যাপারে আমি তোমাকে প্রাচীন ইতিহাস থেকে একটা কাহিনী বলছি। আমাদের পরম্পরাতে এটাই খুব মজার ব্যাপার, নিজে যা বলার বলে দেওয়ার পরই বলছেন এই ব্যাপারে প্রাচীন কালের একটা আখ্যায়িকা আছে। অর্থাৎ আমি তোমাকে যা কিছুই বলি না কেন আমার বক্তব্যের পেছনে একটা বিশাল দীর্ঘ পরম্পরা আছে। শ্রীকৃষ্ণও এখানে প্রাচীন ইতিহাস থেকে অবধূত দত্তাত্রেয় আর রাজা যদুর মধ্যে যে সংলাপ হয়েছিল সেটাকে তুলে আনছেন।

যদু নামে এক রাজা ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণেরই পূর্বজ। রাজা যদু একজন খুব বড় ধর্মজ্ঞ ছিলেন। ভাগবতের সময়ে ধর্ম বলতে একসাথে অনেক কিছুকেই বোঝাত, ইদানিং কালে ধর্ম বলতে আমরা যেমন পূজা, অর্চনা বুঝি, তখনকার দিনে ধর্মের পরিধি আরও ব্যাপক ছিল। সেই ধর্মের একটা অঙ্গ ছিল নীতি জিনিসটাকে জানা। দত্তাত্রেয় নামে একজন বড় ঋষি ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় রাজা যদু নিজের রাজদরবারে বসে আছেন। রাজা যদু দেখছেন একজন পরম তেজস্বী সন্ন্যাসী রাজদরবারে প্রবেশ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ দত্তাত্রেয়র বর্ণনা দিয়ে বলছেন *অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্। কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ।।*১১/৭/২৫। সন্ন্যাসী মানেই পরম তেজস্বী, যেন জ্বলন্ত আগুন। তিনি তরুণ, বয়স খুব কম। সন্ন্যাসী বুড়ো হলে ঠিক যেন মানায় না, সন্ন্যাসী মানেই তরুণ। সাধুবাবা বা ঋষি যখন বলা হয় তখন বড় বড় লম্বা দাড়ি থাকবে। কিন্তু সন্ন্যাসীকে তরুণ দেখাতে হয়। তরুণ হবে, রাজকীয় চেহারা হবে আর সেই চেহারা সব সময় যেন আগুনের লেলিহান শিখার মত জ্বল জ্বল করছে। আচার্য শঙ্কর, স্বামীজী এনাদের বলা হয় আদর্শ সন্ন্যাসী। এখানে দত্তাত্রেয়কে বলা হচ্ছে তিনি একজন ত্রিকালদর্শী তরুণ সন্ন্যাসী আর চেহারার মধ্যে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই, অকুতোভয়ে নির্ভিক ভাবে বিচরণ করছেন। আমাদের শাস্ত্রে কবি শব্দের অর্থ ক্রান্তদর্শী বা ত্রিকালদর্শী, যিনি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটেকেই একসাথে জানেন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে জানা একমাত্র ভগবানই পারেন, ভগবান ছাড়া আর কেউ পারেন না। সেইজন্য ভগবানের আরেকটি নাম কবি। যে ঋষি এই জিনিসটা পারেন তাঁকেও ক্রান্তদর্শী বলা হয়। কোন ঋষিকে কবি বলা মানে তাঁকে উচ্চতম সম্মান দেওয়া হচ্ছে, এর থেকে উচ্চ সম্মান আর হয় না। কিন্তু কোন তরুণকে যদি কবি বলা হয় তখন খুবই অবাক মনে হবে, একজন তরুণ সন্ন্যাসী কবি হবেন সম্ভবই নয়। স্বামীজী যখন আমেরিকায় গেলেন বা তার আগে যখন ভারতে পরিব্রাজক রূপে পরিব্রাজন করছেন সবাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে, এত কম বয়সে এত কিছু জানেন কি করে! একদিকে তরুণ আবার কবি, দুটোকে একসাথে মেলানো যায় না। দার্শনিকদের মধ্যেও তরুণ পাওয়া যায় না, আমরা তরুণ দার্শনিক এক শঙ্করাচার্যকেই জানি, দার্শনিকরা কেউ তরুণ হন না। দার্শনিক যে অর্থে নেওয়া হয় কবি সেই অর্থেই আসে। কবির একটা বড় গুণ হল বিচক্ষণ, ঈক্ষণ মানে দেখা, জিনিসটা যেমনটি তেমনটি দেখাই বিচক্ষণ, এটা একমাত্র কবি পারেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দ্বারাই মানুষ জ্ঞান লাভ করে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করলে জ্ঞান হয় না। গীতা, উপনিষদে যা বলছেন সেটা হতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই, পরমার্থ জ্ঞান যেখানে আসে সেখানেও অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে। ঠাকুর যে জাগতিক উপমাগুলো আনছেন তাতেও অভিজ্ঞতার ব্যাপার আছে।

রাজা যদু দত্তাত্রেয়কে দেখে তাই চমকে উঠেছেন, তরুণ কবিকে জিজ্ঞেস করছেন – *কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্তুঃ সুবিশারদা। যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ।।*১১/৭/২৬। হে ব্রাহ্মন্! আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি কোন কাজে কর্মে লিপ্ত নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত সুনিপুণ বুদ্ধি কীভাবে অর্জন করেছেন। রাজা যদু দত্তাত্রেয় ঋষির সাথে দু-চারটে কথা বলেই বুঝে গেছেন ইনি কোন সামান্য সন্ন্যাসী নন। কারণ যদুও জানেন, কাজ কর্ম যে করেনি তার কখনই বুদ্ধি হবে না। এই কাজ কর্মের ব্যাপারটা আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের উপনিষদ বলছেন *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি*, তোমরা কাজ কর, গীতাতেও ভগবান বলছেন কাজ করতে, স্বামীজীও বলছেন কাজ করে যাও। মানুষ যখন কাজ করবে তখনই তার বুদ্ধি বিকশিত হতে শুরু হয়, কাজ না করলে বুদ্ধি খুলবেই না, বুদ্ধি না খুললে কোন দিন ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে না। আমাদের ভারতবর্ষের এটাই বিরাট দুর্ভাগ্য, ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ, দেশের মানুষের কাছে সন্ন্যাসীরাই গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসীরা গুরু হওয়ার জন্য পুরো দেশ যেটা গৃহস্থের ধর্ম নয় সেই সন্ন্যাসীদের ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

শাস্ত্রে যেখানে যেখানে পূর্ণ ত্যাগের কথা বলছেন, সেখানে তাঁরা এই কথাগুলো সন্ন্যাসীদের জন্য বলছেন। কিন্তু গৃহস্থরা ঐ কথাগুলোকে নিজেদের উপর নিয়ে নিয়েছে। ফলে পুরো দেশটা অধোগতিতে চলে গেছে। যদু এটাই বলছেন, হে ব্রাহ্মণ! আপনি তো কোন কাজ করেন না, কিন্তু এই বুদ্ধি আপনার কি করে হল, আর এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি সমগ্র জগৎ মণ্ডলে বিচরণ করছেন, সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন, সবারই সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। এই সুবিশারদ বুদ্ধি আপনি কোথা থেকে পেলেন?

বেলুড় মঠের একজন মহারাজ তাঁর সময়কার একজন সফলতম Chartered Accountant। মহারাজকে মঠের অডিট ও এ্যাকাউন্টের কাজে অনেক জায়গায় যেতে হয়। কাজের সূত্রে অনেক এমবিএ পাশ করা ইয়ং ছেলেমেয়েদের কাছেও যেতে হয়। ইয়ং ছেলেমেয়েরা মনে করে নেড়া মাথা সন্ন্যাসী এদের আর কি বোঝাব, দুটো সন্ন্যাসীকে পেয়েছি, বেশ বোকা বানানো যাবে। কিন্তু একটু কথাবার্তার পর যখন এদেরই কোন মতামতকে তিনি খণ্ডন করে দিচ্ছেন এরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে। মঠের এই কাজ তিনি পঁচিশ বছর ধরে করছেন আর তাঁর সমবয়সী বন্ধুরা বড় বড় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হয়ে রিটায়ার করে গেছেন। আর ইয়ং ছেলেরা এমবিএ পাশ করে এসে মনে করছে সন্ন্যাসীদের বোকা বানিয়ে বেরিয়ে যাব।

জি কে চেস্টারটন একজন খুব নামকরা লেখক ছিলেন। তাঁর একটা গল্পের চরিত্রের নাম ছিল ফাদার ব্রাউন। ফাদার ব্রাউন একজন ক্যাথলিক ফাদার, ছোট্টখাট্ট চেহারা, গায়ে কোন বল নেই। ফাদার ব্রাউন যত ক্রিমিনালদের ধরে বেড়ায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিমিনালরা ক্রাইম করার আগেই তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। ধীরে ধীরে ফাদার ব্রাউনের নামডাক হতে শুরু করল। ফাদার ব্রাউনের নাম শুনলেই ক্রিমিনালরা ভয়ে কাঁপতে থাকে, অথচ তাঁর শরীরে কোন শক্তিই নেই। ক্রিমিনালরা যখন সব ধরা পড়ে যাচ্ছে, পুলিশ এক এক করে সব কটাকে যখন জেলে পুরছে তখন তারা ফাদার ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করছে 'আপনি তো একজন খ্রীশ্চান ফাদার আপনি কি করে সব আগে থাকতেই বুঝতে পারেন, আপনার এত বুদ্ধি কি করে হল! একটা ক্রিমিনাল বদমাইশি করার আগেই পৌঁছে যাচ্ছেন, আপনি বুঝলেন কি করে যে সে এই কাজ করতে যাচ্ছে'? ফাদার ব্রাউন বলছেন 'আমি চার্চে বসে ওদের স্বীকারোক্তি শুনি'। মানুষ যখন কোন ভুল কাজ করে তখন ফাদারের কাছে স্বীকারোক্তি করে ফাদার আমি এই অন্যায় কাজ করেছি। চার্চে বসে ফাদার ব্রাউন ক্রিমিনালদের এত কনফেসানস্ শুনেছেন যে, ক্রিমিনালদের ব্যাপারে তিনি সব কিছুই জেনে গিয়েছিলেন। কোন্ ক্রিমিনাল কি করে, ক্রাইম কীভাবে হয় সব জেনে গিয়েছিলেন। সেইখান থেকে তিনি হয়ে গেলেন নিপুণ অপরাধ সমাধানকারী। তিনি কোন পুলিশের লোক নন, এখনও ফাদারের কাজ করে যাচ্ছেন।

রাজা যদু বলছেন 'আমরা তো সমাজে আছি, সমাজে নানা রকম কাজ করছি, আমরা সমাজের সব কিছু বুঝি। কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হয়ে এত বুদ্ধি আপনি পেলেন কোথায়। সব ব্যাপারে আপনার সব কিছু জানা। মানুষ কাজের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে'। যে কাজ না করে চুপচাপ বসে থাকে সে তো ঠাকুরের ভাষায় কুমড়ো কাটা বঠ্ঠাকুর। 'আর তাই না, *যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং*, আপনি বিদ্বান, আপনার চোখ মুখ বলছে আপনার সাংঘাতিক বিদ্যা আছে, তাও আপনি বাচ্চা ছেলের মত ঘুরে বেড়ান কেন'? সাধারণ ভাবে যেটা হয়ে থাকে, যাঁরা বিদ্বান তাঁরা চান লোকে আমাকে মানুক, জানুক, তার মধ্যে বিদ্যার অহঙ্কার থাকে। 'কিন্তু আপনি সন্ন্যাসীর মত ঘুরে বেড়ান, কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকেন না। দুদিক থেকেই আপনার মধ্যে বৈপিরত্য, যিনি বিদ্বান তিনি একটা জায়গায় বসে থাকেন, তিনি চান যাতে লোকেরা তাঁর কাছে সেখানে এসে দেখা করুক, কিন্তু আপনি বিদ্বান হয়েও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেভাবে আপনি ঘুরে বেড়ান তাতে মনে হয় না যে আপনি কাজকর্ম করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে দুটোই আছে, বিদ্যাও আছে আর বিচক্ষণতাও আছে। যে কারণে একজন মানুষের মধ্যে বিচক্ষণতা হয় সেই কারণটা আপনার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আর বিদ্বান হলে মানুষ যেটা করে সেটাও দেখতে পাচ্ছি না'। রাজা যদুর কথা শোনার পর এবার দত্তাত্রেয় বলবেন কীভাবে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের তিনটি অধ্যায় ধরে রাজা যদু ও দত্তাত্রেয়র সংলাপে দত্তাত্রেয় কি বলেছেন সেটাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন। এই অংশটুকুরই নাম *অবধূতোপাখ্যান*। দত্তাত্রেয় একজন সন্ন্যাসী, তাঁকে অবধূতও বলা হত।

পরের শ্লোকেই রাজা যদু আরও মজার কথা বলছেন *প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং চ মানবাঃ। হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ।।*১১/৭/২৭। মানুষ ধর্ম, অর্থ আর কামে প্রবৃত্ত হয় কোন একটা হেতু বশতঃ। কি হেতু? আমার আয়ু বৃদ্ধি হোক, যশ হোক, লোকেরা আমাকে মানুক, সৌন্দর্য বৃদ্ধি হোক বা আমার সম্পত্তি বৃদ্ধি হোক। এই ধরণের কোন বাসনা থেকেই মানুষ ধর্ম, অর্থ ও কামে প্রবৃত্ত হয়। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন, প্রয়োজনের যদি অভাব থাকে মহামুর্খ লোকও কাজে প্রবৃত্ত হয় না। কাজে প্রবৃত্তি মানে কাজ করার ইচ্ছা, কাজে নামা। মহামুর্খও কাজে নামবে না যদি দেখে এই কাজ করে তার কোন স্বার্থসিদ্ধি হবে না। আমাদের শাস্ত্র সচরাচর মোক্ষকে কাজের সম্পর্ক থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু এনারা এখানে মোক্ষকেও নিয়ে এসেছেন, মোক্ষ না বলে বলছেন তত্তজিজ্ঞাসা। বলছেন ধর্ম, অর্থ, কামের পেছনে একটা আশা থাকে, একটা প্রলোভন থাকে। কিসের আশা? আয়ু, যশ, শ্রী, সম্পত্তি এই জিনিসগুলোর আশা নিয়ে ধর্ম, অর্থ আর কামে প্রবৃত্ত হয়। শ্রী শব্দের অর্থ সৌন্দর্য হয় আবার শ্রী শব্দের অর্থ ধন-সম্পদও হয়। আমরা মোক্ষ বলতে মনে করি অজ্ঞানের নাশ, কিন্তু মোক্ষের আরেকটা ব্যাখ্যা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের পারে যাওয়া। তার মানে তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাঁর আয়ুও চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। এখানে এটাকেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা রূপে নিয়ে এসেছেন। মোক্ষকে যদি নাও নেওয়া হয়, এই তিনটে ধর্ম, অর্থ আর কামের পেছনে মোটামুটি এই কটি জিনিসের প্রত্যাশা থাকে, আয়ু, যশ, শ্রী। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষের যা যা চাহিদা ছিল আজও একই চাহিদা আছে, একটুও পাল্টায়নি। এখনও পুরুষ নারীর প্রতি আকর্ষিত হয়ে তাকে ভোগ করার ইচ্ছা করে, পুরুষ চায় কিভাবে কাজ না করে সহজে অর্থ পেয়ে যেতে পারি। আগেকার মানুষরাও সেইজন্য যজ্ঞ করতেন, ধর্ম করতেন যাতে সহজে অর্থ পায়। আজকের দিন মানুষ শেয়ার মার্কেটে নামে, মানি মার্কেটে টাকা লাগায়, লটারি কাটে, জিনিসটা একই, সহজে কিভাবে টাকা আয় হতে পারে। তখনকার দিনেও মানুষ চাইত আমার সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে শিশু হবে, যারা ভালোবাসার মুর্ত রূপ, আজও মানুষ তাই চায়। আগেকার দিনের মানুষরাও চাইত প্রিয়জনদের যেন সব সময় আমার কাছে পাই, তারা যেন সব সময় আমার পাশে থাকে, যারা আমার অপ্রিয় তাদের থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করত, মানুষ আজও তাই করে। তখনকার দিনেও মানুষ কাজ করতে চাইত না, সেইজন্য বাড়িতে চাকর-বাকর রেখে তাদের দিয়ে কাজ করাত, আজও সবাই তাই চেষ্টা করে। এখন লোক পাওয়া না গেলে ভ্যাক্যুম ক্লিনার আছে, মাইক্রোভেন আছে, নিজেকে যেন কাজ না করতে হয়। মানুষের মূল স্বভাব চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। আমরা এখন কত কথা বলছি, বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, মানুষের চিন্তা-ভাবনাতে একটা জোয়ার এসেছে, আমরা সবাই কত পাল্টে গেছি, কিন্তু কিছুই পাল্টায়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়ে আমরা চাইছি আমাদের আয়ু কিভাবে বাড়ানো যায়, আজও চাইছি আমাদের অর্থ বৃদ্ধি, যশ বৃদ্ধি কিভাবে করা যেতে পারে। মানুষের স্বভাব কোথাও পাল্টায়নি, পাঁচ হাজার বছর আগে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। এটাই মহারাজ যদু এখানে বলছেন, মানুষ যা কিছু কাজে প্রবৃত্ত হয় সবাই এই জিনিসগুলোর জন্যই প্রবৃত্ত হয়।

ত্বং তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোহমৃতভাষণঃ। ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।। ১১/৭/২৮।। মহারাজ যদু বলছেন 'কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সব রকম কর্ম করতে সক্ষম কারণ আপনি তরুণ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, আপনার বুদ্ধি আছে, পাণ্ডিত্য আছে এবং নিপুণ। *সুভগঃ*, আপনার চেহারাতে সৌভাগ্য যেন ঝরে পড়ছে, আপনার সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য দুইই প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনি কাজ তো কিছুই করেন না, অন্য দিকে উন্মত্ত আর পিশাচের মত বিচরণ করে বেড়ান। কোন দিকেই আপনার সৌন্দর্য বোধ নেই। আপনার কোন কর্মও নেই আর মনের মধ্যে কোন চাহিদাও নেই। তা সত্ত্বেও আপনি এত অভিজ্ঞতা কোথা থেকে অর্জন করলেন? সৌভাগ্য আর আনন্দ দুটো এক সঙ্গে চলে। *অমৃতভাষণঃ*, আপনার কথাতে যেন অমৃত ঝরে পড়ছে, আপনি যখন কথা বলেন সেই কথাগুলো কত মধুর লাগে'। জীবনে সফলতম ব্যক্তির যা যা থাকা দরকার সবই দত্তাত্রেয়র মধ্যে বিদ্যমান, কার্যকুশলতা আছে, সৌভাগ্য আছে, সৌভাগ্যবান পুরুষ যখনই যেখানে যাবেন সবটাই তাঁর ঠিক চলবে, ট্রেনে বাসে তাঁর কোন অসুবিধা হবে না, যে বাসস্থানে থাকবেন সেখানে সব কিছুই ঠিক ভাবে চলে, তার সাথে *অমৃতভাষণঃ*, তাঁর সব কথাই মধুর। শুধু ভাগ্যই নয়,

দেখতেও কী সুন্দর। বলে, যোগী যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে সেই যোগীকে সন্দেহ করতে হয়, যোগী মানেই দেখতে সুন্দর হবে। কারণ সৌন্দর্য আর আনন্দ এক সঙ্গে চলে। সৌন্দর্য যোগীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক, যোগের জন্য যোগীর শরীর মজবুত থাকে, আনন্দের জন্য চেহারাটা খুলে যায়। আর যোগী তো এক জন্মেই হওয়া যায় না, অনেক জন্মের সাধনায় যোগী হয়। সৌন্দর্য সব সময় ঈশ্বরের কৃপাতে হয়, আমাদের কাছে ঈশ্বরের কৃপা মানেই হয়, তার নিজের সুকৃতি আছে। যদি তাঁর নিজের সুকর্ম থাকে তবেই সে যোগী হয়, আর ঐ সুকর্মই তাঁকে সুস্থ শরীর দেয়, সুন্দর চেহারা দেয়।

কেউ যদি আজ থেকে সাধনা করতে শুরু করে দশ পনের দিনের মধ্যেই তার চেহারা পাল্টে যাবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, I never met a Yogi who did not have a beautiful voice। যোগীর কণ্ঠস্বর সব সময় সুমধুর হবে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে কণ্ঠস্বরটাও মিষ্ট হয়ে যায়। একজন গৃহস্থ যা যা চায়, টাকা চায়, পাঁচজন লোক মানুক জানুক, নিরাপত্তা চায়, সুস্থ শরীর, সুন্দর চেহারা চায়, যোগীর এর সবটাই স্বাভাবিক ভাবে থাকে। যোগীর যেটা নেই সেটা হল তাঁর চাহিদাটা শুধু থাকে না। একজন গৃহস্থ যে যে জিনিসকে মূল্যবান মনে করে, যোগী না চাইতেই সেগুলো তাঁর কাছে চলে আসে। গৃহস্থ ভালো খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করে, যোগী খেতে ইচ্ছে করুক আর নাই করুক, ভালো খাবার সে সব সময় পেয়ে যাবে। যেটাই গৃহস্থের কাছে মূল্যবান মনে হবে সেটাই যোগীর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। সাধু সন্ন্যাসীদের তাই লোকেরা ঈর্ষা করে, আমরা এত খেটে মরছি তাও কিছু পাই না, আর এরা বসে বসে এত সুখ ভোগ করছে কি করে! আমাদের সমস্যা হল, আমাদের কাছে শরীর মানে বাবা-মার জেনেটিক উপাদানে আমার শরীরটা এসেছে, আর যেমন যেমন খাওয়া-দাওয়া করছি তাই দিয়ে শরীরটা চলে। সবটাই ঠিক, কিন্তু এদের সবার রাজা হয়ে বসে আছে আমাদের মন, মন যখন নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে সঙ্গে সঙ্গে শরীরকেও নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। ফলে শরীরের মধ্যে সব গুণ চলে আসে, যে গুণগুলো মানুষ নিজের ভেতরে বা নিজের প্রিয়তমর ভেতরে দেখতে চায়। এই জিনিস হতে বাধ্য, এর কোন ব্যতিক্রম হয় না।

বাস্তবে দত্তাত্রেয় এই রকম ছিলেন কিনা আমাদের জানার কোন উপায় নেই, তবে এই ধরণের রচনার মাধ্যমে একটা আদর্শকে সামনে রাখা হয়, সেখানে অনেকগুলো ব্যক্তিত্বকে মিলিয়ে রাখা হয়। একজন যোগী কেমন হবেন? দত্তাত্রেয়কে সামনে নিয়ে এসে দেখিয়ে দিলেন। ভাগবত দত্তাত্রেয়র যে বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে স্বামীজীর সাথে প্রচুর মিল পাওয়া যায়, স্বামীজীও এই রকম ছিলেন। দত্তাত্রেয়র এই গুণগুলো যদি স্বামীজীর উপর নিয়ে আসা হয় একই বর্ণনা হয়ে যাবে, স্বামীজী! আপনার অভিজ্ঞতা আছে, বিদ্যা আছে, বিচক্ষণতা আছে, আপনার চলন রাজার মত, আপনাকে দেখতে এত সুন্দর, আপনার চেহারা থেকে সৌভাগ্য টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। স্বামীজী যখন হাটাচলা করতেন মনে হত যেন রাজা হাটছেন। আমেরিকার এক বন্দরে নতুন একটা জাহাজ লঞ্চ করা হবে, লঞ্চ করার অনুষ্ঠান দেখার জন্য একটা জায়গা পর্যন্ত সবাই যেতে পারত, তারপরেই সিকিউরিটি থাকত। যাঁরা স্বামীজীকে নিয়ে গেছেন তাঁরা বললেন, স্বামীজী এর পর আর যাওয়া যাবে না, স্পেশাল পারমিশান পাস না হলে যাওয়া যাবে না। স্বামীজীর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি আরামসে হাটতে হাটতে সিকিউরিটির ব্যারিকেড অতিক্রম করে এগিয়ে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে আটকাতে এগিয়ে এলো না, যে জায়গাটা সাধারণদের জন্য নিষিদ্ধ সেখানে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মেরি লুই বার্ক এই ঘটনার কথা তাঁর নিউ ডিসকভারিজ বইতে উল্লেখ করে বলছেন who would have dare to stop the king, স্বামীজির চলার মধ্যে এমন একটা রাজকীয়তা যে কারুর মাথায় আসছে না যে এই লোকটিকে আটকাতে হবে। আমরা যখন হাটি আমাদের হাটাই বলে দেয় অনধিকার প্রবেশ। কিন্তু স্বামীজী সারা জগতের মালিক, উনি জানেন এটা আমারই সম্পত্তি। এখানে দত্তাত্রেয়র মধ্যে ঠিক একই জিনিস।

ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ, আপনি তো কোন কাজ করেন না, তাও আপনার মধ্যে এত গুণ। তবুও আপনি জড়, উন্মত্ত ও পিশাচবতের মত থাকেন। ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার পরমহংসের কথা বলতে গিয়ে এই চারটি লক্ষণের কথা বলছেন, জড়বৎ, উন্মত্তবৎ, পিশাচবৎ ও বালকবৎ। ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে বালকবৎ বলছেন, বাকি তিনটে এই শ্লোকে বলছেন। জড়বৎ, জড় বস্তুর মত সমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন,

উন্মত্তবৎ, পাগলের মত কখন হাসছেন কখন কাঁদছেন, আবার কখন নৃত্য করছেন। পিশাচবৎ, শুচি অশুচির কোন ভেদ নেই আর বালকবৎ, বালকের মত স্বভাব কোন কিছুতে আঁট নেই। মহারাজা যদু বলছেন, আপনাকে দেখে আমার এতদিনের সব ধারণা পাল্টে গেল। মহারাজা যদু আরও টেনে নিয়ে এটাই বলছেন।

*জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা। ন তপ্যসেহগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ।।*১১/৭/২৯। জগতের বেশীর ভাগ লোক কাম আর লোভের দাবাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। যেটা আছে সেটা আরও বেশী বেশী করে হোক এই আগুনে মানুষ দিনরাত জ্বলেপুড়ে মরছে, অপরের আছে নিজের নেই সেই ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলছে। আমরা সব সময় বলি, আজকাল যা দিন পড়েছে ভাবা যায় না। কিছুই দিনকাল পাল্টায়নি, চিরদিন এই রকমই ছিল, ভাগবতেই বলছেন, মানুষ কামাগ্নিতে, লোভাগ্নিতে আর ঈর্ষাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় এই দাবানলের আঁচটুকুও আপনার কাছে পৌঁছাতে পারছে না, পোড়া তো দূরে থাক। বনের হাতি দাবানল লাগলে সে বন থেকে যে কখন বেরিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝতেও পারেনা দাবানল কি জিনিস। হাতির চারিদিকে আগুন জ্বলছে তাতে হাতির কোন বিকার নেই, সে নদীতে আনন্দে স্নান করতে থাকে। ঠিক তেমনি সংসার কাম আর লোভের দাবানলে জ্বলছে কিন্তু তার আঁচটুকুও আপনার কাছে পৌঁছাতে পারছে না। আপনি এটা কি করে সম্ভব করলেন? আর পুত্র, স্ত্রী, ধন এগুলোর সব কিছু থেকে আপনি স্পর্শরহিত। জাগতিক যা কিছু আছে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আপনি নিজের স্বরূপে বিরাজ করে আত্মার আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে কেমন করে আপনি একমাত্র আত্মাতেই এই অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করছেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবনেও প্রথমে ঠিক এই প্রশ্ন এসেছিল। এর উত্তর পাওয়ার পরই তাঁর জীবন অন্য দিকে প্রবাহিত হয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধ প্রথমে দেখলেন একজন বৃদ্ধ, তারপর একজন ব্যাধীগ্রস্ত, পরের দিন দেখলেন মৃত শরীর। আর চতুর্থ দিন দেখলেন শ্রমণ, রাস্থা দিয়ে একজন সন্ন্যাসী বীরদর্পে হেঁটে চলেছেন, তাঁর চেহারা ঝকঝক করছে। ভগবান বুদ্ধ সারথিকে প্রশ্ন করলেন ইনি কে? ইনি একজন সন্ন্যাসী। এনার চেহারা এত ঝকঝকে আর আনন্দে পরিপূর্ণ কি করে হল? সারথির উত্তর – ইনি সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ প্রথমে মানব জীবনের অবশ্যাম্ভাবী তিনটে বিকার জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে দেখে তাঁর মনের মধ্যে শিহরণ আর শোক উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারপরেই দেখলেন সন্ন্যাসী। ইনি এত ঝকঝকে আনন্দে পরিপূর্ণ কি করে হলেন? ইনি সব ত্যাগ করেছেন। সেখান থেকেই ভগবান বুদ্ধের মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য জন্ম নিল। যদুও এখানে সেই একই প্রশ্ন করছেন – চারিদিকে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখের দাবানল জ্বলছে, শুধু অবসাদ আর অবসাদ, এর মধ্যে আপনি কি করে আনন্দে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন?

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্। ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ।। ১১/৭/৩০।। স্পর্শ শব্দ আমাদের শাস্ত্রে বার বার আসে, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় তাদের ভালোবাসার বস্তুর পেছনে দৌড়াতে থাকে। চোখ সুন্দর মুখ, সুন্দর দৃশ্য দেখতে চায়, কর্ণ সুমিষ্ট ধ্বণি শুনতে চাই, যখন দুটো দুটোর সাথে মিলন হয় তখন সেটাকে বলে স্পর্শ, গীতায় যেমন বলছেন *মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়*, ইন্দ্রিয় আর তার বিষয়ের সংযোগকে বলে স্পর্শ। আপনি স্পর্শবিহীন, আপনার ইন্দ্রিয়গুলো কোন কিছুর সাথে সম্পর্ক করছে না। অথচ জগতের সবাই স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, সম্পদ, সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে আর সবাই চায় আমার সব কিছু যেন ঠিক থাকে, বাকীরা যেন আমার থেকে ভালো না থাকে। কিন্তু জগতের সব কিছু থেকে আপনি সম্পূর্ণ আলাদা। এটা কি করে সম্ভব হল? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি পরমব্রহ্মের আনন্দে মস্ত হয়ে আছে। এখানে আমরা মেনেই নিচ্ছি যদু রাজা আর দত্তাত্রেয়র মধ্যে আরও কিছু কথা হয়েছে। যদি জিজ্ঞেস করে থাকেন আপনি কি করেন, দত্তাত্রেয় বললেন আমি আত্মার আনন্দে থাকি। শুধু দেখেই বলে দেবেন যে ইনি আত্মার আনন্দে আছে, এভাবে কেউ বলতে পারবেন না। একজন যোগীর কি কি গুণ থাকবে বা সংসারে যারা আছে তাদেরও কি কি গুণ থাকা উচিত, যার দ্বারা সংসারী মানুষ শান্তি পেতে পারে। আমাদের শাস্ত্র সাধক ও সিদ্ধের মধ্যে কোন তফাৎ দেখে না। বলা হয়, সিদ্ধ পুরুষের যেটা স্বাভাবিক স্থিতি,

সাধক সেটাকেই চেষ্টা করে যায়, তাছাড়া আর কিছু না। গীতা ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন, যাঁরা জ্ঞান পথে এসেছেন তাঁরাও জ্ঞানী, তেমনি যাঁরা ভক্তির পথ নিয়ে নিয়েছেন তাঁরাও ভক্ত। আমরা ভক্ত বলতে মনে করি প্রহ্লাদ, ধ্রুব, কিন্তু তা নয়, যে কেউ ভক্তির পথ নিয়ে নিল সেই ভক্ত। এখানে দত্তাত্রেয়র যে গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে, যেখানে বলছেন তিনি পরমব্রহ্মে নিজেকে হারিয়ে রেখেছেন, তিনি স্পর্শবিহীন, কোন কিছুতে তাঁর মন যাচ্ছে না, তিনি দেখতে সুন্দর, মিষ্টভাষী, দেখেই মনে হয় কাজকর্মে সুনিপুণ। কিন্তু তারও আগে যদু রাজা বলছেন, আপনি তো কাজকর্ম কিছুই করেন না, আপনার কি করে এই রকম হল?

কাজের সাথে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞাতের সাথে জ্ঞানের যে সম্পর্ক তার আলোচনা আমরা আগে করলাম, এটাই আবার অনেক সময় অন্য রকম হয়ে যায়। লোকেরা মনে করে কাজ করার কি দরকার, একটা কিছু হয়ে গেলেই হল, কিন্তু হয় না। দত্তাত্রেয়কে এখানে অবতার মনে করা হয়, তিনিও বলছেন না যে আমার ভেতর থেকেই জ্ঞান এসেছে, তিনি বলছেন আমিও অনেক জায়গায় শিক্ষা গ্রহণ করেছি। যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে ঐ শিক্ষার পেছনেও দত্তাত্রেয়র অনেক কাজকর্ম করা ছিল। কারণ ঐ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে প্রস্তুতি থাকা দরকার, সেটার জন্য কাজ করতে হয়। প্রথম অবস্থায় প্রচুর কাজ করতে হয়, সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হয় কিভাবে অনাসক্ত ভাবে কাজ করা যায়, তারপরে জ্ঞানের পাত্রতা আসে। পাত্রতা এসে গেলে তখন একটা কিছু দেখলেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার অনেকের আগের আগের জন্মে প্রচুর কাজ করা থাকে, একটু দেখলেই তাদের হয়ে যায়। তবে একটা কথা আমাদের ভালো করে জেনে রাখা দরকার, সংসারে থেকে নিষ্কাম কর্ম হয় না। অনেক আগে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারের আচার্য ছিলেন স্বামী শিক্ষানন্দজী মহারাজ, তিনি ব্রহ্মচারীদের খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। স্টোভে দুধ বসিয়ে ধ্যান করতে বসে গেলে, সেই ধ্যান কতটুকু হবে! তোমরা সবাই এভাবেই ধ্যান কর। সব সময় তোমরা কাজকর্ম করছ আর বলছ ধ্যান করবে, সেই ধ্যান কি রকম হবে, উনুনে দুধ বসিয়ে ধ্যানে বসার মত, মনটা সব সময় দুধের দিকেই থাকবে। এই যে বলা হল নিষ্কাম কর্ম হয় না, তাহলে স্বামীজী এত নিষ্কাম কর্মের কথা কেন বলছেন? স্বামীজী ওখানে একটা আদর্শের কথা বলছেন। ওটাই শেষ কথা, গীতাতেও যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলছেন, ওটাও শেষ কথা। নিষ্কাম কর্ম করার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যে নিষ্কাম কর্ম করছেন, এটাই সত্যিকারের নিষ্কাম কর্ম। স্বামীজী যে রামকৃষ্ণ স্থাপনা করছেন, দেশে বিদেশে ঘুরছেন, তিনি নিষ্কাম কর্ম করছেন। আমরা যে কাজ করছি, কিছুটা রজোগুণের জন্য, কিছুটা অহং তুষ্টি আর কিছুটা বাড়ির লোকদের বা অফিসের বসদের খুশি রাখার জন্য আবার কিছুটা লোক দেখানো, সব রকম মিলিয়েই আমরা কাজ করছি। সেইজন্য জীবনে একটা আদর্শকে অবলম্বন করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। লক্ষ্য, আদর্শ যদি না থাকে তাহলেই সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কাজের দ্বারাই জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা আসে, দ্বিতীয় একটা হল সরাসরি জ্ঞান আসা। আমাদের মন যেন একটা সোনার বল। সোনার বলে জল রাখতে গেলে জল রাখা যাবে না, বল কখনই জলকে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সোনার বলকে যদি হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয় তখন ওর মধ্যে গর্ত হতে শুরু করবে, ঐ গর্তে জল ধরবে। আমাদের মস্তিষ্কেও ঠিক তাই হয়। কর্ম করতে শুরু করলে পাত্রতা তৈরী হয়, যত কর্ম করবে তত পাত্রের আকার বাড়বে, ভেতরের আয়তনটা বাড়ে। দ্বিতীয় উপায় হল জ্ঞান, কঠোপনিষদে বলছেন *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, যেমনটি আমাদের কর্ম, যেমনটি আমাদের জ্ঞান তেমনটি আমাদের জন্ম হবে। জগতে জ্ঞানের অভাব নেই, ইন্টারনেটে গুগুলসে গেলে সব জ্ঞান পাওয়া যাবে, তাই বলে কি মানুষ পাল্টে গেছে? কিছুই পাল্টায়নি, যেমন মুর্খ ছিল তেমন মুর্খই থেকে গেছে। দু হাজার বছর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। অথচ উপনিষদে বলছেন যেমনটি কর্ম, তার সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ হল যেমনটি জ্ঞান, পরের জন্ম সেভাবেই হবে। কর্ম আর জ্ঞান দুটো সাথে সাথে চলে, দুটোর মধ্যে বেশি তফাৎ এই জন্যই নেই, কর্ম অনুভব দিয়ে আমাদের জ্ঞান দেয়, আর জ্ঞান সরাসরি দেয়। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি সারা জগতই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু তাও তো আমরা শিক্ষা নিতে পারছি না। মাঝে মাঝে আসছে ঠিকই, কখন কখন মনে হয় তাইতো ছোটবেলায় এই রকম একটা কথা পড়েছিলাম, কিন্তু ঐ শিক্ষা দিয়ে আমাদের জীবনের কোন পরিবর্তন হয়নি।

এখানে জগৎ থেকে যে শিক্ষা অবধূত পেয়েছেন তাতে তাঁর জীবনে পরিবর্তন এসে গেছে। অবধূত যে জ্ঞান লাভের কথা বলছেন, যাঁরা গভীর ধ্যান করেন তাঁদের পক্ষেই এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

জ্ঞানের কয়েকটা ধাপ থাকে। জ্ঞানের প্রথম ধাপ হয় ইংরাজীতে যাকে বলা হয় information, information ছাড়া এই জ্ঞানে কিছু থাকে না। যেমন গুগুলে টাইপ করে সব খবর পেয়ে যাচ্ছি, শুধু এক গুচ্ছ information দিচ্ছে। ছোটবেলা স্কুলে যা কিছু মুখস্ত করেছি সবটাই information, যেটা কোন কাজেই লাগে না। দ্বিতীয় ধাপ হল জ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা বা বলা যেতে পারে কাঁচা জ্ঞান। তৃতীয় ধাপ পাকা জ্ঞান আর চতুর্থ ধাপে আসে বিজ্ঞান। ঠাকুর খুব সহজ উদাহরণ দিচ্ছেন, কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। জ্ঞানের প্রথম অবস্থা শুধু শোনা, আমি শুনেছি দুধ বলে কোন কিছু আছে, ঐ information দিয়ে আমার কিছু হবে না। প্রায়ই লোকেরা ভক্ত বা সাধুদের বলে, ব্যাটা ভণ্ড একদিকে ধর্ম করে অন্য দিকে সব দু নম্বরী কাজ করে বেড়ায়। তার মানে ধর্মের যা কিছু আছে ওটা তার কাছে শুধু মাত্র information হয়ে আছে। দ্বিতীয় ধাপে আরেকটু যেন কাছে এগিয়ে গেল, কাছে এগিয়ে গেলে একটু একটু করে বিশ্বাস হতে শুরু হয়। বিশ্বাসেরও দুটো অবস্থা, প্রথমটা প্রাথমিক অবস্থা আর দ্বিতীয় অবস্থা হয় পাকা অবস্থা। বিশ্বাসের প্রাথমিক অবস্থায় মনটা চঞ্চল হতে শুরু হয়, মনে করে শাস্ত্রের কথায় কিছু ভালো জিনিস আছে, ভগবান বলে কিছু আছেন। সেখান থেকে আসে পাকা বিশ্বাস, বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে যায়, শাস্ত্রে যা বলছে সব সত্য, জিনিসটা এই রকমই। বিশ্বাসের পাকা অবস্থা হয়ে গেলে জীবন পাল্টাতে শুরু করে। অবধূতের কিন্তু এই অবস্থা নয়, অবধূতের তার পরের অবস্থা, যেটাকে বলছেন বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানে, তিনি জিনিসটাকে জেনে জীবনে লাগিয়েছেন, লাগিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য করে কৃতকৃত্য হয়ে গেছেন। আমরা জানি আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, আগুনের ব্যাপারে আমরা খুব সাবধান, এটাই বিজ্ঞানের অবস্থা। আগুন জিনিসটা কি, আগুন কিভাবে হয়, আগুন কি করে এই অবস্থা গুলো আমরা পেরিয়ে এসেছি। শুধু তাই না, আগুনকে নিয়ন্ত্রণে এনে আগুনের সদ্ব্যবহার করে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই ব্যাপারেও আমরা অভিজ্ঞ হয়ে গেছি। বিজ্ঞানের অবস্থা একমাত্র আসবে ধ্যানের মাধ্যমে। কাজ করলে মস্তিষ্কের নিউরোন গুলো যেমন সুনিয়ন্ত্রিত হয়, ধ্যানের গভীরে একই জিনিস হয়। কথামৃতে যে এত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা রয়েছে, ওখানে ঠাকুরের যেমন নিজের অনুভূতির কথা আছে তার সাথে শাস্ত্র নিয়েও অনেক কথা আছে, শাস্ত্রের কথা শুনে সেটাকে ধারণা করে ধরে রাখার ক্ষমতাটা ঠাকুরের ছিল, এই ক্ষমতাটা ধ্যানের জন্য হয়েছে। কাজ করে আমরা যে জ্ঞান পাব, সেই জ্ঞান আমরা ধ্যান করেও পেয়ে যাব। তফাৎ হল ধ্যানে একটা জিনিসকে গ্রহণ করে রপ্ত করার ক্ষমতা অনেকে বেশি বেড়ে যায়। দশ ঘন্টা কাজ করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে, পাঁচ মিনিট ধ্যানেই সেটা এসে যাবে। সেইজন্য যাঁরা ঠিক ঠিক ধ্যান করেন তাঁদের ক্ষমতাটা অসীম হয়ে যায়। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলেন লাটু মহারাজ, তাঁর কোন পড়াশোনাই ছিল না, অথচ ঠাকুরের বিদ্বান সন্তানরা জ্ঞানের যে অবস্থায় পৌঁছে ছিলেন, লাটু মহারাজও ঐ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। একই জিনিস আমরা ঠাকুরের ক্ষেত্রেও পাই, যীশুও তাই ছিলেন, মহম্মদও তাই ছিলেন, এনাদের কারুরই পড়াশোনা ছিল না। কিন্তু তাঁদের ধারণ করে ধরে রাখার ক্ষমতাটা সাংঘাতিক। অবধূতেরও এই একই জিনিস ছিল, তিনি ধ্যান করেছেন কিনা। ধ্যানের গভীরে একটু সামান্য যদি কোন আভাস পেয়ে যান তাতেই তাঁর জ্ঞান হয়ে যায়।

আমরা সাধারণ ভাবে জ্ঞান বলতে বুঝি, কেউ কিছু একটা বলে দিল, জিনিসটা এই রকম, তখন সেটা জ্ঞান রূপে আমাদের কাছে আসে। কিন্তু এখানে অবধূতকে কেউ কিছু বলে দিচ্ছে না, তিনি এক একটা জিনিস দেখছেন, দেখার পর সেই জিনিসের কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি একটা জ্ঞান পেয়ে যাচ্ছেন। যেমন পাহাড় থেকে কিছু শিক্ষা পাচ্ছেন, পাখি থেকে পাচ্ছেন, মাছ থেকে শিক্ষা পাচ্ছেন। এই শিক্ষা কি করে হচ্ছে? এই একটি কথাকে আমাদের মাথার মধ্যে খুব ভালো করে বসিয়ে নিতে হবে, কক্ষণ, কোন পরিস্থিতিতে, কোন অবস্থাতেই কোন জ্ঞান বাইরে থেকে আসে না। জ্ঞান সব সময় ভেতরেই আছে, এর কোন ব্যাতিক্রম হবে না। একটা পেন আছে, এই পেনের দাম কত হতে পারে, এর দাম পাঁচ টাকা হবে নাকি পাঁচ হাজার হবে, এই দামটা কে ঠিক করে দেবে? কোম্পানি একটা দাম করে দেয়। যদি আমি শুনি এই পেনটা চোরাই মাল, তখন আমি পাঁচ টাকা

থেকে শুরু করব। হাজার টাকাও যদি দাম হয় তাহলেও শুরু করব পাঁচ টাকা থেকে। সেখান থেকে যদি আমি শুনি, এই পেন কোন মামুলি পেন নয়, এই পেন দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সই করেছিলেন। তখন এই পেনের কত দাম হয়ে যাবে? কেউ দশ হাজার দেবে, কেউ পাঁচ লাখ দেবে। পাঁচ টাকা দামের একটা পেন পাঁচ লাখে কি করে চলে গেল? জিনিসের দাম ওর উপযোগিতা দিয়ে কখনই হয় না, ওর পেছনে কি কাহিনী আছে দেখা হয়। যেমন আমরা বাবা মাকে ভালোবেসেছি, বাবা-মা আজ কেউ বেঁচে নেই, ওনাদের ব্যবহৃত জিনিস যদি কিছু থাকে তার দাম আমার কাছে সাংঘাতিক। কিন্তু অপরের কাছে কোন দাম নেই। দামটা হল একটা নলেজ। জিনিসটার মূল্য কোথা থেকে আসছে? নিজের ভেতর থেকে আসে, বাইরে থেকে কিছু আসে না। আমাদের সব রকম প্রতিক্রিয়া, আমাদের যত রকম জ্ঞান, যা কিছু আছে সব ভেতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে কিছু আসে না। বাইরের জগৎ কি সরবরাহ করে? শুধু একটা ছোট্ট information, একটা সুইচের মত কাজ করে। রেডিওতে সুইচ অন করলে রেডিও নিজে থেকেই চলতে শুরু করে। আমার আর আমার অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দের কোন তফাৎ নেই, সচ্চিদানন্দ তিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, তাই আমার ভেতরেই অনন্ত জ্ঞানরাশি রয়েছে। যখন বাইরে থেকে কোন উত্তেজনা ভেতরে আসে তখন সেই জ্ঞান বেরোতে শুরু হয়। একটা টোকা মারলেই সেই জ্ঞান ফেটে ফেটে পড়ে। আমার আপনার কেন জ্ঞান ফেটে ফেটে পড়ছে না? মৌচাকে মধু আছে, একটা কিছু দিয়ে খোঁচা দিলে মৌচাক থেকে মধু ঝর ঝর করে পড়বে, কিন্তু মৌচাকের বাইরে যদি একটা কাঠ কিংবা লোহার আবরণ দেওয়া থাকে তাহলে যতই খোঁচা মারুক না কেন এক ফোঁটা মধুও পড়বে না। আমার আপনার যে জ্ঞানের মৌচাক, সেই মৌচাকের উপর অনেক আবরণ দেওয়া আছে, সেইজন্য কোন জ্ঞানের প্রকাশ হচ্ছে না। কিন্তু ধ্যান করে করে যিনি আবরণ গুলিকে সরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের মৌচাক এখন খোলা পড়ে আছে। এবার একটু কোন টোকা কেউ দিল বা বাইরে থেকে সামান্য একটু উত্তেজনা ভেতরে এসে ধাক্কা দিল, জ্ঞানরাশি হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকবে। স্বামীজীর রচনাবলী পড়লে আমরা অবাক হয়ে যাই, এত জ্ঞান তিনি কি করে পেলেন! কোথাও পাননি, তাঁর ভেতরেই সব ছিল। ইংল্যাণ্ড কোথায়, প্যারিস কোথায় এই জিনিসগুলো সবাইকে জানতে হবে, এগুলো information দিয়েই চলে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মনের জগৎ এগুলোকে নিয়ে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার সেখানে জ্ঞান দরকার। আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রচুর information নিয়ে চলে কিন্তু নলেজ জিরো। কারণ তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারটা অনেক রকম আবরণ দিয়ে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। তাদের জীবনটাও তাই দুঃখ আর যন্ত্রণায় ভরা, চেহারার মধ্যে কোন জৌলুষ নেই। কিন্তু দত্তাত্রেয়কে দেখে যদু রাজা বলছেন, আপনার চেহারাতে সৌন্দর্য আছে। কেন সৌন্দর্য? মনের মধ্যে শান্তি আছে। শান্তি কেন আছে? তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই জ্ঞান একমাত্র তাঁদেরই আসবে যাঁদের গভীর ধ্যান হয়, গভীর ধ্যান হলে ঐ আবরণগুলো খসে পড়ে যায়। ঠিক তেমনি প্রচুর কাজ করলে আবরণ গুলো ক্ষয় হয়ে যায়। ঐ আবরণ যতক্ষণ না ক্ষয় হয় ততক্ষণ তাকে কেউ কিছু শেখাতে পারবে না। সেইজন্য মঠ মিশনে সাধু ব্রহ্মচারীদের দিয়ে প্রচুর কাজ করান হয়, কাজ করা মানে ব্রেনে হাতুড়ি মারা। ধীরে ধীরে মনটা যখন একটু নরম হল, এবার তুমি ধ্যানের দিকে যাও। তখন আস্তে আস্তে তার ধারণা করার ক্ষমতাটা বাড়ে। তখন যে কোন একটা জিনিস দেখলেই মনের মধ্যে একটা ভাবের উদয় হয়। কবি বা লেখকদের তাই হয়, একটা কিছু দেখলেন, একটা ফড়িং উড়ছে, গাছের ডালে একটা পাখি বসে আছে, আমাদের কাছে এগুলো কিছুই মনে হবে না, কিন্তু তাঁরা ওটাকে নিয়েই একটা কবিতা বা কাহিনী রচনা করে দিলেন। মন এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে, একটা কিছু দেখলেই সেখান থেকে সৃষ্টি বেরিয়ে আসে। এখানে শুধু সৃজনী নয়, পুরো জীবনটাই তাঁর পাল্টে গেছে।

এই দীর্ঘ আলোচনার মূল বক্তব্য হল, মহারাজ যদু বলতে চাইছেন, আপনাকে দেখে মনে হয় না যে আপনি কোন কাজ করেন। কারণ দেখছেন তিনি একেবারে যোগীর বেশে আছেন, হয়ত সামান্য একটা কৌপীন পড়ে আছেন, গায়ে কোন বস্ত্র নেই, হাতে একটা কমণ্ডুলু, তার মানেই তিনি কোন কাজকর্ম করেন না। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞানে পরিপূর্ণ, এটা কি করে হতে পারে! দ্বিতীয় বয়স কম, যশ আছে, চেহারায় একটা আনন্দের ভাব আছে, সৌন্দর্য আছে। এগুলো থাকলে মানুষ সাধারণ ভাবে স্ত্রী আনে, পরিবার করে,

সম্পদ করে, কিন্তু দত্তাত্রেয় সেগুলোও করছেন না। বলতে চাইছেন জগতের কোন ভোগের দিকেও তাঁর মন নেই। দুটো জিনিসকে বলছেন, এক আপনার ভেতরে শক্তি কি করে এল, দুই এই শক্তিকে যে কাজে মানুষ লাগায় সেটাও আপনি লাগাচ্ছেন না, এই অনাসক্তির শক্তিটা আপনার কি করে এল।

জীবনে যদি শক্তি না থাকে তাহলে সে শেষ, আর ঐ শক্তিকে যদি কাজে লাগানো হয় তার সাথে সেখানে যদি অনাসক্তি না থাকে, তাহলেও সে শেষ। এটাকেই স্বামীজী বলছেন, আমাদের চাই man making and character building education। Man making মানেই শক্তি চাই, ভেতরে যার শক্তি নেই সে একটা পিঁপড়ে। কিন্তু এই শক্তিই একজনকে রাবণ বানিয়ে দিতে পারে, একটা কংস বানিয়ে দিতে পারে, একটা হিটলার বানিয়ে দিতে পারে। সেইজন্য চাই অনাসক্ত, জীবনের এই দুটো লক্ষ্য, ক্ষমতা আর অনাসক্তি। ক্ষমতা থাকবে, যেমন ভারত বলছে আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার থাকবে কিন্তু আমরা বোমা বানাবো না। পাকিস্তান বলছে আমরা বোমাটাই বানাবো, বোমা বানানো আমার দরকার, এটাই আসুরিক শক্তি। এখানে এটাই বলছেন, আপনার দুটোই আছে, আপনার মধ্যে শক্তি আছে, কিন্তু শক্তি কর্ম দিয়ে আসে অথচ আপনি কোন কর্ম করেন না। যেমন অনেকে বলছে পাকিস্থান নিউক্লিয়ার পেলো কি করে? বলছে চায়না তাকে দিয়েছে, কারণ নিজের ক্ষমতা নেই। প্রশ্ন উঠবে, আপনি নিউক্লিয়ার পাওয়ার পেলেন কি করে। যদু রাজা এটাই জিজ্ঞেস করছেন, আপনাকে দেখে মনে হয় না যে এই এই ক্ষমতা থাকার কথা। কিন্তু পেলেন কি করে? দ্বিতীয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ, ঐ ক্ষমতা পেলে মানুষ যে যে কাজে লাগায় বা নিজের স্বার্থে যে জায়গাতে লাগায়, সেটাও আপনি লাগাচ্ছেন না। আপনার মধ্যে দুটোই আছে, ক্ষমতাও আছে আবার অনাসক্তিও আছে, এই দুটোর সংমিশ্রণ দেখা যায় না। এটাই এই আলোচনার মূল বক্তব্য।

তখন দত্তাত্রেয় বলতে শুরু করছেন আমি কীভাবে শিক্ষা পেয়েছি। তিনি বলছেন *সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ। যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামীহ তান্ শৃণু।।১১/৭/৩২।।* হে রাজন্! আমি কোন একজনের কাছে শিক্ষা পাইনি, জীবনে আমি অনেক গুরুর আশ্রয় নিয়েছি। এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি নিজের বুদ্ধি সহযোগে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। ব্রেন যখন খুলতে শুরু হয়ে যায় তখন যেখানে যা দেখবে সেখান থেকেই শিক্ষা পেতে শুরু করবে। আমার গুরুদের কাছে আমি যা যা শিক্ষা পাওয়ার পেয়ে গেছি, তারপর থেকে জগতে আমি মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারছি। কাউকে যদি বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয় কিছু দিন পর থেকে সে ছটফট করতে থাকবে। জেলকে মানুষ এই কারণেই ভয় পায়, জেলে যাওয়া মানে সব কিছুতে সীমাবদ্ধতা এসে গেল। কিন্তু মনের জেলখানায় আমরা সব সময় সীমাবদ্ধ হয়ে আছি। কিন্তু দত্তাত্রেয় বলছেন, আমি স্বচ্ছন্দ। কেন স্বচ্ছন্দ? কোন ধরণের জেলখানায় আমি সীমাবদ্ধ নই। জেলখানায় কেন নেই? আপনি কি জন্ম থেকেই মুক্ত? না, জন্ম থেকে কি করে আমি মুক্ত হব, জীবনে যত জেলখানা, যত বন্ধন ছিল, যা যা দেখেছি, ওর একটা একটা দেওয়াল খসে পড়ে গেছে। কিভাবে খসে পড়েছে? এই যে চব্বিশ গুরুর কথা বলতে যাচ্ছেন, এদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে।

এরপর মাত্র দুটি শ্লোকে দত্তাত্রেয় তাঁর চব্বিশ জন গুরুর নাম বলছেন, আর তার সাথে এক এক করে বলবেন কার কার কাছে থেকে কি কি শিক্ষা পেয়েছেন। *পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোহগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ। কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ।। মধুমা হরণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোহর্ভকঃ। কুমারী শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ।।*১১/৭/৩৩-৩৪। চব্বিশ জন গুরু হলেন পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য, পায়রা, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মৌমাছি বা ভ্রমর, হাতি, মধু সংগ্রহাক, হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বেশ্যা রমণী, কুহর পাখি, বালক, কুমারী কন্যা, বাণ নির্মাতা, সর্প, মাকড়সা, ভৃঙ্গী কীট (কাঁচপোকা)। এই জিনিসগুলো আমরা সবাই রোজই দেখছি, নিয়মিত দেখছি, কিন্তু আমাদের শিক্ষা হচ্ছে না। অবধূতোপখ্যানের সব থেকে বড় শিক্ষণীয় হল, আমরা আমাদের চারিপাশে প্রকৃতির মধ্যে প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই দেখে থাকি, কত ছোটখাট জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেও ইচ্ছে হয় না। অথচ প্রকৃতির রাজ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে কিছু না কিছু শিক্ষণীয় জিনিস থাকে, যেটা আমরা গ্রহণ করতে অপাঙ্গম। কিন্তু

যাঁরা বুদ্ধি সহযোগে গ্রহণ করে জীবনকে সেইভাবে সংঘটিত করে নিতে পারেন তাঁরাই মহৎ হয়ে যান। দত্তাত্রেয় সবার কাছ থেকে শিক্ষাটা নিতে পেরেছিলেন। দত্তাত্রেয় বলছেন এই শিক্ষা গ্রহণের ফলে জগতে আমি মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম। আমি তোমাকে তাঁদের সবার কথা এক এক করে বলব আর সাথে সাথে তাঁদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, সেই শিক্ষার কথাটাও বলব।

(১) পৃথিবী

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ। তদ্ বিদ্বান্ন চল্যার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্।।১১/৭/৩৩।

অবধূতের প্রথম পাঁচজন গুরু হলেন পঞ্চ মহাভূত, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এই পঞ্চ মহাভূতের যে স্থূল রূপ আমরা দেখি তার প্রথমটা পৃথিবী। অবধূতের প্রথম গুরু পৃথিবী। অবধূত বলছেন, ধরিত্রীর কাছ থেকে আমি ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা পেয়েছি। পৃথিবীর বুকে কত আঘাতই না হয়ে চলেছে, মানুষ এই পৃথিবীর বুকে অবিরাম কত রকমের উৎপাতই না করে চলেছে। পৃথিবীর বুকে চাষবাশ করছে, খনন কার্য করে পৃথিবীর ভেতর থেকে খনিজ পদার্থ তুলে নিয়ে আসছে, কিন্তু তার জন্য ধরিত্রীকে কখনই কোন প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে দেখা যায় না, কোন প্রতিবাদ করতে যায় না, কোন রকম ক্রন্দনও করে না। কিন্তু এই পৃথিবীর যারা বাসিন্দা তারা সবাই নিজের নিজের প্রারব্ধ অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছে, কখন ভালো করে কখন মন্দ করে। এই চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে একে অপরকে আক্রমণ করে নানান ধরণের প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। এতেই বোঝা যায় মানুষ কত অসহায়। যাঁরা আত্মচিন্তনে নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইছেন তাঁদের মনের মধ্যে কোন ধরণের বদলা নেওয়ার চিন্তাও উঠতে দিতে নেই। নিজের ধৈর্য এই কারণেই কখন হারাতে নেই। সেইজন্য ধীর ব্যক্তির ভালো করে বোঝা উচিত কোথায় তার প্রতিকূলতা বা বাধা আসছে, বুঝে নিয়ে কোন কিছুতেই ক্রোধ না করা এবং ধৈর্যচ্যুত না হওয়া আর নিজের স্বধর্মে দৃঢ় থাকা।

স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর লাটু মহারাজ স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন 'লোরেন ভাই! তুমি তো এত দেশ বিদেশ ঘুরলে কোথাও কি দেখেছ যে আমাদের পৃথিবীর পূজা হয়'? প্রশ্ন শুনে স্বামীজী খুব অবাক হয়ে গেলেন। অনেক গ্রামের মেয়েরা ভাতের মাড় একটা পাত্রে ঢালে, মাড়টা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর সেটা মাটিতে ফেলে। একবার একটি বাচ্চা মেয়ে গরম মাড়টা নিয়ে মাটিতে ঢেলে দিয়েছে, সেটা দেখে তার মা দৌড়ে এসে মেয়েকে এক চড় মেরে বলছে, তুই এই গরম মাড় পৃথিবীর বুকে ফেললি, বুঝতে পারছিস না পৃথিবীর কত কষ্ট হল। একটা গ্রামের মেয়েদের মনে এই অনুভূতিটাই এখানে কাজ করছে। পৃথিবী সব কিছুকে ধারণ করে আছে, তার উপর কত অত্যাচার, কত কিছু হচ্ছে কিন্তু পৃথিবী কখন প্রতিক্রিয়া করছে না। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের এই কথা বললে তারা বলবে, পৃথিবীর তো কোন প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই নেই। যখন pure intelect দিয়ে চলে তখন আমরা ওটাই ভাববো, ওর তো কোন প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যাঁর sensitivity আছে তিনি সেখানে দেখবেন সেও প্রতিক্রিয়া করছে, উনি এটা কখনই দেখতে যাবেন না যে ওর কোন প্রতিক্রিয়া করা ক্ষমতা আছে কি নেই। যাঁদের মধ্যে খুব sensitivity আছে, খুব উচ্চমানের কবি বা লেখকদের মন শিশুর মনের মত হয়ে যায়। শিশুরা সব কিছুকেই অন্য ভাবে দেখে, ঋষিরাও অন্য ভাবে দেখেন, কবি, লেখকও অন্য ভাবে দেখেন। ঠাকুর তাঁর ভাইপো শিবুকে নিয়ে শুয়ে আছেন, বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ভাইপো ঠাকুরকে বলছে, খুড়ো আকাশে কেমন চকমকি ঠুকছে। আকাশের বিদ্যুতকে একটা শিশু অন্য ভাবে দেখছে। দত্তাত্রেয় তিনিও এখানে পৃথিবীকে অন্য ভাবে দেখছেন, তিনি দেখছেন না যে পৃথিবী প্রতিক্রিয়া করতে পারে কি পারে না, কারণ তাঁর কাছে অস্তিত্বটাই সম্পূর্ণ রূপে জীবন্ত। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিনি বলবেন পৃথিবীর প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও করে না। প্রতিক্রিয়া করে না বলেই তুমি দেখত পারছ না। যখন তার উপর আঘাত হানছে, ক্ষতি করা হচ্ছে তাতেও তিনি নড়েন না। ঠাকুর বলছেন কামারশালার নেহাই, ওর উপর কত হাতুড়ির ঘা পড়ছে নেহাইয়ের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আমাকে একজন আক্রমণ করছে তখনও আমি প্রতিক্রিয়া করছি না, এটাকে বলে ধীর।

বৌদ্ধদের একটা কাহিনী আছে, এই কাহিনী স্বামীজী কর্মযোগে বলছেন, একটা ষাঁড় জঙ্গলে বসে আছে আর তার শিঙের উপর একটা মশা এসে বসে আছে। বহুক্ষণ বসে আছে, হঠাৎ তার মনে হল ষাঁড়ের শিঙের উপর অনেকক্ষণ বসে আছি, ওর না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। তখন সে উড়ে ষাঁড়ের কানের কাছে এসে বলছে, দাদা! অনেকক্ষণ তোমার শিঙে বসেছিলাম, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, আমাকে ক্ষমা করো। ষাঁড় তখন মশাকে বলছে, তোমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসে আমার শিঙে বসে থাক তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। এটাই ধীর, কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। কিন্তু আমাদের জীবনকে আমরা এমন তৈরী করে রেখেছি যে সারা অঙ্গে আমাদের চর্মরোগের মত হয়ে আছে, একটু হাত লাগলেই চুলকোতে শুরু করে দেবে, কেউ একটা সামান্য কথা বলে দিল তাতেই ভেতরে জ্বলতে শুরু করে দেব, যে বলেছে তার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধশান্তি না করা পর্যন্ত জ্বলতেই থাকবে, একটা কেউ অপমান করেছে সেটাকে সারা জীবন মনে রেখে দেবে।

তদ্ বিদ্বান্ন চল্যার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্, যদি কখন কোন ভাবে আক্রমণ হয়েও যায় তখন বোঝার চেষ্টা করতে হয় নিশ্চয় তার কিছু অসুবিধা ছিল। আমাদের যখন কেউ মারে তখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে দেখা যাবে একজন একজনকে দুটো কারণে মারে। আমার দোষের জন্য আমাকে কেউ কোন দিন মারবে না। কাউকে যদি আপনি নিজের দুঃখের কথা বলেন শোনার পর সে অবশ্যই বলবে, ভাই একেবারে আমার মতই তোমার জীবন। মানুষ যখন কাউকে আঘাত করে তখন প্রথম কারণ হয় সে একটা কোন পরিস্থিতির জন্য বিবশ হয়ে গেছে, ইংরেজীতে বলে the person has his own compulsion আর দ্বিতীয় কারণ তার অবশ্যই মাথা খারাপ। একজন স্ত্রীকে স্বামী মারধোর করে, স্বামী অসহায়, সে যদি মেনে নেয় স্ত্রী আমার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ, আমার থেকে অনেক বেশি গুণ আমার স্ত্রীর মধ্যে আছে, তাহলে সে মরে যাবে। মানুষ সব কিছুকে নিয়ে বাঁচতে পারে, কিন্তু আমি অপদার্থ, আমি হীন এই বিশ্বাস যদি এসে যায় সে আর বাঁচতে পারবে না, হতাশাতেই শেষ হয়ে যাবে। যে মারছে তার অসহয়তাকে যদি কেউ বার করে দেয় তখন আবার তার প্রতি করুণা এসে যাবে। একবার একজন ভদ্রলোক বাড়ির উপর খুব রেগেমেগে স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের কাছে এসে বললেন, আমি আর বাড়ি যাচ্ছি না, সব ছেড়ে দিয়ে এসেছি। মহারাজ তাকে কিছু বললেন না, ওকে বসালেন, বসিয়ে বললেন, ঠাকুরের একটু প্রসাদ খান। তারপর এক গ্লাশ জল দিলেন। আরও কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে, আপনি যান প্রসাদ খেয়ে আসুন তারপর কথা হবে। একজনকে দিয়ে ভদ্রলোককে খাওয়ার জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। খাওয়া-দাওয়া করার পর তার পেট ভরে গেছে, মনটাও আস্তে আস্তে শান্ত হতে শুরু করল। দূরপাল্লার ট্রেনে বাসে যাচ্ছেন, অনেকক্ষণ খাওয়া যদি না পাওয়া যায় মেজাজটা একটু একটু করে খিটখিটে হতে শুরু করবে। একটা মেয়ে বিয়ে করে তার স্বামীর ঘরে এসেছে, স্বামী সারা জীবন নিজের মাকে ভালোবেসে এসেছে, মেয়েটি চাইছে স্বামীকে মায়ের কাছ থেকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে আসতে, তার নিজের বিবশতা আছে। অন্য দিকে মায়েদের সমস্যা হল, ছেলেকে মানুষ করেছে ঠিকই, কিন্তু ছেলের মন এখন নতুন স্ত্রীর প্রতি গেছে, মায়েরও কিছু বিবশতা আছে। এই বিবশতাকে একবার যদি বিচার করতে যাওয়া হয় তখন দেখে সে সত্যিই অসহায়। দ্বিতীয়টা হল বেশির ভাগ লোকেরই মাথা খারাপ। পুরো মাথা খারাপ যদিও না হয় সেখানেও দেখা যাবে কিছু বিবশতা আছে। যখনই দেখবে সামনের লোকটির বিবশতা আছে তখনই তার প্রতি তার করুণা এসে যাবে। আমরা যে খনন কার্য করছি, চাষবাশ করছি, এগুলো না করলে মানুষ বাঁচতে পারবে না, কিন্তু আবার exploitationও হচ্ছে, সেইজন্য এখন বলা হচ্ছে তোমার যতটুকু দরকার তার বাইরে উৎপাদন করবে না। তার বাইরে যদি নিতে যাও তাহলে তুমি মরবে। ঐ ক্ষতিটা কেন করছে? মাথায় ছিট, ভোগ ঢুকে গেছে, ভোগের বাইরে আসতে পারছে না, সেটাও তার বিবশতা। ঐ বিবশতা পৃথিবী সহ্য করে নেবে কিন্তু কোন মানুষই সহ্য করবে না। মূল জিনিসটা হল, পৃথিবী জানে এরা আমার উপর অনেক উৎপাত করছে, অনেক আঘাত হানছে কারণ এদেরও কিছু বিবশতা আছে। ঠিক তেমনি তোমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে, তার প্রতি কোন আক্রোশ প্রকাশ না করে ধৈর্য ধরে একটু সহ্য করে মেনে নিতে হয়। কারণ তারও কিছু বিবশতা আছে। পৃথিবী থেকে অবধূত এই শিক্ষা পেলেন, শিক্ষা পেয়ে তিনি জীবনে সেটাকে কাজে লাগালেন।

পৃথিবীর মত সব কিছু সবাই সহ্য করতে পারবে না, যদি পারে তাহলে সে মহাপুরুষ। তুমিও পৃথিবীর মত সহনশীল হও, কারণ তোমাকে যে আঘাত দিচ্ছে তারও কিছু অসহায়তা আছে, তার এই অসহায়তা, বিবশতাকে ভেবে তার প্রতি তুমি করুণাশীল হও। আঘাত তোমাকে দুজনই করবে হয় তার বিবশতা আছে আর তা নাহলে মাথা খারাপ। মাথা খারাপ যার তার উপর ক্রোধ করা যায় না, তার থেকে সরে আসতে হয় আর যার বিবশতা আছে তার উপরেও রাগ করে কোন লাভ নেই, তার প্রতি করুণার ভাব। অবধূতের প্রথম গুরু পৃথিবী, যার কাছে তিনি ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা পেলেন। তিনি তাই কারুর উপর রেগে যান না। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চারা হয়ত ঢিল ছুঁড়ছে, তিনি দেখছেন বাচ্চাদের বিবশতা হল মজা পাওয়া, মজা করা। খুব উচ্চ অবস্থায় না পৌঁছালে ধৈর্য আর ক্ষমার ভাব আসে না। আকবরের একটা কাহিনী আছে, একদিন দরবারে বাদশা আকবর বললেন, আমার গোঁফ যদি কেউ টেনে দেয় তার কি শাস্তি পাওয়া উচিৎ? সবাই বলল এক্ষুণি ওর মুণ্ডুটা কেটে ফেলে দিতে হবে। ইতিমধ্যে বীরবল দরবারে এসেছে, বীরবলকেও আকবর বললেন, যদি কেউ আমার গোঁফটা ধরে টেনে দেয় তাকে কি করতে হবে? বীরবল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দিতে হবে। বাদশার গোঁফে হাত লাগাবে কার এমন বুকের পাটা আছে! তাহলে কে গোঁফ টেনেছে? আকবরের নাতি, নাতিকে কোলে নিয়ে খেলছিল, ছোট্ট বাচ্চা কিছু জানে না, দাদুর গোঁফটা ধরে নেড়ে দিয়েছে। বাচ্চার ওটাই খেলার, ওটাই মজার। অবধূত সারা জগতকেই ছোট্ট শিশুর মতন দেখছেন।

অবধূতের প্রথম গুরু পৃথিবীরই আবার দুটো বিকার আছে – পাহাড় ও বৃক্ষ, এরা যেন পৃথিবী থেকেই ফেটে বেরিয়ে আসছে। পাহাড় আর বৃক্ষ এদের অস্তিত্বটাই অপরের জন্য, নিজের জন্য কিছু নেই। বায়োলজিস্টরা বলবেন, কেন বৃক্ষও তো আলো নিচ্ছে, পৃথিবী থেকে জল টানছে। এখানে সেভাবে দেখলে হবে না, কোন জিনিসটাকে বলতে চাইছেন সেটাকে ধারণা করতে হয়। অবধূত হলেন পরমহংস, পরমহংসের বর্ণনা গীতাতেও করছেন, আবার ঠাকুরও বলছেন পরমহংস যেন কামারশালার নেহাই, যতই ওর উপর হাতুড়ি মারো ওর কিছুই হবে না। পরমহংসেরও ঠিক তাই হয়, তাকে যদি কেউ আঘাত করে তাতে তাঁর কিছুই হয় না। গীতায় ভগবান বলছেন *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে*, গুরু দুঃখ, বিরাট দুঃখ এসে গেলেও তিনি বিচলিত হবেন না। এর উল্টোতেও একই হয়, বিরাট কিছু লাভ হয়ে গেল, তাতেও তিনি উৎফুল্ল হন না। নিজেকে তিনি এত বিশাল করে নিয়েছেন যে এর কোনটাই তাঁকে আর বিচলিত করতে পারে না। দত্তাত্রেয় পৃথিবী থেকে যেমন ধৈর্যের শিক্ষা নিয়েছেন, ঠিক তেমনি পাহাড় আর বৃক্ষ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন তোমার যা কিছু কর্মোদ্যম হবে তার সবটাই যেন অপরের মঙ্গল ও কল্যাণে লাগে, তুমি নিজের জন্য কোন কিছু করবে না। পাহাড়ও নিজের জন্য কিছু করে না আর বৃক্ষ লতাদিও নিজের জন্য কিছু করে না, যা কিছু ফুল, ফল, পাতা হয় সব অপরের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। সব মিলিয়ে এই পৃথিবী আর তার বিকার, পাহাড় আর বৃক্ষকে পৃথিবীর বিকার বলা হচ্ছে। পৃথিবীই পাহাড় হয়ে জন্মেছে, পৃথিবীই আবার বৃক্ষ হয়ে জন্ম নেয়। আমাদের ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর, দেখছেন গাছপালা পৃথিবীরই বিকার। একটা বীজ মাটিতে পড়ছে, মাটিতে পড়ে সে পৃথিবী থেকেই তার বেড়ে ওঠার রসদ গ্রহণ করছে। সেটাই আবার আস্তে আস্তে অন্য রূপ ধারণ করে নিচ্ছে। পৃথিবী থেকে ধৈর্য আর পাহাড় ও বৃক্ষ থেকে অপরের সেবা করার শিক্ষা পেলেন।

এই যে এখানে বলছেন, পাহাড় আর বৃক্ষ থেকে আমি শিক্ষা পেলাম জীবনটা অপরের জন্য, সব কিছু অপরকে দিয়ে দেব। কিন্তু তাও তো আমরা অপরকে কোন কিছু দিতে চাই না। কেন অপরকে দিতে চাই না, অপরকে সেবা আমরা কেন করতে চাই না? ঠাকুর আবার বলছেন, এমনই দুষ্ট স্বভাব যে দুপয়সার বাতাসা আনতে বললে চুসতে চুসতে নিয়ে আসে। আবার বলছেন, কেউ যদি বলে এখানে প্রস্বাব করতে সে করবে না, ওর ভয় আছে প্রস্বাব করলে পাছে ওর যদি কিছু লাভ হয়ে যায়! আমরা যে কাউকেই কিছু দিই না তাও ঠিক না, একজন মহিলা যতই কৃপণ হোক, এক সময় নিজের সন্তানকে তো সে দুধ খাইয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল আমরা কিছু কিছু জিনিসকে আঁকড়ে ধরে রাখি। যে জিনিস গুলিকে আমরা আঁকড়ে ধরে রাখি, যেটাকে মনে করছে এটা আমি, এটা আমার, ওই জিনিসটা যখন চলে যায় আমরা কষ্ট পাই, যাতে না চলে যায় তারই জন্য

আমাদের যত লড়াই। মহাপুরুষদের আবার আত্মজ্ঞান ছাড়া কিছু নেই, আত্মা ছাড়া উনি আর কিছুতে অবস্থিত নন। আমরা মনকে এত ছোট করে রেখেছি যে ছোট ছোট জিনিসের সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছি।

আমাদের জীবনে সঙ্গের খুব প্রভাব পড়ে, কার সাথে আমি মেলামেশা করছি, কার সঙ্গ করছি এর একটা প্রভাব আমাদের সবারই জীবনে পড়ে। এখন আমরা দত্তাত্রেয়র সঙ্গ করছি, যিনি একজন তরুণ সন্ন্যাসী, বিদ্বান, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই আলোচনা চলছে, সেইজন্য আমরা এখন তাঁর সঙ্গে আছি। আমরা যদি মহৎ পুরুষদের সাথে চলি তবেই আমরা মহৎ হতে পারব। যদি অতি সাধারণ মানুষদের সাথে ওঠাবসা করি তখন আমরাও অতি সাধারণ মানুষ হয়েই থেকে যাব। ঠাকুর বলছেন সত্তা হরণ করে, হারু খুব ভালো ছেলে কিন্তু ওকে এখন একটা প্রেতনী ধরেছে, হারু এখন আর কিছু করে না, খায় না দায় না শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু শুধু হারু নয়, আমি, আপনি সবাইকে প্রেতনী ধরে রেখেছে। যার সাথে আমরা থাকব সে আমাদের পুরো তেজ হরণ করে নেবে। আমরা মানতে চাইব না, আমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, স্বামী আছে, পাড়া প্রতিবেশী আছে, সবাই এক একটা প্রেতনী। আমাদের বিশ্বাস হবে না ঠিকই কিন্তু এটাই সত্য। ঠাকুরও বলছেন যে যার সঙ্গ করে সে তার সত্তা পায়, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সত্তা পায়, যার অধীনে কাজ করে তার সত্তা পায়। চোখ কান বন্ধ করে জেনে নেওয়া দরকার যে সমাজে শুধু দুষ্ট লোকই আছে। দুষ্ট লোকের একটাই সংজ্ঞা আত্মকেন্দ্রিক, জগতে কাউকেই পাওয়া যাবে না যে আত্মকেন্দ্রিক নয়। অবধূত এটাই বলছেন, পাহাড় আর বৃক্ষের কাছ থেকে শিক্ষা পেলাম, আমার সব কিছু অপরের জন্য, আত্মকেন্দ্রিক নয়। আধ্যাত্মিকতার অর্থই হয় সে আর আত্মকেন্দ্রিত নয় আর এর বিপরীত জাগতিকের অর্থই হল আত্মকেন্দ্রিত। কিন্তু এটাই পরিতাপের যে আত্মকেন্দ্রিক হওয়া মানে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অথচ আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার অর্থ হয় আমি বোধ যখন নিজের শরীর মনকে কেন্দ্র করে চলে।

জাতক কথায় একটা গল্প আছে, বুদ্ধ এক জন্মে একজন শেঠ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। কেউ যদি ভিক্ষায় আসে সেই শেঠ থালায় সুন্দর করে খাবার সাজিয়ে অতিথিকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো। একদিন শেঠের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এক ব্রাহ্মণ এসেছেন, দেবতারা তখন শেঠকে বলছেন সাবধান এরপর আর এগোবে না, এই দেখ নরকের আগুন, এই নরকের আগুনে গিয়ে তুমি পতিত হয়ে যাবে। বোধিসত্ত্ব তখন দেবতাদের বলছেন, আমি দান ধর্মে প্রতিষ্ঠিত স্বর্গে যাওয়ার জন্য নয় আর নরকের ভয়েও নয়। আমি যদি নরকের আগুনেও পড়ে যাই তাও আমি দান ধর্ম থেকে কখনই বিচ্যুত হব না। তিনি এগিয়ে যেতেই দেখেন আর কোন আগুন নেই। পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ইন্দ্র ঐ আগুন তৈরী করেছিল। ধর্ম মানেই তাই, আমার এটা ধর্ম। কেন ধর্ম করছি? কারণ এটাই আমার ধর্ম। আমি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কেন নিচ্ছি? এটাই আমার ধর্ম, প্রাণী মাত্রেরই ধর্ম। আমি দান কেন করছি? এটাই আমার ধর্ম। যদি দান করার পর মনে হয়, এই দান করার পর লোকেরা আমাকে মানুক জানুক, তাহলে ভাই তুমি এই দান করা বন্ধ করে নিজের কাছেই রেখে দাও। যদি মনে কর দান করলে স্বর্গে যাবে, বন্ধ কর দান করা, স্বর্গে যাওয়ার তোমার দরকার নেই, তাতে তুমি অনেক ভালো লোক হবে। নিজের ব্যক্তিত্বের বাইরে কখনই যাবে না, তাতে তুমি আরও বেশি সহজে ভালো মানুষ হবে, ধর্মকে কখনই ছাড়বে না। দত্তাত্রেয় পাহাড় ও বৃক্ষ থেকে এই শিক্ষা নিচ্ছেন, এরা কোন কিছুর বিনিময়ে, কোন কিছুর প্রত্যাশায় নিজেকে অপরের জন্য বিলিয়ে দিচ্ছে না, এটাই তাদের ধর্ম। এখানে দত্তাত্রেয় যে শিক্ষা পাহাড় আর বৃক্ষ থেকে নিচ্ছেন এই শিক্ষা আমরা নিতে পারব না, কারণ সেই প্রস্তুতি আমাদের নেই, যেটাতে আমাদের inner growth হবে সেটা আমাদের নেই। কেউ যখন কারুকে কিছু দেয় সে তখন জানছে যে সে আমার, নিজের জন ছাড়া মানুষ কাউকে দিতে চাইবে না। যে ভক্ত সে জানে কাঙাল, গরীব এরাও ঠাকুরের সন্তান, যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন এই কাঙালী, ভিখারী এরা আমারই আত্মার রূপ। যতক্ষণ এই বোধ না আসে, এরা আমার ভাই, আমারই স্বরূপ ততক্ষণ কাউকে কিছু দিতে পারবে না। যতই আমরা পাহাড় থেকে শিক্ষা নিই, বৃক্ষ থেকে শিক্ষা নিই যতক্ষণ হৃদয় না খুলছে, এই জগতটা আমার, এই বোধ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ পরার্থে জীবন দেওয়া যাবে না। অবধূত শেষে তাই বলছেন *শশ্বৎ পরার্থসর্বেহ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ। সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্।।১১৭/৩৮।।* পর্বত ও বৃক্ষ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে

সমগ্র জীবনটাই অপরের কল্যাণের জন্য বা এদের জন্মই জগতের মঙ্গলের জন্য। সাধু পুরুষদের উচিত যে এই দুজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে পরোপকার করার শিক্ষা গ্রহণ করা।

(২) **বায়ু**

অবধূতের দ্বিতীয় গুরু বায়ু। বায়ুকে অবধূত দুভাবে দেখছেন, অন্তর্বায়ু আর বহির্বায়ু, অর্থাৎ শরীরের ভেতরের বায়ু আর শরীরের বাইরের বায়ু। শরীরের ভেতরের বায়ুকে বলা হয় প্রাণবায়ু, প্রাণবায়ু না বলে শুধু প্রাণও বলা হয় আর শরীরের বাইরের বায়ুকে বায়ু বলা হয়। আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেটাও বায়ু আর যেটা বেরিয়ে আসছে সেটাও বায়ু। বাইরে যে বাতাস সেটাও বায়ু, কিন্তু শরীরের ভেতরে যখন বায়ু যায় তখন সেই বায়ু প্রাণন ক্রিয়া করে, প্রাণন ক্রিয়া মানে জীবনকে সঞ্চালন করা, সেইজন্য এর আলাদা নাম, বলছেন প্রাণ। বায়োলজির শিক্ষক বলবেন বাইরেরটাও বাতাস, ভেতরেরটাও বাতাস। আমাদের কাছে ভেতরের বাতাসটা বাতাস নয়, যখন ইঞ্জিন চলে তখন তার যে একটা ফ্লাই হুইল থাকে সেটাই পুরো ইঞ্জিনকে বা কোন মেশিনকে চালায়, যে বায়ু শরীরের মধ্যে যাচ্ছে এই বায়ুকে আধার করে প্রাণ চলে। প্রাণটাই ক্রিয়াবান হয়, যেখানেই ক্রিয়া সেখানেই প্রাণ, যেখানে ক্রিয়া সেখানে কিন্তু বায়ু নয়। প্রথমের দিকে ইলেক্ট্রন প্রোটন নিয়ে যখন রিসার্চ হত তখন পুরো ভ্যাক্যুম করে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রোটন ছাড়া হত, সেখানে ইলেক্ট্রন প্রোটনের যে মুভমেন্ট হচ্ছে এগুলো সব প্রাণনক্রিয়া কিন্তু সেখানে কোন বায়ু নেই। আমাদের শরীরে বা যে কোন জীবিত প্রাণীর শরীরে যে প্রাণনক্রিয়া চলে সেখানে বায়ু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ ঐ ক্রিয়া বায়ুকে আশ্রয় করে চলে। প্রাণীর শরীরে ক্রিয়া যখন বায়ুকে আশ্রয় করে চলে তখন তাকে বলে প্রাণ, সেইজন্য আমাদের বলা হয় প্রাণী। কিন্তু রেলের ইঞ্জিন যখন চলছে, তার চাকা ঘুরছে, ওটা কিন্তু প্রাণ নয়। প্রাণ সব সময় ব্যবহার হয় জীবিত প্রাণীর প্রাণনক্রিয়াতে, জীবিত প্রাণী ছাড়া প্রাণ শব্দ আসবে না।

অবধূত বলছেন *প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ। জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাঙমনঃ।*।১১/৭/৩৯। শরীরকে প্রাণ একা চালাতে পারে না, শরীর চালানোর জন্য প্রাণকে অন্য কিছুর থেকে সাহায্য নিতে হয়। যে কোন ইঞ্জিন চালানোর জন্য দরকার জ্বালানী, যতক্ষণ জ্বালানী না দেওয়া হবে ইঞ্জিন চলবে না। বিজ্ঞানীরা প্রথমের দিকে perpetual machine তৈরী করার চেষ্টা করতে গিয়েছিলেন, perpetual machineএর concept ছিল একবার চালু কর দিলে মেশিন চলতেই থাকবে, সেখান থেকে যত খুশি এনার্জি বার করতে পারবে। এটাকে নিয়ে পরে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন, অনেক চালাকি করা হয়েছে, কিন্তু পরে গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করে দেওয়া হয় perpetual machine বলে কিছু হতে পারে না। মেশিনে যত এনার্জি দেওয়া হবে তার বেশি সেই মেশিন থেকে কোন দিন কিছু পাওয়া যাবে না, ওর থেকে বরং কমই পাওয়া যাবে আর খুব ভালো হলে সমান সমান পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমান সমান পাওয়াটা সম্ভব হয়নি। একটু কমে যাবে, কারণ transformation যখন হয়, একটা অবস্থা থেকে যখন দ্বিতীয় অবস্থায় যায় তাতে একটু এনার্জি বেরিয়ে যায়। ইদানিং ইলেক্ট্রিসিটিতে সুপার কণ্ডাক্টিভিটি এসেছে, তাতে বিজ্ঞানীরা বলছেন শতকরা একশ ভাগই পাওয়া যাবে। তবে এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ, কিন্তু যেটুকু এনার্জি দেওয়া হবে তার থেকে বেশি কোন দিন পাওয়া যাবে না। যে শরীর চলছে এই শরীর প্রাণনক্রিয়াতে চলছে, তার দরকার আহার। প্রাণ কিন্তু একবারও বিচার করছে না আমরা কি খেয়েছি, প্রাণ শুধু যেটা খেয়েছি ওটাকে টেনে নিজের কাজে লাগিয়ে নেয়।

প্রাণ পাঁচ রকমের, সব কটিকে প্রাণই বলা হয়। এই পাঁচটি প্রাণের নাম প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। আমাদের শাস্ত্রে যে পঞ্চপ্রাণের কথা বলেন এটাই সেই পাঁচটি প্রাণ। এখানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা প্রাণন ক্রিয়া হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এই যে এনার্জি চলছে এটাকেই বলছে **প্রাণ**। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে প্রাণন ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন তার ছাড়া ইলেক্ট্রিসিটি চলবে না, আপনি বলবেন কেন আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায়, ঠিকই, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় চলবে না। আর আমরা হলাম সাধারণ অবস্থার লোক। সাধারণ অবস্থায় যেমন তার ছাড়া ইলেক্ট্রিসিটি

চলবে না, ঠিক তেমনি বায়ু ছাড়া প্রাণ চলে না। কিন্তু প্রাণ আর বায়ু দুটো আলাদা জিনিস। বলে, প্রাণ জিনিসটা ঠিক নাকের ডগায় থাকে, আর কারুর মতে হৃদয়ে থাকে। প্রাণ সব সময় ঊর্ধ্বগামী। যার জন্য মানুষ মারা গেলে আমরা বলি ঊর্ধ্বগামী প্রাণ তার শরীর থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। দ্বিতীয় **অপান**, যে এনার্জিটা শরীরের নীচের দিকে যায় সেটাকে বলে অপান। অপান সচরাচর কোমড়ের নীচের দিকে থাকে। তৃতীয় **ব্যান** শরীরের সব দিকে চলে, সমস্ত শরীরেই ছড়িয়ে আছে। সেইজন্য শরীরের সব কটি অঙ্গে ব্যানের স্থান। যদি দেখা যায় হাতে ফোড়া হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে ব্যান গোলমাল করছে। ব্যান যদি ঠিক থাকে তাহলে ফোড়া হবে না। যোগীরা ইচ্ছাশক্তিতেই ব্যাধি নিরাময় করে নিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তিতে নিরাময় করা মানে ব্যাধির জায়গাতে তাঁরা ব্যান শক্তিকে প্রবাহিত করে দেন। এমনকি চিন্তা তরঙ্গ প্রেরণ করে দূরের মানুষের শারীরিক ব্যাধিকেও সারিয়ে দেওয়া যায়। যাকে সে ভালোবাসে তার শরীরে হয়ত কোন কষ্ট হচ্ছে, সে হয়ত তার থেকে অনেক দূরে আছে, সে যদি ইচ্ছাশক্তিতে মনে মনে চিন্তা করে করে ব্যান শক্তিকে তার শরীরে প্রবাহিত করে দেয়, তাতে শরীরের ব্যাধি আস্তে আস্তে নিরাময় হয়ে যাবে। স্বামীজীও এই জিনিসটাকে নিয়ে গুরুভাইদের চিঠিতে লিখছেন, চিন্তা তরঙ্গ প্রেরণ করেও দূরের মানুষকে ব্যাধি থেকে মুক্ত করা যায়। আর যে ভালোবাসে সেও যদি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে তখন তার ব্যান শক্তি জাগ্রত হয়ে অপরের ব্যাধিকে সারিয়ে দিতে পারে। ছোট সন্তানদের মায়েরা এভাবেই দিনরাত রোগ সারিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চার হাতে বা পায়ে একটু চোট পেয়ে হয়ত ব্যাথা হতেই কাঁদতে শুরু করল, মা দৌড়ে এসে বলছে, দেখি দেখি কি হয়েছে, বলেই একটু ফু ফা করে দিল, বাচ্চা মনে করছে কোন মন্ত্রটন্ত্র দিয়ে সারিয়ে দিচ্ছে। তাতে বাচ্চার মস্তিষ্ক তার ব্যান শক্তিকে চালু করে দেয়। ব্যান শক্তি চালু হয়ে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে ব্যাথাটা কমে যায়। প্রাণিক হিলিং যারা করে তারাও ঠিক এটাই করে। চতুর্থ হল **উদান**, মানুষ যখন মারা যায় তখন উদান বায়ু কাজ করে, উদানের অবস্থান কণ্ঠে। উদানের কাজ হল, মৃত্যুর সময় উদান ভেতরের জীবাত্মাকে নিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। জীবাত্মাকে শরীর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারও একটা শক্তির দরকার, সেই বিশেষ শক্তি হল উদান। উদান বেরিয়ে গেলে প্রাণশক্তি আর কাজ করবে না। শেষ হল **সমান**, সমান মূলতঃ পেটের এলাকায় কাজ করে। খাদ্য হজম করাটা পেটের কাজ, সমানের কাজ হলে খাদ্যের সার অংশকে শোষণ করে শরীরে ছড়িয়ে দেওয়া। অনেকের দেখা যাওয়া খাওয়া-দাওয়া ঠিকই করছে কিন্তু শরীরে খাওয়াটা লাগছে না, তখন বুঝতে হবে সমান বায়ু গোলমাল করছে, তার মানে assimilationটা ঠিক ভাবে হচ্ছে না। এই হল পঞ্চপ্রাণ। এই পঞ্চপ্রাণ দাঁড়িয়ে আছে আহারের উপর, খাওয়া-দাওয়া যদি না করে পঞ্চপ্রাণ আর কাজ করতে পারবে না। পঞ্চপ্রাণ চলে বায়ুর উপর কিন্তু ওদের দরকার এনার্জি সাপ্লাই, এনার্জি সাপ্লাই আসে খাওয়া-দাওয়া থেকে।

কিছু কিছু পণ্ডিত আছেন এনারা আরও পাঁচটি প্রাণের কথা বলেন। এনাদেরটা যোগ করলে দশটি প্রাণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রধান প্রাণ বলতে এই পঞ্চপ্রাণকেই বোঝায়, যে পাঁচটি প্রাণের কথা বলা হল। বাকি পাঁচটি প্রাণের প্রথমটা হল **নাগ**, যখন বমি হয়, বমি করার জন্য একটা শক্তির দরকার, ওনারা সেই শক্তিকে বলছেন নাগ। দ্বিতীয় **কুর্ম**, চোখের পাপড়ি খোলা বন্ধ করার কাজ যে শক্তিতে হয় তাকে বলছেন কুর্ম। অনেক সময় সুন্দর দৃশ্য অবাক হয়ে দেখছে, আমরা বলি, কিরে তোর যে চোখের পাতা পড়ছে না, কুর্মটাও একটা প্রাণ, তার মানে কুর্ম কিছুক্ষণের জন্য কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তৃতীয় হল **ক্রিকল**, ক্রিকল আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক তৈরী করে। মন্দাগ্নি একটা শব্দ আছে, যার খিদে হয় না, তার মানে তার ক্রিকল প্রাণ গোলমাল করছে। আয়ুর্বেদে এই প্রাণ শক্তি গুলিকেই ঠিক করার চেষ্টা করে। চতুর্থের নাম **দেবদত্ত**, দেবদত্ত আমাদের হাই তোলায়। দেবদত্ত প্রাণ আছে বলে আমরা হাই তুলতে পারছি। যদি ঘন ঘন হাই তোলে তাহলে বুঝতে হবে দেবদত্ত প্রাণ খুব সক্রিয় হয়ে গেছে, দেবদত্ত সক্রিয় হওয়া মানে এখন তার ঘুমের দরকার। পঞ্চম ও শেষ হল **ধনঞ্জয়**, সমান যে ভুক্ত খাদ্যকে assimilate করেছে সেটাকে এবার ধনঞ্জয় পোষণ করে। শরীরটা যদি ঝকঝকে সুস্থ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে ধনঞ্জয় প্রাণ কাজ করছে না। মোট এই দশটি প্রাণ, তবে প্রথম পাঁচটাই প্রধান প্রাণ। পরের পাঁচটাকে সবাই মানে না, কিন্তু শাস্ত্রে পরের পাঁচটি প্রাণের কথাও আছে।

এই যে দশটি প্রাণের কথা বলা হল, এদের সবাইকে কাজ করতে হয়। বলছেন এরা কখনই খাওয়া-দাওয়ার বিচার করে না। যে খাওয়াই ভেতরে যাক, সব খাওয়াকেই এরা শক্তিতে রূপান্তরিত করে কাজ করতে থাকে। প্রাণ থেকে অবধূত শিক্ষা পেলেন খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কোন আসক্তি রাখতে নেই। ঠাকুর বলছেন, মানুষ যখন আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে এগোয় তখন তার খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আড়ম্বর থাকে না, একটু ঝোল-ভাত হলেই হয়ে যায়। তার থেকেও মারাত্মক হল, জিহ্বাতে যদি রুচি বা রসবোধ থাকে তাহলে তার বিপদে পড়তে খুব বেশি সময় লাগবে না। একটা প্রচলিত কথাতে বলে, কামজয়ী হওয়া যায় কিন্তু রসনাজয়ী হওয়া যায় না। সেইজন্য বলে জিহ্বা আর জননেন্দ্রিয় এই দুটোকে যিনি জয় করে নিয়েছেন তিনি মহাপুরুষ। তাতেও বলা হয় বয়সের সাথে সাথে জননেন্দ্রিয়ের ইচ্ছাটা কমে যায়, কিন্তু জিহ্বার আকাঙ্খা বয়স হলে আরও বেড়ে যায়। এটাকে আরও বিস্তার করে বলছেন *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, যে কোন কাজ যখন করা হবে, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, ঘুমনো কোন অবস্থাতেই জ্ঞান যেন নাশ না হয়। কালীপদ ঘোষ মদ খেতেন, ঠাকুর তাঁকে মদ খেতে নিষেধ করছেন না, কিন্তু বলছেন, যেটাই খাবে মাকে অর্পণ করে খাবে। তারপরেই বলছেন, পা যেন না টলে। *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, খাওয়া-দাওয়া এমন যেন না হয় যার জন্য তোমার আত্মবিস্মৃতি হয়ে যায়। একবার একজন ভক্ত কোন সাধুকে বলছেন, আপনারা তামাক, সিগারেট কেন সেবন করেন, তামাক সেবনে যদি দোষ না থাকে তাহলে মদ্যপানে কি দোষ? মঠে মদ খাওয়া কেন নিষেধ? স্বামীজী মঠের সাধুদের জন্য নিয়মাবলী তৈরী করেছেন তার মূলটা কি? এর মূলই হল *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, কোন পরিস্থিতিতে যেন তোমার আত্মবিস্মৃতি না হয়। ঠাকুর বলছেন স্বদারা গমনে দোষ নেই। কারণ সেখানে মনের নাশ হয় না, কিন্তু পরকীয়া প্রেমে, অন্যের স্ত্রীর সাথে যদি প্রেম করে তখন তার চিত্তে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, সেখান থেকে তার মনের নাশ হয়ে যাবে আর তার সত্তাকে পুরো হরণ করে নেবে। নিজের স্ত্রীর সাথে থাকলে মনে চাঞ্চল্য আসবে না। খাওয়াটাও যদি লোভে পড়ে বেশি হয়ে যায়, খাবারে ঝাল মশলা বেশি আছে, এই ধরণের কিছু কিছু খাবার আছে, যেগুলো খেলে মনকে নাশ করে দেবে।

প্রাণ থেকে আমি এই শিক্ষা পেলাম, যতটুকু কাজ ততটুকুই করতে হবে, তার বাইরে কখনই না। তার মানে খাওয়া-দাওয়া যেটা হবে সেটা যেন মনকে নাশ করতে না পারে, মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য না আনতে পারে। মঠ মিশনে বিশেষ বিশেষ দিনে একটু অন্য ধরণের কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়, কিন্তু কোন দিন কোন সন্ন্যাসীকে দেখা যাবে না যে, খাওয়া-দাওয়া করার পর খাবার নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু বাইরের লোকেরা এটা পারে না, খাওয়া নিয়ে কত আলোচনা, কত কাহিনী যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। মূল হল মনই সব কিছু, মনে যেন কোন পরিস্থিতিতেই চাঞ্চল্য না আসে, আর *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, জ্ঞানের নাশ যেন না হয়। শুধু খাওয়া-দাওয়ার সাথেই এর সম্পর্ক নেই, সব কিছুতেই দেখতে হবে মনে যেন চাঞ্চল্য না আসে আর জ্ঞানের নাশ যেন না হয়। টাকা যদি বেশি থাকে সেখানেও একই হবে, জ্ঞানের নাশ হয়ে যাবে। সারাক্ষণ এই চিন্তা, কোন ব্যাঙ্কে রাখা যাবে, কত ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে, শেয়ারে লাগালে কি হয়, মিউচাল ফাণ্ডে রাখলে দু বছরেই ভালো রিটার্ন আসবে, মন বনবন করে ঘুরছে তো ঘুরছেই।

রিচার্ড ফাইনম্যান একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। খুব কম বয়সেই তিনি প্রফেসর হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তার বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। খুব মেধাবী ছিলেন। ওনার হঠাৎ একবার মনে হল যেখানে আছেন ওরা মাইনে কম দিচ্ছে। উনি অন্য একটা ইউনিভার্সিটিতে লিখেছেন। এখানে হাজার ডলার করে পাচ্ছিলেন, ওরা সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠাল আমরা বারশ ডলার দেব আপনি চলে আসুন। উনি গিয়ে নিজের প্রধানকে বলেছেন। প্রধান বলে দিলেন, তোমাকে ছাড়াছাড়ি করতে হবে না, আমাদের এখানে যে একবার আসে সে আর ছেড়ে যায় না, ওরা তোমাকে বারশ ডলার দেবে বলছে, ঠিক আছে আমরা তোমাকে পনেরশ ডলার দেব। উনিও ঐ ইউনিভার্সিটিতে লিখে পাঠালেন এরা পনেরশ ডলার দেবে বলছে। ওরাও লিখে পাঠালো, আমরা আপনাকে সতেরশ ডলার দেব। আবার তিনি নিজের ইউনিভার্সিটির প্রধানকে বলেছেন, উনি বলে দিলেন আমরা তোমাকে আঠারোশ ডলার দেব। ফাইনম্যান নিজের বায়োগ্রাফিতে লিখছেন, এই টাকাটা নিয়ে আমি কি করব? নিজেই তখন লিখছেন, নিশ্চয়ই আমি একটি প্রেমিকা রাখব, তাকে একটা বাড়িতে

রাখব, এরপর সারাটা দিন ওর কথা ভাবতে থাকব, সে ঠিকঠাক আছে কিনা, আমার অনুপস্থিতিতে অন্য কাউকে ধরে এনেছে কিনা, সারাদিন ওর কথা চিন্তা করতে করতে আমার যে ফিজিক্সের লেখালেখি, পড়াশোনার কাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ইনি নিজের প্রধানের কাছে গিয়ে বললেন, আমার এক ডলারও বেশি লাগবে না, যা পাচ্ছিলাম তাই থাকবে।

আমাদের দেশে যে পাঁচ হাজার ছয় হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণদের যে আত্মত্যাগ তাতে এটাই ছিল, তুমি বিদ্যার প্রতি সমর্পিত হও। বিদ্যার প্রতি সমর্পিত হওয়া মানে তোমার কাছে যেন পয়সা না থাকে। সেই থেকে ব্রাহ্মণরা এমনই গরীব হয়ে গেলেন যে নিজের স্ত্রী সন্তানকেও ঠিক মত খাওয়াতে পারতেন না। কিন্তু এরই ফলশ্রুতি হল, ব্রাহ্মণরা বিদ্যার প্রতি সমর্পিত থাকতে পেরেছিলেন, *জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত*, জ্ঞানের যেন নাশ না হয়ে যায়। যে কোন জাগতিক জিনিস বেশি থাকলেই জ্ঞানের নাশ হবে, তা সে টাকাই হোক, পোষাক হোক, জমি-জায়গা হোক। কিন্তু এখানে শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বলছেন, খাওয়া-দাওয়াও যদি বিশেষ ভাবে করতে ইচ্ছে হয়, ইদানিং কালে যেমন কিছু হলেই বলবে চলো আজ বাইরে কোন হোটেল রেস্টুরেন্টে ভালো মন্দ খেয়ে আসি, বুঝবেন গোলমাল আছে। যোগী বা সন্ন্যাসী কখনই বলতে পারবেন না যে চলো বাইরে খেয়ে আসি। দত্তাত্রেয় আবার যোগীও নন, উনি পরমহংস, কোন প্রশ্নই উঠবে না। আর কোন কারণে যদি খাওয়া-দাওয়া করতেও হয়, জ্ঞানে চাঞ্চল্য হবে না। এমনিতেও চল্লিশ পেরিয়ে গেলে বেশি খাওয়া-দাওয়াও শরীরের দরকার হয় না। বেশি খাওয়া-দাওয়া করলে হজম করতেও অনেক শক্তি বেরিয়ে যায়। গাড়ির ইঞ্জিনকে স্টার্ট করার জন্য যেমন ব্যাটারি লাগে তেমনি খাওয়া হজম করার জন্য একটা শক্তি লাগে। একটা বয়সের পর মাংস, ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হয়। সাধারণ মানুষের হজম করতেই বেশির ভাগ শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। শরীরের শক্তি যদি খাওয়াতেই ক্ষয় হয়ে যায় এরপর কোন শক্তিতে জপ করবে, ধ্যান করবে, পড়াশোনা করবে, ঈশ্বর চিন্তন করবে, সম্ভবই নয়! খাওয়া-দাওয়াতে গোলমাল পাকালে দ্বিতীয় যেটা হয়, তা হল, প্রথমে বুদ্ধিটা বিকৃত হয় আর বুদ্ধি বিকৃতির সাথে সাথে বাণীতেও বিকৃতি আসা শুরু হয়, তখন আলতু-ফালতু কথা বেরোতে থাকবে। অবধূত এটাকে আটকাচ্ছেন।

শরীরের অভ্যন্তরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে যে প্রাণবায়ু চলছে, শরীরের জন্য যতটুকু প্রাণবায়ুর দরকার সে ততটুকুই গ্রহণ করে। বায়ুর থেকে আমি শিক্ষা নিলাম আমার শরীর ধারণের জন্য, জীবননির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আমাকে এই জগৎ থেকে গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজনের বেশী একটুও রাখতে নেই। আমার নিজেরই শরীরের চারিদিকে এত বাতাস রয়েছে, কিন্তু সে ঠিক ততটুকুই নিচ্ছে যতটুকু শরীরের জন্য দরকার। ঠিক তেমনি জগতে এত কিছু আছে কিন্তু ততটুকুই নিতে হয় যতটুকু আমার দরকার, তার বেশী এতটুকুও নিতে নেই। এই শিক্ষা কে নিয়েছেন? দত্তাত্রেয়। আমাদের সবারই তো শরীর রয়েছে, সেই শরীরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা প্রাণবায়ু চলছে, আমরা কি পারছি প্রাণবায়ুর ধর্মকে লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষা নিতে? পারি না। যদি পারি তাহলে আমরাও মহৎ হয়ে যাব।

এতক্ষণ ভেতরের প্রাণ যে কাজ করে তার কথা বললেন, এবার বাইরের বায়ুকে নিয়ে বলছেন। *বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্মেষু সর্বতঃ। গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ।।*১১/৭/৪০। শরীরের মধ্যে যে প্রাণবায়ু চলছে, তার থেকে কি শিক্ষা পেলেন বলা হল। বাইরে বায়ু থেকে দত্তাত্রেয় কি শিক্ষা পেলেন? বাইরের বায়ু থেকে দত্তাত্রেয় নির্লিপ্ত থাকার শিক্ষা পেলেন। বায়ু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কোন কিছুতেই বায়ু লিপ্ত হয় না। বায়ু সর্বত্র বিচরণ করছে, ভালো জায়গায় যাচ্ছে, মন্দ জায়গায় যাচ্ছে, দুর্গন্ধ যুক্ত জায়গায় যাচ্ছে, সুগন্ধ যুক্ত জায়গায় যাচ্ছে, কিন্তু কোন জায়গার প্রতি সে আসক্ত হয়ে পড়ে না। বায়ু বলে না যে এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে, এই জায়গা ছেড়ে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। বায়ুর মধ্যে কখন দুর্গন্ধ আসছে কখন সুগন্ধ আসছে কিন্তু বায়ু সব সময় নির্বিকার, তার স্বভাব সব সময় অপরিবর্তিতই থাকে। পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকটি তত্ত্বের তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথিবী তত্ত্বের বিশেষত্ব হল গন্ধ। গন্ধ পৃথিবীর গুণ, কিন্তু গন্ধকে বহন করার দায়ীত্ব বায়ুর। গন্ধকে বয়ে নিয়ে যায় কিন্তু তার সঙ্গে বায়ু কোন সম্পর্ক স্থাপন করে না, সে শুদ্ধ পবিত্রই থাকে, গন্ধের গুণ বায়ুকে স্পর্শ করতে পারেনা, অপরের ধর্মকে বায়ু গ্রহণ করে না।

প্রত্যেকটি মানুষের একটা ধর্ম থাকে, প্রত্যেকটি তত্ত্বেরও একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। বায়ু সর্বত্র বিচরণ করছে, সব জায়গাতে তাকে যেতে হয়, যেটা অগ্নিকে যেতে হয় না, জলকে যেতে হয় না। বায়ু যেখানে থাকবে না সেখানেই শেষ, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। আমাদের সবাইকেই অনেক জায়গায় যেতে হয়, ভালো লোকের কাছে যেতে হয়, মন্দ লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, যার সাথেই মেলামেশা করতে যাই তার সাথে আমরা জলের মত মিশে যাই। জল যখন কারুর সাথে মেশে তখন সে তারই আকার ধারণ করে নেয় বা জল তার ধর্মকেই গ্রহণ করে নেয়। বায়ু কখনই কারুর ধর্ম গ্রহণ করে না। বায়ুর ধর্ম হল চলা, বায়ু চলতে থাকে। চলতে চলতে কোথাও বায়ুতে কোন গন্ধ ঢুকে গেল, গন্ধও বায়ুর সাথে চলতে চলতে কিছুটা যাওয়ার পর গন্ধ পড়ে গেল, বায়ু নির্বিকার, সে চলছে। আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি, যেতে যেতে একটা জায়গায় দুর্গন্ধ লাগছে ঠিকই, দূরে চলে গেলে আর দুর্গন্ধ নেই, কারণ বায়ু নির্বিকার। বদ্ধ ঘরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, জানলা দরজা খুলে দেওয়া হল, সব দুর্গন্ধকে বায়ু পরিষ্কার করে দিল, বায়ু কিন্তু নির্বিকার। বক্তব্য হল, যদি নিজের ধর্মে অবস্থিত থাকে, লক্ষ্য যদি পরিষ্কার থাকে, এরপর সে ভালো-মন্দ কোন কিছুর সংস্পর্শে আসছে, লোকজনদের সাথে মেলামেশা করছে, কোন কারণে যদি এদের প্রভাব তার উপর এসেও যায়, তার উপরে এদের আরোপ যদি হয়েও যায়, তাতে কখনই নিজের ধর্ম পরিবর্তন হতে দিতে নেই। সমস্যা হল আমাদের কারুরই জীবনে কোন লক্ষ্য নেই, চলে যাচ্ছে তো চলেই যাচ্ছে। ট্রেনের জন্য আমরা যেমন প্ল্যাটফরমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, কখন চায়ের স্টলের সামনে যাচ্ছি, কখন বইয়ের দোকানে যাচ্ছি, কখন পায়চারি করি, এই দোকানটা দেখছি, সেই দোকানটা দেখছি। মাইকে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকার ঘোষণা হল, চারিদিকে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল, আমরাও জিনিসপত্র গুলি ঠিকঠাক করতে শুরু করি। আমাদের সবারই জীবন এই রকম, একটা ট্রেন, যে ট্রেনের নাম মৃত্যু এক্সপ্রেস। মৃত্যু কখন আসবে আমরা জানি না, মাঝে মাঝে মাইকে ঘোষণা করে গাড়ি দু ঘন্টা দেরীতে চলছে, তখন কি করব, সময় কাটাতে থাকি। সংসারে দশ রকম কাজ কেন করছি? গাড়িটা আসতে দেরী আছে, সময় কাটাতে হবে। তারপর ঢং ঢং করে ঘন্টার আওয়াজ শোনা গেল, ব্লাড সুগার, হার্টে ব্লকেড, এই অসুখ সেই অসুখ, বোঝা গেল এবার ট্রেনটা আসছে, যাওয়ার জন্য তৈরী, তারপর শেষমেশ ট্রেনটা এসে গেল। প্ল্যাটফর্মে অনেক লোক থাকে, যার ট্রেন এসে গেল সে দৌড়াল, ট্রেনে উঠে বেরিয়ে গেল। আমরা সবাই প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করে আছি কখন মৃত্যু এক্সপ্রেস রূপী ট্রেনটা আসবে, এটাই আমাদের জীবন। কেউ হয়ত প্ল্যাটফর্মে এসেছে গীতা প্রেসের স্টল থেকে একটা বই কিনতে, সে বইটা কিনে নিয়ে চলে গেল। এছাড়া প্ল্যাটফর্মের বাকি সবাই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে, যার যার ট্রেন আসবে সে সে বেরিয়ে চলে যাবে। অন্য আর কোন লক্ষ্য নেই। এই পরিস্থিতিতে এদের ধর্মান্তরণ হয়ে যায়, ধর্মান্তরণে যখন যার সাথে আছে তখন তার মত হয়ে যায়। যদি কোন ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলতে থাকে দুদিন পরে তার কথাবার্তা, চালচলনে মেয়েলি স্বভাব এসে যাবে। তার মানে নিজের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। নিজের ধর্ম, নিজের লক্ষ্য যদি পরিষ্কার থাকে তখন এই ধর্মান্তরণটা সহজে হতে পারে না। যাদের একটা লক্ষ্য থাকে, আমি এটাই চাই, এদের চেহারাটাই অন্য রকম হয়। যতক্ষণ লক্ষ্য পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ জীবন কিন্তু কারুরই পাল্টাবে না। আমি আমার শহরের সব থেকে ভালো রাঁধুনি হব, আমার পয়সাকড়ি নেই কিন্তু আমি সব থেকে ভদ্র পোশাকে নিজেকে ফিটফাট রাখব, আমি এই ছোট্ট বই গীতার জ্ঞানকে আয়ত্ত করব, কথামৃতকে ভালো করে আমাকে জানতে হবে, একটা জিনিসকে আমি জানব, আসলে জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু জীবনের লক্ষ্য হয় না। যে কোন বিষয়, বিষয়টা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে, এই কাজের কৌশলটাকে আমি জানতে চাইছি, আমাকে এই কাজে বিশ্বের সেরা হতে হবে। আমরা যে দিনরাত বলছি, আশীর্বাদ করুন আমার যেন ভক্তি হয়, আমি ভক্তি চাই, এগুলো সব আমাদের মুখের কথা। মুখের কথাতে কিছু হয় না। সমস্যার মূল এটাই, প্রথম ও শেষ কথা হল আমাদের জীবনে কোন লক্ষ্য নেই।

বিশ্বের যে কোন ধর্মের যে কোন শাস্ত্রের একটাই কাজ, তোমার যে আমি বোধ, ঠাকুর যাকে বলছেন কাঁচা আমি, এই কাঁচা আমির বোধটাকে সরিয়ে পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত করা। অবধূতের চব্বিশ গুরুর প্রসঙ্গেও ঠিক একই জিনিস করা হচ্ছে। এটা একটা আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকার মাধ্যমে দত্তাত্রেয় দেখাচ্ছেন পাকা আমিটা

কি আর কাঁচা আমিটা কি। কাঁচা আমি মানে আমি শরীর বা আমি মন, এটাকেই বলা হয় আত্মকেন্দ্রিত। আত্মকেন্দ্রিত সবাই, নিজের আমিতে সবাই বসে আছে, একটা ছোট শিশু যার সবে জন্ম হয়েছে সেও আত্মকেন্দ্রিত, শ্রীরামকৃষ্ণও আত্মকেন্দ্রিত, যিনি পরমহংস তিনিও আত্মকেন্দ্রিত, শুধু আত্মার পরিভাষাটা পাল্টাতে থাকে, তাছাড়া আর কিছু হয় না। এখানে অবধূত যে কথাগুলো বলছেন খুবই সাধারণ কথা কিন্তু প্রত্যেকটি কথা অদ্বৈতের স্তর থেকে বলছেন। এর একটি কথাও উপদেশাত্মক নয়। যিনি অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর দেহবোধ নেই, দেহের জন্য যতটুকু আহার দরকার ঐ ততটুকুই আছে। আমি বোধ, যেটাকে অহঙ্কার বলে, সেটাও তাঁর নেই, আমি তুমি বিভেদ বলে কোন কিছু নেই, শুধু আছেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। এই বোধ যাঁর হয়ে গেছে, এই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি আবার জগতে যখন ফেরত আসেন তখন ঐ ভাবটাকে নিয়েই থাকবেন। তবে এগুলো আদর্শ ধর্মগ্রন্থ, এখানে অনেক কিছু জিনিস বোঝা যায় না। কিন্তু ঠাকুরের জীবন, স্বামীজীর জীবন দেখলে বোঝা যায় ব্যবহারিক স্তরে কিছু কিছু তফাৎ থাকে। ঠাকুরেরও নরেন, রাখালের মত কিছু বিশেষ লোক ছিল কিন্তু কারুর প্রতি বিসদৃশ আচরণ নেই, যদি ক্রোধও করেন সেটা তিনি লোকশিক্ষার জন্যই করেন। ঠাকুর যে খাওয়া-দাওয়া করছেন সেটাও লোকশিক্ষার জন্য। কথামৃতে বর্ণনা আছে, ঠাকুর একটা জায়গায় গেছেন, সেখানে যারা আছে সবাই অল্প বয়সের, তাদের আগেকার লোকজনরা কেউ আর নেই, তারা অনেক কিছু জানে না, ঠাকুরের যে সেবা হয়নি সেদিকে কারও খেয়াল নেই, সেখানে ঠাকুর খবার চেয়ে পাঠাচ্ছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে ঠাকুর এটা কি করছেন! কিন্তু তা নয়, ঠাকুর তাদের মঙ্গলের জন্য চেয়ে পাঠাচ্ছেন, তিনি খেলে এদের মঙ্গল হবে। এনাদের যা কিছু সবই অপরের মঙ্গলের জন্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটাও যে নিচ্ছেন সেটাও অপরের মঙ্গলের জন্য।

(৩) আকাশ

অবধূতের তৃতীয় গুরু আকাশ। আকাশ হল সব থেকে সূক্ষ্ম ভূত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু সূক্ষ্ম অণু আছে তার মধ্যে আকাশ সূক্ষ্মতম অণু। আকাশকে ইংরেজী করে বলা হয় sapce। Space বলতে আমরা যেটা আয়তন মনে করি, জিনিসটা কিন্তু তা নয়। এই ধারণাটা, আমাদের যাঁরা দার্শনিক ছিলেন তাঁরাও পরিষ্কার বুঝতেন না বলে অনেক গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন। আমরাও প্রথমের দিকে মনে করতাম আকাশ মানে মাথার উপর যে নীল আকাশ, বৃহৎ আকাশ ইত্যাদি, কিন্তু তা নয়, আকাশ মানে সূক্ষ্মতম অণু। সৃষ্টি যখন হয় তখন সৃষ্টিতে যেটা finest particle সেটা হল আকাশ। আকাশ যেমনি এল একটা বস্তু এসে গেল, বস্তু এসে গেল সেইজন্য স্থান এসে গেল। সেইজন্য স্থানকেও আকাশ বলে আর সূক্ষ্মতম জিনিসটাকেও আকাশ বলে। সূক্ষ্মতম জিনিস যত বাড়বে আয়তন বা স্থানও তত বাড়বে। আর আকাশ যখন নিজের সাথে নিজে মিলতে শুরু করে, সেখান থেকে পর পর এক একটা তত্ত্ব বেরোতে শুরু হয়ে যায়, যেমন উপনিষদে বলছেন, *আকাশ আকাশাদ্বায়ু*, আকাশ থেকে বায়ু ইত্যাদি। আকাশ পার্টিকেলস্ যদি চলে যায় তাহলে স্পেস থাকবে না। আকাশ পার্টিকেলটাই স্পেস, এটাই আবার ম্যাটেরিয়াল। আগেকার দিনে এগুলো বোঝা যেত না, বর্তমানে ফিজিক্সের থিয়োরী আসাতে এগুলো বোঝা যাচ্ছে। বিগ ব্যাঙ যখন হয় তখন ঠিক তাই হয়। বিগ ব্যাঙের আগে স্পেস নেই, বিগ ব্যাঙের আগে ম্যাটেরিয়াল নেই। বিগ ব্যাঙে যখন বস্তু তৈরী হয় তখন স্পেসও তৈরী হয়, স্পেস আর বস্তু এক সঙ্গে চলে। কারণ স্পেসও যা বস্তুও তাই। বস্তু ঠিকই কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইলেক্ট্রন প্রোটনের থেকেও সূক্ষ্মতম। আকাশ ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই, কারণ আকাশই বায়ু হয়েছে, অগ্নি হয়েছে, জল হয়েছে, পৃথিবী হয়েছে। আর সব কিছু মিলে এই বোতল হয়েছে, বোতলের জল হয়েছে, মাইক্রোফোন হয়েছে, মাইক্রোফোনের তার হয়েছে। আমরা যে জলতত্ত্ব বলছি সেটা এই জল নয়, পৃথিবীতত্ত্ব মানে এই পৃথিবী নয়, এগুলো এক একটা তত্ত্ব, finest particle। আকাশের ক্ষেত্রে কি হয়, যেখানেই আকাশ সেখানেই স্পেস, যেখানেই স্পেস সেখানেই সৃষ্টি। সৃষ্টি, স্পেস ও আকাশ এই তিনটে এক সঙ্গে চলে। যেখানে আকাশ নেই সেখানে সৃষ্টি নেই, যেখানে আকাশ আছে সেখানেই সৃষ্টি আছে বা যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই আকাশ। আকাশ তত্ত্বকে ধারণা করতে আমাদের অবশ্যই অনেক সময় লাগবে, কিন্তু এমন বিরাট কিছু জটিলও নয়। যেমন এই গ্লাশ আছে, গ্লাশের বাইরে আকাশ, গ্লাশের ভেতরে আকাশ আর গ্লাশ নিজেও আকাশ। উপমা কি রকম, একটা

কাপড় টাঙানো আছে, কাপড়ে একটা ভারী কিছু রেখে দেওয়া হল, কাপড়টা ওখানে ঝুলে গেল, তার মানে একটা স্পেস তৈরী হয়ে গেল। আকাশ জিনিসটা যেন তাই, যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, তাঁর যে জায়গাতে আকাশ এসে গেল সেই জায়গাতে যেন সৃষ্টি এসে গেল। সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু সচ্চিদানন্দের যে জায়গাতে আকাশ পার্টিকেলস্ এসে গেলে সেই জায়গাতেই সৃষ্টির খেলা শুরু হয়ে গেল। যেখানেই সৃষ্টি এসে গেল সেখানেই আকাশ এসে গেল সেখানে পৃথিবী নাও থাকতে পারে কিন্তু আকাশকে থাকতেই হবে। কল্পনা করার জন্য আমরা ধরে নিলাম এই ঘর জুড়ে একটা বিশাল প্লাস্টিক টাঙানো হয়েছে আর তাতে কিছু লোহার বল বা পাথর যদি ফেলে দেওয়া হয় তখন প্লাস্টিকের কয়েকটা জায়গা ঝুলে যাবে। এবার যদি আমরা পুরো প্লাস্টিকটাকে সচ্চিদানন্দ মনে করি, আর সচ্চিদানন্দের যে জায়গাটা ঝুলে যাচ্ছে ঐ জায়গাটায় আকাশ পার্টিকেলস এসে গেছে, ওটা সৃষ্টি রচনা করার জন্য প্রস্তুত। তাহলে ব্রহ্মাণ্ড এখন কটা হতে পারে? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হবে। আর যদি প্লাস্টিকের উপর থেকে তিন চারটে লোহার বলকে তুলে নেওয়া হয় তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না যা ছিল তাই থাকবে। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই যেন কখন আকাশ হয়ে যান। কিন্তু সচ্চিদানন্দ আকাশ কি করে হন কেউ জানে না। সেইজন্য কেউ ওটাকে বলে মায়া, কেউ বলে শক্তি, কেউ বলে প্রকৃতি আর কেউ বলে তাঁর ইচ্ছা বা তাঁর লীলা। যিনিই সচ্চিদানন্দ তিনিই কোথাও কোথাও যেন স্থূল হয়ে যান। যখন স্থূল হতে শুরু করেন তখন প্রথম তিনি যে আকারটা নেন সেটাই আকাশ। আকাশ তাই সূক্ষ্মতম, এমনকি দুটো পার্টিকেলসের মধ্যে যে স্পেস আছে সেখানেও আকাশ আছে, আকাশ এত সূক্ষ্মতম।

আত্মা ভৌতিক জিনিস নয়, আত্মা আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম। যেখানে আকাশ নেই সেখানেও আত্মা আর আকাশের ভেতরে যে স্পেস সেখানেও আত্মা আছেন। কোন কারণে দুটো আকাশ পার্টিকেলসের মাঝখানে যদি একটু স্পেস থাকে সেখানেও আত্মা থাকবেন। আকাশের ভেতরেও আত্মা, আকাশটাও আত্মা। যদি আত্মাকে কেউ না মানে তাকে আকাশ জিনিসটাকে মানতেই হবে। কেউ আত্মা না মানতে পারে, আকাশ না মানতে পারে, কিন্তু ফিজিক্স পড়ে থাকলে তাকে ইলেক্ট্রন প্রোটন মানতেই হবে। এটাও কিছুটা ঐ ধরণের। এখন আত্মাকে যদি বুঝতে হয়, ভৌতিক জগতে আত্মা জিনিসটা কি যদি কেউ জানতে চায় তখন তার সব থেকে কাছের উপমা হল আকাশ। এই শরীরটাও আত্মা, শরীরের ভেতরেও আত্মা, শরীরের বাইরেও আত্মা, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। এটাকে বোঝার জন্য খুব ভালো উপমা হল, একটা বরফের গ্লাশ বানানো হল, এবার একটা বড় বালতি নেওয়া হল, তাতে জল দিয়ে ভর্তি করা হল, এবার ঐ বরফের গ্লাশটাকে তাতে চুবিয়ে দেওয়া হল। গ্লাশের বাইরে জল, গ্লাশের ভেতরে জল আর গ্লাশটাও জল। এই জগতটা বাস্তবিকই তাই, এর ভেতরেও আত্মা, বাইরেও আত্মা আর যেটা আছে ওটাও আত্মা।

এবার দত্তাত্রেয় তাঁর তৃতীয় গুরুর কথা বলতে গিয়ে বলছেন, হে রাজন্! স্থাবর জঙ্গম ব্যতিরেকে ঘটে-পটে দৃশ্য এবং পদার্থ সমুদয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হলেও বস্তুত আকাশ এক, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। ঠিক তেমনি *অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজোঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন। ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্নভস্তং বিততস্য ভাবয়েৎ।।*১১/৭/৪২। জগতে যা কিছু আছে, সচল অচল যাই থাকুক, এই গ্লাশ, বোতল, আমাদের সবার শরীর, সব কিছুর কারণও আলাদা, আমরা জানি ঘোড়ার বাচ্চা ঘোড়া হয়, মানুষের বাচ্চা মানুষ হয়, এক একটা কারণে এক একটা জিনিসের সৃষ্টি হয় আর সূক্ষ্ম হোক স্থূল হোক যাই হোক সব কিছুর ভেতরে আত্মা ওতপ্রোত হয়ে সমান ভাবে ব্যপ্ত। বস্তুর বাইরেও ব্যপ্ত ভেতরেও ব্যপ্ত। ঠিক তেমনি যিনি সাধক তিনি সব সময় সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে চিন্তা করবেন সচ্চিদানন্দ আকাশের মত সর্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছেন। এই জগতে ভালো লোক, মন্দ লোক, সজ্জন সাধু লোক সবার মধ্যে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই বিরাজ করছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। মুক্তোর মালাতে যে সুত্র সব মুক্তোকে ধরে রেখেছে সেখানে সুত্রটা অসঙ্গ, সুত্রটা নির্লিপ্ত। বলছেন, আমি সেই আকাশ বা আমি সেই আত্মা, দুটোর মধ্যে একটা মনে করতে হয়। যদি আত্মবুদ্ধিতে মনে করা হয় তখন আত্মা সর্বব্যাপী সব জায়গায় আছেন আর ভৌতিক দৃষ্টিতে যদি আকাশবুদ্ধি করা হয় তখনও সব জায়গাতেই আছে। সর্বব্যাপী অথচ নিঃসঙ্গ। আকাশ সব কিছুতেই আছে ভালোতে আছে মন্দতে আছে, আকাশে কত কিছুই না অবিরত হয়ে চলেছে, মেঘ আসছে, বজ্রপাত হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ফসল হচ্ছে, ফসলের

বিনাশ হয়ে যাচ্ছে, এত কিছুর হওয়ার পরেও আকাশ কিন্তু অসংলগ্ন, নির্লিপ্তই থাকে, আকাশের দৃষ্টিতে এর কোন কিছুরই যেন কোন অস্তিত্ব নেই। আবার আকাশকে কাটতে পারে না, আকাশকে কেউ পোড়াতে পারে না, আকাশকে কেউ খণ্ডিত করতে পারে না, আকাশকে কেউ কিছু করতে পারে না, আকাশ যেমন আকাশ তেমন। আর আকাশের পেছনেও রয়েছেন আত্মা, আত্মা আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম, তাঁকে কে কি করবে! একটা জিনিসকে ধরার জন্য তার থেকে ছোট জিনিসের দরকার পড়ে। বড় জিনিস দিয়ে ছোটকে মাপা যায় না, ছোট দিয়ে বড়কে মাপা হয়। আত্মা সূক্ষ্ম নয়, আমরা যে সূক্ষ্মতম বলি এটা একটা শব্দ মাত্র। কারণ আত্মা কোন ভৌতিক জিনিস নয়। সেইজন্য মনে করতে হয়, এই যা কিছু দেখছি, যেমন মালার ভেতর দিয়ে সুতো যাচ্ছে ঠিক তেমনি আত্মা সব কিছুর ভেতরে আছেন। এই বোতলের ভেতরে সেই আত্মা, বোতলের ভেতরে যে জল সেই জলের মধ্যেও সেই আত্মা, জলের মধ্যে যে পার্টিকেলস আছে তার ভেতরেও সেই আত্মা, আর ঐ পার্টিকেলসের ভেতরে যে হাইড্রোজেন এ্যটম আছে তার ভেতরেও আত্মা আছেন, আর এ্যটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন আছে তার ভেতরেও সেই আত্মা, অথচ আত্মা নির্লিপ্ত। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে মিশলে জল হয়, হাইড্রোজেনের সাথে কার্বন মিশলে মিথেন হয়, তাতেও আত্মাতে কোন পরিবর্তন হয় না। ঠিক তেমনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই কালের চক্রে অগণিত নাম-রূপের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রূপ খেলা হয়ে চলেছে কিন্তু তাতে আত্মার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এই যে অবধূত বলছেন আকাশের ভাব আরোপ করতে, সত্যিই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দক্ষিণেশ্বরের কাছে কৃষ্ণকিশোর থাকতেন, ঠাকুর তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। কৃষ্ণকিশোর নিজেকে আকাশবৎ ভাবতেন, বলতেন আমি খ। আমাদের বেদে বলে কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, খ মানে আকাশ। কিন্তু যখন ট্যাক্সওয়ালা ট্যাক্স নিতে এসেছে তখন কৃষ্ণকিশোরের মাথায় চিন্তা ঢুকে গেছে, ট্যাক্স আদায় না করতে পারলে ঘটি বাটি নিয়ে টানাটানি হবে, তখন আর নিজেকে খ ভাবতে পারছেন না। আমাদের এটাই সমস্যা, ঠাকুর বলছেন টিয়া পাখি এমনি সময় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছে, কিন্তু বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। কিন্তু যখন আমি ভাবছি আমি আকাশবৎ, যা হবার হবে, দেখা যাবে, আমি মরে যাব, ঠিক আছে মরে যাব, কষ্ট হবে, খাওয়া পাবো না, পাবো না, তাতে কি হবে। কিছুক্ষণের জন্যও যদি এই ভাবকে ধরে রাখা যায় আমাদের একটা বিরাট শক্তি দেবে। গীতায় এই কথাই ভগবান বলছেন, *স্বল্পমপস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*, একটু যদি এর অভ্যাস করা হয় তাতেই মহৎ ভয়ের নাশ হয়। সাধারণ লোক পারবে না, এখানে সাধারণ লোকের কথা হচ্ছে না, এখানে উচ্চতম অবস্থার কথা বলছেন। তাই বলে যারা উচ্চতম নয়, তারা করবে কি করবে না, অবশ্যই করবে। যেটা ওনারা চব্বিশ ঘন্টা, সারা জীবনের জন্য করছেন, আমরা কিছুক্ষণের জন্য করব। অবধূত বলছেন, তোমাকে অত বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যত ভাবতে হবে না, তুমি নির্বিকার, যেমন আকাশ এই মেঘে ঢেকে গেল, মেঘ সরে গিয়ে আবার সূর্য এসে যাবে, আকাশ নির্বিকার।

(৪) জল

অবধূত এবার তাঁর চতুর্থ গুরুর কথা বলছেন, *স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্যস্তীর্থভূর্ণনাম্। মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রোমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ।।* ১১/৭/৪৪। চতুর্থ গুরু জল। জলও একটা তত্ত্ব, জল থেকে আমি কি শিক্ষা পেলাম? জল *স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ*, প্রকৃতি মানে স্বভাব, জল স্বভাবেই স্বচ্ছ। আমরা যে বলি নোনতা জল, মিষ্টি জল, নোংরা জল, নোনতা, মিষ্টি, নোংরা এগুলো জলের মধ্যে বাইরে থেকে আসে, প্রকৃতিগত ভাবে জল স্বচ্ছ, স্বচ্ছতা জলের স্বাভাবিক গুণ। যার জন্য মনুস্মৃতিতে শুদ্ধিকরণের যে যে উপায়ের কথা বলা হয়েছে সেখানে জলকে একটা শুদ্ধিকরণের উপায় বলে মানা হয়েছে। যে কটি তত্ত্ব আছে, এই তত্ত্বগুলি শুদ্ধির কাজে লাগে, যেমন মাটি শুদ্ধির কাজে লাগে, বায়ু শুদ্ধির কাজে লাগে, অগ্নি দিয়েও শুদ্ধি করা হয়। স্বচ্ছতার সাথে জলের আরেকটি স্বভাব হল জল স্নিগ্ধ, আর মাধুর্য, জল পান করার পর আমাদের প্রাণ শীতল হয়, একটা তৃপ্তির ভাব আসে, এটাই জলের মাধুর্য। আর *তীর্থভূর্ণনাম্*, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদাদি তীর্থের যদি নাম উচ্চারণ করা হয়, যদি দর্শন করা হয় বা স্পর্শ করা হয় মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। প্রথম হল স্বচ্ছ, পরিষ্কার করে, দ্বিতীয় স্নিগ্ধ, শীতল করে আবার পবিত্র করে। ঠিক সেই রকম *মুনিঃ পুনাত্যপাং*, যে কোন মুনির স্বভাব জলের মত হতে হবে। জলের যে যে গুণ সব গুণ যেন প্রত্যেকটি সাধুর মধ্যে থাকে। ভেতর থেকে একেবারে শুদ্ধ, ভেতর

থেকে একেবারে স্নিগ্ধ। আমরা যে religious harmony, শান্তিবার্তাদি করতে চাইছি, কিন্তু তোমার ভেতরে স্নিগ্ধতা নেই তুমি কি শান্তিবার্তা করবে! শান্তি আগে তোমার ভেতরে থাকতে হবে, তবেই তুমি অপরকে শান্তি দিতে পারবে। জল পান করে মানুষের যেমন তৃপ্তি হয়, ঠিক তেমনি যিনি মুনি তাঁর কথা মিষ্ট হবে, কখন কটু কথা বলবেন না, যে শুনবে তারই প্রাণ শীতল হয়ে যাবে। শুধু মুনি নয়, যিনিই সাধনার পথে এগোচ্ছেন, তিনি কখনই কটূ কথা বলবেন না। কিন্তু শেষে আরও দামী কথা বলছেন, *পুনাত্যপাং*, পাবন অর্থাৎ পবিত্র করেন। পবিত্র কিভাবে করেন? *ঈক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ, ঈক্ষঃ*, দৃষ্টি দিয়ে, স্পর্শন করলে আর নাম উচ্চারণ করলে। যিনি মুনি তাঁর এমন উচ্চমানের পবিত্রতা হবে যে, তাঁকে দর্শন করলেই মানুষ পবিত্র হয়ে যাবে, তাঁকে কেউ স্পর্শ করলে সে পবিত্র হয়ে যাবে আর তাঁর নাম উচ্চারণ করলেও পবিত্র হয়ে যাবে।

জল নিয়ে এখানে যে কটি গুণের কথা বললেন, এগুলোকে পালন করা খুব সহজ, পালন করলে সবারই মঙ্গল। এমন স্বচ্ছ যে নোংরা ভাব নিয়ে যারা তাঁর কাছে আসছে তার নোংরা ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। দ্বিতীয় এমন স্নিগ্ধ যে আপনার সাথে দু মিনিট কথা বললে তার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। তৃতীয় মাধুর্য, শ্রীমা বলছেন, খোঁড়াকে দেখে খোঁড়া বলতে নেই, বলতে হয় তোমার পাটি অমন মোড়া হল কি করে? এই তিনটে হল ভালো মানুষের গুণ। কিন্তু সাধু পুরুষ, মুনিদের একটা চতুর্থ বিশেষত্ব থাকে, একজন ভালো লোক আর একজন সাধুর মধ্যে একটা তফাৎ থাকে। ভালো লোক মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, মুনি ত্রিগুণাতীত বা ত্রিগুণাতীত হওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রথম তিনটে স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ আর মাধুর্য যে কোন লোকের মধ্যে থাকা দরকার। কিন্তু যিনি সাধু, যিনি সন্ন্যাসী তাঁর মধ্যে চতুর্থ একটা জিনিস থাকে, সেটা হল *পুনাতি*, পবিত্র করেন। কিভাবে? *দর্শনাৎ*, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একজনের দিকে দৃষ্টি যেতেই বলে উঠল, এইরে কার মুখ দেখে বেরোচ্ছি, নির্ঘাৎ আজকের দিনটা খারাপ যাবে, এটা যেন না হয়। মানুষের মধ্যে এমন সৎ গুণ থাকবে যাতে লোকে দেখে বলবে, সকালবেলাই এনার দর্শন হয়েছে, দিনটা আজকে খুব ভালো যাবে। *স্পর্শনাৎ*, তাঁকে প্রণাম করল, বা আলিঙ্গন করল, সে বলবে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম, সাধুদের প্রণাম করার মূল ভাব এটাই, তিনি এমনই পবিত্র যে তাঁর চরণ স্পর্শ করে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম।

একবার একজন সাধুকে অদ্বৈত আশ্রম থেকে বেলুড় মঠে কোন কাজে সকাল ছটার সময় যেতে হয়েছিল। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তখন অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রেসিডেন্ট মহারাজের কোয়ার্টারেও যাওয়ার ছিল। তিনি গেছেন, ভাবলেন প্রেসিডেন্ট মহারাজকে প্রণাম করবেন। মহারাজের সেক্রেটারী বললেন, আজকে দীক্ষা আছে, মহারাজ মন্দিরে গেছেন, মন্দির থেকে ফিরে গাড়ি থেকে নামলে তুমি প্রণাম করে নিও। সন্ন্যাসীকে আবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, তাই তিনি মন্দিরের দিকেই গেলেন। উনি মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখছেন মহারাজ মন্দির থেকে নেমে আসছেন, কাছে আসার পর মহারাজকে দেখে সন্ন্যাসী অবাক হয়ে গেছেন, তাঁর মনে হচ্ছে পবিত্রতার এক জীবন্ত বিগ্রহ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই পবিত্রতা দিয়ে তিনি একটু পরেই কয়েকজনকে ঠাকুরের চরণে সমর্পিত করতে যাচ্ছেন। সন্ন্যাসীর মনে হল ওনাকে যদি আমি এখন স্পর্শ করি তাহলে কাঁচের শিশিতে রাখা গঙ্গাজলে এক ফোঁটা কালি ঢেলে দিলে যা হবে, মহারাজেরও যেন তাই হয়ে যাবে। ড্রাইভার মহারাজকে প্রণাম করল, ভেতর থেকে সন্ন্যাসী আঁতকে উঠছেন, হে ভগবান! কেন মহারাজকে প্রণাম করছেন। মহারাজ সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে এক গাল হাসি দিয়ে বলছেন, আরে এত সকাল সকাল তুমি এখানে কি করে এলে? তখন সন্ন্যাসীর ঐ ভাবটা ভেঙে গেল। তারপর তিনি মহারাজকে রাস্থায় হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলেন, তাও অনেক ভয়ে ভয়ে। মহারাজ যদি তাঁর সাথে কথা না বলতেন তাহলে হয়ত তাঁর প্রণাম করাই হত না। এই ঘটনা সেই সন্ন্যাসী পঁচিশ বছর ধরে তাঁর মনের মণিকোঠায় সযত্নে লালন পালন করছেন। এটাই এখানে বলছেন, যিনি মুনি হবেন তিনি সবাইকে পবিত্র করে দেবেন। কিভাবে? *দর্শনাৎ*, তাঁকে দর্শন করে মানুষ পবিত্র হয়ে যাবে। *স্পর্শনাৎ*, তাঁকে স্পর্শ করে পবিত্র হয়ে যাবে। আর শেষে বলছেন, তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু ঠাকুরের কথা বলা হচ্ছে না, ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করলে পবিত্র হবেই জানা কথা। এখানে মুনির কথা বলছেন, দত্তাত্রেয় নিজের কথা বলছেন। মুনিকে এই ব্যাপারে খুব

সচেতন থাকতে হবে, আমাকে এমনই পবিত্র হতে হবে যে, আমার নাম যদি একবার উচ্চারণ করে বা মনে মনে ভাবে তাতেই সে পবিত্র হয়ে যাবে।

জলের অনেক রকম স্বভাবের কথা বলা যেতে পারে, যে পাত্রে জল ঢালা হবে জল সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু এখানে জলের এই স্বভাবের কথা বলছেন না। জলের যে ঠিক ঠিক ধর্ম তা হল স্নিগ্ধ ও পবিত্র করা। খাওয়া-দাওয়ার পর হাতটা জলে ধৌত করে নিচ্ছে। আবার গঙ্গার জল একটু ছিটিয়ে দিলে সব কিছু পবিত্র হয়ে যায়। গঙ্গার নাম তিনবার উচ্চারণ করলেও পবিত্র হয়ে যায়। দত্তাত্রেয় বলছেন আমি জল থেকে এই শিক্ষা পেলাম, যিনি সাধক হবেন তাঁর স্বভাব এমন হবে – শুদ্ধ, স্নিগ্ধ, মধুরভাষী আর লোকপাবন। লোকপাবনের অর্থ হল, যারাই তাঁর নাম করবে সে মনে করবে আমি তাঁর নাম করে ধন্য, পবিত্র ও পরিপূর্ণ হয়ে গেলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ভাইঝি নলিনীদির মাথায় একটু গোলমাল ছিল। রাত্রে নোংরা কিছুতে নলিনীদির পা পড়েছে। তিনি এখন নিজেকে অশুদ্ধ মনে করতে শুরু করেছেন। এত রাত্রে কি করে শুদ্ধ হওয়া যাবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। মাকে বলতে মা তাকে অনেক কিছুই করতে বললেন। কিন্তু কোনটাই তার মনঃপূত হচ্ছে না। নলিনীদি এখন ঠিক করেছে রাত্রে স্নান করে নিজেকে পবিত্র করে নেবে। মা যেটাই বলছেন সব তাতেই বলছেন ওতে কি শুদ্ধ হব? শেষে মা বলছেন 'ঠিক আছে আমাকে ছুঁয়ে নে তাহলে শুদ্ধ হয়ে যাবি'। দত্তাত্রেয় বলছেন সাধক এমন হবে লোকে তাঁর নাম নিলেই যেন নিজেকে মনে করে পবিত্র হয়ে গেলাম। পবিত্রতার ব্যাপারে গীতা বলছে যখনই শুদ্ধ অশুদ্ধের ব্যাপারে সন্দেহ হয় তখন ওঁ তৎ সৎ বললেই সব সংশয় নিরসন হয়ে যায়। কেউ গ্লাশে জল এনে দিয়েছে কিংবা কোন খাবার এনে হাতে দিয়েছে, বসার জন্য আসন বা শোওয়ার জন্য বিছানা দেওয়া হয়েছে, এই আসন বা বিছানা আগে কে না কে ব্যবহার করেছে, এই সব ভেবে মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করতে থাকে। তখন একবার ওঁ তৎ সৎ বলে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে সব পবিত্র হয়ে যাবে। যদি গঙ্গাজল না থাকে শুধু ওঁ তৎ সৎ বললেও শুদ্ধ হয়ে যাবে। এগুলো সবই ভগবানের নাম। কিন্তু এখানে বলছেন সাধকের নামে। সাধক এমনই শুদ্ধ পবিত্র হবেন যে তাঁর মুখনিঃসৃত কথা শুনলেই মানুষের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে আর তাঁর নাম নিলেই মনে করবে আমি পবিত্র হয়ে গেলাম।

(৫) অগ্নি

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে অগ্নিও একটি তত্ত্ব। দত্তাত্রেয় বলছেন হে রাজন্ অগ্নিও আমার একজন গুরু। অগ্নি থেকে কি শিক্ষা নিয়েছেন? *তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ। সর্বভক্ষোঽপি মুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ।*।১১/৭/৪৫। অগ্নি নিজেই প্রচণ্ড তেজস্বী ও দীপ্তিমান। জগতের কোন তেজই অগ্নিকে দাবাতে পারেনা। তার সাথে মজার ব্যাপার হল, অগ্নি কোন কিছুই সংগ্রহ করে না। যা কিছু আছে সব নিজের পেটের মধ্যে রেখে দেয়। সব কিছু নেওয়ার পর সেগুলোর দোষগুণের সাথে অগ্নি লিপ্ত হয় না। অগ্নিতে যা কিছুই আমরা দিই না কেন অগ্নি কোন কিছুতেই দূষিত হয় না। উল্টে অগ্নি সব কিছুকে শোধন করে দেয়। সেইজন্য বলা হয় তপস্যা করলে তপস্যার অগ্নি ভেতরে যত পাপ আছে সব পাপকে শোধন করে দেয়।

অগ্নি যেমন তেজস্বী, মুনি যিনি তিনিও তেজস্বী হবেন। তেজকে আচার্য বলছেন প্রাগলভ, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন চামড়ার চমক নয়, ক্রিম পাউডার মেখে, বিউটিপার্লারে গিয়ে ঘষে মেজে চামড়াকে ঝক ঝকে করা নয়, চোখ মুখ আর চেহারা দেখেই বোঝা যাবে যে এর মধ্যে তেজ আছে, চেহারাটা জ্যোতির্ময় হবে, দীপ্ত হবে। আর বলছেন *দুর্ধর্ষঃ*, দুর্ধর্ষ মানে তাকে এই জগতে কেউ দাবাতে পারে না, অগ্নির যা তেজ ঐ তেজের সামনে যেমন কেউ দাঁড়াতে পারে না। দত্তাত্রেয় নিজের কথা বলছেন, অগ্নির কাছে থেকে শিক্ষা নিলাম, আমার তেজটাও আগুনের মত হবে। আর বলছেন *উদরভাজনঃ*, যতটুকু পাবে ততটুকুই খাবে আর কিছু অবশিষ্ট রাখবে না। অগ্নিকে যা দেওয়া হবে সব খেয়ে নেবে, পরে কি খাবে তার কোন চিন্তা অগ্নি করে না। উত্তরকাশীতে সাধুর তপস্যায় যান, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় সাধুদের ভিক্ষা দেওয়া হয়। ভিক্ষাতে কোথাও ডাল, রুটি কোথাও অন্ন ডাল, সেটাও আবার সকাল নটার মধ্যেই বিতরণ করা হয়ে যায়। সাধুরা একটা থালা নিয়ে যান, ওখানেই খেয়ে নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে থালাটা মাটি দিয়ে মেজে ঘরে ঢুকে জপধ্যানে বসে যান।

সারাদিন কি খাবেন না খাবেন কোন চিন্তা করেন না। গৃহস্থরা এটা পারবে না, কারণ গৃহস্থদের সঞ্চয় করতে হয়। সন্ন্যাসীর ধর্ম গৃহস্থদের জন্য নয়। কিন্তু লোভের একটা সীমা রাখতে হয়। সন্ন্যাসীর আদর্শ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, এইসব আদর্শের কথা শুনলে জানলে ভেতরে একটা উৎসাহ হয়। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগ করতে সাহস পায়। ষোল আনা ত্যাগ কি রকম, অগ্নির মত, অগ্নিকে যা দিল খেয়ে নিল, রাখারাখির কোন বালাই নেই।

সর্বভক্ষোঽপি, অগ্নি সব কিছুকে ভক্ষণ করে নেয়, কোন বাছবিচার নেই, মল, মুত্র যা দিয়ে দেওয়া হোক অগ্নি সব কিছুকেই ভস্ম করে দেবে আবার ঘি তেল দিয়ে দিলে সেটাও খেয়ে নেবে। কিন্তু অগ্নি কারুর স্বভাবকে গ্রহণ করবে না, অগ্নির যে স্বভাব তেজস্বীতা, দীপ্তিমান, দুর্ধর্ষ, জ্যোতির্ময় এই স্বভাব থেকে অগ্নি কখনই বিচ্যুত হয় না। ঠিক তেমনি যিনি সাধক, তিনি জগতে সর্বত্র বিচরণ করবেন, সবারই সাথে মিশবেন, কিন্তু কোন স্থান বা কোন ব্যক্তির কোন দোষকে তিনি গ্রহণ করবেন না। স্বামীজী বলছেন, শিক্ষক কি রকম হবেন, তিনি যাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের টেনে উপরে নিয়ে চলে আসবেন। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষকই যাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তার স্তরে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি ওখানেই থেকে যান, ওখান থেকে আর উপরে আসা হয় না। এগুলো আসলে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকার একটা ঈপ্সা। যেখানে মানুষ নিজেকে একা মনে করে, নিজেকে অসহায় মনে করে, তাদের এই সমস্যা হয়। হয়ত তাদের মধ্যে অনেক ভালো ভালো গুণ আছে, তার জন্য সে চাইছে আমাকে লোকেরা একটু জানুক মানুক। আমাকে মানুক এই ইচ্ছার জন্য তখন তারা কি করে? এক পাল বাছুর আছে সেখানে একটা ষাঁড় ঢুকে গেছে, বাছুররা দেখছে এ আমাদের থেকে বিরাট বড়। ষাঁড় এখন নিজের শিঙ ভেঙে নিয়েছে যাতে বাছুরের মত হওয়া যায়। শিঙ ভাঙলেই কি বাছুরের মত হয়ে যাবে! ষাঁড় যে সে ষাঁড়ই থাকবে, বাছুর বাছুর থাকবে। এই জিনিসটাকে আমাদের বুঝে নিতে হবে, আমি সবার থাকে আলাদা, মিশব সবারই সাথে কিন্তু আমি জানব আমি এদের সাথে এক নয়। শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের সাথে বেশি মেশামেশি করে ছাত্ররা ভাবে ইনি আমাদের মতই একজন। ঠিক তেমনি সন্ন্যাসী যদি গৃহীদের সাথে বেশি মেলামেশা করে ভক্তরা মনে করে ইনিও আমাদের মতই একজন, বেশির ভাগ ভক্তের কাঁচা মন কিনা। মিলিটারিতে ট্রেনিংএর সময় বলেই দেওয়া হয় কক্ষণ তোমরা জনসাধারণের সাথে বাসে ট্রেনে যাতায়াত করবে না। আইএএস, আইপিএস অফিসাররা কখনই সাধারণ লোকেদের সাথে মিশবেন না। সাধারণ লোক যেখানে যাতায়াত করে তুমি যদি সেখানে চলার সময় সাবধান না থাকো, ওদের গুণ তোমার উপর আসবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না, সেইজন্য এড়িয়ে চলতে হয়। আগুন সবাইকে গ্রহণ করে নিজের মধ্যে গ্রাস করে নিচ্ছে কিন্তু আগুন তার স্বভাবকে কখনই ছাড়ছে না, তার তেজ, তার দীপ্তি, তার দুর্ধর্ষতা কখনই কমে যাবে না। ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয় জগতে সব কিছুই গ্রহণ করবে, খাবে-দাবে, চলাফেরা করবে, গান-বাজনা শুনবে সবই করবে কিন্তু যারা তোমার কাছে আসবে তারা জানবে এ আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা। ঠাকুর নিজের শিষ্যদের সাথে ফষ্টিনষ্টি সবই করছেন, কিন্তু সবাই জানে ইনি আমাদের থেকে আলাদা। ইনি আমাদেরই মত একজন এই বোধ কোন পরিস্থিতিতেই মুনি হতে দেবেন না, দত্তাত্রেয় এই শিক্ষা অগ্নি থেকে পেলেন।

দত্তাত্রেয় আবার বলছেন, অগ্নির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অগ্নি কখন কোথাও প্রকট থাকে কোথাও আবার অপ্রকট থাকে। যেমন কাঠ, কাঠের মধ্যে অগ্নি অপ্রকট হয়ে আছে। ঠিক তেমনি সাধকও প্রয়োজনে কোথাও নিজেকে গুপ্ত আবার কোথাও ব্যক্ত রাখবে। কোথায় যোগী নিজেকে প্রকাশ করেন? যারা কল্যাণকামী, যারা সত্যিকারের নিজের আধ্যাত্মিক বিকাশ চায়, শুভ চাইছে তাদের কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন যাতে তারা যেন তাঁর উপাসনা করতে পারে। যেমন অরণি মন্থন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। মুনি যাদের সাথে মেলামেশা করছেন তিনি তাদের অতীত আর ভবিষ্যতের অশুভ জিনিস গুলোকে নাশ করে দেন, বিশেষ করে তাদের কোন জিনিস বা অন্নাদি যখন গ্রহণ করেন। যেমন যখন যজ্ঞ করা হয় তখন অগ্নি যজমানের যা কিছু অশুভ আছে সব নাশ করে দেয়, ঠিক তেমনি যিনি মুনি, তাঁর তেজ এমন জ্বলজ্বল করে, তিনি যে লোকটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন তার অতীত আর ভবিষ্যতের যে পাপরাশি সঞ্চিত হয়ে আছে সবটাকে ভস্ম করে দেন।

আর অন্যান্য জায়গায় তিনি নিজেকে গুপ্ত রাখেন, নিজের শক্তি, তেজকে কখনই প্রকাশ করবেন না, যেমন কাঠের মধ্যে যে অগ্নি আছে সেই অগ্নি নিজেকে সেখানে গুপ্ত রাখে।

এখানে প্রথম যে পাঁচজন গুরুর নাম করা হল এদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এই পাঁচটি সৃষ্টিতত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব। মনুস্মৃতি বলছে এই পাঁচটি হল পবিত্রকারীর মূল উপাদান। মানুষকে পবিত্র করার শেষ পদার্থ হল এই পাঁচটি – আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। এখানে এই পাঁচটিকে তত্ত্ব রূপে দেখানো হচ্ছে না, স্থূল রূপেই দেখানো হয়েছে। দত্তাত্রেয় এই পাঁচটি পদার্থ থেকে পাঁচ রকমের শিক্ষা নিয়েছেন।

(৬) **চন্দ্রমা**

অবধূতের ষষ্ঠ গুরু চন্দ্রমা। *বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ। কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা।। কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ। নিত্যাবপি ন দৃশ্যতে আত্মনোহগ্নের্যথার্চিষাম্।।**১১/৭/৪৮-৪৯**।।* অমবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চাঁদের কলা বৃদ্ধি পায় আবার পূর্ণিমা থেকে অমবস্যা পর্যন্ত কলা হ্রাস হতে থাকে। চন্দ্রমা কখনই এক অবস্থায় থাকে না, হ্রাস-বৃদ্ধি সব সময় হয়েই চলেছে। কিন্তু চন্দ্রমা চন্দ্রমাই, তার আসল সত্তার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। ঠিক তেমনি আমার জন্ম হয়েছে, আমি বড় হচ্ছি, একটা সময় আমার মৃত্যু হবে। আমার সব কিছু বাড়ছে কমছে, কিন্তু আমি আমিই, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আত্মার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, কোন বিকার নেই, আত্মার কোন পরিবর্তন নেই। আমরা নিজেদের দেহ, মন, বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম করে রেখে এদের ধর্মের সাথে আমি কখন হাসছি, কখন কাঁদছি। কিন্তু আমি তো তা নই, আমার আসল স্বরূপের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। আমি কে? আমি সেই নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। চন্দ্রমার কাছে থেকে আমি এই শিক্ষা পেলাম, চন্দ্রমার যা কিছু পরিবর্তন হোক না কেন, চন্দ্রমা চন্দ্রমাই থাকে। আমি হলাম সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার যা কিছু পরিবর্তন সব এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির, এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। দত্তাত্রেয় বলছেন, কালের প্রবাহে জলস্রোতের মত প্রাণী শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ সমানে হয়ে চলেছে কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই যে কালের প্রবাহ, বিজ্ঞানে এর একটা বড় সমস্যা আছে, একটা জিনিসের continuity থাকে নাকি quantum থাকে? Quantum মানে জিনিসটা চলছে, চলতে চলতে হঠাৎ দুম্ করে উপরে চলে গেল। সাধারণ মন এটাকে মেনে নিতে পারে না। যেমন এই টেবিলের উপর একটা ফোন রাখা আছে, হঠাৎ ফোনটা চলে গেলে ছাদে। ছাদে যদি যায় তাকে একটা পথ দিয়ে যেতে হবে, তার মানে একটা নৈরন্তর্য আছে। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে তা হয় না। যাঁরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের জন্ম দিয়েছেন, যাঁরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তাঁরাও কোয়ান্টাম ফিজিক্স ঠিক ঠিক বোঝেন না কিনা অনেকের সন্দেহ। সাধারণ বুদ্ধি আমাদের কি বলবে? এখানে আমার কাছে একটা কলম আছে, হঠাৎ দেখা গেলে কলমটা আরেকজনের কাছে চলে গেল। কলমটা অন্যের কাছে কিভাবে যাবে? নিশ্চয়ই একটা পথ দিয়ে যাবে। কিন্তু কোয়ান্টাম ফিজিক্সে তা হয় না, এখানে আছে দুম করে ওখানে চলে যাবে। কি করে হয় জানা নেই, কিন্তু থিয়োরেটিক্যালিও তাই হয় প্র্যাক্টিক্যালিও তাই হয়। আমাদের মন কিন্তু কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মতই চলে, মন এই এখানে আছে দুম করে চাঁদে চলে গেল, তবে মন লম্বা পথ নেয় না। কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে এই রকম কিছু হয় না। সেইজন্য লোকেরা কেউ কোয়ান্টাম ফিজিক্স বোঝে না। অথচ আমাদের জীবনে একটা এমন কিছু নেই যেটাকে আমরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের মত দেখি না। আমাদের জীবনে এমন একটি জিনিসও নেই যেটা paradigm shiftএর মত দেখি না, paradigm shift মানেই জিনিসটা এখানে আছে দুম্ করে ওখানে চলে গেল, কিন্তু মাঝখানের পথে তাকে দেখা যাবে না। কিছু নিশ্চয়ই আছে, দুম্ করে তো চলে যাবে না, যেমন বলা হয় যদি একটা ইলেক্ট্রনকে ছাড়া হয়, যাওয়ার সময় ইলেক্ট্রন বস্তু না থেকে এনার্জি হয়ে ছড়িয়ে যায়, তারপর একটা জায়গায় গিয়ে আবার জুড়ে যায়, সেইজন্য মাঝখানে তাকে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা কত কিছু বলছেন, আমরা তার কোন কিছু আদৌ জানি না, বুঝি না, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে কোয়ন্টাম ফিজিক্সের এই নিয়মকে সব সময় মেনে

চলছি। সাধারণ ভাবে আমরা দেখছি যে আমাদের জীবনে একটা নৈরন্তর্য আছে, কিন্তু জীবনে মানছি কোয়ান্টাম, paradigm shiftএর মত, দুম্ করে হয়ে যাওয়াকে। একটা বিচিত্র কিছু হওয়া, একটা চমৎকারিত্ব হওয়া এটাই আমরা মানি। যেমন আমি বললাম আমার খিদে পেয়ে গেছে, খিদে তো চট করে পায় না, তিল তিল করে খিদে হতে থাকে কিন্তু হঠাৎ দুম্ করে লাফিয়ে বলে দিলাম আমার খিদে পেয়ে গেছে। এর থেকে আরও জঘন্য হল কেউ মারা গেলে আমরা বলি, তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। আবার বন্ধুত্বের হানিকে নিয়ে বলি, সে হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিল, আমাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না। হঠাৎ কিছুই হয় না, ওর বিয়ে হয়েছে, নতুন স্ত্রীকে নিয়ে আনন্দ করছে, মনটা আমার থেকে ঘুরে অন্য দিকে চলে গেছে। বিয়েটা কি হঠাৎ একদিনেই হয়ে গেল? না, তার পেছনে কত প্রস্তুতি আছে, কালের প্রবাহে সে বড় হয়েছে, কালের প্রবাহে ওর বাবা-মার ইচ্ছে হয়েছে ছেলেকে বিয়ে দিতে হবে, কালের প্রবাহে বিয়ে হল, বিয়ে তো দুম্ করে হয় যায়নি। কিন্তু আমি দেখছি দুম্ করে হয়েছে, আগে আমার কাছে কত আসত এখন আর আসে না। মৃত্যুটা আরও বেশি, আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি জিনে টেলিরোম নামে একটা জেনেটিক পদার্থ আছে, টেলিরোম আয়ুর সাথে সেট করা আছে, আয়ু কমার সাথে সাথে ওটাও ছোট হতে থাকে। টেলিরোমকে মেপে যদি দেখা হয় কি রেটে ছোট হচ্ছে, তাহলে বলে দেওয়া যাবে লোকটি কবে মারা যাবে। মানুষের মৃত্যু জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে না, টেলিরোমের কমে যাওয়ার উপর নির্ভর করে। তাহলে মৃত্যু কি মানুষের দুম্ করে হচ্ছে? আমরা কেন বলছি তিনি হঠাৎ মারা গেলেন? দুম্ করে কিছু হয়নি, মৃত্যুটাও তিল তিল করে হচ্ছিল। কিভাবে হচ্ছিল? কালের প্রবাহে। অবধূত ঠিক এই শিক্ষা নিলেন, তিনি রোজ রাত্রে দেখছেন চন্দ্রমার হ্রাস হচ্ছে আবার একটা দিন থেকে বাড়তে থাকছে। হঠাৎ একদিন বললাম ছেলেটা কত বড় হয়ে গেল। কিন্তু ছেলে কি একদিনেই বড় হয়ে গেল। আমরা সাধারণ ভাষায় এই ধরণের কথা ব্যবহার করি ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ কিছু নেই, সবই তিল তিল করে কালের প্রবাহে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর নিজের নামে বলছেন, লোকেরা উপর থেকে পাথর বসানো মেঝেটাই দেখে, কিন্তু এর ভেতরে কত কি হয়েছে সেটাকে কেউ দেখে না।

অবধূত বলছেন, আত্মা হলেন নিত্য আর আত্মার উপর যে শরীর এই শরীরের উপর কালের প্রবাহ চলছে। কালের প্রবাহের জন্য কিছু জিনিস বাড়ছে, কিছু জিনিস কমছে আর এই কমা বাড়াটা ক্রমাগত হয়ে চলেছে, এর মধ্যে একটা নৈরন্তর্য আছে। অবস্থার নিরন্তর পরিবর্তন হয়ে চলেছে। বাস্তবে চন্দ্রমা যেমন থাকার তেমনই থাকে। চন্দ্রমা যে পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরছে আর পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, কালের প্রবাহে ঘুরছে। কিন্তু যে জিনিসটার কোন পরিবর্তন নেই, চন্দ্রমা তো আসলে কোন সময়েই কমে যাচ্ছে না, আর বেড়েও যাচ্ছে না, চন্দ্রমা চন্দ্রমাই আছে, অথচ দেখাচ্ছে পূর্ণিমা থেকে অমবস্যা পর্যন্ত কমতে থাকে আর অমবস্যা থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত বাড়তে থাকে। ঠিক তেমনি আমার আসল আমিটা কমেও না বাড়েও না অথচ দেখছি আমার মধ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তাহলে কি বলা যাবে যে মারা গেছে সে যেখানে ছিল সেখানেই আছে? মুর্খরাই এভাবে কথা বলে। কারুর শরীর চলে গেছে, তার বাড়ির লোককে গিয়ে কি কেউ বলবে, তার কিছু হয়নি, সে শুদ্ধ আত্মা, আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। আমাদের কাছে এগুলো সব মুখের কথা, যাঁরা খুব উচ্চমানের তাঁরাই এই কথা বলতে পারেন। তাঁরা নিজে আগে উপলব্ধি করেন, তারপর নিজের জীবনে যখন নামান তখন তাঁদের দেখে মানুষ শেখে। যখন দেখবে কারুর মৃত্যুতে সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন শোকের ছাপ নেই, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরোচ্ছে না, তখন তারা চিন্তা করবে মৃত্যুকে সন্ন্যাসীরা কিভাবে দেখেন। কোন সন্ন্যাসী মারা গেলে অন্য সন্ন্যাসী ভাইয়েরা তাঁকে কাঁধে তুলে আনন্দে গান করতে করতে শ্মশানে নিয়ে যান। অনেক আগে বেলুড় মঠে এক নাপিত ছিল, ইউপি থেকে এসেছিল। একদিন এক বৃদ্ধ সাধু দেহ রেখেছেন, তাঁর মাথাটা কামিয়ে দিতে বলা হল, কোন রকমে সে কামিয়ে দিয়েছে। তারপর দেখে সাধুরা ঘাড়ে করে তাঁকে গান করতে করতে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। ঐ দৃশ্য দেখে সে নাপিত খুড় কাঁচি সব গঙ্গায় ফেলে ইউপি পালিয়ে গেল, এরা মানুষ না রাক্ষস! নিজের গ্রামে দেখেছে রামনাম সৎ হ্যায়, হরিবোল বলে সবাই কান্নাকাটি করতে করতে মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যেতে আর এখানে সাধু মরেছে তাকে নতুন জামা কাপড় পড়িয়ে সবাই আনন্দ করতে করতে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ যখন দেখবে সাধুরা মৃত্যুকে

এভাবে নেন তখন নিজেদের মধ্যে একটু বল আসে। সাধুদের যদি একশ পয়সার বল হয় তাহলে সাধারণ মানুষের এক পয়সার বল আসবে। আপনজনদের সাথে সাধুদের দেহের সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু সংসারীদের আপনজনদের সাথে দেহের সম্বন্ধ হয়ে যায়, সেইজন্য সংসারীদের কষ্ট হয়। তবে এই কষ্টেরও লাঘব করা যায়, আর সেইজন্যই এইসব শাস্ত্র পড়া। ধর্মের এটাই কাজ, শোক আর মোহ যে মানুষকে ভেঙে চুরমার করে দেবে, ধর্ম সেটা হতে দেয় না। বলছেন, চন্দ্রমাকে দেখে এই শিক্ষা পেলাম, চন্দ্রমা চন্দ্রমা, কালের গতিতে যে তার হ্রাস বৃদ্ধি হয় সেটা মিথ্যা, ঠিক তেমনি আত্মা রূপে আমি হলাম নিত্য আর দেহ রূপে আমার বৃদ্ধি হচ্ছে আর ক্ষয় হচ্ছে।

উনপঞ্চাশ নম্বর শ্লোকে বৌদ্ধের একটা প্রভাব পাওয়া যায়। দীপ শিখা যখন জ্বলে তখন শিখাকে নিরন্তর দেখায়, অথচ ফোটা ফোটা করে তেল জ্বলে যাচ্ছে, এটাই আমাদের এক নৈরন্তর্যের ভাব দিচ্ছে। উপনিষদে একটা শব্দ আসে আলাদ্, একটা জ্বলন্ত কাঠ বা মশালকে যদি খুব জোরে ঘোরান হয়, দূর থেকে মশালকে একটা আগুনের বৃত্ত দেখাবে। অথচ একটা জিনিসই ঘুরছে, আগুন নিভিয়ে দিলে আর কিছু থাকবে না। দীপা শিখা ক্রমাগত ঘুরছে কিন্তু দেখাচ্ছে যেন পুরো একটা বৃত্ত। ঠিক তেমনি আমাদের শরীরের অনবরত পরিবর্তন হয়ে চলেছে, অথচ আমরা মনে করছি দেহটা নিত্য, জন্ম থেকে ঐ একই দেহ চলছে। বায়োলজিতেও বলছে, শরীরের অনবরত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আর রোজ যে খাওয়া-দাওয়া করা হচ্ছে তাতে অনবরত নতুন নতুন সেল তৈরী হয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের ভাব দেহটা নিত্য, এটাই আশ্চর্যের, এটাই মায়া। অবধূত বলছেন, চন্দ্রমাকে দেখে আমার এই বোধ এসে গেল, চন্দ্রমা বাড়েও না কমেও না অথচ কালের প্রবাহে আমরা তার অনবরত একবার ক্ষয় হতে দেখছি আবার তার বৃদ্ধি হতে দেখছি, ঠিক তেমনি আমার আত্মা, আমার আসল আমিটা নিত্য, কিন্তু দেহ যেটাকে আমার আসল আমি মনে করছি, দেখায় কমছে বাড়ছে। কমছে বাড়ছে যদিও নেওয়া হয় তাতেও কোন দোষ নেই কিন্তু কালের প্রবাহে জিনিসটা যে টানা চলছে, এই জিনিসটাকে ধরতে পারা। আর বায়োলজির দিক থেকেও যদি দেখা হয় তারা বলবে টেলেরোম কমে যাচ্ছে, জ্যোতিষীরা বলবে তার এতটা আয়ু নির্ধারিত ছিল, প্রাচীন জ্যোতিষিরা বলবে অমুক অমুক গ্রহের সব যোগ ছিল তাই শরীর চলে গেছে। যেটাই বলা হোক, কোনটাতেই দুঃখ করার কিছু নেই।

গীতায় ভগবান বলছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*। অর্জুন বলছেন, পিতামহ ভীষ্ম যিনি কোলে পিঠে করে স্নেহ দিয়ে আমাদের বড় করেছেন তাঁর মৃত্যুতে কি আমি শোক করব না? যে আচার্যের কাছে আমি শিক্ষা পেয়েছি, তিনি মারা গেলে কি আমার শোক হবে না? নিশ্চয়ই শোক করতে যদি এনারা ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে যেতেন। ধর্ম থেকে যদি মানুষের পতন হয়ে যায় তখন তার জন্য শোক করতে হয়, কিন্তু মৃত্যুর জন্য কিসের শোক, মৃত্যু তো কালের প্রবাহে হচ্ছে। এনারা স্বধর্ম পালন করে যুদ্ধে মারা গেলে শোক করার কি আছে! চন্দ্রমা থেকে তুমি শিক্ষা নাও, কালের প্রবাহে সব কিছু হচ্ছে, তিল তিল করে পাল্টাচ্ছে, সেইজন্য হঠাৎ করে কিছু একটা হয়ে গেল এভাবে ভাবতে নেই।

(৭) সূর্য

যে কোন জিনিষের আমি নিজের মত একটা ব্যাখ্যা করে নিতে পারি। এখানে দত্তাত্রেয় কি ভাবে দেখছেন সেটাই আমরা আলোচনা করছি। অথবা যিনি ভাগবত রচনা করেছেন তিনি এই জিনিসগুলোকে যে ভাবে দেখেছেন, সেটাকেই ছন্দোবদ্ধ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এগুলো থেকে যে এভাবেই শিক্ষা নিতে হবে তা নয়, আরও পাঁচ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু দত্তাত্রেয় একজন বড় যোগী পুরুষ, যোগে অবস্থান করে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখছেন, আমরাও যদি সেইভাবে গ্রহণ করে মনন করি তাহলে আমারাও যে যোগী হতে পারব না কে বলতে পারে। যেমন দত্তাত্রেয়র সপ্তম গুরু হলেন সূর্য। সূর্য থেকে তিনি কি শিক্ষা পেলেন? *গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি। ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ।। বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ। লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽকর্ষবৎ।*১১/৭/৫০-৫১। চন্দ্রমা থেকে অবধূত *নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*, এই ভাবটা নিচ্ছেন, কিন্তু সূর্য থেকে তিনি খুব উদ্ভট শিক্ষা নিচ্ছেন। সূর্য তাঁর প্রখর রশ্মি

দ্বারা ধরিত্রীর বুক থেকে তার জলরাশিকে আকর্ষণ করে আকাশে তুলে নিয়ে আসে এবং উপযুক্ত সময়ে সেই জলরাশিকে বৃষ্টি রূপে বর্ষিত করে ধরিত্রীকে শীতল করে দেয়। ঋষিরা সব কিছুকে অনেক গভীরে নিয়ে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন, প্রকৃতির অনেক কিছুই তাঁরা জানতেন। ঋষিরা জানতেন সমুদ্র বৃষ্টি বর্ষণ করছে না, সূর্যই জল টেনে নিয়ে মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, যা কিছু হয় সূর্যের জন্যই সব কিছু হয়। আসলে ত্যাগের মাহাত্ম্যটা দেখাতে হবে, তাই সূর্যকেই বেছে নিলেন। সুর্য যেমন পৃথিবীর বুক থেকে জল শুষে নিচ্ছে, আর ঠিক সময় হলে বৃষ্টি রূপে বর্ষণ করে সেই জল ত্যাগ করে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি যোগী যখন যেমন দরকার হবে ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়কে গ্রহণ করবে আর ঠিক সময়ে সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে দেবে। যেমন যোগীকে খাদ্য গ্রহণ করতে হচ্ছে, খাওয়া হয়ে গেল তাঁর মন থেকে খাওয়াটা নেমে গেল। কি খেয়েছি, কি খাইনি তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। কোন দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল, তিনি তাকিয়ে দেখলেন, তারপরেই সেই দৃশ্য তাঁর মন থেকে হারিয়ে গেল। কোথাও কোন আসক্তি নেই। সূর্য জলকে আকর্ষণ করে নিজের কাছে রেখে দেয় না, ঠিক সময়ে সেই জলকে ত্যাগ করে দেয়। দত্তাত্রেয় সূর্য থেকে এই ত্যাগের শিক্ষা পেলেন।

ঠাকুরের সাধনার সময়কার কত সব কাহিনী আছে। ঠাকুর অজ গ্রামের অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন, ভোগ কি জিনিস জীবনে দেখেননি। সাধনার সময় তাঁর মনে নানান রকম ভাবনা উঠছে, রূপার গড়গড়াতে হুকো খাওয়ার ভাবনা উঠল। মথুর বাবু আনিয়ে দিলেন। বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ ফিরে টানছেন আরেকবার ওপাশ ফিরে টানছেন, তারপর বলছেন মন এর নাম রূপোর গড়গড়াতে তামাক খাওয়া, ওখানেই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। প্রায়ই একটা কথা বলা হয়, গৃহস্থরা ত্যাগ করে যাতে আরও ভোগ করতে পারে, সাধুরা ভোগ করে যাতে আরও ত্যাগ করতে পারে। দেখা যাবে বিয়ের কদিন পর মেয়েটি বাপের বাড়ি চলে গেল, কেন গেল, যাতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসাটা আরও বাড়ে, একদিন হয়ত উপোস করল, কেন করল, যাতে আগামী দিন আরও ভালো করে খেতে পারে। সাধুদের ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়, সাধুরা ভোগ করেন যাতে ত্যাগ করতে পারে। অনেক আগে চেরাপুঞ্জী আশ্রমে একজন মহারাজ ছিলেন, ওনার খুব শখ ছিল এ্যারোপ্লেনে চাপবেন। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, আর কদিন পরই দেহ রাখবেন, তাঁর ইচ্ছাপূর্ণ করার জন্য গৌহাটি থেকে ওনাকে প্লেনে নিয়ে আসা হয়েছিল, ঐ একবারই জীবনে প্লেনে চাপলেন। সাধুরাও বাচ্চাদের মত, একটা বাই উঠতেও যতক্ষণ চলে যেতেও ততক্ষণ। সূর্যও ঠিক তাই, যখন টানে পুরো জলকে টেনে তুলে নেয় আর যখন সময় হয় তখন পুরো জলটাই ছেড়ে দেয়, তার মানে কোন কিছুতেই তার আসক্তি হয় না।

ভগবান বুদ্ধও ত্যাগের শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু অন্য ভাবে। তিনি পর পর তিন দিন জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে বিমর্ষ হয়ে গেলেন। পরের দিন তিনি একজন সন্ন্যাসীকে দেখলেন। ইনি কে? ইনি সর্বস্ব ত্যাগ করে আনন্দের উৎসের দিকে যাত্রা করেছেন। ভগবান বুদ্ধ দেখলেন জগৎ তো জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নয়। সন্ন্যাসী এই জগৎকেই ত্যাগ করে দিয়ে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির পারের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ত্যাগ ছাড়া শাশ্বত আনন্দ ও চিরস্থায়ী শান্তি আসবে না। ভগবান বুদ্ধ এইভাবে শিক্ষা পেলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাপ্রতিষ্ঠানে আমরা সবাই যাচ্ছি, সেখানে এই চারটে জিনিস একসাথে দেখছি, রোগী দেখছি, বৃদ্ধ দেখছি, মৃত্যুও দেখছি আবার মঠের সন্ন্যাসীদেরও দেখছি। আমাদের মনের মধ্যে বৈরাগ্য আসছে না, ত্যাগের ভাবও জন্মাচ্ছে না। ঠিক তেমনি দত্তাত্রেয় এগুলো দেখেছেন, দেখে নিজের মত একটা ভাবকে গ্রহণ করে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নিজের মত কি করে হয়? শেষমেশ নিজের মনই গুরু রূপে সব দেখিয়ে দেন। আমাদের মন এখন বিষয়রসে সিক্ত, কিন্তু এগুলো শুনে রাখতে হয়। শুনতে শুনতে একটা সময় যখন মন ধীর স্থির হয়ে শান্ত হবে তখন আমরাও অনেক কিছু দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারব। একজন বলল – ভাই, আমার মা-বাবার ঝগড়া দেখে দাম্পত্য জীবনের শিক্ষা হয়ে গেছে, আমি আর বিয়ে করছি না। ছোটখাট অনেক ঘটনা বা দৃশ্য আমাদের অনেকের জীবনকে পাল্ট দেয়। কিন্তু তাই বলে সবার জীবন পাল্টায় না। নেতারা, আইএএস অফিসাররা চুরি করে ধরা পড়ার পর জেলে যাচ্ছে, কিন্তু চুরিতো বন্ধ হচ্ছে না। বাকিরা মনে করছে এরা বোকা ছিল তাই ধরা পড়েছে।

কিন্তু এনারা হলেন যোগী পুরুষ, এনাদের বুদ্ধি প্রচণ্ড প্রখর ও জাগ্রত। ঠাকুর কথামৃতে আধ্যাত্মিক উচ্চ তত্ত্বগুলিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট জিনিষের উপমা দিয়ে কত সহজ করে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। ঠাকুর কথামৃতে যত উপমা ব্যবহার করেছেন এগুলো আমরা দিনরাত চোখের সামনে প্রতিনিয়ত দেখছি। সেই দৃষ্টি যদি থাকে তাহলে আমাদের চারিপাশের যে কোন জিনিস থেকে কোন না কোন শিক্ষা নিতে পারি। এখানে এই ব্ল্যাকবোর্ড আছে, ব্ল্যাকবোর্ডকে দেখে আমার মনের মধ্যে একটা ভাব এল। এই ব্ল্যাকবোর্ডে এখন কিছু লেখা নেই, সব পরিষ্কার। এর ওপর কত কিছু লেখা হবে, ক্লাশের ছেলেরা সেই লেখা থেকে কত জ্ঞান অর্জন করবে। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা থাকলে নতুন করে কিছু লিখতে গেলে আগের লেখাগুলো পরিষ্কার করে দিতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ড থেকে আমি শিক্ষা পেলাম আমার যে সংস্কার এগুলোকে পরিষ্কার রাখতে হবে, মন পরিষ্কার থাকলে যে কোন জিনিসকে ধারণা করা যাবে। এই বোতলকে দেখে শিক্ষা পেলাম, বোতল যদি জলে পরিপূর্ণ থাকে তখন সে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমার জীবনও যদি পরিপূর্ণ থাকে তাহলে অপরের তৃষ্ণা মিটবে। পাখাকে দেখে শিক্ষা পেলাম, পাখা যখন ঘোরে তখন কিছু লোকের বাতাস লাগে, যখন স্থির থাকে তখন কোন কাজেই আসে না। আমিও কখন বসে থাকবে না, সব সময় কাজ করে যাব অপরের সেবা ও মঙ্গলের জন্য। যেদিকেই দৃষ্টি দিই না কেন, চেষ্টা করলে সেখানেই আমরা হাজার রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এইভাবে শিক্ষা নিলেও কিছু হবে না। দত্তাত্রেয় প্রথমেই বলছেন আমি এইভাবে বহু গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবনকে আগে গুছিয়ে নিয়ে সংঘটিত করে আজকের এই অবস্থায় দাঁড় করিয়েছি। তাই দত্তাত্রেয়ের কথার এত দাম। শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রথমে শিক্ষা দেন তোমরা নেতাজীর মত হও বা স্বামীজীর মত হও। ছাত্ররা বাচ্চা বয়স থেকে এই কথা শুনেই যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষককে ছাত্রদের বলতে দেখা যায়নি, তোমরা আমার মত হও। শিক্ষকরা কি ট্রাফিক পুলিশ? এর ওর দিকে হাত দেখাচ্ছে! শিক্ষককে সেই ভাবে তৈরী হতে হবে যাতে তার মধ্যে সেই দৃঢ় মনোভাব আসবে যে বলতে পারবে তোমরা আমার মত হও।

বোর্ড, পাখা, বোতল এগুলো সব প্রকৃতির উপমা এগুলো আমাদের মত সাধারণ মানুষকে সেইভাবে স্পর্শ করবে না। কিন্তু শুদ্ধাত্মা থেকে যেটা আসে সেটাই আমাদের স্পর্শ করে। দত্তাত্রেয় একেবারে পবিত্র শুদ্ধ আত্মা, তাঁর কাছ থেকে এই কথাগুলো আসছে। তাই বলে কি তিনি আগে থাকতেই পবিত্র আত্মা ছিলেন? তিনি বলছেন এটাই আমার সাধনা, আমি যখন পঞ্চতত্ত্বকে দেখলাম তখন তাদের আচরণ থেকে আমি শিক্ষা নিলাম। আমাকেও খেতে হবে, আমাকেও শরীর ধারণ করতে হবে, আমারও চোখের সামনে দৃশ্য আসবে, আমারও কানে দু-তিনটে কথা আসবে। কিন্তু এলো তারপর সেখানেই ত্যাগ।

সূর্যের কাছে ত্যাগের শিক্ষা ছাড়া আরেকটি শিক্ষা পেয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় তেমনি যত প্রাণী আছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ দেখেন বস্তুত সূর্যই আছে প্রতিবিম্ব সূর্য আর আসল সূর্যে কোন তফাৎ নেই। শুধু উপাধি ভেদে তফাৎ হয়ে যায়। যত শরীর দেখছি সব শরীর সেই আত্মারই প্রতিবিম্ব। তাহলে কেউ যদি মারা যায় কষ্ট হবে না? খুব কষ্ট হবে, কারণ ঐ দেহের সাথে নানা রকমের লীলা খেলা চলছিল কিনা। কেশব সেনের খুব শরীর খারাপ, ঠাকুর ঠনঠনে কালীবাড়ি গিয়ে মানত করছেন, মা! কেশবের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা বলব? কেশব সেনের মৃত্যু যদি হয়ে যায় সেটা কোন দুঃখের কারণ নয়, তিনি যা পাওয়ার, যা করার করে নিয়েছেন। দুঃখ এটাই, যার সাথে কথা বলতাম সে নেই। কিন্তু এই দুঃখটাকে কত দূর নিয়ে যাওয়া যাবে, এরও একটা লাইন টেনে দিতে হয়। আমরা ঐ লাইনটা টানি না। লাইন যদি না টানা হয় তাহলে কি হবে? তখন দত্তাত্রেয় একটা পায়রার গল্প বলছেন। পায়রার কাহিনী অতি সাধারণ, কিন্তু ঐ পায়রা থেকেও তিনি একটা শিক্ষা নিলেন। কপোত অবধূতের অষ্টম গুরু।

৮) কপোত

দত্তাত্রেয় বলছেন *নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ। কুর্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ।।*১১/৭/৫২। হে রাজন্! এই জগতে কোন পরিস্থিতিতে, কোন মতে কারুর সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহ বা

আসক্তি রাখতে নেই। কারুর প্রতি যদি তোমার বেশী আসক্তি বা স্নেহের সম্পর্ক থাকে তাহলেই কিন্তু তোমার সর্বনাশ। কি রকম সর্বনাশ হবে? বলছেন, আসক্তিপূর্ণ মন সব সময় বুদ্ধিকে বিপথে পরিচালিত করে তার স্বাতন্ত্রতাকে নষ্ট করে দেয় আর মনের মধ্যে সন্তাপের সৃষ্টি করে তাকে দুর্বল করে দেয়। আমি এই শিক্ষা পেয়েছি কপোতের কাছ থেকে। এই বলে দত্তাত্রেয় একটা কাহিনী বলছেন।

একবার জঙ্গলে দত্তাত্রেয় তপস্যা করছিলেন। সেখানে একটি বৃক্ষে এক কপোত নিজের স্ত্রীকে নিয়ে বাসা তৈরী করে বহু দিন ধর বাস করছিল। কপোত-কপোতীর ভালোবাসা কেমন ছিল? বলছেন *কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্মিণৌ। দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ।।১১/৭/৫৪।।* দুজন দুজনের প্রতি ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। এত ভালোবাসা হয়ে গেল যে কেউ কাউকে দৃষ্টির আড়াল করতে পারত না, ভালোবাসা দিয়ে এক অপরকে বেঁধে রেখেছে। *অঙ্গমঙ্গেন*, দুজনের অঙ্গ একেবারে সমান হয়ে গেছে, তোমার অঙ্গ আমার অঙ্গ, আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গ, আমার দুঃখ তোমার দুঃখ, তোমার সুখ আমার সুখ। *বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা*, তোমার চোখে হাসি আমার চোখে হাসি, তোমার চোখে জল আমার চোখে জল। এই হল সংস্কৃত ভাষা, পুরো শ্লোকও নয়, অর্দ্ধেক শ্লোকে কয়েকটা কথায় অনেক কিছু বলে দিচ্ছেন। কপোত-কপোতীর কি রকম ভালোবাসা? দৃষ্টিতে দৃষ্টি, অঙ্গে অঙ্গ, বুদ্ধিতে বুদ্ধি। দুজনের পরস্পরের প্রতি এমনই ভালোবাসা যে দুজনে একত্রে শয়ন, বসন, বিচরণ, বিশ্রাম, কথোপকথন, ক্রীড়া এবং আহারাদি সম্পন্ন করত। এমনই ভালোবাসা যে তারা কেউ আলাদা থাকতে পারত না, সব সময় একত্রে সব কিছু করত। দত্তাত্রেয় বলছেন *যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা। তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ।।১১/২৭/৫৬।।* কপোতীকে কপোত এমন ভালোবাসত যে কপোতী যা কিছু ইচ্ছা করত কপোত তার যত কষ্টই হোক, যে করেই হোক কপোতীর ইচ্ছাকে সে পূর্ণ করত। এই কপোত ছিল অজিতেন্দ্রিয়, তার নিজের উপর কোন সংযম ছিল না, ফলে কপোতের যত কাম বাসনা কপোতী বিনিময়ে মিটিয়ে দিত। ঠাকুর বলছেন, গিন্নী ভালো মন্দ রান্না করে স্বামীকে পরিবেশেন করে বলবে, ওগো পাশের বাড়ীর উনি তাঁর স্ত্রীকে খুব সুন্দর হাতের বালা গড়িয়ে দিয়েছেন। নারী-পুরুষের যে সম্পর্ক হয় তাতে দেখা যাবে, ওর মধ্যে দুজনেরই দুটো দুর্বলতা অবশ্যই থাকবে। এর দুর্বলতাকে ও পূরণ করে, ওর দুর্বলতাকে এ পূরণ করে। মেয়েরা চায় আর্থিক নিরাপত্তা, ছেলেরা চায় ইমোশানাল নিরাপত্তা। যে কোন মেয়ে যদি নিজের স্বামীকে বা প্রেমিককে বলে তোমাকে ছাড়া আমি মরে যাব, বুঝবেন সে মিথ্যা কথা বলছে। মেয়েদের কখনই ইমোশানাল নিরাপত্তাহীনতা হয় না, মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা হয়। পুরুষরা হয় ইমোশানাল, পুরুষের চাই ভালোবাসা। ভালোবাসা যদি অন্য কোথাও থেকে পেয়ে যায় স্ত্রীকে উপেক্ষা করবে। যদি দেখা যায় স্বামী স্ত্রীকে অবহেলা করছে বুঝবেন সে অন্য কোথাও ভালোবাসা পাচ্ছে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। এখানে এটাই বলছেন, কপোতী শুধু আবদার করে যাচ্ছে। সীতা বায়না শুরু বললেন আমার সোনার হরিণ চাই, শ্রীরামচন্দ্র দৌড়ালেন। কিছু করার নেই, স্ত্রী আবদার করবে আর স্বামী পূরণ করবে না, সেকি কখন হয়! কোন পুরুষরা নারীর আবদার বেশি করে মেটায়? যারা অজিতেন্দ্রিয়। তাদের দুঃখের আর শেষ নেই, স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে মেটাতে জেরবার হয়ে যায়। যারা জিতেন্দ্রিয়, বেশি বায়না করলে দুদিন পরে বিদায় করে দেবে।

এরপর তাদের বাচ্চাদের জন্ম হল। তাদের একটু একটু করে নরম রোঁয়া বেরোচ্ছে। বলছেন, *প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ। শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলয়াষিতৈঃ।।১১/৭/৫৯।।* এইবার কামনা-বাসনা সব পাল্টে গিয়ে সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ এসে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোর নরম নরম শরীরের দিকে কপোত-কপোতি তাকিয়ে আনন্দে বিগলিত হয়ে যেত। *শৃণ্বন্তৌ কূজিতং*, বাচ্চাগুলোর মিষ্টি মিষ্টি ডাক শুনে ওরা অবশ হয়ে যেত। জলের ঘূর্ণিতে যে মিষ্ট আওয়াজ হয় ঐ আওয়াজ মাছদের বেঁধে রাখে, ওখান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না। ওখানেই কপোত-কপোতীর অবশতা থেমে থাকছে না, বাচ্চারা তাদের নরম ডানা দিয়ে তাদের বাবা-মাকে স্পর্শ করছে, একটু একটু করে লাফাচ্ছে তাতেই কপোত-কপোতি মনে করছে যেন অনন্ত স্বর্গের সুখ নেমে এসেছে। বলছেন, *স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া। বিমোহিতৌ*

দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ।।১১/৭/৬১।। এগুলো কিছু না, বিষ্ণুমায়া এদের বেঁধে রেখেছিল। অনেকে এই কথা বলে, সন্তান না হলে, সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা না থাকলে সৃষ্টি চলবে না, সংসারের স্থিতি হবে না। না তা নয়, সৃষ্টি ঠিকই চলবে, সংসারও আরামসে চলতে থাকবে। কারণ ভগবানের এমনই মায়া যে, কোটি লোক ঐদিকেই যাবে আর একজন ঈশ্বরের পথে যাবেন। ভগবানের মায়া সবাইকে নাচিয়ে ছাড়বে, কেউ ছাড় পাবে না। দশটা ইন্দ্রিয় আর তার সাথে মন, এই এগারো জন সবাইকে নাচিয়ে রেখেছে। সবাই ভগবানের মায়াতে একেবারে বিমোহিত হয়ে আছে। যারা বলে সবাই যদি ভগবানের পথে যাওয়ার জন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে সংসার চলবে কি করে, তাদের জন্য একটাই কথা ভগবান কি তোমাকে তাঁর সৃষ্টি রক্ষার দায়ীত্ব দিয়েছেন? যাই হোক এরা এখন অপত্য স্নেহ দিয়ে এদের লালন-পালন করতে থাকল। এরপর এদের কুটুম্ব সংখ্যায় অত্যাধিক হয়ে গেছে। একটা পাখি একসাথে কটি ডিম দেয় এই নিয়ে অনেকেই অনেক রকম বলে, কিন্তু সঠিক তথ্য হল, একটা মা পাখি ডিমে যখন তা দিতে বসে তখন তার শরীর যত দূর যাবে সে তত ডিম দেবে। ডিমের সাইজের উপর নির্ভর করে মা পাখি কটা ডিম দেবে। ডিমের সাইজ বড় হলে সংখ্যা কম হবে, সাইজ ছোট হলে সংখ্যায় বেশি হবে। কিন্তু ওর শরীরের যতটা সাইজ ততটা ডিমকে কভার করবে। যদি কায়দা করে ডিমটা সরিয়ে অন্য কিছু দিয়ে দেওয়া হয়, পাখি ওটাকেই তা দেবে। যেমন কোকিল ঠিক অতটাই কাকের বাসায় গিয়ে ডিম দেয় যতটা কাক ডিমকে কভার করবে। পায়রা একবারে দুটো তিনটে ডিমই দেবে, কারণ তার মা ওর বেশি ডিমকে কভার করতে পারবে না।

একদিন শাবকদের খাদ্য সংগ্রহের জন্য কপোত-কপোতী দুজনেই বাইরে গিয়েছিল। সেই সময় এক লুব্ধক বা ব্যাধ ঘুরতে ঘুরতে কপোতের বাসার কাছেই হাজির হয়ে গেল। ব্যাধ দেখছে বাসাতে কপোতের শাবকরা লাফালাফি করে খেলছে। সে তখন জাল পেতে তাদের ফাঁসিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কপোত-কপোতী ফিরে এসে দেখছে তাদের শাবকরা জালের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে আর্তনাদ করছে। শাবকদের মায়ের আর দুঃখের পরিসীমা নেই। তখন বলছেন, *সাসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া। স্বয়ং চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পাশন্ত্যপস্মৃতিঃ।।১১/৭/৬৬।। দীনচিত্তাজমায়য়া,* জালের মধ্যে শাবকদের আবদ্ধ দেখে দীনচিত্ত, এত দিন চিত্তের মধ্যে যে আনন্দ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দীনচিত্ত হয়ে গেছে। শাবকদের ঐ অবস্থা দেখে কপোতীর অপস্মৃতি হয়ে গেছে, তার স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। স্মৃতি মানে, গুরু যে বেদান্ত বাক্য বলেছেন সেই বাক্যগুলিকে মনে রাখা। স্মৃতি মানে স্মরণ নয়, শাস্ত্রে যখনই স্মৃতি শব্দ আসে তার অর্থ একটাই, শাস্ত্রের যে কথাগুলো গুরুমুখে শ্রবণ করা হয়েছে সেটাকে ধারণা করা। গীতায় ভগবান বলছেন *ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ* আর *স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো*। আমরা সবাই এখন শাস্ত্রের আলোচনা শুনছি, কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মোহ মায়া চলে গেছে। তার মানে শাস্ত্র বাক্যগুলি আমাদের মনে গিয়ে বসে গেছে। কিন্তু আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে সবটাই অপস্মৃতি হয়ে যাবে। অপস্মৃতি মানে গুরু যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো মন থেকে বেরিয়ে চলে যাওয়া। দীনচিত্ত হলে কি হয়? অপস্মৃতি হয়ে যায়, সম্মোহ হয়ে গেলেই মানুষ দীনচিত্ত হয়ে যায় আর মোহ চিত্ত যেমনি হল তখন *স্মৃতিবিভ্রমঃ,* শাস্ত্রের যে কথাগুলো গুরুমুখে শুনেছিল সেগুলো মনে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ করতে পারে না। তখন যদি বলে, তুমি এটা কী করছ, সব ভুলে গেলে নাকি। সে তখন বলবে, সব মনে আছে কিন্তু আমি পারছি না। বলছেন, বাচ্চাদের ঐ অবস্থা দেখে কপোতীর আর কোন হুঁশ থাকল না, সেও আর্তনাদ করতে করতে বাচ্চাদের বাঁচাতে ঝাপিয়ে পড়তেই ব্যাধের জালে ফেঁসে গেল। সন্তানের প্রতি এমনই মায়া।

কপোত ফিরে এসে দেখছে নিজের সন্তানরা জালের মধ্যে ফেঁসে গেছে, তার এতদিনের প্রিয়তমা স্ত্রীও ফেঁসে গেছে, খুব কাঁদছে। কপোত তখন খুব সুন্দর বলছে *অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্মতেঃ। অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ।।*১১/৭/৬৮। আমি কি অভাগা, *অল্পপুণ্যস্য*, আমার পূণ্য কিছুই নেই তা নাহলে কি আমার এই দুরবস্থা হয়! স্ত্রীর প্রতি আমার কাম-বাসনা এখন পূর্ণ হয়নি, আমার যত রকমের আশা ছিল সেগুলও পূর্ণ হয়নি। ধর্ম, অর্থ আর কাম যেটা গৃহস্থের মূল এই তিনটে স্ত্রীকে দিয়েই পূর্ণ করা হয়, তাই তিনটেই আমার নাশ হয়ে গেল। স্ত্রী যদি না থাকে কোথা থেকে কামের পুর্তি হবে, স্ত্রী যদি না থাকে

তাহলে অর্থ দিয়েই বা কি হবে আর স্ত্রী যদি না থাকে আমি ধর্ম পালন কি করে করব। এটা আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ থিম, মহাভারতে এই জিনিসটাকে বার বার নিয়ে আসা হয়েছে আর পুরাণে তো আছেই। পাখির মাধ্যমেও ধর্ম, অর্থ, কাম চলে। কপোত বলছে ধর্ম, অর্থ, কাম কিন্তু আসলে তা নয়, ওর শুধু কাম, স্ত্রীকে ছাড়া থাকতে পারবে না, যে বাচ্চাগুলো এত দিন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছিল, মিষ্টি কথা আর শুনতে পারবে না। কপোত বলছে *অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা। শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ।। ১১/৭/৬৯।।* আমার প্রিয়তমা কত ভালো ছিল, আমাকে ইষ্ট মনে করত, আমাকে ভগবান মনে করত, আমার কথা মত চলত, আমি যা করতে বলতাম তাই করত, আর এই সন্তানদের জন্য আমাকে ছেড়ে স্বর্গে চলে গেল! আমার স্ত্রী চলে গেল, আমার সন্তানরা চলে গেল, আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ! আর যে বাড়িতে গিন্নী নেই সেই বাড়িতে থেকে কি হবে! এইভাবে কপোত একা একা প্রলাপ করে যাচ্ছে। জালের মধ্যে আমার নিজের লোকেরা ছটফট করছে, কিন্তু বেরোতে পারছে না, আমি এখানে নিঃসঙ্গ পড়ে থেকে কি করব। আমার আপনজনরা যেখানে সেখানেই আমার স্থান। এই সব বলে সেও জালে লাফিয়ে পড়ল। আর ঐ ব্যাধ সে অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির, তার মধ্যে কোন করুণার উদয় হল না, ব্যাধ দেখল আমার কপাল খুলে গেছে, এসেছিলাম দুটো পায়ার বাচ্চা ধরতে কিন্তু সাথে ওদের বাবা-মাকেও পেয়ে গেলাম, সবাইকে বেঁধে থলের মধ্যে পুরে বাড়ি চলে গেল।

পায়রার মুখ দিয়ে একটা মানব জীবনের গল্প শোনান হল। দত্তাত্রেয় এই দৃশ্য দেখে দুটো শ্লোকে খুব সুন্দর বলছেন *এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতৎত্রিবৎ। পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি।। যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারামপাবৃতম্। গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ।।১১/৭/৭৪*। যারাই নিজের সম্বন্ধীর থেকে সুখ পায়, তাদের ভরণ-পোষণ করাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, এই পায়রাদের মতই তাদের দুরবস্থা হয়। এই মানব-শরীর মুক্তি প্রাপ্তির মুক্ত দ্বার। মানব-শরীর ধারণ করার আগে কত যোনির মধ্যে তাকে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। পিঁপড়ে থেকে শুরু করে পায়রার মত পাখি, সেখান থেকে কত পশুর শরীরের মধ্য দিয়ে এসে এই মানব দেহে জন্ম নিয়েছে। এর আগে কোথাও তার মুক্তির সুযোগ ছিল না। একমাত্র এই মানব যোনিতেই ঈশ্বর চিন্তন করা সম্ভব, আর কোন যোনিতে যেটা কখনই সম্ভব নয়। সমস্ত প্রাণী মানুষের থেকে কোন না কোন ক্ষেত্রে বেশী ক্ষমতাবান। টিকটিকি কত স্বচ্ছন্দে দেওয়ালে চলতে পারে, মানুষ পারবে না। মানুষ পাখির মত আকাশে উড়তে পারে না। একটা গৃধ্র কত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে, মানুষ পারে না। যে কোন পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ মানুষের থেকে কোন না কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে কিন্তু মুক্তির ব্যাপারে মানুষের উপরে কোন প্রাণীকেই নিয়ে যাওয়া যাবে না। মানুষের কাছে মুক্তির দুয়ার খোলা, একটু চেষ্টা করলেই সে জগতের সমস্ত বন্ধনকে কেটে বেরিয়ে যেতে পারবে। এটাই দত্তাত্রেয় বলছেন, *মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্*, মুক্তির দরজাটা খোলা পড়ে আছে, কি আশ্চর্যের তাও মানুষ বেরিয়ে যেতে পারছে না।

বলছেন, এই পায়রদের মত যারা দু-পয়সার জিনিসকে ভালোবেসে নিজের জীবনকে নষ্ট করছে তাদের একটা শব্দই বলা যায়, শাস্ত্রে তাদের বলা হয় *আরূঢ়চ্যুত*। আরূঢ়চ্যুত মানে উপরে উঠে আবার যার পতন হয়ে যায়। সন্ন্যাসী বা যোগীদের ক্ষেত্রে বলা হয় যোগভ্রষ্ট কিন্তু গৃহস্থদের ক্ষেত্রে বলা হয় আরূঢ়চ্যুত। ভালো কিছু কর্ম করে উপরে উঠেছে বলেই সে এই মানব শরীর পেয়েছে। কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না বলে উপর থেকে আবার চ্যুত হয়ে গেল। হে ভগবান! শুধু নিজের স্ত্রী সন্তানকে এত ভালোবাসে বলে অকারণে এভাবে নিজের প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে দিল। মানুষ এত উপরে যায়, টাকা-পয়সা সব আছে কিন্তু স্ত্রী সন্তানের মায়াতে আবদ্ধ হয়ে সব হারিয়ে বসে। তাহলে সে কি করবে? সে কি নিজের স্ত্রী-পুত্রকে মরতে দেব? সেটাতো পারবে না। চোখের সামনে নিজের পরিবারকে মরতে দেখে সে কি চুপ করে বসে থাকবে? তাহলে সে তো একটা পশু, পরে আরেকটাকে বিয়ে করে সংসার পাতবে। আর যারা পশুবৎ নয় তাদের এমনিতেই ঝাঁপ দিতে হবে না, বেঁচে থেকেও গ্লানিতেই সে মরে যাবে। সব ব্যাপারেই একটা লাইন টানতে হয়। এই যে এখানে বলছেন, কি সুন্দর কথা, *দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ*, একেবারে জলে জল তেলে তেল মিশে গেছে, এই করলে কপোত কপোতির মতই মরতে হয়। সেইজন্য প্রথমেই বলে দিচ্ছেন – দ্যাখো বাপু, তুমি

আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যেও না। একবার যদি আসক্তিতে পড়ে যাও তাহলে তুমি আর পথ পাবে না, সেইজন্য প্রথম থেকেই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে যেতে হবে। যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি, যার জন্য এই মানবজীবন পাওয়া গেছে, সেই উদ্দেশ্যটা তখন আর নষ্ট হয়ে যাবে না। ভগবান দুটো বাচ্চাকে বড় করতে আমাদের পাঠাননি, ভগবান সুযোগ দিয়েছেন যাতে আমরা তাঁর সাথে এক হয়ে যেতে পারি।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে কপোত-কপোতি নিজের সন্তানদের জন্য চোখের জল ফেলছে, আমরা দেখি শ্রীশ্রীমাও তো তাঁর নিজের স্বজনদের জন্য চোখের জল ফেলছেন। তাহলে কপোত-কপোতীর চোখের জল ফেলাতে দোষ কোথায়? ভাগবতে এটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হল কেন? শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় বা কোন বিষয়কে নিয়ে অধ্যয়ন করার সময় তার সমষ্টি চিত্রটাকে সব সময় মাথার মধ্যে রাখতে হয়। সাধারণ মানুষের সমস্যা হল তারা সব সময় খাপছাড়া বা খণ্ডিত ছবিটা নেয়। এখানে দত্তাত্রেয়কে নিয়ে বলছেন, দত্তাত্রেয় একজন সন্ন্যাসী, তাঁর ব্যাপারে যা কিছু বলা হচ্ছে এটা সন্ন্যাস ধর্মের বর্ণনা, গৃহস্থ ধর্মের সাথে এক করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তখন একজন গৃহস্থ বলতে পারে তাহলে এগুলো শুনে আমার কি লাভ, আমি কেন শুনব? ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে সংসারীরা এক আনা ত্যাগ করার সাহস পায়। একদিকে কপোত-কপোতী সন্তানের ভালোবাসায় এমন আসক্ত যে, সবাই এক এক করে ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়ে গেল। অন্য দিকে রয়েছেন অবধূত, যিনি ঐ দৃশ্য দেখে সংসারের ধারে কাছেই গেলেন না। সংসারী এখন কোনটাকে নেবে? কপোত-কপোতীর মত মরে যেতে চাইবে না, আর সন্ন্যাসীও হতে পারবে না। একদিকে কপোত-কপোতী অন্য দিকে একজন কাঠখোট্টা সন্ন্যাসী, এই দুটোর মধ্যে যদি একটা লাইন টানা হয় তাহলে আমাদের এই লাইনের কোন একটা জায়গায় থাকতে হবে। যতটা কপোত-কপোতীর কাছাকাছি থাকবে ততটা তার কষ্ট হবে আর যতটা দত্তাত্রেয়র দিকে যাবে ততটা তার কষ্ট কম হবে। এই জগতটা একটা প্যাকেজ ডীল, যখন শাড়ি কিনতে যাওয়া হয় তখন একটা দোকান থেকে কিনলে একটা গিফট দেবে, অন্য দোকানে অন্য গিফট দেবে। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি কোন গিফট নেব। জগতটাও একটা পুরোপুরি প্যাকেজ ডীল, ভালোবাসা যেমন আনন্দ দেয় তেমনি চোখের জলও দেয়। একজন লেখকের একটা খুব নামকরা কথা আছে, It is good to have loved and lost than to have not loved at all, জীবনে ভালোবেসেছি আর হারিয়েছি আর কেঁদেছি, একেবারেই না ভালোবাসার থেকে এটা অনেক ভালো। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী বলছেন, আমি ভাই চোখের জল খরচ করতে পারব না, আমার ভালোবাসাও লাগবে না। আমরা কিছুটা এটাও করব কিছুটা ওটাও করব। শ্রীশ্রীমায়ের যে কথা বলা হল, শ্রীশ্রীমা আসক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন, গ্রহণ করার জন্য আসক্তিটা সারা জীবন ধরে শ্রীশ্রীমাকে মারতে পারছে না। আসক্তি অবশ্যই আছে, আসক্তি না থাকলে সংসার চলবে কি করে! রাধুকে যখন ভালোবাসছেন তখন মা অনুযোগ করছেন, রাধুর জন্য আমার সময় গেল, অর্থ গেল। তবে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, জোর করে কোন শক্তি মায়ের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে না। আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কর্ম সবাইকে ঐদিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা বাধ্য। ঠাকুর মাকে দিয়ে বিশেষ কাজ করাতে চাইছেন, সেইজন্য স্বেচ্ছায় রাধুকে গ্রহণ করতে হল। কিন্তু যেদিন তিনি রাধুর থেকে মন তুলে নিলেন, সেদিন থেকে আর রাধু রাধু করছেন না। অন্তিম সময়ে স্বামী সারদনন্দজী একটা শেষ চেষ্টা করছে, রাধুর ছেলেকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, মা বলছেন, ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আর তোরা আমাকে বাঁধতে পারবি না। শ্রীমার যে আসক্তি ঐ আসক্তি সাংসারিক আসক্তি নয়, উনি চাইলে ছেড়ে দিতে পারতেন। সোনাতে খাদ না মেশালে যেমন গয়না হবে না, ঠিক তেমনি শ্রীমাকেও সংসারে বিচরণ করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঐ খাদটুকু গ্রহণ করতে হয়েছিল। অবতারাদি পুরুষদের ক্ষেত্রে এসব জায়গায় একটা বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তার নাম লীলা। লীলা বলতে আমরা অনেক সময় ভুলে নাটক মনে করি, কিন্তু কোথাও কোন নাটকীয়তা নেই, সবটাই বাস্তব। আমাদের কর্ম, মায়া, অবিদ্যা আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছে। আগেও আমরা এই উপমা নিয়েছিলাম, একজন কয়েদীকে পুলিশ ঘিরে থাকে, পুলিশ যেদিকে তাকে কোমড়ে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে তাকে সেদিকেই যেতে হবে। আর শ্রীমা বা ঠাকুর এনারা হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, তাঁকে আরও বেশি পুলিশ বডিগার্ড রূপে ঘিরে রেখেছে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি যেদিকে যাবেন

পুলিশকে সেদিকেই যেতে হবে। মায়ার অধীনে সবাই আছে, আমরাও আছি আর শ্রীমা, ঠাকুর এনারাও আছেন, তফাৎ হল শ্রীমা যেদিকে যাবেন মায়াকে সেই দিকে যেতে হবে, আর আমাদের ক্ষেত্রে মায়া যেদিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাবে আমাদের সেই দিকে যেতে হবে। আমরা ঈশ্বরকে ভুলে আছি, ঈশ্বর তাই আমাদের পেছনে। সেইজন্য আমাদের ছায়া এগিয়ে এগিয়ে যায়। ছায়া যেদিকে যায় আমরাও সেদিকে যাই, সারা জীবন আমরা সবাই ছায়াকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি। একবার মুখটা যদি ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তখন ছায়াটা আমাদের পেছনে পেছনে চলতে থাকবে। যতক্ষণ আলো আর ছায়ার খেলা চলবে ততক্ষণ ছায়া ছাড়বে না। ঠাকুরেরও ছায়া আছে, মায়েরও ছায়া আছে, কিন্তু ছায়া তাঁদের পেছনে পেছনে চলে, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের দিকে মুখ করে আছেন, আর আমাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর পিঠ পেছনে। ভাগবত কোন নাটক নয়, কোন উপন্যাস নয়, ভাগবত অত্যন্ত উচ্চমানের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, যার জন্য ভাগবতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। আধ্যাত্মিক গ্রন্থের কাজ হল সত্যকে আমাদের সামনে রেখে দেওয়া। চোখের জল ফেলা, গামছা নিংড়ানোর মত হৃদয়ের যন্ত্রণা যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে তোমাকে ত্যাগের পথ অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আমরা বলছি, আমি পারছি না, ওনারাও বলছেন তুমি পারবে না, না কেঁদে তুমি থাকতে পারবে না, কিন্তু তার মধ্যেও যতটা তুমি ত্যাগের পথে এগোতে পারবে ততটাই তোমার লাভ, ততটাই তোমার শান্তি। আজ হোক বা কালো হোক সবাইকে দত্তাত্রেয়র অবস্থায় যেতে হবে, কারুর এক জন্ম লাগবে, কারুর হাজার জন্ম লাগবে, এবার আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি কত জন্মে পেরোতে চাই। দত্তাত্রেয় কি এক জন্মেই এই অবস্থায় এসেছেন? আমরা তা মানি না। কোথাও আমাদের একটা শুরু করতে হবে।

প্রসঙ্গ থেকে সরে আমরা কয়েকটা কথা নিয়ে আলোচনা করছি, এগুলো শুনে রাখা ভালো। আধ্যাত্মিক জীবনে দুটো জিনিস হয়ে, একটা হল ধর্ম আরেকটা হল আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম হল সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আধ্যাত্মিকতা শুরুই হয় সত্ত্বগুণের পার থেকে। সেইজন্য আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁর ঠিক ঠিক ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তাঁর কখনই পতন হয় না। যদি কোন সন্ন্যাসী বা সাধুর পতন হয় তাহলে বুঝতে হবে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন না। যে জেনে গেছে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, সে কোন দিন আগুনের ধারে কাছে যাবে না। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে, আবার বলছেন, বশিষ্ঠ অত বড় জ্ঞানী তিনিও পুত্রশোকে কাতর হয়ে গেছেন। এনাদের শাস্ত্রজ্ঞান প্রচুর ছিল, কিন্তু মূলতঃ তাঁরা ছিলেন বেদমার্গের পথিক, মানে ধর্মমার্গের লোক। ধর্মমার্গের পথিক মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত। যিনি একেবারে সত্ত্বগুণে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মাচরণের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না, তখনও কিন্তু তিনি সত্ত্বগুণের সীমানায় বাঁধা। ভয়তরাসে মানে, যদি কোন ধাক্কা আসে সেই ধাক্কা কতটা সামলাতে পারবেন বলা খুব মুশকিল। সেইজন্য ধর্ম জিনিসটা খুব খটমটে, ভরসা করা যায় না। যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন বা যিনি জীবনে কোন একটা আদর্শকে ভালোবাসেন, জীবনে তাঁর কখনই ধাক্কা লাগে না। বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই চারটে আদর্শ ছাড়া পঞ্চম কোন আদর্শ হয় না। বিদ্যা মানে যে কোন বিদ্যাতে নিজেকে পুরোপুরো উৎসর্গ করা। সম্পদ হল, দেশের জন্য, সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা। সেবা, আমার সামনে যেই আসুক আমি তার সেবা করব বা আমি যেটার দায়ীত্ব নিয়েছি সেই দায়ীত্বকে আমি সেবা ভাব নিয়ে পালন করব। ত্যাগ, আধ্যাত্মিকতার পথ, যেখানে জগতের সব কিছু ত্যাগ। যে কোন একটা আদর্শকে নিতে হবে। সংসারীদের দ্বারা ত্যাগ হবে না, তিনটে আদর্শ পড়ে রইল, বিদ্যা, সম্পদ ও সেবা। সেবা মানে সমাজের সেবা, জগতের সবার সেবা। যারা গৃহবধূ তাদের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি হবে না। থাকল সেবা আর বিদ্যা। যিনি সেবা আদর্শ নিয়েছেন তাঁর সন্তান যদি মারা যায় তাতে সেবা আদর্শে কোথায় ঘাটতি পড়ছে! কোথাও নয়। তাহলে চোখের জল কেন ফেলছেন? কারণ তিনি সেবা আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নন। যে কোন আদর্শে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত থাকে তাঁর কোন অবস্থাতেই চোখের জল বেরোবে না। ঠাকুরার আদর্শ ছিল ত্যাগ, ত্যাগ এখানে Technical শব্দ, ত্যাগ মানে ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না বা আত্মা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না। শ্রীমা খেতে পাচ্ছেন না, তাঁর কোন হুঁশ নেই। কেউ যদি একটা কোন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার ছেলে মারা গেল, স্ত্রী মারা গেল, সমাজে কেউ মারা গেল, তাতে আদর্শে কোথায় আঘাত করছে? কোথাও না, মুশকিল এটাই, আমরা নিজেদের মনে

করি নিধিরাম সর্দার কিন্তু ভেতরে না আছে ঢাল না আছে তলোয়ার। যতই আমরা শাস্ত্রের কথা শুনে যাই আমরা প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি আমরা শোধরাব না।

৯) অজগর

দত্তাত্রেয়র নবম গুরু অজগর। অজগরের এখানে যে বর্ণনা আছে তাতে বলছেন, অজগর তার সামনে যে শিকার পায় সেটা খেয়েই সে ঐভাবে পড়ে থাকে। আসলে অজগরের এত বড় শরীর যে বেশি নড়াচড়া করতে পারে না, কিন্তু একেবারেই যে নড়াচড়া করে না তা নয়, অজগরও নড়াচড়া করে। কিন্তু এখানে বক্তব্য পুরোপুরি আলাদা। এর প্রথম শ্লোকটা দর্শন আর দ্বিতীয়টা উপাচার। দত্তাত্রেয় বলছেন *সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ। দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ বুধঃ।।১১/৮/১*। হে রাজন্! আমরা যতই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি না কেন আমাদের পূর্বজন্মকৃত কর্মের প্রারব্ধ হেতু যে দুঃখ-কষ্ট আসবার সেটা আসবেই। ভাগবতে প্রারব্ধজনিত দুঃখের তত্ত্বটা ঘুরে ঘুরে আসে। এটা বলা মুশকিল ভগবান বুদ্ধের কোন প্রভাব ভাগবতের উপর পড়েছিল কিনা। ভগবান বুদ্ধ দুঃখ দুঃখই করে গেছেন, ভাগবতেও যত দুঃখ নিয়ে বলা হয়েছে আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে সেইভাবে অতটা বলা হয়নি। এখানেও দত্তাত্রেয় বলছেন তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন দুঃখ আসবেই। আর ইন্দ্রিয়জনিত যত সুখ আর দুঃখ আছে, যেমন গত কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়াতে কেমন একটা ভ্যাপসা গরমে সবাই হাঁকপাঁক করছে, আমরা ভাবছি কবে একটু বৃষ্টি আসবে, আশা করছি কাল পরশু বৃষ্টি এসে যাবে, কিন্তু মৌসুমী বায়ু সে তার নিজের মত চলছে।

জগতে কি কেউ আছে জীবনে দুঃখ চায়? মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে morbid, এরা দুঃখ পেলে আনন্দিত হয়, এটা এক ধরণের মানসিক রোগ, সাধারণ ভাবে এই রোগ মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এর উল্টো হয় sadist, এরা কাউকে না মেরে শান্তি পায় না, মেরে আবার কাঁদবে, morbidityতে মার খেতে ইচ্ছে করে, মার খাওয়ার পর চোখের জল ফেলবে, চোখের জল বেরিয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক হয়ে যায়। এগুলো রোগ, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কেউ দুঃখ চায় না। যারা দুঃখ চায় না তারা অনেক রকম চেষ্টা করে যাতে দুঃখকে আটকানো যায়। সন্তানের একটু শরীর খারাপ হলে বাড়ির সবাই কত দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়, এই ডাক্তার, এই কবিরাজ, এই বাবাজী, সেই পীড়বাবা, মাদুলি, আধুলি কত কি করে বেড়াচ্ছে। তাও সন্তানের কাশি হবেই, জ্বর হবে, পেট খারাপ হবেই, কিছু করার নেই। ঝামেলা এলে আমরা বলি, হে ভগবান! এই ঝামেলা কোথা থেকে যে এসে গেল। কিন্তু সুখ এলে কেউ বলে না যে, হে ভগবান! এত সুখ কোথা থেকে এলো। কিন্তু দুঃখ যেভাবে আসে সুখও সেইভাবে আসে। আমরা আনন্দস্বরূপ কিনা, আমাদের ভেতরে সচ্চিদানন্দ আছেন তাই আমরা স্বভাবেই সচ্চিদানন্দ, সেইজন্য আনন্দ এলে আমাদের গায়ে লাগে না। আমরা যদি হিসাব করি সারাদিন আমি কতক্ষণ দুঃখে ছিলাম, কতক্ষণ সুখে ছিলাম, তখন দেখা যাবে দুঃখের মাত্রা অনেক কম থাকবে। বাড়িতে যদি প্রচুর অশান্তি চলতে থাকে দেখা যায় সেখানেও মাঝে মাঝে আনন্দের একটা বাতাস আসতে থাকে। ঐ আনন্দের বাতাস যখন আসে তখন আনন্দটাও খুব গভীর হয়। তবে সব কিছুতেই আমাদের একটা কর্মের ব্যাপার জড়িয়ে থাকে। কিছু মানুষ এত বাজে কর্ম নিয়ে এসেছে, ঠাকুরও বলছেন, আগের জন্মে দানটান করা থাকলে এই জন্মে একটু টাকা-পয়সা হয়। ঠিক তেমনি আগের জন্মে ভালো কর্ম করা থাকলে এই জন্মে সুখ-শান্তি হয়। সেইজন্য যাদের জীবনে সুখ-শান্তি নেই তারা যদি ভালো করে দিনে চার-পাঁচ ঘন্টা করে জপধ্যান, তপস্যা করে, ধীরে ধীরে বাজে কর্মের প্রভাব কেটে যায়। কারণ মানুষ জীবনে যা কিছু পায় তপস্যার জোরেই পায়। মূল কথা হল, দুঃখ যেমনি নিজের গতিতে আসে, সুখও তেমনি নিজের গতিতে এমনিই আসে।

দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন *গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা। যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং রসেদাজগরোহক্রিয়ঃ।।১১/৮/২।।* অজগর *অক্রিয়ঃ*, কোন কাজ করে না, সেইজন্য *গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং*, রসাল সুমিষ্ট যাই হোক বা স্বাদহীন হোক যেমনটি পেল তেমনটিই খেয়ে নেয়, পেট ভরা নিয়ে কথা। ঠাকুর বলছেন, আধ্যাত্মিক পুরুষের একটু ঝোলভাত হলেই হয়ে যায়, তারা খাওয়ার বেশি আড়ম্বর করে না।

কয়েক বছর আগে কলকাতার অত বড় নামকরা হাসপাতালে আগুন লেগে কত লোক মারা গেল। যারা মারা গেছে তারা আজ না হলে আগামীকাল যে ভাবেই হোক মারা যেত। হাসপাতালের যারা ডিরেক্টর, এরা সব বড় বড় কোম্পানীর মালিক, টাকা-পয়সার অভাব নেই, ক্ষমতাবান লোকেদের সঙ্গে দহরম-মহরম, স্বর্গে যেমন দেবতা এখানকার এরাই দেবতা, কিন্তু তাদের সবাইকে জেলে যেতে হল। দুদিন আগেও যারা বড় বড় পার্টিতে ভালো ভালো খানাপিনা করে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল, গতকালও কি তারা ভেবেছিল আগামীকাল তাদের জেলে কাটাতে হবে। এখন তাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

মানুষ জীবনে যখন অনেক কিছু দেখে নেয় তখন সে সব কিছুতেই উদাসীন হয়ে যায়। যারা খুব উপরে উঠে গেছে তাদের দেখেও সে আর অবাক হয় না, আবার সেখান থেকে যখন নীচে পড়ে যায় তাতেও সেই অনপেক্ষই থাকে, সে ভালো করেই জানে ওখান থেকে আবার সে উঠে দাঁড়াবে। একটা সমাজ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে তবে গিয়ে এই ধরণের ভাবনা-চিন্তাগুলো আসে। ঋষিরা শিষ্যদের বলে গেছেন, এক সময় এই রকম হয়েছিল, সেই রকম হয়েছিল। অনেক কিছু দেখে দেখে তাঁরা অনপেক্ষ হয়ে গেছেন। দত্তাত্রেয় এই অনপেক্ষর স্তর থেকে কথা বলছেন – আপনি যতই চেষ্টা করুন, যত অনিচ্ছাই থাকুক আপনার কর্ম আপনাকে কখনই ছাড়বে না। হাসপাতালের যারা ডিরেক্টর ছিল, তারা তো প্রত্যক্ষ ভাবে দোষী নয়। তার জানে না হাসপাতালে কোথায় কি হচ্ছে, কলকাতা শহরে এই ধরণের তাদের কত বাড়ি আছে। প্রথম যখন মাঝ রাত্রে হাসপাতালে আগুন লাগার ফোন তাদের কাছে গেছে, তখন হয়ত ঘুমের ঘোরে অতটা গুরুত্ব দেয়নি। দ্বিতীয় ধাপে আরও অনেকটা এগিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারল গোলমাল লাগতে যাচ্ছে তখন তারা নিশ্চয়ই অনেক কিছু চেষ্টা করেছে, পুলিশকে দিয়ে আটকান যায় কিনা, নেতাদের দিয়ে ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সব রকমের চেষ্টাই করেছিল। কিন্তু কিছুই হল না, থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হল। এটাই দত্তাত্রেয় যদু রাজাকে বলছেন। ঠিক তেমনি আপনি স্বর্গেই থাকুন আর নরকেই থাকুন আপনার কপালে যে সুখ আছে সেটা যেভাবেই হোক এসে যাবে। এখানে যুক্তিটা খুব সাধারণ। এত ক্ষমতাবান যারা তারা এত চেষ্টা করেও নিজের দুঃখকে আটকাতে পারছে না। যদি দুঃখকে নাই আটকান যায় তাহলে সুখকেও তো আটকান যাবে না। সেইজন্য সুখের জন্য কখনই বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করতে নেই, সুখ আসার থাকলে এমনিই আসবে। এখানে এটা বলছেন না যে তুমি নিজের ধর্ম কর্ম করবে না। শাস্ত্র বার বার বলছে তুমি ধর্মে অবস্থিত থাকবে। ধর্মে অবস্থিত থেকে তুমি এগুলো করবে না – ধর্মের বাইরে যাবে না, মোসায়েবি করতে যাবে না, অযথা সুখের পেছনে দৌড়াবে না, সুখের পরিকল্পনা করবে না। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবনকে সুস্থ ভাবে পরিচালিত করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও।

এই সব বলে দত্তাত্রেয় বলছেন এইভাবে উদাসীন থেকে জীবন যাপনের শিক্ষা আমি অজগর সাপ থেকে পেয়েছি, এই অজগর আমার একজন গুরু। অজগর কারুর কাছে যাঞ্ঝা করে না, কোন কিছু কামনা করে না, অনায়াসে যা পাওয়া যায় সেটা শুখা হোক, মিষ্টি হোক, স্বাদিষ্ট হোক অস্বাদিষ্ট হোক অথবা কম বা বেশী যাই হোক না কেন তাতেই সে উদাসীন ভাবে গ্রহণ করে জীবন রক্ষা করে। অতি সাধারণ যে গৃহস্থ সে রোজ একই ডাল, তরকারি, ভাত খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারাও মাঝে মাঝে বলে এই একই খাওয়া দাওয়া ঠিক জমছে না, তারপর একটু আচার নিয়ে এল কিংবা তরকারিটা পাল্টে দিল। কিন্তু বেলুড় মঠে রোজ একই ঝোল ভাত বছরের পর বছর সাধুরা খেয়ে যাচ্ছে, এতেই তাঁদের তপস্যা হয়ে যাচ্ছে। আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষ যে উন্নতি করছে এটা কি করে বোঝা যাবে? অনেকগুলো লক্ষণের মধ্যে একটা খুব গুরত্বপূর্ণ দিক হল কথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আয়োজন করে না। একটা কিছু হয়ে গেলেই হল। বিশেষ আয়োজন মানে? অনেক পদ রান্না করতে হবে, তার জন্য সময় দিতে হবে, বাজারে ঘুরে ঘুরে অনেক রকম আনাজ কিনতে হবে, তার জন্য সময় নষ্ট হবে। আর আনাজপাতি কেনার জন্য পয়সা লাগবে, পয়সা উপার্জন করতে হলে আলাদা ভাবে খাটতে হবে, তার জন্য অনেক সময় দিতে হবে। আধ্যাত্মিক পুরুষের অত সময় কোথায়, শরীর রক্ষা করতে হবে তাই একটা কিছু জুটে গেল তাতেই

সন্তুষ্ট হয়ে গেল। এটাই অজগর থেকে দত্তাত্রেয় শিক্ষা নিলেন, যা সামনে আসছে সেটাকেই ধরে খেয়ে নিল। শুধু খাওয়ার ব্যাপারেই নয় ইন্দ্রিয়ের যত রকমের বিষয়তৃষ্ণা আছে সেখানেও এই একই মনোভাব।

সুখ যদি এমনিই আসে আর দুঃখও যদি এমনিই আসে তাহলে কি মানুষ কাজকর্ম বন্ধ করে বসে থাকবে? আমাদের মনে রাখতে হবে, এখানে দত্তাত্রেয় কিন্তু গৃহস্থ ধর্ম নিয়ে কথা বলছেন না। যদু রাজা দত্তাত্রেয়কে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কোথা থেকে এই শান্তি পেয়েছেন? এর উত্তর দিতে গিয়ে অবধূত যে চব্বিশ গুরুর কথা বলছেন তাতে মূলতঃ সন্ন্যাস ধর্মেরই কথা বলছেন। সন্ন্যাসীরা যা পেয়ে যান তাই খেয়ে নেন, যতটুক পান ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকেন। ভাগবত তো গৃহস্থদের গ্রন্থ, তাহলে গৃহস্থদের কাছে এই কাহিনীগুলো কেন শোনান হয়? এই যে অজগরের কথা বলছেন, অজগরের মত অক্রিয় হয়ে পড়ে থাক, যা জুটে যাবে তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; এতো সন্ন্যাসীর ধর্ম হয়ে গেল, সন্ন্যাসীর ধর্ম তো উপনিষদে দেওয়া আছে, ভাগবতে কেন বলছেন? তাহলে গৃহস্থরাই বা কি করবে? মূল কথা হল যার যেটা ধর্ম সেই ধর্মের বাইরে কাউকে যেতে নেই। যেমন যে ছাত্র, তার ধর্ম পড়াশোনা করা, সে পড়াশোনা করে যাচ্ছে। ভাগবত এই কাহিনীর মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তুমি পড়াশোনা করে যাও, এটাই তোমার ধর্ম, কিন্তু ফলের কোন প্রত্যাশা করবে না, নিজে থেকে যা ফল আসার আসবে। তুমি চাকরির জন্য দরখাস্ত করবে, তুমি পড়াশোনার তপস্যা করেছ, তাই তুমি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য তুমি ভালো চাকরি পাবে। ভালো চাকরি পেয়ে এবার তুমি ধর্ম পথে চল, কারণ তুমি গৃহস্থ। কিন্তু যারা ধর্ম পথে থাকে না তারা চাকরি করে মাইনে পাচ্ছে কিন্তু চেষ্টা করছে কি করে ঘুষ নিয়ে আরও বেশি উপার্জন করা যায় বা অফিসের সম্পত্তি চুরি করবে, এগুলোকে বন্ধ করতে বলছেন। দ্বিতীয় যেটা গৃহস্থদের উদ্দেশ্যে বলছেন, গৃহস্থকেও বেশি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতে নেই, তাতে শরীর ভালো থাকে, মনও ভালো থাকে আর অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হয়। কিন্তু তিন আর চার নম্বর শ্লোকে পুরোটাই সন্ন্যাসীদের জন্য বলছেন।

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ। যদি নোপনমেদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্।। ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্ দেহমকর্মকম্। শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি।।১১/৮/৩-৪।। খাবার যদি নিজে থেকে না আসে তখনও অজগরের মত পড়ে থাকতে হয়, নিজে থেকে যা আসবে সেটুকুতেই শরীর মনের চাহিদা মিটিয়ে দিতে হয়। সন্ন্যাসীদের জন্য এখানে চরম মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন, এতটা চরমে যাওয়ার যে দরকার আছে তা নয়। অবধূত সন্ন্যাস ধর্মের কথাই বলছেন, তবে গৃহস্থরা এর যতটা সম্ভব পালন করবে। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থরা এক আনা ত্যাগ করতে পারে। তবে কোন কিছুর জন্য বেশি ছটফট করতে নেই। গৃহস্থদের উচিত বছরে একটা দিন বাড়িতে যা যা জিনিস আছে সব জিনিসের হিসাব করা, ঘটি-বাটি থেকে শুরু করে জামা-কাপড় যা আছে। এবার যে যে জিনিস তার মাথায় নেই যে এই জিনিসটা আমার আছে, ঐ জিনিসগুলোকে বিদায় করে দিতে হবে, তার মানে ঐ জিনিসগুলো তার দরকার নেই। কারুর যদি একশ খানা শাড়ি থাকে, সব শাড়ির কথা নিশ্চয়ই মনে থাকবে না, কবে কোথায় পেয়েছে বা কিনেছে, কিন্তু তার মধ্যে তিরিশ চল্লিশটা শাড়ির কথা মাথায় আছে, এবার বাকি সব কটা শাড়িকে বিদায় করে দিতে হবে। শুধু শাড়ি নয়, যা যা জিনিসের কথা মাথায় নেই সেই সেই জিনিসগুলোকে বিদায় করে দিক। অনেকে বলবে, ভবিষ্যতে এগুলো লাগবে। কিছুই লাগবে না, ভবিষ্যতে যখন লাগবে তখন তুমি ঠিক আবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে বা কিনবে। এই নিয়ে একটা বিদেশী কাহিনীও আছে, একজন মহিলা এই ভাবে চেকিং করে মাঝে মাঝে সব কিছু বিদায় করে দিত। একদিন তার স্বামী এসে বলছে, আমি শুনলাম তুমি নাকি বাড়ির অনেক জিনিস বিদায় করে দিয়েছ। মহিলা বলছে, তুমি বল তুমি কি কি জিনিস হারিয়েছ, তাহলে আমি বুঝব আমি এই রকম করেছি কিনা। ভদ্রলোকের একটা স্বভাবই ছিল যেখানে যা কিছু মেশিন পায় কিনে আনে, কিছু দিন উপরে রেখে দেয় তারপর বেসমেন্টে রেখে দেয়, জিনিস জমছে তো জমছেই। পাঁচ-ছয় বছর ধরে পড়ে আছে অথচ ভদ্রলোক ভুলেই গেছে কবে কি মেশিন কিনে নিয়ে এসেছিল। মহিলা তাই বলছে, আগে তুমি বল তুমি কি কি জিনিস হারিয়েছ তবে আমি বলব আমি কি করেছি। বেচারী আর কিছু বলতে পারছে না, কারণ যা যা ওর মনে আছে সবটাই আছে। সবাই একগাদা ফালতু জিনিস জমিয়ে রেখে আবর্জনা তৈরী করে

রাখে, এভাবেই গৃহস্থদের পরিষ্কার করতে হয়। তবে এখানে কর্মেন্দ্রিয়ের যে চেষ্টা করা হয়, সন্ন্যাসীদের সেটা নিষেধ করছেন, সন্ন্যাসী কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। এই শিক্ষা অজগর থেকে পেয়েছেন।

১০) সমুদ্র

দত্তাত্রেয়র দশম গুরু সমুদ্র। *মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ। অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ।।*১১/৮/৫। সাধকের জীবন সমুদ্রের মত হবে। এগুলো সবই আখ্যায়িকা, কাহিনীর সব কিছু নিতে নেই কিন্তু এর যে মূল ভাব সেটাকে গ্রহণ করে গভীর ভাবে অনুধাবন করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা সাধকের কাজ। সাধক মানে, একটা পাখি ডিম থেকে বেরিয়ে প্রথমে মাটিতে হাটতে থাকে, ওটাতেই ওর মজা, তবে মা ওকে জোর করে ওড়াতে শেখায়, প্রথম যেদিন পাখির শাবক মাটিকে ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল, ওর জীবনটা সেই মুহুর্তে পালটে গেল, সাধক মানে সে এখন সবে মাটিতে হাটছে, কিন্তু যেদিন মাটি ছেড়ে দেবে, তার ব্যপ্তিটাই পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। *মুনিঃ প্রসন্ন*, সাধক সব সময় আনন্দে থাকবে। যা কিছু জীবনে হারিয়েছে তার থেকে বেশি সাধকের কাছে আছে, তার কিসের দুঃখ! সব সময় আনন্দে থাকবে। দত্তাত্রেয় এখানে মুনিদের কথা বলছেন। স্বামীজী বলছেন যাদের মুখ সব সময় গোমড়া হয়ে থাকে তারা কখনই আধ্যাত্মিক হতে পারেনা। যদি তোমার গোমড়া মুখ থাকে তাহলে তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাক, বাইরে তোমার মুখ দেখিও না। আমাদের শাস্ত্রের এটি একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সব সময় চোখের জল ফেলাটা খ্রীশ্চানদের মধ্যে আছে। হিন্দুদের মধ্যেও অনেককে বলতে শোনা যায় ব্যাকুলতা চাই, তার জন্য চোখের জল ফেলতে হবে। কিন্তু সেই ব্যাকুলতা আলাদা। আধ্যাত্মিক পুরুষ বিশেষ করে যিনি জ্ঞানী, তিনি সব সময় প্রসন্ন থাকবেন। তাই বলে তার আচারণে কোন ছ্যাবলামো থাকবে না। চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, ঈশ্বরের যিনি ভক্ত তিনি কখনই গ্রাম্য কথা করবেন না, পরনিন্দা, পরচর্চা কিছুই করবেন না। একদিকে প্রসন্ন অন্য দিকে গম্ভীর, ভেতরটা গভীর কোন তল পাওয়া যাবে না। খুব কঠিন, কিন্তু এটাই পথ, *দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি*, ঋষিরা বলে গেছেন আধ্যাত্মিক পথ অত্যন্ত দুর্গম। হিমালয়ে কেদারবদ্রী যাচ্ছে, অর্দ্ধেক পথ পেরিয়ে আসার পর আর কোন পথ থাকে না, এবার তাকে যেতেই হবে, এছাড়া আর কোন পথ নেই। মানবজীবন একবার যখন পাওয়া গেছে, তার মানে অর্দ্ধেক রাস্থা পেরিয়ে এসেছে, এবার আর তার কোন পথ নেই। যদি বলে আমি আর এই দুঃখ নিতে পারছি না, আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়েই থাকব, একটা স্ত্রী মরে গেলে আরেকটা স্ত্রী নিয়ে আসব, তার মানে হিমালয়ের পাহাড়ি রাস্থাতে সে বসে পড়েছে, বলছে আমি আর এগোব না। সে কিন্তু বাঁচবে না, যেখানে ছিল ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আধ্যাত্মিক জীবনে কোন কিছু হারিয়ে যাবে না, যতটুকু এগিয়েছে ততটুকুতেই দাঁড়িয়ে থাকবে, পিছিয়েও আসবে না, এগিয়েও যাবে না। সেইজন্য এগিয়ে চল, গম্ভীর হবে, ছ্যাবলামো চলবে না।

বেলুড় মঠের একাদশ প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ। তিনি যখন ব্রহ্মচারী ছিলেন তখনও তাঁর নাম ছিল সৌম্য চৈতন্য। গম্ভীর মহারাজ সব সময় চিন্তার জগতে বিচরণ করতেন আর লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অনেক দিন তিনি মঠের জেনারেল সেক্রেটারিও ছিলেন। একবার একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল। ফটো নেওয়ার সময় একজন মহারাজ তাঁকে বললেন 'মহারাজ একটু হাসুন'। উনিও সেই রকম মজা করে গম্ভীর ভাবে বললেন 'আমার নাম গম্ভীরানন্দ'। বলেই আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। ওনাকে হাসতে দেখা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল, একেবার গম্ভীর। হাসতেন না তা নয়, কখন সখন মজা করতেন। খুব কম। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল হাসি, হাহা হিহি করা বিশেষ করে ভক্তদের সাথে, কোন প্রশ্নই নেই। একবারে গম্ভীর আত্মা। আধ্যাত্মিক পথে যাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন তাঁদের এই গম্ভীর আত্মা হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লক্ষণ, যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে খুব সহজ সরল হবে। তার সাথে তাঁর ভাব হবে *দুর্বিগ্রাহ্যো*, অন্তরে ঈশ্বরীয় ভাব এতই গভীর যে তাঁর কোন তল পাওয়া যাবে, তাঁকে কখনই কেউ মাপতে পারবে না। আধ্যাত্মিক সাধনা না করা থাকলে বাইরেরটা গম্ভীর হবে না আর ভেতরের ভাবও গভীর হবে না। গম্ভীর,

মানে বাইরেরটা একেবারে শান্ত, কোন রকম ছ্যাবলামো নেই আর গভীর মানে তাঁর ভেতরে ভাবের কোন তল পাওয়া যাবে না।

দুরত্যয়ঃ, তাঁর ভাব, জ্ঞান, ভালোবাসা সব অপার অসীম। একটা সাধারণ মানুষের জীবনের যদি ইতিহাস লিখতে বলা হয় তাহলে দু-চারটে বাক্যে সেই ইতিহাস লিখে দেওয়া যায়। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, একটা জিনিস যখন সবারই মধ্যে ছড়িয়ে যায় তখন তার গভীরতা হারিয়ে যায়। কিন্তু ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাব, এনাদের ভাবের যেমন গভীরতা তেমন বিস্তার। এনাদের জীবনী যদি লিখতে বসা হয় তখন এনাদের ব্যক্তিত্বের কত দিক এসে হাজির হয়ে যাবে, লিখে শেষ করা যাবে না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকরা একটা বিষয়কে নিয়ে অনেক গভীরে চলে গেছেন, কিন্তু ওই একটা বিষয় ছাড়া আর কিছু জানেন না। আগেকার ডাক্তাররা সব ধরণেরর রোগের চিকিৎসা করতে জানতেন, কিন্তু এখন যে ডাক্তার কানের রোগের ব্যাপারে জানে সে কানের পাশে যে চোখ আছে তার রোগের কথা জানে না। আর কিছু দিন পরে এও দেখা যাবে সে ডান কানের খবরই জানে বাম কানের ব্যাপারে জানে না। গভীরে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার পাশে কি হচ্ছে তা জানে না, তার মানে গভীর ভাবে তার আর বিস্তার হয় না। স্বামীজী ঠাকুরের নামে বলছেন, তাঁর ভাব অত্যন্ত গভীর কিন্তু সাংঘাতিক বিস্তার। যে কোন সাধক এই রকমই হবেন, গভীর আর তার সাথে বিস্তার। স্বামী গম্ভীরানন্দ মায়ের জীবনী খুব সুন্দর একটা আঙ্গিকে রচনা করেছেন। মায়ের ব্যক্তিত্বের এক একটা দিক নিয়ে এক একটি অধ্যায়কে সাজিয়েছেন। 'সঙ্ঘমাতা' নিয়ে একটা অধ্যায়, 'মাতৃভাব' নিয়ে আরেকটি অধ্যায়। মায়ের এক একটি ভাব নিয়ে লিখে গেছেন, আর কোন ভাবের সঙ্গে মিল নেই। অবতার বা বড় মহাত্মাদের ব্যক্তিত্বকে কখনই মাপা যায় না। পার্থিব শরীর চলে যাওয়ার পর একশ দেড়শ বছর পর তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানান ধরণের প্রবন্ধ লেখা চলতেই থাকে। কিছু দিন আগে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে 'শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ভাষা চিন্তন'। ঠাকুরের কথা বলার ভঙ্গিমাতেই নতুন একটা ভাষার জন্ম নিয়েছে। এই রকম কত দিক নিয়ে লেখা বেরোচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে যে আমরা এইটুকুর মধ্যে বেঁধে দেব, সেটা কোন ভাবেই হবে না। ভাগ্যিস তখন ভিডিওগ্রাফি ছিল না, তা নাহলে 'শ্রীরামকৃষ্ণের আঙ্গিকে নৃত্যের ঘরানা' নামে নাচের একটা আলাদা ঘরানাই সৃষ্টি হয়ে যেত, যেমন কথকলি, ওড়িশি নৃত্য আছে। সেই রকম ঠাকুরে গানের ব্যক্তিত্ব আরেকটা দিক, শ্রীরামকৃষ্ণের গানের শৈলী নিয়েও বিচিত্র বিচিত্র রচনা লেখা যায়। ঠাকুরের ভালোবাসা এটা আরেকটা ব্যক্তিত্ব। ঠাকুরকে একজন ব্রাহ্মভক্ত বলছেন মশাই আপনি জানেন না কি করে দল গড়তে হয়। কিন্তু আজ দেখুন ব্রাহ্ম সমাজ কোথায় হারিয়ে গেল আর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দিনে দিনে প্রসারিত হয়ে চলেছে। ঠাকুরই আবার ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনকে বলছেন, তুমি লোক দেখে শিষ্য কর না বলে তোমার দল ভেঙে যায়। ঠাকুরও জানতেন কীভাবে দল গড়তে হয়। *দুরত্যয়ঃ*, আমি তাঁকে কোন ভাবেই মেপে নিতে পারব না। যিনি মহাত্মা তাঁকে একটা দুটো কথা দিয়ে বাঁধতে পারব না। চৈতন্য সত্তা যখন নিজে থেকে তাঁর মধ্যে খেলা করতে শুরু করবেন তখন তিনি যেদিকেই মন দেবেন সেটাতেই তিনি প্রভুত্ব অর্জন করবেন।

অনন্তপারো, সমুদ্রের কোন কুল কিনারা পাওয়া যায় না। সাধকেরও কোন পার পাওয়া যাবে না। কোন কিছুতেই সমুদ্রে ক্ষোভণ হয় না। চারিদিক থেকে নদী, খাল, নর্দমার জল সমুদ্রে এসে পড়ছে কিন্তু তার জন্য সমুদ্রে কোন রকম ক্ষোভণ হয় না। সমুদ্রকে দেখে কেউ টের পায় না যে চারিদিক থেকে জলরাশি অনবরত এসে পড়ছে। গীতাতে যে কথা ভগবান বলছেন *তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে*, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। রাগ, দ্বেষের বৃত্তি সাধকের হৃদয়কে ক্ষোভিত করতে পারবে না। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন – আমাকে তোমার কি মনে হয়? আপনি মহাপুরুষ। কেন মহাপুরুষ মনে হচ্ছে? আপনার তো রাগ নেই। ঠাকুর হেসে বলছেন – কেন, সেদিন ঘোড়াওয়ালা আসবে বলে আসেনি তখন তার উপর রাগ করেছিলাম। ভক্ত তখন বলছেন – সেট তো লোকশিক্ষার জন্য।

ক্ষোভণ মানে? আমি আর আমার রাগ এক হয়ে গেল। কিন্তু আমি আর আমার রাগের বৃত্তি দুটো আলাদা। শুধু রাগের বৃত্তিই নয়, যে কোন বৃত্তি, কোন চিন্তা করছি, চিন্তাটা আলাদা আমি আলাদা, লোভ মানে লোভের বৃত্তি আলাদা আমি আলাদা, সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, এই ইচ্ছা বৃত্তিটা আলাদা আমি আলাদা।

আমরা আমি আর আমার বৃত্তি এই দুটোকে আলাদা করতে পারিনা। রেগে টং হয়ে একেবারে দাবানল হয়ে গেছে। কে দাবানল হয়েছে? যে রেগে গেছে। মানুষ কি কখন দাবানল হতে পারে? কারণ তখন তার মনে শুধু ক্রোধ বৃত্তিই আছে অন্য কিছুই নেই। ভগবানেরও এই অবস্থা হয়। ঠাকুরই বর্ণনা করছেন, নৃসিংহ অবতার যখন হিরণ্যকশ্যপুকে জানুতে বসিয়ে হিরণ্যকশ্যপুর বুকটা চিড়ে দিচ্ছেন তখন ভগবান এত রেগে গেছেন যে ভগবানের সামনে দেবতারা, এমনকি লক্ষ্মীদেবীও দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। তাঁকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। প্রহ্লাদ এসে স্তুতি করাতে তারপর তিনি আস্তে আস্তে শান্ত হলেন। ভগবান তখন তমোগুণকে আশ্রয় করে বধ করেছিলেন বলে এই রাগ বৃত্তিটাকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করার পর বিভীষণকে বলছেন 'যত দিন মানুষ বেঁচে থাকে তত দিনই শত্রুতা, মরে যাওয়ার পর আর কিসের শত্রুতা! রাবণ একজন বীর ছিলেন যাও সসম্মানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন কর'। শ্রীরামচন্দ্রের কোন ক্ষোভণ হয়নি, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। সংসারে থাকতে গেলে কিছু পেয়ে গেলে যেমন উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই তেমনি কিছু চলে গেলেও হতাশ হতে নেই।

আমাদের মনে যে চাঞ্চল্য হয়, আসলে বস্তুই ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করে দেয়। হিন্দু ধর্ম মতে, পাঁচটি তন্মাত্রা সংমিশ্রণে বস্তু তৈরী হয়, তেমনি এই পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়েই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৈরী। ইন্দ্রিয় আর বস্তু সুযোগ পেলেই এক অপরের সাথে মিলিত হতে চায়। শুধু মিলতেই চায় না, কিছু ব্যাপারে মিলতে চায় আবার কিছু ব্যাপারে সরে আসতে চায়। সৌন্দর্য যে তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত চোখও সেই তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত, সুন্দর ধ্বণি যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরা আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ও সেই তন্মাত্রা দিয়ে নির্মিত। সেইজন্য কুৎসিৎ, কুরূপ থেকে চোখ সরে আসতে চায়, কর্কশ ধ্বণি থেকে কান সরে আসতে চায়। যদি সুন্দর দৃশ্য হয় তখন মানুষ সেই দৃশ্যের দিকে এগোতে চায়। ক্ষোভণ তখনই হয় যখন ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বস্তুর সংযোগ হয়। হঠাৎ যদি বলা হয়, একটা বিষধর সাপ, সবাই চমকে উঠবে, কারণ সবারই মৃত্যুভয় আছে। আমি বিষধর সাপ দেখলাম, আমার চোখে তার ছবিটা গেল, মস্তিষ্কে সেই সংবাদ গেল, জ্ঞানকে বিচারের প্রক্রিয়া করল, এরপর ভেতরের যিনি চৈতন্য তিনি এবার তার প্রতিক্রিয়াটা ছাড়লেন। আমাদের জীবন মানেই প্রতিক্রিয়া ছাড়া, সব কিছুতে আমরা প্রতিক্রিয়া করছি, ক্রিয়া কিছুই করছি না। আমার খিদে পেয়েছে, পেট থেকে সূচনা আসছে, আমি তখন প্রতিক্রিয়া করছি, মানে আমি খাচ্ছি। গরমে জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভেতর থেকে সিগন্যাল দিচ্ছে, আমি প্রতিক্রিয়া করছি। কেউ আমাকে একটা কথা বলল, আমি প্রতিক্রিয়া করছি। রাস্থায় যেতে যেতে একজন পরিচিতের সাথে দেখা হল, মস্তিষ্কে সিগন্যাল গেল, আমি তার সাথে কথা বলতে চাইছি। অপছন্দের লোক, মুখে কিছু বলা যাবে না, মনে মনে দুটো গালাগাল দিয়ে দিলাম। সবটাতেই আমরা প্রতিক্রিয়া করি। ক্রিয়া আমরা কখনই করি না, ক্রিয়া করি যখন আধ্যাত্মিক চিন্তন হয় বা সৃজনশীল পুরুষরা যখন কোন সৃজন করেন।

এখানে সমুদ্রের উপমা নিয়ে বলছেন, ইন্দ্রিয়ের বস্তু গুলো চুম্বকের মত এসে তোমাকে ধাক্কা মারবে, ধাক্কা মারলে তোমার ইন্দ্রিয়গুলো প্রতিক্রিয়া করবেই। ইন্দ্রিয় গুলো স্বভাবতই চঞ্চল, সব সময় নিজের বস্তুর সাথে মিশতে চায়, বাচ্চা দেখলেই যেমন আমাদের আদর করতে ইচ্ছে করে। যতক্ষণের মধ্যে ইচ্ছা হবে ততক্ষণে হাতটা এগিয়ে যাবে, এটাই স্পর্শসুখ। কিন্তু হাত তো নিজে থেকে যায় না, ওকে দেখল চোখ, চোখ নিয়ে ফেলে দিল ব্রেনে, ব্রেন ওখান থেকে সিগন্যাল দিচ্ছে, এটা স্পর্শ সুখ, হাত তুমি এগিয়ে এসো। কত লম্বা প্রক্রিয়া অথচ আমরা বুঝতেও পারছি না। যাঁরা সাধক, যাঁরা যোগী তাঁরা ঐ প্রতিক্রিয়া করার যে শক্তি, ঐ শক্তিটা পুরো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। গ্রামের এক জমিদার একটা নতুন দুর্দান্ত ঘোড়ায় বসেছে আর ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে। ক্ষেতে একজন কাজ করছিল সে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, বাবু এত দৌড়ে কোথায় চললেন? জমিদার বলছে, আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, ঘোড়াকে জিজ্ঞেস কর। ঘোড়া তার নিজের মত দৌড় করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও তাই, আমরা জীবনে কিছুই করছি না, ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের দিয়ে যা করায় আমরা সেটাই করছি। ইন্দ্রিয়গুলো হল সেই দুরন্ত ঘোড়া, একটা দুটো ঘোড়া নয়, পাঁচটি দুর্দান্ত ঘোড়া আমাদের দৌড় করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের আটকানো মানে, ওরা যে প্রতিক্রিয়া করছে, ওটাকে টেনে নেওয়া। প্রতিক্রিয়াকে আটকানোর শক্তি তখনই আসে যখন ক্রিয়া করার শক্তি হয়। এই শক্তি একমাত্র জপধ্যান,

তপস্যাতেই হয়, জপধ্যান, তপস্যা ছাড়া এই শক্তি হবে না। দত্তাত্রেয় এটাই বলছেন, *অক্ষোভঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ*, সমুদ্রে কত কিছু হচ্ছে, তাতেও সমুদ্র জোয়ার-ভাটা, তরঙ্গরহিত শান্ত, এই গুণগুলো আমি সমুদ্রের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি। আমাদের মন শান্ত, তরঙ্গরহিত হয়েছে কিনা তার একটাই পরীক্ষা, যদি কোন অশান্ত লোক এসে তাঁর পাশে এসে বসে তারও মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাবে। আর আমার সামনের লোকটি শান্ত, পবিত্র কিনা বোঝা যাবে, তাঁকে দেখে আমার মনে পবিত্রতার ভাব জাগছে কিনা, মন শান্ত হচ্ছে কিনা। যদি কোন বড় লেখক বা বড় কোন ক্রিকেট প্লেয়ারের কাছে থাকা যায় তখন এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও মনে আসবে, ইস আমিও যদি ওর মত বড় প্লেয়ার হতে পারতাম।

আবার বলছেন, *সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ। নোৎসর্পতে ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ।।১১/৮/৬।। নারায়ণপরো মুনি* মানে ভগবৎপরায়ণ মুনি, যিনি ঈশ্বরে পুরোপুরি নিজেকে সমর্পিত করে দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন একটা আদর্শকে নিয়ে নিয়েছেন, তা সে যে আদর্শই হোক, বিদ্যার আদর্শই হোক আর সেবার আদর্শই হোক, ঐ একটা আদর্শে তাঁর ভেতরটা একটা শক্তিতে এমন ভরে যাবে যে তাঁকে যদি কোন জাগতিক পদার্থ দিয়ে দেওয়া হয় তাঁতে তিনি এক বিন্দুও উল্লসিত হবেন না, আর তাঁর থেকে যদি কিছু নিয়েও নেওয়া হয় তাঁতেও তিনি বিন্দু মাত্র বিষন্ন হবেন না। *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং* সমুদ্র একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, ঐ পরিপূর্ণ সমুদ্রে যত জলই প্রবেশ করুক তাতে সমুদ্রে কোন ক্ষোভণ হবে না, আর সমুদ্র থেকে যদি কেউ এক বালতি জল নিয়ে নেয় তাতেও সমুদ্রের কোন কিছুই হবে না। বোঝাই যাচ্ছে, যাঁরা খুবই উচ্চমানের সাধক তাঁদের কথাই বলছেন। কিন্তু আমাদের মত সাধারণদেরও এই জিনিসটাকে দৈনন্দিন জীবনে একটু অনুশীলন করতে হয়, অন্তত সব কিছুর ব্যাপারে একটা লাইন টেনে দিতে হয়, এতটুকু ভোগ করা যেতে পারে, এতটুকু যদি চলেও যায় আমার কোন দুঃখ হবে না, একটা লাইন টেনে দিয়ে ঠিক করে নিতে হয় এই লাইনের বাইরে আমি যাবো না। ঠাকুর যেমন গৃহস্থদের বলছেন স্বদারা গমনে দোষ নেই কিন্তু সন্ন্যাসীদের বলছেন, সন্ন্যাসী স্ত্রীর চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। তার মানে গৃহস্থদের লাইনটাকে পরিষ্কার করে টেনে দেওয়া হল, এর বাইরে আর না। এই ধরণে উচ্চতম আদর্শের কথা শুনে শুনে নিজের রেখাটা টেনে দিতে হয়, আমি এর বাইরে আর যাবো না। এই ভাবগুলো জীবনে অবলম্বন করলে তখনই একটা শান্তি আসে।

১১) পতঙ্গ

দত্তাত্রেয়র একাদশ গুরু পতঙ্গ। পতঙ্গের চোখের লেন্স এমন ভাবে করা থাকে যার ফলে এরা আলোর দিকে আকর্ষিত হয়। শরীরে আগুনের তাপ লাগলে পতঙ্গও সরে যেতে চায় কিন্তু চোখের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ লেগে থাকে যে সবাই আগুনের মধ্যে গিয়েই পড়ে। বড় আগুন লাগিয়ে দিলে সব পোকা ঐ আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দেবে। পতঙ্গ থেকে দত্তাত্রেয় কি শিক্ষা পেলেন? *দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রলোভিতঃ পতত্যান্ধে তমোস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ।।*১১/৮/৭। স্ত্রী হল দেবমায়া, দেবতাদের মায়া। দেবতাদের মায়া এই জন্যই বলছেন, দেবতারা প্রায়ই ঋষি মুনিদের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য মেয়েদের কাজে লাগান। এই প্রথা প্রথম থেকেই চলে আসছে, সৃষ্টিতে কোন প্রলোভন যদি তৈরী করতে হয় সব সময় মেয়েদেরকেই ব্যবহার করা হয়। ইদানিং কালে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর অধীনে বিদেশে একটা গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে। কাউকে ট্র্যাপে ফেলার জন্য এরা সব সময় মেয়েদেরকেই কাজে লাগায়, এর নামই হল, হানি ট্র্যাপ। চাণক্য বিষকন্যা নামে একটা নতুন পদ্ধতি বার করলেন, কোন রাজাকে যদি মারতে হয়, বিষকন্যা তৈরী করে রাজার কাছে উপহার রূপে পাঠিয়ে দেওয়া হত। যে মেয়েকে বিষকন্যা তৈরী করা হবে তার রূপ এমন হত যে রাজা আকৃষ্ট হয়ে ওই মেয়েকে যদি চুম্বনও করে সেখানেই রাজা মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, এত তার শরীরকে বিষাক্ত করে দেওয়া হত। সত্যিই বিষকন্যা হত কিনা আমাদের জানা নেই, অন্য কোথাও এর উল্লেখ আমরা পাই না। তবে দেবতা থেকে শুরু করে ক্ষমতাবান লোকেদের কাছে আজ পর্যন্ত মেয়েদের দিয়ে কাউকে ফাঁসানোটা একটা খুব প্রচলিত পদ্ধতি। বলা হয় যে, কোন মেয়ে যদি ঠিক করে নেয় আমি কোন পুরুষকে ফাঁসাবো, সেই পুরুষকে ভগবানও আর বাঁচতে পারবেন না। একজন নামকরা মহিলা কিছু দিন আগে খুব গর্ব

করে বলছিল, কোন পুরুষ জন্মায়নি আমরা মেয়েরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করব আর সে আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, বিশেষ করে যারা কামী পুরুষ, নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর যাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কোন নারীরূপ দর্শন করে নিলে, নারীর চোখের চাহনি, হাত নাড়া, মিষ্টি কথা শুনে নিলেই এদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। পতঙ্গ যেমন আলোর প্রতি আকর্ষিত হয়ে আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষও ঠিক ঐভাবে নারীর রূপে আকর্ষিত হয়ে ঐ রূপের আগুনে দগ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যায়। কোন পুরুষ যদি কোন মেয়ের চোখের জল মুছতে নেমে যায় বুঝে নিতে হবে সে এবার মরল। চামচ দিয়ে সমুদ্রের জল ছেঁচে ফাঁকা করে দেওয়া যাবে কিন্তু কোন মেয়ের অশ্রুজল বিমোচনে যদি নেমেছে, সে জীবনে আর ঐ জল শেষ করতে পারবে না। যে মেয়েই হোক, বিধবার চোখের জলই হোক, ডিভোর্সির চোখের জলই হোক, একবার ঐ চোখের জল মুছতে যদি কেউ নেমেছে ঐ পতঙ্গের মত অবস্থা হতে আর বেশি দেরী হবে না। কারণ পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শক্তি অনেক বেশি, মেয়েদের শক্তি অন্য দিকে থাকে। আর ইমোশানালি মেয়েরা একেবারে জিরো। জিতেন্দ্রিয় মানে, যার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আছে। সব কটি ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আছে কিন্তু তার মধ্যে যদি কোন একটা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলেও সে কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়। দত্তাত্রেয় মূল কথা বলছেন শুধু নারীকে নিয়ে।

এখানে শুধু মেয়ে বলছেন না, বলছেন রূপ। সংস্কৃতে শব্দটাকে ব্যবহার করা হয় শোভন অধ্যাস। শোভন মানে সুন্দর, সুন্দরের প্রতি একটা আসক্তি। নারীর রূপের আকর্ষণের ব্যাপারে অজিতেন্দ্রিয়দের পরিণতি সম্বন্ধে যে শুধু ভাগবতই বলছেন তা নয়; বিশ্বের অনেক সাহিত্যে, প্রবন্ধেই বর্ণনা করা হয়েছে। আলডাস্ হাক্সলে খুব বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন, ওনার একটা বই আছে 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট'। বইয়ের একটা ছোট্ট অংশে একটা চরিত্রকে নিয়ে লিখছেন, রাত্রিবেলা গাড়ি করে যাচ্ছে। গাড়ির হেডলাইটে দেখছে একটা মেয়ে শেয়াল এক পাশ থেকে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে আর তার পেছনে একটা পুরুষ শেয়াল দৌড়াচ্ছে। মেয়ে শেয়ালটা পার হয়ে গেছে কিন্তু পুরুষ শেয়ালটা গাড়ির চাকার তলায় পিষে গেছে। যিনি মূল চরিত্র তিনি বলছেন মেয়েদের পেছনে দৌড়ালে এই পরিণতি। নারীকে নিয়ে এই সমস্যা চিরন্তন। এখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে নিয়ে বলা হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার আসক্তিতে থেকে যে বিপদ আসে সেই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন কপোত-কপোতীর থেকে। স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসবে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে এটা নতুন কিছু না আর অস্বাভাবিক তো নয়ই। তাই বলছেন বাপু এই মোহের মধ্যে তুমি পড়বেই, সেইজন্য আগে থেকেই তুমি মোহের মধ্যে পড়তে যেও না। এই শিক্ষাটা পেয়েছিলেন পায়রার কাছ থেকে। কিন্তু পতঙ্গের কথা বলা হচ্ছে অজিতেন্দ্রিয়কে নিয়ে। অজিতেন্দ্রিয় যে কোন লোক সে রাজাই হোক মরবে, বিয়েথা করেছে কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় সেও মরবে, সন্ন্যাসী অজিতেন্দ্রিয় সেও মরবে। অজিতেন্দ্রিয় যেই হবে সেইই পতঙ্গের মত মরবে।

আট নম্বর শ্লোকে বলছেন, মানুষের যা কিছু আছে, ধন, সম্পদ, বিদ্যা, মান, যশ ওর মধ্যে একটা মেয়েকে নিয়ে আসা হোক, তার সব কিছু, অর্থের নাশ হয়ে যাবে, মান যশ চলে যাবে, শরীরের তেজ চলে যাবে। তীর্থে গিয়ে মানুষ নিজের স্ত্রীকে সামলায়, বাচ্চাকে সামলায়, তীর্থে গিয়ে ধর্ম করা আর হয় না। একটা ভালো কিছু খাওয়ার ইচ্ছে হলে পূরণ করতে পারে না, ভাবে স্ত্রীকে দেব, সন্তানকে খাওয়াবো। সব জায়গার জল যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, ঠিক তেমন একজন পুরুষের যাবতীয় ধর্ম, অর্থ যা কিছু অর্জন করে সব ঐ একটি ঘোগের গর্তে গিয়ে ঢুকে যায়।

১২) ভ্রমর

অবধূতের দ্বাদশ গুরু ভ্রমর, বলছেন *স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা। গৃহানহিংসান্নতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ।।১১/৮/৯*।। মাধুকর হল মধুকর, মধুকরের দুটি অর্থ হয়, একটা হয় ভ্রমর আরেকটা অর্থ মৌমাছি। মধুকর মানে যে মধু পান করে, মধু দুজন পান করে, একটা ভ্রমর আর অপরটি মৌমাছি। মধুর চাক মৌমাছিরও হয় আর ভ্রমরেরও হয়। এখানেও সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যেই বলছেন, কোন গৃহস্থকে সন্ন্যাসী পীড়া দেবে না। ভ্রমর বিভিন্ন ফুল থেকে মধু পান করে। একটা ফুল থেকেই সে মধু

নেয় না। সন্ন্যাসীরও উচিত অনেক গৃহস্থ বাড়ি থেকে ভিক্ষা করা। একটা বাড়ি থেকে ভিক্ষা নিলে সেই গৃহস্থের পক্ষে সেটা বোঝা হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী ভ্রমরবৎ জীবন ধারণ করে কোন গৃহস্থকে উত্যক্ত করবে না। বলা হয় যে, ভারতের দুটো সম্প্রদায় কখনই অভাবগ্রস্ত হবে না। প্রথম হল সন্ন্যাসী আর দ্বিতীয় হল সৈন্য, সন্ন্যাসী আর সৈন্য কোন দিন অভাবগ্রস্ত হবে না। সৈন্যদের সরকার খাওয়ায় আর সন্ন্যাসীদের সমাজ খাওয়ায়। তাই সন্ন্যাসী কোন দিন মরবে না, সমাজ তাকে খাওয়াবে, সৈন্যও কখন না খেয়ে মরবে না কারণ সরকার তাকে খাওয়াবে। যদি সন্ন্যাসী কোন গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে বলে আপনার বাড়িতে আমি ছয় মাস থাকব। গৃহস্থ কি করবে? সন্ন্যাসীকে যদি ভালোবাসে তাঁকে রাখবে। কিন্তু এখানে এটাকে নিষেধ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অভাবগ্রস্ত, তার বাড়িতে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করলে সমস্যা হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন *স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং*, বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটু একটু করে নেবে। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, সন্ন্যাসী যে কোন বাড়িতে গিয়ে বলবেন, আপনারা যে রান্নাবান্না করেছেন তার থেকে এক গ্রাস ভিক্ষা দিন, এইভাবে তিনি সাত বাড়ি থেকে ভিক্ষা নেবেন। কোন কারণে যদি সাত বাড়িতে গিয়েও খাবার না জোটে তাহলে ঐ দিন সন্ন্যাসী অভুক্তই থেকে যাবেন। সাত বাড়ি কেন বলছেন? এইজন্যই বলছেন, তোমার সময় কত নষ্ট করবে, তোমার সময় লাগাতে হবে জপধ্যানে, আত্মচিন্তনে। সেইজন্য একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হল। এটাও বলছেন না যে পেট ভরার মত, বলে দিচ্ছেন সাত বাড়ি। যদি কোন বাড়ি থেকেই ভিক্ষা না পাওয়া যায় তাহলে বুঝে নেবে ঈশ্বরের ইচ্ছা নেই। চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকতেন, সারা দিন উনি জপধ্যান করতেন আর একটু সময়ের জন্য ভিক্ষায় যেতেন। ভিক্ষা করে শুকনো রুটি নিয়ে আসতেন আর রুটিকে জলে ভিজিয়ে রাখতেন। সেখান থেকে নিজের ইষ্টকে নিবেদন করে নিজে গ্রহণ করতেন। একদিন তাঁর ইষ্ট গোবিন্দ স্বপ্নে বলছেন, রোজ রোজ এই শুকনো রুটি চলে না, সাথে যদি একটু লবণ দাও। উনি কি আর করবেন, আরও তিনটে বাড়ি থেকে লবণ জোগার করতে লাগলেন। এরপর রুটি আর লবণ চলতে লাগল। কিছু দিন পর আবার স্বপ্নে গোবিন্দ দেখা দিয়ে রূপ গোস্বামীকে বলছেন, শুকনো রুটি গলা দিয়ে যায় না, একটু যদি ঘি লাগিয়ে দিতে। স্বপ্নেই উনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এর বেশি আমার দ্বারা হবে না, যদি আপনার এত কিছুর দরকার হয় তাহলে আপনি একজন বড়লোক ভক্ত জোগার করুন। তখন ভগবান দক্ষিণ ভারতের কোন এক রাজাকে স্বপ্নে বললেন, শুকনো রুটি আর লবণ খেতে আমার বড় কষ্ট। এরপর বৃন্দাবনে রঙ্গনাথ মন্দির তৈরী হল, সারাটা দিন ওখানে শুধু ভোগ নিবেদন হয়েই যাচ্ছে। মাধুকরি বৃত্তির এটাই হল সঠিক আদর্শ, নিজের ইষ্টকেও খাওয়াবার জন্য অতিরিক্ত গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা করবে না।

এগুলো হল যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গি, সে সেই রকম শিক্ষা নেবে। এক একজন এক এক মনোভাব নিয়ে দেখছে। দত্তাত্রেয় ভ্রমরের মধুপানকে এইভাবে দেখেছেন। অন্য কেউ বলতে পারে 'আমাদের বাংলা সাহিত্যে ভ্রমরকে চরিত্রহীনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে অনেক ফুল চুষে বেড়াচ্ছে'। সাহিত্যিক ঠিকই বলছেন, তুমি যখন ঐ দিক থেকে দেখে বলছে অনেক ফুল থেকে রস নিচ্ছে সে চরিত্রহীন। কিন্তু অবধূত দেখছেন, বিভিন্ন ফুল থেকে নিলে কি হয়, কোন একটা ফুল থেকে বেশী নিতে হয় না। কিন্তু অবধূত তার থেকেও অনেক বেশী বলছেন একটা ফুলেই যদি সে মধু খেয়ে মত্ত হয়ে পড়ে থেকে বাসা করে নেয়, ফুলের পাপড়ি যখন বন্ধ হয়ে যাবে ভ্রমর তার মধ্যেই শেষ হয়ে পড়ে থাকবে। অনেক ভ্রমর এই ভাবেই মরে। পদ্মফুলের মধ্যে বসে মধু পান করতে করতে এমন মত্ত হয়ে যায় সন্ধ্যে হতে হতে কখন পদ্মফুলের পাপড়ি বন্ধ হয়ে আসে তার কোন হুঁশই থাকে না। কৌপিন কি ওয়াস্তে কাহিনীতে ইঁদুরের থেকে সাধু কৌপিন বাঁচাবার জন্য বেড়াল পুষলেন, বেড়ালের দুধ চাই, গরু কেনা হল, গরুর দেখাশোনার জন্য একটা মেয়েকে আনা হল। সাধু এখন পদ্মফুলে আবদ্ধ হয়ে গেল।

পরের শ্লোকে আরও মজার কথা বলছেন *অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ।।১১/৮/১০।।* প্রথম শ্লোকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে বললেন, সেখানে মধুকর বৃত্তিকে ভ্রমরের উপমা দিয়ে বললেন, ভ্রমর যেমন বিভিন্ন ফুল থেকে অল্প অল্প মধু সংগ্রহ করে, কারণ ফুলকেও বাঁচতে হবে, ঠিক সেই রকম সন্ন্যাসী গৃহস্থ থেকে বেশি ভিক্ষা চাইবে না। দ্বিতীয় বলছেন, ফুল

থেকে কি নেয়? মধু। মধুর আরেকটা মানে সার। ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে বলা হয়, যেটা ঠাকুরেরই কথা – দুটো বৃত্তি, একটা মধুকর বৃত্তি আরেকটা মক্ষিকা বৃত্তি। মধুকর সার টুকু নেয়, আর মক্ষিকা মানে মাছি, মাছি সবই নেয়। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, মাছি কখন সন্দেশে বসছে, কখন পচা ঘায়ে বসছে। অন্যান্য জায়গায় বলবে, সবটাই তো নেওয়া উচিত। ঠিকই সবটাই নেওয়া উচিত, কিন্তু সমস্যা হল উপমা সব সময় একদেশীয়, উপমা আমাদের যতটুকু বলতে চাইছে তার বাইরে তুলনা করতে যেতে নেই। এখানে উপমা দেওয়া হচ্ছে সার, যার মধ্যে বলছেন গুণগ্রাহী। মধুকর বৃত্তির একটা বৈশিষ্ট্য হল গুণগ্রাহী, যেখানে যার মধ্যে যতটুকু গুণ দেখা যাবে তার ঐ গুণটুকুই নেবে, যেখানেই দোষ দেখবে ওটা নেবে না। দোষটাও যদি নিয়ে নাও তাহলে ওটাই মক্ষিকা বৃত্তি হয়ে যাবে। সংসারের দোষগুণ সবটাই যদি নেওয়া হয় তখন সেটাই মক্ষিকা বৃত্তি হয়ে যাবে। মাছি সন্দেশে বসে সন্দেশের গুণটুকু নিচ্ছে, বিষ্ঠায় গিয়ে যখন বসছে তখন আবর্জনা সংগ্রহ করে। কিন্তু আমাদের স্বভাব এমনই যে আমরা পারি না, গুণটাও নিই দোষটাও নিই। একজন মুমুর্ষ লোক, ইনটেনসিভ কেয়ারে ভর্তি, সেখানে গিয়ে কারুর নিন্দা করা শুরু করা হোক, সেও চাঙ্গা হয়ে উঠে বসবে। এটাই আমাদের স্বভাব, সংসার চালাতে গেলে দু-চারজন লোককে আমরা অপছন্দ করবই, যাকে অপছন্দ তার নিন্দা শুনলে ভেতরটা খুশিতে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

যারা জীবনে শান্তি চায়, শক্তি চায় তাদের কারুর নিন্দা বা দোষগ্রহণ করতে নেই। কেন শান্তি বিঘ্ন হয় আর শক্তি ক্ষয় হয়? কারণ আমি যখন অপরের দোষ দেখছি, সাধারণ ভাবে দেখা যায় আমার ভেতরে ঐ দোষটা আছে বলে তখন আমি বাইরে ঐ দোষটা দেখছি। Strength, Power and Space এই তিনটে জিনিসই এক, আমরা যেটাকে শক্তি বলি, আর নিজের যে স্পেস, আমরা প্রায়ই বলি, আমার স্বামী আমাকে স্পেস দেয় না, ফ্রিডম দেয় না, আসলে সব একই শব্দ। যে ইমোশান গুলিকে নেগেটিভ বলা হয়, কাম, ক্রোধ, লোভাদি এই ছয়টি, যখনই কারুকে দ্বেষ করা হয় তখনই তার নিন্দা করে, বাচ্চারা বন্ধুদেরও যে নিন্দা করে সেখানেও সামান্য একটা ঈর্ষার ভাব থাকে। পরিহাস আর উপহাস দুটো আলাদা জিনিস, বন্ধুদের সাথে, নিজের লোকের সঙ্গে আমরা পরিহাস করি কিন্তু যাদের আমরা পছন্দ করি না তাদের আমরা উপহাস করি। যার প্রতি দ্বেষ তাকেই উপহাস করে। উপহাস করা মানেই যাকে উপহাস করা হচ্ছে তার প্রতি দ্বেষ আছে। দ্বেষ আছে মানে, তার স্পেসে সে ঢুকে পড়েছে। ভালোবাসা দেওয়াল গুলোকে দূরে ঠেলে দেয়, নেগেটিভ ইমোশান গুলো দেওয়াল গুলিকে কাছে নিয়ে আসে। আমি একটা ঘরে একা বসে আছি, সেই সময় একজন এসে ঘরে ঢুকল যাকে আমি পছন্দ করি না, তখন কি আমার মনে হবে না যে আমার স্পেস যেন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে? তখন কি মনে হয় না লোকটা বেরিয়ে গেলে বাঁচি? তার মানে যত কাছে সে এগোতে থাকে তত আমার স্পেসকে সঙ্কুচিত করছে। স্পেস যত কমে আসে তত আমার শক্তিও কমে যেতে থাকবে, কারণ আমি ডানা বিস্তার করতে পারব না। যদি আমার বন্ধু একজনকে নিয়ে আমার বাড়িতে এল যাকে আমি পছন্দ করি না, আমি বন্ধুর সাথে সেই ভাবে হাসিঠাট্টা করতে পারব না। আমার শক্তি কমে গেল, আমার ফ্রিডম কমে গেল, স্পেস কমে গেল। তাই যাকে আমি নিন্দা করছি, যে কোন ভাবেই করা হোক না কেন, তার প্রতি নিশ্চয় আমার দ্বেষ আছে, তার প্রসঙ্গ এলেই আমি কুঁচকে যাচ্ছি, তার মানে স্পেস আমার কমে যাচ্ছে। যে জিনিসটা আমার স্পেস কমিয়ে দিচ্ছে সেই জিনিসটা আমার জন্য কখনই ভালো নয়। সেইজন্য সার টুকু নিলে তার যে দুর্বলতা আছে, তার যে দোষক্রটি গুলো আছে, সেগুলো আর আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তখন শক্তিটাও বাড়বে। যে কোন জিনিস, যদি মনে হয় এটা ভুল হচ্ছে, ন্যায় সঙ্গত যদি না হয়, ইমোশান দ্বারা যদি চালিত হয় তখন বুঝতে হবে তার শক্তিকে শুষে বার করে নিচ্ছে। একটা মেয়ে যদি এসে যায়, সেখানে মেয়ের সারটুকু নিয়ে নিলেই হয়। তার রূপ কখনই তার সার নয়, সার হল তার গুণ, তার বুদ্ধি, সার হবে তার স্নেহ, যে স্নেহ পেয়ে মানুষ বড় হয়। স্বামীজী বলছেন, বন্ধুত্ব এমন জিনিস, ভালোবাসা এমন জিনিস যেটা দিয়ে মানুষ ঈশ্বর পর্যন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু আজকে একটা মেয়ের সাথে দেখা হতেই ছেলেটি বলবে, she is so divine, আর কাল কিছু একটা হয়ে গেলে বলবে তোমার মরা মুখ দেখলে ভালো হয়। নিশ্চয় তোমার কোথাও ভুল হয়ে গেছে, তুমি মেয়েটির সার নাওনি।

যে কোন জিনিসের একটা internal aspect থাকে আরেকটা external aspect থাকে, যেমন এখানে শাস্ত্র আলোচনা শুনে আমার ভালো লাগছে, শাস্ত্রের সারকে আমি নিতে পারছি। এরপর এই আচার্যই শাস্ত্র পড়ান আর অন্য কোন আচার্যই পড়ান তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। যদি সার টুকু শুধু নেওয়া হয় তখন সে কখনই কোন কষ্ট পাবে না। যদি দেখা যায় কারুর স্পেস কমে যাচ্ছে, তার শক্তিও কমে যাচ্ছে, ফ্রিডম কমে যাওয়া মানে তার জীবনে এমন কোন লোক জড়িয়ে আছে যার থেকে সে তার সার নেয়নি, তার বাহ্যিকটাই নিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সার কি? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালোবাসা মানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে ভালোবাসা, ভাবটাই তাঁর সার। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব কি? ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি। ঠাকুরও একজন স্থূল শরীরধারী, কিন্ত তাঁর ভাবকে ভালোবাসছি, তিনিও আমাকে উঁচুতে তুলে দিচ্ছেন। এই জিনিস যে কোন লোকের ক্ষেত্রেই হবে। সমস্যা হল বেশির ভাগ লোকের সার এতই কম যে, সে আমাকে আকাশে তুলতে পারে না। কিন্তু আকাশে যদি নাও তুলতে পারে, আমি কেন নিজেকে ওখানে আবদ্ধ করে নেব, আমি কেন ওখানে জড়িয়ে নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে নেব। কখন সঙ্কীর্ণ হয়? যখন তার বাহ্যিক জিনিসটাকে ভালোবাসছি। আভ্যন্তরীণ আর বাহ্যিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস হয় যেগুলো আমরা নিজেরা অর্জন করিনি। যেমন একটা কোন বিশেষ পরিবারের লোকেদের দেখতে সুন্দর, আবার তার বাবা-মার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থেকে সে একটা কালচার পেয়েছে, বুদ্ধি পেয়েছে। এরপর যে জিনিসগুলো আমাদের নয় সেই জিনিসগুলো নিয়েই আমরা অহঙ্কার করতে থাকি, যেমন আমাদের রূপ, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের কালচার। মেয়েদের যেমন রূপের অহঙ্কার থাকবেই। রূপটা কি সে নিজে অর্জন করেছে? তোমার তো নিজের নয়, ভগবানের ঘর থেকে এসেছে বা তোমার বাবা-মায়ের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল থেকে এসেছে। ঠিক এই একই জিনিস হয় যখন আমরা কাউকে ভালোবাসি, তার সার আমরা নিই না। সার হবে অর্জন করা, যেটা অর্জন করা নয় সেটাই বাহ্যিক। যেমন তার রূপ, তার বুদ্ধি, এগুলো তার সার নয়, এগুলো তার পাওয়া, অর্জন করতে হয়নি। তার যদি প্রচুর টাকা-পয়সা থাকে, সে অর্জন করেই তৈরী করেছে, কিন্তু টাকা-পয়সাটা তার সার হতে পারে না। একটা পরিস্থিতিতে কেউ বুদ্ধি লাগিয়ে ব্যবসা বা এমন কোন কাজকর্ম করেছে, যার ফলে সেখান থেকে তার প্রচুর টাকা এসে গেছে। তার কাজ করার যে দক্ষতা, যে ক্ষমতা সেটা তার সার। ঐ সারটুকুকে ভালোবাসলে আর কখনই সমস্যা হবে না। এখানে এটাই বলছেন, *অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ*, ভ্রমর যেমন ফুলের ছোট বড় বিচার না করে সকল ফুলের সার আহরণ করে ঠিক তেমনি বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত ছোট বড় বিচার না করে প্রত্যেকটি শাস্ত্রের সার কথাকে গ্রহণ করা। এক নামকরা হিন্দী কবির খুব সুন্দর একটা কথা আছে, বিদ্যা যদি উত্তম হয় তাহলে ঐ বিদ্যা যেখানেই থাকুক, যার কাছেই থাকুক, যে শাস্ত্রেই থাকুক, ঐ বিদ্যাকে নেবে। সোনা যদি নোংরাতে পড়ে থাকে নোংরা থেকেও লোকেরা সোনাকে তুলে নেয়, সেইজন্য সোনা কখন অশুদ্ধ, অপবিত্র হয় না। এখানে বলছেন প্রত্যেকটি শাস্ত্রের সার জানতে হবে, তার মানে, বায়োলজিরও সার জানতে হবে, ফিজিক্সেরও সার জানতে হবে আর নাট্যশাস্ত্র, তার সারও জানতে হবে।

মস্তিষ্কের বিস্তার সব সময়ই হয়ে থাকে অনাবৃতকরণের দ্বারা। যত শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ হবে, যত শাস্ত্রের কথা গ্রহণ করবে তত তার মস্তিষ্কের সম্প্রসারণ হবে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা যত বৃদ্ধি হবে ধারণা করার শক্তিও তত বাড়বে। যিনি নিজের শাস্ত্র ছাড়া আরও পাঁচটা শাস্ত্র জানেন তিনি নিজের শাস্ত্রটাও ভালো জানবেন। যাঁরা সরোদ, সেতারে ওস্তাদ, তাঁরা নিজের বাদ্যযন্ত্র তো ভালো বাজাবেনই তার সাথে অন্য বাদ্যযন্ত্রও বাজাতে জানেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলতঃ কবি কিন্তু তিনি উপন্যাসও লিখেছেন, নাটকও লিখেছেন আবার ছবিও এঁকেছেন। যাঁরা একটাতে পারদর্শি তাঁরা আরও পাঁচটা জিনিস করতে পারেন। এখানে এটাই বলতে চাইছেন, প্রত্যেকটি মানুষের সার গ্রহণ করবে, প্রত্যেকটি শাস্ত্রের, বিদ্যার সার গ্রহণ করবে। রাজকুমারদের আগেকার দিনে চৌষট্টি কলার সব কটি কলাই জানতে হত। *পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ*, মৌমাছি, ভ্রমর এরা যেমন সব ফুলের থেকে সারটুকু গ্রহণ করে, ঠিক সেই রকম তুমিও প্রত্যেকটি মানুষের থেকে, প্রত্যেক শাস্ত্রের সার গ্রহণ করবে।

তার সাথে বলছেন *সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্। পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী।।১১/৮/১১।।* সন্ন্যাসীদের পেটটাই একমাত্র সংগ্রহের পাত্র, এর বাইরে কোন বাসন বলে কিছু নেই।

সন্ন্যাস জীবনের উপর একটা নামকরা কথা আছে, করতল ভিক্ষা করতল বাস, হাতে যতটুকু ভিক্ষা ধরবে ততটুকু খেয়ে নেবে, ওর বাইরে আর কিছু তার লাগবে না। গৃহস্থদেরও খাওয়া-দাওয়াতে সংযম দরকার, যতটুকুতে শরীর চলে যাবে তার বেশি কিছু আয়োজন করতে নেই। যদি সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ কিছু সংগ্রহ করেছে, যেমন মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে জমাতেই থাকে, তারপর একটা দিন একজন এসে পুরো মৌচাকটা কেটে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে চলে যায়, শুধু চাকই কাটে না, তার সাথে মৌমাছির প্রাণটাও চলে যায়। কিছু সংগ্রহ না করা, সঞ্চয় না করা কি গৃহস্থদের পক্ষে সম্ভব? কখনই সম্ভব নয়, ঠাকুরও বলছেন গৃহস্থ সঞ্চয় করবে। এখানে সন্ন্যাসীদের ধর্ম নিয়ে বলছেন। যদিও সন্ন্যাসীদের ধর্ম কিন্তু সংসারীকেও একটা জায়গায় লাইন টেনে দিতে হয়, শুধু যদি সঞ্চয়ই করতে থাকে তাহলে সে কিন্তু আর এগোতে পারবে না, একটা জায়গাতে তাকেও থামতে হবে। কারণ ঈশ্বরের দিকে যাত্রা শুরু হয় সংসারে থেকেই।

জগতে দুই ধরণের লোক দেখা যায়, প্রথম ধরণের লোকেদের মধ্যে দেবতা বৃত্তি থাকে। দেব শব্দ থেকে দেবতা এসেছে, দেব শব্দের অর্থ আলো, এই আলো আধ্যাত্মিক আলো। আধ্যাত্মিক আলো থাকা মানে, যিনি নিজের জীবনকে আধ্যাত্মিক আলোর আধারে এগিয়ে নিয়ে যান। এই ধরণের মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের বেশি প্রভাব দেখা যায় না। এগুলো তাদেরও থাকা, ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া সবারই মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভাদি থাকবে। দ্বিতীয় ধরণের লোক যাদের মধ্যে আসুরিক বৃত্তি আছে। আসুরিক বৃত্তিতে লোভ, ক্রোধাদির মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। অসুর শব্দ আসে 'অসু' থেকে, অসু মানে প্রাণ। শরীরে যে বিভিন্ন ক্রিয়া চলে, এই ক্রিয়ার পেছনে যে শক্তি কাজ করে সেই শক্তিকে বলে প্রাণ। মানুষ যখন পুরোপুরি প্রাণশক্তিকে আধার করে চলে তখন আধ্যাত্মিক ভাবটা দমে যায়। যারাই প্রাণশক্তিতে চলে, যাদের মধ্যে আসুরিক বৃত্তি আছে, তাদের স্বভাবই হল সঞ্চয় করা। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্*, এটাকে আমি জয় করেছি, এরপর এবার এটাকেও জয় করব, ধরো, মারো, লুট করো এগুলোই তাদের প্রবৃত্তি। জীবনে এরা সব সময় goal setting করে যাচ্ছে, জীবনের একটা লক্ষ্য চাই, একটা প্রাপ্তি চাই। অন্য দিকে রয়েছে যাদের মধ্যে দেবতার ভাব। জগতে মাঝারি ধরণের লোকের সংখ্যাই বেশি, এই দলেরও নয় ঐ দলেরও নয়। দৈবী সম্পদের অধিকারী সম্পন্ন লোক জগতে কমই হয়। আর ঘোর আসুরিক সম্পদে সম্পন্ন লোকের সংখ্যাও জগতে কম হয়। বেশির ভাগই হল মাঝারি, এদের সমস্যা হল এরা দৈবী সম্পদ সম্পন্ন লোকেদের সাথে দৈবী হয়ে যায় আর আসুরিক মনোভাবাপন্নদের সাথে আসুরিক হয়ে যায়, এদেরকে বলা হয় fence sitter, পাঁচিলের উপর বসে থাকে, যখন যেই দল ভারী সেই দিকে ঢলে পড়ে।

এখানে আমরা সবাই শাস্ত্রের কথা শুনছি, যতক্ষণ শুনছি খুব ভালো লাগছে, মনে মনে ভাবছি একটু ত্যাগ তপস্যা করতে হবে। আবার যখন খবরের কাগজ, টিভিতে পঞ্চাশ রকমের জিনিস দেখছি, তখন মনে হয়, কি জানি বাপু ধর্মের কথাগুলো ঠিক না ভুল। এর মধ্যেই সবাই দোদুল্যমান। শুধু সংসারীরাই না, সন্ন্যাসীরও পাকা বুদ্ধি যতক্ষণ না হয়ে যায়, তাঁরও মন দুলতে থাকবে। উত্তরকাশী, হরিদ্বার, হৃষিকেশে এক একটা আশ্রমের যা সম্পত্তি আছে দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। মনে হবে আমরা আর কি করলাম, সাধুরাই সব সুখ ভোগ করছে। এগুলো কিছু না, এদের মধ্যেও আসুরিক বৃত্তি আছে। এখানে শাস্ত্রের কথা শুনে আমাদের মনে হবে সঞ্চয় করা ঠিক নয়, সঞ্চয় করে কি হবে! কিন্তু বাইরে বেরোলেই পাঁচটা জিনিস দেখতে হচ্ছে, পাঁচ রকমের কথা শুনতে হচ্ছে, কোন উপায় থাকে না। একজন সাধু আশ্রমের সন্ন্যাসীদের প্রায়ই একটা কথা বলতেন, শাস্ত্র বুঝে নেওয়া থেকে শাস্ত্রের নিয়মিত আবৃত্তি করা অনেক শ্রেয়। আমরা প্রায়ই বলে থাকি, কেউ শুনে শেখে, কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। কিন্তু হোঁচট খেলেই কি আমরা শিখে যাই? কিছুই শিখি না। বোধে বোধ করে জীবনে ওটাকে কাজে লাগানো একমাত্র অবতার পুরুষরা আর খুব উচ্চমানের মহাপুরুষরাই পারেন। যেমন গান্ধীজী বললেন আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হব, এরপর মাথায় ডাণ্ডা পড়ুক, বাজ পড়ুক যাই পড়ুক, তিনি সত্যকে আর ছাড়বেন না। এই রোখ কদাচিৎ কখন সখন কারুর হয়। বাকিদের নিজেদের নিয়মিত মনে করাতে হয়। আমরা হলাম মন্দ বুদ্ধির সেইজন্য শাস্ত্রের আবৃত্তি না করলে, বার বার আঘাত না করলে কথাগুলো ভেতরে ঢুকতে চায় না। কারণ আমরা দৈবী গুণে সম্পন্ন নই, আর আসুরিক সম্পন্নও নই, আসুরিক

মানসিকতার হলে এখানে শাস্ত্র কথা শুনতেই আসতাম না, আমরা হল ঠিক ঠিক পাঁচিলের উপর বসা, অসুরদের সাথে অসুরের মত হয়ে যাই, আর ভালো লোকেদের সাথে ভালো মানুষ হয়ে যাই।

১৩) হস্তি

অবধূতের ত্রয়োদশ গুরু হাতি, বলছেন *পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি। স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ।।১১/৮/১৩।।* ঠাকুরও এই কথা বলছেন, সন্ন্যাসী কাঠের তৈরী বা পাথরের তৈরী নারীমুর্তিকে পায়ের আংঠা দিয়েও স্পর্শ করবে না। এর আগে ঠাকুর অনেকবার বলছেন সন্ন্যাসী স্ত্রীর চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না, আর তিনি ভাগবত থেকে নিচ্ছেন, কাঠের নির্মিত যুবতী নারীর মুর্তিকে পা দিয়েও সন্ন্যাসী স্পর্শ করে দেখবে না। বুনো হাতিকে ধরার অনেক রকম কৌশল অবলম্বন করা হয়। একটা কৌশল হল, যে পথ দিয়ে হাতিরা চলাচল করে সেই রাস্থাতে গর্ত করা থাকে আর এমন ভাবে পটকার আওয়াজ করতে থাকে হাতি ভয়ে দৌড়াতে গিয়ে ঐ গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। আরেকটা কৌশল হল খেদা, খেদান থেকে খেদা এসেছে। বিরাট বিরাট কাঠ দিয়ে চারিদিকে একটা পাঁচিলের মত তৈরী করে একটা জায়গাকে ঘিরে রাখে। আর বুনো হাতিকে পোষা হাতি দিয়ে এমন তাড়া করতে থাকে যে বুনো হাতিগুলো পালাতে শুরু করে। আর এমন কায়দা করে তাড়াতে থাকে একটা জায়গায় গিয়ে সব কটা বুনো হাতিকে ঐ ঘেরা জায়গাতে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। ঢুকিয়ে দিয়েই গেটটা বন্ধ করে দিল। বুনো হাতিগুলো আর পালাতে পারেনা। জংলী হাতিকে না হয় বেঁধে নেওয়া হল। কিন্তু এগুলোকে পোষ মানিয়ে কাজে লাগাতে হবে, তার ট্রেনিং কে দেবে? খেদাতে সব সময় এরা মেয়ে হাতিদের ব্যবহার করে। পুরুষ হাতি কোন অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়া হয় না, পুরুষ হাতি নিয়ে যাওয়া মানেই প্রচণ্ড মারামারি। মেয়ে হাতিকে দেখেই বুনো হাতিগুলো শান্ত হয়ে যায়। এটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের, যে কোন কারণেই হোক সারা বিশ্বে হাতিদের সব ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম। এই ভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়ার পর দু দিক থেকে দুটো মেয়ে হাতিকে নিয়ে যাবে। মেয়ে হাতিগুলোকে দেখে জংলী হাতিরা শান্ত হয়ে যায় আর সেই সময় ওদের পায়ে শেকল পড়িয়ে দেওয়া হয়। ট্রেনিং দেওয়ার সময়েও মেয়ে হাতিগুলোই থাকে। জংলী হাতির শক্তি সাজ্ঘাতিক, পুরুষ পোষা হাতি যদি থাকে এক সঙ্গে দুটো তিনটে হাতিকে তুলে ফেলে দেবে। কিন্তু মেয়ে হাতিকে দিয়ে এইভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়ার পর কয়েক দিনের মধ্যে ট্রেনিং দিয়ে পুরো কব্জা করে নেওয়া হয়।

দত্তাত্রেয় নিশ্চয়ই দেখেছেন হাতিকে কীভাবে ধরা হয়। হাতি যে কিনা জঙ্গলের রাজা, তার হাঁটাচলা সব রাজকীয় কিন্তু সেই বুনো হাতি পোষা মেয়ে হাতির পাল্লায় পড়ে সারা জীবন মানুষের হয়ে খেটে মরে। দত্তাত্রেয় তখন বলছেন *পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি। স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ।।* দত্তাত্রেয় বলছেন আমি হস্তীর কাছে এই শিক্ষা পেয়েছি, কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত যদি কোন যুবতী নারীর মুর্তিও হয় সেটাকেও সন্ন্যাসী পা দিয়েও স্পর্শ করবে না। ঠাকুর ভাগবত, অধ্যাত্মরামায়ণাদি শুনতেন। বুনো হাতিগুলো যেমন মেয়ে হাতিদের পাল্লায় পড়ে নিজের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা সব কিছুকে বিনষ্ট করে দেয় ঠিক সেইভাবে নারীর স্পর্শ সন্ন্যাসীকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে।

খ্রীশ্চান ট্রাডিশানে একটা খুব সুন্দর কাহিনী বলা হয়, কোন এক খ্রীশ্চান ফাদারের সাথে কনভেন্টের কোন সিস্টারের সাথে মেলামেশা চলছিল। ফাদারের সুপিরিয়র খুব আপত্তি করেছেন, ওরকমটি করো না। ফাদার বলছেন, কেন তাতে কি হয়েছে? আমরা তো পবিত্র, আমরা ভগবানের কথাই বলি। তখন উনি ফাদারকে বলছেন, মাটি খুব ভালো জিনিস, জলও খুব ভালো জিনিস, দুটোই প্রাণদায়িনী। কিন্তু দুটো মিশে গেলে হয়ে যায় পাঁক। নারী পুরুষ মিলন মানেই পাঁক, কেউ বাঁচাতে পারবে না। এগুলোর উপর প্রচুর কাহিনী মোটামুটি সব ধর্মেই ছড়িয়ে আছে। ঠাকুরের এক শিষ্য কোন মহিলার কাছে যেতেন, সেই মহিলার আবার বাৎসল্য ভাব। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, ওরে সাবধান! বাৎসল্য থেকেই তাচ্ছল্য ভাব হয়। আমাদের তিনটে ইন্দ্রিয় চোখ, কান আর নাক এদের বিষয়গুলো দূরের জিনিস কিন্তু জিহ্বা আর চর্মের সরাসরি সংযোগ দরকার। সরাসরি সংযোগের জন্য তার সুখের গভীরতাও বেশি হয়।

চর্মের স্পর্শ সুখকে নিয়ে দত্তাত্রেয় বলছেন *নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ। বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা।*।১১/৮/১৪। একটা তো হয়ে গেল ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীদের জন্য, কিন্তু বিবেকী পুরুষরা কখনই স্ত্রীকে ভোগ্য রূপে গ্রহণ করবেন না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনই কোন নারীকে ভোগ্যবস্তু রূপে দেখবেন না। তার মানে, কোন নারীকে যখন স্ত্রী রূপে গ্রহণ করা হয় তখন সেই নারী কখনই ভোগ্য রূপ নয়, সেইজন্য স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী যজ্ঞে সঙ্গ দেবে, ঘর গৃহস্থের সব কিছু সামলাবে, স্বামীকে ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থ সাধনে সাহায্য করবে। ভোগরূপে নারীকে দেখা মানেই *বলাধিকৈঃ স হন্যেত*, তুমি তোমার বিনাশকে ডেকে আনছ। যে কোন হাতির পালে সাধারণত একটাই হাতি থাকে, বাকি সব হস্তিনী আর বাচ্চা হাতি থাকে। বানরের দলেও একটাই পুরুষ থাকে, বাকি সব মেয়ে বানর থাকে। একটা হাতি হয়ত তিরিশ চল্লিশটা হাতিকে নিয়ে আছে। এখন এই হাতিরও তো বয়স হচ্ছে। বয়স হয়ে যাওয়ার পর তখন তারই গ্রুপের, হয়ত তারই সন্তান, তাকে চ্যালেঞ্জ করে। সে এখন নতুন যৌবন পেয়েছে, বুড়ো হাতিকে সে মেরে শেষ করে দেয় বা যদি নাও মেরে দিতে পারে, ঐ বুড়ো হাতি এবার দলছুট হয়ে যাবে। মানুষের ক্ষেত্রেও যদি দেখা যায় একজন নারীর প্রতি দুজন পুরুষ আসক্ত হয়ে গেছে, এবার একজনকে মরতে হবে। মনুস্মৃতিতে বলছেন, পরনারী সঙ্গে যে পরিমাণ আয়ু ক্ষয় হয় অন্য কিছুতে এই ক্ষয় হয় না। পরনারী সংস্পর্শ বিষের মত। এই শ্লোকে শুধু সন্ন্যাসীকে বলছেন না, যাঁরা প্রাজ্ঞ, যাঁরা বিবেকী তাকে সব সময় নারী থেকে সাবধান থাকতে হবে, কারণ নারী তার জন্য মুর্তিমান মৃত্যুস্বরূপা, হস্তিনী যেমন বুনোহস্তীর কাছে মৃত্যুস্বরূপা। ঠাকুরও বারবার বলছেন নারীকে সব সময় মাতৃস্বরূপা দেখবে, ঠাকুরের ভাবই ছিল সন্তানভাব।

১৪) মধু সংগ্রহকারি

দত্তাত্রেয়র চতুর্দশ গুরু মধু সংগ্রহকারি, বলছেন *ন দেয়ং নোপভোগ্যং চ লুব্ধৈর্যদ্ দুঃখসঞ্চিতম্। ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধহেবার্থবিন্মধু।।১১/৮/১৫।।* একদিন তিনি দেখলেন মধু সংগ্রহকারির দল মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করছে। মধু সংগ্রহকারীর কাছে থেকে তিনি শিক্ষা পেলেন; মানুষ কত কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে আর সেই অর্থকে ভোগে না কাজে লাগিয়ে, দান-ধ্যান না করে, মানুষের উপকারে না লাগিয়ে সঞ্চয় করে যাচ্ছে। টাকা মানেই দুঃখ, টাকা উপার্জন করার জন্য কত খাটতে হয়, খাটার জন্য দুঃখ, টাকা কাছে থাকলেই সব সময় ভয়, ছিনতাই না হয়ে যায়, চুরি না হয়ে যায়, ডাকাতি না হয়ে যায়, সব সময়ই দুঃখ। আর যখন হাত থেকে চলে যায় তখনও দুঃখ। অথচ মানুষ টাকাকে ছাড়তে পারে না। যেটা সহজে এসে যায় সেটাকে মানুষ খুব সহজেই ছেড়ে দেয়। কামারপুকুরে অনেক বাচ্চা, বাড়ির বউরা গাউডের কাজ করে। তখনকার দিনে সাধারণত চার আনা কি আট আনা দেওয়া হত। একবার কোন ভক্ত পরিবার গিয়েছিলেন, তাঁরা কিভাবে একটা বাচ্চাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে দিয়েছেন। ওর পাওয়ার কথা হদ্দ একটি টাকা আর পেয়ে গেছে দশ টাকার নোট। ভক্তদের সামনেই বাচ্চাটা দশ টাকার নোটকে এ্যারোপ্লেন বানিয়ে ফু দিয়ে ওড়াচ্ছে। দশ টাকাটা ও রাখবে, কিন্তু ফু মেরে ওড়াচ্ছে। এক টাকার নোট দিলে ঐ রকম করত না। কারণ এক টাকাটা ওর খাটনির, কিন্তু ঐ দশটি টাকার ওর কাছে বেশি হয়ে গেছে আর সহজে এসে গেছে। কজন আর সহজে টাকা পায়, কয়েকজন যারা আইটি ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে, আর কিছু আছে শেয়ারে লোকেদের বোকা বানিয়ে টাকা রোজগার করছে, বাকি সবাইকে খেটে মরতে হচ্ছে দুটো টাকা আয় করার জন্য। সেইজন্য *ন দেয়ং নোপভোগ্যং চ*, একটি পয়সা কাউকে দান করবে না আর নিজেও ভোগ করবে না, মধু সংগ্রহকারির মত আরেকজন এসে সেই সঞ্চিত ধন ভোগ করে চলে যায়। মানুষ মাত্রই কৃপণ, তাকে যদি এখানে প্রস্বাব করতে বলা হয় করবে না, ওর ভয় পাছে অন্যের লাভ হয়ে যাবে। এক খ্রীশ্চান ফাদার এক বিরাট বড়লোকের কাছে কিছু ডোনেশানের জন্য গেছেন। গিয়ে বলছেন 'আমাদের চার্চ আছে, গরীবের মধ্যেও আমরা অনেক কাজটাজ করছি, যদি কিছু ডোনেশান দেন'। ফাদারকে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, মহা কৃপণ, এক পয়াসাও পাবেন না। যাই হোক বহু কষ্টে তিনি এ্যপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন। ধনী লোকটি ফাদারের কথা শুনে বলছে 'আপনারা এত কাজ করছেন? তা আপনি কি আমার ব্যাপারে সব কিছু জানেন'? 'হ্যাঁ জানি, আপনি এই

শহরের একজন অন্যতম ধনী লোক, আপনার প্রচুর টাকা-পয়সা আছে'। 'আপনি কি জানেন আমার এক বিধবা বোন আছে সে খেতে পায় না? 'আমার তো জানা নেই'। 'আপনি কি জানেন আমার এক অপঙ্গ ভাইপো আছে, যার কোন রোজগার নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই'? 'না জানা নেই'। এরপর ভদ্রলোক এক এক করে আমার অমুক আছে সে এই রকম, তমুক আছে সে এই রকম, এই করে বিরাট এক ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে। তখন ফাদার বলছেন 'স্যার! আমি জানতাম না আপনার উপর এত কষ্ট পাওয়া মানুষ নির্ভর করে আছে, আপনার কাছে ডোনেশান চেয়ে সত্যিই আমি খুব লজ্জিত, আমি আসছি'। ধনী লোকটি ছাড়বে না, বলছে, 'না না আপনি শুনে যান, ওদেরকে যখন আমি এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করি না সেখানে আপনাকে আমি কেন দিতে যাব'! এটাই মানুষের রোগ, সব জায়গাতে এই একই জিনিস হয়। কথামৃতেও ঠাকুর বর্ণনা দিচ্ছেন কৃপণের ধন কীভাবে শেষ হয়। মানুষ চাকরি করছে, চাকরিতে প্রমোশন হচ্ছে, টাকা আসছে, সেই টাকা জমিয়ে রেখে দিচ্ছে। পরে তার ছেলে-মেয়েরা উড়িয়ে দিল, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কষ্ট করে, না খেয়ে একটি একটি করে পয়সা জমালেন। ছেলে বড় হয়ে এই করতে হবে সেই করতে হবে বলে টাকা চাইল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিলেন। দুদিন পর শুনলেন ছেলে সেই টাকা নিয়ে ফুর্তি করে উড়িয়ে দিয়েছে। বৌমা এল, দুদিন পর ৪৯৮এ একটা কেস ঠুকে দিল, পরে আইনের প্যাঁচ কশে সব টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চারিদিকে এই দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হয়।

হায়দ্রাবাদের নিজামকে কেউ আশীর্বাদ করেছিল, তোমার যা সম্পত্তি হবে তাতে তোমার সাত পুরুষের কোন অভাব থাকবে না। মুঘল রাজত্ব থেকে শুরু করে পুরো ইংরেজদের সময় পর্যন্ত নিজামকে কেউ হাত দিতে পারেনি। নিজামের যে কত সম্পত্তি তার খবর বাইরের কেউ আজ পর্যন্ত জানে না। ভারতের স্বাধীন হওয়ার পর নিজাম পরিবার ঠিক করল কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, পাকিস্থান চলে যাবে। যাওয়ার সময় কয়েকটা গাড়িতে ওরা শুধু সোনার পেটি গুলো রাখল, গাড়িতেও রাখার জায়গা হচ্ছে না। সোনার ভারে গাড়ির চাকা গুলো মাটিতে বসে গেছে। অষ্টম নিজাম মায়ের তরফে তুর্কি দেশের যে খালিফা তার নাতি। আর মহম্মদের তরফ থেকে তিনি ছিলেন, মহম্মদের ছেলে আবু বখর, তার বংশের। বাবার দিক থেকে তার সরাসরি লাইন আসছে মহম্মদের মেয়ে থেকে। সেই সময় বোম্বেতে কোন কারণে নিজামদের কিছু সোনা ছাড়াতে হয়েছিল, তাতে সোনার দামে রাতারাতি ধস নেমে গিয়েছিল, তাহলে ভেবে দেখুন কত সোনা গেছে। নিজামের যা হীরে ছিল, সংসারে কারুর ক্ষমতা ছিল না যে ঐ হীরে কেউ কিনে নিতে পারবে। সেই লোকটির শেষে একটি প্রজন্মে সব কিছু চলে গিয়েছিল। তার ঠাকুরদার হাজারটে বেগম ছিল, বিকেল বেলা সবাইকে একটা লনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত আর ঠাকুরদা যাকে পছন্দ করবে সেই রাত্রে সে তার সঙ্গে থাকবে, এই রকম তার প্রাচুর্য। অথচ এই প্রাচুর্যকে যে কাজে লাগাবে সেই ব্যাপারে কারুরই কোন মাথা ব্যাথা ছিল না। তারপর দেখা গেল যে সব কিছু দেখাশোনা করত সে অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিল আর মামলা মকোদ্দমায় বাকিটাও চলে গেল। ঠাকুরও বলছেন এদের সঞ্চিত ধন মামলা মকোদ্দমাতেই চলে যায়। এত সম্পদ কারুর কোন কাজে লাগবে না। এখন যে নিজাম সেও জানে না অবশিষ্ট সম্পদ কোথায় কিভাবে আছে।

এটাই সংসারের বাস্তব চিত্র। সারাটা জীবন কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করে বৃদ্ধ বয়সে এসে দেখছে তার নামে কোটি কোটি জমে আছে, জানে না এই টাকা দিয়ে কি করবে। অনেকে মঠ মিশনে চিঠি লিখে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অথচ সারা জীবন কষ্টে কাটিয়ে শুধু সঞ্চয় করে গেছে। আমেরিকার একজন অন্যতম ধনী মহিলা ছিল, সে এমনই কৃপণ যে নিজের গাউনটাও কোন দিন ধুতে দিত না, কারণ ধুলে বেশি দিন টিকবে না। শুধু পায়ের তলাটা যেটা মাটিতে লোটাত ঐটুকু মাসে একবার জল দিয়ে ধুয়ে নিত। নিজের সম্পদ দেখাশোনার জন্য কোন অফিস চালাতো না। যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা আছে, সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের অফিসে বসবে। ম্যানেজারের অফিসকে নিজের অফিস বানাবে, ওদেরই কাগজ নেবে, ওদেরই কলম নেবে। আর যদি কেউ একটু আপত্তি করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে পুরো টাকা তুলে অন্য ব্যাঙ্কে রেখে দেবে। মহিলার শত শত কোটি টাকা ছিল। রাস্থার ধারে পড়ে থাকত, কেউ বিশ্বাস করত না যে মহিলার এত টাকা আছে। মহিলা যেদিন মারা গেল তারপরই জানা গেলে তার এত টাকা। মহিলাটির দু তিনটে সন্তান ছিল, ছেলে, ছেলের স্ত্রী,

তাদের সন্তানদেরও কিছু খেতে পড়তে দিত না। মহিলা মারা যাবার পর ওরা ঐ সম্পত্তির মালিক হল, আর কিছু দিনের মধ্যেই মদ খেয়ে ফুর্তি করে সব টাকা উড়িয়ে শেষ করে দিল।

এটাই দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে বলছেন, *ভুঙ্ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু,* এত কষ্ট করে সঞ্চয় করে, নিজেও ভোগ করে না, অপরকেও ভোগ করতে দেয় না। টাকা-পয়সা তো নিজের সুখ সুবিধার জন্য। সঞ্চয় করাটা খারাপ নয়, সংসারীদের সঞ্চয় অবশ্যই করতে হয়, কিন্তু একটা সীমা টেনে দিতে হয়। আবার এক আধজন আছে যার এমনই কর্ম তার এই কষ্টটা হয় না। টাকা জমিয়েছে, বাড়ি বানিয়েছে, ভালো ছেলে, বৌমাও ভালো। তারপর নাতি হয়েছে সেটিও ভালো। এই এক আধ জনকে দেখে বাকিরা মনে করে আমারও এই রকমই হবে। কিন্তু বাকি নিরানব্বুইটা যে পথে বসে হাবুডুবু খাচ্ছে সেটা কেউ দেখে না। তখন বলে আমারই কপালে এই ছিল!

এখানে আবার দত্তাত্রেয় মজা করে বলছেন *সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ। মধুহেবাগ্রতো ভুঙক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্।।১১/৮/১৬।।* তুমি তো সব সময় দেখছ মধু সংগ্রহকারীর দল মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু তাদের ভোগের আগেই মৌচাক ভেঙে নিয়ে যায়। ঠিক সেই ভাবে গৃহস্থের অতি কষ্টের সঞ্চিত ধন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সেবায় খরচ হয়ে যায়। আগেকার দিনে অতিথি সেবার নিয়মই ছিল আগে অভ্যাগত সকলের সেবা করার পর গৃহস্থ নিজে গ্রহণ করবে। সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের কখন উচ্ছিষ্ট জিনিস দিতে নেই, সেইজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের বাড়িতে পৌঁছে গেলেই বাড়িতে যা রান্নাবান্না হয়েছে তার অগ্রভাগ দিয়ে তাঁদের সেবা করাতে হত। এই নিয়ম এখনও পালন করা হয়। যদিও অতিথিসেবা এখন আর আগের মত কেউ পালন করতে পারেনা আর করেও না। কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের এখনও সব কিছুর অগ্রভাগ দিয়ে সেবা করার নিয়ম চলে আসছে। মৌমাছি ঘুরে ঘুরে মধু এনে মৌচাকে জমাতে থাকে, সে নিজেও একটু তৃপ্তি করে মধু খায় না, কিন্তু সঞ্চিত মধু অপরে এসে নিয়ে চলে যায়। ঠিক তেমনি মানুষ এত কষ্ট করে অর্থ রোজগার করছে, নিজে কষ্ট কর জীবন নির্বাহ করে সেই উপার্জিত অর্থকে সঞ্চয় করে যায়, অথচ সব সঞ্চিত অর্থ একদিন হাত থেকে বেরিয়ে চলে যায়। দত্তাত্রেয় বলছেন, এইসব দেখে আমি ঠিক করলাম কোন সঞ্চয় করব না। এখানে মূল প্রশ্ন ছিল, রাজা জনকের বংশধর যদু রাজা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি তো কোন কাজ করেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার এত বুদ্ধি কি করে হল। তখন দত্তাত্রেয় বলছেন, আমি অনেক কিছু দেখেছি, যেখানে যা দেখি সেখান থেকেই একটা শিক্ষা পেয়ে যাই। কিন্তু মানুষ যে শিক্ষা পায় তার পেছনে একটা মূল তত্ত্ব হল, মানুষ যেটার জন্য প্রস্তুত সেটার বাইরে সে কিছুই শিখতে পারবে না। একটা সোনার ঘটি আছে, ঐ ঘটিতে ততটুকুই জল ধরবে যতটুকু ঘটির পাত্রতা আছে, তার বেশি দিলে বেরিয়ে যাবে। যদি কেউ ওর মধ্যে আরও বেশি জল ধরাতে চায় তাহলে আগে তাকে ঘটির পাত্রতা বাড়াবার জন্য হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সাইজটাকে বড় করতে হবে। হাতুড়ি পেটানোটা সব সময়ই হয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। যত হাতুড়ি পড়বে তত তার পাত্রতা বাড়বে। অভিজ্ঞতা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কেউই কিছু শিখতে পারবে না। আর লেকচার শুনে, বাক্য দিয়ে তো মানুষ কখনই শেখে না। অভিজ্ঞতা হলে অন্তত জেনে যায় যে জিনিসটা এই রকম, সে হয়ত পালন করতে পারে না, কিন্তু জেনে গেল।

১৫) হরিণ

অবধূতের পঞ্চদশ গুরু হল হরিণ, বলছেন *গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ। শিক্ষেত হরিণাদ্ বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ।।১১/৮/১৭।* দত্তাত্রেয় বলছেন হরিণের কাছে আমি শিক্ষা পেলাম, সন্ন্যাসী যাঁরা একান্ত বাস করছেন তাঁদের কখনই গ্রাম্যগীত, গ্রাম্যগীত মানে বিষয় সম্বন্ধিত চর্চা বা গুণ কীর্তন শুনতে নেই। সাধুর জীবনে দুটো বিরাট বড় বিঘ্নের মধ্যে একটা হয় গ্রাম্যগীত আর আরেকটা হয় গ্রাম্য কথা। চৈতন্য মহাপ্রভুও শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, না কহিবে কভু গ্রাম্যকথা। গ্রাম্যকথা মানে যে কোন বৈষয়িক কথা, সাংসারিক কথা সন্ন্যাসী কখনই আলোচনা করবে না।

কিন্তু এখানে বলছেন *গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্*, সিনেমার গান, আধুনিক গান, জীবনমুখী গান, ব্যাঙের গান সন্ন্যাসী কখনই শুনবে না। যদি শোন তাহলে তোমারও হরিণের মত অবস্থা হবে। আগেকার দিনে হরিণ শিকার করা অত সহজ ছিল না, হরিণ প্রচণ্ড জোরে ছুটতে পারে। তীর মারা যায় কিন্তু তাতে হরিণকে জ্যান্ত ধরা যাবে না। অনেক সময় জাল ফেলে ধরা হয়। কিন্তু হরিণ, পাখি ও আরও কিছু পশু আছে এদেরকে জ্যান্ত ধরার জন্য শিকারীরা কোন গাছের তলায় বা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে আর মুখে এক ধরণের মিষ্টি আওয়াজ বা শিস্ দেয় আর হরিণকে ধরার জন্য এক ধরণের গান করে। এমন সুন্দর মিষ্টি সুরে গান করে যে ঐ সঙ্গীতে মোহিত হয় হরিণ ব্যাধের কাছে চলে আসে। হরিণ তখন ব্যাধের কাছে ধরা পড়ে যায়। জিম করবেট যে বাঘ শিকার করতেন সেখানেও বাঘকে ফাঁসানোর একটাই পথ ছিল, বাঘিনী বাঘের সাথে মিলনের ইচ্ছা হলে যে রকম আওয়াজ করে, জিম করবেট গলায় ঠিক সেই রকম আওয়াজ করতেন। তাতে জিম করবেটও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আরেকজন শিকারীও একই জঙ্গলে ছিল, জিম করবেট বাঘের মত ডাক দিচ্ছেন, অন্য শিকারী অন্য রকম ডাক দিচ্ছে, আস্তে আস্তে এক অপরের দিকে এগোতে থাকছে, মানে জিম করবেটও এগোচ্ছেন আর ঐ শিকারীও এগোচ্ছে। তারপরে বন্দুকটা বার করে দেখে আরে এ তো একটা মানুষ। তাতে জিম করবেট প্রচণ্ড রেগে গেলেন, জেলা শাসককে চিঠি লিখলেন, আপনারা একই সাথে জঙ্গলে দুজনকে শিকারের পারমিশান দেবেন না।

একটা কাহিনীতে আছে যেটা সিনেমাও হয়েছে, খুব বড় শিল্পী রাজমহলে সরোদ বাজাচ্ছেন, এমন সুরের মুর্ছনা যে প্রকৃতি যেন স্তব্দ হয়ে গেছে, বন্য পশুরাও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাজনা শোনার জন্য সব রাজমহলে ঢুকে গেছে। যেমনি বাজনা বন্ধ হয়ে গেলে সব পশুরা প্রাণের ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। তবে যেটা খুব মজার ব্যাপার, হরিণরা যে ধরা পড়ে ওরা কিন্তু সঙ্গীতের জন্য ধরা পড়ে না, দেখা গেছে যদি একটা ছন্দে কোন আওয়াজ যদি বার বার করা হয়, এমনিতেও পশুপাখিরা ছন্দ ও তালকে খুব পছন্দ করে, তখন হরিণের কান ঐ ছন্দ ও তালের সাথে অভ্যস্ত যায়, আর আস্তে আস্তে ঐ আওয়াজের দিকে এগিয়ে যায়। শিকারীরা মনে করে হরিণ সম্মোহিত হয়ে যায়, কিন্তু হরিণ সম্মোহিত হয় না। তখন part of landscape হয়, landscape মানে, আমার যেমন সবাই এই ঘরে আছি, আমরা সবাই এক অপরকে জানি, এখানে অপরিচিত কেউ নেই, কিন্তু একটা বানর যদি ঢুকে যায় আমরা সবাই চমকে উঠব। কিন্তু রোজ যদি একই বানর দেখি আমরা ওটাতেই পরিচিত হয়ে যাব। ওদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। কোন আওয়াজ একই ছন্দ ও সুরে এক নাগাড়ে করতে থাকে তখন ঐ সুর ও ছন্দে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর দেখতে ইচ্ছে করে কোথা থেকে এই আওয়াজটা আসছে। শিকারীরাও কায়দা করে লুকিয়ে থেকে হরিণকে ধরে ফেলে।

হ্যারি হুডিনি জাদু খেলাতে খুব বিখ্যাত ছিলেন। হুডিনি দুজন ছিলেন, বর্তমান কালের যিনি হুডিনি তিনিও অনেক খেলা দেখিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর থেকেও ওস্তাদ ছিলেন প্রথম যিনি হুডিনি, উনি ঠিক ঠিক ওস্তাদ লোক ছিলেন। একবার তাঁকে একটা বাদ্যযন্ত্র সারাবার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ঐ বাদ্যযন্ত্র থেকে নানা রকমের পশুপাখির আওয়াজ বাজানো যেত। বাদ্যযন্ত্রটাকে সারালেন, সারিয়ে পরীক্ষা করার জন্য হুডিনি ওটাকে জঙ্গলে নিয়ে গেলেন। একটা কোকিলের আওয়াজের মত ঐ বাদ্যযন্ত্রে বাজাতে লাগলেন। বসে বসে বাজিয়ে যাচ্ছেন, কিছুক্ষণ পরে দেখছেন চারিদিক থেকে বন্য কোকিল গুলো আসতে শুরু করে দিয়েছে। আওয়াজটা এতই বিশ্বাসযোগ্য যে পাখিগুলো এগিয়ে এসেছে। এখানে বলছেন, ঋষিরা যাঁরা বনচর হয়ে যান, গান তাঁদের মুগ্ধ করে। আগেকার দিনে এইভাবে হরিণকে ধরতে দত্তাত্রেয় নিশ্চয়ই দেখেছেন। খবরের কাগজে কার সম্বন্ধে কি লেখা হচ্ছে, ম্যাগাজিনে কি কি আর্টিকেল বেরিয়েছে এই ধরণের কোন জাগতিক বিষয় সম্বন্ধিত লেখা পড়তে নেই, এগুলোকে এখানে বলছেন গ্রাম্যকথা। বিষয় নিয়ে চর্চা করলে আজ হোক, কাল হোক বন্ধনে পড়বেই। কিন্তু গ্রাম্যগীত বিশেষ করে সঙ্গীত, মিষ্টি মিষ্টি গান, লারেলাপ্পা গান সন্ন্যাসীর কখনই শুনতে নেই।

দত্তাত্রেয় আবার মহাভারত থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দৃষ্টান্ত আনছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বৈশিষ্ট্য হল তাঁর পিতা বিভণ্ডক মুনি তাঁকে ছোটবেলা থেকে এমন ভাবে বড় করেছিলেন যাতে তিনি কোন দিন নারী মুখ না দেখতে পান। অঙ্গ দেশের রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ফাঁসাবার জন্য কিছু নর্তকীকে পুরুষ সাজিয়ে পাঠালেন তাঁর

রাজ্যে নিয়ে আসার জন্য। পুরুষের বেশ ধরে এরা গীত-বাদ্য-নৃত্য করে করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বশীভূত করে বজরাতে বসিয়ে অঙ্গ দেশে নিয়ে এসেছিল। রাজা আবার তার কন্যার সাথে বিয়ে দিয়ে দিল। রাজা দশরথ যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সেই যজ্ঞের পুরোহিত হয়েছিলেন। আমরা মনে করতে পারি ঋষশৃঙ্গ মুনির অঙ্গ দেশের রাজার ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে তো ভালই হয়েছিল, রাজকন্যা পেল, রাজ্য পেল আবার রাজা দশরথের যজ্ঞের পুরোহিত হয়েছিলেন। আমরা এইভাবে দেখছি, কিন্তু দত্তাত্রেয় দেখছেন অন্য ভাবে, নৃত্য-গীতে ঐভাবে বশীভূত হয়ে আধ্যাত্মিকতার একটা ভালো অবস্থা থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পতন হয়ে গিয়েছিল, এই পতন না হলে তিনি হয়ত আরও উঁচুতে উঠতে পারতেন। কিন্তু যেটা মূল কথা সেটাকে ছাড়া যাবে না, সেটা হল তুমি বশীভূত হলে এই মিষ্টি সঙ্গীতের জন্য।

একই ধরণের চিন্তা বিদেশী সাহিত্যেও পাওয়া যায়। ইলিয়ড ওডিসিতে এই ধরণের দুটো বর্ণনা আছে। সাইরিন দ্বীপে এক ধরণের মেয়েরা ছিল, যারা অতি সুন্দরী আর এত সুন্দর মিষ্টি গান করত যে তাদের গানের আকর্ষণে দ্বীপের পাশ দিয়ে যত জাহাজ যেত সব ঐ দ্বীপে এসে আটকে যেত। আরগো নামে একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, সাইরিন দ্বীপের পাশ দিয়ে গেলেই তুমি ওখানকার মেয়েদের সঙ্গীতে ফেঁসে যাবে। তাকে বলে দিল তুমি এমন মিউজিশিয়ান নিয়ে যাও যারা ঐ মেয়েগুলোর থেকেও ভালো গান বাজনা করতে পারে। তা না করলে তোমার নাবিকরা সব পালিয়ে যাবে। আরগো জাহাজ এইভাবে ভালো মিউজিশিয়ানদের নিয়ে যাওয়াতে দ্বীপের পাশ দিয়ে খুব নিরাপদে বেরিয়ে গিয়েছিল। হারকিউলাস যখন ফিরছেন তখন তাঁকেও আগে সাবধান করে দেওয়া হয়ছিল। সাইরিন দ্বীপ থেকে এত সুন্দর সম্মোহিনী সঙ্গীত ভেসে আসবে তোমরা কেউ ফিরতে পারবে না, সব ঐ দ্বীপে বন্দী হয়ে যাবে। হারকিউলিস সব নাবিকের কানে মোম ঢেলে দিয়েছে যাতে কানে কোন শব্দ না শুনতে পায়। আর নাবিকদের বলে দিল তোমরা আমাকে জাহাজের মাস্তুলে ভালো করে বেঁধে দাও। আমি একটু এদের সঙ্গীতটা শুনতে চাই, আর আমি যতই চেঁচামেচি করি না কেন কোন মতেই আমার বাঁধন খুলে দিয়ে নামিয়ে দেবে না। হারকিউলাসকে মাস্তুলে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জাহাজ যখন সাইরিন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন সেই মধুর সম্মোহিনী গান ভেসে আসছে। হারকিউলাস চিৎকার করে যাচ্ছে, উন্মত্তের মত হাত পা ছুঁড়তে শুরু করেছে, বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার মত অবস্থা। নাবিকদের ধমক দিয়ে বলছে আমাকে খুলে দাও, তা নাহলে আমি তোমাদের একটা একটা করে গলা কেটে সমুদ্রে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব। হারকিউলাস ক্যাপ্টেন ছিল। কিন্তু নাবিকদের কানে তো মোম দেওয়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। নাবিকরা ভাবছে ক্যাপ্টেন গান শুনে আনন্দে হাত পা ছুঁড়ছেন। এইভাবে শেষে যখন দ্বীপটাকে অতিক্রম করে পেরিয়ে গেল, সঙ্গীতের শব্দটাও মিলিয়ে গেল, তারপর আস্তে আস্তে হারকিউলাসের পাগলামোটা থামল।

সাধনার জগতে বলা হয় যে, ইন্দ্রিয় জগতের আকর্ষণ থেকে বাঁচার দুটো পথ, প্রথম পথ হল কানে ঠুলি দিয়ে দেওয়া, হারকিউলিসের জাহাজের নাবিকদের মত। কিন্তু কটা ইন্দ্রিয়ে ঠুলি দেবে! কান বন্ধ করবে, চোখটা বুজে রাখবে, নাক বন্ধ করবে, কত বন্ধ করবে, এভাবে কি জীবন চলতে পারে! আরগো জাহাজের ক্যাপ্টেন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সেটাই শ্রেষ্ঠ পথ। ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণটা যদি বেড়ে যায়, ঈশ্বরের সঙ্গীত যদি ভেতরে অনুরণিত হতে শুরু করে তখন জাগতিক সব কিছুই অসার বোধ হবে। সেইজন্য এখানে শব্দটা বলছেন *গ্রাম্যগীতম্*, গ্রাম্যগীত যদি মানুষকে আকর্ষিত করে কিন্তু অন্তর্জগতে যদি ঈশ্বরের দৈবী সঙ্গীতের সুরের মুর্ছনা শুরু হয়ে যায় তখন এই গ্রাম্যগীত এক পাশে অসার হয়ে পড়ে থাকবে। মৌলবীর কাহিনী আছে, এক নর্তকীকে মৌলবীর খুব ভালো লাগত। মৌলবী লুকিয়ে লুকিয়ে নর্তকীর সেবা করত। একদিন ধরা পড়ে গেছে। নর্তকী বলল, ঠিক আছে আজকে আমি শুধু তোমার জন্যই আছি। সেজেগুজে নর্তকী এসে মৌলবীর কাছে বসেছে আর ঠিক সেই সময় আজান শুরু হয়েছে। তখন মৌলবীর মনে পড়ে গেল আমাকে এখন প্রদীপ জ্বালাতে হবে, দৌড়ে সেখান থেকে সে বেরিয়ে মসজিদের দিকে চলে গেল। আল্লার ডাক যদি একবার মর্মে এসে আঘাত করে তখন সাংসারিকতা অসার হয়ে যায়। তবে কি হয়, ঠাকুর বলছেন চারাগাছকে প্রথমের দিকে বেড়া দিতে হয়, বেড়া না দিলে গরু, ছাগল খেয়ে নেবে, মারিয়ে দেবে। ইন্দ্রিয় জগতের আকর্ষণ থেকে বাঁচার

এই দুটি পথ, একটা হল কানে ঠুলি দেওয়া আর দ্বিতীয় হল আরও উচ্চ জিনিসের দিকে যাওয়া। সংসারটা চিটে গুড়ের পানা আর ঈশ্বরের ভালোবাসা মিছরির শরবৎ। একবার মিছরির শরবতের স্বাদ পেলে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না।

১৬) মৎস্য

অবধূতের ষোড়শ গুরু মাছ। দত্তাত্রেয় বলছেন এবার আমি তোমাকে বলব মাছের কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা পেয়েছি। বড়শির টোপে যে মাংসের টুকরো দেওয়া থাকে, তার গন্ধে লোভে পড়ে মাছ এসে বড়শিটাকে ধরে মাংসের আস্বাদ করতে গিয়ে কখন যে তার গলায় বড়শিটা বিধে যায় টেরও পায় না। *জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ। মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা।।*১১/৮/১৯। মাছ যেমন মাংসের স্বাদের লোভে প্রাণ দেয়, ঠিক তেমনি যে নিজের জিহ্বার স্বাদের লোভে বশীভূত হয়ে যায় সে মরবে। রসনার এমন টান যে ওখান থেকে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রমথন করে শেষ করে দেয়। বিবেকী পুরুষরা বাকি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন কিন্তু জিহ্বাকে বশে আনা খুব কঠিন। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন আধ্যাত্মিক জীবনে যে এগোতে শুরু করে তার কতকগুলি লক্ষণ আছে। প্রথমেই বলছেন তার খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বরটা কমে যায়। আগে বললেন অজিতেন্দ্রিয়, মানে যারা মেয়েদের দেখলেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে বলছে যারা জিহ্বার রসনায় আসক্ত, খাওয়া-দাওয়া যাদের পছন্দ। রসনার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই সে আজ হোক বা কাল হোক মরবেই। এখানে অবধূত খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসীদের কথা বলছেন, আমার আপনার কথা বলছেন না। আমাদের একটু আপোষ হতে পারে, কিন্তু যিনি বনচর সন্ন্যাসী, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, তাঁর যদি রসনার দুর্বলতা এসে যায়, সর্বনাশ তাঁর হবেই হবে। আমরা যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বলি, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাথে কর্মেন্দ্রিয়কেও যদি নেওয়া হয়, এই দশটি ইন্দ্রিয় প্রত্যেকটি এক অপরের সাথে জড়িয়ে আছে। একটা ইন্দ্রিয় যদি দুর্বলতা থাকে ঐ একটি ইন্দ্রিয় একাই বাকি নয়টি ইন্দ্রিয়কে নামিয়ে দেবে। সেইজন্য কোন ইন্দ্রিয়কেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। শরীর চালাতে ইন্দ্রিয়ের দরকার পড়বে ঠিকই কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে লাইন টেনে দিতে হয়।

বলছেন, *তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্, বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে।।১১/৮/২১।।* এখানে দত্তাত্রেয় কয়েকটি কথা বলছেন, রসেনেন্দ্রিয়কে বশীভূত করলে সব ইন্দ্রিয়ই বশীভূত হয়ে যায়। রসনা মানে খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যে আসক্তি, রসনাকে জয় করলে সব ইন্দ্রিয়কেই জয় করা হয়ে যায়। অন্য ইন্দ্রিয়গুলো বশীভূত হলে মানুষ কিন্তু জিতেন্দ্রিয় হতে পারে না। কারুর যদি দেখা যায় তার রসেনেন্দ্রিয় বশীভূত তাহলে বুঝতে নিতে হবে যে তার বাকি সব ইন্দ্রিয়গুলোও বশীভূত হয়ে গেছে। বেলুড় মঠের একজন মহারাজ ছিলেন, খুবই ত্যাগী ও তপস্বী, দেহ রেখেছেন। উনি আমেরিকায় এক সেন্টারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে এসে দিল্লীতে ছিলেন। ওনার একবার কি মনে হল, আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে কিছুই তপস্যা করা হয়নি, এবার আমাকে খুব তপস্যা করতে হবে। উনি খুব মজা করে সাধুদের বলতেন, আরে ভাই! সেন্টারে খুব সুখে আছ, জিহ্বার যে কি টান কোন দিন বুঝতে পারলে না। উনি নিজে অত্যন্ত পেটরোগা ছিলেন, কিছুই খেতে পারতেন না, একটাই ওনার প্রিয় ছিল চা খাওয়া, প্রত্যেক এক ঘন্টা অন্তর চা খাবেন। সব কিছুতেই ওনার বৈরাগ্য ছিল কিন্তু চা খাওয়াটা কোন দিন ছাড়তে পারলেন না। উত্তরকাশীতে সন্ন্যাসীদের একটা কুঠিয়া আছে, ওখানে রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থা নেই। তখনকার দিনে তো আরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। ওখানে অন্নসত্র আছে সেখানে গেলে রুটি আর ডাল দিয়ে দেবে। এক রুটি আর ডাল খেয়ে কদিন আর চলতে পারে, মাঝে মাঝে একটু অন্য ধরণের খাওয়ার ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। একদিন ওখানে একটা নোটিশ পড়ল যে, মহাত্মারা আপনার আসবেন অমুক জায়গায় অমুক আশ্রমে আপনাদের চা দেওয়া হবে। মহারাজ যে কুঠিয়ায় থাকতেন ওখান থেকে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন পাহাড়ি জায়গা বলে কম করে তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে হবে, তিন কিলোমিটার যাওয়া, তিন কিলোমিটার আসা, মোট ছয় কিলোমিটার হাঁটতে হবে। মহারাজ ভাবলেন আড়াইশ কি পাঁচশ চায়ের পাতা দেওয়া হবে, দু-তিন মাস ওনার চলে যাবে। তা নাহলে ওখানে সব কিছুই কিনতে হবে, কিন্তু পয়সা কোথায় পাবে! বিকেল চারটের সময় চা দেওয়া হবে,

উনিও তিনটের সময় হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন। ওখানে পোঁছেছেন, পোঁছানর পর সবাইকে এক কাপ করে চা খেতে দিয়েছে। উনি পরে এই ঘটনাটা সবাইকে বলতেন, এক কাপ চা খাওয়ার জন্য ঐ পাহাড়ি রাস্থায় তিন কিলোমিটার যাওয়া তিন কিলোমিটার আসা।

রসনা যে কী পীড়া উৎপন্ন করে সহজে বোঝা যায় না। আলাদা একা একা থাকলে তখন বোঝা যায়। সংসার জীবনে অনেক অশান্তি আছে, অনেক রকম ঝামেলা আছে, সংসারীদের অবশ্যই মনে হতে পারে, সন্ন্যাসীদের আর কি ঝামেল, যত ঝামেল আমাদেরই। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা সংসারীরা কল্পনাই করতে পারবে না, যে জিনিসগুলো যোগীদের কাছে, সন্ন্যাসীদের কাছে কি প্রচণ্ড সমস্যা। কোন মহাত্মার মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপল অমুক জিনিস খাওয়া যাক, হয়ত খুবই সাধারণ জিনিস তেমন কিছু না, কিন্তু তার জন্য তিন চারজনকে আমন্ত্রণ করবে, এরপর জিনিস-পত্র জোগাড়-যন্ত্র করতে নেমে পড়বে। রসনার প্রতি যদি একটু দুর্বলতা থাকে, ঐ একটু দুর্বলতাই এক এক করে সব কটি ইন্দ্রিয়কে টেনে নামিয়ে আনবে। এটাকে নিয়েই নারদ কৌপিন কে ওয়াস্তের কাহিনী বলছেন, একজন সাধুর কৌপিন ইঁদুরে কেটে দিত। ভিক্ষা করতে গিয়ে একজনের কাছে একটা কৌপিন চেয়েছে, সে আবার সাধুকে বুদ্ধি দিল ইঁদুরকে শায়েস্তা করার জন্য একটা বেড়াল রাখতে। সাধু বেড়াল পুষছেন, বেড়ালের জন্য দুধ চাই, দুধের জন্য একটা গরু চাই, গরুর দেখাশোনা করার জন্য একটা মেয়ে দরকার, এরপর ঐ মেয়েকে রাখার জন্য ঘরবাড়ি তৈরী করে নদের হাট বানিয়ে বসে গেল। আমরা যাই করি না কেন, যতই কান্নাকাটি করুক, সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। এত যে বৈরাগ্যের কথা বলছেন, এর একটিও জীবনে অনুশীলন করা যাবে না।

অথচ প্রকৃতি এমনই এক অদ্ভুত জিনিস যে শাস্ত্রে যা যা কথা বলছেন সবটাই প্রকৃতি আমাদের দিয়ে করিয়ে নেয়। আমরা বলছি বৈরাগ্যের অনুশীলন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতি তখন বলে, তুমি বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে পারবে না বলছ, ঠিক আছে আমিই তোমাকে দিয়ে বৈরাগ্যের অনুশীলন করিয়ে নেব। মৃত্যু যখন আসবে তখন সে আমাদের পায়ে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে। সব কিছু এখানে পড়ে থাকবে। আর জন্মজন্মান্তর ধরে প্রকৃতি আমাদের টেনে বার করে আনার অনুশীলন করিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে আমরা অনুশীলন করতে চাইছি না। প্রত্যেক জন্মে আসছি আর প্রত্যেকবার বৈরাগ্যের পরীক্ষায় ফেল করে যাচ্ছি। যে মহারাজের কথা বলা হল উনি বলতেন 'দেখো ভাই আমার সময় হয়ে গেল আমি চললাম, মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি কিন্তু যখনই আমার জীবনের দিকে তাকাই তখন দেখছি আধ্যাত্মিক জীবনে আমার প্রাপ্তি শূন্য'। খুব দুঃখ করে সব সময় এই কথা বলতেন। আর বলতেন 'আমি সাধন-ভজন যে করিনি তা নয়, পাক্কা ছয় মাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এক আসনে বসে আমি টানা জপ করেছি'। অন্নসত্র থেকে ওনার রুটি ডাল কেউ নিয়ে আসত, সারাদিন পড়ে থাকত, এমনিতেই পেটরোগা ছিলেন, কোন দিন খেতেন, কোন দিন খেতেন না। প্রত্যেক জন্মে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যখন আবার পাঠাচ্ছে আমরা আবার ঐ একই কাজ করছি। বৈরাগ্য আসছে না, প্রকৃতি বলছে তুই ফেল করলি, ঠিক আছে আরেক জন্ম থাক। পরীক্ষায় ফেল করলে যেমন একই ক্লাশে রেখে দেওয়া হয়, প্রকৃতিও আমাদের দিয়ে বৈরাগ্যের চেষ্টা করিয়ে যাচ্ছে। আবার জন্ম নিয়ে চেষ্টা করছি, প্রকৃতি অনেক চড়, থাপ্পড় মেরে বৈরাগ্য শেখাচ্ছে, আমরা আবার ফেল করে একই ক্লাশে থেকে যাচ্ছি। এভাবে কত দিন চলবে? *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*, যতদিন ফেল করব ততদিন এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকবে, সেই ভালোবাসা, সেই শত্রুতা। বৌদ্ধ ধর্মের যে মহাযান শাখা আছে তাতে তাঁরা বলেন মুক্তি সবারই হবে। আমাদেরও একটা মতে মুক্তি সবারই হবে। কিন্তু কবে হবে কেউ জানে না। বৈরাগ্যের অনুশীলন করা খুব কঠিন কিন্তু সবাইকে এটাই করতে হবে। মাছের পরে ভাগবতের খুব নামকরা কাহিনী বলছেন। এই কাহিনী অন্যান্য জায়গায়তেও আসে।

১৭) পিঙ্গলা নর্তকী

মিথিলা নগরীকে বলা হয় বিদেহ নগরী। বিদেহ শব্দের অর্থ যিনি এই দেহে থেকেও মুক্ত। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, নারকল শুকিয়ে একেবারে ঝুনো হয়ে গেলে ওর ভেতরের শাঁস খোল থেকে আলাদা

হয়ে যায়, নারকলকে নাড়ালে ঢপর ঢপর আওয়াজ হয়। যিনি জ্ঞানী পুরুষ তাঁর শরীর আর জীবাত্মা পরিষ্কার আলাদা হয়ে যায়। আমি আর আমার জামা যেমন আলাদা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, জ্ঞানী পুরুষও ঠিক সেই রকম পরিষ্কার বুঝতে পারেন আমি আর আমার শরীর আলাদা। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে, আমার ঠিক ঠিক আমিটা আমার দেহ থেকে আলাদা। আমরা সবাই নিজেকে দেহ ছাড়া ভাবতেই পারি না, খুব হলে দেহ মন বুদ্ধি সবটাকে মিলিয়ে মনে করছি এটাই আমি। সাধনা মানে প্রথমে ধীরে ধীরে নিজের মনকে দেহ থেকে আলাদা করা। সারা দিন আমরা কত রকম কাজ করছি, একে গালাগালি দিচ্ছি, তাকে মিষ্টি কথা বলছি, কত বদমাইশি, হাসিঠাট্টা করছি, কিন্তু জপ করতে বসলে সব কিছু ধীরে ধীরে মন থেকে খসে যেতে থাকে, তখন মনে হয় ওকে গালাগাল না দিলেই ভালো হত, এত হাসিঠাট্টা করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু যেমনি জপ থেকে উঠে এলাম আবার সেই একই জিনিস শুরু হয়ে যাবে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, হাতিকে যতই স্নান করিয়ে দাও আবার সে গায়ে ধুলো মাখবে। এইভাবে সাধনা করতে করতে যেদিন সমাধিবান পুরুষ হয়ে যাবে তখন আমি আর আমার দেহ আলাদা এই বোধটা স্থায়ী ভাবে হয়ে যাবে, আমি আর আমার দেহ এই দুটো আর কোন দিন এক হবে না। আমি আর আমার মন আলাদা, আমি আর আমার বুদ্ধি আলাদা, এটাই সমাধিবান পুরুষের বাস্তবিকতা হয়ে যায়। তিনি তখন দেখেন আমি হলাম শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, এটাই আমি, বাকি যা কিছু আছে আবরণের মত। এর জন্য সাধারণ লোকেদের সারা জীবন ব্যাপী বা অনেক জন্ম ধরে বিরাট সাধনা করতে হয়, কিন্তু কিছু কিছু মহাপুরুষ আছেন তাঁদের এত করতে হয় না। রাজা জনক এই রকম ছিলেন, তিনি বিদেহ। যাঁদের জ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু শরীর এখনও চলছে, তাঁদের ব্যবহারটা পুরো আলাদা হয়ে যায়। তিনি জ্ঞানী কিন্তু দেহ থেকে আলাদা, নিজেকে আর দেহ মনে করছেন না, সেইজন্য তাঁদেরকে বলা হয় বিদেহ। যে কোন জ্ঞানী পুরুষকে বিদেহ বলা যেতে পারে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বিদেহ, স্বামীজী বিদেহ। কিন্তু বিদেহ এই শব্দকে বিশেষ ভাবে রাজা জনকের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। বিদেহ বলতে আমরা সবাই জানি রাজা জনক। কারণ তিনি ছিলেন আদর্শ, জ্ঞানী অথচ সাম্রাজ্য চালাতেন। বেদান্ত শাস্ত্রে বিদেহ মুক্তির কথা বলা হয়, বিদেহ মুক্তি খুব বিরল ব্যাপার। বিদেহ মুক্তি মানে, জ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু শরীরটা থেকে গেছে, এর আরেকটা নাম জীবনমুক্তি। সচরাচর দেখা যায় বড় বড় জ্ঞানীদেরও মৃত্যুর ঠিক আগে জ্ঞান হয়। এটাই সাধারণ ধারণা, এই ধারণা ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মেও আছে, তারাও বলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে। একমাত্র হিন্দু ধর্মেই জীবনমুক্তির উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্মও জীবনমুক্তিকে খুব গুরুত্ব দেয়। ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণেও বলা হয় যে মিথিলার রাজার উপর বর ছিল, এই বংশে অবিদেহ কেউ জন্মাবে না। মিথিলার রাজবংশে যাঁরাই জন্ম নেবেন তিনিই জ্ঞানী হবেন। সেইজন্য মিথিলার রাজাকে বিদেহ রাজ বলা হয়, আর পর পর মিথিলার যাঁরা রাজা হতেন সবারই নাম রাজা জনক, একটা পদের মত হয়ে গিয়েছিল। জনক মানেই হয় যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু সংসারে আছেন। কথামৃতে একজন ঠাকুরকে বলছেন, আমরা রাজা জনকের মত। ঠাকুর বলছেন, রাজা জনক কি এমনিই হওয়া যায়, তার আগে রাজা জনকের কত হেঁটমুণ্ডু তপস্যা ছিল।

রাজা জনকের খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে। শুকদেব জন্ম থেকেই জ্ঞানী, তাঁর পিতা ব্যাসদেব। ব্যাসদেব পুত্রকে সব শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাসদেবের শান্তি হচ্ছে না, ব্যাসদেবের মনে হচ্ছে শুকদেবের এখনও ঠিক ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, কারণ তিনি বাবা, বাবাকে আপন লোক মনে করছে। ব্যাসদেব তখন শুকদেবকে বললেন, তুমি রাজা জনকের কাছে যাও, তিনি তোমাকে শিক্ষা দেবেন। রাজা জনক জেনে গিয়েছিলেন যে শুকদেব তাঁর কাছে আসছেন। তিনি আগে থাকতেই দ্বারপালদের সব বলে দিয়েছেন কি করতে হবে। শুকদেব আসতেই দ্বারপালরা তাঁকে কোন গুরুত্বই দিল না। শুকদেব সাত দিন সাত রাত ওখানেই বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎ একজন এসে বলল, আরে আপনি এখানে! শুকদেবকে খুব রাজকীয় সম্মান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা জনকের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, রাজা জনক শুকদেবকে বললেন, এই নিন এই তেল পূর্ণ পাত্র দিলাম, এই পাত্রকে মাথায় করে এই সভাকে প্রদক্ষিণ করে আসুন। সেখানে আবার রাজনর্তকীদের নৃত্য করার জন্য লাগিয়ে দিলেন। শুকদেব জন্ম থেকেই জ্ঞানী, ওনার কোন দিকেই হুঁশ নেই, তিনি মাথায়

তেলের পাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করে এলেন। তখন রাজা জনক বললেন, আপনাকে আমার উপদেশ দেওয়ার কিছু নেই, তবে এখানে যখন এসেই গেছেন কিছু দিন এখানে অবস্থান করে যান।

এই জায়গাতেই আমাদের ধরতে হবে, এখানে ঈশ্বর দর্শন, জ্ঞান লাভ বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? ঈশ্বর দর্শন মানে স্থির চিত্ত, একেবারে একাগ্র মন। এই জিনিসটাকেই রাজযোগে বলছেন *যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ*, যোগ হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ মানে, মনের মধ্যে কোন বৃত্তি নেই, মন absolutely one pointed। মন যে কেন্দ্রিত হয়, এটাই জ্ঞান। রাজা জনক এখন শুকদেবের সাথে আছেন। একদিন দুজনে বসে শাস্ত্র আলোচনা করছেন, সেই সময় একটা রব উঠল, রাজমহলে আগুন লেগে গেছে। শুকদেব ত্যাগী পুরুষ, ওনার শুধু দুটো কৌপিন, একটা পড়ে থাকতেন আরেকটা ঘরে শুকোচ্ছে, এই দুটো কৌপিন ছাড়া শুকদেবের আর কিছু ছিল না। শুকদেব শুনলেন আগুন লেগেছে, তিনি দৌড়েছেন নিজের কৌপিনটা বাঁচানোর জন্য। রাজা জনক তখন হেসে বলছেন, *মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন*, পুরো মিথিলা নগরী যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় আমার তাতে কিছু আসে যায় না। খুব নামকরা কথা, বলছেন পুরো জগতের যা কিছু হয়ে যাক আমার তাতে কিছু আসে যায় না। কেন আসে যায় না? কারণ আমি দেহ নই, দেহের সাথে আমার কোন একাত্ম বোধ নেই। এগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের কথা কোন সন্দেহই নেই, এসব কথা আমাদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। যতক্ষণ আমাদের দেহবোধ আছে, যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ সবারই খবর আমাদের নিতে হবে।

এই সেই বিদেহ নগরী, যার রাজা একজন আত্মজ্ঞানী, যে বিদেহ নগরের আসল নাম মিথিলা, সেই মিথিলাতে পিঙ্গলা নামে এক বণিতা বাস করত। পিঙ্গলার কাহিনী আমাদের বিভিন্ন সাহিত্যে, শাস্ত্রে ছড়িয়ে আছে। অন্য এক কাহিনীতে পিঙ্গলা নামে একটি মেয়ের টিয়া পাখি ছিল, সে টিয়া পাখিকে হরিনাম শেখাত, সেখান থেকে পিঙ্গলার জ্ঞান হয়ে যায়। এখানে বলছেন, পিঙ্গলার মিথিলাতে খুব নাম ছিল, যেমন বৈশালীতে আম্রপালী ছিল। আম্রপালী অবশ্য ঐতিহাসিক চরিত্র আর এখানে পিঙ্গলা একটি পৌরাণিক চরিত্র। বলছেন *সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতি। অভূৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্।।১১/৮/২৩।।* পিঙ্গলাকে দেখতে খুব রূপসী ছিল আর স্বেচ্ছাচারিণী ছিল, পিঙ্গলাকে কখনই কোন পুরুষ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। স্বেচ্ছাচারীর অর্থই হয় যে কাউকে মানে না। যেমন বাড়িতে বাবা-মা আছে তাদের কথা শুনবে না, দেশে রাজা আছে, তার কথা মানবে না। কিন্তু কোন স্ত্রীর জন্য স্বৈরাচারিণী বা স্বেচ্ছারিণী শব্দ যদি ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় তার স্বামী তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। এখানে সে বারবণিতা। সে কি করত? *কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতি*, এই লাইনটাই পরে অন্য ভাবে আসবে। পিঙ্গলা বাড়ির দরজার বাইরে সুন্দর বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। পরের শব্দটা ব্যবহার করছেন *সঙ্কেতোপজীবিনী*, যার অর্থ চোখের চাহনি দিয়ে নিজের জীবন নির্বাহ করা। খুব সেজেগুজে নিজের বাড়ির দরজার সামনে বা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে যেখানে খদ্দের পাওয়া যাবে। কিন্তু এদের চোখের চাহনিটাই অন্য রকম। চোখের চাহনি দেখলেই পুরুষরা বুঝতে পারে তার কি উদ্দেশ্য। ভালো লোকেরা তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যায়, গোলমেলে যারা তারা ওর কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকে। যারা ঘুরঘুর করে সঙ্কেতোপজীবিনীরা লোকটিকে মেপে নেয় তার ধন-সম্পদ আছে কিনা। যদি বুঝে যায় এর ধন-সম্পদ নেই তখন লোকটিকে এরা আর পাত্তা দেবে না।

সঙ্কেতোপজীবিনীদের নিয়ে অনেক মজার মজার ঘটনা আছে। একজন ফরাসী সাহিত্যিকের একটা উপন্যাসে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা, তিনি আবার খুব পতিব্রতা, তিনি একদিন এক সঙ্কেতোপজীবিনীকে দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন, দেখছেন মেয়েটি কি রকম চোখের চাহনি দিয়ে পুরুষদের ফাঁসাচ্ছে। সেটা দেখে মহিলার ইচ্ছে হল এর একটু নকল করে দেখলে হয়। নকল করতে করতে একজন পুরুষ মহিলার দিকে এগিয়ে এসেছে, খুব নিখুঁত নকল করছিল। লোকটি বলে গেল, ঠিক আছে আমি আসছি। মহিলাটি ভয় পেয়ে গেছে, তখন বলছে, না না আমি এসব করি না। এইবার নাটক শুরু হয়ে গেল। লোকটি ধরেই নিয়েছে মহিলাটি নিজের দর বাড়াবার জন্য এই রকম করছে। মহিলাটি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে গেছে, আতঙ্কে এখন লোকটিকে

খুব করে আটকাচ্ছে। কিন্তু পুরুষটিও মহিলাকে ছাড়তে চাইছে না। বিরাট লম্বা কাহিনী। সঙ্কেতোপজীবিনীদের চোখের চাহনিটাই আলাদা, সব পুরুষ বুঝতে পারবে না, কিন্তু যারা এই লাইনে আছে, বিশেষ করে যারা ভোগী, যাদের মধ্যে ভোগের ইচ্ছা প্রবল তারাই শুধু বুঝতে পারবে।

দত্তাত্রেয় বলছেন *মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ। তাঞ্শুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেহর্থকামুকা।।১১/৮/২৪।।* পিঙ্গলার উদ্দেশ্য পুরুষের সঙ্গ করা নয়, ধন-সম্পদের প্রতিই তার একমাত্র আকর্ষণ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, যখনই কোন পুরুষকে আসতে দেখছে তখনই ভাবছে লোকটি ধনী কিনা, দ্বিতীয় *শুল্কদান্*, লোকটি আমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক মেটাতে চাইবে কিনা আর তৃতীয় লোকটি কামুক কিনা। এই তিনটে না থাকলে পিঙ্গলার মত মেয়ের কাজ হবে না। একজন লোকের টাকা থাকতে পারে কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে চাইবে না আর টাকা আছে, পারিশ্রমিকও দিতে রাজী কিন্তু মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, বাড়িতে কেউ মারা গেছে। তাকে কামুক হতে হবে, পারিশ্রমিক দেওয়ার মানসিকতা থাকা চাই আর তার পয়সা চাই। পিঙ্গলা কোন পুরুষকে দেখলেই মনে করত এ বিরাট ধনী এবং ধন দিয়ে সে তাকে উপভোগ করতে চাইছে। সে তার কলাকৌশল দেখাতে শুরু করে দিল। *আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী। অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোহপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ।।১১/৮/২৫।।* পিঙ্গলা হয়ত দেখল একজন পুরুষ এগিয়ে আসছে, আসার পর সেই পুরুষ যখন উপেক্ষা করে চলে যেত তখন পিঙ্গলার মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনটা ছটফট করতে শুরু করেছে, আশা করছে এবার হয়ত তার কাছে কোন ধনী পুরুষের আগমন হবে। *এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী। নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত।।১১/৮/২৬।।* অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেছে, *দুরাশয়া* পিঙ্গলাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে, কারণ রাত বারোটা হয়ে গেল এখন পর্যন্ত একটা খদ্দের সে পেল না। *ধ্বস্তনিদ্রা*, তার চোখের ঘুম উড়ে গেছে।

মহাভারত, ভাগবত বা কালিদাস, এনাদের যে ভাষা তাতে কিছু কিছু এমন সব শব্দের প্রয়োগ ও বিন্যাস থাকে তাতে, যে জিনিসটা বলতে চাইছেন সেটা এমন এক উচ্চস্তরে চলে যায় যে আলাদা করে বলার কিছু থাকে না। ওটাই সাধারণ কোন লেখকেরা করতে গেলে পুরোটাই কৃত্রিম মনে হবে। এখানে বলছেন, *এবং দুরাশয়া*, দুরাশা তাকে ঘিরে নিয়েছে আর *ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী*, বাড়ি প্রধান দরজাকে অবলম্বন করেই সে দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ির ভেতরে আর যেতে পারছে না, ভাবছে এইবার বুঝি কেউ আসবে, তার ঘুমটাও উড়ে গেছে। *নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী*, কখন একটু ক্ষণের জন্য ভেতরে যাচ্ছে আবার বাইরে চলে আসছে। পিঙ্গলার অবস্থা খুব খারাপ, ওর দিব্য ভাবের বোধটাই পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার সময় স্বামীজীর জাহাজ কায়রোতে প্রায় বারো ঘন্টার মত দাঁড়াতে হয়েছিল। কায়রো শহরটা দেখার জন্য স্বামীজী আর তাঁর সঙ্গীরা ওই সময় জাহাজ থেকে নেমে শহরে ঘুরতে বেরিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে ওনারা কিভাবে রাস্তা ভুল করে ফেলেছেন। সব বন্দর এলাকার আশেপাশে অনেক রেডলাইট এরিয়া থাকে। নাবিকদের অনেক মাস ধরে জাহাজে কাটাতে কাটাতে ওদের মানসিকতাটা অন্য রকম হয়ে যায়, বন্দরের আশেপাশে এই ধরণের মেয়েরা থাকে। স্বামীজীরা পথ ভুলে ঐ ধরণের একটা এলাকায় ঢুকে পড়েছেন। স্বামীজী দেখছেন বেশির ভাগ মেয়েরাই স্বল্পবাস, হাসাহাসি করছে, ইশারা করছে। সঙ্গীদের সাথে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, তাই স্বামীজী প্রথমে বুঝতে পারেননি। সঙ্গীরা বুঝতে পেরে স্বামীজীকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তখন স্বামীজীর খেয়াল হল, আরে তাই তো আমরা এ কোথায় এসে গেলাম। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তখন নিজেকে সঙ্গীদের থেকে আলাদা করে নিলেন। যে মেয়েগুলো বেশি ইশারা করছিল স্বামীজী তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের কাছে যেতেই স্বামীজীর চোখ জলে ভরে গেছে। সঙ্গীরাও স্বামীজীকে আটকাবার জন্য পেছন পেছন এগিয়ে গেছেন। স্বামীজী তখন সঙ্গীদের বলছেন, দেখো! এদের ভেতরে যে দিব্যত্ব সেটাকে তার কিভাবে পুরোপুরি নিজেদের শরীরের উপর লাগিয়ে দিয়েছে, আর আজকে এদের কি দুরবস্থা! মেয়েগুলো স্প্যানিশ ভাষী ছিল, কিন্তু বুঝতে পেরে গেছে স্বামীজী কি বলতে চাইছেন। ওরা দৌড়ে এসে স্বামীজীর সামনে হাঁটু গেড়ে স্বামী জামার খোট ধরে চুম্বন করছে, হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে Man of God। হৃদয় হৃদয়কে স্পর্শ করার দৃশ্য।

স্বামীজীর এই একটি কথা যদি মনে রাখা হয় তাহলে পিঙ্গলার ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে দিব্যত্ব আছে, দিব্যত্ব মানে sense of 'I'ness আমিত্ব বোধ। একটা যে এ্যটম তার মধ্যেও দিব্যত্ব আছে আর একটা সিংহের মধ্যেও দিব্যত্ব আছে, সবারই মধ্যে দিব্যত্ব আছে। সুন্দরী পতিব্রতা নারীর মধ্যেও দিব্যত্ব আছে আর একটা যে বারবণিতা তার মধ্যেও দিব্যত্ব আছে। যেটা দেখার তা হল এই দিব্যত্বকে সে কোথায় লাগাচ্ছে। যেখানে সে তার দিব্যত্বকে লাগাবে, সেখানেই সে উঠবে, কিন্তু ওঠার জন্য একটা মূল্য দিতে হয়। যে কোন জিনিসেরই একটা মূল্য থাকে। দিব্যত্ব তাকে ওঠাবে, ঐ ক্ষেত্রে তাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। যেমন একটা পাথর তার দিব্যত্বকে লাগিয়ে দেয় স্থবিরতাতে, আমাকে আর নড়তে চড়তে হবে না, আমি এভাবেই পড়ে থাকব। যদি কোন মুর্তিকারের কৃপাদৃষ্টি ঐ পাথরের উপর পড়ে যায়, তখন তিনি বলবেন এই পাথরকে আমি একটা মুর্তিতে দাঁড় করিয়ে দেব। তিনি দারুণ একটা মুর্তি বানালেন, সেই মুর্তি হয়ত কোন মিউজিয়ামে গিয়ে প্রশংসিত হচ্ছে বা কোন মন্দিরে সেই মুর্তির ঈশ্বরের বিগ্রহ রূপে পূজো হচ্ছে। পাথরের দিব্যত্বকে কেউ একজন পরিবর্তন করে দিলেন। এটা কেন হয় আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। মানুষ যদি তার দিব্যত্বকে সৃজনশীল কার্যে লাগিয়ে দেয়, তখন তার ভেতর থেকে বিভিন্ন কবিতা, সাহিত্য, গান-বাজনা, ছবি বেরোতে শুরু হবে। আর দিব্যত্বকে যদি ছ্যাবলামোতে নামিয়ে দেয় তখন ছ্যবালামই হবে। কিন্তু ঐ দিব্যত্বকে যদি কেউ পুরোপুরি শরীরে নামিয়ে দেয়, তখন কি হবে? পুরো শহর তার পেছনে দৌড়াবে। তার সাজপোষাক খুব সুন্দর ফিটফাট, একেবারে উচ্চমানের হয়ে গেছে, কথাবার্তা তার এমন হবে যাতে মানুষকে আকর্ষিত করা যায়, যেখান দিয়ে যাবে মনে হবে যেন একটা সুগন্ধী ফুলের তোড়া চলে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই লোকজন সবাই তার পেছন পেছন যাবে। কিন্তু এর জন্য তাকে একটা মূল্য দিতে হবে। কিছু দিন পর দেখবে আগের মত অত লোক আর আমার পেছন পেছন আসছে না। তখন তাকে আরও কিছু করতে হবে, সেটার জন্য আরও কিছু করতে হবে, এইভাবে আরও কিছু, আরও কিছু করতেই থাকবে। এবার আস্তে আস্তে তার খদ্দের কমতে শুরু করবে। যে কোন লোকই যদি দেহের উপর নিজের দিব্যত্বকে ঢেলে দেয়, কত দিন আর দেহকে ধরে রাখতে পারবে! মেয়েরা মনে করে তাদের চোখের চাহনিতে জগৎ নাচছে। কিন্তু কত দিন? যে কোন মেয়েই, আঠারো থেকে শুরু হয়ে তিরিশ না পেরোতে পেরোতেই শেষ। যারা সঙ্কেতোপজীবিনী তাদের তিরিশের পর কি হবে? তিরিশের মধ্যে একেবারে একটা বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এদেরকেই স্বামীজী কায়রোর রাস্থায় দেখলেন, দেখে তাঁর চোখে জল বেরিয়ে এসেছে, এরা এদের দিব্যত্বকে নিয়ে কি করল!

যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয় আমরা আমাদের দিব্যত্বকে কোথায় লাগিয়েছি? সত্যি বলতে আমরা কোথাও লাগায়নি, দিব্যত্ব যদি লাগাই সেখানে একটা massive passion থাকবে। যেটাতে দিব্যত্ব লাগাবে সেটাই তখন তার জীবন হয়ে যাবে। এটাকেই আমরা বলি জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন আমরা বলি One pointed , যখন বলছি জীবনের উদ্দেশ্য, তখন এগুলোই বিদেশী শব্দ হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ভাষায় বলা হয় তোমার ভেতরে দিব্যত্ব আছে সেই দিব্যত্বকে তুমি কোথায় লাগাচ্ছ। যেমন পাথরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার জীবনের লক্ষ্য কি, এর কোন অর্থই হয় না। কিন্তু পাথরের দিব্যত্ব স্বাভাবিক ভাবে লেগে আছে স্থবিরতায়, ভগবান বলছেন *স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ*, স্থবিরদের মধ্যে আমি হিমালয়। হিমালয়ের স্থাবরের মধ্যে তিনিই আছেন, তার মানে দিব্যত্ব আছে। কিন্তু দিব্যত্ব কিভাবে সে প্রকাশ করে? স্থবির রূপে, স্থৈর্য রূপে। কিন্তু যারা পুরো শরীরের উপর দিব্যত্ব দিয়ে রেখেছে তারা বলছে এটাই আমার জীবন, শহরের সব পুরুষকে আমি নাচিয়ে ছাড়ব। কিন্তু শরীরের সাথে দিব্যত্বকে জুড়ে দিলে তার পরিণতি স্বামীজীর এই ঘটনার মত হয়ে যায়। একটা অবস্থায় গিয়ে বলবে, এদের যে দিব্যত্ব এই দিব্যত্বকে কোথায় লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিল, আজকে তার কি পরিণতি। এরা বারবণিতা, কিন্তু আগেকার দিনে নর্তকী বা গায়িকাদের কাজ ছিল নৃত্য বা গান দিয়ে ঈশ্বরকে খুশী করা, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হবে না। দিব্যত্বকে কোথাও লাগানো মানে সাধনা করা। একজন বারবণিতা কিসের সাধনা করছে? দেহসাধনা করছে। আমাদের অবস্থা আরও বাজে,

আমাদের জীবনটা কিছুই না, সব দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভেতরে যিনি অন্তর্যামী তাঁকে যতক্ষণ জীবনের কোন একটা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে লাগানো না হয় ততক্ষণ জীবনে কেউ উঠতে পারবে না।

পিঙ্গলার ঠিক একই পরিণতি, পিঙ্গলার যে দিব্যত্ব, তার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা, সেই চৈতন্য সত্তাকে সে লাগিয়ে দিয়েছে পুরুষদের ফাঁসানোতে। মেয়েদের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক শক্তি, সেই কারণে আগেকার দিনে মেয়েদের দমিয়ে রাখা হত। তখনকার দিনে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে তাদের দিব্যত্বকে মাতৃত্বের মধ্যে ঢেলে দেওয়ার সুযোগ করে দিত। আগেকার দিনে পঁচিশ বছরের কোন মেয়ের কোলে শিশু দেখলেই তার মধ্যে মাতৃত্বের ভাব পরিষ্কার বোঝা যেতে, মা বলে মনে হত আর এখনকার দিনে পঞ্চাশ বছরের মহিলাদের দেখলে মনে হয় আরেকটা বিয়ে করতে চাইছে, তাদের সাজগোজ, চোখের চাহনি, কথা বলা কোন কিছুর মধ্যে মাতৃত্বের ভাব নেই, মেয়েদের মধ্যে এতটা তফাৎ এসে গেছে।

দত্তাত্রেয় বলছেন *তস্য বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ। নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ।।১১/৮/২৭।।* কিছু অর্থের আশায় পিঙ্গলা এখন দাঁড়িয়ে আছে। খুব উচ্চমানের সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া কাঞ্চনের আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসা যে কোন মানুষের পক্ষেই খুব কঠিন। বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের অন্যান্য ইচ্ছাগুলো হয়ত চলে যায় কিন্তু তাকেও শরীরটা চালিয়ে যেতে হবে, শরীর চালানো মানেই খাওয়া-দাওয়া চাই, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা চাই, তার জন্য অর্থ চাই। আর সন্তান বা নাতিরা থাকলে তাদের খুশী দেখার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। আর যদি মনে করে একে ধরলে আমি কিছু টাকা পেতে পারি, তখন বড়লোকদের পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। ঠাকুরও মোসায়েবীর কথা বলছেন, মোসায়েবরা টাকার আশায় বড়লোকদের তোষামোদ করে। অথচ কোন টাকা আদায় করতে পারে না। যেমন যেমন রাত গভীর হচ্ছে তেমন তেমন পিঙ্গলার মনে দুরাশার ছায়া নেমে আসছে। আজ আর হয়ত কোন খদ্দের এল না। বিত্তবান পুরুষের আশায় অপেক্ষা করে করে পিঙ্গলার মুখ শুকিয়ে আসছে। *দীনচেতসঃ*, তার বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে, যোগের ভাষায় বলে তার বুদ্ধিটা পুরো দুঃখ বৃত্তিতে ঢাকা পড়ে গেল। তখন হঠাৎ তার এই বেশ্যাবৃত্তির উপর তীব্র বৈরাগ্য এসে গেল, এই বৈরাগ্য মানে বৃত্তিটার উপর ধিক্, এই ভাব এসে গেছে। এই ভাব আমাদের সবারই জীবনে বিভিন্ন সময় আসে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, দুই বন্ধু শহরে ঘুরতে এসেছে, একজন গেল ভাগবত কথা শুনতে আরেকজন গেল বেশ্যা বাড়ি। যে বন্ধু ভাগবত শুনতে গেছে, কিছুক্ষণ পর ভাবছে, সব মজা আমার বন্ধুই লুটছে আর যে বন্ধু গণিকা বাড়ি গেছে হঠাৎ তার দুঃখ বুদ্ধি এল, ছিঃ আমি কি করছি!

মানুষ মাত্রই নিজের স্বভাবে অবস্থিত থাকতে চায়, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সে শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত, মানুষের স্বভাবই হল তাই পরমানন্দ, মানুষের স্বভাবই হল চিরন্তন, সহজে মানুষ তাই মরতে চায় না। আর নিজেকে সব সময় শুদ্ধ পবিত্র রাখতে চায়, যদি নাও রাখতে পারে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র মনে করতে চায়। মানুষ নিজেকে সব সময় চৈতন্যবান মনে করে। মানুষ সব কিছুই মেনে নিতে রাজী, আমার টাকা নেই মেনে নেবে, আমার মান নেই মেনে নেবে কিন্তু আমার বুদ্ধি নেই কখনই মানবে না। যারা বলে আমার বুদ্ধি নেই, বুঝতে হবে কায়দা করে অহঙ্কার করছে। তেমনি মানুষ কখনই বন্ধনকে গ্রহণ করবে না। যেখানে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে নিজেদের ভালোবাসায় বন্ধন তৈরী করে, সেই বন্ধনেও সে একটা মুক্তির আস্বাদ পায়, নিজের ডানা বিস্তার করতে পারে। ফলে, মানুষ যখন অপবিত্র কিছু করে, অশুদ্ধ কিছু করে তখন হঠাৎ তার নিজের প্রতি ধিক্ এই ভাবনাটা আসে। এর উল্টোটাও কি হয়? পবিত্র থেকে অপবিত্রর দিকে যায়? অনেক কাহিনী আছে যেখানে দেখা যায় কোন সাধু বা সন্ন্যাসী কোন মেয়ের পাল্লায় পড়ে গেলেন। তবে তুলনা করলে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার দিকে বেশি মানুষ যায়। পবিত্র থেকে অপবিত্রে কেউ যেতে চায় না, আর যদি যায়ও, অপবিত্রতার দিকে যায় না, সে মনে করে ঐ জায়গায় গেলে আমার যে একটা বন্ধনের ভাব আছে সেটা সেটা ছাড়া পেয়ে যাবে। অনেক সময় অনুসন্ধিৎসা থাকে, পবিত্র থেকে অপবিত্র হতে চাইছে না কিন্তু ওর মনে একটা অনুসন্ধিৎসা জেগেছে, জিনিসটা কি, সেটাকে তাই অপবিত্র বলা যায় না। মানুষ যদি অপবিত্রতার মধ্যে থাকে, একটা সময় তার মনে ধিক্ ভাব জেগে উঠেবে, এসব আমি কি করছি।

পিঙ্গলারও ঠিক এই ভাবটা জেগেছে, 'এ আমি কি করছি'! যদিও এখানে কোন সন্দেহ নেই ওর মনে একটা চিন্তার উদয় হয়েছে, টাকার আশায় ছিল, কিন্তু পেল না, সেখান থেকে বৈরাগ্য, হতাশা আর দুঃখ থেকে বা যেভাবেই এই বৈরাগ্য এসে থাকুক, বৈরাগ্য সব সময় সুখেরই কারণ হয়। যেমন অমৃতের কুন্ডে যেভাবেই তুমি পড়ে গিয়ে থাকো, তুমি অমৃতই হবে। বৈরাগ্য যেভাবেই আসুক, বৈরাগ্য সব সময় সুখের কারণ হয়। গীতাতে অর্জুনের যে বিষাদ আর এখানে পিঙ্গলার বিষাদ, দুটো একই জিনিস। পিঙ্গলার মনে যে বৈরাগ্য এসেছিল তার পেছনে একটা চিন্তা, চিন্তা মানে একটা হতাশা। আসলে বৈরাগ্য সব সময় হতাশা থেকেই আসে। কিন্তু এই বৈরাগ্যই এমন তীব্র হবে যে সংসার বন্ধনকে একেবারে কেটে উড়িয়ে দেবে। বৈরাগ্যের জন্য যে হতাশা হতে হবে সেই হতাশারও তত জোর হতে হবে। যত বড় হতাশা তত বেশি বৈরাগ্য। তবে ঈশ্বর পথে যাওয়ার জন্য শুধু যে বৈরাগ্যই দরকার তা নয়, অন্যান্য কারণেও মানুষ ঈশ্বরের পথে আসে, গীতায় যেমন বলছেন, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থি। ঠাকুরের সাধনাও বৈরাগ্যপূর্ণ সাধনা ছিল না, ঠাকুরের সাধনা অন্য ধরণের। আর্ত, অর্থার্থি যে সেও আর্ত, যখনই কেউ কিছু চাইছে, তার মানে, তার অভাব হয়ে গেছে, সে আর্ত। যখন দেখে এই জগৎ থেকে আমার কিছুই পুর্তি হবে না, তখন সে ঈশ্বরের দিকে যায়। কিন্তু এখানে সে একেই গণিকা, সে খদ্দের ধরার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দের ধরতে চাইছে অর্থের জন্য, অর্থের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্থ এলো না, হঠাৎ তার হতাশা এসে গেছে। বলা হয় যে, তার পূণ্য ছিল বলে এই শুভ চিন্তা তার মধ্যে উদয় হল। আমাদের জীবনের যদি তাকাই, আমাদের জীবনটাও একটা দীর্ঘ হতাশার কাহিনী, কিন্তু আমাদের তো কিছুই বৈরাগ্য আসে না। ভগবান বুদ্ধ দেখলেন এক রুগী, এক বৃদ্ধ, এক মৃত ব্যক্তি আর এক সন্ন্যাসী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৈরাগ্য এসে গেল। সেবা প্রতিষ্ঠানে গেলে এই চারজনকেই দেখা যাবে, বৃদ্ধও দেখা যাবে, রুগীও দেখবে, মরাও দেখবে আর সন্ন্যাসীকেও দেখবে, কিন্তু কজন বুদ্ধ হচ্ছে! তাহলে পিঙ্গলার কি করে বৈরাগ্য এলো? এখানে খুব সুন্দর বলছেন। জল বয়ে যাচ্ছে, সেই জলকে যদি বাধা দেওয়া হয় তখন সে ডান দিক দিয়ে বা বাম দিক দিয়ে নিজের পথ করে নেয়। যদি সুযোগ না পায় জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু জলের যদি গতি থাকে, সে সব কিছু বাধাকে ডিঙিয়ে বেরিয়ে যাবে।

আঘাত মানুষের জীবনকে দু ভাবে প্রভাবিত করে, একটা কাঁচের মত আরেকটা স্টীলের মত। মানুষের ব্যক্তিত্ব যদি কাঁচের মত হয় তাকে সেখানেই শেষ করে দেবে, এরপর সে মৃতপ্রায়। ভেতরে যদি দম থাকে, লোহাকে আগুনে দেওয়ার পর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে লোহা যেমন স্টীল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আঘাতে মানুষের মনোবল আরও মজবুত হয়। বৃক্ষ থেকে বীজ পড়ে, বীজের খোসার মধ্যে কোন সার নেই, সে মাটিকে নিজের মত করে নেয়, আর ঐ বীজের খোসার মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে সেখান থেকে নতুন বৃক্ষ বেরিয়ে আসে। আমাদের জীবনে যখন হতাশা, নিরাশা, দুরাশা আসে, আমাদের দুমড়ে মুচড়ে দেবেই, কারণ ভেতরে কিছু নেই কিনা। গাছাপালা, কুকুর বেড়ালের সাথে মানুষের কিছুই তফাত নেই। তারাও খাওয়া-দাওয়া করে, তারাও জন্মায়, তারাও মারা যায়। কিন্তু উপরের দিকে উঠতে হলে জীবনীশক্তি দরকার। জীবনীশক্তি তৈরীর অনেকগুলো পথ আছে, তবে কোন পথই সহজ নয়, সব পথেই খাটতে হয়। তখন যদি আঘাত প্রতিঘাত আসে মনে হয় যেন তাকে শেষ করে দেবে, কিন্তু শেষ করতে পারে না। সেখান থেকে একটা পুরো নতুন জিনিস অন্য একটা নতুন আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন বোঝা যায় না যে এই জিনিসটা সেই জিনিস। জীবনীশক্তি যদি ভেতরে থাকে তখন যতই নিরাশা আসুক, আঘাত আসুক, তাকে দেখে মনে হবে শেষ হয়ে যাবে, সেও নিজে মনে করবে আমি গেলাম, কিন্তু শেষ ও হয়ে যাবে না, ঠিক আবার উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু এবার যে দাঁড়াবে তখন আগের যে রূপটা ছিল ঐ রূপে থাকবে না, রূপটা পুরো পাল্টে যাবে। সেইজন্য সন্ন্যাসীদের সব কিছুই পাল্টে দেওয়া হয়, তাঁর পোষাক পাল্টে দেওয়া হয়, তাঁর চুল পাল্টে দেওয়া হয়, তার বাবা-মায়ের দেওয়া নামটাও পাল্টে দেওয়া হয়, বাবার স্থানটাও পাল্টে সেখানে তাঁর গুরু চলে আসেন। কারণ তখন তার সম্পূর্ণ আলাদা পরিচয় হয়ে যায়।

এখানে বলছেন, বৈরাগ্যের যে হেতু সেটা দোষের নয়, গিয়েছিল কটি টাকার জন্য, সেখানে তার অন্য রকম হয়ে গেল। ঠাকুরও বলছেন, কেউ যদি কাঁচ কুড়োতে গিয়ে হীরে পেয়ে যায় সেকি হীরে ছেড়ে দেবে?

কখনই ছাড়বে না। ধ্রুব সাম্রাজ্য ফেরত পাওয়ার জন্য গিয়েছিল কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর দর্শন লাভ করে ভক্তি পেয়ে গেল। পিঙ্গলা কটি টাকার জন্য খদ্দেরের আশায় সেজেগুজে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল, সেদিন সে কোন গ্রাহক পেল না, তার মনটা অন্য রকম হয়ে গেল, বৈরাগ্যের উদয় হয়ে গেল। জগতের প্রত্যেকটি জীব মশা, মাছি থেকে মানুষ সবাই মুক্তির দিকে এগোচ্ছে, কারুর অনেক বাকি, কারুর কম বাকি। যাদের কম বাকি তাদের রূপান্তরটা পরিষ্কার বোঝা যায়, যাদের এখন অনেক বাকি তাদের রূপান্তরটা চোখে পড়ে না। দত্তাত্রেয় বিদেহ রাজ যদুকে বলছেন *তস্যা নির্বিন্নচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম। নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ।।১১/৮/২৮।।* পিঙ্গলার এখন বৈরাগ্য এসেছে, এই বৈরাগ্যের জন্য তার একটা বোধদয় হয়েছে, এখনও জ্ঞান হয়নি কিন্তু বোধ এসেছে, সেই বোধ থেকে পিঙ্গলা একটা গান করতে শুরু করেছে। গানের বক্তব্য হল, মানুষ যেন আশারূপ ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলছে। ফাঁসির রজ্জু থেকে বাঁচার একটাই পথ একটা ক্ষুরধার তলোয়ার নিয়ে দড়িটাকে কেটে দেওয়া। গীতায় ভগবান বলছেন, *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা*, এই যে সংসার বৃক্ষ, এই বৃক্ষকে উন্মুলন করতে হলে বৈরাগ্য দিয়েই উন্মুলন করতে হবে। বাংলা সিনেমার গানে বলছে, কি আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে। তোমার নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে খেলা করাচ্ছে। কোথায় খেলাচ্ছে? বেদনার বালুচরে। ঐ দড়িটা কিসের? আশা। আশাই মানুষের জীবনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানবজাতির যত উন্নতি সবটাই আশার দৌলতে। প্রকৃতির একটা অমোঘ নিয়ম হল, যে জিনিসটা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সেই জিনিসটাই আমাদের পায়ের বেড়ি হয়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকার জন্য জীবনে অনেক স্থায়িত্ব আসে, আর ঐ সম্পর্কটাই মানুষকে বেঁধে ফেলে, এগোতে দেয় না। যে জিনিসটা আমাদের রক্ষা করে ঐ জিনিসটাই আমাদের বাড়তে দেবে না। একটা চারা গাছকে গরু ছাগলের থেকে বাঁচার জন্য একটা বেড়া দিয়ে দেওয়া হল, বেড়ার জন্য চারা গাছটা বাঁচতে পারে। কিছু দিন পরে ঐ বেড়াটাই তার বন্ধনের কারণ হয়ে যায়। আশাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ঐ আশাই এক সময় মানুষের পায়ের বেড়ি হয়ে যায়। একটা স্তরে গিয়ে ওটাকে কেটে দিতে হয়। মঙ্গল গ্রহে যে মহাকাশ যান পাঠানো হয় তাতে প্রথমে একটা বিরাট বড় রকেট থাকে, সেই রকেটটা মহাকাশ যানকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে নিয়ে যায়। এবার যদি রকেটের সাথে লেগে থাকে তখন অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে, সেইজন্য রকেটকে মহাকাশ যানটা ছেড়ে দিতে হয়। পোল ভল্টে একটা লম্বা ডাণ্ডা নিয়ে দৌড়ে এসে একটা উঁচু জায়গাকে লাফিয়ে পার করে। ঐ ডাণ্ডাটা আছে বলে বিরাট উঁচুকে সে অতিক্রম করতে পারছে, কিন্তু ডাণ্ডাকে যদি ধরে রাখে তাহলে ঐ উঁচু জায়গাটা ডিঙাতে পারবে না, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ডাণ্ডাটা ছেড়ে দিতে হয়। ঠিক তেমনি আশাও মানুষকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, কিন্তু একটা জায়গায় পৌঁছে ওটাকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু আশাকে কি ছাড়া যায়? কখনই ছাড়া যায় না। যা কিছুই আমরা করি না কেন সবের পেছনে আশা লেগে আছে। কিসের আশা? নামযশের আশা, ভালোবাসা পাওয়ার আশা, আমার স্বীকৃতি চাই এই আশা। এই কথাই দত্তাত্রেয় বলছেন, *নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ*, এই আশা রজ্জুকে কাটার একটাই পথ, বৈরাগ্য রূপী তলোয়ার দিয়েই কাটা যায়।

দত্তাত্রেয় আবার বলছেন *ন হ্যাঙ্গাজ্জাতনির্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি। যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ।।১১/৮/২৯।।* হে রাজন্! এই শরীরের বন্ধন থেকে বেরোতে হলে তোমাকে বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে হবে। আর বৈরাগ্যের অনুশীলন যদি না করা হয় তাহলে এই শরীর আর এই শরীরের সাথে যে নানান রকমের আবর্জনা জড়িয়ে আছে, এর থেকে কেউই বেরিয়ে আসতে পারবে না। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছে, সংসারে থেকে কি হবে না? ঠাকুর তাকে কি বলবেন! ঠাকুরের ধর্ম বেদের ধর্ম, বেদের ধর্মে দুটোই আছে, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মও আছে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মও, সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, কেন হবে না। বলার পরেই আবার বলছেন, একটু সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস এগুলো করতে হয়। সাধুসঙ্গ আর নির্জনবাস মানেই তো বৈরাগ্য হয়ে গেল। সন্ন্যাসী মানেই তো বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ছাড়া সন্ন্যাসীর আর কি আছে। এখানে বলছেন, দেহের প্রতি বৈরাগ্য না এলে দেহের অশান্তি, সংসারের ঝামেলা থেকে ছাড়া পাবে না। দেহের প্রতি বৈরাগ্য না এলে কি রকম অসম্ভব? বলছেন, *যথা বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ*, মানুষের বিজ্ঞান যদি না হয়ে থাকে, আত্মার জ্ঞান

যদি না হয়ে থাকে তার মমতা অর্থাৎ আমি ভাব পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। অহংতা আর মমতা আমাদের শাস্ত্রের দুটো বহু প্রচলিত শব্দ, আমি ভাব আর আমার ভাব। আমি ভাব কাটে বৈরাগ্য দিয়ে আর আমার ভাব কাটে বিজ্ঞান দিয়ে। ভাগবত এখানে যদিও বলছেন বিজ্ঞান আর বৈরাগ্য দিয়ে অহংতা মমতা কাটে কিন্তু অন্যান্য জায়গায় আবার একটু অন্য রকম বলেন। দেহের প্রতি আসক্তি, তার সাথে দেহ কেন্দ্রিক যাবতীয় যা কিছু আছে তার যে আসক্তি, এই আসক্তি একমাত্র কাটে বৈরাগ্য দিয়ে। আর মমতা, আমার আমার ভাব, এই ভাব যাবে একমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা। কারণ আমরা সবাই অবস্তুর পেছনেই দৌড়াচ্ছি কিনা। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ঈশ্বরই আছেন, সচ্চিদানন্দই আছেন, এই ভাব যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অবস্তুর পেছনে দৌড়ানটা বন্ধ হবে না। ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেলে মমতা চলে যাবে, তার আগে অহংতাটা যায় বৈরাগ্যে।

আসলে জ্ঞান আর বৈরাগ্য দুটো এক অপরের সাথে চলে। কেউ যদি বলে আমার বৈরাগ্য আছে কিন্তু জ্ঞান নেই, তাহলে বুঝতে হবে তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। পাগলদের সব কিছু থেকেই বৈরাগ্য, কিন্তু কিছুই জ্ঞান নেই। আর কেউ যদি বলে আমার জ্ঞান আছে কিন্তু বৈরাগ্য নয়, বুঝতে হবে সে পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলছে, মহা ধুর্ত, ঠগবাজ। যত বড় বড় বাবাজীদের দিনরাত নাম শুনছি, শুধু টাকা-পয়সা আর কামিনী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ বলে ব্রহ্মজ্ঞানী। কথামৃতের পাতায় পাতায় বলছেন জ্ঞানের প্রথম লক্ষণই হল বৈরাগ্য। যে কোন সাধু বা সন্ন্যাসী, তিনি যেই হয়ে থাকুন, এমনকি ঠাকুরও, যার জন্য ঠাকুর বলছেন, ঘরে যদি কোন মহিলা বেশিক্ষণ থাকে তাদের বলি, যাও মন্দির-টন্দির ঘুরে দেখ, আর যদি তাতেও না যায় আমিই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আসক্তি তো দূরের কথা, বাইরের আচরণেও যেন ধরা না পড়ে। বাইরে থেকেও যদি ধরা পড়ে সে একশ ভাগ গোলমেলে লোক। আর গোলমেলে লোক যদি বলে আমি পারছি না, চেষ্টা করছি এসব থেকে বেরিয়ে আসতে, সেটা তাও অনেক ভালো। কিন্তু যদি বলে, আমি জ্ঞানী, তাহলে বুঝে নিতে হবে তার ইহকাল পরকাল দুটোই গেছে। জ্ঞান বৈরাগ্য একসাথে চলে। ভাগবতে প্রথমের দিকে নারদ বলছেন, ভক্তির দুটি সন্তান, জ্ঞান আর বৈরাগ্য। এখানে পূর্ণ বৈরাগ্যের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু একদিনেই তো পূর্ণ বৈরাগ্য হবে না। বৈরাগ্য তখনই হবে যখন একটু জ্ঞান হবে, ঈশ্বরের প্রতি তখন ভক্তি হবে। যেমন ঠাকুর বলছেন, দুটো সন্তান হয়ে গেলে ভাইবোনের মত থাকবে, যখন বার বার তার মাথায় এটা ঘুরতে থাকবে তখন তার বৈরাগ্য হয়ে যাবে, আমি বিয়েথা করেছি ঠিকই কিন্তু এবার ভাইবোনের মত থাকব। জ্ঞান হল বলে বৈরাগ্যটা এসেছে। যে কোন বৈরাগ্যের পেছনে একটা উচ্চ আদর্শ যদি না থাকে, এখানে উচ্চতম আদর্শ হল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরের জ্ঞান, এছাড়া যদি বৈরাগ্য হয় তাহলে বুঝতে হবে তার মাথায় গোলমাল আছে।

এই বলে তিনি পিঙ্গলা যে গান করছে সেই গানের কথাগুলো বলছেন *অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ। যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা।।*১১/৮/৩০। পিঙ্গলা এখন ভেঙে পড়েছে। আমাদেরই সবারই এই একই অবস্থা হয়, যখন একটা কিছুর খুব আশা করছি, তখন নিজের উপর কোঁদল করতে শুরু করে। কিন্তু সবাই নিজের উপর নেয় না, এখানে নিজের উপর নিচ্ছে। 'ছিঃ ছিঃ আমি কি রকম মোহগ্রস্ত হয়ে গেছি, ইন্দ্রিয়ের বশে অবশ হয়ে পড়েছি। আর আমার মোহের কি বিস্তার দেখ, দুষ্ট পুরুষ যারা তাদের পাল্লায় পড়ে আমার কি দুরবস্থা। যাদের কোন অস্তিত্বই নেই, অস্তিত্বরহিত এই বিষয় সুখের লালসায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, কি দুঃখের কাণ্ড! আমি সত্যিই মুর্খ'। অস্তিত্ব কার আছে? যে জিতেন্দ্রিয় তার অস্তিত্ব আছে। ইয়ং ছেলেদের হাতে এখন প্রচুর টাকা এসে গেছে, এদের অস্তিত্ব কোথায়! একবার যখন ভোগের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, এই ধরণের গণিকাদের কাছে যাচ্ছে সব রোজগারের টাকা সেখানেই ঢেলে দিচ্ছে, সেখানেই তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেল। কথামৃতেও বর্ণনা আছে। ঠাকুরের শরীর যাবার পর একজন ভক্ত এক মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল। তার সবই হরণ হয়ে গিয়েছিল। সবই চলে যাওয়ার পর রিক্ত অবস্থায় সেই মেয়ের কাছেই আবার গেছে। ভক্তটি ভাবত মেয়েটি এখনও আমাকে ভালোবাসে, তাই আবার গেছে। মেয়েটি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই অবস্থায় অর্ধ বস্ত্রে বরানগর মঠে এসে সে হাজির হয়েছে। পুরুষ দেখছে মেয়েরা এই রকমই করে। আবার মেয়েরা দেখছে এই পুরুষগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই! যাদের কোন অস্তিত্বই নেই এদের জালে গিয়ে আমি ফেঁসে গেলাম। পিঙ্গলার গানেও এই আক্ষেপ, অনুশোচনা ও বেদনার সুর ফুটে উঠেছে।

পিঙ্গলা গণিকা, পিঙ্গলা চাইছে ভোগ। ভোগের জন্য তার টাকার দরকার। ফরাসী সাহিত্যে খুব নামকরা একজন লেখক ছিলেন, তাঁর নাম এমিল জোলা। এমিল জোলার একটা নামকরা বই আছে ‘নানা’। নানা একটা মেয়ে, পেশা তার গণিকা বৃত্তি। একটা গণিকার জীবন কেমন হয় সেই নিয়ে লেখা, রীতিমত মোটা বই আর ফরাসী সাহিত্যে নানা উপন্যাসকে ক্লাশিক সাহিত্য বলা হয়। একটা গণিকার কাছে শেষ পর্যন্ত কে যায় বা গণিকাকে টাকা-পয়সা কে দেবে? সাধারণ ভাবে সিনেমা, উপন্যাসে দেখানো হয়, বিরাট দুঃখ, হতাশায় মানুষ শেষে কোন গণিকার কাছে যায়। সত্যিই কি জীবনে তাই হয়? দশ হাজারের মধ্যে একটাও এই ধরণের লোক পাওয়া যাবে না। যে পুরুষগুলো যায় সব কটাই বদমাইশ হয়, আর আরও যেটা দুর্ভাগ্যের, এই লোকগুলো যে টাকা উপার্জন করেছে, হয় সে ন্যায় ভাবে উপার্জন করেছে নয়তো অন্যায় ভাবে উপার্জন করেছে, উপার্জন করার দুটোই পথ। অন্যায় ভাবে করেছে তার মানে ঘুষ নিয়ে, অপরকে কষ্ট দিয়ে, চোরাপাচার করে আয় করেছে, সেখানে একেই সে অধর্ম পথে চলে গেছে আর সেই টাকা ওড়াচ্ছে একটা গণিকাকে ভোগ করার জন্য। আর সেই মেয়েটি অন্যায়োপার্জিত অর্থ নিয়ে ভোগ করতে চাইছে। আর যদি সে ন্যায় ভাবেও টাকা আয় করে থাকে, সেই টাকা দিয়ে তার স্ত্রী, মা-বাবা, সন্তান এদের পরিপালন করবে, তার অতিথি সেবা আছে, দেব সেবা আছে কিন্তু সেই টাকা একটা গণিকার পেছনে গিয়ে ওড়াচ্ছে। এর থেকে আর দুর্ভাগ্যের কি আছে। ধর্মের বাইরে গিয়ে যে টাকা ওড়ায়, দুষ্ট পুরুষ ছাড়া সে আর কিছু হতে পারে না। পিঙ্গলা তাই বলছেন, আমি এই দুষ্ট পুরুষদের আশায় এভাবে আমার জীবনটাকে নষ্ট করছি। আমি কি করছি? একটা দুষ্ট পুরুষের কামনা, লালসার তুষ্টি সাধন করে যাচ্ছি।

পরের শ্লোকে পিঙ্গলা বলছে, *সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়। অকামদং দুঃখভয়াদিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা।।১১/৮/৩১।।* পিঙ্গলার কাহিনীতে এটি একটি খুব মূল্যবান শ্লোক। আমি কি রকম মুর্খ মেয়ে, যিনি আমার সব থেকে কাছে আছেন, যিনি *রমণং রতিপ্রদং*, *রতিপ্রদং* মানে যিনি সুখ দেন, যেখানে মানুষ ক্রিয়ার মাধ্যমে রমণ করে সুখ পায়, মনটা ওর মধ্যেই পুরো ডুবে যায়, *রতিপ্রদং* মানুষের শ্রেষ্ঠতম যে আনন্দ, সেই আনন্দ একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। *বিত্তপ্রদং*, তিনি পরমার্থের প্রকৃত সম্পদদাতা, *নিত্যম্* তিনি নিত্য। *রমনং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং* এর সব কটির সাথে নিত্যকে লাগিয়ে দিলে তখন হয়ে যাবে, যিনি সত্যিকারের, বাস্তবিক চিরস্থায়ী সুখ, আনন্দ, বিত্ত প্রতিক্ষণ দেন। কি সম্পদ দেন? যে সম্পদে বাস্তবিক আনন্দ আসে। তিনি কে? আমার যিনি অন্তর্যামী, যিনি ভগবান। মানুষের সুখের যে শ্রেষ্ঠতম অবস্থা, সেটা তার ভেতরেই আছে। এই সুখ কেউ তার থেকে কেড়ে নিতে পারে না। তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতে পারে, তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারে, কিন্তু তার চিন্তার জগৎ থেকে তাকে কেউ সরিয়ে দিতে পারবে না। এগুলোকে নিয়ে অনেক লেখকরা উপন্যাস লিখেছেন। বিখ্যাত জার্মান লেখক Erich Maria Remarqueএর একটা নামকরা বই All quite on Western Front, সেখানে লেখক দেখাচ্ছেন কিভাবে মানুষকে বন্ধনে রেখেও তার চিন্তার জগতকে ভেঙে দেওয়া যায়। হয়ত ঠিকই বলছেন, কারণ তারা এগুলোকে কাছ থেকে দেখেছেন। কিন্তু সচরাচর এটা করা খুব কঠিন। একজন খুব নামকরা রাশিয়ান গাণিতজ্ঞ ছিলেন, বিভিন্ন কারণে বিশ্বাবিদ্যালয় তাঁর উপর রেগে গিয়ে শাস্তি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাথরুম পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। অথচ তিনি তখন বিশ্বের একজন অন্যতম সেরা গাণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে কোন কাগজ কলমও ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। একদিন দুদিনের জন্য নয় বছর এই শাস্তি বহাল ছিল। তিনি কি আর করবেন, বাথরুমের দেওয়ালে অঙ্ক করে রেখেছিলেন। পরে ঐ অঙ্কগুলোকে নিয়েই খুব নামকরা অঙ্কের বই তৈরী হয়েছিল। লোকমান্য তিলকও জেলে বন্দী ছিলেন, তিনিও জেলের দেওয়ালে পুরো গীতার ভাষ্যকে ‘গীতা রহস্য’ বইয়ে লিখে দিলেন। বড় চিন্তক যিনি তাঁকে বন্ধনে রেখেও আটকানো যায় না। তার নিজের ভেতরে যে সুখ সেটাকে কি করে কেউ কেড়ে নেবে! স্বামীজী গ্রীক কাহিনী বলছেন, যেখানে আলেকজাণ্ডার ব্রাহ্মণকে বলছেন, তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাব না গেলে তোমাকে শেষ করে দেব। ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি এর থেকে বড় মিথ্যা কথা জীবনে বলনি। তিনি মৃত্যুকেই জয় করে নিয়েছেন। তবে এনারা তাঁদের লেখাতে দেখান মৃত্যু খুব সহজেই হয়ে যায়, একটা কোপ দিলেই শেষ। কিন্তু বছরের পর বছর তার

উপর শারীরিক মানসিক নিপীড়ন করা হবে, ঐটাকে সহ্য করে নেওয়া সহজ নয়। শারীরিক নিপীড়ণের কষ্টকে সহ্য করা সত্যিই কঠিন। যাই হোক, পিঙ্গলা বলছে, আমার যিনি সব থেকে কাছের, যিনি আমার অন্তর্যামী রূপে আমাকে নিত্য সুখ দিচ্ছেন, শান্তি দিচ্ছেন, সুখ শান্তি রূপী সম্পদ দিচ্ছেন, তাঁকে ছেড়ে আমি কি করেছি? *অকামদং দুঃখভয়াদিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা,* যিনি অন্তর্যামী তিনি আমাদের সব সুখ দিচ্ছেন, সেই সুখ ছেড়ে দিয়ে আমরা কি করছি, *অকামদং*, পিঙ্গলা বলছে যে পুরুষদের সেবায় আমি নিজেকে নিয়োজিত করছি এরা কেউই আমার একটি ইচ্ছাকেও পূর্ণ করতে পারে না। *দুঃখভয়াদিশোকমোহপ্রদাং*, উল্টে দুঃখ, ভয়, শোক, মোহ, ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই এদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সত্যিই আমি কি মুর্খ, যাঁর কাছে নিত্য সুখ তাঁকে ছেড়ে এই পুরুষগুলোর জন্য আমি দুঃখ, ভয়, শোক, ব্যাধিতে হাবুডুবু খাচ্ছি!

হিন্দী কবি ফণিশ্বর রেণু বাংলা জানতেন, উনি একজন বাঙ্গালী মহিলাকে দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সাথে রামকৃষ্ণ মিশনের যোগাযোগ হয়। উনি পাটনা রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রায়ই যেতেন। ঠাকুর যে রসে বসে থাকার কথা বলছেন, এটাকে হিন্দীতে তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন *'রসমে বসমে তিন দিন'*। কবিতার বক্তব্য হল, পাটনা আশ্রমে ঠাকুরের উৎসব হয়েছে, তিন দিনের উৎসব। উনি তিন দিনই আশ্রমে এসেছেন, দুপুরে খিচুড়ি খাচ্ছেন, বিকেলে ধর্মসভায় ভাষণ শুনছেন আর রাত্রে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখছেন। উনি রাত্রে একটু মদ খেতেন। উনি লিখছেন, ঠাকুর তাঁকে নর্দমার নরক থেকে তুলে কিভাবে আশ্রমে নিয়ে ফেলেছেন আর তিন দিন আনন্দ রসে ডুবে ছিলেন। তৃতীয় দিনের বর্ণনা করার পর বলছেন, সব শেষ হয়ে গেল, আমি আবার ফেরত চললাম আমার সেই নোংরা নর্দমায়। একদিকে আছেন অন্তর্যামী, যাঁর চিন্তন করে চিরন্তন শাশ্বত আনন্দ পাওয়া যায়, সেটাকে ছেড়ে আমি এই নোংরা পাঁকের মধ্যে সুখ খুঁজতে গিয়ে পেলাম দুঃখ, ভয়, শোক, মোহ আর ব্যাধি।

এই ভাবকেই পিঙ্গলা আবার পরের শ্লোকে বলছেন *অহো ময়াহহত্মা পরিতাপিতো বৃথা সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্তয়া। স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোহনুশোচ্যাৎ ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী।। ১১/৮/৩২।।* আমাদের সমাজে দুটো বৃত্তিকে খুব খারাপ বৃত্তি বলা হয়, কোন মেয়ে যখন টাকার জন্য কোন লোককে ফাঁসায়, মানে বেশ্যাবৃত্তি, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আরেকটা অত্যন্ত নিন্দনীয় হল সাধুরা যখন বড়লোকেদের সঙ্গ করে। পিঙ্গলা এটাই বলছে, কি আক্ষেপের কথা যে আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছি আর অনর্থক আমার শরীর মনকে কষ্ট দিয়েছি, আমার শরীরটাই বিকিয়ে গেল আর যারা লম্পট লোভী এবং সমাজের নিন্দনীয় পুরুষ তারা এই শরীরটাকে কিনে নিয়ে শুধু খেলা করে গেল। আমি এতই মুর্খ যে এই শরীর দিয়েই অর্থ এবং রতিসুখ কামন করেছি।

পিঙ্গলা কেন শরীরের নিন্দা করছেন বলছেন। ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার বৈরাগ্য চিন্তনের উপায়ের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, ভেবে দেখ এই নারী শরীরে কি আছে। ঠাকুরের কাছে পুরুষরা বেশি যেতেন বলে নারী শরীরের কথা বলছেন। কিন্তু নারীও ঠিক এভাবেই পুরুষের শরীরকে বিচার করবে। ভাগবতে পিঙ্গলা নিজের শরীরের কথা নিয়েই বলছে, এই শরীরে কি আছে, শরীরটাকে যদি একটা বাড়ি রূপে ভাবা হয় তাহলে এই শরীরের নয়টি দরজা, বাড়ি করার সময় মানুষ বাঁশ কাঠ সব সোজা করে লাগায় কিন্তু আমাদের শরীরের হাড়গুলো ট্যারা বাঁকা করে লাগানো। চামড়া, লোম, নখ দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মানুষের বাড়িতে কত দামী দামী সম্পত্তি থাকে কিন্তু এই শরীরে মলমূত্র ছাড়া কিছু নেই, শরীরের সম্পদ বলতে মলমূত্র। আমি ছাড়া আর কোন মুর্খ নারী আছে যে এই শরীরের এত সেবা করবে। এগুলোই বৈরাগ্য পূর্ণ কথা, যখন বৈরাগ্য আসে তখন জাগতিক সব জিনিসকে এভাবেই দেখে। যখন ভোগে থাকে তখন ভোগ রূপে দেখে। আর যদি আত্মদৃষ্টিতে দেখা হয় তখন এটাও নয় ওটাও নয়, কিছুই নয়, যা আছে তা আছে। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শেষের দিকে একদিন নিজের হাতে হাত বুলাতে বুলাতে হাতটাকে দেখছিলেন। ওনার সেবক মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ কি দেখছেন? মহারাজ খুব আস্তে করে বললেন, দেখছি, কেমন দেবতার শরীর। সেবক আবার জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ কি বললেন? মহারাজ বলছেন, ও কিছু না। কারণ এই শরীরকে আশ্রয় করে সাক্ষাৎ আত্মা আছেন, ভগবান নারায়ণ নিজে এটাকে আশ্রয় করে আছেন। শরীরকে

একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাধনা করতে করতে ঠাকুরের শরীরটাও ভেঙে গেল। একদিন ঠাকুরের শুধু মল বিসর্জন হয়ে যাচ্ছে। সারাটা দিন ধরে ঝাউতলার দিকে দৌড়াচ্ছেন। কোন ভাবে সংক্রামক হয়ে গিয়েছিল। অত মল দেখে ঠাকুর বলছেন, শরীরে শুধু এই আছে! আর এই শরীরকে নিয়েই লোকের এত অহঙ্কার। এগুলো এক একটা মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

পিঙ্গলা বলছে, *বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ। যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাৎ কামমচ্যুতাৎ।। ১১/৮/৩৪।।* আমি মিথিলার মেয়ে, যে নগরীকে বিদেহ নগরী বলে, আমি সেই বিদেহ নগরীর মেয়ে অথচ কি দুর্ভাগ্য আমি দেহের ব্যবসা করছি, আমি সত্যিই অধম। এখানে পিঙ্গলা ঐতিহ্যকে নিয়ে আসছে। যদি এই ঐতিহ্য বোধটা পিঙ্গলার না থাকত তাহলে তার যে দুরাশা থেকে হতাশা এসেছে আর হতাশা থেকে একেবারে গোঁত্তা খেয়ে পড়ে গেছে, সেখান থেকে তার উঠে আসাটা খুব কঠিন হয়ে যেত। ঐতিহ্যটা তাকে ধাক্কা দিয়েছে। নিজের ঐতিহ্য যদি জানা থাকে তাহলে জীবনে যদি কোন ধাক্কা আসে তখন হঠাৎ একটা চেতনা জাগবে, আমি কোন বংশের, আমি আগে কাদের সঙ্গ করেছি। শ্রীমার ভাইঝি রাধু সারা জীবন পাগলামি করে গেছে, মাকে কষ্টই দিয়ে গেল। মায়ের শরীর চলে যাবার পর রাধুর ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রাধুর মৃত্যুর সময় যখন এসেছে তখন সবাই বলল, রাধুকে কাশী নিয়ে যাওয়া যাক। রাধু কিভাবে বুঝে গিয়েছিল যে তাকে কাশীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাধু হঠাৎ একদিন বলছে, আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে হবে না, তোমরা ভুলে যেও না আমি মায়ের মেয়ে। পিঙ্গলাও বলছে আমি বিদেহ নগরের মেয়ে, কিন্তু আর না, এই বিষয়ভোগ আর অস্থির চিত্ত পুরুষদের স্বরূপ আমার জানা হয়ে গেছে। মেয়েদের নামে যেমন বলা হয় ছেলেদের নামেও বলা হয়। নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে অপরের স্ত্রীর কাছে যাচ্ছে, তাকে ছেড়ে আরেকজনের কাছে যাচ্ছে, অস্থির চিত্ত না হলে কেউ এমন করতে পারে! আসলে কোন নারীকে ভোগ করার পর যখন তার মন ভরে যায় তখন সেই নারীর মুখ দেখলেই ভেতরটা গিজ্‌গিজ্ করতে থাকে। ছেলেদের এই সমস্যা আছে। কিন্তু যে ধর্ম ভাবে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী তার তো আর কোন পথ নেই। যে পুরুষের কাছে বাবা-মা ছেড়ে দিয়েছে তাকে ছেড়ে আর কোথায় যাবে! কিন্তু গণিকারা নিজেকে বিক্রী করে বেড়াচ্ছে। কার কাছে? অস্থির চিত্ত পুরুষের কাছে। কেন বিক্রী করছে? দুটো টাকা আয় হবে তাই দিয়ে আরও ভোগ করবে। এই সব দেখে পিঙ্গলার মনে ধিক্কার এসে গেছে। হতাশা, দুরাশা থেকে হঠাৎ তার মধ্যে চৈতন্য জেগে গেল।

পিঙ্গলা তখন বলছে 'অনেক হয়েছে, অনেক পুরুষের কাছে আমি নিজেকে বিক্রী করেছি, আর না'। *সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্। তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহনেন যথা রমা।।১১/৮/৩৫।* আমার হৃদয়ে যিনি আত্মা ইনিই আমার পরম সুহৃৎ। *প্রেষ্ঠতমো,* তিনি সমস্ত প্রানীর সুহৃৎ, তাঁর মত শ্রেষ্ঠ হিতৈষী আর কেউ নেই। তিনিই সমস্ত প্রাণীর প্রভু। আমি ঠিক করেছি আমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে এবার আমি নিজেকে বিকিয়ে তোমাকে কিনে নেব। এতদিন আমি যে খদ্দের খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিন গ্রাহক ধরার জন্য আমি যেসব কাজ করছিলাম, তাতে একটা পুরুষকে আমার শরীর দিচ্ছিলাম বদলে তার কাছ থেকে ওর টাকাটা নিয়ে নিতাম। এই আজ থেকে ঠিক করে নিলাম, আমার শরীর, আমার মন, আমার যা কিছু আছে সব আমার অন্তর্যামীকে দিয়ে দিলাম আর তার বদলে আমি তাঁকে কিনে নেব। তার মানে, পিঙ্গলা তার সব কিছুই তার অন্তর্যামীকে সমর্পণ করে দিল। সমর্পণ করার পর কি হবে? *রমেহনেন যথা রমা,* লক্ষ্মীদেবী যেভাবে ভগবান বিষ্ণুর সাথে রমণ করেন, আমিও আজ থেকে আমার অন্তর্যামীর সাথে ঐভাবে রমণ করব।

বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে বিয়ের সময় ছেলেকে মেয়ে বলে তোমাকে আমি এত পণ দিয়ে কিনে নেব যে তুমি অন্য কোন মেয়ের কাছে যেতে পারবে না। আবার মেয়েরা বলে ভালোবাসা দিয়ে ওকে কিনে নেব। মীরাবাঈ বলছেন আমি নিজে থেকেই তাঁর দাসী হয়ে গেছি। দাসী হওয়া মানে তাকে কিনে নিতে হবে। একটা মানুষকে কিনে দাস বা দাসী করতে গেলে টাকা লাগে, জিনিস কিনতে গেলে যেমন টাকা লাগে। মানুষকে কিনতে গেলেও একটা মূল্য দিতে হয়। সেই মূল্যটা কি? ভালোবাসা। জগতে সব সময় কেনাবেচাই চলছে। পিঙ্গলা বলছে আমি কিনব। কাকে কিনবে? আমার যিনি অন্তরাত্মা, অন্তর্যামি। কি দিয়ে কিনবে? সব কিছু বিক্রী করে, যা কিছু আছে সব বিক্রী করে দেব। এটাই সন্ন্যাসীর ভাব। সন্ন্যাসী নিজের আত্মাকে কীভাবে

কিনে নেয়? সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে। এটাই হল মূল্য দেওয়া। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে অসঙ্গ হয়ে গেল। এর আগে যে এত কিছু বলা হল সেটাতে একটা প্রস্তুতি দিলেন, মূল হল এই পঁয়ত্রিশ নম্বর শ্লোক। আমি আজ পর্যন্ত যে ব্যবসা করছিলাম, সেই ব্যবসায় আমার শরীর দিচ্ছিলাম, পুরুষদের থেকে টাকা নিচ্ছিলাম, আজ থেকে আমি এই শরীরটা আমার অন্তর্যামীকে দিয়ে দিলাম। পিঙ্গলা এখনও সাজগোজ সবই করবে, কিন্তু যেটাই করবে তার অন্তর্যামীর জন্যই করবে। আমিও রমণ করব, প্রেম আমিও করব। কার সঙ্গে করবে? অন্তর্যামীর সঙ্গে। কিভাবে করবে? যেভাবে লক্ষ্মীদেবী ভগবান বিষ্ণুর সাথে করেন। এগুলোকে একটা শ্লোকে বা কাহিনীতে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায়, কিন্তু জীবনে নামানো প্রায় অসম্ভব। গীতায় যেমন আর্ত, অর্থার্থি আর জিজ্ঞাসুর কথা বলছেন, যে অর্থার্থি যার অনেক টাকা-পয়সা পাওয়ার ইচ্ছে আছে, তারা যদিও কোন ভাবে ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে যায় কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি পাওয়াটা কঠিন, কারণ ভোগ তাকে ভক্তি থেকে টেনে নামিয়ে আনে। জিজ্ঞাসু হয়ে ঈশ্বরের পথে আসার সংখ্যাও খুব কম আর আর্ত সারা জগতে ছড়িয়ে আছে।

সংসারে কেউ নেই যার দুঃখের অবসান হয়ে গেছে, সবাই দুঃখের মধ্যে পড়ে আছে। কিন্তু ঈশ্বরের নাম করে দুঃখ থেকে উঠে আসবে সেটাও সম্ভব নয়। কারণ জগতে কোন কিছুই পুরোপুরি একা চলে না, দুঃখ থাকলেও কিছুক্ষণের জন্য একটু সুখও এসে যায়। কাঙালী, ভিখারীরা একটা ভাঙা পাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আমরা মনে করি আহা এদের কত দুঃখ, দুঃখের পরিসীমা নেই। কিন্তু তারও একটা প্যাটার্ন আছে, সেও জানে আমি যে সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি, তিন দিন অন্তর আমি পাঁচটা টাকা পেয়ে যাব, ওর হিসেব করা আছে। কোন কারণে যদি না পায়, দেখা যাবে তিন দিনে না পেয়ে চতুর্থ দিনে পেয়ে গেল, এটাই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই যে একটু আশা, আশার কিরণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ঈশ্বরের দিকে মন যাবে না। এত দুঃখ কষ্ট চারিদিকে কিন্তু কারুরই ঈশ্বরের দিকে মন যায় না, কারণ ঐ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আশার কিরণ জ্বলছে। আর একটু ভালো যদি চলে তাহলে তো ঈশ্বরের দিকে মন যাওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে, গোঁফে তা দিচ্ছে, এদের দ্বারা কোন দিন হবে না। যাদের এই বোধ হচ্ছে বেশ আছি, এদের কোন দিন হবে না। এগুলো কোন নিরুৎসাহিত করার কথা নয়, এটাই একেবারে কঠোর বাস্তব। ঠাকুর বলছেন, কলকাতার লোকগুলো এসে বলে আমাদের কি হবে না, যদি বলে দেওয়া হয় কিছু হবে না, তাহলে এদিকে আর আসবে না, তাই বলে দিই হবে না কেন তবে এক হাতে কর্ম কর আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধর, কর্ম যখন আর থাকবে না তখন দু হাতে ঈশ্বরকে ধর। তাতেও কি কিছু হয়েছে? মানুষ যেমনি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ছিল এখনও তেমনি আসক্ত হয়ে আছে।

একদিন সন্ন্যাসীরা খাওয়ার পর ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে মুখ ধোওয়ার জন্য গেছেন, সব সন্ন্যাসীরা এক সঙ্গে এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মিলিয়ে প্রায় পাঁচশ জন। সেখানে একজন মহারাজ অন্য এক মহারাজকে মজা করে বলছেন, ভাই! একবার ভেবে দেখ তো, হঠাৎ যদি ভারতবর্ষে পাঁচশ জন ব্রহ্মজ্ঞানী দাঁড়িয়ে যান তাহলে ভারতবর্ষের কি হবে! এর মানে কি? অসম্ভব, ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন নেউলের লেজে ইট বাঁধা আছে। গৃহস্থই হোক, সন্ন্যাসীই হোক, যেই হোক সবার লেজে ইট বাঁধা। সংসারীরদের লেজে অনেক বেশি ইট বাঁধা, সন্ন্যাসীদের অবশ্যই তার তুলনায় কম। খুব কঠিন, ঈশ্বরের দিকে মন যেতে চায় না। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে উপায় কি? ঠাকুর তখন বলছেন, কেন, গীতায় বলছেন অভ্যাস, অভ্যাসযোগ। এখানে একটা কাহিনীর মাধ্যমে একটা ভাবকে বোঝাতে চাইছেন, মানুষের মনে যখন দুঃখ-কষ্ট হয় তখন সে কোথায় যাবে? ভগবান ছাড়া তো তার কেউ নেই। কিন্তু সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের দিকে মন যাওয়া অসম্ভব। এই জপ করে যাচ্ছে, গতানুগতিক ভাবে প্রার্থনা, উপাচারাদি করে যাচ্ছে, করতে করতে কিছুটা যদি হয়। উইলিয়ম জেমস্ খুব নামকরা দার্শনিক আর মনস্তাত্ত্বিক ছিলেন। The Varieties of Religious Experiences ওনার একটা খুব নামকরা বই, সেখানে উনি sudden conversion এর কথা বলছেন। ঠাকুরও হঠাৎ সিদ্ধের কথা বলছেন, এখানে ঠিক সিদ্ধির কথা বলছেন না। অনেকে সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞেস কর, আপনি কি করে সাধু হলেন। আমরা যদি একটু ক্ষণের জন্য ভাবি, পিঙ্গলা যতক্ষণ ধরে এইসব কথা ভাবছে আর হঠাৎ যদি সেই সময় কোন বড়লোক খদ্দের এসে যেত তখন পিঙ্গলার কি হত? তখন এই

বৈরাগ্যটা থাকত কিনা বলা খুব মুশকিল। এখানে কাহিনী রূপে আসছে বলে ধরে নিতে হয় যে, এই ধরণের কিছু হবে না। কিন্তু একটা কাহিনীতে আছে, এক বৃদ্ধা জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ আনতে যেত আর রোজ খুব দুঃখ করে বলত হে আল্লা আর পারি না। একটা দুষ্টু ছেলে ঠিক করল বুড়িটাকে একদিন জব্দ করতে হবে। যে গাছের তলায় বসে বৃদ্ধা কাঠের বোঝা বাঁধত সেখানে ছেলেটি একটা লাল ফিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা এসে যেমনি বলেছে আর তো পারি না, এবার নিয়ে চলো। তখন ছেলেটি গাছের উপর থেকে লাল ফিতেটা ফেলে বলছে, দড়ি ঝুলিয়ে দিলাম ধরে উপরে চলে এসো। বৃদ্ধা তখন বলছে, ইস্ জুম্মে মে নেহি আগলে জুম্মে মে, এই শুক্রবার না, আগামী শুক্রবার। মানুষ মরতে চায় না, সব মুখের কথা।

পিঙ্গলা বলছে *কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ। আদ্যন্তবন্তো ভার্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ।।১১/৮/৩৬।।* বেশির ভাগ কাহিনীতে দেখা যায় পুরুষ নারীকে নিয়ে প্রলাপ করে, কোন মেয়ের কাছে হয়ত ধোকা খেয়েছে, এবার সে প্রলাপ করতে থাকে। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম, নারী প্রলাপ করছে পুরুষের কাছে ধোকা খেয়ে। পিঙ্গলা বলছে, মন বলো তো আজ পর্যন্ত তোমাকে কোন পুরুষ সুখ দিয়েছে? পিঙ্গলা অনেক পুরুষের সঙ্গ করেছে, এটাই ওর জীবিকা। যারা নিজেরাই পঞ্চাশ রকম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে তারা তোমাকে কিসের সুখ দেবে! দেবতারাও কি তাঁদের স্ত্রীদের সুখী করতে পেরেছেন? সুখ আর ভোগ দুটো আলাদা জিনিস, ভোগ সব সময় ইন্দ্রিয় দিয়ে হয় আর সুখ সব সময় ভেতর থেকে আসে, যদিও আমরা সুখভোগ একসাথেই ব্যবহার করি। আমাদের মন বুদ্ধি খুবই সাধারণ বলে সব মিশিয়ে ফেলি। আমরা প্রায়ই ভোগকেই সুখ বলে মনে করি, মনে করি ভোগ করলেই জীবনে সুখ পাব। পিঙ্গলা বলছে, আমি যে সারা জীবন পুরুষের মাধ্যমে ভোগ করলাম, ভোগ করার চেষ্টা করলাম বা পুরুষরা যে আমাকে ভোগ করে গেল তাতে আমি কি সুখ পেলাম? সুখ কোথা থেকে দেবে! সুখ তো ভেতর থেকে আসে। যে মানুষ নিজেই ভেতরে সুখে প্রতিষ্ঠিত নয় সে অপরকে কি সুখ দেবে! সবাই হাভাতে কাঠা। ঠাকুর বলছেন, একটা পাখি বসলেও ডুবে যায়। এটাই পিঙ্গলা বলতে চাইছে, যারা নিজেরা সুখে নেই তারা আমাকে কি সুখ দেবে! ঠিক আছে পুরুষদের ছেড়ে দেবতাদের ধরো। দেবতা মানে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এনাদের কথা বলছে। দেবতারাও ভোগ দিয়ে নিজেদের জায়াদের সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। এই দেবতারা নিজেরাই দুরবস্থায় পড়ে আছেন, কাল তাঁদেরও ধরে রেখেছে। গীতায় বলছেন *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, ভালো কর্মের জোরে দেবতা হয়ে জন্ম নিয়েছে, পূণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে ওখান থেকে আবার নেমে আসতে হবে। দেবতারা নিজেরাই কালের ভয়ে আর্তনাদ করছেন, তাঁরা নিজের স্ত্রীকে কি সুখ দেবেন আর আমাকেই বা কি সুখ দেবেন!

পিঙ্গলা বলে যাচ্ছে, *নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণ্য। নির্বেদোহয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ।।১১/৮/৩৭।।* অবশ্যই আমার কোন শুভকর্ম আছে, যে শুভকর্মের জন্য ভগবান বিষ্ণু আমার উপর বিশেষ প্রীত হয়েছেন, যার জন্য *নির্বেদোহয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ*, এই দুরাশা থেকে, হতাশা থেকে আমার সুখের জন্ম হল। দুরাশা আর হতাশা সবারই আছে। দুরাশা থেকেই মানুষের মনে বৈরাগ্যের সূচনা হয়। কিন্তু কারুরই তো দুরাশা থেকে বৈরাগ্যের জন্ম হচ্ছে না। তবে যদি কারুর অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকে তখন তার মধ্যে বৈরাগ্যের জন্ম হবে। ঠিক এই বাক্যটাই পরে আসবে যেখানে চিলের মুখে মাছের কাহিনী আসবে। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ একটু ক্ষীণ আশা থাকবে ততক্ষণ যে বৈরাগ্য আসবে সবটাই মর্কট বৈরাগ্য। যখন আশা দুরাশাতে চলে গেল তখন ঈশ্বরীয় কৃপা যদি হয় তবেই সেখান থেকে বৈরাগ্য হবে। ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে তবেই ঈশ্বরকে ডাকা শুরু হয়, তার আগে হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সব সময় দুঃখ দিয়েই হবে তা নয়, মীরাবাঈ যেমন কোন একটা অবস্থায় গিয়ে তাঁর মনে হতে লাগল কৃষ্ণই আমার স্বামী। এরপর তিনি আর অন্য কোন দিকে তাকালেন না। ঠাকুরও একটা জিজ্ঞাসু বৃত্তি নিয়ে সাধনার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায়, বেশির ভাগই যাঁরা ঈশ্বরের পথে এগিয়েছেন, কোথাও যেন একটা দুরাশা ছিল। দুরাশা সবারই হয়, যখন মনে হবে আমার সব গেল, চলেও যায়, আত্মহত্যাও করে নেয় বা কাউকে খুন করে দিচ্ছে, অশান্তি সৃষ্টি করে দিচ্ছে, কোন সময়ই শান্তি পায় না। কিন্তু কখন সখন দেখা যায়, যদিও খুব বিরল, ঐ দুরাশা থেকে কেউ ঈশ্বরের পথে চলে গেল। পিঙ্গলার বক্তব্য এটাই, আমার কিছু এমন

শুভকর্ম আছে যার জন্য ভগবান বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। এর আগে যখন সে বিদেহ নগরীর কথা, তার হতাশার কথা বলছিল, সব কিছুকে এক করে এই জায়গাতে একটা যুক্তি দ্বারা জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে, কারুর দুরাশা হলেই যে ঈশ্বরের পথে চলে যাবে তা নয়, একটা রহস্যপূর্ণ পদ্ধতি আছে, যেটা আমরা জানি না এটা কেন হয়। ভল্টায়ার ফরাসী লেখক ছিলেন, তিনি খুব মজা করে ব্যঙ্গ করে লিখছেন, একজনকে বলছেন, দেখো মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই। সে বলছে, আমি একজনকে ভালোবাসি, মেয়েটি আমাকে কোন দিন ছাড়তে পারবে না। একটা কাহিনী বানিয়ে মেয়েটিকে বলা হল তোমার ভালোবাসার লোকটি মারা গেছে, মেয়েটি শুনেই মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে, কোন হুঁশ আসছে না। যে খবর নিয়ে গেছে সে দেখতে খুব সুপুরুষ। মেয়েটির হুঁশ ফিরিয়ে এনে সে বলছে, তুমি মন খারাপ করো না। তোমার বয়স কম, দেখতেও রূপসী, তুমি আরেকজনকে সহজেই বিয়ে করে নিতে পার। মেয়েটি চিৎকার করে বলছেন, প্রশ্নই নেই, জীবনে আমি একজনকেই ভালোবেসেছি আমি আর কারুর দিকে তাকাতে পারব না। লোকটি ভালোবেসে মেয়েটিকে আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা, দু ঘন্টা বুঝিয়ে গেল, তারপর নিজের পরিচয় দিল। লোকটি রূপবান, সুপুরুষ, দু ঘন্টা পরেই মেয়েটি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমি এখন আসছি পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। ছেলেটিকে গিয়ে বলল, দু ঘন্টার মধ্যেই আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেছে। তাই বলে কি মেয়েটির আগের প্রেমিকের মধ্যে বৈরাগ্য এসে যাবে, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? কোন দিন হবে না, আরেকটা মেয়েকে খুঁজবে। এভাবেই জীবন চলে। কথামৃতে ঠাকুরের এই ধরণের কত কাহিনী আছে, গুরু শিষ্যকে বড়ি খাইয়ে দিয়েছে, শিষ্য ট্যারাব্যাকা হয়ে মরার মত পড়ে আছে। ঘর থেকে বার করা যাচ্ছে না, দরজা কাটতে হবে। স্ত্রী কান্নাকাটি করছিল, দরজা কাটতে হবে শুনে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বলছে, দরজা না কেটে ওর পা কেটে বার করে নাও। লোকটিও সোজা হয়ে বলছে, তবে রে খ্যাপী আমার পা কাটতে বলছিস! ঠাকুর ওখানে বলছেন, লোকটি সন্ন্যাসী হয়ে গেল। কিন্তু এখানে বলছেন, দুরাশা হলেই যে সব সময় ঈশ্বরের দিকে যাবে তা নয়। প্রচুর শুভকর্ম যদি করা থাকে তবেই যেতে পারে, এই জিনিসটাকে পিঙ্গলার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিলেন।

পিঙ্গলা বলছে, আমি যদি সত্যিকারের অভাগিনী হতাম, তাহলে কিন্তু আমার এমন দুঃখ হত না, যে দুঃখ থেকে এই রকম বৈরাগ্য হতে পারে। এখানে ব্যাপারটা খুবই সামান্য কিন্তু একটা জিনিস বোঝার আছে। একটা মেয়ে দুরাশায় চলে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে সেই রকম হতাশা আসেনি, নতুন নতুন যে ফন্দি ফাঁদবে সেটাও করছে না, কিন্তু হঠাৎ তার perceptionটা পাল্টে গেল, সেখান থেকে বৈরাগ্য এসে গেল। এই জিনিসটাকে নিয়েই বলছে, আমি যদি অভাগিনী হতাম তাহলে দুঃখটা এত জোরালো হত না, এর থেকে কম দুঃখ হত। পিঙ্গলার দুঃখ গভীর, কিন্তু বলছে আমি যদি অভাগিনী হতাম আমার দুঃখ কম হত, দুঃখ যদি কম হত তাহলে আমার এই বৈরাগ্য আসত না। আমার সৌভাগ্য ছিল বলেই দুঃখটা বেশি এসেছে। এতটাই দুঃখ এসেছে যে তার আর কোন দিকে দৃষ্টি নেই। এই বর্ণনাকে আধার করে আমরা বলতে পারি, যদি সে তখন একজন বড়লোক খদ্দের পেয়ে যেত তাতেও সে আর ঐদিকে মন দিতে পারত না। ঠাকুর বলছেন, গিন্নী সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে, কাজকর্ম সেরে যেই স্নানে বেরিয়ে গেল তখন তাকে ডাকলেও আর ফেরত আসবে না। খেলা শেষ, আর সে ফিরে তাকাবে না।

পিঙ্গলা বলছে, ভগবানের এই অপার কৃপাকে আমি নতমস্তকে গ্রহণ করছি আর যত রকমের বিষয়ভোগ আছে সব আমি ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হলাম। *সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী। বিহারম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ।।১১/৮/৪০।।* এবার আমার প্রারব্ধানুসারে যতটুকু আমি পাব ততটুকু দিয়েই আমি পরম সন্তোষে ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার জীবনধারণ করব। আর অন্য পুরুষের উপর দৃষ্টি না দিয়ে আমার হৃদয়ে যিনি পরমেশ্বর আছেন তাঁর সাথে রমণ করব। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, যদি আমার আবার জন্ম হয় তখন আমি বালবিধবা হব, এক টুকরো জমি থাকবে তাতে শাক বুনব, সেই শাকভাত খাব আর ঈশ্বরের নাম করব। পিঙ্গলার এই ভাব, একটু কাজকর্ম করে যা জুটবে তাতে শাকভাত খেয়ে হরিনাম করব। কঠিন কোনটা? দিনের পর দিন শাকভাত খেয়ে থাকা না হরিনাম করা? আসলে শাকভাত খেয়ে থাকা অত্যন্ত সহজ।

গান্ধীজী যেদিন থেকে পথে নামলেন সেদিন থেকে তিনি কোয়াশের ঝোল আর ভাত খেয়ে থেকে গেলেন। সারা জীবন শাকভাত খেয়ে কে থাকতে পারেন? যাঁর জীবনে একটা আদর্শ আছে।

বুকার টি ওয়াশিংটনের একটা খুব নামকরা বই আছে Up from Slavery, সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে লড়াই করে তাকে বড় হতে হয়েছে। উনি একটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রফেসর ছিলেন আমেরিকার কৃষি বিজ্ঞানে ওনার বিরাট অবদান। আজ যে আমরা পিনাট বাটার খাই, পিনাট বাটার তিনিই প্রথম তৈরী করেছিলেন। সারা জীবন অবিবাহিত থেকে গিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে পাঁচ ডলার করে চেকে মাইনে দেওয়া হত, সেটাও তিনি ভাঙাবার সময় পেতেন না। একটা দুটো পোষাক দিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছেন। ওনাকে বিয়ের কথা বললেই বলতেন, বিয়ে তো করতে চাই কিন্তু সময় কোথায়। ভোর চারটে থেকে গাছেদের সাথে আমি কথা বলতে শুরু করি, প্রত্যেকটি গাছকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি কেমন আছ, কি খবর। কোন স্ত্রী কি এটা সহ্য করবে? উনি কি খাচ্ছেন, কি খেতে দিচ্ছে জানতেন না। যে কোন কীর্তিমান মানুষ প্রথম যেটাকে মারবেন সেটা হল খাওয়া-দাওয়া। যা দিল খেয়ে নিল, ওখানেই শেষ। ঠাকুরও বলছেন, আধ্যাত্মিক যাত্রা যাদের শুরু হয়ে গেছে তাদের সামান্য ঝোলভাত হলেই হয়ে যায়, খাওয়া-দাওয়ার কোন আড়ম্বর থাকে না। সমস্যাটা হল আদর্শের অভাব, আর আদর্শের মধ্যে সব থেকে কঠিন আদর্শ হল ঈশ্বরের নাম করা। আর ঈশ্বরের নাম করব বলে শুধু ঝোলভাত খেয়ে থাকব, এ জিনিস অসম্ভব। পেটরোগারা ঝোলভাত খায়, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কোন আদর্শ নেই আর ঝোলভাত খেয়ে থাকবে, কখনই সম্ভব নয়। আদর্শ যদি থাকে, সে বেচারি সময়ই পাবে না যে পাঁচ রকমের আয়োজন করবে। সেইজন্য ঝোলভাত খেয়ে থাকাটা কঠিন না, হরিনাম করাটাই কঠিন। পিঙ্গলা ছিল সঙ্কেতোপজীবিনী, সে যদি এখন বিশেষ খাওয়ার আয়োজন করার ইচ্ছে করে তাহলে তাকে আবার এই পথে নামতে হবে, এখন তার কোন প্রশ্নই নেই। আর দু এক জায়গায় যা কাজ করবে সেখান থেকে যা পেয়ে যাবে তাই দিয়ে কোন রকমে জীবন চালিয়ে নেবে আর বাকি সময়টা হরিনাম করে কাটাবে। এখানে বলছেন প্রারব্ধবশতঃ যা আমার কাছে আসবে, সেখানে প্রারব্ধটা কিভাবে আসবে, কারুর বাড়িতে হয়ত কাজটাজ করবে বা যা পয়সা সঞ্চিত আছে সেটা দিয়েই চালিয়ে নেবে, কিন্তু অন্য কারুর মুখাপেক্ষি হয়ে থাকবে না।

জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কে বাঁচাতে পারেন? পিঙ্গলা বলছে *সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্। গ্রস্তং কালাহিনাহহত্মানং কোহন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ।।১১/৮/৪১।।* জীব সংসারের অন্ধকূপে পড়ে আছে আর বিষয় তাকে অন্ধ করে রেখেছে তার উপর কাল রূপী অজগর সাপ তাকে গ্রাস করে আছে, এই অবস্থায় ভগবান ছাড়া আর তাকে কে রক্ষা করবে? একটা কুয়োতে অজগর সাপ আছে, সেই কুয়োত কেউ পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে। আর বাঁচবে কি করে! আমরা বলব, ভালোই তো, মরে যাবে, মরে গেলে সব ল্যাটা চুকে যাবে। এটাই মুশকিল, অজগর সাপ তাকে তো খেয়ে নিল, দুদিন পর তার আবার জন্ম হবে, আবার কুয়োতে পড়বে, আবার অজগর সাপে ধরবে, ধরে আবার গিলবে। এটাকেই বলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। একবার খেয়ে নিলে ঝামেলা চুকে যাবে, তাহলে তো আর কোন সমস্যা থাকবে না। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে গেলেই হয়, সবা ঝামেলা মিটে যাবে। কিন্তু তা হবে না, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*। কে বাঁচাতে পারেন? ঈশ্বরই বাঁচাতে পারেন, আর কেউ পারবে না। এগুলো উপমা, উপমাতে বলছেন তোমার বাঁচার পথ আছে। কি পথ? তুমি যদি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তুমি বেঁচে যাবে। পিঙ্গলা সব শেষে বলছে, *আত্মৈব হ্যত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ। অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ।। ১১/৮/৪২।।* জীব যখন সমস্ত বিষয় থেকে, ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বিরক্ত হয়ে যায় তখন নিজের রক্ষা নিজেই করে নিতে পারে। তখন দেখার হল কাল রূপী অজগর থেকে কিভাবে বাঁচা যায়। সংসারটা অন্ধকূপ, বিষয় তাকে অন্ধ করে রেখেছে আর কালরূপী অজগরের মুখের গ্রাস হয়ে আছে। একবার সে যদি বিষয় থেকে সরে আসে তার দৃষ্টিটা ফিরে পাবে, তার মানে জ্ঞানদৃষ্টিটা জেগে উঠল, প্রভুর দিকে মন দেওয়ার চেতনাটা জেগে গেল, পরের ধাপে অজগর সাপের থেকে বাঁচা। কিভাবে বাঁচবে? কোন গুরুর আশ্রয় নিল, ঈশ্বরের শরণাগতি নিয়ে নিল। বলছেন তখন সে নিজেই সক্ষম হয়ে যায়। যে শাস্ত্রই পড়া হোক, যে গ্রন্থকেই অনুসরণ করুক, ঘুরে

ফিরে ঐ একটা পয়েন্টকে নিয়ে আসবেই, যে করেই হোক বিষয়াসক্তি থেকে নিজেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আস। বিষয়াসক্তি না যাওয়া পর্যন্ত এই অন্ধকূপ, কালরূপী অজগর এগুলো থেকে বাঁচতে পারবে না। এই হল পিঙ্গলোপখ্যান, আমাদের ঐতিহ্যের খুব নামকরা উপখ্যান।

কাহিনীকে গুটিয়ে এনে এবার অবধূত বলছেন *এবং ব্যবসিতমোতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্। ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা।।১১/৮/৪৩।।* পিঙ্গলা নিশ্চিত করে নিল, আর সে ধনীদের প্রত্যাশা করবে না, যাদের কাছে টাকা-পয়সা আছে আর কোন দিন সে তাদের পেছনে দৌড়াবে না। এবার সে শান্ত মনে নিজের বিছানায় গিয়ে নিদ্রাগত হল। জীবনে যদি কেউ জয়ী হতে চায়, যে কোন জায়গায়, সেখানে তার শত্রুকে সব সময় পালাবার একটা সুযোগ দিতে হয়। শত্রুকে যদি পালাবার একটু পথ খুলে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তার জয় নিশ্চিত। বড়দের সাথে ছোটরা তর্ক করতে গেলে ছোটরা সব সময় ভাববে আমি যেটা বলছি সেটাই ঠিক, এই ব্যাপারে সে একেবারে দৃঢ়। বড় যিনি তিনি দেখছেন সব ভুলভাল বলছে, তিনি হেসে বলে দিলেন, হয়ত তাই হবে। তিনি একটা তাকে পথ দিয়ে দিলেন, যেখানে সে একটা সম্মানের সাথে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বড়রা যদি তাকে সেখানেই পুরো শেষ করে দেন, তখন সে তাঁর সারা জীবনের মত শত্রু হয়ে যাবে। যে কোন পরিস্থিতিতে শত্রুকে সব সময় পথ দিতে হয়। যদি একটু পথ দিয়ে দেওয়া হয় সে পালিয়ে যাবে। যদি পথ না দেওয়া হয় তখন সে তাকে মরণ কামড় দেবে। তর্কাতর্কি করতে করতে যে মানুষ হাতাহাতিতে নেমে পড়ে, এটাই তার কারণ। এখানে প্রকৃতি পিঙ্গলাকে পালাবার সুযোগ দিল না, না দেওয়াতে সে লড়াইয়ে নেমে গেল, যাঃ আমার আর কিছু লাগবে না। সেইজন্য সংস্কৃতে খুব নামকরা যে কথা সেটাই এখন দত্তাত্রেয় বলছেন, *আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা।।*১১/৮/৪৪। আশার মত বড় দুঃখের আর কিছু নেই, দুঃখের মূলে আশা, মোহ। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন শোক আর মোহ এটাই সংসার। শোক মানে, কিছু ছিল সেটা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, মোহ মানে, হাতে এখন নেই কিন্তু আশা করছি পেয়ে যাব, মোহেরেই আরেকটা শব্দ আশা। *নৈরাশ্যং পরমং সুখম্*, জগৎ থেকে যদি নিরাশা হয়ে যায় তখন এর থেকে সুখ আর কিছুতে হতে পারে না। তাই যে কোন কিছুর আশা করে না সেই প্রকৃত সুখ পায়। যেমন এই পিঙ্গলা পুরুষের আশা ত্যাগ করে দেওয়াতে শান্তিতে শয্যায় গিয়ে সুখে নিদ্রা যেতে পারল।

বেদান্তী সন্ন্যাসীদের নামে একটা কথাই বলা হয় *অশোকমন্তঃ*, তাঁরা শোকের পারে চলে যান। পরমহংস উপনিষদে বলছেন, *যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ প্রয়াতু প্রয়াতু তৎ*, যেটা আসার আসছে, যেটা চলে যাওয়ার চলে যাচ্ছে। যদি কল্পনা করা যায়, যদিও এগুলো করা খুব কঠিন, একটা কাঠের পুতুল, পুতুলে এক গাদা ছিদ্র রয়েছে, আমি সেই পুতুল বানিয়েছি। ঐ ছিদ্র দিয়ে বাতাস আসছে বাতাস যাচ্ছে, পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। নিজের শরীর মনকে যদি এই রকম বানিয়ে নেওয়া যায়, নানান রকমের যে চিন্তা-ভাবনা, নানান রকমের যে ঘটনা আমাদের ভেতরে ঢুকছে বেরোচ্ছে, কোনটাতেই জড়াতে নেই। তবে এভাবে থাকা বা করা খুব কঠিন। কঠিন বলেই তো সংসারে আধ্যাত্মিক মানুষের সংখ্যা কম। সবাই বলেন, সংসারে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষের সংখ্যা সব সময় খুব কম থাকে। কারণ সুখ বলতে যে জিনিসটাকে সংসারী মানুষ বোঝে, ওটাকে কেউ পেরোতে পারে না। একটু যদি বিচার করে দেখা হয়, আমাদের সবারই দুঃখ আছে। দুঃখের মূলে কি আছে? হয় একটা জিনিস হাতের মুঠোয় ছিল সেটা বেরিয়ে গেছে আর তা নাহলে একটা জিনিস পেতে চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না, এছাড়া আর কিছু না। দুঃখের মূলে এই দুটি জিনিস, এই দুটির পারে চলে গেলে যেটা আছে সেটাই সুখ, এই সুখকে তাই বলা হয় আত্যন্তিক সুখ। ধর্ম মানে, যে জিনিসটা এই দুটোকে পেরিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়। ধর্ম বলতে আমার সাধারণত বুঝি, মন্দিরে যাওয়া, প্রসাদ খাওয়া, তীর্থে যাওয়া, এগুলোতেও যে হয় না তা নয়, হয়। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি প্রচণ্ড নিষ্ঠা ছিল আর বর্তমানে মুসলমানদের নমাজের প্রতি, মক্কায় হজ করাতে এমন নিষ্ঠা যে ধর্মের নামে তারা অনেক কিছুকে সহ্য করে নেয়। তবে যত দিন এইসব বাহ্যিক আচরণের মধ্যে থাকবে তত দিন তার শোক মোহের পারে যাওয়াটাও ওঠা নামা করবে। কিন্তু একবার যদি আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন আর শোক মোহের পারে যাওয়াটা

আর কোন পরিস্থিতিতেই পাল্টাবে না। এই যে ভাগবতে অবধূতের চব্বিশ গুরুর আলোচনা চলছে, এখানেও ঘুরে ঘুরে ঐ একই বিষয়কে নিয়ে বলে যাচ্ছেন। আমাদের পুরো ধর্মশাস্ত্রে আর যে কোন ধর্মেরই ঐ একটিই কথা, প্রথমেই জগতকে ছাড়, যতটুকু আসছে আসতে দাও, যতটুকু বেরিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে যেতে দাও, ধরে রাখার চেষ্টা করতে যেও না। ধরার চেষ্টা করলে তখনই শোক আর মোহ আসবে। শোক আর মোহ আসা মানেই নিজের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সরে গেল।

১৮) কুরর পক্ষী

এরপর আসছে চিলের মুখে মাছ। কথামৃত পাঠকদের কাছে এই কাহিনী খুবই পরিচিত। একটা চিল মুখে করে মাছ নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। চিলের মুখে মাছ দেখে হাজার হাজার কাক কা কা করতে করতে চিলের পেছনে ধাওয়া করেছে। চিল যেদিকে যায় সেদিকেই কাক গুলো ধাওয়া করছে। কাকের চিৎকারে চিলের নাজেহাল অবস্থা, কোথাও শান্তি পাচ্ছে না। কোন ভাবে চিলের মুখ থেকে মাছটা পরে যেতেই সব কাক চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে চলে গেল। চিল তখন স্বস্তিতে একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসল। যখনই বিষয়-আশয় সম্পত্তি থাকবে তখন যত রকম চিন্তা-ভাবনা, লোকজন মানুষকে বিবশ করে রাখবে। যেমনি বিষয় সম্পত্তি চলে গেল তখন কেউ আর তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

ভাগবতে যে কুরর পাখীর কথা বলা হয়েছে এই পাখি চিল হওয়ার কথা নয়, বর্ণনা অনুযায়ী কুরর পাখি আরও ছোট পাখি আর তার মুখে মাছের বদলে মাংসের টুকরো ছিল। কুরর পাখি থেকে যে শিক্ষা পেলেন সেটাই দত্তাত্রেয় বলছেন *পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্। অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান যস্ত্বকিঞ্চনঃ।।*১১/৯/১। মানুষ নিজের অতি প্রিয় বস্তুকে কখন কাছ ছাড়া করতে চায় না, কিন্তু সঞ্চয়ের এই প্রবণতাই তার যত দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন জিনিসকে নিয়ে মানুষের শোক আর মোহ করবে? যে জিনিসটা তার ভালো লাগে বা তার প্রিয়। ভালো লাগা বস্তুকে একত্রিত করাটাই সংসারের মূলে। যেটা মানুষ ভালোবাসে সেটাই মানুষ সংগ্রহ করে, সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখতে চায়। মহিলাদের সোনার গয়নার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সোনা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আগেকার দিনে নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না, সেইজন্য সোনা জমিয়ে রাখত। শুধু সোনাই না, যেটাকেই ভালোবাসে সেটাকেই মানুষ জমিয়ে রাখতে চাইবে। বাচ্চারা খেলনা ভালোবাসে, ওরা খেলনা জমায়। যে পুরুষের যেটা ভালো লাগে সে সেটাকে জমাতে থাকে। এটাই দুঃখের কারণ, সঞ্চয় করার প্রবণতটাই দুঃখের মূল। সাময়িক কোন অঘটন ঘটলে আমরা অবশাদগ্রস্ত হয়ে যাই। অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেলে অনেক সময় সব ফেলে দেয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাঁর বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি বলতে সব সময় বোঝায় যাঁর বিবেক আছে, কোনটা ভুল কোনটা ঠিক জানেন আর সেই অনুসারে বুদ্ধিকে কাজে লাগান, এটাই বুদ্ধির আধ্যাত্মিক অর্থ, আধ্যাত্মিক অর্থেই বুদ্ধিকে নেওয়া হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথা বুঝে নিয়ে প্রথম থেকেই অকিঞ্চনভাবে কালাতিপাত করেন, কোন কিছুতে জড়ান না আর মনে মনেও কোন বস্তুর আকাঙ্খা করেন না, একমাত্র তিনিই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করতে পারেন। এনাদের ছাড়া আর কেউ সুখী হয় না।

তাহলে কি মানুষ সঞ্চয় করবে না, সঞ্চয় না করলে তার জীবন চলবে কি করে? আসলে এই শাস্ত্রগুলো অনেক আগেকার, আগেকার দিনের মানুষরা পারতেন। আলেকজাণ্ডেরর সেনাপতি ডাইরি লিখতেন, যেখানে যেখানে আলেকজাণ্ডার যুদ্ধে যেতেন উনি সব ডাইরিতে লিখে রাখতেন। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে এলেন তারও অনেক বর্ণনা সেনাপতির ডাইরি থেকে পাওয়া গেছে। আলেকজাণ্ডার খবর পেলেন এখানে অনেক ব্রাহ্মণরা আছেন, তাঁরা সবাই ঋষি, ওনারা সবাই বিনা বস্ত্রে থাকেন। আলেকজাণ্ডার এ্যরিস্টটলের ভক্ত ছিলেন, তিনি চাইলেন এনাদের সাথে দেখা করবেন। ঋষিদের কাছে যেতেই ঋষিরা আলেকজাণ্ডারকে ভাগিয়ে দিয়েছেন, আমাদের কথা শুনতে হলে তোমাকেও কাপড় খুলে আসতে হবে। ওখানে যা গরম, পোশাক ছাড়া ঐ রোদের তাপকে সহ্যই করতে পারবে না, পাঠানরা তাই লম্বা লম্বা পোষাকে সারা শরীরটা ঢেকে রাখে, গ্রীসদের পক্ষে তো রোদের ঐ তাপ সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু তার মধ্যে সব ঋষিরা একেবারে নির্বস্ত্র। আলেকজাণ্ডার একদিন সব ব্রাহ্মণদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। ব্রাহ্মণরা সবাই খেতে গেছেন। তবে একে

সেনাপতি তার উপর গ্রীক, ওদের লেখাকে বিশ্বাস করা যায় না, সব কিছুকে অতিরঞ্জিত করে লিখত। কিন্তু এছাড়া তো আমাদের জানারও এখন কোন উপায় নেই। যাই হোক ব্রাহ্মণরা আলেকজাণ্ডারের ওখানে খেতে গেছেন। কিন্তু কেউ বসলেন না, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চামচ ছেড়ে হাত দিয়ে খেলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, পুরো খাওয়ার সময় ওনারা সবাই এক পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঋষিরা ঐ গরমে বস্ত্রহীন, হয়ত কৌপীন পড়ে আছেন, কিন্তু এক পায়ে দাঁড়িয়ে খেলেন আর যা দিয়েছেন সবই খেয়েছেন। কার সামনে? আলেকজাণ্ডার, যিনি বিশ্বজয়ী। ভাগবতাদি রচনা এইসব ঋষিদের পরম্পরায় রচিত হয়েছে, সবাই খুব উচ্চমানের ঋষি। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগের চেষ্টা করবে। সেইজন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ কখনই সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। সাধারণ লোক যখন ভাগবত শোনে সেখানে তখন তাদের একটাই টপিক, রাসলীলা। রাসলীলার ভেতরের সার তত্ত্বে তাদের কোন আগ্রহ নেই। এখানে যে টপিক চলছে, এই ধরণের টপিকই ভাগবতের অধ্যায়গুলিতে ছড়িয়ে আছে, সাংসারিক লোকেদের পক্ষে তাই ভাগবতের কথা ধারণা করা সম্ভবই না। তবে শুনতে শুনতে ভেতরে একটু ছাপ পড়ে। সেখান থেকে সে ধীরে ধীরে ভোগ বিলাসিতার ব্যাপারে একটা লাইন টানতে শুরু করে। যার যার বিলাসিতার ব্যাপারটা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে, কারণ এক একজনের বিলাসিতা এক একটা জিনিসে থাকে, তার মাত্রাটাও আলাদা হবে। কোন মেয়ের মনে হবে আমার পঁচিশটা শাড়ি হলেই হয়ে যাবে আবার কোন মহিলার মনে হবে দুশো শাড়ি। কোথাও একটা লাইন টেনে দিতে হবে, দুশোটা শাড়ির পর আর নেব না।

এই একটি কথা খুব ভালো করে মনে রাখলে আর কোন অসুবিধা হবে না, ধর্ম মানে একটাই জিনিস, সব সময় ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত থাকা। ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত থাকাটাই ধর্ম। সংসার মানেই যেখানে ঈশ্বরের বোধ নেই। সাধনাও একটাই, দ্বিতীয় আর কোন সাধনা হয় না, সেটা হল ত্যাগ। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপর তলায় যাব, সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, যদি একটা সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকি, আমাকে ওখানেই আটকে থাকতে হবে, যতক্ষণ সিঁড়িটা না ছাড়ছি ততক্ষণ ওপর তলায় যাওয়ার জন্য পরে ধাপের সিঁড়িতে যেতে পারছি না। নীচের ধাপ ছাড়া, এটাই ত্যাগ। যে কোন পথ, যে কোন যোগ যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, ভক্তি পথে যাচ্ছে সেখানেও ত্যাগ, কর্ম পথে যাচ্ছে সেখানেও ত্যাগ, তেমনি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ যে যোগেই যাওয়া হোক সেটাও ত্যাগ। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন unselfishness is God, নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বর। নিঃস্বার্থপরতা মানেই ত্যাগ। সংসার মানে আঁকড়ে ধরে রাখা, সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, নিজের স্বামীকে, নিজের স্ত্রীকে, সন্তান, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়ি, মান, সম্মান সব কিছু আঁকড়ে ধরে রাখবে।

হানিবল নামে এক রাজা ছিল, প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু খুব শক্তিশালী রাজা। হঠাৎ একদিন তার মনে হল তার শরীর আর তার সাথ দিচ্ছে না। নিজের লোকেদের ডাকল, ডেকে আদেশ দিল, তোমরা আমাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দাও, আমি আর বাঁচতে চাই না। তাই হল, সে মরে গেল। তার ছিল, আমি যতদিন বাঁচব রাজার মত বাঁচব, শরীরকেও আমি কোন পাত্তা দেব না। যে মানুষ সারাটা জীবন সুখে কাটিয়েছে, তার কখনই মনে হবে না যে আমি ধর্মের দিকে যাই। সমস্যা হল, আবার তো তাকে জন্ম নিতে হবে, কোন জন্মে কোথাও না কোথাও গিয়ে তাকে ধাক্কা খেতে হবে। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, মানুষ যতক্ষণ জীবন থেকে, জগৎ থেকে একটা ধাক্কা না খাবে ততক্ষণ ধর্মের দিকে তার মন যাবে না। ধাক্কা খাওয়া মানেই দুঃখ, দুঃখ মানেই শোক আর মোহ, শোক আর মোহ মানে, কিছু জিনিস চলে গেল আর কিছু জিনিস চেষ্টা করেও পাচ্ছে না। এই তিনটে জিনিস, ঈশ্বরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাটাই অধ্যাত্ম, সাংসারিকতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা এটাই সংসার আর এটা থেকে ওটাতে যাওয়ার একটাই পথ ত্যাগ, এছাড়া আর কিছু না। এই কটি জিনিসকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব শাস্ত্রে বলছে। যেমন মুসলমানদের বলা হয় দিনে পাঁচবার নমাজ পড়বে, মূলতঃ কি বলতে চাইছে, তুমি যেটাই করছ, যেটাতেই তুমি আসক্ত হয়ে আছে, তুমি খাচ্ছ, তুমি কাজ করছ, বন্ধুর সাথে কথা বলছ, যেটাই করছ, একটা লাইন টেনে দাও। স্কুল কলেজে ক্লাশ যতই ভালো চলুক, টিচার যতই ভালো পড়াতে থাকুন, চল্লিশ মিনিট হয়ে গেল, ঘন্টা পড়ে গেলে ওখানেই ক্লাশ শেষ। এগুলোই কোথাও আমাদের ত্যাগের প্রস্তুতি করে দিচ্ছে। ত্যাগ মানেই তাই, একটা জায়গায় গিয়ে লাইন টেনে দাও। পাঁচবার যে

নমাজ পড়ছে, ওখানেই তাকে ত্যাগের ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কোন ধর্মের যত রকম বিধি উপাচার আছে সবেতেই মানুষকে ত্যাগের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে জপ করবে, তার মানে তোমার আলস্য ত্যাগ কর। জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও, কোথাও না কোথাও তোমাকে একটা লাইন টানতে হবে। ঐ লাইনটা এখন কোথায় টানবে, কিভাবে টানবে নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে।

১৯) বালক

দত্তাত্রেয়র ঊনিশতম গুরু বালক। ঠাকুরও বলছেন পাঁচ বছরের বাচ্চা ত্রিগুণাতীত, তার মধ্যে কোন গুণের আঁট নেই। কোন মান অপমান বোধ নেই। পায়খানা করে এসে সবাইকে নিজের পেছন দেখিয়ে বলবে দ্যাখো তো পরিষ্কার হয়েছে কিনা। বন্ধুদের সঙ্গে এই ঝগড়া করল, পর মুহূর্তেই আবার তার সঙ্গে গলাগলি। কোন কিছুতে আঁট নেই। ঠাকুরও এই 'আঁট' শব্দ অনেকবার ব্যবহার করছেন। বাচ্চা সব সময় মস্ত হয়ে থাকে, আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকে। দত্তাত্রেয় বাচ্চার থেকে শিক্ষা পেলেন *ন মে মানাবমানৌ স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্। আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ।*।১১/৯/৩। বালকের মান, সম্মান, অপমান কোন দিকেই দৃষ্টি নেই, আর বালকের ঘরবাড়ির চিন্তা, সংসারের চিন্তা, কোন চিন্তাই নেই। যখন খেলা করে নিজের মনেই নিজের সাথে খেলা করতে থাকে, কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, নিজের মধ্যেই বুঁদ হয়ে আছে। বালকের এই আচরণ দেখার পর আমিও তাদের মত থাকতে শুরু করলাম। আমাদের ঐতিহ্যে বালকের মত থাকার যে ভাব, এই ভাব ঠাকুরের জীবনে আমরা অনেক বেশি দেখতে পাই। ঠাকুর বলছেন, পরমহংসদের অনেক রকম স্বভাব থাকে, যেমন জড়বৎ বলছেন, কখন উন্মাদবৎ, কখন পিশাচবৎ আর বালকবৎ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণের কথা বলছেন, ওটা জ্ঞানীর একটা স্বভাব, একটা টাইপ কিন্তু জ্ঞানী পূর্ণাঙ্গ টাইপ নয়। জ্ঞানীর পূর্ণাঙ্গ টাইপ হল ঠাকুরে যে চার রকম স্বভাবের কথা বলছেন। ঠাকুর সব কিছুর পরেও দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে গিয়ে বলছেন, মা আমি শিশু কিনা, শিশুর তো মা চাই। কথামৃতে এর বর্ণনা এসেছে। কথামৃতে আসা মানে, শিষ্যরা তখন তাঁকে অবতার রূপে মানছেন, নরেনের মত যুক্তিবাদী যুবকরা আসতে শুরু করে দিয়েছেন, ঐ অবস্থাতেও তিনি নিজেকে শিশুর মত দেখছেন, বালকবৎএর বাইরে খুব কম তিনি থাকতেন। শেষ দিন পর্যন্ত বালকের মতই থেকে গেলেন। অন্য ভাবও নিতেন, জ্ঞানীদের মত থাকতেন, যুবকের মত থাকছেন, ফষ্টিনষ্টি করছেন কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই বালকবৎ। বালকবৎ এর বিশেষত্ব হল, দায়ীত্ব পুরো ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত। দত্তাত্রেয় বলছেন, আমিও বালকের মত থাকতে শুরু করলাম, আমারও কোন মান অপমান বোধ নেই। আমি নিজের আত্মাতেই রমণ করি আর নিজের সঙ্গেই খেলা করি।

আমাদের কি এই জিনিস চলবে? বাচ্চাদের এই ভাব পুরোটাই চলবে। ঠাকুর বলছেন বড়লোকের বাড়ির দাসীর মত থাকতে, বাড়ির দাসী আর বাচ্চার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। দাসীকে কাজ একটু বেশি করতে হয়, কিন্তু সে জানে যে এগুলো আমার কিছু না। বাচ্চাকে কাজ অনেক কম করতে হয়। পরমহংস বাচ্চার মত থাকতে পারেন, গৃহস্থরাও বাচ্চার মত থাকতে পারে শুধু তফাৎ হল কাজটা একটু বেশি করতে হয়, এছাড়া আর কিছু তফাৎ নেই। কিন্তু একবার যদি কেউ ঠিক করে নিল আমি সব ভার ঠাকুরের উপর দিলাম, এরপর যে কাজটা আমার দায়ীত্বের মধ্যে পড়ছে করে দিলাম, এর কোন ফলই আমার লাগবে না, এবার কিন্তু সে সত্যিই বালকের মত মজায় থাকবে। একবার কোন এক সেন্টারের অধ্যক্ষ মহারাজ অফিসে বসে আছেন, সেই সময় একজন ব্রহ্মচারী এসে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে ওনার চোখে চশমা নেই। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার চোখে চশমা দেখছি না। মহারাজ হেসে বললেন, চুরি হয়ে গেছে। চুরি হয়ে গেছে মানে? ট্রেনে আসছিলেন, তখনকার দিনের অর্ডিনারি স্লীপারে রাত্রে শুয়েছিলেন, দুটো ব্যাগ ছিল দুটোই চুরি হয়ে গেছে। ঘুমনোর সময় চশমাটা খুলে ব্যাগে রেখেছিলেন, সেটাও চলে গেছে। ব্রহ্মচারী বললেন আপনাকে টিটি ধরল না? না টিকিটটা ছিল। মহারাজ খুব আনন্দ করে বলছেন, দুটো ব্যাগ ছিল, দুটোই চুরি হয়ে গেছে। জামা-কাপড় যা ছিল সব চুরি হয়ে গেছে। যেন একটা মজার ঘটনা, মজা করেই বলছেন। এই যে ভাব এটারই কথা বলছেন, আমি কাঁদলেও ব্যাগ চলে আসবে না, হাসলেও আসবে না, ও চলে গেছে। চলেই যদি যায় তাহলে

কেঁদে লাভ কি। কিন্তু আমরা পারি না। উপায় কি? উপায় একমাত্র অভ্যাস। মহারাজ যখন দেখলেন ব্যাগ নেই, একটু ক্ষণের জন্য তাঁরও মনটা একটু খারাপ হয়ে থাকবে, কিন্তু ঐটুকুই। বাচ্চারা ঠিক এভাবেই চলে। তামসিক লোক ওই নিয়েই কত কাণ্ড বাঁধিয়ে দিত। এই কথাটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, সিদ্ধ পুরুষরা যেটা অনায়াসে করেন, সাধারণ মানুষকে সেটাকেই চেষ্টা করে করতে হয়, এটাই সাধনা। নির্বিকার চিত্ত তো একদিনে হওয়া যাবে না, চেষ্টা করতে হয়ে।

পরের শ্লোকে দত্তাত্রেয় খুব সুন্দর কথা বলছেন *দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুত। যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ।।১১/৯/৪।।* জগতে দুজনই আনন্দে থাকে, একজন বালক আর দ্বিতীয় গুণাতীত। গুণাতীত মানে যিনি কোন কিছুর বন্ধনে নেই, সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে গুণেরই তিনি পারে। এই দুজন ছাড়া জগতে আর কেউ আনন্দে থাকতে পারবে না, সন্ন্যাসীরও মনে জ্বালা, সংসারীরও মনে জ্বালা, পুরুষের মনেও জ্বালা, নারীর মনেও জ্বালা, সবারই জ্বালা, আনন্দে থাকে এক ছোট বাচ্চা আর দুই ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ। আমরা বাচ্চা কেউ হতে পারব না, সেই সুযোগ পেরিয়ে গেছে, এখন একটাই পথ, কিভাবে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। কিন্তু এর জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে। আর যদি বলে, এতেই বেশ আছি, তাহলে থাকো। ঠাকুর বলছেন উট কাঁটা গাছ খায়, মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত বেরোচ্ছে তাও সে কাঁটা গাছ খাওয়া ছাড়তে পারছে না। যারা বলে কষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দ আছে, ধর্ম কিন্তু তাদের জন্য নয়।

২০) কুমারী কন্যা

কুড়ি নম্বর গুরু কুমারী কন্যা। *ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্। স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু।।১১/৯/৫।।* ছোট্ট একটা কাহিনীর মাধ্যমে দত্তাত্রেয় দেখাচ্ছেন তিনি এই কুমারী কন্যার থেকে কি শিক্ষা পেয়েছেন। একদিন কুমারী মেয়েটির বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে বরপক্ষ থেকে কয়েকজন অতিথি এসেছে। সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। অতিথিদের আপ্যায়নের দায়িত্ব মেয়েটিকেই নিতে হয়েছিল। মেয়েটির পরিবার খুব দরিদ্র। সেদিন বাড়িতে কিছুই ছিল না। অতিথিদের খাওয়াতে হবে, বাড়িতে একা। মেয়েটি তাই ধান কাঁড়তে শুরু করল। এটা খুব মজার ব্যাপার, আমরা মনে করি আগেকার দিনে মেয়েদের অনেক কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত, কিন্তু এখানেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটির বয়স কম নয়। কারণ ধান ভাঙছে মানেই পনের ষোল বছরের নীচে হবে না। সব মেয়েদের বাল্যবিবাহ হত, এই ধারণাটা ভুল। ইসলাম ধর্ম আসার পর আমাদের ধর্মে এত পরিবর্তন হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের আসল ধর্মটাই ভুলে গেছি। এখানে কুমারী কন্যার কথা বলছেন। যাই হোক, মেয়েটি হাতে শাঁখের চুড়ি ছিল, চুড়ি পড়ার প্রথাও আমাদের অনেক পুরনো। ধান ভাঙার সময় তার হাতের চুরি গুলো থেকে ঝন ঝন আওয়াজ হচ্ছিল। আওয়াজে অতিথিরা বুঝে নেবে কি হচ্ছে। খুবই লজ্জার ব্যাপার, বাড়িতে অতিথি এল আর তারপর আমি ধান কাঁড়ছি। অর্থাৎ বুঝে ফেলবে যে এদের অবস্থা একেবারেই স্বচ্ছল নয়, ঘরে চালটুকুও নেই। মেয়েটিকেই এখন সব কিছু করতে হবে। আওয়াজটা বন্ধ করবার জন মেয়েটি হাত থেকে এক জোড়া চুড়ি খুলে রেখে দিল। আওয়াজ একটু কমল, কিন্তু তাও আওয়াজ একেবারে বন্ধ হয়নি। এবার সে আরও এক জোড়া খুলে রেখে দিল। এই করে করে যখন দু হাতে একটি করে চুড়ি থেকে গেল তখন আর কোন আওয়াজ নেই। অবধূত খুব সুন্দর কথা বলছেন *অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দরম। লোকাননুচরন্নেতাঁল্লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া।।১১/৯/৯।।* মানুষ কিভাবে থাকে, মানুষের কি স্বভাব এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যদি আমাদের মনে না থাকে তাই মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে রাজা জনকের পূর্বপুরুষদের গল্প বলছেন, সেখানে রাজা যদুর কথা বলতে গিয়ে অবধূতের চব্বিশ গুরু প্রসঙ্গে চলছে। রাজা যদু দত্তাত্রেয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি শিক্ষা কি করে পেলেন। তখন তিনি বলছেন, আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকেই একটা শিক্ষা গ্রহণ করছি। দত্তাত্রেয় তাই চোখা-কান খোলা রেখে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। অবধূত এটাই বলছেন, আমিও ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলাম দেখতে এখানে

কি হচ্ছে আর কেন হচ্ছে। অবধূত দেখছেন দুটো চুড়ি তাতেও আওয়াজ হচ্ছে, তখন মেয়েটি একটাকে ভেঙে দিয়েছে, একটি চুড়ি থেকে গেল।

এটা দেখতেই তাঁর চোখ খুলে গেল। *বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি। এক এব চরেত্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ।।*১১/৯/১০। যেখানেই অনেক লোকজন একত্র থাকে সেখানেই নানা কথাবার্তা, কলহ আর সেখানেই অশান্তি। যখন কেবল দুজনও থাকে তখনও কথাবার্তা চলতেই থাকে, সেইজন একা একা বিচরণ করাই উৎকৃষ্ট পথ। একা হয়ে গেলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। কুমারী কন্যার কঙ্কণ থেকে কি শিক্ষা পেলেন? একা থাকলে কোন অশান্তি হবে না। যেখানেই একাধিক সেখানেই কথাবার্তা আর অশান্তি। কিন্তু একা থাকা সম্ভব না, বাচ্চারা একা থাকতে পারে না। বাচ্চাদের মত আমাদেরও মনটা খুব কাঁচা, সেইজন্য আমাদের সঙ্গ চাই। বহুলোকের সঙ্গ ভালো লাগছে, তার মানে সে গোল্লায় গেছে আর একজনের প্রতি দুর্বলতা আছে, তার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে তাহলে বুঝতে হবে *ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি*, তার মধ্যে এখনও বার্তার দুর্বলতা আছে। তমোগুণী লোক অনেকের মধ্যে থাকতে চায়, রজোগুণীরা নিজের পছন্দের একটা বিশেষ গোষ্ঠির সাথে থাকতে চায়, সত্ত্বগুণীরা দুজনের সাথে থাকত চায়, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*। সত্ত্বগুণীকে সুখ আর জ্ঞান এই দুটো বেঁধে ফেলে। তোমার সাথে কথা বলে কত সুখ পাই, তার মানে তার বন্ধন আছে, সত্ত্বগুণের বন্ধন। পাঁচজনের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে, পাঁচজনের সাথে থাকতে ভালো লাগে, রজোগুণের বন্ধন। আর চারিদিকে যা হচ্ছে, মিটিং, মিছিল, সিনেমা, খেলা, লোকে লোকারণ্য, খুব মজা পাচ্ছে, তমোগুণের বন্ধন। একা মানে ত্রিগুণাতীত, তাঁর আর কোন কিছুতেই বন্ধন নেই। সেকি সম্ভব? একবারও বলা হচ্ছে না যে এটা সম্ভব। এখানে চব্বিশ ক্যারেট সোনার কথা বলা হচ্ছে, চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে যেমন গয়না হয় না, তেমনি এনাদের দিয়ে জগৎ চলে না। জগৎ চালানোর জন্য খাদ মেশাতে হয়। খাদ কত কম মেশাতে হবে, কত বেশি মেশাতে হবে সেটা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। জগাতের চরম সত্যকে এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিগুণাতীতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, যিনি ত্রিগুণাতীত তিনি কারুর সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে না, মানে দরকার পড়ে না। ঠাকুর বলছেন বিষয়ী লোকেদের সাথে কথা বলে বলে মুখ পুড়ে যাচ্ছে, তিনি যে সঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেটা তাঁর ছিল না। কারণ সমাধিতে সব সময় থাকার জন্য তো তিনি আসেননি, তাঁর শিক্ষাটা কাকে দেবেন, আধার খুঁজছেন, তাই এই কথা বলছেন। পরমহংসরাও জগতের মাঝখানে বিচরণ করেন তাঁরাও তখন সত্ত্বগুণের আশ্রয় নেন, কিন্তু ভেতর থেকে ত্রিগুণাতীত। তার থেকেও মজার হল, অবধূত বলছেন কিভাবে তিনি ঘুরতে ঘুরতে ওখানে এসে দেখছেন ঝন ঝন চুড়ির আওয়াজ হচ্ছে আবার আওয়াজটা ধীরে ধীরে কমতে কমতে একেবারেই থেমে গেল। কিভাবে জিনিসটা হল, সেটার খোঁজ নিতে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। জগতে সব কিছুকে চোখ-কান খোলা রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কিন্তু আমরা সবাই উদভ্রান্তের মত দৌড়েই যাচ্ছি, কোন দিকেই আমাদের দৃষ্টি নেই। হাওড়া স্টেশনে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, এক একটা ট্রেন এসে থামছে আর কিভাবে হাজার হাজার লোক দৌড়াচ্ছে, কারুর সাথে কথা বলারও সময় নেই। একজন বলল আটাশ চলে গেছে? ছটা আটাশের ব্যাণ্ডেল লোকাল কি চলে গেছে সেটারও বলার সময় নেই, শুধু আটাশ চলে গেছে। ইলেক্ট্রনের মত সবাই দৌড়াচ্ছে।

২১) বাণ নির্মাতা

এবার একুশ নম্বর গুরুর কথা বলছেন। এই কাহিনীও কথামৃতে অন্য ভাবে ঠাকুর বলছেন। এক বাণ নির্মাতা একাগ্র চিত্তে একটা বাণ তৈরী করছিল। বাণ তৈরী করা খুব কঠিন কাজ। বাণ তৈরীর সব থেকে কঠিন কাজ হল বাণের ডাণ্ডাটা একেবারে সোজা থাকতে হবে, ফলাটা ধারাল করতে হবে, তা নাহলে ওর ব্যালেন্সে গোলমাল হয়ে যাবে, বাণ চলার সময় এলেমেলো হয়ে যাবে। প্রত্যেকে রাজার তীর বানাবার জন্য খুব দক্ষ লোক থাকত, আর তাদের খুব সম্মান ছিল। এক একটা তীরের খুব দাম হত, সেইজন্য যুদ্ধের পর কিছু লোক ছিল যারা ব্যবহৃত তীরগুলো সংগ্রহ করে বেড়াত, সেই তীরগুলো আবার চলে যেত যারা তীর বানায় তাদের কাছে। ওরা দেখে নেয় তীরের লাইনটা ঠিক আছে কিনা। সামান্য একটু যদি ওজনের এদিক সেদিক থাকে

তাহলে লক্ষ্যের দিকে চালাতে গেলে তীরটা বেঁকে যাবে। দত্তাত্রেয় একদিন দেখছেন একজন বাণ তৈরী করছে, সেই বাণ নির্মাতা এত একাগ্র হয়ে কাজ করছিল যে কোন দিকে তার হুঁশ নেই। পাশ দিয়ে রাজার বরকন্দাজ চলে গেলেও সে কোন টের পেল না। দত্তাত্রেয় বলছেন বাণ নির্মাতার থেকে আমি শিক্ষা পেলাম *মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ। বৈরাগ্যভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ।।*১১/৯/১১। যে কজন গুরুর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এই শ্লোকটিই most practical। বলছেন, প্রথমে আসনকে স্থির করে শ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তারপর বৈরাগ্য ও অভ্যাস সহযোগে নিজের মনকে বশ করতে হবে এবং খুব সংযমের সাথে ইষ্টে মনকে সংলগ্ন করতে হবে। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞাসা করছেন উপায় কি? ঠাকুর বলছেন, কেন গীতায় আছে অভ্যাস যোগ, অভ্যাস যোগ মানে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করে যাওয়া। গীতায় ভগবানকে অর্জুন বলছেন, আপনি যে কথাগুলো বলছেন শুনতে খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু আমাদের মন দুর্নিগ্রহ, বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করা যেমন কঠিন, তেমনি মনকেও নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য। তখন ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি ঠিকই বলছ, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই খুব কঠিন, কিন্তু অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণর করা যায়। যে জিনিসটা মনকে চঞ্চল করছে সেই জিনিসটা থেকে সরে আসার অভ্যাস করতে হয়। যে জিনিসটা মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ত্যাগ করে দিতে হয়। এই অভ্যাস করলে কি হয়? বলছেন, *জিতশ্বাসো জিতাসনঃ*, এখানে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলছেন। মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যোগে দুটো জিনিসের কথা বলা হয়, একটা হল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়মিত করা আর দ্বিতীয় আসন জয় করা। যাদের আসন স্থির হয়নি তাদের মনও স্থির হবে না। স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন, উনি গৌর বর্ণ ছিলেন আর ভারী শরীর ছিল। উনি মন্দির উদ্বোধনে কানপুরে গিয়েছিলেন। একজন ভক্ত তার বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসেছেন, মেয়েটি খুব ছটফটে। মন্দিরের মধ্যে শঙ্করানন্দজী মহারাজ বসে আছেন। একটা মাছি বার বার তার গালে এসে বসছিল। মহারাজ হাতটা নাড়িয়ে মাছিটাকে তাড়িয়েছেন। মেয়েটিকে বলে দেওয়া হয়েছিল, ওখানে গিয়ে ছটফট করবে না, চেঁচামেচি করবে না, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবে ইত্যাদি। কিন্তু এবার বাচ্চা মেয়েটি আর থাকতে পারেনি, চেঁচিয়ে বলছে, মা মা দেখ ঠাকুর হাত নাড়ছে। মেয়েটি এতদিন ঠাকুরের মুর্তি দেখে এসেছে। শঙ্করানন্দজী বসে আছেন একেবারে মুর্তির মত বসে আছেন, মেয়েটির স্থির ধারণা যে এটাও ঠাকুরের মুর্তি। মহারাজ হাত নেড়েছেন আর ও মনে করছে মুর্তি যেন হাত নেড়েছে, শুধু মুর্তিই না, ঠাকুর। মা মা দেখ ঠাকুর হাত নাড়ছে। *জিতাসনঃ*, আসন জয় করা মানে এই রকম, মনে হবে যেন মুর্তি বসান আছে। কি আসন করে বসে আছেন সেটা কোন ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা হল স্থির হয়ে যাওয়া। *জিতশ্বাস*, মন যদি স্থির হয়ে যায় তখন কুম্ভক হয়ে যায় তার সাথে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়মতি হয়ে যায়। মন যদি স্থির হয়ে যায় তখন মনের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়, মুখস্ত করার ক্ষমতা বেড়ে যায়, স্মৃতি শক্তি বেড়ে যায়, নিজের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ বেড়ে যায়। অন্য দিকে বলছেন *ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ*, অত্যন্ত সংযম চিত্ত সহকারে এক লক্ষ্যে মনকে সংযুক্ত করা। বাণ তৈরী করাটা খুব সূক্ষ্ম কাজ, শুধু বাণ তৈরীর ক্ষেত্রেই নয়, ছুঁচের কাজ বা যে কোন সূক্ষ্ম কাজ করার সময় মন এমন একাগ্র হয়ে যায় যে আর কোন দিকে হুঁশ থাকে না। এখানে দেখাচ্ছেন কিভাবে সব জায়গা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়, যে কোন সূক্ষ্ম কাজ অনেকক্ষণ ধরে করলে মনটা স্থির হয়ে যায়। কোন কিছু একদিনেই হয়ে যাবে না, অভ্যাস করে করে রপ্ত করতে হয়। আমাদের মন অনেক কিছুর সাথে জড়িয়ে রয়েছে, মনের স্বভাবই হল যাকে সে আপন মনে করে তার সাথে জড়িয়ে থাকে। মনের আপন হল ইন্দ্রিয়গুলো আর ইন্দ্রিয়ের আপন হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়। আমাদের দশটি ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের শেষ নেই, ফলে মানুষ কিছুতেই শান্তি পায় না। জীবনে যদি কেউ কিছু পেতে চায়, জাগতিক কোন কিছুই হোক আর আধ্যাত্মিক কোন কিছুই হোক মনকে সব সময় একটা জিনিসে লাগাতে হয়। যখন দেখা যাবে একসাথে অনেক কিছু করছে, বুঝে নিতে হবে এর দ্বারা কিছু হবে না। গীতায় ভগবান বলছেন *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্*, যারা অব্যবসায়ী তারা এক সঙ্গে অনেক কিছুতে মন লাগিয়ে রাখে। এই যে বাণ তৈরী করছে, সে মনকে চারিদিক থেকে গুটিয়ে এনে একটি জায়গায় দিয়ে রেখেছে। দত্তাত্রেয় বলছেন কর্মবাসনা থেকেই মনের চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়। কর্মবাসনা শূন্য হলেই মন ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায়। এই স্থির মনকে যদি

পরমাত্মাতে স্থাপন করে দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত কর্মবাসনা শেষ হয়ে যাবে। আর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির ফলে রজোগুণ আর তমোগুণকে সত্ত্বগুণ দাবিয়ে দেয়, ফলস্বরূপ মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়।

সৃষ্টির যে উৎস, উৎসটা হল শুদ্ধ গুণ, এই গুণ তিনটে সত্ত্ব, রজো আর তমো। সত্ত্ব, রজো ও তমো যখন সাম্য অবস্থায় থাকে তখন কোন সৃষ্টি হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টির যখন সময় হয় তখন এই তিনটে গুণের সাম্য ভাবটা ভেঙে যায়। কেন যে সাম্য অবস্থাটা নড়ে যায় আমরা কেউ জানি না। আমাদের ঋষিদের যে বিভিন্ন দর্শন তাতে ওনারা বলেন, আত্মা যেমনি কাছে আসেন তখনই তিনটে গুণের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। যেমন লোহার টুকরোর কাছে নিয়ে যদি একটা চুম্বককে নাড়ানো হয় সব লোহার টুকরো গুলো নড়তে শুরু করে। ঠিক তেমনি আত্মা যেমনি কাছে আসে তখন চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়, ওদের স্বভাবের মধ্যেই এই জিনিসটা আছে, সেইজন্য এর একটা নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি মানেই স্বভাব, স্ব স্ব ভাব। আমরা এখানে যে কজন আছি সবারই প্রকৃতি আলাদা, ঠিক তেমনি যেটা আলাদা তখন বলবে ওর এটাই স্বভাব। প্রকৃতি মানে স্বভাব, তার ভেতরের যে স্বভাব। প্রকৃতি, নেচার, স্বভাব সব একই কথা। সত্ত্ব, রজো আর তমো এই যে তিনটে গুণ এটাই প্রকৃতি। প্রকৃতি একা যখন থাকে তখন সে চুপচাপ শান্ত হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু যেমনি কেউ ওর কাছে এলো সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তখন সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনজন তিনজনকে দাবাতে শুরু করে। এই যে এক অপরকে দাবিয়ে যাচ্ছে এটাই সৃষ্টি। জগতে আমরা কত রকমে রঙ দেখছি, জগতটা যেন রঙের খেলা, কিন্তু জগতে মূল তিনটে রঙই আছে, ঐ তিনটে রঙ থেকেই জগতে এত বিচিত্র রঙের খেলা চলছে। আমাদের মনেও সত্ত্ব, রজো আর তমো আছে, আমাদের পোষাকও সত্ত্ব, রজো আর তমো, আমাদের খাওয়া-দাওয়াতেও সত্ত্ব, রজো আর তমো আছে। আগের আগের জন্মের যে কর্ম বাসনাগুলো সঞ্চিত হয়ে আছে, আর পূর্বজন্ম যদি নাও মানা হয়, এই জন্মে যে কর্মগুলো করা হয়েছে, সেই কর্মের সংস্কারে আমাদের অনেকগুলো প্রবণতা হয়েছে, এই নানা রকমের প্রবণতা থেকে আমাদের ভেতরে অনেক কিছু করার ইচ্ছা জাগে, এটাকেই বলে কর্মবাসনা। কর্মবাসনা থেকে যখন ইচ্ছা জাগে তখন সাধারণ ভাবে এর দুটো প্রতিক্রিয়া হয়, একটা রজোগুণ, যার থেকে কর্মে প্রবৃত্তি আসে, আরেকটা তমোগুণ, ধ্যুৎ থাক, কে করবে! তমোগুণ মানে পলয়ানবৃত্তি, ছেড়ে দাও, আরও অনেক করার লোক আছে। রজোগুণ মানে যুদ্ধবৃত্তি, আমাকে জয়ী হতে হবে।

আমাদের সারা জীবনটাই তমো আর রজোর খেলার মধ্যে চলে যায়, সত্ত্বে কখনই যায় না। যে কোন জিনিসে এই তিনটে গুণকে থাকতেই হবে, সেইজন্য কোন কিছুই পুরোপুরি ভালো হয় না আর কখনই কোন জিনিস পুরোপুরি খারাপ হয় না। সব কিছুতে তিনটে গুণ থাকবেই, কিন্তু বেশি কোনটা আছে? আমি যখন ঘুমোতে যাচ্ছি, তখন আমার শরীর মনের আটানব্বুই শতাংশ তমোগুণ নিয়ে নেয়, আর ওয়ান পয়েন্ট নাইন রজোগুণ নিয়ে নিল, সেটা দিয়ে আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, শরীরের ক্রিয়া চলছে। আর একটু সত্ত্বগুণ আছে। যখন গভীর নিদ্রায় চলে গেল তখন সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সারাটা জীবন সাধারণ ভাবে তমোগুণ আর রজোগুণ দিয়ে চলে। কর্মবাসনা পেছন থেকে ঠেলছে, পরিস্থিতি গুলো নিজে থেকে আসছে বা ভেতর থেকে চাড়া দিচ্ছে। আমাদের যে প্রতিক্রিয়া, এই প্রতিক্রিয়া সব সময় হয় তমোগুণ আর রজোগুণ। অনেক সময় তমোগুণটা আসে রজোগুণের রূপ ধরে। সত্ত্বগুণীর চরিত্র সব সময় পুরো আলাদা হয়। তাদের কি হয়? আমি এটা করতে পারি কিন্তু করব না। কেন করব না? আমি এর পারে চলে গেছি। খুব সহজ উদাহরণ, বাচ্চারা গুলি খেলতে ভালোবাসে। যারা খেলতে চায় তারা যেমনি দেখছে গুলি খেলছি ওখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে, মানে রজোগুণ। অনেকে আছে, কাছে গেলেই ওরা ঝগড়া করে, সে ওখান থেকে সরে এল, এটা তমোগুণের লক্ষণ। যিনি সত্ত্বগুণে চলে গেছেন, তিনিও চলে আসবেন, কারণ তিনি এসবের উর্ধ্বে চলে গেছে, এটা তমোগুণের লক্ষণ নয়, উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা হল। বিভিন্ন বয়সে কর্মবাসনা, ইচ্ছা এগুলো পাল্টে যায়। তখন রজোগুণ আর তমোগুণ তাকে টানতেই থাকে। সেইজন্য বলছেন, সত্ত্বগুণে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তার একটাই উপায় ঈশ্বরের দিকে মনকে নিয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের দিকে মন গেলে রজোগুণ আর তমোগুণের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসে। সত্ত্বগুণের লক্ষণকে গীতায় দুটি শব্দে বলে দিয়েছেন, সুখ আর জ্ঞান। বই পড়ে আনন্দ পাচ্ছে, লেখালেখি করে আনন্দ পাচ্ছে, বুঝতে হবে এখন সে সত্ত্বগুণে আছে। ঈশ্বরের জ্ঞানে

নিমগ্ন হয়ে যেতে চাইছে, তখন বুঝতে হবে সত্ত্বগুণের আধিক্য চলছে। ঈশ্বরের নামের প্রতি রুচিকে ঠাকুর দুই রকম বলছেন, প্রথমে ভজনান্দ আর পরে ব্রহ্মানন্দ। যখন পরমাত্মাতে মনকে পুরোপুরি লাগিয়ে দেওয়া হয়, সব সময় তাঁরই নামগুণগান করছে, তাঁরই কথা আলোচনা করছে, পড়ছে তখন বুঝতে হবে তার সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়েছে।

বাণ নির্মাতা বাণ তৈরী করছিল, সে কাজ করছিল। আমাদের দৃষ্টিতে কাজ করাটা রজোগুণ, কিন্তু এখানে রজোগুণ নয়, কারণ বাকি সব জায়গা থেকে বাণ নির্মাতার মনটা পুরোপুরি সরে এসেছে। মন সব কিছু থেকে সরে একটা জায়গায় কেন্দ্রিত হয়ে যাওয়াটা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। রজোগুণের দৃষ্টিতে দেখলেও কোন দোষ নেই, কারণ তার মনের একাগ্রতা অনেক উচ্চস্তরের। জীবনে যদি কেউ উন্নতি লাভ করতে চায় তাহলে তার মনকে একটা জায়গাতে কেন্দ্রিত করা দরকার। এখানে অবধূত রজোগুণ আর তমোগুণ থেকে মনকে সরিয়ে পরমাত্মাতে লাগাতে বলছেন। বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষরা এমন তমোগুণ আর রজোগুণের চক্রে পড়ে আছে দেখলে করুণা হয়। তমোগুণ মানে, চুপচাপ শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, খেতে দিলে খাচ্ছে, শুতে বললে শুয়ে পড়ছে, বয়স হয়ে গেছে কি করবে, কিছু করার থাকে না। রজোগুণ মানে একই খবর পাঁচবার পড়বে, পাড়ার বুড়োদের সাথে কোন পার্কে গিয়ে গল্প করবে। ঠাকুর বলছেন, অমুক জায়গায় গেলাম দেখছি বুড়ো গুলো তাস খেলছে, বুঝি এখনও ঈশ্বরের নাম করার সময় হয়নি। তাস খেলা রজোগুণ কিন্তু তমোগুণের আধিক্য লেগে আছে। সত্ত্বগুণের আধিক্য যখন হয় তখন ঈশ্বরের নামগুণগান, ঈশ্বরের কথা পাঠ, ঈশ্বরের আলোচনা করে। আরেকটু নীচে যখন কোন বিষয়কে নিয়ে পড়াশোনা করা হয়, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ইতিহাস পড়ছে, সেখানে মন পুরোপুরি ডুবে আছে আর জ্ঞান উপলব্ধি হচ্ছে তখন সেটাও সত্ত্বগুণের লক্ষণ। কিন্তু ঠিক ঠিক সত্ত্বগুণ হল পরমাত্মাতে মনকে কেন্দ্রিত করা। যাঁর মন পরমাত্মাতে গিয়ে স্থির হয়ে যায়, বাহ্য জগতেরও কোন হুঁশ নেই, অন্তর্জগতেরও কোন হুঁশ নেই, অন্তর্জগত বলতে পুরনো যে স্মৃতিগুলো আছে, সেগুলোকে নিয়েও থাকছে না, কল্পনা নিয়ে থাকছে না, শুধু আত্মাকে নিয়ে আছে। বাণ নির্মাতার কাছ থেকে অবধূত এই শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

২২) সর্প

অবধূতের বাইশ নম্বর গুরু হল সর্প। সাপ থেকে দত্তাত্রেয় সন্ন্যাসীর অনেক ধর্ম শিক্ষা পেয়েছেন। *একচার্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ। অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ।।*১১/৯/১৪। সন্ন্যাসী সব সময় সাপের মত একা একা বিচরণ করবে। সাপ কখন দুজন মিলে চলে না। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল সাপ নিজের জন্য কখনই বাসা বানায় না, ইঁদুরের গর্তে গিয়ে ইঁদুরকে খেয়ে তারই গর্তে বাস করতে থাকে। সন্ন্যাসীও তাই কখন নিজের জন্য কোন সংগঠন বা মঠ তৈরী করতে যাবে না। সাপ কখন এক জায়গায় থাকে না, সন্ন্যাসীও কখন এক জায়গায় গেঁড়ে বসে থাকবে না, প্রমাদে যুক্ত হবে না আর নিজের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করবে না। সন্ন্যাসী কোথাও কোন গুহাতে গিয়ে বাস করবে। আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ, বাহ্য আচরণ দিয়ে যেন তাকে চেনা না যায়।

'In the name of God' বলে একটা খুব বিখ্যাত বই আছে। বর্তমান যিনি পোপ তাঁর ঠিক দুই কি তিনজন পোপ আগে যিনি ছিলেন তাকে কার্ডিনালরা তাদের স্বার্থে কিছু অসুবিধা হওয়াতে স্লো পয়েজন করে খুন করে দিয়েছিল। তাকে হত্যা করার আগে কীভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনাকে কীভাবে কার্যকর করা হল, কীভাবে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল এই নিয়ে পুরো একটা কাহিনীর মত 'In the name of God' বইতে ছাপা হয়ে বেরিয়ে গেল। একজন পোপকে, পোপ কোন সামান্য লোক নন, পুরো বিশ্বের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গুরু, ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্নাসী হয়েছেন ভগবানের নাম করবেন বলে, মাঝখানে সে Priest হলেন, বিশপ, কার্ডিনাল হয়ে হয়ে তারপর পোপ হলেন, আর তাঁর সাগরেদরাই তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে দিল। এটাই হয়, সন্ন্যাসী যখনই বাসা করে নিলেন তখন নানা সমস্যা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলবেই।

সাপকে দেখে অবধূত বলছেন, সন্ন্যাসী কোন মঠ করবে না। কিন্তু স্বামীজীর মত পুরুষ বেলুড় মঠ তৈরী করলেন, সন্ন্যাসীরা মঠের স্কুল কলেজে পড়াচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, মঠে থাকছেন। সন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী অবধূতের শিক্ষার বাইরে গেলেন। অবধূতের বাইশ নম্বর গুরুর কথা শোনার পর আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে। আসলে এখানে একক সন্ন্যাসীর কথা বলছেন, একক সন্ন্যাসী যদি মঠ বানায় তখন তাঁর অনেক ঝামেলা এসে যাবে। মঠ স্থাপন করা মানে সম্পত্তি করা। পাঁচজন শিষ্যকে নিয়েই থাকছেন, স্ত্রী পুত্রাদি নিয়ে যে থাকছেন তা নয়। কিন্তু সম্পত্তি হয়ে যাবে, সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য লোকজন লাগবে। বেলুড় মঠ কারুর সম্পত্তি নয়। প্রেসিডেন্ট মহারাজ থেকে নিয়ে আজকের যিনি ব্রহ্মচারী সবাই জানেন, এখানে বাস করা গুহায় বাস করার মতই। যেদিন কোন সন্ন্যাসীকে বলে দেওয়া হবে তোমাকে এই ঘর ছাড়তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে। যেদিন বলে দেবেন এই সেন্টার ছেড়ে অন্য সেন্টারে যেতে হবে, এতদিন সেন্টারে যে নদের হাট বানিয়ে রেখেছিলেন সব ওখানেই ছেড়ে তল্পিতল্পা নিয়ে তাঁকে নতুন সেন্টারে চলে যেতে হবে। স্বামীজীও বলছেন, প্রত্যেকটি সংগঠন এক নতুন ধরণের evil নিয়ে আসে, তা সত্ত্বেও আমাকে এই সংগঠন তৈরী করতে হবে। কারণ এর দ্বারা যে মঙ্গল হবে, সেটা এই ক্ষতিটুকুর থেকে অনেক গুণ ভালো হবে। Allan Octavian Hume যখন কংগ্রেস দল করেছিলেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলন করে বৃটিশ সরকারের কাছে আমরা বিভিন্ন পিটিশানস দেব। কংগ্রেস জনপ্রিয় হল মূলতঃ গান্ধীজী আসার পর। কংগ্রেস দলকে তিনি ভারতে বিরাট সংগ্রামাদি করাতে কাজে লাগালেন কিন্তু যেমনি ভারত স্বাধীন হল তিনি বললেন এখনই কংগ্রেস দলকে তুলে দেওয়া উচিত, কংগ্রেস যেন আর না থাকে। কারণ কংগ্রেস যে কাজের জন্য করা হয়েছিল সেই কাজ হয়ে গেছে, এরপরেও যদি কংগ্রেস থাকে গোলমাল হতে থাকবে। ঠিক তাই হল, এখন কত গোলমাল চলছে। তুলে দিলেও কিছু হত না, কংগ্রেসের নামটা পাল্টে দিয়ে আরেকটা নামে পার্টি করে সাম্রাজ্য চালাত। যে কোন আন্দোলন, কম্যুনিস্ট বলুন, কংগ্রেস বলুন, তৃণমূল বলুন যে কোন জায়গায় একটা নতুন সমস্যা নিয়ে আসে। জাতিপ্রথা যদি তুলে দেওয়া হয় তখন এক নতুন সমস্যা আসবে, যদি জাতিপ্রথা রেখে দেওয়া হয় তখনও আরেক নতুন সমস্যা দেখা দেবে। বেলুড় মঠ যে এসেছে, এও সমস্যা তৈরী করবে, হয়ত এখনও করেনি, সবে একশ বছর হয়েছে। এটা হল প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা হল, এই কথাগুলো অনেক আগেকার কথা, তখনকার দিনে সাধারণত গৃহস্থ ধর্মের সব কিছু পালন করার পর সন্ন্যাসী হত, এরপর জগতের যে ভালো করা, বেলুড় মঠ যে পদ্ধতিতে কাজ করছে, স্কুল চালনা করা, হাসপাতাল চালানো এগুলোর ব্যাপারে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না। এনাদের বক্তব্য একটাই, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া তোমার আর কিছু করার দরকার নেই আর ঈশ্বর চিন্তন করার জন্য তোমার কোন বাড়িতে থাকারও দরকার নেই, কোন মন্দিরের চাতালে, গাছের তলায়, কোন গুহায় থাকলে; সন্ন্যাসীর ঘরবাড়ি থাকলেই সমস্যা হবে।

২৩) মাকড়সা

দত্তাত্রেয় বলছেন এবার আমি মাকড়সার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি বলছি। অবধূতের তেইশতম গুরু মাকড়সা। *একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টং স্বমায়য়া। সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ।। ১১/৮/১৬।।* সৃষ্টির ব্যাপারে মাকড়সার উপমা অনেক জায়গায় এসেছে, মুণ্ডকোপনিষদেও এই উপমা নেওয়া হয়েছে, *যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ*। মাকড়সা নিজের ভেতর থেকে তার জাল তৈরী করে বাইরে বের করে দেয়। জালের মধ্যে পোকামাকড় এসে আটকে যায় তখন মাকড়সা সেই জালটা আবার ভেতরে টেনে নেয়। মাকড়সার জালের এক একটা সুতোর প্রচণ্ড শক্তি, মাকড়সার জালের সুতোর মত স্টীলের তার যদি তৈরী করা হয়, স্টীলের তারের থেকেও মাকড়সার জালের সুতো বেশি শক্ত ও ভারী হবে। একই থিকনেসের স্টীলের তার যতটা ওজন নিতে পারবে মাকড়সার জালের তার থেকে বেশি ওজন নেবে। জাল এমন ভাবে তৈরী থাকে যে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন পোকা বিভিন্ন জায়গায় ফেঁসে যায়। মাকড়সা যখন দেখে দুটো চারটে পোকা জালে ফেঁসে গেছে, মাকড়সা তখন জালটাকেই গিলে নেয়। দত্তাত্রেয় বলছেন, মাকড়সার এই দৃশ্য দেখার পর আমি তখন বুঝলাম পরমাত্মা ঠিক এই ভাবেই সৃষ্টি করছেন। পরমাত্মা নিজের ভেতর থেকেই সব কিছু বিস্তার করেন আবার সময় হলে, কল্প শেষ হয়ে গেলে সব আবার নিজের ভেতরে গুটিয়ে নেন। মাকড়সার কাছ থেকে আমি

জগতের স্বরূপটা বুঝতে পারলাম। এখানে একটা বড় তফাৎ হল, মাকড়সার জালে যে জিনিস গুলো এসে ফাঁসছে সেগুলো বাইরে থেকে আসছে, কিন্তু সৃষ্টিতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। যিনি ঈশ্বর তিনি জাল রূপে এই জগতের বিস্তার করছেন আর তিনিই জীব রূপে ঐ জালে খেলা করেন। যদিও ঈশ্বরের মধ্যে কোন ধরণের কোন বিভেদ নেই কিন্তু আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যখন দেখি তখন ঈশ্বর, জগৎ, জীব আলাদা আলাদা দেখছি। মাকড়সার ক্ষেত্রে মাকড়সা নিজের ভেতর থেকে জাল ছড়িয়ে দিল, সেই জালের উপর মাকড়সা দৌড়াচ্ছে আর ঐ জালকে আবার গিলে ফেলল। এটা একটা উপমা, মাকড়সার জাল দেখে ঈশ্বরের সৃষ্টির কথা মনে পড়ে। আমাদেরও কিছু কিছু জিনিস দেখে অনেক কিছু মনে হয়, আমরা যদি কোন কিছু থেকে আঘাত পেয়ে থাকে, ঐ ধরণের কিছু যদি দেখি তখন পুরনো ব্যাথাটা আবার চাগিয়ে ওঠে। ঠাকুরের প্রচুর এই ধরণের ঘটনা আছে। গঙ্গার উপর দিয়ে মাঝি নৌকা নিয়ে যাচ্ছ, মাঝি বাঁশে বাজাচ্ছে, বাঁশির আওয়াজ শুনে ঠাকুরের মন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বণিতে চলে গেল, তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। বাইরে থেকে যদি কোন ইঙ্গিত ইশারা আসে তখন আমাদের ভেতরে যেটা আছে সেটা জেগে ওঠে, ভেতরে যদি কিছু না থাকে তাহলে কিছু হবে না। ঠাকুরের উপমা আছে, একজন লোক নদীর ধারে পড়ে আছে, একটা চোর দেখে ভাবছে সারা রাত চুরি করে এখন ঘুমোচ্ছে, এক মাতাল দেখে ভাবছে, সারা রাত মদ খেয়ে এখন উল্টে পড়ে আছে আর একজন সাধু ভাবছে, আহা বেচারা সারা রাত ধ্যান করে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বহির্জগৎ হল ইঙ্গিত ইশারা মাত্র, কিন্তু আমাদের ভেতরে যেটা আছে তাতে সেটাই জেগে উঠবে। মাকড়সার জাল দেখলে আমাদের মনে হবে, এমন জাল ছড়াব যাতে আরও অনেক লোককে ফাঁসানো যায়। কিন্তু অবধূতের ভেতরটা ঈশ্বরের ভাবে এমন পরিপূর্ণ হয়ে আছে যে মাকড়াসার জাল দেখে জগতের স্বরূপটা জেগে উঠল। এই জিনিসগুলোকে বৈষ্ণবরা বেশি জনপ্রিয় করে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এত কথা চারদিকে দাঁড় করিয়েছেন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের ভাব ছড়িয়ে গেছে, কোন কিছুকে দেখলেই শ্রীকৃষ্ণের ভাবটাই মনে আসে। অবধূত বলছেন, মাকড়াসার জাল দেখে মনে পড়ে কিভাবে সর্ব প্রকাশক এবং অন্তর্যামী সর্বশক্তিমান ভগবান সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে সুতো দিয়ে সংসার রচনা করে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঐ জালের মধ্যে ধারণ করে রেখেছেন। ঐ জালের মধ্যে পড়ে জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রের খেলা চলছে। সবটাই তিনি হয়েছেন, কিন্তু যখন জীব বোধ এসে যায় তখন দেখছেন ভগবানই তাকে সৃষ্টি করেছেন, ভগবানের মধ্যেই থাকে আবার ভগবানের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। মাকড়সার এই দৃশ্য দেখে অবধূতের মনে এই ভাবটা জেগে গেল। যার এই বোধটা এসে যাবে, ভগবানেতেই আমার জন্ম, ভগবানেতেই আবার অবস্থান, ভগবানেই আমার আহার বিহার তখন আর তার কিসের থেকে শোক মোহ আসবে, প্রশ্নই উঠছে না।

২৪) ভ্রমর বা ভৃঙ্গী কীট

কোন একটা জিনিসকে নিয়ে যদি অনেক চিন্তা করা হয় তখন তার সত্তাটা তার মধ্যে চলে আসে। ভ্রমর কীট বা ভৃঙ্গী কীট থেকে দত্তাত্রেয় এই শিক্ষাটাই পেয়েছিলেন। কথামৃতে ভৃঙ্গীকে ঠাকুর বলছেন কুমুরে পোকা। কুমুরে পোকা আরশোলাকে দংশন করতেই বেহুঁশ হয়ে যায়, ঐ আরশোলাকে কুমুরে পোকা নিজের বাসাতে গিয়ে রেখে দেয়। বাসা থেকে বেরিয়ে আসার আগে কুমুরে পোকাটা ডিম পেড়ে আসে, আর বেরোবার সময় বাসার মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দেয়। কিছু দিন পর ডিম থেকে কুমুরে পোকার বাচ্চা বেরিয়ে আসে। বাচ্চার আহার দরকার, তাই আরশোলাকে আগে থেকেই বাচ্চাদের মা রেখে গেছে, আরশোলাটা এখনও মরে যায়নি, বেহুঁশ হয়ে আছে। যদি মরে যেত তাহলে সেটা পচে যেত। আহার মানেই যেটা পচে যায় আর যে খাদ্য যত তাড়াতাড়ি পচে সেই খাদ্য তত আমাদের পক্ষে ভালো। যেমন রুটি, রুটি পচতে অনেক সময় লাগে, সেই তুলনায় ভাত অনেক তাড়াতাড়ি পচে যায়, সেইজন্য ভাত সব সময় ভালো। কাঁচা জিনিস রেখে দিলে পচতে অনেক সময় লাগবে কিন্তু সেদ্ধ করা জিনিস রেখে দিলে তাড়াতাড়ি পচে যাবে। খাওয়ার নিয়মই হল, খাদ্য পচতে হবে। যে খাদ্য যত তাড়াতাড়ি পচবে সেই খাদ্য আমাদের জন্য তত ভালো। যেমন দই, দই পাতলে দু ঘন্টা পরেই টক হতে শুরু করে, সেইজন্য দই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। দুধ খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, সেইজন্য দুধকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আরশোলা যদি মরে যায় তাহলে পচে যাবে। পচে গেলে

বাচ্চাগুলো খাবে কি? সেইজন্য ওদের মা ঠিক ততটাই বিষ ঢেলে দেয়, এ্যনাস্থেসিয়ার মত, যাতে মরে না যায়। ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে এসে আরশোলাটাকে খেতে থাকে। খাওয়া হয়ে গেল বাচ্চাটাও বড় হয়ে গেল এবার সে বাসাটা ভেঙে বেরিয়ে আসে। আমরা কি দেখছি? দেখলাম একটা আরশোলাকে ভেতরে রেখে কুমুরে পোকা বেরিয়ে এল। তারপর কিছু দিন পর সেই আরশোলাটাই কুমুরে পোকা হয়ে বেরিয়ে এল। আসলে কুমুরে পোকার ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ঐ আরশোলাকে খেয়ে বড় হয়ে বেরিয়ে আসছে। যদি ভালো করে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে, ওর বাসার ভেতরে আরশোলার ছোট্ট ডানা পড়ে আছে। ওটা দেখে আরও দৃঢ় হয়ে যায় যে আরশোলা যেটা ভেতরে ছিল তার ডানা থেকে গেছে আর বাকিটা ভৃঙ্গি পোকা হয়ে গেছে। কিন্তু আগেকের দিনে ওনারা ঐ রকম দেখেছেন। তাতে কোন দোষ নেই। উপমা সব সময়ই ভুল হতে পারে, কিন্তু এখানে শিক্ষাটাই বড় কথা। সেইজন্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কখনই উপমা দরকার হয় না, উপমাটা হল জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য। বায়োলজির যে ব্যাখ্যা এখন এসে গেছে তাতে এই উপমাটা অযৌক্তিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, সত্যটা সব সময় সত্যই থাকবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসে যদি থাকে তাহলে দেখা যাবে স্বামীর মধ্যে স্ত্রীর কিছু স্বভাব চলে আসে আর স্ত্রীর মধ্যেও স্বামীর কিছু স্বভাব চলে আসে। খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, কথা বলার ধরণ, হাটা-চলার ভঙ্গি পাল্টে যায়। যে যার সঙ্গ করে সে তার সত্তা পায়। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সত্তা পায়। সেইজন্য এত সাধুসঙ্গের কথা বলা হয়।

ভৃঙ্গী পোকা থেকে অবধূত এই শিক্ষা পেলেন। কি শিক্ষা? *যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্।।*১১/৯/২২। যদি কেউ স্নেহবশতঃ বা দ্বেষবশতঃ কিংবা ভয়বশতঃ একাগ্র ভাবে কোন কিছুকে চিন্তা করতে থাকে তাহলে তার সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়। স্নেহ মানে ভালোবাসা, দ্বেষ মানে যেখান থেকে আমরা সরে আসতে চাইছি। ভয় শব্দটা নিয়ে এসেছেন ঠিকই, ওখানে ইমোশানের একটা জোর রয়েছে বলে ভয় শব্দটা নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ভয় জিনিসটা দ্বেষের মধ্যেই পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে ইমোশান দুটো, রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে অনুরাগ অর্থাৎ ভালোবাসা আর দ্বেষ মানে যেটাকে আমরা পছন্দ করি না। ভালোবাসা, অনুরঞ্জন বা অনুরাগ আবার বেশ কিছু ইমোশানের জন্ম দেয়, যেমন যাকে ভালোবাসি তাকে পাওয়ার ইচ্ছে হয় বা যে জিনিসটাকে ভালোবাসি সেই বস্তুকে পাওয়ার ইচ্ছে করবে, তার প্রতি লোভ হয়, মোহ হয়। পেয়ে যাওয়ার পর একটা মদ হয়, অপরের কাছে যদি আমার ভালো লাগার বস্তু থাকে কিন্তু আমার কাছে নেই তখন মাৎসর্য হয়। দ্বেষ মানে যে জিনিসগুলোকে আমি পছন্দ করি না। দ্বেষও অনেক ধরণের ইমোশান জন্ম দেয়, তার মধ্যে খুব শক্তিশালী ইমোশান হল ভয়। সংস্কৃতে দ্বেষ মানে যেটা কাছে থাকলে আমাকে দুঃখ দেয়, আর যেটা কাছে থাকলে আমাকে সুখ দেয় তাকে রাগ বলে। যোগশাস্ত্রে বলছেন *সুখানশয়ী রাগঃ* আর *দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।* কিন্তু ভয় খুব শক্তিশালী ইমোশান সেইজন্য এখানে ভয় শব্দটা নিয়ে এসেছেন। স্নেহ, দ্বেষ আর ভয় এই তিনটে কারণে যদি কোন কিছুকে বেশি ভাবা হয় তাহলে *তত্তৎসরূপতাম্*, সেই জিনিসের স্বরূপ সে পেয়ে যাবে। এই জিনিসটা থেকেই পরের দিকে একটা ধারণার জন্ম দিল, তাকে বলছেন, বৈর ভাবে সাধন। রাবণের নামে বলা হয় যে সে বৈর ভাবে সাধন করেছিল। আমরা যারই চিন্তন করি না কেন আমরা তার অনুরূপতা পেয়ে যাব, তা তাকে ভালোবেসেই ভাবি, রেগে গিয়েই ভাবি আর ভয়ের কারণেই ভাবি, তার সত্তা আমরা পেয়ে যাব। এর উপমা দিলেন কুমুরে পোকা। ঠাকুর ভাগবত শুনতেন, তিনিও এই উপমাকে কথামৃতে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে তা হয় না, আরশোলাকে ভ্রমরের বা কুমুরে পোকার বাচ্চারা খেয়ে নেয়।

চব্বিশ গুরুর কথা বলার পর অবধূত দত্তাত্রেয় বলছেন এই চব্বিশ গুরুই শেষ নয়, এর পরেও আমি অনেক কিছু থেকে শিক্ষা পেয়েছি। যেমন আমার দেহটাও আমার গুরু। এই দেহ থেকে আমি বিবেক বৈরাগ্যের শিক্ষা পেয়েছি। শরীরের জন্ম হচ্ছে, ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে, একদিন শরীরের নাশ হয়ে যাবে। শরীরের এই ধর্ম গুলিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে নিজের দেহের প্রতি আর আসক্তি থাকে না। মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষ মরছে, এই শরীরটাও থাকবে না, তবে তত্ত্ব বিচার যদি করতে হয় তাহলে এই শরীর ছাড়া সম্ভব নয়। অন্য দিকে

আমি জানি আমার শরীরের একদিন নাশ হয়ে যাবে, এই দেহটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। আর আমি সন্ন্যাসী, রাস্থাতেই হয়ত শরীরটা একদিন পড়ে যাবে, তখন শেয়াল, কুকুর এই শরীরকে খাবে, সেইজন্য এগুলো থেকে আমি নির্বিকার থাকি। দত্তাত্রেয় বলছেন, মানুষের শরীরটা বৃক্ষের মত, বেঁচে থাকতে এই শরীর দিয়ে অনেক কিছু করা হয়, মরার আগে বৃক্ষ যেমন বীজ ছেড়ে দিয়ে যায়, সেই বীজ থেকে আবার বৃক্ষ তৈরী হয়, ঠিক তেমনি মানুষ নিজের শরীর থেকে আরও কয়েকটি শরীরের জন্ম দেয়। শরীর এমনই বিচিত্র যে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি তাকে বিভিন্ন দিকে টানছে। একজন পুরুষের যদি অনেক স্ত্রী থাকে, স্ত্রীরা যেমন পুরুষকে নিজের দিকে টানতে থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের শরীরকে নিজেদের দিকে সব সময় টানতে থাকে। জিহ্বা একদিকে টানছে, নাক আরেকদিকে টানছে, সব ইন্দ্রিয়ই টানছে। আর আমরা বোকা বরের মত, দশ বারোটা স্ত্রী জোগাড় করে নেওয়া পুরুষের মত দুরবস্থার মধ্যে পড়ে আছি। দত্তাত্রেয় সব কিছুকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছেন তিনি সেই রকম শিক্ষা পেয়েছেন। যাদের শেখার আগ্রহ আছে তারা অনেক কিছু থেকেই শিক্ষা লাভ করতে পারে। যাদের শেখার আগ্রহ নেই তাদের কেউ কোন দিন কিছু শেখাতে পারবে না।

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ কেন

অবধূতোপখ্যানের শেষে দত্তাত্রেয় খুব সুন্দর কথা বলছেন *সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্। তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।।* **১১/৯/২৮**। ভগবান তাঁর নিজের অচিন্ত্যি মায়াশক্তি দিয়ে কত বিচিত্র জিনিস রচনা করলেন। বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, মাছ ইত্যাদি কত রকমের যোনি সৃষ্টি করলেন। *তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ*, এত কিছু রচনা করার পরও ভগবানের নাকি হৃদয় শান্ত হয়নি, তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তখন তিনি মানুষের রচনা করলেন। মানুষ রচনা কেন তিনি করলেন? কারণ আগে যাদের সৃষ্টি করেছিলেন তারা কেউ ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু মানুষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করতে পারে। গুরু নানক বলছেন – যিনি নিরাকার তাঁর ইচ্ছে হল দেহ ধারণ করে নিরাকারকে আস্বাদন করবেন। তাই যিনি নিরাকার তিনি প্রথমে পাথর হলেন। পাথর হয়ে দেখলেন এই দিয়ে ব্রহ্ম চিন্তন করা যাবে না। তারপর তিনি গাছপালা, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ হলেন, এতেও দেখছেন নিরাকারের চিন্তন করা যাচ্ছে না। তখন তিনি মানুষ হলেন। মানুষ হয়ে দেখলেন হ্যাঁ এইবার ব্রহ্ম চিন্তন করে নিরাকারকে আস্বাদ করতে পারবেন। তখন তিনি শান্ত হলেন। এরপর আর নতুন করে কিছু রচনা করার প্রয়োজন রইল না, কারণ উদ্দেশ্য হল নিরাকারকে আস্বাদ করা।

ইদানিং বিজনেস ম্যানেজমেন্টে একটা খুব নামকরা শব্দ এসেছে Unique Selling Point (USP)। একটা ব্র্যাণ্ড বাজারে নতুন এসেছে, এর মত সার্ভিস অন্য কোন ব্র্যাণ্ড দিতে পারবে না, এটাই এর বৈশিষ্ট্য। যেমন মেয়েদের মাথার একটা তেল, এর এমন একটা সুগন্ধ যা অন্য কোন তেল দিতে পারে না। হায়দ্রাবাদে একটা বিরিয়ানির দোকান আছে। তার মালকিন একজন মহিলা। অনেক কর্মচারি মিলে সকাল থেকে বড় বড় হাড়িতে বিরিয়ানির রান্না করতে থাকে। মহিলাটি সারাদিন নিজের মত চুপচাপ বসে কখন মদ খাচ্ছে, কখন সিগারেট টানতে থাকে। শেষ মুহুর্তে বিরিয়ানিটা নামাবার আগে নিজের ঘর থেকে একটা মশলা বার করে এনে সব কটা হাড়িতে একটু একটু করে ছড়িয়ে দেয়। বলে নাকি, হায়দ্রাবাদ শহরে ঐ বিরিয়ানির কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই নেই। দোকানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব বিক্রী হয়ে যায়। শুধু তাই না, দুবাইয়ের মত মধ্য-প্রাচ্য অনেক শহরে ঐ বিরিয়ানি রপ্তানিও হচ্ছে। কেউ জানেও না ওটা কি মশলা। এটাই Unique Selling Point (USP)। মানুষের USP টা কি? মানুষ যেটাই করে অন্য জীবজন্তু তার থেকে অনেক ভালো করতে পারে। স্বামীজী বলছেন কুকুর যে আনন্দ নিয়ে খাবার খায়, শূয়োর যে আনন্দ নিয়ে নোংরাকে ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে খায়, সেই আনন্দ নিয়ে কি মানুষ কখন খেতে পারে! স্বামীজী বলছেন, তুমি একটা ইলেক্ট্রিসিটি আবিষ্কার করেছ অথচ প্রকৃতি কোটি কোটি ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বিনা তারেই পাঠিয়ে দেয়। তোমার USP টা তাহলে কোথায়? মানুষের USP ঈশ্বর চিন্তন। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। সমস্ত পশুপাখি জানোয়ারের মাঝখানে মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সবাইকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের সবার কি কি USP? মানুষ

বলবে আমি নির্গুণ ব্রহ্মের আস্বাদ করতে পারি। বাকি সব কিছু সবাই করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের অনুভূতির আনন্দ মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী অনুভব করতে পারবে না।

এখানেই স্বামীজীর মহত্ত্ব, তিনি আমেরিকাতে বক্তৃতাদি দিলেন, যদি তিনি সেখানে বলতেন, ভগবান গাছপালা, পশু, পাখি, পোকামাকড় সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষকে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ করলেন। এই কথা শোনার পর শতকরা নব্বুই জন্য শ্রোতা সভা ছেড়ে বেরিয়ে যেত। কারণ তারা না মানে ভগবানকে, না মানে ভগবানের সৃষ্টিকে, না মানে আমাদের মতবাদকে। স্বামীজী এদিকে গেলেনই না, তিনি ধর্মকে নতুন করে ব্যাখ্যা করলেন। আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকের এভাবে ব্যাখ্যা করার কারুর ক্ষমতাই নেই। স্বামীজী পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়। আহার, নিদ্রা আর মৈথুন প্রত্যেকটি জীব করছে, এমনকি গাছপালাকেও নিজের প্রজাতি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রজনন প্রক্রিয়ায় যেতে হয়, পশুপাখিকেও করতে হয়। নিজের সন্তানের পরিপালন পশুপাখিরাও করে। আমরা বলি জীবসেবাই ধর্ম, কিন্তু অনেক পশু আছে তারাও জীবসেবা করে। এক ধরণের পাখি আছে তাদের সংখ্যা যদি অনেক বেড়ে যায় তখন একসাথে অনেক পাখি আত্মহত্যা করে নেয়। অপরকে বাঁচানোর জন্যও অন্য পশুরা এগিয়ে আসে। আফ্রিকার এক জঙ্গলে একবার একটা সিংহীকে অনেকগুলো মোষ গুঁতিয়ে মেরে দিয়েছে। তারপর দেখা গেলে একটা সিংহের বাচ্চা বনরক্ষীরা যেখান দিয়ে যাতায়াত করে তার পাশের একটা ঝোপের আড়ালে এমন ভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখল যাতে বনরক্ষীদের নজরে পড়ে। বনরক্ষীদের নজরে পড়তেই সিংহের বাচ্চাটা কায়দা করে ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। বনরক্ষীরা বন্য পশুদের রক্ষার জন্যই কাজ করে, ওরা গুলি করবে না। মাঝে মাঝে সিংহের বাচ্চাটা একটু করে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে ওরা আসছে কিনা। বনরক্ষীরা বুঝে গেল সিংহটা আমাদের কিছু ইশারা করছে। এই করে করে ওদের আড়াইশ তিনশ মিটার নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে বনরক্ষীরা দেখে একটা সিংহী মরে পড়ে আছে। তাকে মোষগুলো গুতিয়ে মেরে দিয়েছে। বনরক্ষীরা বলছে, সিংহের বাচ্চাটি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, কারণ সে জানে মানুষ তাকে দেখলেই গুলি করে দিতে পারে, কিন্তু ওর মধ্যে এমন একটা অনুকম্পা এসেছে যে সিংহীটাকে যদি রক্ষা করা যায়, সেতো জানে না যে সিংহীটা মারা গেছে, কিন্তু বুঝেছে মানুষই তাকে সাহায্য করতে পারবে। পশুও তো অপরের সেবা করছে।

তাহলে মানুষের মধ্যে এমন কি গুণ আছে যেটা পশুপাখির মধ্যে নেই? প্রকৃতি সবাইকে দিয়ে সব কিছু করায় কিন্তু মানুষ যেটা পারে সেটা অন্য কোন প্রানী পারে না, তা হল, non reaction, স্বামীজীর কথা, whatever a man can do animal, birds can do equally them, it is only the power of non-reactive which is unique in human beings। Non-reaction মানে কক্ষণ কোন পশু পাখি হবে না যে নিজের মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে যেখানে reaction হবে না। রিক্সাওয়ালা যদি আমার সাথে অভদ্র ব্যবহার করে আমি তাকে উল্টে গালাগাল না দিতে পারি কিন্তু মনে একটা প্রতিক্রিয়া আসবে। রিক্সাওয়ালাকে আমি নাও কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারি কিন্তু বাড়িতে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে কিছু বললে তার মনে একটা প্রতিক্রিয়া আসবেই, সেখানেও যদি কোন প্রতিক্রিয়া না করা হয়, বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায় সবাই সেখানে প্রতিক্রিয়া করবেই। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী নিজের মনকে এমন নিয়ন্ত্রণ করে নেন যে তিনি non-reactionএ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। এই non-reactionটাই মোক্ষ। স্বামীজী মোক্ষকে define করছেন non-reaction, এটাই স্বামীজীর বিশেষত্ব। যেটা একটা fact ওইটাকে দিয়েই explain করছেন। গীতাতেও ভগবান ঠিক এই non-reactionএর কথাই বলছেন *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ*, সমুদ্রে যখন বিভিন্ন জলরাশি প্রবেশ করে তখন সমুদ্র কোন react করে না, *এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ*, এটাই ব্রহ্মজ্ঞান, এটাই মোক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষর মানে the power to hold your mind back, মন আর react করবে না। এটাই মানুষের বিশেষত্ব, একমাত্র মানুষই এই জগতের সব কিছুতেই non-reaction থাকতে পারে, non-reactionটাই ব্রাহ্মী স্থিতি। যত সে react করবে তত সে পশুপাখির মত আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের মধ্যে মুখ গুজে পড়ে থাকবে। অবধূত এটাই বলছেন মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, একমাত্র মনুষ্য যোনিতেই শরীর আর মনের সাহায্য নিয়ে মনকে non-reactive অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমাদের মনকে নিয়েই

সব কিছু, মন বহির্জগতকেও নিচ্ছে, অন্তর্জগতকেও মন নিচ্ছে। বহির্জগতে যখন থাকে তখন আমরা বলি তার মধ্যে এখন রজোগুণ প্রবল আর মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে গেলে সত্ত্বগুণী হয়ে যায়। তমোগুণে থাকলে কোন কাজই করতে চায় না, চুপচাপ পড়ে থাকতেই তার ভালো লাগে। বেশির ভাগ লোকের মনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু অন্তর্মুখী হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে মন যখন নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় তখন মনকে যদি বলা হয় এমনটি করা যাবে না, মন তখন আর ওদিকে যাবে না।

বেদান্ত শেখার শেষ কথা হল, *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্*। ভূমা মানে বৃহৎ, বৃহতেই আনন্দ, ভূমা মানে সেই ব্রহ্ম, যেখানে গিয়ে মন ঠিক ঠিক শান্তি পায়। বেদান্তে সাধনার দিকে এগোন বা সিদ্ধিতে পৌঁছান মানে *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ ন সুখম্ নাস্তি অল্পমেব*। ছোটতে কখন সুখ হয় না। সুখ যদি পেতে চাও তাহলে বৃহতে যাও। বৃহৎ মানেই মনকে আরও উপরে নিয়ে যাওয়া। যেদিন আমি কিছু শিখলাম না, মনকে বড় করা গেল না, সেই দিনটা আমার জন্য বৃথা গেল। আমাদের তাই প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক দিন নিজেকে বড় করা, বড় করা মানে মনকে উঁচুতে নিয়ে যাওয়া। যেদিন আমি বিশেষ কিছু একটা করলাম না, বিশেষ কিছু শিখলাম না, মনকে বিশেষ কোন উচ্চাবস্থায় রাখলাম না, চব্বিশটি ঘন্টাই আমার সেদিন বৃথা গেল। যদি গতকালের দিকে ফিরে তাকাই, আমরা কি গতকাল এমন কিছু করেছি যে আজকে আমরা নিজেদের আরও বেশি পবিত্র মনে করছি? গীতা, উপনিষদ বা চণ্ডীর একটা শ্লোক কি মুখস্ত করেছি যা থেকে মনে করছি আমাদের স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে? নতুন এমন কিছু কি অধ্যয়ন করেছি যে মনে করছি আমাদের জ্ঞান বেড়েছে, চরিত্রের বিকাশ হয়েছে? এমন কোন মানুষের সেবা করেছি যে মনে করতে পারছি আমরা নিজেদের আরও বৃহতের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছি বা মনের মধ্যে উদারতার ভাব জেগেছে? দেখছি কিছুই করিনি, গতকালটা বাদ দিয়ে গত এক মাসেও হয়ত কিছুই করিনি। কোথায় সময়ে গেছে? ঘোর তমোগুণে। ঘোর তমোগুণে এই সংসারকে দিনগত ভাবে আমরা চালাচ্ছি। রজোগুণে বিশেষ চেষ্টা করা হয়, সেখানেও সেই রকম কিছুই নেই। আর সত্ত্বগুণের কোন প্রশ্নই নেই, সত্ত্বগুণে পুরো নির্বিকার থাকে। বেদান্ত আমাদের কাছে দেখতে চাইবে তুমি আরও বৃহৎ হয়েছ কিনা, আরও মহৎ হয়েছ কিনা। মহৎ হওয়ার যে পদ্ধতি, ধাপে ধাপে আমরা যে মহৎ হওয়ার দিকে এগোচ্ছি, এটাই বেদান্ত। এগিয়ে যাওয়ার শেষ ধাপ হল, ব্রহ্মে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা কি সেই ভাবে চেষ্টা করছি? করছি না। এটা হল একটা দিক।

এর অন্য দিক হল, মন যখন কোন কিছু শেখে বা মনের উপর যখন কোন আঘাত আসে বা প্রতিঘাত যখন হয়, যেমন কুকুরকে একট ঢিল মারা হল, ওখানে একটা আঘাত পড়ল, তখন কুকুরটা একটা প্রতিঘাত করে, প্রতিঘাত স্বরূপ সে একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করে ঐ অশান্তিটাকে ঠিক করে। নিউটনের থার্ড ল বলছে, every action has equal and opposite reaction, equal হবে আর opposite হবে। নিউটনের থার্ড ল যেমন পদার্থ জগতে কাজ করে ঠিক তেমনি মনের জগতেও কাজ করে, কারণ মনটাও একটা পদার্থ। মন সব কিছুতেই প্রতিক্রিয়া করবে, ঘুমের মধ্যে বাইরে থেকে কিছু আসছে না কিন্তু স্বপ্ন খেলা করতে থাকে। আর জাগ্রত অবস্থায় যদি ধ্যান করতে বসে তখনও মন নিজের মত চলতে থাকে, কারণ তখন ভেতর থেকে তার সিগনালস্ গুলো আসতে থাকে। পুকুর শান্ত, একটা পাথর ছুড়লে শান্ত পুকুর অশান্ত হয়ে ওঠে। পুকুরে যদি প্রচুর মাছ থাকে মাছগুলো সব সময় এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকে, লাফাতে থাকে, পুকুরের জল তখনও অশান্ত হয়ে ওঠে, সব সময় তরঙ্গ হতে থাকবে। আমাদের মনও ঠিক তাই, পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাইরে থেকে ঢিল ছুড়ছে আর ভেতরে যে চুনো থেকে বড় মাছ আছে সেগুলো তোলপাড় মাচিয়ে যাচ্ছে। যেখানে পদার্থ আছে সেখানেই এই তোলপাড় হবে, একটা যে ছোট্ট বালিকণা সেখানেও তাই হবে, যেমনি ওর উপর কোন ক্রিয়া হবে তেমনি সে প্রতিক্রিয়া করবে। গাছাপালা, পশুপাখিতে এই প্রতিক্রিয়াটা আরও ভালো বোঝা যাবে। হয়ত তাদের অস্তিত্বটাই নাশ হয়ে গেল। তফাৎ হল ওরা নিউটনের থার্ড ল পুরোপুরি পালন করে। আমাদের মনও স্প্রিংএর মত চলে, কেউ যদি একটা মন্দ কথা আমাকে বলে পাঁচটা কথা তার মুখের উপর শুনিয়ে দেব, দশ খানা কথা ভাবব যে এই কথাগুলোও বললে ভালো হত, আর পনেরটা কথা স্বপ্নে দেখব। ঋষিদের মন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য তাঁকে যদি কেউ কোন কথা বলে তখন উনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন আমার

ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়া হতে শুরু হয়ে গেছে। হয়ত একটা দুটো কথা বলেও দিলেন কিন্তু তিনি সচেতন যে আমি কি বলছি। আমাদের মধ্যে এই সচেতনতা থাকে না, যতক্ষণে একটা কথা ছুড়ছে ততকক্ষণেই একটা কথা প্রতিক্রিয়া রূপে মুখ থেকে চড়াং করে বেরিয়ে আসে। ঋষিরা ধীর স্থির থাকেন, অনেক সময় চুপ থেকে যান। চুপ থাকলেও ভেতরে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যাঁরা পরমহংস, অত্যন্ত উচ্চমানের ঋষি, তাঁদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। একটা পাথর পড়লে ছোট্ট যে একটা তরঙ্গ উঠবে সেটাও তাঁদের হয় না। সাধারণ মানুষের এটাই বৈশিষ্ট্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন জীবের ক্ষমতা নেই যে প্রকৃতি তাকে ধাক্কা মারবে আর সে প্রতিক্রিয়া করবে না। নিউটনের নিয়ম সব জায়গাতে প্রযোজ্য হবে, প্রত্যেক পদার্থে প্রযোজ্য হবে, প্রত্যেক প্রানীর জীবনে প্রযোজ্য হবে। ব্যতিক্রম শুধু একটা জায়গাতেই হয়, যিনি পরমহংস হয়ে গেছেন তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, নিউটনের থার্ড ল সেখানে কোন কাজ করে না।

সব কিছু বলার পর অবধূত বলছেন, বুঝলে রাজন্ এক গুরুতে কখন হয় না, অনেক গুরু লাগে। আমার তো চব্বিশ জন গুরু লেগেছিল সব শিক্ষা পেতে। যদু রাজার মূল প্রশ্ন ছিল, মহাশয়, আপনি তো কাজকর্ম করেন না অথচ আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি প্রচণ্ড জ্ঞানী, এই জ্ঞান আপনি কোথা থেকে পেলেন? অবধূত তখন বলছেন, *ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্। ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।।১১/৯/৩১।।* আমাদের শাস্ত্রের শেষ কথা, অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আছেন। *গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ*, এই জিনিসটাকেই ঋষিরা নানান ভাবে গান করেছেন অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে লাভ করবার বহু পথের কথা বলে গেছেন। ঠাকুর বলছেন ঋষিদের সনাতন ধর্মই থাকবে বাকি সব ধর্ম আসবে যাবে। অনেক মনে করেন বাকি ধর্ম বলতে ঠাকুর খ্রীশ্চান, ইসলাম এইসব ধর্মের কথা বলছেন, কিন্তু তা নয়। তখনকার দিনে ব্রাহ্ম সমাজ এবং আরও যে নানা রকমের মতের কথা বলা হচ্ছিল, ঠাকুর এখানে তাদেরকে নিয়ে বলছেন। বিশ্বে কয়েকটা ধর্ম মূল ধর্ম, যেমন খ্রীশ্চান, ইসলাম, পার্সি, জহুদি এদিকে জৈন, বৌদ্ধ এগুলো মূল ধর্ম। ইদানিং কালে অনেক বলবে আমাদের মতের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনিও ঋষি ছিলেন, যুক্তিতর্ক করতে গেলে তারাও বুঝিয়ে দেবে। আমরা ঐ বিতর্কে যাচ্ছি না। আমরা শুধু পাঁচশ বছর আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ধর্মকেই নিচ্ছি। আজকে সনাতন ধর্ম বলতে আমরা যে হিন্দু ধর্মকে বলছি, এই সনাতন ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরাট তফাৎ আছে। সব ধর্মই এক কথা বলছে, সত্য মানে এটা। একমাত্র হিন্দু ধর্ম বলছে, ঐ সত্যকে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে একরূপতা নেই। জহুদিরা জানে আমরা এক, খ্রীশ্চানরা জানে আমরা এক, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যতই মারামারি করুক কিন্তু কোরানের নামে, আল্লার নামে সবাই আমরা এক। হিন্দুরা কোন দিন কোন কিছুতে গিয়ে এক হবে না। কেন হবে না, তার কারণ এখানে বলছেন *ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ*, আমাদের যে হাজার হাজার ঋষিরা ছিলেন তাঁরা এই অদ্বৈত ব্রহ্মের পরমতত্ত্বকে বলছেন অদ্বয়, ওখানে কোন ভেদ নেই, ওই একটাই আছে। মুসলমানরাও তাই বলছে, ওই এক আল্লাই আছেন, খ্রীশ্চানরাও একই কথা বলছে, God is one, তাহলে তফাৎটা কোথায়? হিন্দুদের কাছে পরমতত্ত্ব যেটা তিনি অনন্ত, ব্রহ্ম মানেই অনন্ত। ওনারা বলে দিলেন তিনি অনন্ত, আল্লা অনন্ত, গড অনন্ত তখন ওটাই পরিভাষা হয়ে গেল। কিন্তু সনাতন ঋষিদের যে পরম্পরা, ঋষিরা কি করলেন, অনন্তকে অনন্ত ভাবে ব্যক্ত করলেন, ফলে সব বর্ণনাগুলো পাল্টে যায়। কিন্তু সব বর্ণনার মধ্যে সেই অনন্তের ভাবটা থেকে যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে যখন বর্ণনা করা হচ্ছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত, যেখানে শ্রীরামচন্দ্রও অনন্ত। দুটো অনন্ত তো কখনই হতে পারে না? এটাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। খ্রীশ্চানরা যখন গডকে নিয়ে বর্ণনা করছে, মুসলমানরা যখন আল্লাকে নিয়ে বর্ণনা করছে, ওনারা ঠিক সেইভাবেই বর্ণনা করছে, যেভাবে বেদে বর্ণনা করা হয়। সমস্যা হল, ওদের একজনই ঋষি, যীশু আর মহম্মদ। যীশু আর মহম্মদ যা বর্ণনা করে দিয়ে গেছেন তার বাইরে আর কিছু হবে না। সেই দিক থেকে নিতে গেলে হিন্দু ধর্ম অনেকগুলো ধর্মে পাল্টে যাবে। কিন্তু হিন্দু ধর্ম জিনিসটাকে সেভাবে দেখে না, ওনাদের বক্তব্য, যাঁরা ব্রহ্মকে জানেন তাঁরা বলেন ব্রহ্মাই কৃষ্ণ হয়েছেন বা কৃষ্ণই ব্রহ্ম হয়েছেন, এগুলো হল দার্শনিক পণ্ডিতদের বিরাট বড় আলোচ্য বিষয়। বেদে যে ব্রহ্মের আলোচনা করা হয়েছে, তিনি অখণ্ড, সেই অনন্তকে বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন ভাবে দেখেছেন, বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন, গান করেছেন। তাই তাঁর ভাব অনন্ত,

একটা পাখির মধ্যেও কেউ সেই অনন্ত ব্রহ্মকে দেখে সাধনা করতে পারে, একটা গাধার মধ্যেও সেই অনন্তকে দেখে গাধারই সাধনা করতে পারে। এতে অবাকেরও কিছু নেই আর ভুলেরও কিছু নেই। এবার যিনি একজন গুরুর কাছে যাবেন, গুরু তাঁকে সেটাই বলবেন যেটাতে তিনি সিদ্ধি পেয়েছেন। কিন্তু পুরো জ্ঞান সেটাতে আসে না। সেইজন্য বলছেন *ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্*, একজন গুরুর কাছ থেকে যদি জ্ঞান নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু জ্ঞান তার পুরো হবে না। ভাগবতের এই শ্লোকটি আমাদের মত করে নিলে তখন হবে, গুরু একজনই হবেন কিন্তু উপগুরু অনেক হতে পারে। কিন্তু ভাগবতের যাঁরা ভাষ্যাদি রচনা করেছেন তাঁদের বক্তব্য হল, নিজের পরিস্কৃত বুদ্ধিটাও লাগাতে হয়। এখানে উপগুরু হল বুদ্ধি। নিজের বুদ্ধি লাগালে সেখান থেকে অনেক শিক্ষা পাওয়া যাবে। কথামৃত পড়ার সময় খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঠাকুরও অনেক জায়গায় বলছেন, অমুক জায়গায় ওরকমটি দেখে আমার এই রকমটি মনে হল। ঠাকুর যখন বলছেন, আমার এই রকমটি মনে হল, তখন ওটাই উপগুরু হয়ে যাবে। এই ধরণের জিনিস আমাদের সবারই হয়, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। যত সাধনা করবে তত তার মন পরিষ্কার হবে, মন যত পরিষ্কার হবে মনের গ্রহণ করার ক্ষমতা তত বাড়বে। মনের গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়লে নানান কথা যে শুনছে, নানান ভাব যে দেখছে, সেখান থেকে সে অনেক কিছু শিক্ষণীয় জিনিস গ্রহণ করতে পারবে। গুরু সব সময় যে শিক্ষা দেন, ওই শিক্ষাটা হল পরমতত্ত্বের শিক্ষা। জগৎ চালানোর শিক্ষা গুরু কোথা থেকে দেবেন! যেমন ঠাকুর বলছেন, অনন্ত আকাশ, পাখি উড়ে যাচ্ছে। তার মানে, তার কোন শেষ নেই যত জ্ঞান লাভ করবে তত সে জিনিসটাকে দেখতে পারবে। সোনা জিনিসটাকে জানতে হলে আমি যদি একজন রসায়নবিদের কাছে যাই বা একজন সুবর্ণকারের কাছে গিয়ে সোনা দেখে নিলে জেনে যাব সোনা কাকে বলে। কিন্তু সোনা দিয়ে কত রকমের গহনা বানানো যেতে পারে তার ইতি করা যাবে না। ঠিক তেমনি গুরুর কাছে পরমতত্ত্বটা জেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ঐ পরমতত্ত্বের যে বিভিন প্রকাশ এই সংসারে আমরা দেখছি, এই প্রকাশের ইতি করা যায় না। ঐ জিনিসটাকে জানার জন্য আমাদের একাধিক গুরুর প্রয়োজন। অনেক গুরুর কাছে গেলে ঠিক সেভাবেও শিক্ষা পাওয়া যাবে না, শেষ পর্যন্ত নিজের ভেতর থেকেই শিক্ষাটা আসে, তার জন্য দরকার পরিশ্রুত মন, মন যত পরিষ্কার হবে, মন যত বিস্তার লাভ করবে, মন থেকে তত শিক্ষা পাওয়া যাবে। এটাই এই অধ্যায়ের, অবধূত গীতার শেষ কথা। আমার কত গুরু ছিল, কোন কোন গুরুর কাছ থেকে কি কি শিক্ষা পেয়েছি আমি তোমাকে বলছি। এই হল অবধূতের চব্বিশ গুরুর মূল তাৎপর্য।

সেইজন্য মানুষকে সব সময় পরমার্থ সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। পরমার্থ সাধনের জন্য চাই উন্নতমানের প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ মানুষ কোথায় পাবে? তার নিজের ভেতর থেকেই সে শিক্ষা পাবে। সব সময় সজাগ ও সচেতনতার দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে তাকালেই পরমার্থ সাধনের অনেক রসদ পেয়ে যেতে পারে। দত্তাত্রেয়র মধ্যে এই স্বচ্ছ ও সজাগ দৃষ্টি ছিল বলেই তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এটাই হল চব্বিশ গুরুর মূল কথা।

এবার আস্তে আস্তে যদুবংশ বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখন উদ্ধভ, উদ্ধভকে আমরা দেখেছিলাম, তিনি গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ নিয়ে ব্রজে এসেছিলেন। উদ্ধভ শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশ নিয়ে গোপীদের কাছে গিয়ে গোপীদের বোঝাচ্ছেন, আর বিখ্যাত ভ্রমরগীতও ঐ সময়েই হয়েছিল। সেই উদ্ধভ এখন কিছু প্রশ্ন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে বলছেন 'প্রভু, আমি জানি আপনি এবার মর্ত্যধাম ছেড়ে চলে যাবেন, কিন্তু প্রভু! আমাদের জন্য আপনি কি আদেশ রেখে যাচ্ছেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন'। খালিজ ইব্রাহম একজন খুব বড় কবি ছিলেন, ওনার 'The Prophet' বইতে ঠিক এই রকম একটা বর্ণনা আছে, এক দেশে এক বিরাট প্রফেট ছিলেন, তিনি সেই দেশ থেকে জাহাজে করে চলে যাচ্ছেন, সেই সময় লোকেরা এসে বলছে 'আপনি তো চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আমাদের আপনি কিছু উপদেশ দিয়ে যান'। উদ্ধবও ঠিক সেই রকম বলছেন 'হে প্রভু, আপনি তো চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে আমাকে কিছু শেষ উপদেশ দিয়ে যান'। তখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে বলতে শুরু করে প্রথমে অবধূতের এই কাহিনী বললেন।

<u>বদ্ধ, মুক্ত ও ভক্তের লক্ষণ</u>

দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সংসারে যত রকম ভোগ্য সামগ্রী আছে সবই কি রকম অসার সেই ব্যাপারে কিছু কথা বলছেন, সেই আলোচনায় না গিয়ে আমরা সরাসরি একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের আলোচনায় যাচ্ছি। তিন ধরণের মানুষকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, একদিকে যারা পুরো সংসারে বদ্ধ, অন্য দিকে যাঁরা পুরো মুক্ত আর মাঝখানে ভক্ত, এই তিনটে শ্রেনী করেছেন। এদের কি কি লক্ষণ বলছেন। ভক্ত হল যারা লড়াই করছে, বদ্ধ হল যারা সংসারে থেকে বলছে বেশ আছি, মুক্ত মানে যিনি এই দুটোর পারে চলে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ। গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্।।১১/১১/১।।* 'পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখলে বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই। আর যদি গুণ রূপে দেখা হয়, গুণ মানে সত্ত্ব, রজো ও তমো, তখন যা কিছু আছে সবই মায়ার উপাধিতে হয় কিন্তু তত্ত্বের দৃষ্টিতে এগুলো কখনই হয় না। সেইজন্য আমার (শ্রীকৃষ্ণের) না আছে মোক্ষ, না আছে আমার বন্ধন'। আমরা প্রায়ই বলি জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ করা, মোক্ষ প্রাপ্তি করা। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে বা ঠিক ঠিক বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তখন বলবে, বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই। বন্ধনটাও মায়ার মধ্যে আর মুক্তিটাও মায়ার মধ্যে। যিনি মুক্ত তিনিও দেখেন না আছে বন্ধন, না আছে মুক্তি। কথা প্রসঙ্গে একদিন গিরিশ ঘোষ স্বামীজীকে বলছেন 'বন্ধন তো মায়ার, এই যে তোমাদের সেবাকার্য সবই তো মায়ার'। স্বামীজী তার উত্তরে বলছেন 'মুক্তিটাও তো মায়ার'। স্বামীজী কথা প্রথমের দিকে যাঁরা পড়বেন তাঁরা বুঝতে পারবেন না স্বামীজী কি বলতে চাইছেন। আমরা যে ভোগের মধ্যে আছি, খাওয়া-দাওয়া করছি, এটা সেটা চাইছি, নানা রকমের আমোদ আহ্লাদ করছি, এটাই বদ্ধ জীবের লক্ষণ। আর মুক্তি মানে ঈশ্বরের জ্ঞানে লীন হয়ে যাওয়া। এগুলো খুব প্রচলিত ধারণা। সেইজন্য বলছেন যেখানেই কার্য সেখানেই মায়া। সেবাকার্য, রোগীর সেবা করা, মানুষের সেবা করা এগুলোও কাজ, তাই এগুলোও মায়া। এটা আমাদের পরম্পরার খুব পুরনো আলোচনা। আচার্য শঙ্কর যেখানে কর্ম আদিকে নিয়ে আলোচনা করছেন সেখানেও তিনি বার বার বলছেন কর্ম মানে মায়া। স্বামীজী সেবাকার্যের প্রচলন করলেন, আর বললেন সেবার দ্বারাও মুক্তি হয়। অনেকে তখন বলতে শুরু করলেন সেবা দিয়ে কি করে মুক্তি হবে, কারণ সেবাটাও একটা কর্ম, কর্ম মানেই বন্ধন, মানে মায়া। তখন স্বামীজীও বলছেন, মুক্তিটাও তো মায়া। যে কোন মানুষের পক্ষে এটাকে ধারণা করা খুব কঠিন। বন্ধন বা ভোগ মানেই মায়া, মায়া মানে মনের এলাকার, মুক্তিটাও কিন্তু মনেরই। কিন্তু যিনি পরমহংস তিনি দেখেন মুক্তি বলে কিছু নেই, বন্ধন বলেও কিছু নেই। গীতাতে মায়া জিনিসটা কি, বন্ধন জিনিসটা কি এই নিয়ে যেখানে জোর যুক্তিতর্ক চলছে তখন সেখানেও বলা হচ্ছে, এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ বন্ধনটা মনের একটা অবস্থা। ঠিক তেমনি মুক্তিও মনেরই একটা অবস্থা। আচার্য গীতার ভাষ্য রচনার সময় জানতেন যে এই প্রশ্ন আসবে আর এর উত্তর দেওয়া যাবে না, মায়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি বন্ধনকেও ব্যাখ্যা করা যায় না, মুক্তিকেও ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা করা না যাওয়ার একটাই কারণ, তিনটেই মনের এলাকার। সেইজন্য যিনি মনের এলাকাকে অতিক্রম করে চলে গেলেন তখন তিনি দেখেন মায়াও নেই, বন্ধনও নেই আর মুক্তিও নেই। বন্ধনটাও মিথ্যা, মুক্তিটাও মিথ্যা।

বেদান্ত সব সময় যুক্তি দিয়ে চলে, সেখানে কোন ইমোশানের খেলা নেই। মুক্তি যদি সত্য হয় তাহলে বন্ধনটাও সত্য। একজনের হাতে একটা হাতকড়া পড়া আছে, এটা সত্যি না মিথ্যা? একটা সম্ভবনা থাকতে পারে, সে কল্পনা করে নিয়েছে আমি হাতকড়া পড়ে আছি, স্বপ্নে যেমন দেখে। আরেকটা সম্ভবনা হতে পারে, সত্যিই হাতকড়া পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্যিকারের যদি হাতকড়া পড়ে থাকে তাহলে আজ যদি মুক্তি হয়ে যায় তাহলে আগামীকাল আবার হাতকড়া পড়তে পারে। আজ যাকে পুলিশ আটক করেছে, দুদিন পর ছাড়া পাওয়ার পর আবার তাকে ধরতে পারে। কিন্তু স্বপ্নে যদি হাতকড়া পড়ে, স্বপ্ন ভেঙে গেলে হাতকড়াটাও চলে গেল, তার তো হাতে কখনই হাতকড়া ছিল না। এই যুক্তির উপর আলোচনা চলার সময় আচার্য দেখান বন্ধন কখনই সত্যি হতে পারে না। কারণ বন্ধন যদি সত্যি হয় তাহলে মুক্তি হয়ে গেলে আবার বন্ধনে পড়ার সম্ভবনা থাকবে। বন্ধনটা যদি সত্যি না হয় তাহলে মুক্তিটা কিভাবে সত্যি হবে! অন্ধকারে একটা দড়ি দেখে মনে করলাম একটা সাপ। আলো নিয়ে এসে দেখছি সাপ নয় দড়ি। বাড়ির লোকেরা বলেই যাচ্ছে, সাপটাকে মেরে

দিয়েছ তো? আমি এর কি উত্তর দেব? এগুলোকে ধারণা করা খুব কঠিন। সেইজন্য বেদান্ত সবার জন্য নয়, অনেক দিন লেগে থাকতে থাকতে তখন এগুলো ধারণা হতে শুরু হয়। শাস্ত্রের দুটো কথা শুনে, কথামৃত পড়ে মুক্তি, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, এই কথাগুলো শুনে নিয়েছি, কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো এখন শব্দমাত্র, আমরা এর কিছুই বুঝি না। বন্ধনটাও মনের, মুক্তিটাও মনের, মনের মানে মায়া। বন্ধনও মায়ার জগতের, মুক্তিও মায়ার জগতের। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্*, আমার বাপু বন্ধনও নেই, মোক্ষও নেই। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এটাকে বার বার নিয়ে এসেছেন যাতে মানুষ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ব্যাপারটা বুঝতে পারে। যেমন বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, আমার কর্মও দিব্য আমার জন্মটাও দিব্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মও নেই মৃত্যুও নেই, তাঁর বন্ধনও নেই মুক্তিও নেই। যে নিজেকে বদ্ধ মনে করে সে চিরদিনই বন্ধনে থাকে আর যে নিজেকে ঠিক ঠিক মুক্ত মনে করে সে দেখে তার বন্ধন কখনই ছিল না। আমাদের মধ্যে যে মুক্তির একটা বিচিত্র ধারণা হয়ে আছে, এই ধারণাটা এসেছে খ্রীশ্চান আর মুসলমান ধর্ম থেকে, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, স্বর্গে নানান রকমের ভোগ করবে, সেই মুক্তির বিরাট আনন্দ। এই ধারণা গুলো ভুল ধারণা। একটা আনন্দ হতেই পারে, কারণ স্বপ্নে দেখছিলাম একটা বাঘ আমাকে তাড়া করেছে, স্বপ্নটা ভেঙে গেল, দেখছি বাঘও নেই, কোন তাড়াও নেই, আমি যা ছিলাম তাই আছি, তাতে একটা আনন্দ অবশ্যই হবে। কিন্তু বাঘ কখনই ছিল না, আর কেউ আমাকে তাড়াও করছিল না, ঠিক তেমনি আমার মুক্তিও হয়নি আর কোন বন্ধনও ছিল না।

দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন *শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নো যথাহহত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী।।১১/১১/২।।* স্বপ্নে কিছুই হচ্ছে না, আমি ঘুমিয়ে আছি, ঘুমের মধ্যে আমার মনে একটা জগৎ ভাসছে, ওর মধ্যেই আমি মানুষ হয়েই সব করে যাচ্ছি। ঠাকুরকে একজন বলছেন, আমি এই রকম স্বপ্ন দেখলাম। ঠাকুর বলছেন, আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে, তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও। এই জিনিসগুলো কিন্তু তার মনে ভাসছে, কোথাও কোন বাস্তবিকতা নেই। অনেক বলবেন, স্বপ্নও তো অনেক সময় মিলে যায়। সেটা আলাদা কথা, এখানে আলোচনটা তা নয়। স্বপ্ন মিলুক আর নাই মিলুক, স্বপ্নে তো কোন বাহ্যিক বস্তু নেই, যা কিছু হয় মনের ভেতরেই হয়। ঠিক তেমনি শোক-মোহ বা জন্ম-মৃত্যু আর সুখ-দুঃখ, এই ছয়টিকে এনারা খুব জোর দিচ্ছেন, এগুলো স্বপ্নেও ঘুরে ঘুরে আসে। যদিও গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর শোক আর মোহের উপর বেশি জোর দিয়েছেন, কিন্তু গীতা নিজে জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখকে নিয়েও বলছেন আর তার সাথে শীত-উষ্ণ নিয়েও বলছেন। কিন্তু ভাগবত এই ছয়টিকে নিয়ে বলছেন, শোক-মোহ, জন্ম-মৃত্যু আর সুখ-দুঃখ, সবই মায়ার খেলা। উপমা স্বপ্নের, মায়াটা স্বপ্নবৎ নয়, স্বপ্নে বাহ্যিক কোন কিছু না থাকা সত্ত্বেও পুরো একটা নগরীকে তৈরী করে নেয়, তার মধ্যেই হাসি, কান্না, খেলা সব কিছু চলছে। ঠিক তেমনি এই যে মায়ানগরী, এখানেও সব কিছুকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সবটাকেই আমাদের সত্য বলে মনে হচ্ছে, এর একটা বাস্তবিক সত্তা আছে কিন্তু বস্তুগত সত্তা নেই। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, যদি জানতাম জগৎ সত্য তাহলে কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতাম। সত্যের পরিভাষা কি দিচ্ছেন? দেশ, কাল ও বস্তুতে অপরিচ্ছিন্ন। যে কোন জিনিসকে সত্য তখনই বলা যাবে যখন যে জিনিসটা দেশ, কাল ও বস্তুতে অসীমিত। যা কিছু বস্তুকে আমরা জানি সবই সীমিত। একটা জায়গায় আছে আরেকটা জায়গায় নেই, একটা সময় আছে আরেকটা সময় নেই আর একটা জিনিসে আছে আরেকটা জিনিসে নেই, এই জিনিস গুলিকেই মিথ্যা আখ্যা দিচ্ছেন। আমরা বলব, জগতে সব জিনিসই তো তাই, জগতে কোন জিনিস আছে যেটা এই তিনটের বাইরে? মেয়েরা সোনা ভালোবাসে, সোনার গয়নার একদিন জন্ম হয়েছে, স্বর্ণকার গয়না বানিয়েছে, তার আগে ছিল না, এতেই তো সোনার গয়না মিথ্যা হয়ে গেল। সোনা আবার অন্য জিনিসে নেই, সোনা কাঁচের মধ্যে নেই, তার মানে এটা মিথ্যা হয়ে গেল। আমেরিকার এক মহিলা স্বামীজীকে বলছেন, আপনি ব্রহ্মের কথা, আত্মার কথা বলছেন, কিন্তু আমার সোনার গয়না, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে সেই আত্মাকে দেখছি। স্বামীজী বলছেন, তাই দেখতে থাকুন, হাজার হাজার জন্ম ধরে দেখতে থাকুন, তারপর একটা সময় জীবনে দুঃখ-কষ্টের ঝড় আসবে, সেই ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে তখন ঐদিকে যাবেন।

এনারা তাই বলেন, প্রথমে দেখ তুমি শান্তি চাও কি চাও না? তুমি স্থৈর্য চাও কি চাও না? যদি চাও তাহলে অনিত্যকে ছাড়ো। অনিত্য কোনটা? যেটা দেশ, কাল আর পাত্র এই তিনটে জিনিসে সীমিত। তাহলে কি আমার গয়না, বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সব ছেড়ে দেব? না, তোমরা ছাড়তে পারবে না। এখানে এসেই যাঁরা ধুর্ত মহাত্মা তাঁরা নিজের ধান্দাটা খুব ভালো করে চালিয়ে নেয়। তোমার কাছ থেকে সব টেনে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। প্রথমেই তাই যে জিনিসগুলো একেবারেই দরকার নেই সেই জিনিসগুলোকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু যেগুলো ছাড়া আমাদের জীবন চলবে না, অসুস্থ হলে ওষুধ লাগবে, ওষুধের জন্য টাকা লাগবে, আগামীকাল আমাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, কোথা থেকে তুমি টাকা পাবে, তুমি তো আর সন্ন্যাসীর মত ভিক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে জেনে নিতে হবে এগুলো কোনটাই বাস্তবিক জিনিস নয়। তোমার মন যখন ঈশ্বরের দিকে পুরোপুরি চলে যাবে তখন আর তুমি কোন দিকে তাকাবে না, তখন দেখবে যারা তোমার আশেপাশে আছে তাদের তো তখনও এই বোধ আসেনি, তাদের জন্য করবে। ঠাকুর নিজে ঐ পরমহংস অবস্থায় আছেন কিন্তু তার মধ্যেও তিনি শ্রীশ্রীমায়ের খবর নিচ্ছেন, তুমি কটি রুটি খাও। মা লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। সেখান থেকে ঠাকুর হিসাব করছে, ঐ কটি রুটি খেলে কত আটা লাগবে, সেই আটার জন্য মাসে কত টাকা লাগবে। ভাবসমাধিতে দেখছেন মা সীতার হাতে একটা ডায়মণ্ড কাটা বালা, ঠিক সেই রকম বালা মায়ের জন্য গড়িয়ে দিচ্ছেন। এতে কোন দোষ নেই। আসল তত্ত্বটা জানতে হবে আর সেটাতে তোমাকে স্থির হতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বাপু তুমি বোঝ, স্বপ্নে দেখা কোন বস্তুরই আধার নেই, আধারটা কি, আধার হল মন। ঠিক তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুত কোন সত্যতা নেই, এটাও ঠিক ঐ ভাবে বস্তু শূন্য। এখন যিনি এই জিনিসটাকে জেনেছেন তিনি এটাকে এই ভাবে দেখছেন, যিনি জানেননি তাঁর পক্ষে এভাবে দেখা সম্ভব নয়।

তৃতীয় শ্লোকে বলছেন *বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুব শরীরিণাম্। মোক্ষবন্ধকারী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে।।১১/১১/৩।।* 'যারা শরীরি তাদের মধ্যে দুটো জিনিস কাজ করে – বিদ্যা আর অবিদ্যা। বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুটো আমারই সৃষ্টি। বিদ্যা মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়, অবিদ্যা সংসারের দিকে নিয়ে যায়'। সংসারে দুটি শক্তি চলে, বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, অবিদ্যাশক্তি সংসারের দিকে নিয়ে যায়। মোক্ষের দিকে যেটা নিয়ে যায় সেটাও ঈশ্বরের আর সংসারের দিকে যেটা নিয়ে যাচ্ছে সেটাও ঈশ্বরের। অন্যান্য ধর্মে ভালো আর মন্দ দুটি সত্তাকে গ্রহণ করা হয়, হিন্দু ধর্মে দুটি সত্তা হয় না। ভালো আর মন্দ দুটো আলাদা সত্তা বলে কিছু নেই, সত্তা শুধু ঈশ্বরের রয়েছে, ভালোটাও তাঁর মন্দটাও তাঁর, বিদ্যাটাও তাঁর অবিদ্যাটাও তাঁর, সুখও তিনি দেন দুঃখটাও তিনি দেন। অন্যান্য ধর্মও মানছে কিন্তু কোথাও কোথাও তারা শয়তানকে নিয়ে আসে, খারাপ জিনিসগুলো যেন শয়তান দিচ্ছে। সেদিক থেকে ইসলামের দর্শন অতটা খারাপ না, তারা বলে সব আল্লার ইচ্ছা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বিদ্যাটাও আমার আর অবিদ্যাটাও আমার। তার সাথে বলছেন, *মোক্ষবন্ধকারী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে*, বিদ্যা আর অবিদ্যার নির্মাণ আমিই করেছি, একটা সংসারের দিকে নিয়ে যায় আরেকটা মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সারা জীবনে আনন্দ খুঁজে বেড়ায়, আনন্দ সব থেকে সহজে সংসারে পাওয়া যায়, কিন্তু সংসার থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দ ক্ষণিকের। সংসারে আনন্দ না পেলে তখন মানুষ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। এগুলো করেও একদিন যখন দেখে আনন্দকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, তখন সে চিরস্থায়ী আনন্দের অনুসন্ধান করে। যতক্ষণ মনে করছে আমি বেশ আছি ততক্ষণ ধর্ম ভাব আসবে না। তাদের জন্য এই জিনিসগুলো নয়, বোঝাতে গেলেও তারা শুনতে চাইবে না। কারণ মানুষ মাত্রই সুখ খোঁজে, আনন্দ পেতে চায়, যতক্ষণ সংসারেই সুখ, আনন্দ পেয়ে যায় ততক্ষণ কেন সে এদিকে আসতে চাইবে। যেমন দুধের থেকে মাছিকে তুলে ফেলে দেয়, বৃদ্ধ বয়সে সংসার থেকে যখন তুলে ফেলে দেবে তখন কাঁদবে আর সবাইকে বলবে আমার ছেলে, পুত্রবধূ এরা কেউ আমাকে দেখে না। বয়স থাকতে, সামর্থ থাকতে প্রস্তুতি নেয়নি। সময় থাকা সত্ত্বেও জপধ্যানের দিকে মন দেয়নি, সময় থাকতেও শাস্ত্র পাঠে আগ্রহ আনতে পারেনি, এখন আর কিছু করার নেই।

মুক্তি আর বন্ধনকে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে উদ্ধবকে বলছেন, *একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে। বদ্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ।।১১/১১/৪।।* হে উদ্ধব! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি

নিজেই বিচার করে দেখ জীব সেই একই, বস্তুত সে আমারই স্বরূপ। কিন্তু আত্মজ্ঞান হলে তাকে মুক্ত বলে আর আত্মজ্ঞান না হলে তাকে বদ্ধ বলে। মুক্ত মানে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন আর বদ্ধ মানে আত্মজ্ঞানের অভাব। যার আত্মজ্ঞানের অভাব তার হয়ত সংসার জ্ঞান আছে, ফিজিক্সের জ্ঞান আছে, অঙ্কের জ্ঞান আছে কিন্তু আত্মজ্ঞানটা নেই। আত্মজ্ঞান যেমনি হয়ে গেল তাঁকেই আমরা মুক্ত বলি। আত্মজ্ঞান মানে নিজেকে জানা। মানুষ সব কিছুর জ্ঞান পেয়ে যায় নিজের জ্ঞানটা পায় না।

বদ্ধ ও মুক্তের কি ভেদ? *অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণং বদামি তে। বিরুদ্ধধর্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্মিণি।।১১/১১/৫।।* বদ্ধ আর মুক্তের দুই প্রকার ভেদ। প্রথম ভেদ ঈশ্বর আর জীবের ভেদ আর দ্বিতীয় ভেদ, মুক্ত আর বদ্ধ জীবের ভেদ। তৃতীয় আরেকটি ভেদ হয়, যদিও এখানে নেই, বদ্ধ জীব আর বদ্ধ জীবের ভেদ। যে কোন জীবের এই তিন প্রকার ভেদ হয়, বদ্ধ জীব ও বদ্ধ জীবের ভেদ, যেমন আমার আপনার সাথে একটা ভেদ আছে, বদ্ধ জীবের সাথে মুক্ত জীবের ভেদ আর বদ্ধ জীবের ঈশ্বরের সঙ্গে ভেদ। এখানে বদ্ধ, ভক্ত আর মুক্তের যে লক্ষণের কথা আলোচনা করছেন, প্রথমেই বলে দিচ্ছেন, এই দুই প্রকার ভেদ, যদিও ভাগবতে দুই প্রকার ভেদের কথা বলছেন। বদ্ধ জীব আর বদ্ধ জীবের ভেদ এতই স্বাভাবিক যে লোকেরা বুঝতে পারে বলে এখানে তাই আর আলোচনা করছেন না।

মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রে এরই উপমা দিয়ে বলছেন *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*। অশ্বত্থ বৃক্ষকে অনেক সময় সংসারের উপমার জন্য নেওয়া হয় আবার অনেক সময় দেহের উপমার জন্যও নেওয়া হয়। এই দেহরূপী বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে, একটা ঈশ্বররূপী পাখি আরেকটা জীবরূপী পাখি। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, একটা বৃক্ষে দুটি পাখি আছে। প্রথম পাখিটি গাছের একেবারে উপরে বসে আছে, দেখতে খুব সুন্দর। নীচের পাখিটিও খুব সুন্দর, সেইজন্য বলছেন *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*, তাদের শরীর, পালক সব কিছুই অতি সুন্দর। তফাৎ হল, নীচের পাখিটি ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, যখন মিষ্ট মধুর ফল ভক্ষণ করে তখন খুব আনন্দ পায়, যখন কটু ফল খায় তখন সে বিষন্ন হয়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে তখন ঐ ডাল ছেড়ে উপরের ডালে গিয়ে বসে। সে উপরের পাখির দিকে তাকিয়ে দেখে ওর মধ্যে কোন বিকার নেই, নির্বিকার চিত্তে গাছের একেবারে উপরে বসে আছে। কারণ সে এই বৃক্ষের কোন ফলই ভক্ষণ করছে না। নীচের পাখিটি কটু ফল খেয়ে বিরক্ত হয়ে যায়, আবার তার খিদে পায় তখন আরেকটা ফল খায়, খেয়ে দেখে ফলটা মধুর। আবার সে কিছুক্ষণ আনন্দে থাকে। ফল খেতে খেতে আবার একটা তিক্ত ফল খেল তখন আবার উপরের দিকে উঠে যায়। এই করতে করতে সে উপরর দিকে উঠতে থাকে। উপরের পাখিটিকে সে সব সময়ই দেখছে, তার না আছে শোক, না কোন মোহ, সব সময় আনন্দে ভাসছে। নীচের পাখিটি শেষে যখন উপরে চলে যায় তখন দেখে এই নীচের পাখিটাই উপরের পাখি ছিল, দুটো আলাদা কিছু ছিল না। নীচের যে পাখি এটাই কল্পনা, উপরের পাখিটাই সত্য। মুণ্ডকোপনিষদের এই উপমাটা স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। এর অন্য উপমাও নেওয়া যেতে পারে। আকাশে সূর্য আছে, আয়না দিয়ে সূর্যকে যদি দেওয়ালে প্রতিবিম্বিত করা হয়, তখন দেওয়ালেও সূর্যকে দেখা যাবে। আয়নাকে নাড়ালে সূর্যটাও নড়বে, আসল সূর্য স্থির কিন্তু এই সূর্যটা নড়ছে। ঠিক তেমনি ঈশ্বর সেই উপরে, আমাদের যে মন, এই মনে যখন তিনি প্রতিবিম্বিত হন তখন তিনি জীব রূপে ভাসমান হন। ঐ জীবই সংসারের নানা রকমের দৃশ্যের মধ্যে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে গিয়ে জীব ঐ দৃশ্যের সাথে নিজেকে একাত্ম করে জড়িয়ে নেয়। জড়িয়ে নিতেই তার মধ্যে হাসিকান্না শুরু হয়ে যায়, হাসিকান্না চলতে চলতে এমন কোন একটা কিছু হয়ে গেল যাতে ঐ মনকেই ভেঙে দেওয়া হল, আয়নাটাই ভেঙে দেওয়া হল। তখন কি হবে? কিছুই হবে না, আয়না ভেঙে গেলে সূর্যের কিছুই হবে না, সূর্য কখনই আমাদের ঘরে ঢোকেনি, কোন ভোগও করেনি, যেমন ছিল তেমনই আছে। মাঝখান থেকে আয়নাটা লাফাচ্ছে, আয়নার ঐ নাচানাচির জন্য কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। আমি আপনি হলাম ঐ আয়নাতে প্রতিবিম্বিত সূর্য, যে প্রতিবিম্ব জগতের দেওয়ালের উপর ঘুরছে, এই সুখ পাচ্ছে, এই দুঃখে ভেসে যাচ্ছে, এই কান্না, এই হাসি। এই করতে করতে কোন এক সময় গুরুর দেখা মিলল, গুরু আমাকে বোঝালেন, গুরুর নির্দেশে সাধনা শুরু করলাম। সাধনা করতে করতে একটা সময় মনকে অতিক্রম করে বেরিয়ে গেলাম। তখন দেখছি, আরে! আমি তো এর মধ্যে কখনই ঢুকিনি, আমার কিসের মুক্তি,

আমি তো সেই আকাশের স্থির সূর্য, আমি সূর্য ছিলাম এখনও আমি তাই। এটাই আত্মজ্ঞান, এটাই মুক্তি। এটাকেই শ্লোকে উপমা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বোঝাচ্ছেন, দেহরূপী বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করছে, এক ঈশ্বর আরেকটি জীব। জীব দেহের মধ্যে নানান সুখভোগ, দুঃখভোগ করে যাচ্ছে, ঈশ্বর তিনি কোন কিছুই করেন না।

ঠাকুর একদিন নিজের শরীরের দিকে ইশারা করে বলছেন, এর ভেতরে এক তিনি আছেন আর তাঁর ভক্ত আছে, ভক্তেরই লেগেছে। সেই সময় ঠাকুরের হাত ভেঙে গিয়েছিল, হাতে প্লাস্টার করা ছিল। একদিকে এই কথা যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী কথা যেখানে আমি বোধ আছে আর অন্তর্যামীর বোধ আছে, ঈশ্বরই সব কিছু করাচ্ছেন। কারণ অদ্বৈতে তিনি ছাড়া কিছু নেই। অন্য দিকে এটাই বাস্তবে হতে দেখা যাচ্ছে। ঠাকুরও সেখানে বলছেন না যে, আমি আগে এই রকম দেখতাম আর এখন অন্য রকম দেখি। তিনি বলছেন, এই রকমই আছে। এটা একেবারে বাস্তবিক, মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতার দিকে এগোতে শুরু করে, সেখান থেকে সাধনা করে করে একটা ধাপে এসে দেখে যে দুটো এক। ঠাকুর যেমন বলছেন তাঁর ভক্তেরই লেগেছে, ঠিক সেই রকম বলছেন, এই বৃক্ষে যে দুটি পাখি, এর বিলক্ষণ স্বভাব হল, ঈশ্বর অভোক্তা তিনি ভোগ করেন না কিন্তু তিনি নিজের স্বরূপকেও জানেন, জগতকেও জানেন। জগতকে জানছেন মানে অপরকেও জানছেন। যিনি অন্তর্যামী(ঈশ্বর) তিনি নিজের স্বরূপকেও জানেন জগতকেও জানেন কিন্তু জীব নিজের স্বরূপকেই জানে আর নিজের ছাড়া আর কাউকেই জানতে পারে না। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।* আমি ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সব জানি কিন্তু আমাকে কেউ জানতে পারে না। যার ফলে ঈশ্বর হলেন নিত্যমুক্ত আর জীব নিত্যবদ্ধ। জীব চিরন্তন ভাবে বদ্ধ, মুক্তি তার হবে না। পরে আবার ব্যাখ্যা করবেন যখন মুক্ত হয়ে যায় তখন দেখে বন্ধন তার কখন ছিলই না। জীব শব্দ যেমনি এসে গেল, এর আর কোন দিন মুক্তি হবে না। যেমনি জীবের মুক্তি হয়ে গেল তখন সে দেখে, আরে! আমি তো কখনই বন্ধনে ছিলাম না। ঠাকুর বলছেন, যে নিজেকে সব সময় পাপী পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়, যে নিজেকে বদ্ধ মনে করে সে বন্ধনেই থাকে, যে নিজেকে মুক্ত মনে করে সে মুক্ত হয়ে যায়, দেখে যে আমার কোন দিন বন্ধন ছিল না। বন্ধন, মুক্তি এগুলো সব অজ্ঞানের কথা। একমাত্র অন্তর্যামী যিনি তিনিই সব দেখেন, সব জানেন, নিজের স্বরূপকেও জানেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও জানেন।

একটা মানুষ কতটা উন্নত বোঝা যায় তার আত্মকেন্দ্রিকতা কত বেশি, যে যত বেশি আত্মকেন্দ্রিক সে তত ঈশ্বর থেকে দূরে। পশুপাখি, পোকামাকড় এরা নিজের অস্তিত্বটুকু ছাড়া আর কিছু জানে না, আহার, নিদ্রা, মৈথুন এই তিনটে ছাড়া আর কিছু জানে না। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঠাকুর যখন জিজ্ঞেস করলেন জীবনের উদ্দেশ্য কি, বঙ্কিমবাবু একটু মজা করেই বললেন আহার, নিদ্রা আর মৈথুন। কিন্তু ঠাকুর যে এত উচ্চ আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ তিনি বুঝতে পারেননি। কারণ আধ্যাত্মিক পুরুষকে চেনা সবার পক্ষে সম্ভব না। ঠাকুর তখন তৎকালীন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক তার উপর তখনকার দিনের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁকে বলছেন, তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। বঙ্কিমবাবু কিছু ভুল বলছেন না। কারণ জীব, যারই মধ্যে প্রাণ আছে, প্রানী মাত্র এই তিনটেকে নিয়েই বেঁচে থাকে। যেখানে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনই মূল সেখানেই হল আত্মকেন্দ্রিক হওয়া। সেই মানুষই যখন আধ্যাত্মিক পথে যেতে শুরু করে তখন শেষে আত্মাকেন্দ্রিত হয়ে যায়। আত্মকেন্দ্রিক থেকে আত্মাকেন্দ্রিত হয়ে যাওয়া, আত্মকেন্দ্রিক মানে কাঁচা আমিকে কেন্দ্র করে জীবন চলছে, আর আত্মাকেন্দ্রিক মানে আত্মাই সব কিছু হয়েছেন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। আত্মাকেন্দ্রিক জীবন হয়ে গেলে পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পূর্ণ জ্ঞানের দিকে যত এগোয় অপূর্ণ জ্ঞান তত কমে। আমি বলতে যে দেহ-মনের সংঘাত মনে করছি, এটাই আমি বোধের সৃষ্টি করে। এই আমি বোধটাই পশুপাখি থেকে শুরু করে মানুষ সবাইকে চালাচ্ছে। কাঁচা আমির বোধ যত কমে পাকা আমির বোধ তত বাড়ে। ভোগ যে ভাবেই আসুক, দেহসুখ, ইন্দ্রিয়সুখ, সম্মানসুখ, বুঝতে হবে তার এখনও অনেক দেরী। ঠাকুর বলছেন, যে ঈশ্বরের পথে এগোতে শুরু করে প্রথমে তার সংসারের প্রতি আকর্ষণটা কমে যায়। ঠাকুর বলছেন, নিজের সম্বন্ধীদের বিষধর সাপের মত মনে হয় আর সংসারকে পাতকুয়া মনে হয়। দ্বিতীয় ধাপে নিজের যে দেহ এত প্রিয় সেই দেহের প্রতিও আসক্তি চলে যায়, এই দেহের সাহায্য নিয়ে আমাকে এগোতে হবে, তাই একে ট্যাক্স দিতে হবে, যেটুকু না হলে চলবে না সেই

খাওয়াটুকু দিয়ে দেওয়া, এর বেশি কিছু না। আর শেষে যায় ধর্ম, তখন আর এত জপ করতে হবে, এই নিয়মে পূজা উপাচার করতে হবে, তীর্থ না করলে চলবে না, এই জিনিসগুলো খসে পড়ে যায়। সব থেকে বড় হল কর্তব্যবোধ, কর্তব্যবোধটাই ধর্ম, এই কর্তব্যবোধটা চলে যায়, ঈশ্বরকে ভালোবাসা ছাড়া আমার আর কোন কর্তব্য নেই। যতক্ষণ মানুষ ধর্ম, অর্থ আর কামের মধ্যে ঘোরে ততক্ষণ সে নিজেকে শুধু জানে। যখন কাম কমে যায়, অর্থের ইচ্ছা কমে, ধর্মের পারে চলে যায়, তখন তার জ্ঞানরাশি বৃদ্ধি পায়। এইভাবে এগোতে এগোতে একটা জায়গায় এসে সে পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে আমিত্বের পুরোপুরি নাশ হয়ে যাওয়া।

আরেকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ খুব মজার কথা বলছেন *দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ। অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা।।১১/১১/৮।।* যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে তিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান। ঘুম ভাঙার পর স্বপ্নে যে তার শরীর ছিল সেটার সাথে যেমন তখন আর কোন সম্পর্ক থাকে না, স্বপ্নের কথা ভাবলে তখন তার হাসি পায়, ঠিক তেমনি যিনি জ্ঞানী পুরুষ, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর এই স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর কোন শরীরের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। আর যেমন স্বপ্নে সবাই স্বপ্নের শরীরের সাথে জুড়ে থাকে, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ এই স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীরের সাথে বন্ধনে পড়ে থাকে। জ্ঞানী দেখেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, শরীর সব কিছুতে গুণ গুণের উপর কাজ করছে। সৃষ্টি যখন থাকে না তখন এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো একেবারে সাম্য অবস্থায় শান্ত হয়ে থাকে। সৃষ্টি শুরু হওয়া মানে তিনটে গুণের মধ্যে এবার চাঞ্চল্য এসে গেছে, সাম্য অবস্থাটা ভাঙতে শুরু হয়ে যায়। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই আছেন, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু কোন একটা কারণে, যে কারণের কোন ব্যাখ্যা করা যায় না, কেউ একে বলছেন লীলা, কেউ বলছেন মায়া, নানান রকমের শব্দ ব্যবহার করেন, যেন সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, কালের সৃষ্টি হয় আর বস্তুর সৃষ্টি হয়। ঐ সৃষ্টির একটা নিয়ম আছে। নিয়মটা হল, প্রথম যাকে বোধ করা যাবে তাকে বলা হয় প্রকৃতি বা মায়া। প্রকৃতির স্বরূপ হল সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ, এগুলো একেবারে শুদ্ধ গুণ, কোন বস্তু নয়। এবার ওদের মধ্যে সাম্য ভাবটা ভেঙে যায়, ভেঙে যেতেই এই তিনটে গুণ এক অপরকে নিজের শক্তি দেখাতে শুরু করে। ফলে সত্ত্বগুণটা রজোগুণে পাল্টে যায়, রজোগুণ তমোগুণে পাল্টে যায়, তমোগুণ আবার রজোগুণে পাল্টায়, রজোটা আবার সত্ত্বে পাল্টায়, এক অপরকে ক্রমাগত দাবিয়ে যেতে থাকে। এই যে মুভমেন্ট, এই মুভমেন্টটাই সংসারের সৃষ্টি। ঐ মুভমেন্টটাই আস্তে আস্তে বৃহৎ আকার ধারণ করতে শুরু করে। যেখানে মোশান সেখানেই তাপ সৃষ্টি হয়, অন্যান্য ধরণের শক্তির সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি এখানেও অন্যান্য শক্তির আবির্ভাব খুব তাড়াতাড়ি হতে শুরু হয়ে যায়। সেখান থেকেই মনের জন্ম হয়, সেখান থেকেই ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি হয় আর ইন্দ্রিয়ের বস্তুরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিয়ম একটাই, গুণ গুণের উপর কাজ করে। যেমন জল আর তেল মিশিয়ে খুব ঢালাঢালি করলে জল জলের দিকে যায় আর তেল তেলের দিকে যায়, ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলোর দিকে তেড়েফুড়ে যেতে চায়, কারণ এটা তার স্বভাবেই আছে। ওরা এক, বস্তুও যা ইন্দ্রিয়ও তাই, চোখ যে বস্তু দিয়ে নির্মিত সুন্দর দৃশ্যও ঐ একই বস্তু দিয়ে নির্মিত। আমরা যারা সাধারণ লোক তারা নিজেকে ইন্দ্রিয়ের সাথে এক মনে করি। চোখ যখন কোন কিছুকে দেখে তখন মনে করে আমি দেখছি, কিন্তু চোখের স্বভাব সুন্দর জিনিসকে দেখা, কানের স্বভাব মধুর ধ্বণি শ্রবণ করা, জিহ্বার স্বভাব নিজের স্বাদ অনুযায়ী খাদ্যকে আস্বাদ করা। আমি আপনি মনে করছি এগুলো আমরাই করছি। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন গুণ গুণের উপর খেলা করছে। গীতায় ভগবান বলছেন *গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে*, গুণের উপর গুণের খেলা চলছে, সুন্দর জিনিস এর উপর সত্ত্ব, রজো ও তমোর খেলা, আমাদের চোখের মধ্যেও সত্ত্ব, রজো ও তমোর খেলা চলছে, দুজন দুজনের উপর খেলা করে যাচ্ছে। এদিকে কুকুরের ছোট তিনটে বাচ্চা, ঐদিকে কুকুরের তিনটে বাচ্চা, সব কটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যস্, এই তিনটে বাচ্চা আর ঐ তিনটে বাচ্চা মিলে এক হয়ে গেল, আর ওদের ছাড়ানো যাবে না।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ প্রারব্ধ নিয়ে বলছেন। যাঁরা ফিজিক্স জানেন তাঁরা সহজে প্রারব্ধ জিনিসটা বুঝতে পারবেন। একটা জিনিস যখন চলে তার মধ্যে অনেকগুলো শক্তি লেগে থাকে। যেমন মিসাইল যে চালানো হয়

তাতে অনেক রকমের শক্তি থাকে। পৃথিবী ঘুরছে তার একটা শক্তি কাজ করছে, বাতাস চলছে তার একটা শক্তি কাজ করছে। জাহাজ থেকে এ্যারোপ্লেন উড়ছে এ্যারোপ্লেনের একটা মোশান আছে, নানান রকমের শক্তিগুলো গিয়ে যখন কাজ করে তখন হিসাবও থাকে না কত রকমের শক্তি কাজ করছে। এ্যারোপ্লেন থেকে যারা মিসাইল চালায় ওদের জিজ্ঞেস করলে বলবে, এতে এত রকমের ক্যালকুলেশান আছে যা আমাদের মাথা দিয়ে করা যায় না, কম্প্যুটার দিয়ে সব ক্যালকুলেশান করতে হয়। এ্যারোপ্লেন থেকে নীচে একটা জাহাজকে মারতে হবে, জাহাজ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলছে। সমুদ্রের একটা গতি আছে, পৃথিবীর একটা গতি আছে আর তার মধ্যে জাহাজও চলছে; এদিকে এ্যারোপ্লেনের নিজস্ব একটা গতি আছে, তার আশেপাশের বাতাসের একটা গতি আছে, কত রকমের resultant forces রয়েছে। ঠিক তেমনি আমাদের জীবন যে চলছে ওর মধ্যেও অনেক রকম শক্তির খেলা চলছে। কত জন্মের কর্মপ্রসুত শক্তিগুলি কাজ করছে, যে বাড়িতে জন্ম নেওয়া হয়েছে সেখানকার resultant forces গুলো আছে। একটা হাসপাতালে একই সময়ে দুটি শিশুর জন্ম হল, জ্যোতিষ বিদ্যানুসারে তাদের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানও একই হবে। তাই বলে ওদের কপালের লিখন একই রকম কখনই হবে না। সেইজন্য জ্যোতিষ বিদ্যা বা কুষ্ঠি বিচার যেভাবে করা হয়, ঐভাবে সব কিছু মেলে না। একজন মহারাজ তাঁর নিজের একটা ঘটনা বলেছিলেন, ওনার মামা খুব বড় জ্যোতিষি ছিলেন। মামা একজনকে দেখে বললেন এর ছয় মাস পরেই মৃত্যু হবে। মহারাজ তখনও সন্ন্যাসী হননি, তিনি শুনলেন, শোনার পর ওনার মনে হল কিছু একটা গোলমাল আছে। তিনি এখন জ্যোতিষ বিদ্যা পড়তে শুরু করে দিলেন। পড়তে পড়তে ওনার হঠাৎ মনে হল, যাকে বলেছিলেন ছয় মাসের মধ্যে মারা যাবে তার স্ত্রীকে দেখলে হয়। তিনি তার স্ত্রীকে ভালো করে দেখে বুঝলেন মহিলার মধ্যে বৈধব্যের কোন যোগ নেই আর তাদের যে সন্তান তারও পিতৃবিয়োগের কোন যোগ নেই। অথচ তার কুষ্ঠিতে দেখাচ্ছে মৃত্যু আসছে। কোনটা হবে? একদিকে যম ভদ্রলোককে মারতে আসছেন অন্য দিকে বিধাতা তার স্ত্রীকে বিধবা হতে দেবেন না। সেইজন্য জ্যোতিষ বিদ্যা কখনই কাজ করতে পারে না। একজন সন্ন্যাসী তাঁর নিজস্ব কিছু কর্ম আছে, তিনি হয়ত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশনের নিজস্ব একটা কর্ম আছে, সেই কর্মও তাঁর উপর কাজ করছে, সন্ন্যাসী যাঁদের সঙ্গে থাকছেন তাঁদের কর্মও তাঁর উপর কাজ করবে। কেউ যদি সাধুসঙ্গ করে সাধুদের যে কর্ম সেই কর্ম তার উপরও কাজ করবে আর সাধু যদি ভক্তদের সাথে বেশি সঙ্গ করেন ভক্তদের কর্মও তাঁর উপর কাজ করবে। প্রারব্ধ মানেই resultant forces, আমরা অনেক সময় মনে করি প্রারব্ধ মানে আমরা আগে আগে যেটা করে এসেছি, কিন্তু প্রারব্ধ মানে তা নয়। আমরা যাদের সাথে থাকছি, স্ত্রী, পুত্র, ভাইবোন, বাবা-মা এদের কর্ম কাজ করবে, আবার অফিসে যাদের সাথে ওঠাবসা করতে হচ্ছে তাদের কর্মও প্রভাবতি করছে। একটা ছেলে খুব বদমাইশ, রাস্থায় বদমাইশি করেছে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। ওর বাবা হয়ত খুব সাধুপুরুষ, কিন্তু ছেলের সঙ্গ করেছে বলে তাকেও এখন থানা জেল দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। ঠাকুরকেও বুটের গোজা খেতে হয়েছে, মথুরবাবুদের পারিবারিক পুরোহিত এসে ঠাকুরকে বুটের গোজা দিচ্ছে। ঠাকুরের কিসের কর্ম ছিল, কিছুই না, মথুরবাবুদের সঙ্গ করছেন বলে তাদের কর্ম এসে ঠাকুরের উপর কাজ করছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যাঁর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ সমস্ত অবয়ব সঙ্কল্পরহিত হয় তিনিই মুক্ত পুরুষ, তিনি দেহে বাস করেও কোন গুণের সাথে যুক্ত থাকেন না। ভাগবত নতুন কিছু বলছেন না, আমাদের সব শাস্ত্র এই একই কথা বিভিন্ন জায়গায় বলছেন – যাঁর ক্রিয়া, ক্রিয়া বলতে সব ক্রিয়াকেই বলছেন, দেহের ক্রিয়া, বুদ্ধির ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া, সব ক্রিয়াই সঙ্কল্প ছাড়া হয়, তিনিই জীবনমুক্ত পুরুষ। এটা অত্যন্ত সহজ কথা কিন্তু লোকেদের ধারণা হয় না। সাংসারিক জীবন মানে সঙ্কল্পময় জীবন আর আধ্যাত্মিক জীবন মানে সঙ্কল্পবিহীন। কাজের পেছনে যদি সঙ্কল্প থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখনও সে সাংসারিক জীবনে আবদ্ধ আছে। মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন যখন শুরু করে তখন ধীরে ধীরে সঙ্কল্প গুলিকে কমাতে শুরু করে। সঙ্কল্প জিনিসটা কি? জীবন দুই প্রকার চলে, একটা স্বধর্মময় জীবন অন্যটা সঙ্কল্পময় জীবন। সঙ্কল্পময় জীবনে goal setting হয়। আইটি ইণ্ডাস্ট্রি মানেই সবাই প্রজেক্ট করে যাচ্ছে, আজ এই প্রজেক্ট, কাল আরেকটা প্রজেক্ট। যে ক্লাশ সেভেনে পড়ছে এখন থেকেই বলছে তাকে ক্লাশ এইটে যেতে হবে,

পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। Goal setting হিন্দু ধর্মের আদর্শ নয়, তাই ভারতেরও আদর্শ নয়। হিন্দু ধর্মের আদর্শ সব সময় চলে স্বধর্মের উপরে, এটাই আমার ধর্ম, এটাই আমার করণীয়, আমাকে এটাই করতে হবে। ছাত্রের স্বধর্ম বিদ্যা অর্জন করা, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করা, যুদ্ধ জয় করার জন্য ক্ষত্রিয় কখনই যুদ্ধক্ষেত্রে যায় না, যুদ্ধ করাটা আমার কর্তব্য তাই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি। তাহলে আমি যুদ্ধ জয় করব কি করব না? নিশ্চয় আমি জয় করব, আমি আমার সমস্ত দক্ষতাকে কাজে লাগাব তাতে যদি মরেও যাই কিছু আসে যায় না, হেরে গেলেও আমার কিছু আসবে যাবে না। সেইজন্য আগেকার দিনে ক্ষত্রিয়রা হারা জিনিসটা জানত না, মৃত্যুর জন্যই যেত। গীতাতেও ভগবান এই কথা বলছেন, *হতো প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা মোক্ষ্যসে মহীম*। সঙ্কল্পবিহীন জীবনেই স্বধর্ম ভালো ভাবে পালন করা যায়, ওখানে সঙ্কল্প বলে কোন কিছু থাকে না। গীতায় ভগবান কত সুন্দর কথা বলছেন, আমরা গীতা পড়ি ঠিকই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই ভুলে যাই, *সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্*, অর্জুন তুমি এই মহাযুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছ; যারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয় তারাই এই সুযোগ পায়। কারণ ক্ষত্রিয়ের কাজ হল যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করাটাই তার স্বধর্ম। স্বধর্মে কোথাও তার একটা থাকে যে বিরাট কিছু একটা আমার উপলব্ধি হবে, কারণ ধর্ম, অর্থ, কামের মধ্যেই এই সঙ্কল্প নিহিত, ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু লোভে পড়ে কোন কিছু করতে পারে না। মানুষ নিজের কৌশল দেখাবার জন্য ছটফট করছে। কেউ যদি নিজের কৌশল দেখাবার জন্য ছটফট করে তাহলে সে কি করবে? একটা ছোট কিছু ইচ্ছা করবে, এই ছোট ইচ্ছাটাই সঙ্কল্প। কিন্তু বলছেন সঙ্কল্প জিনিসটাই সংসার, সংকল্পটাই মানুষের শত্রু।

গীতায় বলছেন *সঙ্কল্পপ্রভবান কামাংস্ত্যক্তা সর্বানশেষতঃ*, সমস্ত সঙ্কল্পকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু সঙ্কল্প না থাকলে জীবন চলবে কি করে? হ্যাঁ চলবে, খুব মজাসেই জীবন চলবে যদি জীবন সঙ্কল্পবিহীন হয়ে যায়। তখন স্বধর্মের উপর চলে। সন্তানকে বড় করা তোমার কর্তব্য। সন্তানকে সঙ্কল্পবিহীন হয়ে কিভাবে বড় করা যাবে? খুব সহজ, যদি স্বধর্মের দিক থেকে বড় করতে হয়, তখন তাকে ভালো শিক্ষা দিতে হবে, সন্তানের চরিত্র নির্মাণের জন্য সব রকম চেষ্টা করতে হবে, অসুস্থ হলে ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু যখন সঙ্কল্প হবে তখন অন্য রকম হয়ে যায়, ওকে একটা বিরাট লোক বানাতে হবে, আমার সুনাম করবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, ভেতরে একটা সঙ্কল্প এসে গেল। একই কাজ সঙ্কল্পময় হয় আবার সঙ্কল্পবিহীন হয়। আধ্যাত্মিক পুরুষ সব সময় সঙ্কল্পশূন্য হয়ে কাজ করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ চেন্নাইতে থাকাকালীন গীতাদি পাঠ করতেন। কোন কোন দিন একজনও শ্রোতা থাকত না; উনি কিন্তু সেদিনও ঘড়ি দেখে এক ঘন্টা পাঠ করে যেতেন। এখনও তাই হয়, অনেক সেন্টার আছে যেখানে মহারাজরা রবিবার ধর্মের কথা আলোচনা করেন, কিন্তু দেখা গেল একজন মাত্র শ্রোতা, তাও এক ঘন্টা পাঠ করে যাচ্ছেন। এটাই তাঁর ধর্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, রবিবার দিন এই সময় ক্লাশ হবে। একজন শ্রোতা থাকলেও ক্লাশ হবে, এটাই ধর্ম। চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের সব কিছুতেই কিছু না কিছু সঙ্কল্প লেগে আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করছি, ওখানে কোন সঙ্কল্প থাকে না, এটাই আমাকে রোজ করতে হবে। রোজ স্নান করছি, সঙ্কল্পবিহীন, স্নান আমাকে করতেই হবে। বিয়ে বাড়ি যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে কিছু করার নেই, ভদ্র ভাবে একটা সাজগোজ করে গেলাম। কিন্তু বিয়ে বাড়ি যাওয়াটাও সঙ্কল্প হয়ে যায়, আমি যেন ওখানে সবচেয়ে সুন্দর দেখাই, সঙ্কল্প এসে গেল। আমি শাস্ত্র পড়তে এসেছি, পরীক্ষায় আমি যেন সব থেকে বেশি নম্বর পাই, সঙ্কল্প এসে গেল। সঙ্কল্পবিহীন কি হবে? আমি শাস্ত্র জানতে এসেছি, ওখানেও কিন্তু সঙ্কল্প আছে, শাস্ত্র জানতে চাওয়াটাও সঙ্কল্প। তবে এই সঙ্কল্প আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে, শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যায় বলে পরে ওটাও চলে যায়। পতঞ্জলী যোগসূত্রে বলছেন, সাধনা যখন শেষের দিকে এগিয়ে আসে তখন সে জেনে যায় আমার যা কিছু জানার জেনে গেছি, আর শাস্ত্র পড়ে কাজ নেই। বই পড়াটাও তখন বন্ধ করে দেয়। কারণ জ্ঞানের ইচ্ছাটাই সত্ত্বগুণের বন্ধন। কিন্তু যতক্ষণ সত্ত্বগুণে না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ সত্ত্বগুণকে ছাড়ার তো কোন প্রশ্নই নেই। সত্ত্বগুণকে ছাড়ার জন্য আগে তাকে সত্ত্বগুণে পৌঁছাতে হবে। যদি কেউ সব সময় আনন্দে না থাকে, সুখী যদি না থাকে তাহলে সে এখনও সত্ত্বগুণে পৌঁছায়নি। জ্ঞানের প্রতি যদি আগ্রহ না থাকে, এখনও

সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রাহ্মণ মাত্রই যদি বলে আমি শ্রেষ্ঠ, কোন মতেই শ্রেষ্ঠ নয়। সন্ন্যাসী যদি বলে আমি শ্রেষ্ঠ, কোন মতেই না। প্রথমেই দেখতে হবে তার শাস্ত্র পড়ার আগ্রহ আছে কিনা, দ্বিতীয় সর্বদা আনন্দে থাকে কিনা। মুখটা সব সময় হাঁড়িমুখ, বিদ্যার প্রতি আগ্রহ নেই, বুঝে নিন সত্ত্বগুণে আসতে এখনও বহু দেরী। আর যে এখনও সত্ত্বগুণে পৌঁছায়নি, মুখে সে যাই বলুক তার আধ্যাত্মিকতার পথে নামতে অনেক দেরী আছে।

গীতায় বলছেন, সুখ আর জ্ঞান, এই দুটো সত্ত্বগুণের বন্ধন। কিন্তু এখানে যে সঙ্কল্পবিহীন বলছেন, তাতে বিদ্যার প্রতি আগ্রহটাও শেষ হয়ে যায়। কখন শেষ হয়ে যায়? যোগশাস্ত্রে বলছেন, শেষের দিকে চলে যায়। তখন মন ঐ একটাকে নিয়েই থাকে, ঈশ্বর দর্শন ছাড়া আর কিছু থাকে না। ওটাও সঙ্কল্প রূপে আসে না, তখন বলে এ ছাড়া আমি করবটা কি? ঠাকুর বলছেন, অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলে শাশুড়ি বৌমার কাজ কমিয়ে দেয়, সন্তান হয়ে গেলে সন্তানকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। সন্তান প্রসব হওয়ার আগে পর্যন্ত শুধু ঐটাকে নিয়ে যেমন থাকে, ঠিক সেই ভাবে যে ঈশ্বর জ্ঞানের দিকে এগোচ্ছে তার ঈশ্বর ছাড়া কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না। কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন, তখন তার এই ভাবটাও থাকে না যে, কবে আমার ঈশ্বর দর্শন হবে। ঈশ্বর দর্শন হলে কি হবে? একটা ভাবে থাকবে। কিন্তু তার আগেই তো সেই ভাবে আছে, তাতে তার অসুবিধার কি আছে! তফাৎ হল ওই ভাবে থাকার জন্য একটা চেষ্টা লেগে থাকে আর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেলে নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য কবে আমার আত্মজ্ঞান হবে, কবে ঈশ্বর দর্শন হবে, এই ভাবটাও তখন আর থাকে না। কাঁচা অবস্থায় একটু ছটফটানি থাকে, কারণ তখনও তার কিছুই হয়নি, এখনো সত্ত্বগুণেই পৌঁছাতে পারেনি। তমো আর রজোগুণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ শুধু কামনা আর বাসনা, গীতায় ভগবান বলছেন *আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ*, আশা একেবারে তাকে বেঁধে রেখেছে। ওখান থেকে একটু ছাড়া পেলে রজোগুণের বৃদ্ধি হবে, তখন সঙ্কল্প হতে শুরু করে, আশা থেকে সঙ্কল্পটা আরও একটু ভালো হয়ে গেল। আশা ঘোর তমোগুণীদের লক্ষণ। আর সত্ত্বগুণে চলে গেলে জ্ঞান আর সুখ ছাড়া কিছু থাকে না। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক ভক্ত তিনি সঙ্কল্পবিহীন। তিনি শুধু স্বধর্ম পালন করেন, আমাকে এটা করতে হবে, এছাড়া আর কোন দিকেই তাঁর আগ্রহ থাকে না। ঠাকুরও বলছেন, যেটা সামনে পড়ে গেল, কিছু করার থাকছে না, তখন ঐটুকু করে দিল, এর বাইরে আর কিছু করতে নেই। এমন কিছু কাজ করবে না যেটা দিয়ে নতুন কর্মের সৃষ্টি হয়। যে কাজগুলো পড়ে আছে ওই কাজগুলোই করে দিতে হয়, কিন্তু *মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ*, নতুন কর্মের তুমি কারণ হতে যাবে না। এগুলো হল যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের জন্য। তবে শুনে রাখতে হয়, শুনতে শুনতে ভেতরে একটা সংস্কার তৈরী হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জীবনমুক্ত কে, যিনি দেহের মধ্যেই আছেন কিন্তু কোন সঙ্কল্প করেন না।

সঙ্কল্পবিহীন হওয়ার জন্য প্রথমে সংসারের প্রতি অনাসক্তি আসে, দ্বিতীয় দেহের প্রতি আসক্তিটা চলে যায় আর তৃতীয় মনের প্রতিও অনাসক্তি হয়ে যায়। সেখান থেকে পুরোপুরি সঙ্কল্পবিহীন হয়ে যান। বলছেন *যস্যাত্মা হিংসতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া। অর্চ্যতে বা ক্বচিত্তত্র ন ব্যাতিক্রিয়তে বুধঃ।।১১/১১/১৫।।* এই ধরণের সঙ্কল্পবিহীন মানুষকে যদি কেউ কোন কারণে পীড়া দেয় উনি তার উপর কুপিত হন না, আর যদি কেউ পূজা করে তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না। মথুরবাবু যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে অনেক পণ্ডিতরা আসতেন, পদ্মলোচন এবং আরও অনেক আসতেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী সব পণ্ডিতদের নিয়ে সভা করে বললেন ঠাকুর অবতার। পরের দিকে গিরিশ ঘোষ, রাম দত্ত এসে বলছেন ঠাকুর অবতার। ঠাকুর বলছেন, আগে কত পণ্ডিতরা বলে গেল অবতার আর এখন কারা বলছে, একজন থিয়েটার করে আর আরেকজন ডাক্তারী করে।

মজার ব্যাপার হল ঠাকুরের জীবনী দেখলে দেখা যাবে তিনি অনেককে গালাগালও দিচ্ছেন আবার নরেন, রাখালদের বেশি ভালোবাসছেন। ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, ওরে হৃদু আমি রাগলে তুই শান্ত থাকবি আর তুই রাগলে আমাকে শান্ত থাকতে হবে, তা নাহলে খাজাঞ্চিকে ডাকতে হবে। ঠাকুরও গালাগাল দিতেন, এমন গালাগাল দিতেন যে কানে আঙুল দিতে হত। ঠাকুরকে একজন এসে বলছেন, এই তো আপনি শুধু নরেন নরেন করেন, নরেন খা, নরেন বোস, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? ঠাকুর হাসছেন। এমনকি নরেন যখন ঠাকুরের কথায় আপত্তি করছেন তখন নরেনকেও গালাগাল দিতে ছাড়ছেন না, তুই যদি আমার কথা নাই

মানিস এখানে আসিস কেন? তখন নরেন বাইরে এসে তামাক সাজতে বসে গেলেন। স্বামীজী একজনকে এমন গালাগাল দিলেন যে সে বেচারী কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমার কাছে এসে অভিযোগ করছেন, নরেন এই রকম বলল। শ্রীমা তাঁকে বলছেন, নরেন কলকাতার ছেলে, জানো না ওর মুখ খারাপ, ওকে রাগাতে গেলে কেন! এখানে তো শাস্ত্রের সাথে মিলছে না। গীতায় যে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলছেন, এখানে তাঁরই বর্ণনা চলছে। পরমহংস অনেক ধরণের হন, ঠাকুর বলছেন তিনি কখন বালকবৎ থাকেন, কখন পিশাচবৎ থাকেন, কারুর মধ্যে শান্ত ভাব আবার কারুর মধ্যে আচার্য ভাব থাকে। পরমহংস কখন এক ভাবে থাকেন না। গীতাতে বা এখানে যে বর্ণনা দিচ্ছেন, তাতে শুধু শান্ত ভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন। কিন্তু পরমহংস কখন এক ভাবের হয় না। কথামৃতে অনেকবার ঠাকুর পরমহংসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন বালকবৎ, জড়বৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ, এই যে বৎ বৎ শব্দ বলে যাচ্ছেন আচার্য হয়ে যখন আসেন তখন তিনি এই শব্দ থেকে সরে যান, কিন্তু তাতেও ওনার বাস্তবিকতাকে কখন স্পর্শ করতে পারে না। এর খুব জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত আছে, যেটা সচরাচর পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায় না, কারণ যেগুলো পুনরাবৃত্তি হতে দেখা গেছে সেগুলো খুবই সাধারণ, সেটা হল যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে বলা হল কায়েতের ছেলে নরেন, রাখালের উপর মন কেন দিয়েছেন? ঠাকুর তখন বলছেন, এদেরকে আমি সেই নারায়ণ দেখি, যদি না দেখি আমার মন এখানে থাকবে না। ঠিক আছে আমি ওদের থেকে আমার মন তুলে নিচ্ছি। তখন সবাই দেখছেন ওখানেই ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন আর তাঁর চুল দাড়ি সব সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেছে। উনি যখন মন রাখছেন তখন বালকবৎটা আর থাকছে না, জ্ঞানীর জড়বৎ স্বভাবটাও থাকছে না। আচার্য রূপে যখন তিনি চলেন তখন তাঁর এই জিনিসগুলো থাকে কিন্তু ভাসা ভাসা থাকে। যেমন স্বামীজী জাহাজে ভারতে ফিরছেন, সেখানে একজন পাদরী হিন্দু ধর্ম ও ভারতবর্ষের নিন্দা করছেন, স্বামীজী তার ঘাড় ধরে বলছেন, আরেকটা শব্দ বলবে তোমাকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেব। আচার্য রূপে এই ভাবটা আছে, স্বামীজী যখন বলছেন তখনও তাঁর রাগ থাকার কথা না, কিন্তু একটা লোকশিক্ষার জন্য এক মুহূর্তের জন্য তিনি ঐ রকম করলেন। কিন্তু এই শ্লোকে বা গীতাতে যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলছেন, ওখানে যিনি শান্ত ভাবের তাঁর স্বরূপের বর্ণনা করছেন। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা শান্ত ভাবের ঋষি নন, এনারা আচার্য ভাবের ঋষি। আচার্য ভাবের ঋষিদের ব্যবহার একটু অন্য ধরণের হয়, কারণ তাঁদের একটু রজোগুণ নিয়ে আসতে হয়। তাহলে অন্যান্য সাধুরা যে রাগারাগি করেন, গালাগাল করেন তাঁদেরও তো ঠাকুর স্বামীজীর মত বলা যেতে পারে। তাঁদেরকে বলা যাবে না, কারণ ত্রিগুণাতীতের লক্ষণগুলো ঠাকুর স্বামীজীর মধ্যে আমরা মুহুর্মুহু দেখছি, যা অন্য সাধুদের মধ্যে পাওয়া যাবে না, ওখানেই ধরা পড়ে যাবে। সাধুরা আচার্য ভাবের নন, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই শান্ত ভাব থাকতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাঁকে কাজ দেন তখন তাঁকে কিভাবে রাখবেন আমরা জানি না। কারণ ভগবান বুদ্ধকে একভাবে রেখেছেন, যীশুকে আরেক ভাবে রেখেছেন আর মহম্মদকে পুরো অন্য ভাবে রেখেছেন, তিনি তো তলোয়ার তুলে নিলেন, যদিও অন্য কারণে তুলে ছিলেন। তলোয়ার নিলেও এই শ্লোকে ব্যাঘাত হচ্ছে না। এই শ্লোকে যেটা আছে *যস্যাত্মা হিংসতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া*, মহম্মদ অন্যায় ভাবে কাউকে আঘাত করতেন না, আমাকে আমার লোকেদের রক্ষা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মহাভারত যুদ্ধ করালেন বা অসুরদের বধ করলেন, মহম্মদও ঠিক সেই ভাবে করে চলে গেছেন। যদি মহম্মদকে সমালোচনা করতে হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণকেও সমালোচনা করতে হবে। ওনার কাছে পরিষ্কার, আমি একটা ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এসেছি, এই ধর্মের উপর যে ব্যাঘাত ঘটাবে তাকে জীবন দিতে হবে, কিন্তু জীবন নিতে গিয়ে তাঁর কোন কাম ক্রোধ আসছে না।

তবে আমাদের সাধন জীবনে যেটা সিদ্ধি সেটাই সাধনা। যেটা আমি সাধনা করছি সিদ্ধি আমার সেটাই হবে। যদি আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেতে চাই তাহলে আমাকে সব জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে হবে, যদি আমি আত্মজ্ঞান পেতে চাই তাহলে আত্মাই আছেন, বাকি সব বাণীর বিকার, এটাই দেখতে হবে। জীবনে আমরা যেটা পেতে চাই ওটাই আমাদের সারা জীবন করে যেতে হবে। যেমন ধরা যাক কেউ বলছে আমি স্থিতপ্রজ্ঞ হতে চাই, স্থিতপ্রজ্ঞের একটাই লক্ষণ হয়, আর বাকি সব কিছু ওটারই রূপ। যদি বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শান্ত, তাহলে শান্তও যা সমদর্শিও তাই, দ্বেষ-হিংসার পারে সেটাও তাই, সবার প্রতি ভালোবাসাও একই,

যে কোন একটা গুণ হলে বাকি সবটাই ওরই অন্য রূপ। বেদান্তে সাধনা আর সিদ্ধি কখনই আলাদা নয়। মা কালীকে যদি কেউ রোজ হাজারটা পাঠা বলি দেয় আর যদি আশা করে আমি মা কালীকে পাব, বেদান্ত মতে সে কোন দিন মা কালীকে পাবে না। কারণ মায়ের দর্শন আর পাঠা বলি দুটো এক জিনিস নয়। ঈশ্বর জ্ঞান যে হবে সেটা কখনই কর্মের পরিণতি হয় না। সেইজন্য কর্ম একটা করবে আর ফল আরেকটা হবে, এই জিনিস কখন হবে না। ভালো মানুষ হলে কোন দিন ঈশ্বর দর্শন হবে না, কারণ তাহলে ঈশ্বর দর্শন কর্মের পরিণতি হয়ে যাবে। ভালো মানুষ হলে ভালো মানুষ হয়েই সে থাকবে। সবাইকে যে ভালোবাসে ঈশ্বর জ্ঞানের পরেও সে সবাইকে ভালোবাসবে, যেটা আগে ছিল সেটাই থেকে যাবে। ভগবান বুদ্ধ আগে যা ছিলেন নির্বাণ লাভের পরেও উনি তাই ছিলেন। যেটা সাধনা করছেন, করতে করতে একদিন দেখলেন সেটাই পরিণতি হয়ে গেল, তখন চেষ্টা করলেও ওখান থেকে আর সরতে পারবেন না। যেমন ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রথমের দিকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, ঈশ্বরের কথা ভাবতে ভাবতে একটা অবস্থায় চলে গেলেন, তখন ওখান থেকে আর সরে আসতে ইচ্ছে করবে না, সেখানে গিয়েই তার উপলব্ধিটা হবে। প্রথমে চেষ্টা করে করতে হবে, দ্বিতীয় অবস্থায় আর সরতে ইচ্ছে করে না, তৃতীয় স্তরে চাইলেও আর সরে আসতে পারবে না, কারণ জ্ঞানটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। এই মহাত্মারা তখন যারা ভালো কাজ করছে তারও স্তুতি করেন না, যারা বাজে করছে তারও নিন্দা করেন না। কারণ তিনি দেখছেন সবই তো তিনি হয়েছেন, কার নিন্দা কার স্তুতি করবেন। দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস এসে বলছেন, যখন গঙ্গার জল আর নর্দমার জল এক মনে হবে তখন বুঝবে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। সেই পরমহংস কুকুরের গলায় হাত দিয়ে এঁটো পাতা থেকে তিনিও খাচ্ছেন কুকুরও খাচ্ছে। ঠাকুর কাঁপছেন, হে ভগবান! আমারও কি এই অবস্থা হবে!

এর ফলে কি হয়? *ন কুর্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা। আত্মারামোহনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ।।১১/১১/১৭।।* ভালো কাজও তিনি করেন না, মন্দ কাজও করেন না আর তিনি কাউকে কিছু বলেনও না। সব কিছুতে তাঁর সমান বৃত্তি, ভালো মন্দের কোন বোধই থাকে না। যদি তাঁকে বলা হয় সবই যদি সমান তাহলে ঘৃত আর বিষও কিছু না, হ্যাঁ ঘৃত আর বিষ সমান। তাহলে বিষ খেয়ে নিন। বিষ খেয়ে নিলে তো শরীর চলে যাবে। জ্ঞানীর তো জীবন মৃত্যু সমান। বাস্তবিকই তিনি কোন তফাৎ করেন না। কিন্তু যিনি আচার্য ভাবে আছেন তাঁকে ওখানে তফাৎ করতে হয়। কারণ তিনি ঈশ্বরের কাজের জন্য শরীর ধারণ করে আছেন। জ্ঞানীর কাছে এগুলো কোন কিছুই করতে পারে না, সেইজন্য বলে, যেন শরীর ধারণ করে আছেন। আর বাস্তবিকই তাই হয়েছিল, ভগবান বুদ্ধকে চণ্ডাল খাবার এনে দিয়েছে, খাবারটা কোন কারণে বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, ভগবান বুদ্ধ ঐ খাবার খেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। চণ্ডাল তখন কাঁদছে, আমার কত বড় অপরাধ হয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধ বলছেন, কোন অপরাধ হয়নি, তুমি তো আমাকে দেহ থেকে মুক্ত করে দিলে, আমি তো তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহলে এই ধরণের মহাত্মার কি করেন? ব্রহ্ম চিন্তন ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া আর কিছুই করেন না। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর বৈ আমি কিছু জানি না।

বিষয় থেকে একটু সরে এসে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণোয়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।১১/১১/১৮।।* যদি কেউ সমস্ত বেদ জেনে গিয়ে থাকে কিন্তু পরব্রহ্মের জ্ঞান শূন্য তাহলে এই বেদপারঙ্গম বিদ্বানের সব পরিশ্রম নিষ্ফল। উপমা দিচ্ছেন, যদি কেউ এমন গরুকে পালন করে যে গরু আর দুধ দেবে না। গরু কেন পালন করে? গরু বাছুর দেবে, দুধ দেবে। কিন্তু এমন গরু রেখেছে যে বাছুরও দেবে না, দুধও দেবে না, এই গরু পালন করে কি হবে! ঠিক তেমনি যে কোন বিদ্যা, সেই বিদ্যার ফলের পরিণতি যদি না হয় তাহলে পরিশ্রমটাই বৃথা। বেদ অধ্যয়ন করছেন, গীতা অধ্যয়ন করছেন, এই অধ্যয়নের ফল কি হবে? পরব্রহ্মের জ্ঞানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। যদি না প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে কি হবে? এখানে শব্দটা বলছেন *অধেনু*, মানে যে গরু আর দুধ দেবে না। তার মানে, ভাগবতের দৃষ্টিতে কেউ যদি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সেটার কোন দাম নেই। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে সমস্ত বেদ জানে, সমস্ত গীতা জানে, সমস্ত শাস্ত্র জানে। কিন্তু পরব্রহ্মের জ্ঞানে তার মন প্রতিষ্ঠিত নয়। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, পুরো বেদে যা কিছু আছে ওর সারটাই সন্ধ্যা। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী প্রণবে লয়

হয়। আর যোগীরা সে প্রণবের নাদকে ভেদ করে জ্ঞান লাভ করেন। সে পুরো বেদ মুখস্ত করে নিয়েছে কিন্তু তার পরের যে ধাপ গুলো আছে তাতে গেল না, সন্ধ্যাতে গেল না, গায়ত্রীতে গেল না, ওঁ সাধনা করল না, নাদ ভেদ করল না, সমাধি লাভ হল না, সবটাই বেকার হয়ে গেল, মুখস্ত না করলেই হত। বেদ মুখস্ত করাটা প্রস্তুতি, সাংসারিকতা থেকে একটু এগোল, ঠিকই বলছে, এনারাও মানছেন। বক্তব্য হল, এত কিছু করা হল, এত পরিশ্রম করল, বেদ মুখস্ত করা তো অত সহজ কথা নয়, কিন্তু এটাকে যদি কাজে না লাগায়, হাতেনাতে ফল যদি না পায়, তাতে তো কোন লাভ হল না।

এরপর বলছেন জীবনে কি কি জিনিস বৃথা। প্রথম বলছেন দুধবিহীনা গরু, যে গরু আর দুধ দেবে না। দ্বিতীয় অসতী, স্বামীকে ছেড়ে আরেকজন পুরুষের সাথে থাকে। তৃতীয় পরাধীন দেহ, তার মানে যেখানে কাউকে দাসত্ব করতে হচ্ছে, একজনের গোলাম হয়ে থাকতে হচ্ছে। চতুর্থ দুষ্ট পুত্র, অবাধ্য সন্তান। পঞ্চম টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও সৎপাত্রে দান না করা। টাকা-পয়সা আছে, সৎপাত্রও আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও দান করে না, ঐ দান না করা ধন বৃথা। আর শেষে ষষ্ঠ হল, ঈশ্বরের গুণগান বিহীন বাণী, কথা বলতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের গুণগান করে না, এই বাণী বৃথা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই কটি জিনিস জীবনে শুধু কষ্টই দেয়। আর বলছেন *য্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য। লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্ বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ।।১১/১১/২০।।* এই যে ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি আর সংহার করছেন যে বাণী ঈশ্বরের কার্যের বা লীলা বর্ণনা করে না, যে বাণী ঈশ্বরের অবতারের লীলার বর্ণনা করে না, সেই বাণী বন্ধ্যা। যেমন বন্ধ্যা গরু, মানুষ গরু পালন করে এই আশা নিয়েই যে সে বাছুর দেবে, দুধ দেবে।

তাহলে উপায় কি? যাঁরা উত্তম ভক্ত তাঁরা কি করেন বলছেন। জগতে যে আমরা বহু দেখছি বা আমাকে ছাড়া জগতে আরও অনেক কিছু আছে দেখছি, উত্তম ভক্ত বহু দেখাকে ছেড়ে আত্মাতে মন লাগিয়ে দেন। অন্যান্য ধর্মে এবং হিন্দু ধর্মেরও কিছু কিছু মত আছে যেখানে বলে কর্মের একটি ফল আছে। যজ্ঞাদি করলে মানুষ স্বর্গে যায়। খ্রীশ্চান ও ইসলামে যদি ভালো কাজ, শুভ কাজ করে তাহলে স্বর্গে যাবে। কিন্তু বেদান্তে তা হয় না, বেদান্তে সাধনা যা সিদ্ধিও তাই, যেটা নিয়ে একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম। বেদান্তে সিদ্ধি মাত্র দুটি, সেইজন্য সাধনাও মাত্র দুটি। বেদান্তে ও সমগ্র হিন্দু ধর্মের দর্শনে প্রথম সিদ্ধি হল ঈশ্বর দর্শন আর দ্বিতীয় সিদ্ধি আত্মজ্ঞান। এই দুটি সিদ্ধি ছাড়া তৃতীয় কোন সিদ্ধি নেই। যখন আত্মজ্ঞান হয় তখন দেখে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু দেখছি সবই নাম আর রূপের খেলা, নাম আর রূপটা মিথ্যা বা মায়া। ঈশ্বর দর্শন যখন হয় তখন দেখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব ঈশ্বরেরই রূপ। এই বোতলও ঈশ্বরেরই রূপ, এই টেবিল, চেয়ার, মানুষ সব ঈশ্বরেরই রূপ। তার সাধনাও তাই হবে, এতে মনকে একাগ্র করাটা একটা পথ। মন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, সব কিছু থেকে কুড়িয়ে মনটাকে যখন একাগ্র করা হল, এতক্ষণ যে বহু দেখছিল, বহু দেখাটা চলে গিয়ে একটিতে নিয়ে এলো। এখন সে যদি অনুশীলন করতে যায়, সে যাকে ভালোবাসে তার মধ্যেও ঈশ্বরের রূপ দেখবে। কিন্তু আমাদের মন চঞ্চল, একটা ভাব থেকে আরেকটা ভাবে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে, একটা বিচার থেকে আরেকটা বিচারে চলে যাচ্ছে। এই জিনিসটাকে ঠিক করে জপ। জপ করতে করতে মন একাগ্র হতে শুরু করে, তারপর যখন যেটাকে ধরবে সেটাতেই মনকে একাগ্র করে দিতে পারবে। আর সেখান থেকে যখন ভাবটা নেবে, সব ঈশ্বরেরই রূপ, যে আমাকে মারতে আসছে সেও ঈশ্বরের রূপ। এসব নিয়ে পরে অনেক কাহিনী তৈরী হয়েছে।

একটা খুব নামকরা কাহিনীতে আছে, ভগবান একজনের পরীক্ষা নেবেন, সাধু সেজে ভক্তের বাড়ি গেছেন। ভক্ত ব্রাহ্মণ সাধুকে খুব নিষ্ঠা ভক্তি দিয়ে আপ্যায়ন করেছে। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছে কি দিয়ে সেবা করবেন। ব্রাহ্মণ বলল আমি তো মাংস দিয়ে সেবা করব। ভক্ত অবাক হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ বলছে, মাংস শুধু না, তোমার ছেলের মাংস রন্ধন করে খাওয়াতে হবে। ভক্তের পরিবার রাজী হয়ে গেছে। তাই না, ছেলেটাকে তোমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে মাঝখান থেকে চিড়বে। তারাও রাজী হয়ে গেছে, এমনই তারা ঈশ্বরের ভক্ত। ছেলেটাকে বসান হল, করাত নিয়ে আসা হল, করাতের একদিকে ছেলের বাবা করাতের অন্য দিকে মা। ছেলেও নাকি খুব ভক্ত, তার খুব ইচ্ছে যে ব্রাহ্মণ অতিথির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। তখন ভগবান

তাদের বর দিলেন। এগুলো কাহিনী, ভক্তির শেষ কথা কি হতে পারে সেটাকে দেখানো হচ্ছে। ভক্ত দেখছে ঈশ্বরই সব, অতিথি আসছেন ঈশ্বরই আসছেন, তার সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে। স্বামী অখণ্ডানন্দজী একবার গুজরাতের দিকে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরছেন। একটা গ্রামে পৌঁছেছেন। গ্রামের লোকেরা মহারাজের উপর পুরো গ্রামের দায়ীত্ব দিয়ে ক্ষেতে কাজ করতে চলে গেল। উনি গ্রামের লোকদের বলছেন, তোমরা সব কিছু আমার উপর ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছ, আমি তো চোর ডাকাতও হতে পারি, সব কিছু নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি। ওরা বলছে, সেতো আপনার ফল। তারপর উনি জানতে পারলেন, গতকালই তাই হয়েছে। একটা চোর সাধু সেজে এসেছিল, এরাও তার উপর সব দায়ীত্ব দিয়ে চলে যেতেই গ্রামের সব কিছু চুরি করে পালিয়ে গেছে। কিন্তু ওদের ভাব পাল্টায়নি। গুজরাতেরই আরেকটা জায়গায় একজন লোক পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াতো। তখন লোকেরা তাকে বলছে, সব বদমাইশ, জোচ্চর লোকদের খাওয়াচ্ছ? লোকটি বলছে, সারা জীবনে একটা দুটো ভদ্রলোক, সাধুলোক কখনও না কখন তো আসবে, তাতে এটা পুষিয়ে যাবে। এটা হল ভাব, ভাবের পরিবর্তন হয় না। জপধ্যান করলে ভাবটা একটা জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে যায়। সিদ্ধি কি? আত্মা ছাড়া কিছু দেখছে না, সাধনাও তাই হবে। সাধনাও যেহেতু তাই হয়ে যায় সেইজন্য সমদর্শিতা এসে যায়। যার মধ্যে সমদর্শিতার অভাব তার এখনও দেরী আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে উদ্ধব আমার কথা সবাইকে বলা আর ধর্ম, অর্থ ও কাম এগুলোর যখন সেবন করা হবে তাতেও তখন আমিই থাকব। কেন্দ্রে আমিই আছি, আর এই কেন্দ্রকে আধার করেই বাকি সব কিছু চলছে। শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি স উপাসিতা। স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্।।১১/১১/২৫।।* মানুষ যখন সৎসঙ্গ করে তখন তার মধ্যে ভক্তির উদয় হয়, ভক্তি লাভ হলে তখন আমার উপাসনা করে, আমার সান্নিধ্যের অনুভব করে। এই করে করে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গেলে ঋষিরা যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলোকে ধারণা করতে করতে তার মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয়। মূল বক্তব্য, সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ থেকে ভক্তি লাভ, ভক্তি থেকে উপাসনা, উপাসনা থেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের বোধ, ঈশ্বরের সান্নিধ্য বোধে ঈশ্বরীয় কথা স্পষ্ট হয়।

ভক্তের লক্ষণ

উদ্ধভ এক এক করে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর শ্রীকৃষ্ণ সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। উদ্ধভ প্রশ্ন করছেন *সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো। ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যতে কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা।।১১/১১/২৬।* হে ভগবন্! বড় বড় সাধু মহাত্মারা সব সময় একমাত্র আপনার লীলা সংকীর্তন করে থাকেন। আপনি আমাকে বলুন প্রকৃত সাধুপুরুষের কি লক্ষণ? উদ্ধভ খুব মজার প্রশ্ন করেছেন, সাধুরা তো সব সময় ভগবানের গুণকীর্তন করেন, আপনি তো ভগবান, তাই আপনিই বলুন সাধু কে? এর উত্তরে ভগবান অনেক কথা বলছেন। ঠাকুর এক কথায় বলে দিচ্ছেন, যাঁর মন সব সময় ঈশ্বরে পড়ে আছে। কিন্তু তাঁর মন কোথায় পড়ে আছে আমরা বাইরে থেকে কি করে বুঝব? সেইজন্য সংস্কৃতে একটা কথা আছে স্বসংবেদ্য, যিনি বোধ করেন তিনিই জানেন তিনি কি বোধ করেন, বাইরের লোক বুঝতে পারবে না। কিন্তু বাহ্যিক কিছু লক্ষণ আছে যে লক্ষণ দিয়ে জানা যাবে ইনি সাধুপুরুষ কিনা। ভাগবতের প্রত্যেকটি শ্লোক অত্যন্ত ভাবগ্রাহী, কিন্তু সব শ্লোক নিয়ে আলোচনা করা এই স্বল্প সময়ে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি বিশেষ শ্লোককে আলোচনা করে আমরা ভাগবতের উদ্দেশ্য ও তার মূল বক্তব্যের ধারণা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সবাইকে জীবনে একবার অন্তত সমগ্র ভাগবত অধ্যয়ন করা দরকার।

উদ্ধব বলছেন, হে ভগবন্! আমি জানি আপনি প্রকৃতির পারে সেই পুরুষোত্তম। যে কোন দর্শনকে অন্তত তিনটে জিনিসের আলোচনা করতে হয়, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। যারা নাস্তিক বা আজকের দিনের যাঁরা বিজ্ঞানী আর যাঁরা যুক্তিবাদী তাঁরা এক কথায় বলে দেবেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই। জীবের ব্যাপারে বলবেন, জীব জগতেরই একটা অঙ্গ তারপর জগতকে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। স্থূল মানসিকতা সম্পন্ন লোকেদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হল, জগৎ একটা বস্তু, জীব আরেকটি বস্তু আর ঈশ্বর আরেকটি বস্তু। যেমন একজন রাজা, তিনি

আলাদা, তাঁর রাজ্য আলাদা, ঐ রাজ্যের রাজসিংহাসনে তিনি বসেন। বেশির ভাগ মানুষের মনে এই ধারণাই হয়ে আছে, বিশেষ করে যখন এই শ্লোকগুলো আমরা পড়ি, *ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ।।১১/১১/২৮।। প্রকৃতেঃ পরঃ*, আপনি প্রকৃতির পারে, এই একটি কথা আমাদের শাস্ত্রে প্রায়ই আসে। আমরা মনে করি, গঙ্গা নদীর এই পারে আমি আছি, ঐ পারে আরেকটা জায়গা আছে। ঠিক তেমন আমরা প্রায়ই এই ভুলটা করে থাকি যে, প্রকৃতি একটা আলাদা কিছু আর ভগবান প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে কোথাও অবস্থান করছেন। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। কিন্তু জিনিসটা তা নয়, প্রকৃতির এলাকাতে যা কিছু আছে, ভগবান তার থেকেও বড়, ঐ অর্থে বলছেন *প্রকৃতেঃ পরঃ*। আমাদের মন বুদ্ধি প্রকৃতির এলাকার জিনিস, ভগবান তার পারে, তাই মন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না। প্রকৃতি মানে তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো আর তমো, ঈশ্বরের মধ্যে এই তিনটে গুণের কোনটাই নেই। ভগবান তার থেকে অনেক বৃহৎ, প্রকৃতি তাঁর একটা খুব ছোট্ট অঙ্গ। তাহলে এত প্রকৃতির কথা বলা হয় কেন? তার কারণ, আমরা দেখছি এক বিশাল জগৎ, পৃথিবীটাই বিশাল। আকাশের দিকে তাকালে আরও বৃহৎ দেখায়। শাস্ত্রে পড়েছি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিরই একটা অংশ। তখন আবার মনে হয় প্রকৃতি বিরাট কিছু। তার সাথে মনে হয় কোথাও ভগবান প্রকৃতির সাথে জড়িয়ে আছেন, দ্বিতীয় ভগবানের মধ্যে মানুষ ভাব আনা। যাঁদের মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে, সবারই প্রতি ভালোবাসা আছে, করুণা আছে, এই জিনিসগুলো আমরা ভগবানের উপর চাপিয়ে দিই। ঠিক তেমনি যেহেতু বুদ্ধি দিয়ে আমরা এই জগতকে জানছি তাই মনে করছি সেই বুদ্ধি দিয়ে ভগবানকেও জানা যাবে। কিন্তু ভগবান যদি প্রকৃতির এলাকার হতেন তবেই আমরা জানতে পারতাম। ধরা ছোঁয়ার বাইরে বললেই আমরা মনে করছি ভারতের সীমান্ত শেষ হয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এই ধরা ছোঁয়া ওই অর্থে হয় না, তিনি প্রকৃতি থেকে বিরাট, কোন কিছু দিয়ে এই বিরাটত্বকে ধারণা করা যাবে না। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাই বলছেন, আপনি ভগবান, ভগবান মানেই প্রকৃতির পারে আর আপনিই চিদাকাশস্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম। উদ্ধব নিরাকারের কথাও বলছেন। আর বলছেন, হে ভগবন্! আপনার বাইরে কিছু নেই, আপনি ভিন্ন কিছু নেই। কিন্তু এই যে মহাভারতের যুদ্ধ হল, কত কিছু হল, এই লীলা করার জন্য আপনি নিজের ইচ্ছায় আলাদা একটা শরীর ধারণ করেছেন। আমরা এর আগেও কয়েকবার বলেছি, আধ্যাত্মিক জগতে যত তত্ত্ব আছে তার মধ্যে অবতারতত্ত্ব বোঝা সব থেকে কঠিন। উপনিষদের তত্ত্বগুলি বোঝা খুব সহজ, যোগশাস্ত্রের তত্ত্বও বোঝা খুব সহজ। কিন্তু অবতারতত্ত্বকে বোঝা সত্যিই খুব কঠিন। যাঁরা প্রচুর চিন্তন মনন করেন তাঁরা সেইজন্য অবতারতত্ত্বকে নিয়ে কিছু বলতে চান না, পাশ কাটিয়ে যান। যিনি অনন্ত তিনি একটা সাকার রূপ কিভাবে ধারণ করেন, এটাকে ধারণা করা খুব কঠিন। যার জন্য খ্রীশ্চান ধর্মের পণ্ডিতরাও তাঁদের দর্শনে অবতারতত্ত্বকে আনেন না, যীশুকে বলছেন ভগবানের পুত্র। যেহেতু ভগবান আর তাঁর পুত্র সেইহেতু আলাদা হতে পারে না, ঐভাবে যীশুকে ভগবানের সাথে এক দেখেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মে যেভাবে অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয় সেই ধারণাটা ওদের নেই। আর ইসলাম তো ভুলেও আনছে না। উদ্ধব বলছেন, আমি মানছি যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনি শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধারণ করে লীলা করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, আর ভগবানের সাথে তিনটে জিনিস স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়ে যায়, ভক্ত, ভক্তি আর ভাগবত। যিনি ভগবানকে ভালোবাসেন তিনি ভক্ত, ভালোবাসাটাই ভক্তি আর যেখানে এই তিনটেকে নিয়ে আলোচনা করছে সেটাই ভাগবত। ঠাকুর আবার বলছেন, ভাগবত, ভক্ত, ভক্তি, ভগবান চারটেই এক। ভগবানও যা ভক্তও তাই, ভক্তিও তাই, ভাগবতও তাই, সব একই। উদ্ধব তাই বলছেন, আপনি ভগবান, আপনিই ভক্তি, ভক্তের রহস্যটা ভালো বোঝাতে পারেন, ভক্তির রহস্যটা ব্যাখ্যা করে বলুন। কারণ যিনি ঐ বিষয়ের মালিক তিনিই ঐ বিষয়ের ব্যাপারে ঠিক ঠিক বলতে পারবেন। একটা খুব দামী কথা প্রায়ই বলা হয়, যে কোন বিষয়কে যদি জানতে হয় তাহলে Read the masters and live with the toppers। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যদি জানতে হয় তাহলে কথামৃত পড়তে হবে, ঠাকুরের ব্যাপারে যদি জানতে হয় তাহলে কথামৃত বা লীলাপ্রসঙ্গ পড়তে হবে। কিন্তু এগুলো না পড়ে আমরা সাহিত্যিকরা কি বই লিখেছেন, কোথায় কে ঠাকুরের উপর কি হিজিবিজি প্রবন্ধ লিখেছে সেগুলো পড়তেই আমাদের বেশি আগ্রহ।

প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্। সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ।।১১/৯/২৯।* হে প্রিয় উদ্ধভ! আমার ভক্ত সব সময় কৃপার প্রতিমূর্তি, সমস্ত প্রাণীর উপর তাঁর কৃপার ভাব। সেইজন্য *অকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ*, কারুর উপর তার কোন রাগ বিদ্বেষ থাকে না, যতই দুঃখ আসুক সব দুঃখকে সে আনন্দের সাথে বরণ করে। ঠিক ঠিক ভক্তের লক্ষণ কি? সবার প্রতি তার কৃপার ভাব থাকবে, কাউকে বিরক্ত করবে না – গীতায় বলছেন *যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।* ভক্ত কক্ষণ কারুকে উদ্বিগ্ন করবে না, কোন প্রাণীর প্রতি বৈরী ভাব রাখবে না। যত দুঃখই হোক ভক্ত সব সহ্য করবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমার ভক্তের মনে কখন কোন ধরণের পাপ বাসনা জন্ম নেয় না, কারণ সত্যটাই তাঁর জীবনের সার। তিনি সব সময় সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সবার প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি আর সবার উপকার করেন ও মঙ্গল কামনা করেন। মূল কথা, ভগবানের ভক্ত সব সময় কৃপামূর্তি, সবাইকে কৃপা করে যান। গীতায় ভগবান বলছেন *সর্বভূতহিতে রতাঃ।* ভাগবতে এর আগেও অনেকবার এই বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে। যেমন, তিনি চেষ্টারহিত, পরিমিত আহার করেন, মন শান্ত থাকে, বুদ্ধি কামনা-বাসনা শূন্য আর স্থির থাকে, প্রমাদরহিত, গম্ভীর স্বভাব, ধৈর্যবান আর সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে। সবাইকে আমার ভক্ত সম্মান করে, তাঁকে কেউ সম্মান করল কি করল না তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। মানুষ কখন সম্মান করে না? মানুষের মনে যখন অহঙ্কারের ভাব অতিমাত্রায় থাকে তখন সে কাউকে সম্মান করতে চায় না। যারই ভেতর খুব অহঙ্কার থাকে সে সামনের সবাইকে তুচ্ছ বোধ করে। রাজা মহারাজ একদিন বলছেন 'জগতে কারুরই অহঙ্কার করার মত কিছু নেই'। মানুষ অহঙ্কার কখন করে? যখন সে নিজে ঠিক ঠিক কিছু অর্জন করে। অর্জন করা থেকেই অহঙ্কার আসে। অর্জনের এই অহঙ্কারে সে সামনের লোককে তুচ্ছ মনে করে এবং তাচ্ছিল্য করে। কাউকে তাচ্ছিল্য করা মানেই সম্মান না করা। যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদের কাছে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হল আত্মজ্ঞান, আমাদের ভাষায় নির্বিকল্প সমাধি। কিন্তু ভালো করে বিচার করলে নির্বিকল্প সমাধিকে কি কারুর সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলা যেতে পারে? আত্মজ্ঞান মানে, আমার হারানো জিনিসটা আমি খুঁজে পেলাম, নির্বিকল্প সমাধি আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা, আমরা সবাই শুদ্ধ ব্রহ্ম। এই স্বাভাবিক অবস্থাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, নির্বিকল্প সমাধিতে গিয়ে সেই হারানো অবস্থাটা ফিরে পেলাম। তাতে আমার অহঙ্কারের কি হল! আমি তো নতুন কিছু অর্জন করিনি। ঠাকুর বলছেন 'মাইরি বলছি আমার একটুও অহঙ্কার নেই'। একজন অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের কাছে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হল আত্মজ্ঞান, নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মজ্ঞান লাভ মানে, আমার হারানো জিনিসটা আমি পেয়ে গেলাম। আমি কে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার আসল 'আমি'টা হারিয়ে গিয়েছিল, আত্মজ্ঞানে সেই হারানো 'আমি'টা ফিরে পেলাম, এতে অহঙ্কার করার কি আছে! অর্জন তো কিছু হয়নি আর কোন দিন হবেও না। অর্জন করা তখনই হবে যদি ঈশ্বর আর আমি আলাদা হই, তখন বলতে পারবো আমি ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করেছি তাই আমি আনন্দ করছি। কিন্তু বেদান্ত মতে তাও হবে না। বেদান্ত মতে বলবে ওইটাই তোমার স্বভাব, তোমার স্বভাবকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে, সেটা ফেরত পেলে। কিন্তু যারা ভক্ত তারা বলবে তাঁর ইচ্ছাতে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, আমার এখানে কিছু নেই। তাই যদি হয়, তিনি কৃপা করে তাঁর দর্শন দিয়েছেন তাতে তোমার অহঙ্কারের কি আছে! অহঙ্কারের মত তুচ্ছ ফালতু জিনিস জগতে আর কিছু নেই। অহঙ্কারের মত তুচ্ছ জিনিস জগতে না হওয়ার জন্য অপরকে যখন কেউ তুচ্ছ জ্ঞান করে অসম্মান করে তখন সে কত বড় অন্যায় করছে কল্পনাই করা যায় না। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিন, অনেক সাধু সন্ন্যাসীরাও অনেক সময় এই ভুল করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলছেন, আমার ঠিক ঠিক ভক্ত কাউকে কখন অসম্মান করে না।

এখানে যে ভক্তের এত গুণের কথা বলা হচ্ছে, গীতাতেও ভক্তের অনেক গুণ নিয়ে বলছেন, আর ভাগবতে তো কয়েক পাতা অন্তর অন্তর ভক্তের কি কি গুণ থাকতে হবে বর্ণনা করছেন। কিন্তু এতগুলো গুণ সবই একটা পয়েন্টকে কেন্দ্র করে চলছে। যখনই কেউ বলবেন ঈশ্বরই আছেন বা আত্মাই আছেন তখন তার ফলস্বরূপ অনেকগুলো জিনিস বেরিয়ে আসবে। আত্মাই আছেন। আমি কি? নাম আর রূপের একটা আবরণ। আপনি কি? আপনার উপরেও নাম আর রূপের আবরণ। এর সর্বোচ্চ যে অবস্থা সেটা তিনটে ধাপে চলে,

সর্বোচ্চ হল যিনি আত্মাকে বা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন। দ্বিতীয়, উপলব্ধি হয়নি কিন্তু তাঁরা বুদ্ধি দিয়ে জেনে গেছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি দৃঢ়, কোথাও কোন সংশয় নেই, কিন্তু এখনও প্রত্যক্ষ করেননি। তৃতীয় তিনি বুদ্ধি দিয়ে পুরোপুরি দৃঢ় হননি কিন্তু চেষ্টা করছেন যাতে ওখান পর্যন্ত পোঁছাতে পারেন। প্রথম দুজনকে ভক্ত বা জ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু যিনি চেষ্টা করছেন তিনিও ভক্ত, এমনকি আচার্য শঙ্করও বলছেন, যিনি চেষ্টা করছেন তিনিও জ্ঞানী। যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তিনিও জ্ঞানী, আর যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে তিনিও জ্ঞানী। সেইজন্য অনেক সময় আমাদের সংশয় হয়ে যায়।

এবার কল্পনা করা যাক, আমি যদি সত্যিই দেখি ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তাহলে আমাকে চিন্তা করে দেখতে হবে আমার ব্যবহারটা কি রকম হওয়া উচিত, আমার কি কি করণীয়? ভাগবত বলছেন ভক্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তকে কেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, কেন তিনি সত্যবাদী হবেন? তাহলে উল্টো দিক দিয়ে দেখতে হবে। মানুষ মিথ্যে কথা কেন বলে? লোভে পড়ে বা নিজেকে বাঁচানোর জন্য। লোভ কার থাকে? যার মধ্যে অপূর্ণতা আছে। ভয় কার থেকে? আপনি আমাকে মেরে দিতে পারেন, আপনার থেকে ভয় হয়। কিন্তু আমি যদি দেখি আমিও ভগবান আপনিও ভগবান, তাহলে কার থেকে আর ভয় পাব আর কোন জিনিসে লোভ করব? স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে সত্যবাদী হতে হবে। ঈশাবাস্যোপনিষদের খুব নামকরা কথা, *তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতি*, যখন সবাইকে এক দেখছি তখন আমি কাকে নিয়ে শোক করব আর কাকে নিয়েই বা মোহ করব। মায়ের চারটি সন্তান, মা কি কখন এক ছেলের পকেট থেকে টাকা চুরি করবে, আরেকজনের ভয়ে কুঁকড়ে থাকবে? কখনই করবে না। সন্তানদের সাথে তার একত্ব বোধ হয়ে আছে। ঠিক তেমনি যাঁরা ভক্ত তাঁদের এই একত্ব বোধটা হয়ে যায়। একত্ব বোধ হয়ে গেলে মিথ্যা কথা বলা, লোভ করা, মোহ হওয়া এগুলো সব খসে পড়ে যায়। ভক্তও তাই সত্যবাদী হয়ে যায়, কারণ মিথ্যা কথা বলার আর তার দরকার হয় না। কৃপামুর্তি কেন হয়? কারণ যেখানেই যাকে দেখছেন তাকেই তিনি নারায়ণ দেখেন, নারায়ণকে সেবা করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই কৃপামুর্তি হয়ে যান। নিজের লোকদের আমরা সবাই ভালোবাসি, ঈশ্বরের মাধ্যমে জগতটা যখন আমার হয়ে গেল তখন আমি সবাইকেই ভালোবাসব, সবারই প্রতি আমার কৃপা, করুণা থাকবে। তাহলে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কি হবে? ভক্ত কি বিয়েথা করবে? সংসার করা তার পক্ষে আর সম্ভবই হবে না।

একজন মুসলিম ফকির ছিলেন, একদিন নদী দিয়ে একটা ফল ভেসে যাচ্ছিল, খিদে পেয়েছিল উনি জল থেকে তুলে ফলটা খেয়েছেন। খাওয়ার পর ফকিরের মনে হল, আমি তো খুব অন্যায় করলাম, কারুর বাগান থেকে এই ফল পড়েছে, এটা তার সম্পত্তি। তিনি এখন তিন দিন ধরে নদীর পাড় দিয়ে হাটতে হাটতে খুঁজে বার করলেন এই ফলটা কার বাগানের। বাগানের মালিকের কাছে গিয়ে ফকির বলছেন, আমি খুব অন্যায় করেছি, আপনার বাগানের একটা ফল নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল আপনাকে না বলে আমি সেটাকে তুলে খেয়েছি। বাগানের মালিক বলছে, আগে আমার বাগান ছিল ঠিকই কিন্তু এখন অমুক রাজার হয়ে গেছে, কিছু দিন আগে বাগানের মালিকানা হাত বদল হয়ে গেছে। এবার ফকির এক মাস পায়ে হেটে ঐ রাজার দরবারে গেছেন। একজন ফকিরকে রাজদরবারে দেখে রাজা খুব অবাক। ফকির বলছেন, আমি খুব অন্যায় করেছি, নদী দিয়ে আপনার বাগানের একটা ফল ভেসে যাচ্ছিল আমি তুলে খেয়ে নিয়েছি। আমি খোঁজ নিয়ে বাগানের মালিককে বার করলাম, কিন্তু তার কাছ থেকে জানতে পারলাম বাগানটা এখন আপনার, তাই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। রাজা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। রাজা তখন নিজের মেয়েকে ডেকে আনলেন। মেয়েকে ডেকে এনে রাজা বলছেন, তুমি যে বলতে একজন ভালো লোককে বিয়ে করবে, এই সেই ভালো লোক, দুনিয়াতে এর থেকে তুমি আর ভালো লোক পাবে না, একে তুমি বিয়ে কর। তখন সেই ফকির বলছেন, দোহাই মহারাজ! আমি পারব না এই কাজ করতে। রাজা ফকিরের কথাকে কোন গুরুত্বই দিল না। বিয়ে হয়ে গেল। ফুলশয্যার রাতে মেয়েকে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সকালে উঠে দেখছে ফকির মারা গেছে। আল্লার ভক্ত বা ঈশ্বরের ঠিক ঠিক ভক্ত নারী-পুরুষের সম্পর্ককে নিতে পারবে না, ওর শরীরের পক্ষে সম্ভবই না। যিনি দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তিনি সত্ত্বগুণে এত বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান যে, নারী-পুরুষের সম্পর্ক হলে ওনাদের শরীরটাই থাকবে না। যাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর লক্ষণ গুলো এভাবে প্রকাশ পায়। আর যাঁরা

জিনিসটাকে বুঝে গেছেন কিন্তু এখনও উপলব্ধি হয়নি তাঁদের ক্ষেত্রেও এই একই লক্ষণগুলো দেখা যাবে। কিন্তু অনুভূতি সম্পন্ন পুরুষদের যে ব্যবহার, আর বুদ্ধি দিয়ে যাঁরা বুঝে গেছেন তাঁরা যা যা অনুশীলন করেন সেগুলোকেই আমাদের মত সাধারণ ভক্তদের দুটো চারটে কথায় বলে দেওয়া হয়, সত্য কথা বলবে, বেশি লোভ করবে না, অপরের জিনিস কখন না বলে নিতে নেই ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ আরও কিছু কিছু লক্ষণের কথা বলছেন। ছয়টি কর্ম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জন্ম ও মৃত্যু, এখানে মূলতঃ বলতে চাইছেন যে কোন দ্বন্দ্ব ভাব। যে কোন দ্বন্দ্ব ভাবে তার উল্টোটাও আছে, যেমন খিদে আছে, খিদে মিটে যাওয়া আছে, তৃষ্ণা আছে, তৃষ্ণার নিবারণ আছে, ঠিক তেমনি জন্ম আছে মৃত্যু আছে, শীত আছে গরম আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমার ভক্ত যে কোন দ্বন্দ্বের পারে চলে যায়। সমগ্র গীতায় ভক্তের যে লক্ষণ বলছেন বা পুরো ভাগবতে ভক্তের যে লক্ষণ বলছেন, সবটাই একত্বকে আধার করে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ।।১১/১১/৩২।।* মানুষের ধর্ম আর তার আচরণ কি হবে বেদ আর শাস্ত্রে আমি সেই উপদেশ দিয়েছি। বেদের সংজ্ঞাই হয় বিধি আর নিষেধ, বেদকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখনও বলা হয়, বেদ মানে যিনি ধর্মের আদেশ করেন। ধর্ম কি? ধর্ম মানে বিধি নিষেধ, কি কি করবে আর কি কি করবে না। বিধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকলে সে স্বর্গে যাবে, বিধির উল্লজ্ঘন করলে নরকে যাবে। ধর্মে যিনি প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন তাঁকে বিধি আর নিষেধ এই দুটোকে ভালো করে জানতে হবে। এখন হঠাৎ যদি পরিষ্কার আকাশ থেকে মাথায় জল পড়ে, তখন সন্দেহ হবে, এই জলটা কোথা থেকে এলো, কাক প্রস্বাব করল নাকি পায়রা প্রস্বাব করল, কাকে প্রস্বাব করলে কটা ডুব দিতে হবে, পায়রা প্রস্বাব করলে কবার ডুব দিতে হবে, এগুলোর ব্যাপারে শাস্ত্রে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, তা নাহলে একজন পণ্ডিতের কাছে গিয়ে জানতে হবে কোনটাতে কি কি দোষ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমার ভক্ত তার মন পুরোপুরি আমাতে দিয়ে রেখেছে, সেইজন্য তার আর বিধি নিষেধ কোনটাই খাটে না। বেদের উপদেশ পালনে মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। যারা বেদ আর শাস্ত্রের কথা উল্লজ্ঘন করে তারা নরকাদি লোকে গিয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি এই ধর্মাচরণকেও বিক্ষেপ মনে করে জাগতিক সব কিছু পরিত্যাগ করে শুধু আমারই ভজনা করেন, তিনিই আমার ঠিক ঠিক ভক্ত। যিনি সর্বত্র ঈশ্বরকে দেখেন তিনি বিধি নিষেধের পারে। গীতায় ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন *অনন্যাশ্চিন্তয়োত মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে*, সেইজন্যই গীতাকে সর্বশাস্ত্রের সার বলা হয়। যে কোন ধর্মের একটা ধর্মগ্রন্থ আছে, যে কোন ধর্মই ওই ধর্মগ্রন্থের বিধি ও নিষেধের উপর চলে। ধর্ম বলছে যারা এই বিধি পালন করবে তারা স্বর্গে যাবে, যারা বিধি ও নিষেধকে উল্লজ্ঘন করবে তারা নরকে যাবে। কিন্তু যিনি মহাত্মা, যিনি ভক্ত, যিনি সর্বত্র ঈশ্বর দেখছেন তাঁর আর এসবের দিকে বাস্তবিক কোন হুঁশ থাকে না। বলছেন, যিনি বিধি নিষেধের পারে তিনি সন্ততম। প্রথম থেকে ভক্তের যে আলোচনা করছেন, সবটা ধরলে ভক্ত তিন শ্রেনীর হয়ে যাবে, প্রথম হল যাঁর উপলব্ধি হয়ে গেছে, দ্বিতীয় হল যিনি বৌদ্ধিক স্তরে একটা দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত আর তৃতীয় যিনি বিধি নিষেধ পালন করছেন।

এসব বর্ণনা করার পর নানান রকম আচরণের কথা এবং উদ্ধবকে কি কি করতে হবে বলছেন। যেমন বলছেন – আমার মুর্তি দর্শন করতে আসবে, আমার ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তাঁদের স্পর্শ করবে, প্রণাম করবে, স্তুতি করবে, তাদের সেবা শুশ্রুষা করবে। বিশেষ বিশেষ দিনে যেমন রামনবমী, জন্মাষ্টমীর মত পবিত্র দিনে মন্দিরে, গৃহে নানান ভাবে উৎসবাদি করাবে, এই রকম ধরণের অনেক কিছু করার কথা বলছেন। শিখরা যেমন গুরুদ্বারে করসেবা করে এখানেও সেই রকম করতে বলছেন – মন্দিরে যাবে, গিয়ে সেখানে ঝাঁটা দিয়ে সব পরিষ্কার করবে। আর সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য দ্বারা উৎসবাদির আয়োজন করবে। আর তার সাথে কিছু ইষ্টাপুর্ত কর্ম করবে, যেমন গাছ লাগানো, পুকুর কাটানো, এগুলো করলে মনটা বিনয়শীল হয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর কথা বলছেন, *অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্। অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্।।১১/১১/৪০।।* অহঙ্কার করবে না, দম্ভ রাখবে না আর ভালো কাজ করে অহেতুক প্রচার করবে না। এসব বলার পর বলছেন, আমাকে যা কিছু অর্পণ করেছে, ভক্ত সেগুলো কখন নিজের কাজে

আর ব্যবহার করবে না। এমনকি যে দীপ আমার সামনে দেওয়া হয়েছে, সেই দীপের আলোও নিজের কাজে লাগাবে না। শ্রীমা বলছেন, ঠাকুর যখন ছিলেন তখন কে এসে তাঁর সেবা করত আর এখন কত ভালো মন্দ রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দেয়। কেন দেয়? নিজেরা খাবে বলে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার ভক্ত যা কিছু আমাকে অর্পণ করে সেগুলো তারা আর কোন ভাবেই তাদের নিজেদের কাজে লাগাবে না। প্রায়ই বলা হয় প্রসাদে লোভ করতে নেই, কারণ সাধারণ ভাবেই কোন কিছুতে লোভ করতে নেই। প্রসাদে লোভ মানে, ঈশ্বরের নিবেদিত করা হয়েছে বলে সেই ভোগের মাহাত্ম্য তার কাছে কিছু নয়, কিন্তু তার নজর ভোজ্য জিনিসের প্রতি। শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার বলছেন দরকার হলে কোন গরীবকে দিয়ে দাও, দান করে দাও, কিন্তু নিজের কাজে কখনই ব্যবহার করা যাবে না। আমাদের মধ্যে যাতে লোভ বুদ্ধি, পাপ বুদ্ধি না আসে সেইজন্য বলছেন।

আরেকটি খুব সুন্দর কথা বলছেন *সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্। ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে।।১১/১১/৪২।।* আমাদের বর্তমান প্রচলিত হিন্দু ধর্ম এই সব শ্লোককে আধার করেই দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি জিনিস ঈশ্বরের পূজার স্থান। ঈশ্বরকে আমরা সাক্ষাৎ দেখতে পাই না, কিন্তু পূজা যখন করব তখন কাকে কাকে পূজা করব? শ্রীকৃষ্ণ তাই কয়েকটি জিনিসের নাম করে বলে দিচ্ছেন, এগুলোতে আমার বিশেষ প্রকাশ – সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈষ্ণব বা বিষ্ণুর ভক্ত, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, আত্মা এবং সমস্ত প্রানী। এর মধ্যে পঞ্চভূতও অন্তর্ভুক্ত আর সমস্ত প্রানীর যে কথা বলছেন, এটাকেই স্বামীজী বিরাটের পূজার কথা বলছেন, মুর্তিতে পূজা হতে পারে আর জ্যন্ত মানুষে কেন পূজা হবে না, তার মধ্যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রকাশ। স্বামীজী তাই বলছেন, সমস্ত ভারতবর্ষের সেবা করাই নতুন ধর্ম। কিন্তু ভারতবর্ষে নতুন কথা বলা যাবে না। আমি যদি কোন নতুন কথা বলি তখনই আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এই কথা বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? তখন আমাকে বলতে হবে, এই কথা বেদে আছে বা ভাগবতে আছে, কথামৃতে আছে। স্বামীজী বা ঠাকুর এনারাও নতুন কোন কথা বলতেই পারবেন না, নতুন কথা ভারত কোন দিন নেবে না। কিন্তু স্বামীজী কি করলেন, কোন কোন জিনিসে তিনি বেশি জোর দিতে শুরু করলেন, যে জিনিস গুলোতে এতদিন জোর দেওয়া হয়নি। এখানে ভাগবতে একটা শ্লোকে বলে দিলেন কার কার পূজা করা হবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। সূর্যের পূজা করবে, আমরা এখনও করে যাচ্ছি, অগ্নির পূজা করবে অগ্নিরও পূজা করছি, গরুর পূজো পুরোদমে ভারত করছে, গোমাতা ভাগবত থেকেই এসেছে, ব্রাহ্মণের পূজা সব জায়গাতেই করা হয়, ব্রাহ্মণ দেবতা এই শব্দ কিছু দিন আগেও ব্যবহার হত, ভাগবত থেকেই এসেছে। বাহ্য পূজার জন্য এই কটি জিনিস, তার মধ্যে ভারতে অগ্নি, আকাশ, বায়ু, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি দিয়ে সব কিছুকে শুদ্ধি করা হয়। ইদানিং সাবান, শ্যাম্পু দিয়ে মানুষ শুদ্ধি করছে ঠিকই, কিন্তু এগুলোও পৃথিবীর অঙ্গ কারণ যেখানেই গন্ধ সেখানেই পৃথিবীর তন্মাত্রা বেশি থাকবে। এখানে যদিও পৃথিবীর পূজার কথা বলছেন, কিন্তু পৃথিবীর পূজা এখন আর হয় না, লাটু মহারাজও স্বামীজীকে বিদেশ থেকে ফেরার পর জিজ্ঞেস করছেন, লোরেন ভাই! তুমি তো অনেক দেশ বিদেশ ঘুরলে, কোথাও কি শুনেছ যে পৃথিবীর পূজা হয়। আগে হয়ত ছিল, তা নাহলে ভাগবতে আসত না। আত্মার পূজা তো হয়ই, ধ্যান আত্মারই হয়। কিন্তু সমস্ত প্রানীর পূজা, শব্দটা হল সর্বভূতানি, সমস্ত ভূতের পূজা। সর্বভূতানির পূজা ভারতবর্ষে কখনই সাধনা রূপে নেওয়া হয়নি, স্বামীজীই প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষের পূজার উপর জোর দিলেন, এটাই বিরাটের পূজা।

অধ্যায়ের সমাপ্তি করতে গিয়ে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ সৎসঙ্গ ও ভক্তিযোগের সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন *প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব। নোপ্যায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্ প্রায়ণং হি সতামহম্।। ১১/১১/৪৮।।* এর আগে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ভক্তিযোগের কথা বলছেন। মূল কথা বলছেন – হে উদ্ধব, তুমি জেনে নাও, যারাই আমাকে ভক্তি করতে চাইছে, যারাই আমাকে পেতে চাইছে, যারাই এই সংসারের পারে যেতে চায় তাদের জন্য দুটি উপায়, প্রথম সৎসঙ্গ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ। কথামৃতে ভাগবতের প্রচুর মিল পাওয়া যায়, ঠাকুর ভাগবত খুব মনযোগ দিয়ে শুনতেন। ঠাকুর যা যা অনুভব করেছেন, ঠাকুরের অনুভূতি আর এই কথাগুলো মিলিয়ে সার হয়ে কথামৃতে বেরিয়ে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সাধুরা মনে করে আমিই তাঁদের একমাত্র আশ্রয়। সত্যিই তাই, যে কোন ভালো সাধু ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর উপর নির্ভর করেন না। ভগবান

বলছেন, সেইজন্য আমিও তাঁদের কাছে থাকি। যার ফলে যারাই সাধুসঙ্গ করবে তাদের মধ্যে ভক্তিভাব স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। তুলসীদাস এটাকে আবার আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলছেন, বিভুসত সঙ্গ বিবেক ন হুই, আমরা যে ঈশ্বরের দিকে যাব ভাবছি, এই বিবেক সৎসঙ্গ ছাড়া আসবে না। তুলসীদাস তারপর বলছেন, রামকৃপা বিনু সুলভ ন সই, সাধুসঙ্গ ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হবে না। এটা অবশ্য তুলসীদাসের মত। খুব সহজ কথা হল, আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, আমার হাত-পা যতদূর যাচ্ছে, ঐটুকু আমার এলাকা, ঐ এলাকার মধ্যে আমাকে কাজ করে যেতে হবে। যদি কাউকে আমার মনে হয় ইনি সাধু, আমাকে তাঁর কাছে যেতে হবে, তাঁর কথা শুনে সেইভাবে আমাকে চলতে হবে। আর যদি মনে করি সব সাধুই ভণ্ড, তাহলে কোন দিনই আমার কিছু হবে না।

ভক্তিযোগ মানে – আমার ভক্তজনদের দর্শন করবে স্পর্শন করবে, আমার বিগ্রহের পূজা করবে, স্তুতি করবে, প্রণাম করবে, আত্মনিবেদন করবে, বিশেষ বিশেষ দিনে পূজো অর্চনা করবে। যেমন সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণে বিশেষ পূজা অর্চনা করবে। গ্রহণের যে দোষ-টোষ বলা হয় এগুলো মানুষকে বোঝানোর জন্য। অন্য দিনগুলি একটা স্বাভাবিক রুটিনের মধ্যে চলতে থাকে। আজ প্রকৃতিতে হঠাৎ একটা অন্য নিয়ম এসে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করে, গ্রহণের সময় এই এই করতে বলছে এর বৈজ্ঞানিক কি ব্যাখ্যা? কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন হলে আনন্দ করে সবাই খাওয়া-দাওয়া করে, ঠিক তেমনি আজকে একটা বিশেষ দিন বলে ভক্তরা ভগবানের বিশেষ পূজার আয়োজন করে। সাধারণ লোকের মন ঈশ্বরের দিকে যেতে চায় না, সেইজন্য বলে চন্দ্রগ্রহণে কেতুর আর সূর্যগ্রহণে রাহুর প্রভাব বেড়ে গেছে, এই সময় অন্য কিছু করবে না, শুধু ঠাকুরের নাম করে যাও। এমনিতে তো ভগবানের নাম করবে না, কিন্তু যেই রাহু কেতুর নাম বলে দিল সবার মনে ভয় ঢুকে গেল, রাহু আর কেতু খুব অশুভ জিনিস, কি জানি বাপু কি হয়ে যাবে, তার থেকে বরং ঠাকুরের নাম করি। এইভাবে কৌশল করে ভগবানের দিকে মনটা ঠেলে দেওয়া হল। ঋষিদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে করেই হোক টেনে হিঁচড়ে ভগবানের দিকে মনটাকে ঠেলে দেওয়া। ষোড়শ সংস্কার, বিভিন্ন রকমের ব্রতপালনের কথা এই কারণেই তাঁরা বলে গেছেন। এই ফাঁকে তাকে একটু উপোস করিয়ে দাও, একটু ইন্দ্রিয় সংযম করিয়ে নাও। ছেলে আর মেয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে, বিয়ের পর তারা ভোগই করবে, আনন্দ করবে, স্ফুর্তি করবে। কিন্তু তার আগে তাদের দিয়ে সারাদিন উপোস করিয়ে নিচ্ছে, যজ্ঞ করিয়ে নিচ্ছে, কত রকমের মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে নিচ্ছে। ভোগে নামার আগে কিছু করিয়ে নেওয়া হল। ঋষিরা ফাঁক পেলেই একটা কিছু ঢুকিয়ে যতটুকু পারা যায় ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিয়ে নিচ্ছেন। আরও আছে, ঈশ্বর চিন্তার সাথে সাথে মানুষকে কীভাবে নিঃস্বার্থ করা যায় তার জন্য শাস্ত্রে বলে দিলেন তোমার সন্তান হয়েছে দান কর, তোমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে দান কর, তোমার বাবা-মা কেউ মারা গেছেন দান কর। মানুষ তো মহাস্বার্থপর, নিজেরটুকু ছাড়া আর কিছু সে জানে না, আর সব কিছুতে আসক্ত হয়ে আছে। কিন্তু এইভাবে মানুষের শক্তপোক্ত কঠোর স্বার্থপরতার ইমারতটাকে একটা আলগা করে দিচ্ছেন। ভক্তিযোগ মানেই তাই, নিঃস্বার্থপরতা আর যখনই সুযোগ পাবে তখনই ঠাকুরের নাম করে যাবে। আর তার সঙ্গে কি করবে? সৎসঙ্গ, মানে সাধুদের সঙ্গ করা। ঈশ্বরের যাঁরা ভক্ত, যিনি শুধু ঈশ্বর-চিন্তন নিয়ে আছেন সেই রকম সাধুপুরুষের সঙ্গ করা। ঠাকুরও একই উপদেশ দিচ্ছেন, যখনই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হত যারা বিষয়ী তাদের উপায় কি? সব সময়ই ঠাকুর বলছেন সাধুসঙ্গ করতে। সাধুসঙ্গ করলে কি হয়, সাধুর প্রভাবে ঈশ্বরের ভাবটা একটু একটু করে ভেতরে আসতে থাকে। সাধুসঙ্গ না করলে মনে ঈশ্বরীয় ভাব জাগার সুযোগ পায় না। আবার শুধু সাধুদের সঙ্গ করলেই হয়ে যাবে না, তাঁরা যে রকমটি আচরণ করেন, সেগুলো নিজের জীবনে অভ্যাস করতে হবে। সাধুদের কিছু কিছু গুণ আছে, যেমন নির্বিকার থাকা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু জিনিস সঙ্গে না রাখা ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের এমনই স্বভাব যে সাধুদের যদি কোন গোলমাল দেখে সেগুলিকে সে নকল করতে শুরু করে। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগ করবে। বেলুড় মঠের সাধুদের সবারই কিছু না কিছু বিশেষ গুণ আছে, ঠাকুরের প্রতি তাদের কি অসীম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ভাবা যায় না, কত সহজ সরল জীবন। মানুষ হিসাবেও অনেক উচ্চস্তরের। এগুলোই নিজের জীবনে অনুকরণ করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সাধুসঙ্গ আর ভক্তিযোগ, এই দুটো একসাথে পালন করতে হবে। এখানে ভক্তিযোগ বলত এতক্ষণ যা যা করতে বলছেন, এটাই বৈধীভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমার মতে এছাড়া আর কোন গতি নেই। কারণ, সন্তপুরুষরা আমাকেই তাঁদের একমাত্র আশ্রয় মনে করেন, তাঁরা জানেন ঈশ্বর ছাড়া আমার কোন আশ্রয় নেই। আমিও তাঁদের সাথে সাথে থাকি। সেইজন্য সাধুসঙ্গ করলে আমার প্রতি ভক্তিটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, আমার প্রতি ভক্তির প্রেরণাটা সাধুদের থেকেই আসে। আমার প্রতি ভক্তি চলে আসার পর ভক্তিযোগ পালন করা, যে ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলো নিষ্ঠাপূর্বক পালন করতে থাকা। এটাই ভক্তিযোগ। কিন্তু শুধু ভক্তিযোগ করে গেলেই হবে না, যতক্ষণ সাধুসঙ্গের দ্বারা সাধুর প্রেরণা না পাওয়া যাবে ততক্ষণ শুধু ভক্তিযোগ করে গেলে কোন দিন এগোতে পারবে না। সাধুর inspirationও চাই আর নিজের respirationও চাই, respiration মানে ঘাম ছাড়ান। ঘাম কি করে ছাড়বে? খাটতে হবে। খাটা মানে, ভক্তিযোগ। তার সাথে সাধুদের প্রোৎসাহ চাই। পরের অধ্যায়ে যাওয়ার আগে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন। সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা।।১১/১১/৪৯।।* হে উদ্ধব! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সেবক, হিতৈষী, সুহৃদ, প্রেমী সখা আর তুমি আমার কথা শুনতেও আগ্রহান্বিত তাই তোমাকে আমি এখন অত্যন্ত গুহ্য কথা বলব। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সৎসঙ্গ করলে কি হয় আর কর্ম, কর্মত্যাগ এগুলোকে ব্যাখ্যা করছেন।

সৎসঙ্গ, কর্ম, কর্মত্যাগ ও নিঃসঙ্গত্বের মহিমা

একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যের কথা বলছেন, *ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা।। ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মান্।।১১/১২/১-২।।* একটা কথাকেই দুটো শ্লোকে বলছেন, প্রথমে যত রকমের সাধনা, উপাচারের অনুশীলন হয় তার একটা তালিকা দিচ্ছেন, সেখানে যোগ, সাংখ্য, ধর্মপালন, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্তি, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, বেদ, তীর্থ এবং যম-নিয়ম যত রকমের সাধনা, উপাচারের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি সবটাই বলে দিয়ে বলছেন *যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মান্,* যদি নিঃসঙ্গ হতে হয়, আসক্তিশূন্য হতে হয় তাহলে এর জন্য সব থেকে শ্রেষ্ঠ পথ হল সৎসঙ্গ, নিঃসঙ্গ হওয়ার এর থেকে আর ভালো পথ নেই। নিঃসঙ্গ সবাই কম বেশি অনুশীলন করছে, যার কাছে অনেক টাকা-পয়সা আছে সে দান দক্ষিণা দিচ্ছে, তার তো নিঃসঙ্গে হচ্ছেই, নিজের বোঝা হাল্কা করছে। ঘরবাড়ির সুখ ছেড়ে মানুষ যখন তীর্থে যায়, তাতেও নিঃসঙ্গ হচ্ছে। কিন্তু সৎসঙ্গের মত আর কিছুতে নিঃসঙ্গ হতে পারে না। সৎসঙ্গের মহিমার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবান এই কথা বলছেন।

নিঃসঙ্গ জিনিসটা কি, নিঃসঙ্গকে ভগবান কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন আর সৎসঙ্গ কেন নিঃসঙ্গ করে, আমাদের ভালো করে বোঝা দরকার। আত্মার স্বরূপই হল শুদ্ধ আর জগৎ মানেই আসক্তি, নিঃসঙ্গ মানে আসক্তিটাকে ফেলে দেওয়া। ঈশ্বর দর্শন, ভক্তি লাভ এই কথাগুলো শুনলেই আমরা ভাবি এই এই করলে এই হবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মে সাধনও যা সিদ্ধিও তাই, যেটা পথ উদ্দেশ্যও সেটাই হয়। উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরও যা আত্মাও তাই, আত্মা হলেন শুদ্ধ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আমাদের যে জীবন চলছে, সেখানে আমরা যাই করি না কেন, এমন কি বই পড়ছি, মানুষের সেবা করছি, ধর্মশাস্ত্রের দিক থেকে এর সবটাই অশুদ্ধি। শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে সেটাও অশুদ্ধি, মানুষকে যখন ভালোবাসছে সেটাও কিন্তু অশুদ্ধি। কিন্তু যিনি আত্মা তিনি শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, সেইজন্য আত্মাকে পাওয়ার জন্য অনাসক্তি বা নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া গতি নেই। স্বামীজী বার বার বলছেন নিঃস্বার্থপর হও, নিঃস্বার্থপর হও। পুরো গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলছেন, সেখানেও ভগবান নিঃসঙ্গ হওয়ার কথাই বলছেন, যেখানে ভক্তি করতে বলছেন সেখানেও নিঃসঙ্গ হতেই বলছেন। সাধারণ লোকের ক্ষমতা সীমিত, সেইজন্য অবলম্বন রূপে ঠাকুরকে ধরছে কিন্তু বাকি যা কিছু আছে সব ছেড়ে দিচ্ছে। ঠিক ঠিক সাধনা বলতে নিঃসঙ্গ হওয়াটাই ঠিক ঠিক সাধনা, নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া অন্য কোন সাধনা নেই। কাউকে যে দান করছে, দক্ষিণা দিচ্ছে তাতেও সে নিঃসঙ্গই হচ্ছে, বহু কষ্ট করে উপার্জন করে কটি টাকা

পেয়েছে, সেই কষ্টোপার্জিত টাকাকে সে ছেড়ে দিচ্ছে, নিঃসঙ্গ তো হচ্ছেই। যজ্ঞ করছে, ধ্যান করছে, তীর্থে যাচ্ছে সবেতেই নিঃসঙ্গ হচ্ছে। সেইজন্য বলছেন উদ্দেশ্য হল নিঃসঙ্গ। আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন বা উপলব্ধির দ্বিতীয় শেষ ধাপটাই *নিঃসঙ্গত্বম*। নিঃসঙ্গ না হলে শেষ ধাপে যেটা হয় সেটা হবে না। ক্ষেত প্রস্তুত থাকলে তাতে বীজ পড়লে ফসল হয়। দ্বিতীয় শেষ ধাপটা হল ক্ষেত তৈরী হওয়া, ক্ষেত তৈরী হওয়াটাই *নিঃসঙ্গত্বম্*। আত্মা শুদ্ধ নিষ্পাপ, তার মানে আত্মা কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে নেই। কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে না থাকাটাই যার স্বভাব, এটাই তার সিদ্ধ অবস্থা। তার সাধনা কি হবে? নিঃসঙ্গত্বমই তার সাধনা। যদি নিঃসঙ্গ হয় তাহলে তার অন্যান্য দিকে কি হবে, নিঃসঙ্গত্বমই হবে। তাহলে নিঃসঙ্গ হওয়াটাই তো আত্মতত্ত্বে পৌঁছানো, নিঃসঙ্গই একমাত্র সাধনা। কিন্তু দুম্ করে নিঃসঙ্গ হওয়া যায় না, পাগল হয়ে যাবে।

মানুষ বন্ধন ছাড়া থাকতে পারে না, সংসার মানেই বন্ধন আর মুক্তি মানেই নিঃসঙ্গত্বম্। নিঃসঙ্গ হওয়াই মুক্তি আর সঙ্গ হওয়াই মানে বন্ধন। সংসারে যারাই আছে সঙ্গ ছাড়া তারা থাকতেই পারবে না। সারা জীবন কাউকে ভালোবাসল না, বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে কোথা থেকে একটা কুকুর বা বেড়ালের বাচ্চা জোগাড় করে তার যত্নআত্তি করতে থাকে। সারা জীবন ব্যাচেলার হয়ে কাটিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে কোন ভাইপো, নাতি নিয়ে এসে কাছে রেখে দেয়। সারা জীবনে যত ভালোবাসা জমে ছিল সব ওর উপর গিয়ে উথলে পড়ে। মানুষ এর থেকে বেরোতে পারে না, কারণ সংসার মানেই হয় সঙ্গ। নিঃসঙ্গ হওয়ার অনেক পথ আছে। সঙ্গ মানেই আসক্তি, আসক্তিকে অনেক কিছু জিনিসই নাশ করে। যিনি ব্রত করেন ব্রততে নাশ হয়, যিনি স্বাধ্যায় করেন তাতে নাশ হয়, এক এক করে বলছেন যজ্ঞ করলে, তপস্যা করলে, দান করলে নাশ হয়। কিন্তু নিঃসঙ্গ হওয়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা কি? ভগবান বলছেন সাধুসঙ্গের মত আর কিছুতে এত সহজে নিঃসঙ্গ হওয়া যায় না। সাধুসঙ্গকে এখানে বলছেন *সৎসঙ্গঃ*, সৎসঙ্গ মানেই সাধুসঙ্গ করা। ঠাকুরও বার বার সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। সাধুসঙ্গকেই ভাগবতে সৎসঙ্গ বলছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন, যেখানে গীতায় একাকী থাকার কথা বলছেন সেখানে সৎসঙ্গটাও একা থাকার মতই। একা একা থাকা মানে কোথাও যেন আসক্তি না থাকে, কোথাও যেন সঙ্গের ভাব না থাকে। সাধুসঙ্গ একা থাকার মতই, ওখানে কোন আসক্তি হয় না। ঠাকুর যেমন বলছেন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়, ঠিক তেমনি সাধুসঙ্গ সঙ্গের মধ্যে নয়। তবে সমাধিবান হয়ে গেলে তখন আর কোন কিছুরই দরকার হয় না। কিন্তু সমাধি থেকে মন নেমে এলে তখন কার সাথে কথা বলবেন, তখনও সাধুসঙ্গই করেন। কিন্তু সাধুসঙ্গ যে সমাধিবান পুরুষের দরকার তা নয়, গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে বলছেন এক একাই থাকেন, তবে যদি সঙ্গ করতে হয় সাধুসঙ্গই করেন।

সাধুসঙ্গ করলে কেন নিঃসঙ্গত্ব হয়? সাধুসঙ্গে একমাত্র লাভ *নিঃসঙ্গত্বম্*। সাধু কে? ঠাকুর বলছেন যাঁর মন ও প্রাণ সর্বদা পুরোপুরি ঈশ্বরে লেগে আছে, এর বাইরে সাধুর অন্য আর কোন সংজ্ঞা হয় না। যে কেউই তো বলতে পারে আমার মন প্রাণ সব সময় ঈশ্বরে লেগে থাকে, আমরা কি করে বুঝব তিনি ঠিক সাধু কিনা? ঠাকুর এর খুব সুন্দর লক্ষণ বলছেন, যাঁকে দেখলে মনে ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বর চিন্তন উদয় হয় তিনি সাধু। ওনার তরফ থেকে সংজ্ঞা হল, যাঁর মন প্রাণ সর্বদা ঈশ্বরে আছে আর আমাদের তরফ থেকে সাধুর পরিভাষা হল যাঁকে দেখলে মনে ঈশ্বর চিন্তন জাগে। যাঁকে দেখে মনে ঈশ্বর চিন্তনের উদয় হয়, এরপর কি হবে? সাধুসঙ্গে কি ফল হয় এর উপর খুব নামকরা কাহিনী আছে, আনন্দ ভগবান বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন, তাঁকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। উনি একদিন ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন, ঘুরতে ঘুরতে ওনার পিপাসা পেয়েছে। একটা গ্রাম্য মেয়ে ইজারা থেকে জল তুলছিল, আনন্দ কাছে গিয়ে বলল, আমাকে একটু জল দাও। মেয়েটি জল দিল, পান করার পর আনন্দ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য মেয়েটিকে খুব মিষ্টি করে কৃতজ্ঞতা জানাল। মেয়েটি অত্যন নিম্ন জাতির ছিল, তার সাথে ঐ রকম মিষ্টি ব্যবহার করতে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে আনন্দের পেছনে পেছনে হাটতে শুরু করে দিয়েছে। আনন্দ আশ্রমে পৌঁছে গেছেন, মেয়েটিও তাঁর পেছনে পেছনে আশ্রমে পৌঁছে গেছে। আনন্দ তাকে ভগবান বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন। ভগবান বুদ্ধ মেয়েটিকে বলছেন, তুমি আনন্দের মধ্যে কি দেখে ওকে ভালোবেসেছ? মেয়েটি বলল, ওর ওই মিষ্টি ব্যবহার দেখে। তখন ভগবান খুব সুন্দর কথা বলছেন, যেটা তুমি অপরের মধ্যে ভালোবাসছ সেটাকে নিজের মধ্যে রাখলেই তো হল, ওটাকে

তোমার মধ্যেই জাগিয়ে নাও। শুধু ওই একটি কথা শুনে মেয়েটি তখনই ভিক্ষুণী হয়ে গেল। আনন্দের মিষ্ট ব্যবহার তাতে মেয়েটির মধ্যে যে ভালোটা সুপ্ত ভাবে ছিল সেটা জেগে গেছে। মেয়েটি মনে মনে দেখছে আমি এর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম, যা আমার হওয়ার হবে। আনন্দ কিন্তু এই সমস্যাটাকে সামলাতে পারল না। আনন্দও সাধু, ভিক্ষু কিন্তু তিনি পারলেন না, অথচ ভগবান বুদ্ধ একটা বাক্যে সব কিছুর সমাধান করে দিলেন। তুমি যে ওকে ভালোবেসেছ, নিশ্চয়ই ওর কোন গুণ দেখে ওকে ভালোবেসেছ, অপরের ঐ গুণ দেখে যদি তুমি তাকে ভালোবাস, পূজা কর, ঐ গুণটা নিজের কাছে রাখলেই তো হল। এই একটা বাক্য মেয়েটির জীবনটাই পুরো পাল্টে দিল। সৎসঙ্গে ঠিক এটাই হয়। আমাদের অনেকেই বলেন আমি অমুক মহারাজের সঙ্গ করেছে, আমি প্রভু মহারাজের সঙ্গ করেছি, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের সঙ্গ করেছি আর এই মেয়েটি যে কাহিনী বলা হল, দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়? এখানেই পাত্রতার সমস্যা হয়ে যায়। এই মেয়েটি যদিও নীচু জাতির কিন্তু ওর ভেতরটা তৈরী ছিল, যার ফলে একটি কথা ভেতরে গেছে আর তার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেল। ঠাকুর বলছেন সাধুসঙ্গে আদাড়ে বাদাড়ে গুলোর কিছু হয় না, সাধুর কমণ্ডুলু সাধুর সাথে চার ধাম ঘুরে আসে কিন্তু যেমন তেতো তেমন তেতোই থাকে। বেশির ভাগই এই সাধুর কমণ্ডুলুর মত, যতই বেলুড় মঠে মহারাজদের পেছন পেছন ঘুর ঘুর করুক এদের কিছুই হবে না। প্রস্তুতিটা নিজেকেই করতে হয়।

এই রকম আরেকটি কাহিনীতে ভগবান বুদ্ধের শিষ্য উপগুপ্তকে দেখে এক নর্তকী উন্মাদিনী হয়ে গেছে। উপগুপ্ত তো প্রাণ ছেড়ে পালিয়েছে। পড়ে নর্তকীর কুষ্ঠ হয়ে গেছে, তখন তার রূপ যৌবন সবই শেষ। ভগবান বুদ্ধ তখন উপগুপ্তকে বললেন, এবার তুমি নর্তকীর কাছে যাও। উপগুপ্ত এসে নর্তকীকে সেবা করে করে সারালেন। পরে সেও ভিক্ষুণী হয়ে গেল। যখন কেউ মানসিক ভাবে একেবারে প্রস্তুত বা শোকে মগ্ন তখন ভগবানের কথা গিয়ে কাজ করে। যেমন অর্জুনের ক্ষেত্রে হল, অর্জুনের ভগ্ন হৃদয়, ভগবানের একটা কথা গেল অর্জুন সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। আনন্দের কি গুণ ছিল? তিনি স্নেহ মমতা দিয়ে একটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এই জিনিস তো আমরা সব সময়ই করতে পারি, এটাকেই যে কেউ তার জীবনের আদর্শ করে নিতে পারে। যে সাধারণ মূল্যবোধ গুলো আছে, সততা, করুণা, নিয়মানুবর্তিতা, সবারই প্রতি মৈত্রীর ভাব এগুলোকে যে কেউ অনুশীলন করতে পারে, এর জন্য বিরাট কিছু করতেও হবে না। বাচ্চারা যেমন শচীন তেণ্ডুলকারের ফ্যান, তাই বলে সে শচীন তেণ্ডুলকার হয়ে যাবে না, তার জন্য তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু এগুলো ভেতরের কোয়ালিটি, আমাদের যেটা স্বাভাবিক স্বভাব। আমাদের স্বভাবই হল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি এগুলো বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, ওগুলোকে বার করে দিলেই হল। করুণার ভাব আমাদের স্বাভাবিক, স্নেহের ভাব, মৈত্রীর ভাব এগুলো স্বাভাবিক, কিন্তু যেটা আমরা করছি সেটা অস্বাভাবিক। আমি রেগে যাচ্ছি, এটা অস্বাভাবিক, আমি লোভ করছি, এটা অস্বাভাবিক, আত্মার দৃষ্টিতে এগুলো সবই অস্বাভাবিক। যদি আমি শুদ্ধ আত্মা হই, আমার সামনের লোকটি যদি শুদ্ধ আত্মা হয়, আমি কি করে তার ক্ষতি করতে পারব, কি করে তাকে হিংসা করব, কি করে তার প্রতি ক্রোধ করব, কি করে তার জিনিসের প্রতি লোভ করব। এই ভাবগুলো উদয় হয় সাধু সন্ন্যাসীকে দেখলে। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগ করবে। সাধুকে যখন দেখছে তিনি ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া কিছু করেন না, বিদ্যাচর্চা ছাড়া কিছু করেন না, তখন তারও ইচ্ছা জাগবে। বাড়িতে বাবা-মা যা করে তাদের বাচ্চারাও তাই করে। ঠিক তেমনি আমরা যাদের সাথে মেলামেশা করি তারা যা আলোচনা করে, যে রকম ব্যবহার করে সেগুলোই আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করবে। সাধুসঙ্গে এটাই লাভ। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তন করেন বলে তাঁরা নিঃসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। সাধুর সাথে সঙ্গ করতে শুরু করলে তারও মধ্যে নিঃসঙ্গের ভাব আসবে। বলছেন, সাধুসঙ্গে এই জিনিসগুলো যত জোরালো ভাবে আসে অন্য কিছুতে আসে না। কারণ অন্য জিনিসে human factor involve থাকে না। জীবন্ত কিছু থাকলে তার শক্তিটা অনেক বেড়ে যায়। যখন তীর্থ করছি তখন নিজের মত তীর্থ করছি, যখন দান করছি তখন মনে অহঙ্কার আসছে, আমি কত দান করেছি, আমি কত তীর্থ করেছি, যজ্ঞ করছে ভাবছে আমার মত কে যজ্ঞ করেছে, ঠাকুরও বলছেন নিষ্কাম কর্ম করছে কিন্তু কোথা দিয়ে অহঙ্কার এসে যায় টেরও পায় না। কিন্তু সৎসঙ্গে হিউম্যান ফ্যাক্টর জড়িয়ে থাকে, হিউম্যান ফ্যাক্টর প্রচণ্ড শক্তিশালী। যে

কোন জিনিসে অনেক রকম সমস্যা আসবে, সাধুসঙ্গেও সমস্যা আসে, যেমন আমি অমুক মহারাজকে জানি, তমুক মহারাজকে জানি, আমি অমুকের শিষ্য ইত্যাদি, এরা হাভাতে, এদের দ্বারা কিছু হবে না। এখানে যারা আন্তরিক তাদের কথা বলা হচ্ছে। তথাপি আন্তরিক হলেও অন্য জিনিসে সমস্যা আসবে কিন্তু সাধুসঙ্গে কোন সমস্যা আসবে না। সেইজন্য ভগবান বলছেন, নিঃসঙ্গ পাওয়ার জন্য সাধুসঙ্গের মত আর কিছু নেই। মোক্ষ একটা পথেই আসে, নিঃসঙ্গত্ব। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ যে যোগেই যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত একটাই পথ, নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গ হয় একমাত্র সাধুসঙ্গে।

এরপর ভগবান কয়েকজন খুব নামকরা ভক্তদের নামের একটা বড় তালিকা দিয়ে বলছেন, যেমন প্রহ্লাদ, বলি, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান এই নামগুলোর উল্লেখ করে বলছেন, এনারা সবাই সাধুসঙ্গের মহিমাতেই মহৎ হয়েছেন। তারপরেই ভগবান বলছেন, *কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেহন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা।।১১/১২/৮।।* যখন আমি বৃন্দাবনে ছিলাম সেখানে গোপীরা ছিল, তাদের গরুগুলো ছিল, যমলার্জুন বৃক্ষ ছিল, নানান রকমের পশু, হরিণ, পাখি, গাছপালা, গুল্মলতাদি ছিল, শুধু আমাকে ভালোবেসে এরা সবাই আমার ভাব পেয়ে গেল। ভগবান সৎসঙ্গ নিজের উপর দিয়ে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এরা সাধ্য সাধন কিছুই জানত না। একটা যমলার্জুন গাছ সাধ্য সাধনের কি বুঝবে! কালিয় নাগ সে তো একটা সাপ সে এর কি মর্ম বুঝবে! এদের থেকে এক ধাপ উপরে গোপ বালকরা, এরাও সকলেই মুক্ত হয়ে ধন্য হয়ে গেল। কি করে তারা মুক্ত হয়ে গেল? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – কিছু না, এদের একটা জিনিসইই ছিল, আমার প্রতি শুধু তাদের প্রেমভাব ছিল। শুধুমাত্র এই প্রেমভাবের জন্য, আমার প্রতি ভালোবাসার জোরেই এরা মুক্ত হয়ে গেছে। এই প্রেম আসে সৎসঙ্গ দিয়ে, সৎসঙ্গ করলে মনটা পবিত্র হয়ে যায়, ওই পবিত্র মনে আমার প্রতি প্রেমের উদয় হয়, ঐ প্রেম দিয়ে তারা আমাকে পেয়ে যায়। উদ্ধব তুমি মনে রেখো, যারা বড় বড় তপস্বী, যোগী, সাধক, অনেক দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যারা সাংখ্য অনুশীলন করছে, মানে বিবেক বিচার করছেন, দান করছেন, ব্রত করছেন, এরাও আমাকে পায়, কিন্তু এদের প্রচুর খাটতে হয়। কিন্তু যারা সৎসঙ্গ করে, মানে সাধুদের সেবা করে, তাদের সঙ্গ করে আর যেখানে আমার লীলাগুণগান হয়ে সেখানে তারা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার লীলাকথা শ্রবণ করে, আর আমাকে ভালোবাসে, তারা অতি সহজে পেয়ে যায়। তাদের বেদ স্বাধ্যায় করতে হয় না, বিধিগতভাবে কোন মহাপুরুষের উপাসনা করতে হয় না, কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা কোন তপস্যা করারও প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র সাধুসঙ্গ আর ভক্তিযোগ করে আমাকে প্রাপ্ত করতে পারে। ঠাকুরও বার বার বলছেন কলিযুগে নারদীয়া ভক্তি। ভক্তিতে এত খাটতে হয় না, মন প্রাণ যেমনি আমাকে দিয়ে দিল তাতেই তারা আমাকে পেয়ে যায়। ভগবান বলছেন, অক্রুর যখন আমাকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য বৃন্দাবন এসেছিলেন, তখন গোপীদের হৃদয় আমার প্রতি তীব্র প্রেম অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। আমার বিয়োগের ব্যাথায় তারা এমন ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিল যে, আমি ছাড়া অন্য কোন কিছুই তাদের সুখদায়ক মনে হচ্ছিল না।

উদ্ধবকে ভগবান বলছেন *তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরণে। ক্ষণার্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ।।১১/১২/১১।।* 'বৃন্দাবনের গোপীরা আমাকেই তাদের প্রিয়তম মনে করত, আর আমাকে তারা এত ভালোবাসত যে, রাসলীলার সেই রাতগুলিতে যখন তারা আমার সাথে অবস্থান করত তাদের কাছে ঐ রাত যেন ক্ষণার্ধ মনে হত। কিন্তু আমি যখন তাদের কাছে অনুপস্থিত থাকতাম তখন প্রত্যেকটি রাত তাদের কাছে যেন একটা কল্পের মত মনে হত'। যাকে আমরা ভালোবাসি তার সাথে সময় কাটাতে গিয়ে মনে হয় কোথা দিয়ে সময়টা চলে গেল বোঝাই যায় না। আর যাকে ভালোবাসি তাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারি না। আইনস্টাইন তাঁর ছেলেকে একটা চিঠিতে বলছেন, কোন বিষয়টা তোমার ভালো লাগার বিষয় সেটা বোঝা যাবে যখন সেটা পড়তে গিয়ে তোমার সময়ের বোধ থাকে না। আমাদেরও পরীক্ষা করে দেখা উচিত, জীবনে কোন একটা অবস্থায় বা আমার এমন কোন জিনিসটা আছে যেখানে আমার সময়ের বোধ থাকে না, কোন কাজ করতে গিয়ে সময়ের বোধ থাকে না আর কার সাথে থাকলে সময়ের বোধ থাকে না। তার মানে ওটাতেই তার শক্তি, তারপর ঐটাকেই ধীরে ধীরে ঠিক ভাবে সাজিয়ে নিতে হয়। যে

কাজটা করতে ভালো লাগবে সেই কাজটাই ধীরে ধীরে কিভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করার অভ্যাস করে নিজেকে মহৎ করে দেওয়া যেতে পারে আর যাকে ভালোবাসে তার মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করে কিভাবে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে। কারুর হয়ত ফিজিক্স পড়তে ভালো লাগে, তার মানে ফিজিক্সটা তার জন্য। আর যদি বলে সিনেমা দেখতে গিয়ে আমার সময়ের হুঁশ থাকে না, তার জন্য ওটাই ঠিক, তার মানে ওর জীবনটা গেল, তার দ্বারা আর ভালো কিছু হবে না। ভগবান বলছেন, গোপীরা আমাকে ছাড়া থাকতে পারত না, সেটা তাদের সিদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াল। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি তাদের একমাত্র প্রিয়তম।

পরের শ্লোকটাও খুব সুন্দর। ভগবান এখানে দুটো উপমা আনছেন, প্রথমে নদীর উপমা নিচ্ছেন, বড় বড় নদীর বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন রূপ কিন্তু সমুদ্রে গিয়ে সব নদী নিজের নাম আর রূপকে হারিয়ে ফেলে। মুণ্ডকোপনিষদেও এই উপমাটা নেওয়া হয়েছে। বড় বড় ঋষি-মুনিদের মন সমাধিতে গিয়ে লীন হয়ে যায়, সেইজন্য মনে কোন চাঞ্চল্য আসে না, পৃথিবীর কাছে তিনি একজন মৃত হয়ে গেছেন। মৃত হয়ে যাওয়া মানে তাঁর নাম আর রূপটা হারিয়ে যায়। মায়া মানেই নাম আর রূপ, নাম-রূপ মানেই বহু। জগতে যে এই বহু দেখছি, এই বহুটা দেখায় মায়ার জন্য। ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান হওয়া মানে মায়া নেই, মায়া না থাকা মানেই সমাধিতে থাকা, যেখানে নাম আর রূপ থাকছে না। নাম আর রূপ না থাকাটা সমাধি ছাড়া আর কোন অবস্থায় হবে না বা ঈশ্বরের ভালোবাসায়। ছেলে মেয়েরা যখন প্রেম করে ভালোবাসে তখন ওদেরও জগতটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, কে তাদের দেখছে, কারা তাকাচ্ছে এগুলোর দিকে তাদের আর হুঁশ থাকে না। ঋষিরাও যখন সমাধিতে যান তখন তাঁদেরও বহুত্ব ভাব, নাম আর রূপের ভেদটা মিটে যায়। প্রেমিক প্রেমিকার উপমা যদিও নেওয়া হয় কিন্তু এখানে ঠিক এই উপমা খাটবে না। ঋষিদের নাম আর রূপ যে মিটে যাচ্ছে, এটা চিরদিনের জন্যই মিটে যাচ্ছে। কিন্তু সমাধি থেকে নামার পর তিনিও নাম আর রূপ দেখেন কিন্তু তিনি জানেন এই নাম আর রূপের পেছনে ঐ এক সত্তা আছে। কোন কাজ করতে করতে হারিয়া যাওয়া, সিনেমা দেখতে দেখতে হারিয়ে যাওয়া এই হারিয়া যাওয়াটা এক নয়। কারণ সিনেমা দেখার পর আবার সে এই জগতে ফেরত চলে আসে, কিন্তু সমাধিবান পুরুষের আর জগৎ ফেরত আসবে না। ঠিক তেমনি সমুদ্রে যে নদীগুলো মিশে গেল তারও নাম আর রূপটাও চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। ভগবান বলছেন, ঠিক তেমনি গোপীরা আমাকে এমনই ভালোবাসত যে তাদের পরকালের শরীর, যেখানে স্বর্গাদির ব্যাপার আছে, ইহকালের নিজের শরীর, সংসার, স্বামী, পুত্র সব হারিয়ে যেত। আর তারা যে নিজের পরিবারের লোককে ছেড়ে আমাকে ভালোবাসছে তাতে যে তাদের নামে কলঙ্ক হবে, কোন পাপ হবে এসবেরও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, সবটাই হারিয়ে যাচ্ছে।

ভগবান বলছেন, ঋষিরা তপস্যা করে করে সমাধির অবস্থায় গিয়ে নিজেকে পরমাত্মাতে বা তাঁর ইষ্টে লয় করে দেন, লয় হয়ে যাওয়ার পর আর তিনি কোন দিন সাংসারিক জীবনে ফিরতে পারেন না। কিন্তু গোপীদের এটাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গোপীরা তপস্যাদি কিছুই করেনি, আমাকে শুধু ভালোবেসে তারা সেই একই জিনিস পেল যে জিনিস মুনি ঋষিরা এত তপস্যা করে পেয়েছেন। এটা কি কখন সম্ভব? মুনি ঋষিরা, কামিনী-কাঞ্চন, সংসার সুখ সব কিছু ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে কত তপস্যা করলেন, কত সাধনা করে করে পরমাত্মার সাক্ষাৎ করলেন আর সেখানে বৃন্দাবনের গোপীরা শুধু কৃষ্ণকে ভালোবেসেই সব কিছু পেয়ে গেলেন? পতঞ্জলি যোগসূত্রে একটা জায়গায় বলছেন, সমাধি সাধকের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, চেষ্টা তীব্র হলে তার উপলব্ধিটাও তীব্র হবে, চেষ্টা যদি মধ্যম হয় উপলব্ধিটাও মধ্যম হবে, চেষ্টা যদি ঢিমে তেতালা হয় তাহলে সময় লাগবে। ঠাকুর সেইজন্য ঢিমে তেতালা কখনই পছন্দ করতেন না। এই তো আমাদের ছোট্ট জীবন, এর মধ্যেই যদি ঢিমেতেতালা চলে তাহলে তো জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে। যোগীদের আর গোপীদের এখানেই তফাৎ, গোপীদের হল তীব্র। কিন্তু মুনি ঋষিদের তীব্র নয় বলাটা আমাদের মুখে সাজে না। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে আমাদের নিজেদেরকেই বুঝে নিতে হবে। সবারই জীবনে এমন কিছু জিনিস থাকে যেটার ব্যাপারে প্রচণ্ড তীব্রতা থাকে। গোপীদের ভালোবাসার তীব্রতাটা সাংঘাতিক মাত্রায় ছিল। এই তীব্রতাকে বোঝাবার জন্য আমাদের শাস্ত্র পরকীয়া প্রেমের দৃষ্টান্তকে নিয়ে এসেছেন। যদি পর পুরুষের প্রতি ভালোবাসা হয় সেখানে ভালোবাসার তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। ঈশ্বরের প্রতি তীব্র অনুরাগকে বোঝাবার জন্য পরকীয়া প্রেমকে

উপমার রূপে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু বৈষ্ণবরা উপমাকে বাস্তবে নামিয়ে অনেক গোলমাল করে ফেলেছে। যোগীদের শান্ত ভাব, শান্ত ভাবের জন্যই ঐ তীব্রতাটা থাকে না। আমাদের সবারই ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা, কারুর শান্ত স্বভাব, কারুর মধ্যে প্রচুর উদ্বেগ। একদিকে গোপীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্র ভালোবাসা আর অন্য দিকে যোগীরাও কঠোর তপস্যা করে সমাধির অবস্থায় চলে যাচ্ছেন, দুটোর মধ্যে একটাই সাধারণ ব্যাপার, তা হল আমিত্বের নাশ। আমিত্বের নাশ এটাই আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম কি? আমিত্বের নাশ, এছাড়া আর কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণকে তীব্র ভালোবাসে গোপীদের আমিত্বের পুরোপুরি নাশ হয়ে যাচ্ছে, ঋষি মুনিরা বা যোগীরা যে সমাধিতে যাচ্ছেন সেখানেও তাঁদের পুরোপুরি আমিত্বের নাশ হয়ে যাচ্ছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ওরা তো প্রথমে আমাকে ভগবান বলেও জানত না, আমাকে প্রিয়তম মনে করত, জার ভাবেই আমাকে ভালোবেসেছিল। একজন সংসারী মানুষকে ভালোবাসা আর কোন সাধু মহাত্মাকে বা ভগবানকে ভালোবাসাতে এটাই তফাৎ। ঠাকুর বলছেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সত্তা পায়। যদি কেউ ফিল্মস্টারকে ভালোবাসে সে তার সত্তাই পাবে। ফিল্মস্টারের সত্তা কি? সাংসারিকতা, তার মধ্যেও সাংসারিকতা বাড়বে। কেউ হয়ত কোন সাধু মহাত্মাকে খারাপ ভাবেই ভালোবাসছে, কিন্তু তাতেও ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন হতে শুরু হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক সত্তা ভগবানের। যশোদা তাঁকে সন্তান রূপে ভালোবাসছে, গোপীরা তাদের প্রেমিক রূপে ভালোবাসছে, ফল কিন্তু একই হবে। কারণ যাঁকে ভালোবাসছে সত্তাটা তাঁরই পাবে। ভগবানের সত্তা মানেই শুদ্ধ চৈতন্যের সত্তা, তাঁরাও তাই ওই ফলটাই পাবেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন বৃন্দাবনে গোপীরা আমাকে এত ভালোবাসত যে নিজের যে ঘরবাড়ির বাঁধন, সেটাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে রাত্রিতে লুকিয়ে আমার সাথে শুধু মাত্র রাসলীলা করার জন্য চলে এসেছিল। বলছেন – *মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ।।১১/১২/১৩।* বৃন্দাবনের গোপীরা এরা *মৎকামা রমণং*, আমাকে জার রূপে, নিজেদের প্রেমিক রূপে ভালোবেসেছিল, এদের একমাত্র ইচ্ছা ছিল আমার প্রতি দেহসুখ। কিন্তু আমি যে সাক্ষাৎ নারায়ণ এটা তাদের বোঝার ক্ষমতা ছিল না। এদের একমাত্র ইচ্ছে ছিল আমাকে শরীর মন দিয়ে সার্বিক রূপে ভালোবাসা। এরা সাধনহীন, অবলা, শুধু আমার সঙ্গ করে করে এরা আমার সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মার ভাব পেয়ে গেছে। আমার সঙ্গ না করলে তারা কোন দিন এই ভাব লাভ করতে পারতো না। শুধু তাই না, তারা যখন আমার দিকে এগিয়েছিল তারা ঈশ্বরজ্ঞানে আমার দিকে এগোয়নি; ঠাকুরের কাছে এখন যারা আসছে তারা এটা বিশ্বাস করেই আসছে যে ঠাকুর স্বয়ং ভগবান, কিন্তু গোপীদের সেই বোধটাও ছিল না। তাদের কাছে আমি ছিলাম তাদের সখা, প্রেমিক। কি প্রেম? অবৈধ প্রেম, কারণ তারা সবাই বিবাহিতা রমণী। শুধু মাত্র জার ভাব নিয়ে আমার সঙ্গ করে করে তারা মুক্ত হয়ে গেল। সেইজন্য বলছি উদ্ধব তুমিও কেবল সাধুসঙ্গ কর।

এখানে দুটো দিক আছে, ভগবানকে যে রূপেই ভালোবাসুক, তাঁর স্বরূপকে জেনেই ভালোবাসুক আর না জেনেই ভালোবাসুক, ভগবানকে প্রেমিক রূপেই দেখুক আর শত্রু রূপেই দেখুক, যে কোন রূপে তাঁর প্রতি মন দিলেই তার বাকি জিনিসগুলো খসে পড়ে যাবে। এটা হল প্রথম। দ্বিতীয় হল, নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, প্রেম বলতে গোপীদের প্রেম। গোপীদের প্রেম দিব্য প্রেম এই জন্যই যে, তাঁদের মধ্যে কাম ভাব ছিল না। কিন্তু ভগবান উদ্ধবকে বলছেন, গোপীদের মধ্যে জার ভাব ছিল, অথচ নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন গোপীদের মধ্যে কাম ভাব ছিল না। দু রকম কথা হয়ে যাচ্ছে, আমরা কোনটা মানব? আসলে তা নয়, প্রথমের দিকে গোপীদের মধ্যে কাম ভাবই ছিল কিন্তু ভগবান ঐ কাম ভাবকে টেনে সরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, ভালো লোককে দায়ীত্ব দিলে সে কখন ক্ষতি হতে দেয় না। গোপীরা ভগবানকে যখন ভালোবেসেছেন উনি আর তাদের ক্ষতি হতে দেবেন না। তার মধ্যে যে ভাবই থাকুক ভগবান তাকে টেনে নিয়ে চলে যাবেন। তবে জিনিসটা খুব সুবিধের নয়, ভাগবতকেও অনেক জিনিসকে justify করতে হয়, রাসলীলা এক রকম কিন্তু পরে পরে যে জিনিস গুলো আসছে সেগুলোকে justify করতে গিয়ে অনেক রকম সমস্যা আসে। যেমন বলছেন বড় বড় ঋষিরা যাঁরা ভগবানের লীলা আস্বাদ করতে চাইছেন তাঁরাই গোপী হয়ে এসেছেন বা বেদের ঋচারাই গোপী হয়ে এসেছেন, দুটো কথার মধ্যে কোথাও একটা বিরোধ আছে। ঠাকুরের কাছে এক পাগলী আসত যার মধ্যে

মধুর ভাব ছিল, ঠাকুরকে পাগলী বলছে, তুমি আমাকে মন থেকে ঠেলে দিচ্ছ কেন। ঠাকুর আবার রামলালকে ডেকে বলছেন, ওরে রামলাল এখানে যে ঠেলাঠেলির ব্যাপার চলছে। কোথাও একটা বাধা আসে। কিন্তু ভগবান এখানে বলতে চাইছেন, যদি ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যেভাবেই ভালোবাসুক, তার সব কিছুই খসে পড়ে যাবে।

কিন্তু এর একটা খুব মজার তাৎপর্য আছে, শুধু ভগবানকেই নয়, যে কাউকেই ভালোবাসুক, এই ভালোবাসাই তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, through true friendship even a man can realize God, যদি সত্যিকারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়, ঐ বন্ধুত্বের সাহায্যে সে ঈশ্বর প্রাপ্তিও করে নিতে পারবে। কারণ কাউকে ভালোবাসা মানেই নিঃস্বার্থ হয়ে যাওয়া, ভালোবাসায় কোন কামনা থাকে না। কামনা যেখানে থাকে সেখানেই বন্ধন এসে যায়। যার জন্য মা ও সন্তানের উপমা নেওয়া হয়, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সব থেকে বেশি দেখা যায় মা আর সন্তানের ভালোবাসায়। চারিদিকে আমরা যে প্রেম ভালোবাসা দেখছি, প্রেম ভালোবাসার কথা শুনছি, চোখ কান বুজে বলে দেওয়া যায় সবটাই দোকানদারি। যার ভেতর ঠিক ঠিক প্রেম আছে, আর সেই প্রেম খুব গভীর, সে একটি সাধুর সঙ্গ করবে, সেই সাধু একটি কথা বলবেন আর সে ঈশ্বর জ্ঞানের দিকে এগিয়ে চলে যাবে। ঠাকুরের কাছে একজন বিধবা এসে বলছেন, আমার ভাইপো থেকে মন যাচ্ছে না। ঠাকুর বলে দিলেন, ওর মধ্যে গোপালকে দেখ। পরে সেই বিধবার জীবনটাই পুরো পাল্টে গেল। প্রেম যদি নিঃস্বার্থ হয়, আর সেই প্রেম যদি প্রচণ্ড গভীর থাকে, শুধু কাম ভাবেও যদি হয়, সে কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান পেয়ে যাবে। একটা মাধ্যম থাকবে, একবার সাধুসঙ্গ হবে, সাধুর একটা কথা যাবে আর পুরোটা স্ফটিকে পরিণত হয়ে যাবে। এটা হল এই শ্লোকের তৃতীয় তাৎপর্য। কিন্তু আমরা এভাবেই নেব, গোপীদের সাধুসঙ্গ হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা প্রেমিক রূপে, জার ভাব নিয়ে ভালোবেসেছিলেন, তথাপি তাঁরা মুর্খ হওয়া সত্ত্বে এই ভালোবাসাতেই তাঁদের ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়ে গেল।

সেইজন্য হে উদ্ধব *মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্। যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ।।১১/১২/১৫।।* তোমার যা প্রবৃত্তি অর্থাৎ তোমার যা দায়ীত্ব আছে, কর্তব্য আছে সব কিছুকে ছেড়ে দাও, তোমার যা ধর্ম অধর্ম আছে সব ছাড়ো, তোমার ভালো মন্দ যা আছে ছাড়ো, শ্রুতি-স্মৃতি, বিধি-নিষেধ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় বিষয় যা কিছু আছে সব ছেড়ে আমার শরণাগতি নাও, তখন তুমি নির্ভয় হয়ে যাবে। সারা জীবন ধরে আমরা সব সময় ভয়ে কুঁকড়ে আছি। নির্ভয় হওয়ার পথ কি? তোমার যা কিছু ধর্ম অধর্ম আছে সব কিছুর পারে চলে যাওয়া আর শুধু মাত্র আমার শরণাগত হয়ে থাকা। এটাও সাধুসঙ্গ, শুধু যে দৈহিক ভাবে সঙ্গ করলেই সাধুসঙ্গ হবে তা তো নয়। ভগবানের চিন্তনের মত আর সৎসঙ্গ হয় না, আর ভগবানের মত সাধু কে আছেন, ভগবানই সৎ, সত্তা মাত্রম্, তাঁরই সঙ্গ করো। ঈশ্বরের সঙ্গ করা মানে, আর কোন রকমের দায়ীত্ব, কর্তব্য বলে কিছুই থাকে না, ঈশ্বর ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। এই ভাব যদি হয়ে যায়, তখন তাকে আর কোন সাধনাই করতে হবে না, কিছুই করতে হবে না।

শরণাগতি দুই প্রকার, একটা বেদান্তের বা অদ্বৈতের দৃষ্টিতে আর দ্বিতীয় শরণাগতি হয় দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে। অদ্বৈত দৃষ্টিতে আমি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, পূর্ণব্রহ্ম, শুদ্ধ আত্মা কিন্তু আমার ভেতরে নানান ধরণের অপবিত্রতা এসে গেছে। কেন এসেছে, কিভাবে এসেছে, কবে এসেছে এই আলোচনার কোন দরকার নেই, এটা একটা statement of fact যে আমার মধ্যে পঞ্চাশটা দুর্বলতা আছে। আমার মধ্যে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি আছে আর আমার মধ্যে যে ধর্মের প্রবৃত্তি আছে যা কিনা আমাকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে, এটা আমাদের কাছে বাস্তবিক। এটাও বাস্তবিক যে আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, কথায় কথায় শাস্ত্র এই কথাই বলছেন। তাহলে উপায় কি? আমার মধ্যে যে অপবিত্রতা আছে, যে অপূর্ণতা আছে মনে হচ্ছে ওগুলোকে ছেড়ে দেওয়া। ছেড়ে দিলেই আমি যা ছিলাম তাই থাকব। আমাদের মধ্যে যত ধরণের অপবিত্রতা আছে বলে মনে করছি এগুলো বাস্তবিক নয়, সবটাই কাল্পনিক, শাস্ত্রও বলছে সব কাল্পনিক। কাল্পনিক হওয়ার জন্য আমি ছেড়ে দিলেই আমি পূর্ণব্রহ্ম। আচার্য শঙ্কর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, চন্দন কাঠ কিছু দিন জলের মধ্যে রেখে দিলে ওর মধ্যে দুর্গন্ধ এসে যাবে। দুর্গন্ধ সরানোর কি পথ? চন্দন কাঠটা ভালো করে ঘষে নিলেই আবার তার সুগন্ধ বেরিয়ে আসবে। আমাদের ভেতরে যে দুর্গন্ধ জমে আছে, নানান

রকমের কাজে জড়াচ্ছি, ভালো মন্দ যাবতীয় যা করছি সবটাই দুর্গন্ধ। এর উপায় কি? সব ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিলে তো আমাদের মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে কি করতে হবে? শরণাগতি। শরণাগতি মানে, আমার ভালো, মন্দ যা কিছু আছে সবটাই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া। এটাই অদ্বৈতের দৃষ্টিতে শরণাগতি।

ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদী বলতে গেলে ভারতে কোন দ্বৈতবাদী নেই। খ্রীশ্চান, মুসলমান, জহুদি এরাই ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদী। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম দ্বৈতবাদী নয় এমনকি শিখ ধর্মও ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদী নয়। মাধ্বাচার্য, রামানুজ এনারা যদিও নিজেদের দ্বৈতবাদী বলেন, কিন্তু ঠিক ঠিক যে অর্থে দ্বৈত হয় সেই অর্থে এনারা দ্বৈত নন। সাংখ্য, যোগদর্শনে যদিও দুটো সত্তাকে নেওয়া হয় কিন্তু ওখানেও আত্মাকে শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্পাপ বলেই নেওয়া হয়, সেইজন্য ওনাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অদ্বৈতের দৃষ্টিভঙ্গী রূপেই নেওয়া হয়। দ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে বলা হয়, তুমি অপবিত্র, তোমার অপবিত্রতা বাস্তবিক, তোমার অপূর্ণতাও বাস্তবিক। এখন অশুদ্ধ যদি বাস্তবিক হয় তাহলে তাকে শুদ্ধ করতে হবে, অপূর্ণতা যদি বাস্তবিক হয় তাহলে তাকে পূর্ণ করতে হবে। তাই যতক্ষণ আমি in the image of God বা in the image of a saint না হই ততক্ষণ আমি ঈশ্বরের শরণাগতি নিতে পারব না। ঈশ্বর তাকেই শরণাগতি দেবেন যে শুদ্ধ পবিত্র, অশুদ্ধ অপবিত্ররা কেউ ভগবানের কাছে যেতে পারবে না। তার মানে এইসব ধর্মে আমাকে আগে চরিত্র নির্মাণ করতে হবে, কিছু গুণ অর্জন করতে হবে। কি কি গুণ অর্জন করতে হবে? তখন এসে যাবে কোরাণে কি কি বলছে, বাইবেলে কি কি বলছে। বাইবেল বলছে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাস। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, আমি প্রতিবেশীর মেয়েকে ভালো না বেসে প্রতিবেশীকে কেন ভালোবাসব? এর কি উত্তর আছে! তখন বলবে, আমার বাইবেলে আছে। কোরাণ বলে দিয়েছে তুমি এই এই করবে, যদি না কর তুমি অপবিত্র, তুমি আল্লার কাছে আর জায়গা পাবে না। খ্রীশ্চানরাও তাই বলে, বাইবেলে এই এই করতে বলে দিয়েছে, এগুলো যদি তুমি না কর তুমি অপবিত্র হয়েই থাকবে, ভগবানের কাছে তুমি জায়গা পাবে না। হিন্দু ধর্মে কোথাও কেউ এভাবে চলবে না।

তাহলে কি হিন্দু ধর্ম কোন গ্রন্থ মানে না? হিন্দু ধর্ম কোন গ্রন্থই মানে না, এমনকি বেদকেও মানে না। ওনারা বলেই দিন উচ্চতম অবস্থায় বেদও বেদ থাকে না, একটা অবস্থায় গিয়ে বেদকেও অতিক্রম করে যান, *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*। প্রথম যারা এই কথা শুনবে তারা কিছুই বুঝতে পারবে না যে, কেন এই কথা বলছেন। কারণ আমাদের সবারই সত্তা হলেন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, উপায় হল ভেতরে যত আবর্জনা এসে জমা হয়েছে সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা। আবর্জনকে কি করে পোড়াতে হবে বা কিভাবে ফেলতে হবে? স্বামীজী এক কথায় বলছেন, নিঃস্বার্থপরতা, গীতা একটি বাক্যে বলছেন, কামনারহিত হওয়া বা নিষ্কাম হওয়া। বেদ, বেদান্ত, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ যা কিছু আছে সবাই এই একটি কথাই বলছেন, তোমার উপর ভালো মন্দ যা কিছু আছে সব ত্যাগ কর। তাহলে মূল একটি শব্দই আছে, কি সেই শব্দ? ত্যাগ। শাস্ত্রের এখানে কোন দামই নেই। কারণ এই একটা শব্দ ত্যাগ জেনে গেলে তার আর কোন কিছুই জানার দরকার নেই। স্বামীজী বার বার বলছেন নিঃস্বার্থপর হও। আমাদের হিন্দু ধর্মের সব শাস্ত্রে যা কিছু বলছেন তার একটিই মূল শব্দ – নিঃস্বার্থপর, তাছাড়া আর কিছু বলছেন না। যেমন বেদে বলছেন যজ্ঞ কর, যজ্ঞ করা মানেই তাকে অনেক কিছু থেকে সরে আসতে হবে, সাংসারিকতা থেকে টেনে সরিয়ে এনে বলছেন নিঃস্বার্থপর হও। যজ্ঞ করা মানে আলস্য ত্যাগ করে অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হবে, শীতের সময় স্নান করতে হবে, উপোস করে থাকতে হবে, ধীরে ধীরে তাকে নিঃস্বার্থ বানিয়ে দিচ্ছে। হিন্দু ধর্মের যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলা হয়, সেখানে নিঃস্বার্থ, ত্যাগ শেখাচ্ছে। হিন্দু ধর্মের সব শাস্ত্র বলছে, এই জগতটা তোমার ভোগের জায়গা নয়, জগতটা ত্যাগের জায়গা, তুমিও ত্যাগ কর। আমাদের যত মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয় সবার উদ্দেশ্য একটাই, মিথ্যা কথা কেন বলবে না, নিঃস্বার্থ হতে গেলে তোমাকে সত্য বলতে হবে আর তোমার সত্য কথা বললে কারুর যদি ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে সেখানে মিথ্যা কথাই বলবে। নিঃস্বার্থ হওয়াটাই এখানে মূল উদ্দেশ্য, সত্য কথা বলার কোন গুরুত্ব নেই, অহিংসার কোন দাম নেই, একমাত্র দাম হল নিঃস্বার্থ হওয়া। তোমার ভেতর ভালো মন্দ যা কিছু আছে সবটাই আবর্জনা, ওগুলোকে ত্যাগ কর, ত্যাগ মানেই নিঃস্বার্থপরতা। পড়াশোনা যখন করছে তখন সেখানেও দুটো পথ স্বার্থপরতা আর নিঃস্বার্থপরতা। আমাকে পড়াশোনা করতে হবে, লেখাপড়া

শিখে আমাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাই পড়াশোনা করছি, এটাই নিঃস্বার্থপরতা। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হবে, ভালো নম্বর পেলে আমি ভালো চাকরি পাব, এটাই স্বার্থপরতা। যেখানেই দুটোর মধ্যে বিরোধ হবে তখন সেখানে যেটা স্বার্থপরতা সেটাকে সরিয়ে দিলে তার আধ্যাত্মিকতার যাত্রা শুরু হয়ে যাবে।

যেখানে শুধু শাস্ত্রকে নিয়ে চলে সেখানে বিরাট সমস্যা, সেখানে পূর্ণতাকে টানছে। যেখানে পূর্ণতাকে টানছে সেখানে বিরাট লম্বা একটা লিস্ট দিয়ে যেতে হবে, সত্য কথা বলবে, সত্য কথা কেন বলব, বাইবেলে আছে তাই বলবে। শাস্ত্রে বলেছেন বলে যারা পালন করছে তাদের অবধারিত ভাবেই এই সমস্যা আসবে। হিন্দু ধর্মের এই নিয়ে কোন সমস্যা নেই। দু বছর আগে আমাদের এখানে অন্য একটা পরিস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থ হতে গেলে আমাদের এক রকম করতে হত, কিন্তু আজকে নিঃস্বার্থ হতে গেলে আরেক রকম করতে হবে, মূল শব্দ সব সময় এক থাকবে, নিঃস্বার্থ আর ত্যাগ, নিঃস্বার্থও যা ত্যাগও তাই। এই দুটো মূল শব্দকে নিয়ে আমরা যা কিছুই করছি, যে কাজ করছি এই কাজটি কি নিঃস্বার্থ হয়ে করছি নাকি স্বার্থ নিয়ে করছি, যদি নিঃস্বার্থ হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা ত্যাগ। ত্যাগ মানেই যেমন গীতায় ভগবান বলছেন *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। *সর্বধর্মান্* মানে ভালো মন্দ দুটোই, *সর্বধর্মান্* মানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্ম না। ধর্ম মানে প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম, সবটাই ত্যাগ কর, ভালো মন্দ সবটাই ত্যাগ কর। কিন্তু সব দ্বৈতবাদী ধর্ম বলবে, মন্দটা ত্যাগ করে ভালোটাকে ধর। এবার ঠিক করতে হবে বাজে কোনগুলি আর ভালো কোনগুলি, এবার ভালো আর মন্দ ঠিক করার জন্য শাস্ত্র নেমে আসবে। তারপর দেখা যাবে সেটাকে নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব এসে যাচ্ছে। কেন আসছে? বাড়িতে বাচ্চা একটা মিথ্যা কথা বললে বড়রা একটা চড় মারবে, স্কুলে মিথ্যা কথা বললে শিক্ষক একটা চড় মারবে আর সিনেমার অভিনেতা আর অভিনেত্রীরা মিথ্যে কথা বলছে বলে কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে। দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকছে কারণ দেশের গুপ্তচররা বিদেশে মিথ্যে কথা বলছে বলে। তাহলে মিথ্যে কথা বলাটা ঠিক না ভুল? হিন্দু ধর্মে এই ধরণের কোন বিরোধ কখনই আসবে না। তুমি অভিনয় করছ নিষ্কাম ভাবে অভিনয় কর তাতে কোন আপত্তি নেই, যখন গুপ্তচরবৃত্তি করছ তখন নিষ্কাম ভাবে দেশের জন্য মিথ্যা কথা বলে যাও, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য যদি মিথ্যা কথা বল তাহলে তুমি পাপী। মিথ্যা কথা অপরের মনোরঞ্জনের বলছ, সিনেমার অভিনেতারা কোন অন্যায় করছে না, দেশের জন্য মিথ্যা কথা বলছ, কোন অন্যায় নেই, কারুর ভালোর জন্য মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে কোন অন্যায় নেই। কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য যে মিথ্যা কথা বলছে সে একটা ধুর্ত, বদমাইশ। সার্বজনীন মূল্যবোধ হিন্দু ধর্ম কখনই মানে না। হিন্দু ধর্মে সার্বজনীন মূল্যবোধে শুধু একটি কথা মানে – নিঃস্বার্থপরতা অথবা ত্যাগ।

আত্মার স্বভাবই শুদ্ধ পবিত্র, কিন্তু যে করেই হোক আবর্জনা জড়িয়ে যাচ্ছে। এই আবর্জনা সরানো জন্য দরকার ত্যাগ, ত্যাগটাই রূপান্তরিত হয় নিঃস্বার্থপরতায়। গীতার আঠারোটি অধ্যায় ব্যাসদেব রচনা করলেন, তার মধ্যে সতেরটি অধ্যায় ভগবান বলে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে ভগবান কত কথা বলে যাচ্ছেন, কোথাও সাংখ্যযোগের কথা বলছেন, কোথাও কর্মযোগের কথা বলছেন, জ্ঞানযোগ বলছেন, সন্ন্যাসযোগ বলছেন, একের পর এক ভক্তি, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ, গুণত্রয়, দৈবাসুরীসম্পদ, শ্রদ্ধাত্রয় বলে বলে সব শেষে একটি মাত্র কথা বলছেন, পুরো গীতাকে একটি বাক্যে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আচার্য শঙ্করও বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* এটাই গীতার মর্ম, তোমার ভালো মন্দ সব কিছু ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। শুধু গীতাই নয়, যত শাস্ত্র আছে, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ সবারই একটি কথা – ত্যাগ। খ্রীশ্চান বা মুসলমানদের *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য* বললে আতঙ্কিত হয়ে যাবে, কী বলছেন! ভালোটাও ত্যাগ করতে হবে! কারণ ওরা জানে, আমি একটা নিরেট পাথর, ঐ নিরেট পাথরকে ছেনি মেরে মেরে একটা মুর্তি তৈরী করতে হবে। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা পূর্ণ মুর্তি, কাদার মধ্যে ডুবে ছিল, মুর্তির উপর পাঁক জমে গেছে, জল দিয়ে ধুয়ে দিলে কাদাটা বেরিয়ে গিয়ে যেমন মুর্তি ছিল তেমন মুর্তি বেরিয়ে আসবে। এই দুটো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী, সেইজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী সব সময় হয় *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। ভালো মন্দ সব কিছু ত্যাগ করে তোমার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর দ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সব সময় তুমি একটা কিছু হয়ে আছ তোমাকে আরেকটা কিছু হতে হবে। দ্বৈতবাদী ধর্ম সব সময় হয় to become তোমাকে হতে হবে,

হিন্দু ধর্ম সব সময় হয় to be তুমি যেটা আছ সেটা হও, এখানে পরিবর্তনের কিছু নেই। শেষ শ্লোকে ভগবান উদ্ধবকে ঠিক এই কথাই বলছেন, আমি হলাম সমস্ত প্রানীর আত্মা, সব কিছুর সার। তুমি সব কিছু ছেড়ে তাঁর কাছে চলে যাও। কিভাবে যাবে? গোপীরা যেভাবে গিয়েছিলেন।

ভগবানের কথা শোনার পর উদ্ধব বলছেন *সংশয়ং শৃন্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর। ন নিবর্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ।।১১/১২/১৬।।* উদ্ধবের মুখ দিয়ে এই প্রশ্ন করাচ্ছেন, উদ্ধবের মত জ্ঞানী কখনই এই প্রশ্ন করবেন না, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকের মন্দ বুদ্ধি, বার বার বুদ্ধির উপর হাতুড়ি না মারলে জিনিসগুলো পরিষ্কার হয় না। উদ্ধব বলছেন 'আপনার কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু আমার তো কিছু স্বধর্ম আছে, আমি এই স্বধর্ম পালন করব নাকি সব ধর্ম ত্যাগ করে বেরিয়ে যাবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই আপনি কৃপা করে ভালো করে বুঝিয়ে দিন এখন আমার কি করা উচিৎ'। এটাই আমাদের চিরন্তন সমস্যা, স্বধর্ম পালন করব কি করব না, নাকি আপনার পূর্ণ শরণাগতি নেব, পূর্ণ শরণাগতি মানে সন্ন্যাস। উদ্ধব বলছেন, আমি এই দুটোর মধ্যে আটকে আছি, আপনি পরিষ্কার করে দিন। গীতাতেও ভগবান গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে কর্মযোগের কথা বলে যাচ্ছেন, *স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি*, এই সব বলে ৫৫ নম্বর শ্লোকে গিয়ে বলছেন *প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্*। সব কথা শুনে অর্জুন পুরো সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মশাই আপনি ঠিক করে বলুন তো আপনি কি চাইছেন, আমি কাজ করব কি করব না? এতক্ষণ আপনি বলে এলেন কাজ কর, আর এখন বলছেন যাঁরা সত্যিকারের যোগী তাঁরা কাজ করেন না। আমি কোনটা করব ঠিক করে বলুন। মন্দের পারে যাওয়াটা না হয় বোঝা গেল কিন্তু ভালোর পারে কেন যেতে হবে এ কাউকেই বোঝানো যায় না। অথচ শুধু বেদান্ত নয় ভগবান বুদ্ধের পুরো শিক্ষাও এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে, চীনের তাও ধর্মও ভালো মন্দের দুটোরই পারে যাওয়ার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের ক্রিয়া দু রকমের হয়, একটা শারীরিক ক্রিয়া আরেকটি মনের চিন্তন। যেখানে কর্ম সেখানেই ভালো মন্দ, যেখানেই চিন্তা সেখানেই ভালো মন্দ। যেখানেই ভালো মন্দ সেখানেই নিয়ম আছে আইন আছে, যেখানেই ভালো মন্দ সেখানেই ধর্ম আছে অধর্ম আছে, কারণ ভালো মানেই ধর্ম, মন্দ মানেই অধর্ম। তার মানে ক্রিয়া ও চিন্তনের এলাকায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ধর্ম থাকবে, অধর্ম থাকবে, সত্য অসত্য সবই থাকবে। কিন্তু উচ্চতম অবস্থা এর সব কিছুর পারে। সব কিছুর পারে হওয়ার জন্য যখন সেই উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছে গেল তখন এগুলোর কোন কিছুরই আর দাম থাকে না। এর সহজ উপমা হল, কল্পনা করে নিচ্ছি সূর্যলোকে বাসিন্দা আছে। যদি কেউ সূর্যলোকের বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস করা হয় সূর্যে কতক্ষণ দিন থাকে আর কতক্ষণ রাত থাকে? সূর্যলোকের বাসিন্দা অবাক হয়ে ভাববে দিন ও রাতের ব্যাপারটা কি। যদি বলা হয় সূর্যলোকে সব সময়ই দিন, এই কথারও কোন অর্থ হয় না। যেমনি দিন শব্দ বলছি তার মানে ওখানে রাতও আছে। সূর্যে রাতের কোন কল্পনাই করা যায় না, সেইজন্য সেখানে দিনও নেই। আত্মজ্ঞানের যে অবস্থা, পরম নির্বাণের যে অবস্থা সেখানে কোন ক্রিয়া নেই, কোন চিন্তাও নেই, সেইজন্য ভালোও নেই মন্দও নেই, ধর্মও নেই অধর্মও নেই। ওই অবস্থায় যাওয়ার জন্য প্রথমে ক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর শেষে চিন্তন থেকেও বেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু ঐ অবস্থায় পৌঁছানর একমাত্র পথ হল স্বধর্ম, নিজের দায়ীত্ব যদি পুরোপুরি পালন না করা হয় তাহলে কেউই ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে না। সেইজন্য সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতেই পারে, আমি আমার স্বধর্ম পালন করব কি করব না। স্বধর্মই পালন করতেই হবে, স্বধর্ম পালন করতে করতে মন যখন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই কর্মত্যাগ, কর্মত্যাগ মানেই ধর্ম ত্যাগ। কর্ম ও ধর্ম দুটো এক রূপেই যায়, যেখানেই ধর্ম সেখানেই কর্ম, যেখানেই কর্ম সেখানেই ধর্ম। শেষ অবস্থায় কর্মও থাকে না, ধর্মও থাকে না। এরপর ভগবান স্বধর্ম আর শরণাগতি এই দুটো জিনিসকে নিয়ে লম্বা আলোচনা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন উদ্ধবকে বলছেন 'উদ্ধব, তুমি স্বধর্ম-টর্ম সব ভুলে গিয়ে তোমার আত্মস্বরূপে অবস্থিত হও'।

বেশির ভাগ মানুষই অধর্মে প্রতিষ্ঠিত। অধর্ম মানেই স্বধর্মের অভাব। সকাল থেকে রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত জীবন যতক্ষণ নিয়ন্ত্রিত না হচ্ছে, আর যা কর্ম করছি সব ঈশ্বরের কর্ম করছি এই বোধ যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ সবটাই অধর্ম। ধর্ম মানে, সব কিছু আমরা এই বোধ নিয়ে করছি যে এটা আমার পবিত্র কর্ম।

আমরা যারা এখানে শাস্ত্রের কথা শুনছি কেউই পুরোপুরি অধর্মে প্রতিষ্ঠিত নই, বলা যেতে পারে ধর্ম অধর্মের মিশ্রণ। কিন্তু ধর্ম অধর্মের মিশ্রণ যাদের মধ্যে আছে তারা কখনই ঈশ্বরের শরণাগত হতে পারে না। যখন পুরোপুরি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সূর্যোদয়ের আগে উঠে জপধ্যান করছে, সব কর্ম এই বোধ নিয়ে করছে যে আমি ঈশ্বরের সেবা করছি, আবার সন্ধ্যেবেলায় জপধ্যানে বসছে, পুরো জীবনটাই ঐভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এরপর তার মন পুরো শুদ্ধ হয়ে যায়। এই শুদ্ধ মনই তখন ঈশ্বরের শরণাগত হতে পারে। আর দ্বিতীয় উপায় গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর যে বকলমা দেওয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু বকলমা সাধারণ মানুষের দ্বারা হয় না। পবিত্রতার একটা স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত শরণাগতি হয় না। গোপীরা আগে থেকেই পবিত্রতার একটা স্তরে চলে গিয়েছিলেন বলেই পূর্ণ শরণাগতিতে চলে যেতে পেরেছিলেন। উদ্ধব যে বলছেন, আমি কোনটা করব, আপনার শরণাগত হব নাকি স্বধর্ম পালন করব, সাধারণত আমাদের মত যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাদেরকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। কিন্তু স্বধর্ম পালন না করে প্রথমেই শরণাগতি হয় না।

মানুষ তার নিজের সন্তানকে কত ভালোবাসে। সন্তান মরে গেলে তার শরীরটাকে আর ভালোবাসে না, মানে তাকে আর জড়িয়ে রাখবে না। এটা কেন হয়? সেই তো একই শরীর, একই লোক, কিন্তু তাকে আর জড়িয়ে রাখবে না। আমরা তখনই কাউকে ভালোবাসি যতক্ষণ তার মধ্যে জীবন আছে। জীবন মানে? জীবন মানেই যেখানে ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ। ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, সব সময় বিচার করবে, নারী শরীরে কি আছে, হাড়, মাংস, রক্ত, মুত্র, বিষ্ঠা ছাড়া কিছুই নেই। কোন যুবক ছেলেকে এভাবে বিচার করতে বললে কি তারা এক অপরকে ভালোবাসা ছেড়ে দেবে? কখনই ছাড়তে পারবে না। কিন্তু যাকে ভালোবাসছে সে মরে গেলে তাকেও আর জড়িয়ে রাখতে পারবে না। তার মানে কোথাও একটা দিব্যতার স্ফুলিঙ্গ থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়িকে বলছেন, মানুষ নিজেকে ভালোবাসে, আত্মা আত্মাকেই ভালোবাসে, যেখানেই আত্মার প্রকাশ সেখানেই মানুষের ভালোবাসা হবে। মানুষ যে একটা মানব দেহকে ভালোবাসছে, সেখানেও কোন না কোন ভাবে সেই ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখতে পায়, অজান্তেই দেখে। কিন্তু মনটা তাদের অত্যন্ত নিম্নস্তরে আছে বলে ঈশ্বরের নিম্নস্তরকেই ধরে, উচ্চস্তরটাকে আর ধরতে পারে না। ঠাকুর এটাকেই নিষেধ করছেন। গুরু নানকের এক কাহিনী আছে, গুরু নানক একবার শহরের এক বড়লোককে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। বড়লোকটি যে রাস্তা দিয়ে যাবে সেখানে গুরু নানক অনেক বড় বড় পাথর সামনে নিয়ে বসে আছেন। গুরু নানককে সবাই জানত, ধনী লোকটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করছে, আপনি এত পাথর নিয়ে এখানে কি করছেন? গুরু নানক বলছেন, তোমার মৃত্যুর পর তোমার সম্পত্তিগুলো নিয়ে তুমে স্বর্গে যাবে, আমিও তাই পাথরগুলো জড়ো করছি স্বর্গে একটা বাড়ি বানাতে হবে তো। মানুষ একটা জায়গায় গিয়ে দিব্যত্বের সন্ধান পায়, যার যেমন চেতনা জাগ্রত হয়েছে দিব্যত্বকে সে ঠিক সেই ভাবেই দেখে। আমরা ভুল জায়গায় দিব্যত্বকে দেখছি বলে কত কষ্ট পাচ্ছি, আমাদের দেখে মহাপুরুষদের করুণা হয়। সেইজন্য তাঁরা আমাদের নানা ভাবে শিক্ষা দেন যাতে আমরা সঠিক জায়গায় দিব্যত্বের অনুসন্ধান করতে পারি।

বাণীর চারটি রূপ

শ্রীকৃষ্ণ এখানে উদ্ধবকে এই শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রথমেই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন *স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ। মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ।।১১/১২/১৭।* এখানে সৃষ্টিকে নাদ ব্রহ্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। বেদের ছয়টি অঙ্গ, ছয়টিকে একসাথে বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গের একটা কাজ হল বেদ মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণের বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা দেওয়া, কোথায় কণ্ঠস্বর ওঠাতে হবে, কোথায় নামাতে হবে, কোথায় সমান থাকবে এগুলোর শিক্ষা দেওয়া। বেদের ঋচার উচ্চারণ বিধিটা পুরো একটা আলাদা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান বেদের সময় রীতিমত খুব উন্নত পর্যায়ে ছিল। স্বামীজী বলছেন, কিছু না হোক বেদ সাত আট হাজার বছর আগে এসেছে, অত বছর আগে তাঁদের উচ্চারণ বিধি, মাত্রা, স্বর, বর্ণ কত উন্নত ছিল আমরা ধারণাই করতে পারব না। এখানে বাণীকে নিয়ে বলছেন। মুখ থেকে যে বিভিন্ন রকম কথা বেরোয়, যার দ্বারা আমরা এক অপরকে জানছি; বলা হয় যে, মানুষের মধ্যে

যেখানে আমিত্বের বোধ সেখানেই আবার বাণীর বোধ। মানুষ মস্তিষ্ক দিয়ে যেন নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে, আর আমি বোধটাও মস্তিষ্ক দিয়েই আসে। বায়োলজিতেও এখন বলছে আমিত্বের বোধ মানুষের মধ্যে সব থেকে জোরাল আর মানুষের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল বাণীকে স্পষ্ট করে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারা। মানুষের সব থেকে বিশেষত্ব হল বাণীতে, আরও বলা হয় যে বিবর্তনে বাণী সব থেকে শেষে এসেছে। বাণী জিনিসটা আমাদের আগের আগের দার্শনিক, চিন্তকদের খুব আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। বর্তমান নিউরোলজিস্টরাও এগুলোকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছেন। যেখানে তার মস্তিষ্ক রয়েছে সেখানে তার আমিত্ব বোধ আবার সেখানেই রয়েছে বাণীর বোধ। এই সব কিছুকে নিয়ে কোথাও একটা যেন বার বার শব্দ আর সৃষ্টি এই দুটোকে এক সঙ্গে দেখার তাগিদ এসেছে। সেখান থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আর শব্দ এই দুটোকে কোথাও যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাইবেলও বলছেন In the beginning there was word and the word was with God and word was God, এরই অভিব্যক্তি পরে আমরা ঠাকুরের গানেও পাচ্ছি, বাণী রূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি। বাণী ভগবানেরই রূপ, আর ভগবান প্রথমে বাণী রূপেই প্রকট হন। বাইবেলে যে বলছেন প্রথমে শুধু বাণীই ছিল, বাণী মানে কথাবার্তা নয়, ধ্বণি ছিল।

বাণীর চারটি রূপ – পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। বলছেন, *প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ*, বাণীর প্রথম অবস্থার নাম পরা, ভগবান প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ অর্থাৎ ওঁকার হয়ে পরা রূপে প্রাণের সাথে মূলাধারচক্রে প্রবেশ করেন। ওঁ হল universal, এটাকেই বলছেন পরা। সেখান থেকে ধীরে ধীরে ওঁএর উপর যেন একটা সূক্ষ্ম আবরণ এসে যায়, ঐ সূক্ষ্ম আবরণ এসে যাওয়ার পর আরেকটু উপরে নাভিস্থানে (মণিপুর চক্র) এসে পশ্যন্তী হয়ে যায়। ওখান থেকে যখন ভগবানের বাণী কণ্ঠদেশে (বিশুদ্ধ চক্র) উঠে আসে তখন মধ্যমা রূপে ব্যক্ত হয়। তারপর ক্রমশ মুখে এসে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত আদি স্বর বৈখরী বাণীর রূপ গ্রহণ করে। সৃষ্টির আদি মূলে শব্দব্রহ্ম, শব্দব্রহ্মই এই চারটে রূপ ধারণ করেন। এখানে বাণী আরেকটু সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে। কণ্ঠদেশে যখন বাণী এসে গেল তখন সেটাকে বলবে মধ্যমা। ভীমসেন যোশী তাঁর শিষ্যদের বলতেন ‘গলা দিয়ে যখন আওয়াজ বার করবে তখন সব সময় চেষ্টা করবে নাভিদেশ থেকে আওয়াজটা বার করতে’। নাভিদেশ মানে পশ্যন্তি। পশ্যন্তির নীচে আর শব্দ যেতে পারে না, পরাতে পুরোপুরি নৈঃশব্দ হয়ে যায়। কেউ যখন মৌন হয়ে যান, তখন বুঝতে হবে তিনি বাগ্‌-বৈখরীকে বন্ধ করে দিয়েছেন। বৈখরীকে বন্ধ করলে কি হবে, মধ্যমা তো চলতে থাকবে। যে মধ্যমা বন্ধ করে দিল সে কিন্তু নৈঃশব্দতার দিকে অনেক এগিয়ে গেছে। এরপর তার বৈখরী থেকে যে আওয়াজটা বেরোবে সেই আওয়াজটা খুব গম্ভীর ও ভারী হবে। আমাদের বেশীর ভাগ লোকের কথা মুখ থেকে বেরোয়। মেয়েরা যে কথা বলে সব মিনমিনে, ভেতর থেকে যে আওয়াজটা বার করবে সেই শক্তিটা ওদের নেই তাই মেয়েদের সব বাণী ওপর থেকে বেরোচ্ছে। কণ্ঠস্বর যত গম্ভীর হবে বুঝতে হবে আওয়াজটা তত নীচ থেকে বেরোচ্ছে। যত সুন্দর ও ভালো গলার আওয়াজ তৈরী হয় তলপেট থেকে, এটাই সত্যিকারের আওয়াজ।

বেদেই একটা ঋচা আছে সেখানেও বলছেন বাণী চার প্রকার, মানুষ এক প্রকার বাণী শুনতে পায় বাকি তিন প্রকার বাণী শুনতে পায় না। আমরা যে কথা শুনি এটাই বৈখরী, তার থেকে একটু সূক্ষ্মকে বলে মধ্যমা, তার থেকে আরেকটু সূক্ষ্ম হয়ে গেলে বলে পশ্যন্তি আর চারিদিকে ব্যপ্ত হয়ে যেটা রয়েছে তাকে বলে পরা। পরার আরেকটা নাম নাদ, পরার আরেকটা নাম বাইবেলে বলছেন word, ভগবানকে জানার তো কোন পথ নেই, কিন্তু জানার কয়েকটি পদ্ধতি আছে, যেমন নির্বিকল্প সমাধিতে জানা যায়, বোধে বোধ করেন। সবিকল্প সমাধিতে গড্‌, ঈশ্বর, আল্লা এই রূপে জানা যায়। কিন্তু ভগবানের একটা sound equivalent আছে, শব্দ দিয়ে ভগবানকে জানা, সেটা হল ওঁ। এটাই পরা আর পরা রূপেই তিনি আমাদের ভেতরে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভেতরে এলেও কোন কাজের নয়, কারণ পুরোটাই ছড়িয়ে রয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওই একটাই ধ্বণি রয়েছে। ওঁ থেকে আরেকটু যেই স্থূল হয়ে গেল তখন তাকে বলছেন পশ্যন্তি, পশ্যন্তি আরও স্থূল হয়ে গেলে মধ্যমা, মধ্যমা আরও স্থূল হয়ে যাওয়ার পর বৈখরী হয়ে যায়। এটাকেই ঠাকুর একটু অন্য ভাবে বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁএ লয় হয়, ঐ নাদ ভেদ করে যোগীরা সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন।

সমগ্র বেদের সার ত্রিসন্ধ্যা। পুরো বেদ যদি অধ্যয়ন না করে তাহলে ত্রিসন্ধ্যা করলেই হয়ে যায়। ত্রিসন্ধ্যা করতে করতে যদি গায়ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে যায় আর তখন যদি শুধু গায়ত্রী জপ করে তাতেই ত্রিসন্ধ্যা করা হয়ে যাবে। যদি গায়ত্রী জপ কেউ করে তাতে বেদের যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই তার করা হয়ে গেল। কারণ বেদের উদ্দেশ্য পরমাত্মা প্রাপ্তি। গরুর সার যেমন দুধ, দুধের সার যেমন ঘি, গায়ত্রী হল এই ঘিয়ের মত। যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন, তাঁরা ওর মধ্যেই হারিয়ে যান, বেদের বাইরে তাঁরা আসতে পারেন না। ত্রিসন্ধ্যাও যাঁরা করেন তাঁরাও ধর্মীয় আচারেই শেষ হয়ে যান, গায়ত্রী জপে যখন আসেন তখন ওটাই বর্ডার লাইন হয়ে যায়। গায়ত্রী জপ করে কেউ ধর্মীয় আচারেই শেষ হয়ে যেতে পারেন আবার কেউ বড় আধ্যাত্মিক সাধকও হয়ে যেতে পারেন।

গায়ত্রী মন্ত্রকে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে আবৃত্তি করে যাচ্ছে, বেদের মন্ত্রোচ্চারণ করা হচ্ছে, এটাই বৈখরী। গায়ত্রী মন্ত্রকে কেউ ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন এটাও বৈখরী। সেখান থেকে ভেতরে গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করতে করতে যদি মন শান্ত হয়ে যায় তখন দেখা যাবে ঠোঁট নড়াটা বন্ধ হয়ে গেছে, জিহ্বাটা তখনও একটু নড়তে থাকে, কিন্তু বৈখরীকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জিহ্বার নড়াটাও যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন ভেতরটা শান্ত হয়ে গেল, কিন্তু কণ্ঠদেশটা একটু নড়তে থাকে, ওই অবস্থায় গায়ত্রী মন্ত্রের জপ দ্রুত হতে শুরু হয় আর তা নাহলে জপ বন্ধ হয়ে শুধু ওঁ টুকু থেকে যায়। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, একজন গান করছে নিতাই আমার মাতা হাতি, সেখান থেকে যখন ভাব হতে শুরু করল তখন মাতা হাতি মাতা হাতি বলে যাচ্ছে, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়ে শুধু হাতি হাতি হতে থাকে, শেষে শুধু হা হা হয়ে যায়। জপেও ঠিক একই জিনিস হয়।

দীক্ষার সময় গুরুদেব বলে দেন জপ করবে কিন্তু ঠোঁট দিয়ে যেন আওয়াজ না বেরোয়, আর ঠোঁট ও জিহ্বা কোনটাই যেন না নড়ে। কিন্তু জপের সময় প্রায় বেশীর ভাগেরই গুরুবাক্যের উল্লঙ্ঘন করে ঠোঁট দুটো নড়তে থাকে, কারো বেশী নড়ে, কারো একটু কম নড়ে। দীক্ষাগুরু বলে দিয়েছেন জিহ্বা পর্যন্ত যেন না নড়ে। জপ করার সময় আমাদের জিহ্বাটা নড়ার জন্য ছটফট করতে তাহাকে। কারণ আমাদের জপ বৈখরী থেকেই হয়। বৈখরীতে ঠোঁট প্রচণ্ড গতিতে নড়ে, সেইজন্য আমাদের জপ ঠিক হয় না, জপের ফলও পাই না। মন যখন শান্ত হয় তখন জিভ নড়াটা বন্ধ হয়ে যায়। জিভ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন জপটা মধ্যমা রূপে আসে, মধ্যমা হল কণ্ঠস্থান। কণ্ঠে পৌঁছে গেলে জপ অনেক তাড়াতাড়ি হতে থাকে। অনেকের একশ আটবার জপ করতে তিন থেকে চার মিনিট লাগে। তার বেশী যদি সময় লাগে তাহলে বুঝতে হবে জিভ খুব বেশী নড়ছে। এক হাজার জপ করতে মোটামুটি সবারই চল্লিশ মিনিট লাগে। যদি এক ঘণ্টা লেগে যায় তাহলে বুঝতে হবে গুরুদেবের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে জিভ, ঠোঁট সব নড়ছে, সে নিজেও বুঝতে পারছে না। যদি দেখা যায় দশ মিনিটে হাজার জপ করে নিচ্ছে, তখন দুটো সম্ভবনা থাকে। প্রথম সম্ভবনা মন্ত্র ঠিক উচ্চারণ হচ্ছে না আর করে আঙ্গুল উল্টোপাল্টা ছুটছে, এতে পরিষ্কার যে মন্ত্রে মন একেবারেই নেই। দ্বিতীয় সম্ভবনা হতে পারে জপ করে করে মন এতো স্থির হয়ে গেছে যে বাণী মধ্যমা মানে কণ্ঠে চলে এসেছে। মধ্যমাতে যদি জপ হয় তাহলে জপের গতি বেড়ে যাবে। জপের সময় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের কণ্ঠের নীচে যে কণ্ঠনালী রয়েছে ওটা নড়ছে। ওই নড়াটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে জপ পশ্যন্তীতে চলে যাবে। ঐখানে চলে গেলে জপ যে কি গতি নিয়ে নেবে বলা যায় না, কেননা ঐ সময় যান্ত্রিক ভাবে যে জপটা হচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে একটা নিজস্ব ছন্দ, পদ্ধতি ও গতিতে চলতে থাকবে। রেলগাড়ির গতি আর রেডিও ওয়েভের গতি, দুটোর মধ্যে কত পার্থক্য চিন্তাই করা যায় না। রেলের গতির একটা সীমা আছে, রেডিও ওয়েভেরও একটা নির্দিষ্ট সীমা রেখা আছে কিন্তু কোটি কোটি গুণ বেশী। পশ্যন্তীকেও যদি পার করে যেতে পারে তখন পরা স্তরে পৌঁছে যাবে। পরা স্তরে পৌঁছে যাওয়া মানে মন্ত্র আর ইষ্ট এক হয়ে গেল। কারণ তখন ধ্বণির সাথে সে এক হয়ে গেছে। তখন মন এত একাগ্র হয়ে যায় যে পুরো মন্ত্রের আর উচ্চারণ না হয়ে শুধু ওঁএই শেষ হয়ে যায়। সেখানে তিনি অনাহত ধ্বণি বা নাদ ধ্বণি শুনতে পান। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সমাধিতে যাওয়ার আগে শেষ যেটা যোগীরা শোনেন বা জগতের অনুভব করেন সেটা হল ওঁ। ওঁ কোন শব্দ নয়, ওঁ একটা ধ্বণি। মন্দিরের ঘন্টার ধ্বনির শেষে যে অনুরণটা হয় সেই রকম গম্ ধ্বণি শোনেন। এই ধ্বণি সব সময়ই যোগীরা শুনতে পান। মন যদি

ওখানে আরও একাগ্র হয়ে যায় তখন তিনি ঐটাকেও ছেড়ে বেরিয়ে যান। ভগবান যিনি বাণী রূপে ঢুকেছিলেন যাকে পরা বলা হচ্ছে, সেটাই ক্রমাগত স্থূল হয়ে হয়ে পরা, পশ্যন্তি, বৈখরী হয়ে শব্দ ছিল, এবার উল্টো পদ্ধতিতে বৈখরী থেকে ধীরে ধীরে পরাতে পৌঁছে গেল। পরা থেকে কিন্তু আর বেরোতে পারবে না। পরাকে ছাড়া মানে মন, বুদ্ধির এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। প্রথমে ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে হচ্ছে, বেদে যে কর্মকাণ্ড ছিল সব ছাড়ল, সেখান থেকে চলে এলো বাণীতে। বাণীও সূক্ষ্ম হতে হতে এগিয়ে গেলে থাকে চিন্তন, ঐ চিন্তনে শুধু ওঁ থেকে যাচ্ছে। ওঁ কেও যখন পার করে গেল তখন পরমাত্মাকে বোধে বোধ করেন।

ভগবান স্বধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে বললেন সৃষ্টি কোথা থেকে এল, যদি প্রথম জিনিসটাই না বোঝা যায় তাহলে সে এগোবে কি করে। বলছেন *যথানলঃ খেহনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারণ্যধিমথ্যমানঃ। অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমধ্যতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী।।১১/১২/১৮।।* অগ্নি যেমন সব কিছুতে আছে, আকাশে অগ্নি উষ্মা রূপে আছে, মেঘে বিদ্যুৎ চমকায় সেখানে বিদ্যুৎ রূপে অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নি কাঠের মধ্যে আছে যাকে বলছেন দাহিকা শক্তি। অগ্নি সব জায়গায় রয়েছে অথচ আমরা সেই অগ্নিকে কাজে লাগাতে পারছি না। ওই অগ্নিই কাঠের মধ্যে প্রবেশ করছে। কাঠ মানে, সূর্যের আলো গাছের উপর পড়ে ফটো সিন্থেসিস হয়ে সূর্যের আলো ঘনীভূত হয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে আমরা বলছি কাঠের মধ্যে অগ্নি বিশেষ ভাবে রয়েছে। অগ্নিকে পেতে হলে অরণি কাঠকে ঘষলে ঐ অগ্নি বেরিয়ে আসবে। চারিদিকে এত অগ্নি কিন্তু কোন কাজে লাগে না। একজন লোক রাত্রিবেলা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। কোন কোন শহরে সাইকেলের সামনে আলো লাগানো বাধ্যতামূলক। লোকটির সাইকেলে আলো ছিল না। পুলিশ তাকে ধরেছে, আলো নেই কেন। লোকটি বলছে চারিদিকে এত আলো আছে, সাইকেলে আলো লাগাবার কি দরকার। পুলিশটি খুব মজাদার মানুষ ছিল, সে মাটিতে বসে সাইকেলের চাকার হাওয়া খুলে দিয়ে বলল, চারিদিকে এত বাতাস থাকতে সাইকেলের চাকায় কেন হাওয়া দিয়েছ। শহরে যতই আলো থাকুক গাড়ির হেডলাইট জ্বালাতেই হবে, চারিদিকে যতই বাতাস থাকুক ঐ বাতাসে সাইকেলের চাকা ঘুরবে না। ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ভগবান সব জায়গায় বিদ্যমান, যেভাবে উষ্মা সব জায়গায় বিদ্যমান, কিন্তু অগ্নির তাপ যদি পেতে হয় তাহলে অরণি মন্থন করতে হবে। ঠিক তেমনি ভগবান সব জায়গাতেই আছেন কিন্তু ধ্বণি রূপে তাঁকে অনুভব করা যায়। পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী ভগবানেরই চারটে রূপ।

নামজপ করার তাৎপর্য এখানেই, বাণী ঈশ্বরের স্বরূপ। ভাগবত ভগবানের স্বরূপকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেন কিন্তু এখানে বাণী দিয়ে বর্ণনা করছেন, বাণী ভগবানেরই স্বরূপ। নামজপ করা মানে ভগবানেরই স্মরণ করা, নামের অর্থকে গভীরে চিন্তন করা মানে ভগবানের আরও কাছে যাচ্ছে। গভীরতমে যখন চলে গেল তখন ভগবানের সাকার রূপের খুব কাছে চলে গেল। সাকার রূপও যখন স্তব্দ হয়ে গেল তখন পরাতে চলে গেল, ওঁ ধ্বণি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ঐ নাদ ধ্বণিকেও যখন ভেদ করে যায় তখন পরমাত্মার সাক্ষাৎ করছে। ঠাকুর এমনও বলছেন যে, ঐ অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তিনি কথা কন। আলবেরুনি ভারতে আসার পর তিনি অনেক ব্রাহ্মণদের সাথে কথা বলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের তিনি জিজ্ঞেস করছেন, আপনাদের ভগবান কি কথা বলতে পারেন? ব্রাহ্মণরা স্পষ্ট বলছেন, হ্যাঁ তিনি কথা বলেন। স্বামীজীও বলছেন, এটা কোন কল্পনা নয়, তিনি সত্যিই কথা বলেন, তিনি আদেশ দেন। উদ্ধব যখন স্বধর্ম আর ঈশ্বরের শরণাগতি নিয়ে জানতে চাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই ঈশ্বরের স্বরূপ বলছেন, বাণী ঈশ্বরের স্বরূপ, সেই বাণীর চারটি রূপ পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা আর বৈখরী। আমরা যদি অপশব্দ ব্যবহার করি, খারাপ শব্দ ব্যবহার করি তাহলে ভগবানকেই তাচ্ছিল্য করা হয়, কারণ শব্দ ভগবানেরই রূপ। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি যেমন মনের অবস্থা ঠিক তেমনি পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী বাণীর চারটে অবস্থা।

বাণী রূপে ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণনা করা হল, ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ এবার ক্রিয়া দিয়ে ঈশ্বরের বর্ণনা করছেন। হাত নাড়ছে, মুখ নাড়ছে, খাওয়া-দাওয়া করছে, যা কিছু করছে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সব আমারই অভিব্যক্তি। কর্মপ্রবাহ যা কিছু আছে সব পরমাত্মাই হয়েছেন। আর যত রকমের বিকার, যেমন রসগোল্লা, সন্দেশ সব দুধেরই বিকার, ঠিক তেমনি যত রকমের ক্রিয়া, যত রকমের কথা, যত রকমের চিন্তন, যত

রকমের অভিব্যক্তি, সবই তিনি, তিনি ছাড়া কিছু নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই পরমাত্মাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এই সংসারটা একটা কাপড়ের মত, কাপড় যেমন সুতো দিয়ে তৈরী, পরমাত্মা হলেন সেই সুতো। কাপড় না থাকলেও সুতো থাকবে কিন্তু সুতো না থাকলে কাপড় হবে না। সংসার ছাড়াও পরমেশ্বর থাকবেন কিন্তু পরমেশ্বর ছাড়া সংসার হবে না। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, সব আমিই হয়েছি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে আমিই ধারণ করে আছি। তোমার উদরের যে অগ্নিতে ভুক্তদ্রব্য হজম হয় সেই জঠরাগ্নিটাও আমি। পরমাত্মার বাইরে এই জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। এই সংসার পরমাত্মারই স্বরূপ, এখানে যে কর্ম করা হয় তাতে দুটি ফল হয়, একটা ভোগ আরেকটি মোক্ষ। সেইজন্য হে উদ্ধভ! তুমি অখণ্ড রূপে প্রতিষ্ঠিত হও। স্বধর্মের যে কথা বলছ সেটা ঠিকই বলছ, কিন্তু যেমন যখন কোন বাণী তৈরী হয় সেটা অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, কিন্তু সমস্ত বাণীর উৎস হল পরা। ঠিক তেমনি এই যে জগৎ দেখছ, এই জগৎ হল অখণ্ড স্বরূপ, এই জগৎকে ছেড়ে দিয়ে তুমি সেই অখণ্ড স্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। ঠিক তেমনি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী থেকে বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তীকে বন্ধ করে পরাতে প্রতিষ্ঠিত হও। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের পেছনে যিনি সেই অখণ্ড স্বরূপ সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সমস্ত জীবের লক্ষ্য। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধভকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন।

এরপর বলছেন সংসার বৃক্ষে কি কি আছে। মূল কথা সংসার বৃক্ষে বাসনাটাই মূল। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *অসঙ্গশস্ত্রেণ*, বৈরাগ্য দিয়ে এই বৃক্ষের ছেদন করতে হয়। সংসার বলতে সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জগতকে দেখছি কিন্তু মনের সংসারটাই ঠিক ঠিক সংসার। মনেই আমরা নানা কিছুর কল্পনা করে নিই, সেই কল্পনা দিয়েই আমরা নদের হাট বসাই, আর সেটাকে আমরা ছাড়তে পারি না। রেশমের গুটি পোকা চাইলে বাসা কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু নিজে তৈরী করেছে কিনা সেইজন্য বেরিয়ে আসতে চায় না। কিন্তু কাটবে কেন? কাটবে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য, যাঁরা ঈশ্বরকে পেতে চায় তাঁরাই কাটবেন। এখান থেকেই ভগবান সাংখ্য, যোগ, ধ্যান, ভক্তি, ধ্যান কিভাবে করবে, জপ কিভাবে করতে হয়, এগুলোকে নিয়ে পর পর বলে যাবেন। বর্তমান হিন্দু ধর্মের যা কিছু সাধনা এই দুটো অধ্যায়কে কেন্দ্র করেই চলে। এর আগেও বলা হয়েছিল যে একাদশ স্কন্ধকে ভাগবতের আত্মা বলা হয় আর দশম স্কন্ধকে ভাগবতের প্রাণ বলা হয়, বিশেষ করে রাসলীলার পাঁচটি অধ্যায় ভাগবতের পঞ্চ প্রাণ। রাসলীলাকে যদি ভাগবত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ভাগবতের আর কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে না। একাদশ স্কন্ধকে আত্মা বলা হয়, কিন্তু একাদশ স্কন্ধকে সরিয়ে দিলে ভাগবত থাকবে না তা নয়। ভাগবতের যা বক্তব্য তার সার একাদশ স্কন্ধে দেওয়া হয়েছে। দশম স্কন্ধ পড়লে ভাগবতের বৈশিষ্ট্য জানা যায় আর একাদশ স্কন্ধ পড়লে ভাগবতের বক্তব্য জানা যায়।

তিন গুণের বিচার

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন *সত্ত্বং রজোস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্য চাত্মনঃ। সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি।।১১/১৩/১।।* এখানে বুদ্ধি ও বুদ্ধির ধর্মের সাথে আত্মার স্বভাবের তফাৎ নিয়ে বলছেন। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান যে তিনটে গুণের কথা বলছেন, সাংখ্য দর্শনে এই তিনটে গুণেরই বিচার করা হয়। সাংখ্য দর্শন ষড়দর্শনের প্রত্যেকটি দর্শনের জনক। সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা হলেন কপিল মুনি, উনি ঋষি, বেদের উপরই তিনি অবস্থিত। বেদে একটি আধ্যাত্মিক সত্তার কথা বলা দেওয়া হল, ঈশ্বরই আছেন। ঠাকুরও বলছেন তিনিই আছেন, তিনিই সত্য। কিন্তু আমরা যে জগৎ দেখছি, এই জগতের সাথে ঐ সত্তাকে মেলাতে পারছি না। আমরা দেখছি জগতটাই সত্য। একদিকে আমাদের কাছে জগৎ সত্য আর ঠাকুর ও ঋষিরা বলছেন ঈশ্বরই সত্য, এই দুটোকে আমরা মেলাব কি করে। যদি বলে দেওয়া হয় এই সংসার মিথ্যা, তোমার সুখ, দুঃখ সব মিথ্যা, কিন্তু আমরা মানব কি করে, আমাদের তো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। যে ধর্ম বলে দেয় সংসার মিথ্যা, তোমার সুখ, দুঃখ মিথ্যা, সেই ধর্মকে নিয়ে আমি কি করব? স্বামীজী বলছেন, যে ধর্ম আমাকে এখানে একটা রুটি দিতে পারে না আর মৃত্যুর পর স্বর্গে অনন্ত সুখ দেবে, সেই ধর্মকে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ঋষিরা দুটোকেই নিয়ে আসেন, এনে দুটোর মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করে মিলিয়ে

দেন। উপনিষদে এই নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়নি। বিস্তারিত ভাবে বলছেন দার্শনিকরা, এই ছটি দর্শনে আধ্যাত্মিক সত্তা আর এই জগতের বাস্তবিকতা এই দুটো জিনিসের মেল বন্ধন করাচ্ছেন। অন্য দিকে দুটোকে মেলানো খুব কঠিন। কারণ পারমার্থিক যে সত্তা, তাঁকে আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর যাই বলা হোক, শাস্ত্র তাঁকে মন বাণীর পারে বলছেন আর জগৎ পুরো মন বাণীর ভেতরে। দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই।

কপিল মুনির সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, কিন্তু চৈতন্য রয়েছে। চৈতন্য পার্টিকেলসের মত, নদীর জলের যেমন অসংখ্য পার্টিকেলস আছে, তেমনি পুরুষের সংখ্যাও অসংখ্য আর প্রকৃতি আছে। প্রকৃতি একটা নদীর মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, পুরুষও পাশাপাশি একটা নদীর মত বয়ে চলেছে আর যেখানে দুটো নদীর মিলন হয়ে যাচ্ছে সেখানেই সৃষ্টি এসে যাচ্ছে। দুটো নদী কিছু সময় একসাথে চলার পর আবার তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তখন কোন সৃষ্টি নেই। প্রকৃতি জিনিসটাকে বলে সত্ত্ব রজো আর তমো, এই তিনটে হল শুদ্ধ গুণ। তার মধ্যে রজো ক্রিয়া নিয়ে আসে, তমো মানে থেমে যাওয়া আর সত্ত্ব হল একটা স্থৈর্য বা স্থিতি নিয়ে আসে। তমো আর সত্ত্বকে বাইরে থেকে একই রকম মনে হয়। কিন্তু যদি তফাৎ করতে হয়, কালো রঙ তমো, লাল রঙ রজো আর সাদা হল সত্ত্ব। কালো আর সাদা রঙে যে রকম তফাৎ, তমো আর সত্ত্বে সেই তফাৎ। তমো জড়ের মত, নড়তে চড়তে চায় না, সত্ত্বও নড়ে না। কিন্তু চাইলে সে নড়তে পারে, সত্ত্বের মধ্যে রজোতে পাল্টে যাওয়ার সম্ভবনা মারাত্মক।

এই তিনটের স্বভাবের মধ্যেই আছে যে, এরা এক অপরকে দাবাতে থাকে। যেমন আগুন আর জল, জল আগুনকে দাবাতে চায়, আগুন জলকে দাবাতে চায়। এখানে সৃষ্টিকে নিয়ে বলছেন না, এখানে বিষয়টা আলাদা, আমরা ঐ বিষয়কেই নিয়েই আলোচনা করব। সৃষ্টি শুরু হওয়ার পর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু দেখছি, সব কিছুই সত্ত্ব, রজো আর তমো বিভিন্ন ভাবে মিশে মিশে দাঁড়িয়েছে। আলো, বাতাস, জল, মাটি যা কিছু দেখছি সবের মধ্যেই সত্ত্ব, রজো আর তমো জড়িয়ে আছে, আমাদের মনেও সত্ত্ব, রজো ও তমো জড়িয়ে আছে, খাদ্যের মধ্যেও জড়িয়ে আছে, পোষাকেও জড়িয়ে আছে, আমাদের ব্যবহারেও জড়িয়ে আছে। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, ভক্তি তিন রকম, ভক্ত তিন রকম, ভগবানও তিন রকমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ। সত্ত্ব, রজো আর তমোকে নিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সব জায়গাতেই এই তিনটে গুণ আছে। বিশ্লেষণ করলে যে কোন জিনিসকে এই তিনটে গুণের মধ্যে classify করে দেওয়া যাবে। ভগবান উদ্ধবকে বলছেন, সত্ত্ব, রজো আর তমো বুদ্ধির মধ্যে আছে কিন্তু আত্মার মধ্যে নেই। স্বামীজী যে জ্ঞানযোগের কথা বলছেন, জ্ঞানযোগের সার এই জায়গাতে; পুরুষ আর প্রকৃতিকে বার করা, কোনটা পুরুষ আর কোনটা প্রকৃতি শুধু এতটুকু যদি বুঝে নেওয়া হয়, এটাই তখন জ্ঞানযোগ হয়ে যাবে। ভাগবতের এই জায়গাতে জ্ঞানযোগের উপর বিরাট আলোচনা করছেন, আলোচনা যত এগোবে তত তাই কঠিন মনে হবে।

ভগবান বলছেন, যে কোন জিনিস যেটা আত্মা নয় সেটা অনাত্মা, যেটাই অনাত্মা সেটাই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। শুধু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাটাই জ্ঞানযোগ নয়, এখানে আরও সূক্ষ্ম স্তরে চলে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার বিচারটাই খুব সূক্ষ্ম স্তরে চলে। তার সাথে এই তিনটে গুণের বিচার করা। সব সময় বিচার করে দেখা, আমি যা কিছু করছি, পড়ছি, দেখছি এগুলো কোন গুণের মধ্যে পড়ে। এই বিচার করে করে যখন স্থিতি হয়ে গেল তারপর সেই অনুসারে কাজ করা। কিন্তু তারও আগে প্রধান যে জিনিসটা জানার দরকার তা হল, এই তিনটে গুণের কার্য। কার্য মানেই তিনটে গুণ, যেটাই তিনটে গুণের এলাকার সেটা আত্মা নয়, এই পুরো ব্যাপারটাকে জানতে হবে। আধ্যাত্মিক মানেই আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর ধর্ম মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত না হলে কখনই ত্রিগুণাতীত হওয়া যাবে না, আত্মা মানেই ত্রিগুণাতীত। কিন্তু তার আগে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ধার্মিক না হলে কোন দিন সে আধ্যাত্মিক সাধনা করতে পারবে না, আধ্যাত্মিক পুরুষও হতে পারবে না। সত্ত্ব, রজো আর তমো বুদ্ধির গুণ, সেইজন্য প্রথমে রজো আর তমো এই দুটো গুণকে সত্ত্বগুণ দিয়ে দাবাতে হয়। মানুষের মধ্যে যে হিংসার ভাব, ক্রোধ, লোভের ভাব, এগুলো রজো আর তমো গুণের প্রভাবে আসে। ঠাকুর বোঝাবার জন্য তিন ডাকাতের গল্প বলছেন। একজন লোক তিনটে ডাকাতের হাতে পড়ে গেছে। ডাকাতরা তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। তমোগুণী ডাকাত বলছে, একে আর

রেখে কি লাভ, এর গলাটা কেটে দিলেই হয়। রজোগুণী ডাকাত বলছে, মেরে কাজ নেই, দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে এখানেই ছেড়ে দিলেই হয়। দড়ি দিয়ে বেঁধে তিনজন ডাকাতই চলে গেল। সত্ত্বগুণী ডাকাত কিছু দূর গিয়ে লোকটির কাছে ফিরে এল। তার দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, আহা! তোমার খুব লেগেছে। তারপর তাকে বলে দিল, তুমি এই রাস্তা দিয়ে চলে গেলে নিজের জায়গায় পৌঁছে যাব। তখন লোকটি বলছে, আপনি আমার এত উপকার করলেন, আমার বাড়িতে একটু চলুন। সত্ত্বগুণী ডাকাত বলছেন, আমার যাওয়ার উপায় নেই, শহরে গেলে পুলিশ আমাকে ধরে ফেলবে। এটা একটা গল্প, গল্পের মাধ্যমে একটা ধারণা দেওয়া হল। গুণ সব সময় ভৌতিক জিনিস, ভৌতিক জিনিস কখনই পরমাত্মার কাছে পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু জীবন যাত্রা চালাতে গেলে সত্ত্বগুণ দিয়ে তমোগুণ আর রজোগুণকে দাবাতে হয়। সবারই প্রতি ভালোবাসা, সবারই প্রতি দয়া, সবারই প্রতি করুণা এই ভাবগুলো দিয়ে বাকি দুটো গুণকে দাবাতে হয়। তমোগুণী বলবে, যা কিছু আছে সব আমার জন্যই আছে, রজোগুণী বলবে, তোমাকেও দেব কিন্তু তার আগে তুমি মানো যে আমি রাজা, দরকার হলে আমি একদিক থেকে শুরু করে আরেকদিক পর্যন্ত সব শেষ করে দিতে পারি। অনেক রকম উপমা নেওয়া হয়, তমোগুণকে বলে কুম্ভকর্ণ, রজোগুণকে বলে রাবণ আর বিভীষণকে সত্ত্বগুণী। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরিক বৃত্তির যে বর্ণনা আছে তাতে তমো আর রজোগুণকে মিলিয়ে বলছেন। আর সপ্তদশ অধ্যায়ে তিনটে গুণেরই বিস্তারিত বর্ণনা করছেন। আহারেও তিনটে গুণ, খুব ঝাল, মশলা দেওয়া, অতি উষ্ণ খাবার রজোগুণী খাবার। পচা, বাসি, শুকনো এগুলো তমোগুণী খাবার। আর যে খাবারে লবণ, ঝাল, মশলা এগুলো কম, মিষ্টের ভাগ বেশি আর রসালো, স্নিগ্ধ এগুলো সাত্ত্বিক আহার।

তেমনি আমাদের মনে যত রকমের বৃত্তি আছে এই বৃত্তিও গুণানুসারে সত্ত্ব, রজো আর তমো হয়। বৃত্তি মানে মনের মধ্যে অনবরত বিভিন্ন রকম যে চাঞ্চল্য উঠছে এটাই বৃত্তি। পুকুরে ঢিল ছুড়লে পুকুরের জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আমাদের মন হল পুকুর, বাইরে থেকে যখন ঢিল পড়ে বা ভেতরে যখন বড় বড় মাছগুলো তড়াং তড়াং করে লাফালাফি করে তখনও ঢেউ উঠবে। বাইরে থেকে ঢিল আসুক আর ভেতরের মাছগুলো নড়াচড়া করুক ঢেউ উঠবে, একই জিনিস। এই দুটো দিয়ে মনের মধ্যে সব সময় তোলপাড় হয়ে চলেছে। বাইরে কিছু জিনিস দেখে ভেতরে তোলপাড় হয়, পুরনো কথা ভাবছি তখনও তোলপাড় হয়, মনে মনে কল্পনা করে যাচ্ছি, তাতেও তোলপাড় হয়, কখনও স্বপ্নে কিছু দৃশ্য দেখে তোলপাড় হতে থাকে। ওই তোলপাড়ের মধ্যে তমোগুণী বৃত্তি প্রচুর থাকে। তমোগুণকে কাটাতে হয় রজোগুণ দিয়ে, রজোগুণ মানে activity নিয়ে আসা। আমরা এতদিন কিছুই করিনি, সারাটা দিন হয় বিছানায় শুয়ে আছি, নয়তো খবরের কাগজ পড়ছি, নয়তো টিভি দেখে সময় কাটাচ্ছি। ঠাকুর বলছেন কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর, মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, বুড়ো শ্বশুড় বা ভাসুর একজন বসে আছে, কিছু করে না, সারাদিন বসে বসে তামাক টেনে যায়, মাঝে মাঝে ভেতর থেকে ডাক আসে, কুমড়োটা কেটে দিতে হবে। দেখতে গেলে আমাদের সবারই জীবন তাই, কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর। তমোগুণ কাটার জন্য কাজে নেমে পড়তে হবে, পাঁচটা বাচ্চাকে বিনা পয়সায় পড়ানো দিয়েই হোক বা পাঁচটা লোকের সেবা করাতে নেমে পড়া দিয়েই হোক। অপরের জন্য কাজ করতে করতে ভেতরে একটা শক্তি এসে যায়। ঐ শক্তিটা আসার পর ওটাকে সত্ত্বগুণে পরিবর্তন করতে হয়। এবার তার মধ্যে সবার প্রতি ভালোবাসা, দয়া, করুণা জাগতে শুরু করবে, তার মানে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হচ্ছে। কেউ কষ্ট দিলে তার প্রতি কোন বিরূপ ভাব আসবে না। অপরের কষ্ট দেখলে মনটা করুণায় দ্রবিভূত হয়ে যাচ্ছে।

এই সত্ত্বগুণের যখন বৃদ্ধি হবে তখন *সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি*, প্রথমে এই সত্ত্বগুণ দিয়ে বাকি সবগুলোকে মেরে দাও। এখানে বলছেন না যে তমোগুণকে রজোগুণ দিয়ে দাবাও, এটাকে ধরেই নেওয়া হয়েছে। তমোগুণকে রজোগুণ দিয়ে মারতে হয় আর তমো আর রজো দুটোকেই মারতে হয় সত্ত্বগুণ দিয়ে। কারণ কখনই কোন পরিস্থিতিতে একটা মাত্র গুণ থাকে না, তিনটে গুণ সব সময় এক সঙ্গে চলে। যেমন ঠাকুরকে আমরা বলছি তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব বলে কিছু হয় না, তমোগুণ একটু থাকতেই হবে, তমোগুণ না থাকলে ঘুমই হবে না। আমাদের জীবনে বেশ কিছু কাজ আছে তমোগুণ ছাড়া হবে না। কিন্তু পুরোপুরি দাবিয়ে দেওয়া হয়। তমোগুণকে রজোগুণকে দাবিয়ে দেওয়া হল, তমো আর রজোগুণকে সত্ত্বগুণ

দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সত্ত্বগুণকেও দাবাতে হবে, তা নাহলে সে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে এগোতেই পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সত্ত্বগুণকে সত্ত্বগুণ দিয়ে দাবাতে হবে। সত্ত্বগুণের কিছু বৈশিষ্ট্য রজোগুণ থেকে আসে, যেমন করুণার ভাব, দয়ার ভাব, ভালোবাসা, অপরের ভালো করা। সত্ত্বের আরেকটা ভাব হল শান্ত বৃত্তি। এনারা একটা উপমা নেন, দাহকার্যে শবকে দাহ করার জন্য অনেক কাঠ দিতে হয় তাতে আগুন দেওয়ার পর একটা বাঁশ দিয়ে মাঝে মাঝে খোঁচাতে হয়। খোঁচা দিয়ে দিয়ে শেষে দাউ দাউ করে জ্বলে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর কিছু পোড়ার বাকি নেই তখন ঐ বাঁশকেও আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক এই একই জিনিস হয়। তমোগুণ, রজোগুণ যা কিছু আছে সবটাকে পোড়াতে হয়, পোড়ানর জন্য প্রথমে দরকার সত্ত্বগুণী বৃত্তি। সত্ত্বগুণী বৃত্তি মানে, দয়া, করুণা, ভালো করা, শুভ চিন্তন করা, জপধ্যান করা। এরপর ওই যে সত্ত্বগুণের বৃত্তিগুলো রয়েছে, ঐ বৃত্তিগুলিকে এবার শান্ত করতে হবে। শান্ত কিভাবে হবে? মনটাকেই একেবারে শান্ত করে দিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ সত্ত্বগুণ থাকবে ততক্ষণ পুরো হয় না, এই শান্ত বৃত্তি, এই একটি বৃত্তি থেকে যায়, তাতে কোন দোষ নেই। ঐ যে পুকুরের কল্পনা করা হয়েছিল যেখানে অনবরত ঢেউ উঠছিল, আগে ঢেউগুলো ছিল অন্য রকম, অপরকে মারতে হবে, ওর ক্ষতি করতে হবে, আমাকে এটা পেতে হবে। এখন বৃত্তিগুলো শান্ত হয়ে গেছে, কাউকে বিরক্ত করে না, কারুর ক্ষতি করতে চায় না। কিন্তু তাতেও মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারে না। শেষ থেকে যায় শান্ত বৃত্তি। দয়া, করুণা এই বৃত্তিগুলিকে শান্ত বৃত্তি দিয়ে শান্ত করে দেওয়ার পর এবার সে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করবে।

এরপর বলছেন *সত্ত্বাদ্ ধর্মো ভবেদ্ বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ। সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে।।১১/১৩/২।।* যে কোন মানুষের মধ্যে যখন সত্ত্বগুণের আধিক্য হয় তখনই মানুষ আমার ভক্তিরূপ স্বধর্ম পায়। স্বধর্ম মানে আমরা যা ক্রিয়া করছি, ঠাকুরও বলছেন আগে কর্মকাণ্ড, আগে যো সো করে অনেক কর্ম করতে হয়। মাছ ধরার আগে পুকুরে চার ফেলতে হয়, ছিপ ফেলে বসে থাকতে হয়, তারপর গভীর জল থেকে মাছ আসতে থাকে, জলের নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় যে চাড়ের গন্ধে মাছ আসছে। এই যে চার তৈরী করা, চার ফেলা, ছিপ ফেলা এগুলো হল কর্ম। ঈশ্বরের পূজা কর্ম, ভজন কীর্তন করা কর্ম, জপধ্যানটাও কর্ম, সবটাই কর্ম, কর্ম মানে মন যেখানে কাজ করছে, মন যেখানেই কাজ করে সেখানেই কর্ম। কর্ম মানেই স্বধর্ম। আমি যদি একটা পথ বেছে নিয়ে থাকি, যে কোন পথই হোক, আমার জীবনে এই পথ। এবার আমি ঐ পথে যে চলছি এটাই আমার ধর্ম। ধর্ম মানে পথ, চলা মানে কর্ম। অনেকেই বলে, জীবনে আমি অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, আমার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা গেছে। স্বধর্মে যারা চলে তাদের জীবনেও ঝঞ্ঝা আসে, দুঃখ-কষ্ট আসে কিন্তু ঝঞ্ঝাকে তাদের ঝঞ্ঝা বলে বোধ হয় না। গান্ধীজী বললেন আমার ধর্ম সত্য আর অহিংসা। ইংরেজ পুলিশ বলে দিল আপনার এই জিনিসগুলোকে আমরা পছন্দ করছি না, আমরা আপনার অহিংসা ধর্মে বাধা দিচ্ছি। পুলিশ তাঁকে লাঠি পেটা করছে, মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, গান্ধীজী নির্বিকার। কতবার তাঁকে তিন-চার বছর ধরে জেলে বন্দী করে রাখছে। কিন্তু তিনি একবারও বললেন না যে আমার জীবনে কত ঝঞ্ঝা এসেছে। আর আমাদের পুলিশ যদি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যও থানায় নিয়ে যায় তাতেও বলছি আমার জীবনে ঝঞ্ঝা এসেছে। তার মানে আমরা স্বধর্মকে লঙ্ঘন করেছি। যে মানুষই বলবে আমার জীবনে কত ঝঞ্ঝা এসেছে, বুঝতে হবে সে ধর্মকে লঙ্ঘন করেছে। যদি স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে কোন কষ্ট হয় সেটাকে যদি ঝঞ্ঝা বলে মনে করে তাহলে বুঝতে হবে তার কিছু একটা গোলমাল আছে, কিন্তু সেটাকে প্রকাশ করতে নেই, নিজের অভাব বাইরের লোকেদের সামনে বলতে নেই।

তাহলে স্বধর্ম কিভাবে করবে, অনেক রকম স্বধর্ম আছে, যেমন মেয়েদের জন্য স্বধর্ম বলে দিলেন স্ত্রীধর্ম। স্বামীর সেবা কর, শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা কর, সন্তানের সেবা কর, এটাই স্ত্রীধর্ম। আগেকার দিনে লোকেরা চাষবাশ নিয়ে থাকত, তাদের বলে দিলেন তোমরা ঘরের কাজ কর, বাড়ির লোকের দেখাশোনা কর আর ঠাকুরের নাম কর। কিন্তু মানুষ যেমন যেমন উন্নত হয়েছে তেমন তেমন তার জীবনের অনেক কিছুতে জটিলতা এসে গেছে। জটিল হয়ে যাওয়ার পর একটা সময় বলতে শুরু করল, এবার আমি ধর্মপথে যেতে চাই। যারা শাস্ত্রের কথা শুনতে আসছে সবাই ধর্ম পথে আসার জন্যই শাস্ত্রের কথা শুনতে আসছে। কিন্তু তাদের

যদি বলা হয় আপনি জীবনে কোন স্বধর্ম অবলম্বন করেছেন? তখন কিছুই বলতে পারবেন না। কারণ সেই খাটনিটাই নেই। প্রথমে সবাই কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর, সেখান থেকে উঠে আসার পর শুরু হয় স্বধর্ম। যেমন গান্ধীজী বা নেতাজী বললেন দেশকে আমি মুক্ত করাবো, এর জন্য আমাকে যা করতে হবে আমি সব করব, এটাকেই এনারা স্বধর্ম রূপে গ্রহণ করলেন। তাঁদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার, এরপর আমার যা হবার হবে আমি এটাই করব, তা ভাল হোক আর মন্দই হোক। এখন কেউ যদি এসে বলে, তুমি নিঃশ্বাস নিয়েছ কি তোমাকে প্রচণ্ড মারধোর করা হবে। সে কি করবে? তাকে কেউ মারুক আর যাই করুক নিঃশ্বাস তাকে নিতেই হবে, স্বধর্ম মানে নিঃশ্বাস নেওয়া যেখানে কোন আপোষ হয় না। এরপর যখন সত্ত্বগুণে আসবে তখন মনটা শান্ত হতে থাকবে, শান্ত হতে হতে এক সময় বলবে, এবার আমার ভক্তি ছাড়া আর কিছু লাগবে না।

এরপর ভক্তিকে নিয়ে পর পর বলতে থাকবেন। সকালে ওঠা থেকে, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, বিগ্রহের সেবা করা, শাস্ত্র পাঠ করা, সেখান থেকে বন্ধুর সাথে কথা বলাতেও ঈশ্বরীয় কথাই হবে। এরপর ধ্যানজপ করে, পূজা করে, ঠাকুরের সেবা করে করে পুরো মনটাই যখন ঈশ্বরের দিকে চলে গেল তখন ভক্তিটাই তার কাছে স্বধর্ম হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তখন কারুর সঙ্গে যদি কোন সম্পর্ক হয় সেখানেও ভক্তি ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। সত্ত্বগুণ যখন বাড়ে তখন সব কিছু সে ছেড়ে দেয়। প্রথম যখন সত্ত্বগুণের অবস্থায় ছিল তখন লোকের সেবা করা, পূজা করা, জপধ্যান করা, শাস্ত্রচর্চা করা, এগুলোকে নিয়েই ছিল। কিন্তু ঐ সত্ত্বগুণই যখন আরও বেড়ে যায় তখন এগুলোও আর থাকে না, তখন ভক্তিই হয়ে যায় তার স্বধর্ম। ঐ ভক্তি থেকে কোন দিন কি নামতে পারে? হ্যাঁ, নামতে পারে, আপদ, বিপদ অনেক কিছুই আসতে পারে কিন্তু তার কাছে জিনিসটা পরিষ্কার, এটাই আমার স্বধর্ম। *সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং*, এই সাত্ত্বিক ধর্মে কাউকে যদি প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তাহলে তার জন্য সাত্ত্বিক জীবন অবলম্বন করতে হয়, আর সাত্ত্বিক বস্তু সেবন করতে হয়। যে কাজ করলে, যে ধর্ম পালন করলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় একমাত্র ঐ কাজই করতে হয়, এই কাজগুলোই রজোগুণ আর তমোগুণকে নাশ করতে শুরু করে দেয়। যদি দেখা যায় এই কাজে আমার সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হচ্ছে না তাহলে সেই ধরণের কাজ থেকে সরে আসতে হয়। মনে রাখতে হবে এখানে যা কিছু বলছেন এগুলো জনসাধারণের জন্য নয়, ধর্ম জনসাধারণের জন্য নয়, ভাগবতও জনসাধারণের জন্য নয়। যে মনে করছে আমি ভক্তি লাভ করতে চাই, আমি ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাই তবেই এই কথাগুলো তার জন্য। যদি বলে, আমি ভক্তি চাই কিন্তু সংসারও চাই, ঈশ্বরকেও চাই আর জগতের সব সুখভোগও চাই, তাহলে কারুরই কোন দিন হয়নি তোমারও কোন দিন হবে না, এরা নিজেদের বোকা বানায় অপরকেও বোকা বানায়। ভক্তিই যখন স্বধর্ম হয়ে যায়, আমাকে এখন এগোতে হবে, তখন উপায় কি? একটাই উপায়, যদি দেখ এতে তোমার সত্ত্বগুণ বাড়ছে না, তৎক্ষণাৎ ওটা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসো।

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির উপায়

এখান থেকেই জ্ঞানযোগ শুরু হয়ে যায়। জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্যই হল আমাদের ত্রিগুণাতীত হওয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তার আগে বলে দিলেন, প্রথমে তোমাকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিভাবে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হবে? সত্ত্বগুণের সেবন করতে হয়। একটা শ্লোকে বলছেন *আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ। ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ।।১১/১৩/৪।।* এই দশটি জিনিসের সেবনে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। এই দশটি জিনিস সেবন করার সময় সাবধান থাকতে হয় আর সাত্ত্বিক গুণ ছাড়া এই দশটি জিনিসের সেবন করতে নেই। প্রথম হল শাস্ত্র, যিনি যে ভাবের ও যে পরম্পরায় আছেন তাঁকে সেই ভাব ও পরম্পরার অনুকূল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করতে হবে। দ্বিতীয় জল, জল পান করার ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হয়, যে কোন জল খাওয়া যাবে না। তার মানে মদ খাওয়া যাবে না, কোল্ডড্রিঙ্কস খাওয়া যাবে না, সাত্ত্বিক জল অর্থাৎ শুদ্ধ জলই শুধু পান করতে হবে। তৃতীয় প্রজা, প্রজা মানে লোকজন, যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হচ্ছে তারা যেন সত্ত্বগুণী হয়। চতুর্থ দেশ, যেখানে বাস করবে সেই স্থান, সেই গৃহ যেন সত্ত্বগুণের আধার হয়। যেখানে মন্দির আছে, তীর্থস্থান এসব জায়গায় ভক্তরা বাস করতে চায়। পঞ্চম সময়, সাত্ত্বিক সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হয়, যেমন ভোরবেলা, ব্রাহ্মমুহূর্তে জপধ্যান, পড়াশোনা করতে হয়। ষষ্ঠ কর্ম, যে কর্ম করতে হচ্ছে সেই

কর্মগুলো যেন সাত্ত্বিক কর্ম হয়। সপ্তম জন্ম, জন্ম বলতে এনারা শুভ যোনিতে জন্ম নেওয়ার কথা বলতে চাইছেন, শুভ যোনিতে জন্ম হলে অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা এসে যায়। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কুলে জন্ম নিলে অনেক কিছু করা সহজ হয়ে যায়। চণ্ডাল কুলে জন্ম নিলে অনেক বিঘ্ন, অসুবিধা এসে যাবে, কারণ ওটা সাত্ত্বিক যোনি নয়। যার অশুভ যোনিতে জন্ম হয়ে গেছে তার কি কোন উপায় নেই? হ্যাঁ আছে, তাকে শুভ কর্ম অনেক বেশি করতে হবে। আগেকার দিনে গর্ভে সন্তান আসার খবর জেনে গেলে খুব সাবধান হয়ে যেতেন, যার জন্য ষোড়শ সংস্কারে গর্ভাধানের একটা সংস্কার রাখা হয়েছিল। অষ্টম ধ্যানের ব্যাপারে বলছেন, ধ্যান যেন সব সময় সত্ত্বগুণী বস্তুর উপরই করা হয়। নবম মন্ত্র, মন্ত্রও যেন সত্ত্বগুণী মন্ত্র হয়। কিছু কিছু মন্ত্র আছে রজোগুণী মন্ত্র, কিছু মন্ত্র আছে তামসিক মন্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্র বলে দেয় কোন মন্ত্র সাত্ত্বিক, কোন মন্ত্র রাজসিক আর কোন মন্ত্র তামসিক । তবে যে কোন মন্ত্রে ওঁ দিয়ে শুরু হলে সেটাই সাত্ত্বিক মন্ত্র। শেষ হল সংস্কার, শুদ্ধির জন্য যে ক্রিয়া করা হয় সেটাও সংস্কার। সংস্কার বলতে দুটো জিনিসকে বোঝায়, একটা হল ষোড়শ সংস্কার যেগুলো করা হয় সেটাও সংস্কার আর মনের ভেতরে যে সংস্কার গুলো আছে এই সংস্কারগুলোকে সব সময় শুভ রাখতে হয়। এই দশটি জিনিস যদি ঠিক না থাকে সমস্যা হয়ে যাবে।

কি করে বুঝব কোনটা সাত্ত্বিক, কোনটা রাজসিক আর কোনটা তামসিক? শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষরাই বলে দেন কোনটা সাত্ত্বিক, কোনটা রাজসিক আর কোনটা তামসিক। গীতাতেও এর অনেক বর্ণনা আছে। সাধুসঙ্গ করলে সাধুরাও বলে দেন। মনে কোন দ্বিধা হলে বিদ্বজ্জনদের বা গুরুজনদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরাও বলে দেন। কিন্তু একটা বয়সের পর মানুষ বুঝতে পারে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা শুভ আর কোনটা অশুভ। একটা মূল লক্ষণ হল, যেখানে কামনা-বাসনা, লোভ, ক্রোধ, হিংসাদি লেগে আছে সেখানেই হয় রজোগুণ নয়তো তমোগুণ লেগে আছে। রজোগুণই হোক আর তমোগুণই হোক ত্যাগ সবাইকে দুটোই করতে হবে। বলছেন, এই দশটি জিনিসকে যদি ঠিক ভাবে সেবন করা হয় তখন মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণের বিকাশ হতে শুরু হয়। সত্ত্বগুণের বিকাশ হওয়া মানেই এবার ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জাগবে, ভক্তি জেগে গেলে ওখান থেকে ধীরে ধীরে ভেতরে ভাব জাগবে। ভাব ধীরে ধীরে মহাভাবে পরিণত হয়। তবে মহাভাব সবার হয় না, যাঁরা খুব উচ্চ আধার, চৈতন্য মহাপ্রভুর মত পুরুষদেরই হয়। ভাব পাকা হলেই তাঁর জ্ঞান হয়ে যাবে।

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে। ততো ধর্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্।। ১১/১৩/৬।। যতক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎকার, আত্মজ্ঞান না হয়, ঈশ্বর দর্শন যতক্ষণ না হয় আর স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর আর কারণ শরীর যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণে না আসে আর এই তিনটে গুণের বাইরে যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্রাদি যে দশটি জিনিসের কথা বলা হল, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির জন্য কঠোর ভাবে সেবন করে যেতে হবে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি যদি না হতে থাকে তাহলে আবার তাকে ধীরে ধীরে রজো বা তমোগুণে নিয়ে ফেলে দেবে। আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর অশুভ কাজ করতে গেলে তিনবার তাকে ভাবতে হবে। ঠাকুর আবার বলছেন তার আর বেতালায় পা পড়বে না, চাইলেও সে কোন অশুভ কাজ করতে পারবে না। সত্ত্বগুণে আগে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে দশটি জিনিসের কথা বলা হল, দশটিতেও যাওয়ার অত দরকার নেই, তোমার আচার-আচরণটা ঠিক করতে হবে, গীতা, উপনিষদ, ভাগবত গ্রন্থই সবাই পড়ে, এগুলোতে সত্য ধর্মের কথাই বলা হয়েছে, ইদানিং যে মন্ত্রাদি দেওয়া হয় সবই সত্ত্বগুণী মন্ত্র, সবটাই সত্ত্বগুণী আছে তবে চেষ্টাটা আরও জোর চালাতে হবে। আর সংস্কার, মনের ভেতরে যে চিত্তবৃত্তি গুলো আছে, সেগুলোর ব্যাপারে খুব সচেতন ও সাবধান হতে হবে, দেখতে হবে সংস্কারগুলো যেন কখনই সত্ত্বগুণের নীচে না নেমে যায়।

এই কথা বলার পর উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জঙ্গলে বাঁশ গাছের ঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, শুকনো বাঁশ কিনা, ঐ আগুনই পুরো জঙ্গলকে ভস্মীভূত করে নিজেও শান্ত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি এই বিচার দ্বারা মনন করলে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এটাই জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ অর্থাৎ মন্থন যখন শুরু হয়ে গেল তখন যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে গেল, এই অগ্নি যত বিষয় বাসনা আছে, সত্ত্ব, রজো, তমো যত গুণ আছে সব কিছুকে ভস্মীভূত করে নিজেও শান্ত হয়ে যায়। যে বীজ থেকে ভবিষ্যতে যত শরীর হওয়ার কথা ছিল সব বীজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গীতাতেও ঠিক এই কথা বলছেন *যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন*। বিচারের মন্থন

যখন হবে, সেই মন্থন যত জাগতিক জিনিস আছে সবটাকেই পুড়িয়ে দেবে। কি বিচার? বিচার এই, আমি যে কাজই করছি এগুলো তমোগুণী না রজোগুণী, যদি দেখি এগুলো তামসিক ও রাজসিক কর্ম, তাহলে সবটাকেই ফেলে দিয়ে ওখান থেকে সরে আসতে হবে। সাত্ত্বিক কর্ম মানে, শাস্ত্রচর্চ, পরোপকার, দয়া, করুণা এই জিনিসগুলো। এরপর একবার যখন বুঝে নিল আমার মধ্যে প্রচুর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়েছে তখন শান্ত বৃত্তিকে অবলম্বন করতে হবে, তার মানে ঐ জিনিসগুলোতে আর জড়ানোর দরকার নেই, এখন শুধু ঈশ্বর চিন্তন, অনবরত বিচার করে করে নিজেকে ঐ শান্ত বৃত্তিতে নিয়ে যেতে হয়। শান্ত ভাব না হলে ঈশ্বর চিন্তন হবে না।

অজ্ঞান ও দুঃখ কিভাবে আসে

শ্রীকৃষ্ণের মুখে এত কথা শোনার পর উদ্ধব জিজ্ঞেস করছেন *বিদন্তি মর্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্। তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ।।১১/১৩/৮।।* হে প্রভু! প্রায় সব মানুষই জানে বিষয় চিন্তা, বিষয় ভোগ সব রকম দুর্গতির মূল, কিন্তু তবুও মানুষ কুকুর, গাধা আর ছাগলের মত এত দুঃখ কষ্ট পায় আর কষ্ট সহ্য করেও আবার ভোগে প্রবৃত্ত হয়, এর কারণ কী? আমরা যদি আমাদের নিজেদের জীবনের দিকে তাকাই, সেখানেও কষ্ট ছাড়া কিছু নেই। এমন কেউ নেই যার মধ্যে কষ্ট নেই। কষ্টের জন্য স্ত্রী স্বামীকে দোষ দিচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে দোষ দিচ্ছে। সন্তান বাবা-মাকে দোষ দেয়, বাবা-মায়েরা সন্তানকে দোষ দিচ্ছে। সবাই এক অপরকে দোষ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কারুরই দুঃখের গাথা শেষ হচ্ছে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যত দুঃখ কষ্টের একটাই মূল বিষয়তৃষ্ণা। যত বিষয়তৃষ্ণার পেছনে দৌড়াবে তত দুঃখ কষ্ট। আর ঠাকুরের কথায় বিষয়তৃষ্ণা দুটি কথাতে দাঁড়িয়ে যায় কামিনী আর কাঞ্চন, অন্য ভাবে নামযশও এসে যায়। নামযশের পেছনে কজন আর দৌড়াতে পারে, বেশির ভাগের ভেতরে তো কিছুই নেই। যার ভেতরে কিছু আছে সেই নামযশের পেছনে দৌড়ায় আর বাকি সবাই কামিনী আর কাঞ্চনের পেছনে ছুটছে। একটু বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, মানুষ যা কিছু চায় সব কিছুর পেছনে কামিনী আর কাঞ্চন জড়িয়ে আছে। আর তা নাহলে নামযশের পেছনে যায়, নামযশ এই অর্থে যে আমার একটা স্বীকৃতি চাই, আমাকে সবাই মানুক জানুক। মা চায় ছেলে বড় হয়ে গেছে সে যেন আমার কথায় ওঠবোস করে। ছেলে কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে, এখন সে যে মেয়েটির পেছনে পেছনে ঘুরবে সে যেন আমার কথা মত চলে। মা চাইছে একটা স্বীকৃতি, এটাও কোন না কোন ভাবে নামযশের সাথে মিশে আছে, নামযশেরই শাখা-প্রশাখা। উদ্ধব এটাই শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন। এই সমস্যা শুধু যে আজকের তা নয়, চিরদিনই এই সমস্যা ছিল আর ভবিষ্যতেও থাকবে আর তার সমাধানও একই আছে, কিছুই পাল্টায়নি। এটাই এখানে উদ্ধব বলছেন, গাধা বোঝা বয়ে বেড়ায়, আর ছাগলের বলি হয়। মানুষও হয় বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে আর নাহলে বলি হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এদের মধ্যে জ্ঞান নেই, অজ্ঞানে একেবারে প্রমত্ত হয়ে আছে, আমি বোধটা দেহের সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। এদের মন জগতের সব কিছুতে হারিয়ে গেছে, তার সাথে আমি বোধটা পুরোপুরি চলে গেছে দেহে। আগে বলা হল জ্ঞান কিভাবে হয়, মুক্তি কিভাবে হয়। এখন বলছেন অজ্ঞান কিভাবে হয়। মন স্বভাবতই সত্ত্বগুণ দ্বারা নির্মিত, মন সত্ত্বপ্রধান। আমরা কখনই কোন মন পাব না যে মন জ্ঞানে অবস্থিত থাকতে চায় না। মানুষ জানতে চায়, অনুসন্ধিৎসা মানুষের স্বভাব। শিশুরা সব সময় আনন্দে থাকে। চৈতন্যের স্বভাব আর আনন্দের স্বভাব, এটাই মানুষের গুণ। এই গুণ কাউকে অর্জন করে নিয়ে আসতে বলছে না। যেমন শরীরচর্চা, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ডাক্তার বলে দিয়েছে এই এই ব্যায়াম করবে, প্রাণায়াম করবে। এগুলো আমাদের বাইরে থেকে করতে হচ্ছে, এটা আমাদের স্বভাবে নেই, শরীর ঠিক রাখার জন্য শরীরচর্চা, প্রাণায়ামাদি করতে হয়। কিন্তু আমাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থাই হল জ্ঞান, স্বাভাবিক অবস্থা হল সুখ, মন তাই স্বাভাবিক ভাবেই সত্ত্বগুণী। গীতায় ভগবান বলছেন *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, মনের স্বাভাবিকতার সবটাই সত্ত্বগুণের, সত্ত্বগুণের স্বভাবই জ্ঞান আর সুখ, সুখ মানেই আনন্দ। অস্বাভাবিক অবস্থা কী? অজ্ঞান, নিরানন্দ। আমরা কি স্বাভাবিক অবস্থায় আছি নাকি অস্বাভাবিক অবস্থায় আছি? কোন সন্দেহই নেই যে আমরা অস্বাভাবিক অবস্থায় আছি। কারণ যখন সৃষ্টি হয় তখন সত্ত্বগুণের আধিক্যই থাকে, কিন্তু আমি বোধ এসে যাওয়ার জন্য রজোগুণ এসে যায়। যে কোন ব্যাপারে, আমি বোধ না আসা পর্যন্ত সেখানে কোন কাজ হবে না।

অহং বুদ্ধি যেখানে, যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন, সেখানেই রজোগুণের প্রাদুর্ভাব হয়ে যাবে। আপনি বলছেন আপনার মন সত্ত্বগুণী, কিন্তু হঠাৎ আপনাকে কেউ একটা গাড়ি গচিয়ে দিল। এবার আপনি অহং বুদ্ধি নিয়ে বলছেন এই গাড়িটা আমার, ব্যস্ এবার রজোগুণের খেলা শুরু হয়ে গেল। বস্তু আর মন এমন এক অপরের সাথে জড়িয়ে যায় যে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সমস্যা হল, সত্ত্ব, রজো আর তমো একই সাথে থাকে, যদিও মনের স্বাভাবিক অবস্থা সত্ত্বগুণের কিন্তু সেখানেও রজো আর তমো মিশে রয়েছে। যদি সাবধান না থাকে, সামান্য অসাবধান থাকার জন্য যেমনি একবার রজোগুণের দিকে চলে যাবে, তখনই কর্মের প্রবণতা এসে যাবে।

আর কি হয়? *রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ। ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্মতে।।১১/১৩/১০।।* রজোগুণ হয়ে গেল মানে এবার সঙ্কল্প বিকল্প শুরু হয়ে গেল, এটা করা যাবে কিনা, এটা করা ঠিক হবে কিনা, ওটা করা দরকার। বাবা-মায়েরা যেমন বলে আমার ছেলেকে অমুক বানাতে হবে, অমুক স্কুলে ভর্তি করতে হবে, ক্রিকেট শেখাতে হবে, গান শেখাতে হবে, সাঁতার শেখাতে হবে একটার পর একটা সঙ্কল্প করতেই থাকে। কিছু করার নেই, মন এদিকে যাচ্ছে আবার ওদিকে যাচ্ছে, কারণ আমি বোধটা বস্তুর জুড়ে গেছে। মনের স্বাভাবিক অবস্থা সত্ত্বগুণেরই, কিন্তু মন যখন বস্তুর সাথে নিজেকে এক করে নেয় তখন সঙ্কল্প বিকল্প এসে যায়। সঙ্কল্প বিকল্প মানেই এটা করা দরকার, ওখানে থেকে এটা আনতে হবে। এবার তাই কাজ করতে হবে, কাজ মানেই রজোগুণ। ছেলেকে ভালো দামী স্কুলে ভর্তি করতে হবে, তার জন্য টাকা দরকার, সেই টাকার জন্য এবার আরও বেশি কাজ করতে হবে। যেমন যেমন কাজ করতে থাকবে তেমন তেমন নানা রকমের বিষয় চিন্তনও এসে যাবে। তাতে আরও কামনা-বাসনা জাগবে, যত কামনা-বাসনা জাগবে তত আরও কাজের মধ্যে নামবে। প্রথমে এসেছে অজ্ঞান, অজ্ঞান থেকে এসেছে অহং বুদ্ধি, অহং বুদ্ধি আসাতে রজোগুণ বেড়ে গেল। রজোগুণ বেড়ে যাওয়াতে কাজ করতে শুরু করল, কাজ করাতে আরও কামনা-বাসনা জেগে গেল, সেখান থেকে আরও কাজে জড়িয়ে গেল, আর ওর মধ্য থেকে বেরোতে পারবে না।

করোতি কামবশগঃ কর্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ। দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ।। ***১১/১৩/১১।।*** *অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ*, যার ইন্দ্রিয় নিজের বশে নেই, সে কি করে, *করোতি কামবশগঃ*, কামনা-বাসনায় বশীভূত হয়ে বহু প্রকার কর্মে যুক্ত হয়। কামন-বাসনার আধার দুটো, খুব হলে তিনটে, কামিনী আর কাঞ্চন, আর তৃতীয় খুব হলে লোকমান্যের ইচ্ছা। কিন্তু সব থেকে যেটা দুঃখের তা হল, যাদের একটু চেতনা আছে, একটু সাধারণ বুদ্ধি আছে সে জানে এর পরিণতি খুবই দুঃখের, কিন্তু রজোগুণের এমন বেগ যে সে ওই বেগ সামলাতে পারে না, ওতেই সেই অভিভূত হয়ে পড়ে। সত্ত্বগুণী তার বিবেক বুদ্ধি আর বিচার দিয়ে আগে থেকেই বুঝতে পারে যে এখানে গোলমাল হবে। গোলমাল শুধু কামিনী আর কাঞ্চন থেকেই হয়, আর কিছু থেকে হয় না। কামিনী আর কাঞ্চনে জড়িয়ে যাওয়া মানেই রজোগুণের বেগ এসে গেল, এই বেগ আর তাকে স্থির হয়ে থাকতে দেবে না। পাহাড়ে যখন ধস নামে, ওই ধসকে যে আটকাতে যাবে সেই চাপা পড়ে মরে যাবে, সব থেকে ভালো হল পাশে সরে আসা। গীতায় ভগবানও এই একই কথা বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে*, ঝড় যেমন নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমন এই ইন্দ্রিয় জগতে যারা বাস করে তাদেরও উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, কিছুই করার থাকবে না। যিনি চাইছেন আমি একটু শান্ত জীবন কাটাবো, সুখের জীবন চাইছে, প্রথমেই তাঁকে বিষয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এছাড়া অন্য কোন উপায় হতেই পারে না। কারণ বিষয় চিন্তন মানেই কাম চিন্তন, কাম চিন্তন মানেই পেছনে রজোগুণ আছে, রজোগুণ মানেই একটা বেগ থাকবে, বেগ থাকা মানে একটা মোহ থাকবে। যে কোন মানুষকে যদি দেখা যায় যে তার জীবনে প্রচুর দুঃখ আছ, বুঝতে হবে সেখানে রজোগুণ আছে। রজোগুণে মোহিত হয়ে সে নানান রকমের কামনা-বাসনার জালে পড়ে আছে। একটা শিশু আগুনে হাত দিতে যায়, কারণ সে জানে না যে আগুনে হাত পুড়ে যাবে, তার জ্বালা হবে। কিন্তু একবার হাত দিয়ে পুড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আর সে আগুনের ধারে কাছে যাবে না, সে জানে আমার হাত পুড়ে যাব। কিন্তু মানুষ যখন কামিনী-কাঞ্চনের পেছনে দৌড়ায় সে জানে

কষ্ট হবে, যন্ত্রণা হবে, কিন্তু নিজেকে আটকাতে পারে না, *ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং*, রজোগুণের এমন বেগ যে তাকে মোহিত করে টেনে নিয়ে চলে যায়।

রজোস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ। অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে।। ১১/১৩/১২।। *বিক্ষিপ্তধীঃ*, তিনি হয়ত বিবেক পুরুষ কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আসলে যাঁদের ধর্মের ব্যাপারগুলো খুব ভালো ভাবে জানা নেই, তাঁদের ধর্মের লোকদের ব্যাপারে সব বিচিত্র রকমের ধারণা থাকে। আচার্য শঙ্কর বলছেন যাঁরা সাধন পথে আছেন তাঁরাও জ্ঞানী, জ্ঞানের পথে যাঁরা চলে এসেছেন তাঁরাও জ্ঞানী। তেমনি ঠাকুরকে যাঁরা ভালোবাসে তাঁরাও ভক্ত। কিন্তু ভক্তের সংজ্ঞা হল যাঁর মন, প্রাণ পুরো ভগবানে পড়ে আছে। আমাদের মন কি পুরো ভগবানে পড়ে আছে? কখনই নয়। তাই বলে কি আমরা ভক্ত নই? পুরোদমে ভক্ত। কেন? কারণ ভগবানকে একটু ভালোবাসতে শুরু করেছে। যাঁরা এই পথে চলতে শুরু করেছেন তাঁরাই ভক্ত। ক্লাশ ওয়ানে যে ভর্তি হয়েছে সেও ছাত্র আর যে পিএইচডি করছে সেও ছাত্র। ঠিক তেমনি ভক্ত সবাই, যে জ্ঞানমার্গের পথে চলতে শুরু করেছে সেও জ্ঞানী। সেও যত এগোবে তত তার ধী বা বুদ্ধি কম বিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু একেবারেই যে বিক্ষিপ্ত হবে না তা নয়। যেহেতু পূর্ব পূর্ব সংস্কারগুলো থেকে গেছে, সেইজন্য বুদ্ধি কিছু না কিছু বিক্ষিপ্ত হবে। সংসারেও যারা সাধনা করছে, সাধনা না করলেও একট সৎ জীবন যাপন করছে তাদেরও মন *রজোস্তমোভ্যাং*, রজো ও তমোগুণের জন্য বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে অনেক গোলমাল করে ফেলে, হয়ত কোন হিংসা করে বসল, অপরের নিন্দা করতে শুরু করে দিল, কারুর কোন ক্ষতি করে দিল, লোভ করে বসল, মর্যাদা রেখাকে উল্লঙ্ঘন করে ফেলল। কিন্তু তাতেও তাদের ঐ জিনিসের প্রতি দোষদৃষ্টি থাকে। বিবেকী পুরুষ যদি কোন গোলমাল করে বসে, তাতেও কিন্তু তাঁর দোষদৃষ্টি সব সময় থাকে। তাহলে বিবেকী আর অবিবেকীর মধ্যে তফাৎ কোথায়? অবিবেকীরা যে কোন জিনিসকে যখন ভোগ করে তখন তাতে তারা আনন্দ পায়। আচার্য শঙ্কর এর খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলছেন, বিবেকী পুরুষ যদি কোন কারণে এমন কোন কাজে নেমে যায়, যেটা তাঁর করা উচিত নয়, তখনও নিজেকে ধিক্কার দেয়, ছিঃ আমার এমনই পূর্ব পূর্ব কর্ম যে আমাকে দিয়ে এমন কাজও করাচ্ছে কিন্তু আমি এটা করতে চাই না। তাই বলে কি সে আর করবে না? আবারও করবে, কিন্তু ধীরে ধীরে প্রবণতাটা কমে যাবে। এখানে দেখার একটাই, জিনিসটার প্রতি আমার দোষদৃষ্টি আছে কিনা। একজনের গাঁজা খাওয়ার স্বভাব। সে যখন গাঁজা খাচ্ছে তাতে তার আনন্দ হচ্ছে কিনা, মদ যখন খাচ্ছে তখন আনন্দ হচ্ছে কিনা। কিন্তু তখনও যদি তার গাঁজা খাওয়া বা মদ খাওয়াতে দোষদৃষ্টি থাকে, সে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সে কিন্তু বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যদি সে ভোগ করে আনন্দ পায়, ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে তার অনেক সময় লাগবে। গীতায় ভগবান বলছেন *দুঃখদোষানুদর্শনম্*, যে কোন জিনিসে যদি দোষ দেখা হয়, তখনই মানুষ বেরিয়ে আসতে শুরু করে।

Questions of King Milinda (মিলিন্দা পান্‌হা) বৌদ্ধদের খুব নামকরা বই, তাতে মিলিন্দা প্রশ্ন করছেন নাগসেনকে, যে অজান্তায় পাপ করে তার পাপ বেশি নাকি যে জেনে শুনে পাপ করে তার পাপ বেশি? বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন বলছেন, যে অজান্তায় পাপ করে তার পাপ সব সময়ই বেশি হয়। নাগসেন এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলছেন, যখন কেউ জেনেশুনে একটা তপ্ত লোহাকে ধরবে তখন সে খুব সাবধানে সুরক্ষিত হয়েই ধরবে। যে জানে না সে যখন ধরবে তার হাত অনেক বেশি পুড়ে যাবে। পাপ পথে ঠিক তাই হয়, যারা শাস্ত্র জানে না, বিবেক বিচার যাদের নেই তারা ভোগে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু যে জানে, কিন্তু কর্মের এমন এমন তোড় থাকে যে তাকেও ভোগে নামতে হয়, সে খুব নিজেকে তখন সামলে নিয়ে নামে। এটাকে অন্য দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে দেখা যাবে, একজন সংসারী যখন কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত হয়, ওই নিয়ে কেউ তোয়াক্কা করে না, কিন্তু বিশ্বামিত্র কবে একটা মেয়ের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিলেন সেটা এখনও কাহিনী রূপে চলছে। অন্য দিকে বিশ্বামিত্রের দেওয়া গায়ত্রী মন্ত্র হিন্দুরা সবাই জপ করে যাচ্ছে। কাহিনী তৈরী হয় বিশ্বামিত্রের, আমার আপনার কাহিনী কোন দিন তৈরী হবে না। আমরা হলাম এই জগতে মশা মাছির মত। যখন কেউ লড়াই, ঝড়-ঝাপ্টাকে ঠেলে উঠতে শুরু করে অনেক উপরে চলে গেল, তারপর ওখান থেকে যখন ধপাস করে নীচে গোত্তা মারবে তখন সেটাই কাহিনী হয়। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে শাস্ত্র বিচারে, শাস্ত্র বিচার

করার পর যদি বিষয় ভোগে তাকে নামতে হয়, তখন সে খুব সতর্ক হয়ে যাবে আর তার দৃষ্টিটাও খুব সজাগ থাকবে যাতে এতে আর না নামতে হয়।

এখানে দুঃখের কারণ বলছেন, দুঃখের কারণ বললে তার উপায়ও বলতে হয়। দুঃখের কারণ কি? মনের স্বাভাবিক অবস্থা সুখ আর জ্ঞান, কিন্তু নানা বিষয়ের সঙ্গ করতে করতে রজোগুণের বৃদ্ধি হয়, রজোগুণের বৃদ্ধিতে বিষয়ের প্রতি আসক্তি হতে শুরু হয়। সে জানে গোলমাল হচ্ছে, বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোক বিষয় ভোগে এত আনন্দ ও মজা পায় যে আর বেরিয়ে আসতে চায় না। স্বামীজী উপমা দিচ্ছেন, বরফের পাহাড়ে বা হিমালয়ের পথে বরফের রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে শরীরটা অবসন্ন হয়ে বরফের উপর পড়ে যায় আর আস্তে আস্তে মৃত্যু তাকে ঘিরে ফেলে। তখন যদি বলা হয়, এভাবে তুমি শুয়ে থেকো না, উঠে পড়। সে বলে, না আমি বেশ আরামে আছি। কিন্তু বুঝতে পারছে না যে সে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। সংসারীদেরও ঠিক তাই হয়, বিষয় ভোগ করতে করতে তন্দ্রার মত একটা ঘোর এসে যায়। ঐ তন্দ্রার ঘোর এসে গেলে তাকে আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন হয়ে যায়। কঠোপনিষদে নচিকেতা তাঁর পিতাকে বলছেন, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, ধান গম যেমন জন্মায় আর মরে, মানুষও ঠিক সেই রকম জন্মায় আর মরে, এটাকেই বলে মৃত্যুধর্মা। কেন জন্ম নিয়েছে? মৃত্যুর জন্য, একমাত্র উদ্দেশ্য মরা। মরে যাওয়াটাই জীবনের উদ্দেশ্য, এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। মরেই যখন যাব ভালো করে ভোগ করে নিই। ভোগ যেটা করছে সেটাও যে আনন্দের জন্য করছে তাও না। কিন্তু কারুর নিন্দা করা ভাগবতের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল সবার জন্য একটা পথ বার করা। যাঁরা বিদ্বান পুরুষ তাঁদেরও রজোগুণ হয়, তাঁদেরও তমোগুণ হয় কিন্তু বিষয় ভোগের ব্যাপারে তাঁরা খুব সতর্ক থাকেন। কিন্তু তাঁরা জানেন এই বিষয় থেকেই আসক্তি আসবে তাই খুব অধ্যাবসায়ের দ্বারা বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে আনেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য বলছেন –

আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনো ময্যর্পয়ঞ্ছনৈঃ। অনির্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।। ১১/১৩/১৩।। যদি কেউ এর থেকে বেরিয়ে আসতে চায় প্রথমে তাকে আসনে বসার অভ্যাস করতে হবে আর প্রাণবায়ুর উপর জয়লাভ করতে হবে। আর যেমন যেমন শক্তি ও সামর্থ সেই অনুসারে ধীরে ধীরে মনকে আমাতে লাগাবে। শ্রীকৃষ্ণ তিনটে জিনিসের কথা বলছেন, আসন, প্রাণায়াম আর ধ্যান। এই তিনটে ছাড়া কখনই সাধন জীবন হবে না। যত জপ করুক, যত পূজা করুক এগুলো কখনই কোন কাজে দেবে না যতক্ষণ এই তিনটে আসন, প্রাণায়াম আর ধ্যান না করা হয়। আসন শরীরকে স্থির করে, প্রাণায়াম বায়ুকে স্থির করে আর ধ্যান মনকে স্থির করে। শরীর যদি চঞ্চল থাকে মন স্থির হবে না, প্রাণ যদি চঞ্চল থাকে মন শান্ত হবে না আর মন যদি চঞ্চল থাকে কিছুই হবে না। মনকে সব থেকে বেশি বিরক্ত করে মন নিজে, দ্বিতীয় ঝামেলা করে প্রাণ আর তৃতীয় করে শরীর। যদি কোন লোক ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন এই তিনটে জিনিসের অনুশীলন করছে না, বুঝতে হবে তার এখনও অনেক দেরী আছে। কিন্তু পরে যেটা বলছেন সেটা আরও মারাত্মক। যদি এর চেষ্টা করতে গিয়ে সফল নাও হও তাতেও ধৈর্য হারাবে না, ওতেই লেগে থাকতে হবে। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের ধ্যান করতে গিয়ে কখনও ধারা পড়ে কখনও কিছুই হয় না।

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষৈঃ সনকাদিভিঃ। সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাঽহবেশ্যতে যথা।। ১১/১৩/১৪।। এতাবান্ যোগ আদিষ্টো, এটাই যোগ, যোগের এই তিনটেই ধাপ – আসন, প্রাণায়াম আর ধ্যান। আর ধ্যান একটাই, পরমাত্মার ধ্যান। *সর্বতো মন আকৃষ্য*, সব কিছু থেকে মনকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। আর তার সাথে, *ময্যদ্ধাঽহবেশ্যতে যথা*, পূর্ণরূপে আমাতেই মনকে সংস্থাপন করবে। আমাতে ছাড়া ওন্য আর যা কিছু আছে, কোন কিছুতেই মনকে নিবদ্ধ করবে না, ভাষ্যকাররা বলছেন যেমন বিরাট, হিরণ্যগর্ভাদি। যে যার ধ্যান করে সে তারই সত্তা পায়। ঠাকুরের ছবির বা মুর্তির ধ্যান করতে বলছেন না, গুরুও বলে দেননি যে ঠাকুরের ছবি বা মুর্তির ধ্যান করবে। যিনি জীবন্ত রামকৃষ্ণ, জীবন্ত শিব, জীবন্ত রাম, জীবন্ত কৃষ্ণ তাঁর ধ্যান করবে। তাঁর ধ্যান করার সময় তাঁর লীলার ধ্যান করতে পার, তাঁর গুণের ধ্যান করতে পার। তাঁর কি গুণ?

তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতে তিনিই আছেন, এটাই ঈশ্বরের পরিভাষা। এই যদি ঈশ্বরের পরিভাষা হয়, তার মানে ঈশ্বরের অন্য কোন রূপে হবে না। যেমন কেউ মহাবীর হনুমানের ধ্যান করছে, সেখানেও কিন্তু শেষ কথা এটাই, মহাবীর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের সাথে এক, মহাবীর হনুমানের যে দাসভাব, ঈশ্বরের প্রতি দাসভাব, ঐ ভাবকে ধ্যানে নিয়ে আসতে হবে। ধ্যান কখনই কোন ছবি বা প্রতিমার হয় না। তিনি যে ভাবের প্রতিমুর্তি, যে ভাবের বিগ্রহ সেই ভাবের ধ্যান করতে হয়।

বারো, তেরো ও চৌদ্দ এই তিনটে শ্লোকে খুব সাধারণ জিনিস নিয়ে বলছেন। মনের স্বাভাবিক অবস্থাই সত্ত্বগুণের, সত্ত্বগুণ মানেই সুখ আর জ্ঞান। মন যদি সুখ আর জ্ঞান থেকে বিচ্যুতি হয়ে যায়, বুঝতে হবে মন এখন সত্ত্বগুণ থেকে রজোগুণে আর তমোগুণে চলে এসেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের মন বেশির ভাগ সময়ই সুখ আর জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়েই থাকে। তার মানে আমরা স্থায়ী ভাবে তমোগুণ আর রজোগুণে আছি। কিন্তু কেউ যদি বুঝে যায় সে সত্ত্বগুণী, এরপর কোন পরিস্থিতিতে বা কোন কারণে যদি মন রজোগুণে বা তমোগুণে চলেও যায় তাতে তার মন খারাপ করার কিছু নেই। বুঝতে হবে পূর্ব পূর্ব কর্মের জন্য নেমে এসেছে। কিন্তু সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকার জন্য ধ্যান করতে হয়, ধ্যান ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণে আসছে, প্রাণবায়ুও নিয়ন্ত্রণে আসবে না যতক্ষণ না আসন জয় হয়। আর বলছেন এটাই যোগ। ধ্যান সব সময়ই হবে ঈশ্বরের, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি সর্বশক্তিমান। উদ্ধব প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষ গাধার মত বোঝা বয়ে বেড়ায় আর ছাগলের মত কেন বলি হয়ে যায়? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বললেন। ধ্যান করতে করতে এক সময় দেখবে বাকি জগতটাই তার কাছে গাধার মত, ছাগলের মত হয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে সে নিজেই গাধা, ছাগলের মত জীবন কাটিয়েছে। গাধা হওয়া আর গাধা বানানোর মধ্যে ছোট্ট একটা তফাৎ, তা হল ধ্যান। ঠাকুর কেশবের নামে বলছেন, কেশবের ঐ ধ্যানটুকু ছিল বলে তার এত নামযশ হল। মানুষ যখন ঈশ্বরের চিন্তন করতে শুরু করে, ধ্যানে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথমেই তার গাধা আর ছাগলের স্বভাবটা খসে পড়ে যায়। তখন তার আসল শক্তি, আসল স্বরূপটা বিকশিত হতে শুরু করে, তখন সে সুখে প্রতিষ্ঠিত হয়, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঁচজন লোকও সুখ আর জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে ঘুরঘুর করতে থাকবে।

হংস রূপে সনকাদি চার কুমারকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

ভারতের বিশেষ করে হিন্দুদের যে কোন শাস্ত্র, তা সে বাল্মীকি রামায়ণই হোক বা যে কোন রামকথাই হোক, ভাগবতই হোক, এগুলো কোন ইতিহাস নয়, বোর্ড মিটিংএর কোন মিনিটস্‌ও নয়। এনাদের একটাই উদ্দেশ্য, যে কোন একটা কাহিনী, একজন বড় কাজ যিনি করেছেন, সে রাজা হতে পারে, বড় যোদ্ধা হতে পারে, সন্ন্যাসী বা সাধু হতে পারেন, তাঁকে প্রধান চরিত্র করে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের শিক্ষা দেওয়া। তাঁরাও নানান বাহানা করে এই শিক্ষা ঢোকাতে থাকেন। কোথাও মোক্ষের উপদেশ, কোথাও ধর্মের উপদেশ, কোথাও অর্থ আর কাম দিয়ে জীবন কিভাবে চলবে উপদেশ দেন। ঋষিরা, যাঁরা শাস্ত্র রচয়িতা, তাঁরা কাহিনীর একটা সূত্র ধরে তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে বিভিন্ন রকমের কথোপকথন বা আখ্যায়িকার মাধ্যমে শাস্ত্রে ঢুকিয়ে দেন। উদ্ধবও এখানে একটা কাহিনীর সূত্র ধরে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন 'শুনেছি আপনি নাকি সনকাদি মহর্ষিদের যোগের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই ব্যাপারে আপনি আমাকে বলুন'। ভাগবত হল পুরাণ, পুরাণের অর্থই হয় পুরনো হয়েও নতুনের মত। যে কোন সমাজে মানুষ তার নিজের যে স্তর সেই স্তরেই মেলামেশা করে। অজ গ্রামের কোন চাষী যদি মুম্বাই চলে যায়, সেখানেও সে খুঁজে খুঁজে তার গ্রামের লোককে যে আগে চাষবাশ করতে, বার করে নেবে। আর দিল্লী থেকে যদি কোন বড়লোক অজানা অচেনা জায়গায় চলে যায়, সেও কিন্তু ঠিক নিজের মত লোক খুঁজে বার করে নেবে। নিজের যে স্তর তাতে সবাই এক অপরকে জানে, কথাবার্তা, মেলামেশাটা সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়। আগেকার দিনে এটাই জাতিপ্রথাতে চলত। কোন গ্রামের কায়স্থ কন্যাকুমারী চলে গেল, সেখানে গিয়ে সে হয় ধর্মশালায় উঠবে আর তা নাহলে অমুক জায়গায় তারই গ্রামের কোন কায়স্থ আছে জেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠবে। ঋষিরাও এই ভাবেই থাকতেন। যেখানেই কোন যজ্ঞ হচ্ছে, দানছত্র হচ্ছে ঋষিরা সেখানে পৌঁছে যেতেন। পৌঁছে সেখানেই ঋষিদের মধ্যে নানান ধরণের গল্প, কথাবার্তা হত। ওনাদের কাহিনী আবার ঋষিদের কাহিনীর মত চলত। উদ্ধবও অনেক তীর্থাদি করেছেন।

তীর্থাদি করতে গিয়ে তিনি কোথাও শুনেছেন যে ভগবান চারজন কুমার সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনৎ কুমারদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই চারজনের কাহিনীও খুব মজার।

ভগবান ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কার্যের দায়ীত্ব দিলেন। ব্রহ্মারও তখন সবে ভগবানের মন থেকে জন্ম হয়েছে, ভগবানের মন থেকে জন্ম হওয়ার দরুন ব্রহ্মার মন সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা বললেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হোক চিন্তা করতেই ব্রহ্মার মন থেকে চারজন সন্তান সৃষ্টি হয়ে গেল, এনারাই হলেন সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনৎ কুমার। চারজন কুমার সব সময়ই একসাথে থাকেন, কখনই আলাদা হন না। ব্রহ্মার মন সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ থাকাতে চারজন কুমারও ব্রহ্মার গুণটা পেয়ে গেলেন, একেবারে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ নিয়েই চারজন কুমারের জন্ম। আগেকার দিনে সেইজন্য বিবাহ করার পর স্বামী-স্ত্রী যখন সন্তান কামনা করতেন তখন তাঁরা প্রচুর পূজা, ব্রত আদি করতেন, যাতে মনটা শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনের সন্তানও সত্ত্বগুণী হয়। মাইকেল এঞ্জেলোর জন্ম বিবাহ বহির্ভূত। তাঁর বাবা এক মহিলাকে ভালোবাসতেন। মাইকেল এঞ্জেলো খুব গর্ব করে বলতেন, আমার জন্ম ভালোবাসা থেকে হয়েছে, সেইজন্যে আমার মধ্যে গুণের সমাবেশ অনেক বেশি। যাদের পেছনে যে শক্তি থাকে সেই শক্তিটাই কাজ করে। এটা আলাদা বিষয়। এই চার কুমারের মধ্যে সত্ত্বগুণের এত বেশি আধিক্য যে জন্ম নিয়ে তাঁরা আর ঘর সংসারের দিকে তাকালেনই না। চারজনই জ্ঞান, বৈরাগ্য নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ান আর শুধু ঈশ্বর চিন্তন করেন। ব্রহ্মার খুব চিন্তা হয়ে গেল, এত তপস্যা করে আমি চারজন মানব সন্তানের জন্ম দিলাম, কিন্তু তারা সবাই একসাথে এভাবে বেরিয়ে গেল! ব্রহ্মা আবার তপস্যা করে করে সপ্তর্ষি ঋষিদের, প্রজাপতিদের জন্ম দিলেন। কিন্তু এই যে চারজন কুমার এনারা হলেন একেবারে perfect beings, সৃষ্টিতে perfect যদি কাউকে বলতে হয় তাহলে এই চারজন কুমারকেই বলা হবে। শ্রেষ্ঠ ঋষি চার কুমার, শ্রেষ্ঠ ভক্ত চার কুমার, শ্রেষ্ঠ পুরুষ চার কুমার। সৃষ্টিতে চার কুমাররাই সর্বশ্রেষ্ঠ, এনাদের থেকে আর কেউই শ্রেষ্ঠ হতে পারবেন না। যাঁরা জ্ঞানী তাঁদেরও মনে কিছু কিছু প্রশ্ন জাগে।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন, ব্রহ্মার মানসপুত্র এই চার কুমাররা একবার ব্রহ্মাকে গিয়ে বলছেন, যোগের যে শেষ কথা, একেবারে সূক্ষ্মতম, তার ব্যাপারে আমাদের বলুন। আজ থেকে দুই থেকে তিন হাজার বছর আগে আমাদের যাঁরা ঋষিরা ছিলেন তাঁদের কোনও একটা common meeting point ছিল না, চিন্তা-ভাবনাও কোনও একজনের নয়। যেমন বাইবেল একজনেরই চিন্তা-ভাবনা, সব ভগবান যীশুর মুখের কথা। কিন্তু সেন্ট জন আদি যে চারজন লিখেছেন, তাতেই পার্থক্য এসে গেছে। ভারতবর্ষ এত বড় দেশ আর যীশুর জন্ম হয়েছিল জেরুজালেম একটা ছোট্ট প্রান্তে, সেখানেই তাদের এত পার্থক্য এসে গেছে। আর আমাদের দেশে হাজার হাজার বছর ধরে এত এত ঋষিরা যাঁরা চিন্তন মনন করছেন আর তাঁদের কোন common point ছিল না, ফলে ঋষিদের চিন্তা-ভাবনাতে শব্দগুলো একই থাকল কিন্তু ব্যাখ্যাটা একটু আলাদা হয়ে গেছে।

যোগ বলতে আমরা পতঞ্জলির কথা বলি, যোগশাস্ত্রের তৃতীয় সূত্রে যোগের শেষ অবস্থা বলছেন *তদাদ্রষ্টু স্বরূপেঽবস্থানম্*, যিনি দ্রষ্টা তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। দ্রষ্টা কি, স্বরূপ কি, অবস্থান কি এই নিয়েই পুরো যোগশাস্ত্র। চার কুমার যে যোগ বলছেন, এই যোগ যুক্ত হওয়ার অর্থে বলছেন। মানুষ যখন শেষ জ্ঞানের দিকে এগোয়, যে পথ দিয়েই সে যাক, শেষের দিকে কি দেখে? তার সাথে প্রশ্ন করছেন, চিত্তের মধ্যে গুণগুলো ঢুকে আছে আর চিত্তের এক একটা বৃত্তিতে গুণ ঢুকে আছে, তার মানে চিত্ত আর গুণ এক অপরের সাথে মিলে মিশে আছে। যারা মুক্তিপদ প্রার্থী তারা কেমন করে এই দুটোকে আলাদা করবে, অর্থাৎ চিত্তকে গুণ থেকে আলাদা করবে? এখানে প্রশ্নটাই এত উচ্চমানের প্রশ্ন যে বেশির ভাগ লোক প্রশ্নটাই ধরতে পারবে না। প্রশ্ন হল, মনের মধ্যে সাংসারিক ভাব ঢুকে আছে, এর থেকে মানুষ কিভাবে বেরোবে।

মূল কথা হল মুক্তি জিনিসটা কি? কথামৃত পড়ার পর আমরা সবাই বলছি ঈশ্বর দর্শন মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তার মানেই মুক্তি। মুক্তি কিসের থেকে? বন্ধনই বা কি? এখানে বন্ধনকে ব্যাখ্যা করছেন। চিত্ত আর গুণ যে এক অপরের সাথে মিশে যায় এটাই বন্ধন। চিত্ত মানে মন, গুণ মানে সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ। কিন্তু ঠিক তা নয়, ওটা হল সত্ত্ব, রজো আর তমোর কার্য। জ্ঞান সব সময় দুই প্রকার হয়,

প্রথমটাকে বলে বৃত্তি জ্ঞান আর দ্বিতীয়টাকে বলে স্বরূপ জ্ঞান। জ্ঞান একমাত্র আত্মারই হয়, বুদ্ধি, মন বা ইন্দ্রিয়গুলির কারুর জ্ঞান লাভ করা ক্ষমতাই নেই। স্টেথোস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপের মত যন্ত্রের যা কাজ, কান, চোখ, নাক ইন্দ্রিয়গুলো এই একই কাজ করে। ইন্দ্রিয়গুলি যাকে সব কিছু রিপোর্ট করে সেও তাই, শুধু একটু বেশি সূক্ষ্ম। আত্মার জায়গায় যদি একজন রাজার কল্পনা করা হয় তাহলে তখন হবে রাজার চর চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। চর এসে কিছু খবর দ্বাররক্ষীদের দিল, সেখান থেকে মন্ত্রীর কাছে খবর গেল, মন্ত্রী সেই খবরটা রাজাকে দিল। ঠিক তেমনি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো চরের মত খবর সংগ্রহ করে বেড়ায়, এগুলোকে ঠিক ইন্দ্রিয় বলা হয় না, এদেরকে গোলক বলা হয়। গোলকগুলো রিপোর্টিং করে ভেতরে ঠিক ঠিক যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে সেইখানে, যার কেন্দ্র মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের কেন্দ্র ভেতরে যিনি চৈতন্য সত্তা আছেন তাঁকে রিপোর্টিং করে, সেখান থেকে এই জগতের জ্ঞান হয়। স্বামীজী উপমা দিচ্ছেন, পুকুরে একটা ঢিল ছুড়লে পুকুর একটা react করে, ঐ reactionকে আমরা ঢেউ রূপে দেখছি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনবরত বাইরে থাকে ভেতরে মনের যে পুকুর রয়েছে সেখানে ঢিল পড়ছে। ঢিল পড়াতে মনও একটা reaction ছাড়ে, ওই reactionটাই পুকুরের ঢেউয়ের মত। এই reactionকে বলা হয় জ্ঞান, এই জ্ঞানকেই বলছে বৃত্তি জ্ঞান। এই বৃত্তি জ্ঞান দিয়ে জগতকে জানা যায়, এই জ্ঞান শুদ্ধ চৈতন্য বা যিনি চৈতন্য সত্তা আছেন তিনিই একমাত্র জানতে পারেন, কিন্তু জানছেন বৃত্তি জ্ঞানের মাধ্যমে। এই বৃত্তি জ্ঞান হয় বুদ্ধিতে। মন, বুদ্ধি পুকুরের মত, বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয় অনবরত মন, বুদ্ধি পুকুরে ঢিল ফেলছে আর ক্রমাগত আমরা জানছি। এমনকি যখন ঘুমিয়ে পড়ছি তখন সারাদিন যত ঢিল পড়েছে সেগুলো স্বপ্নে এসে নাচতে থাকে, যখন জেগে আছি তখন স্মৃতি রূপে নাচতে থাকে, স্মৃতি রূপে না এলে কল্পনা রূপে আসে। বৃত্তি নাচতেই থাকে, থামার জিনিস নয়। বৃত্তি জ্ঞানের বাইরে যেটা আছে তার নাম স্বরূপ জ্ঞান। আত্মা তখন মনকে ছেড়ে দেয়, মনের সাথে নিজেকে জড়ায় না, তখন আত্মা নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, আয়নার সামনে যদি কেউ সারাক্ষণ বসে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকে লোকে তাকে পাগল বলবে, ঠিক তেমনি মানুষ যদি নির্বিকল্প সমাধিতে যায় সেও বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারে না। নির্বিকল্প সমাধিতে তাঁর স্বরূপ জ্ঞান হয়, নির্বিকল্পের বাইরে আর সব অবস্থায় তাঁর বৃত্তি জ্ঞান হয়। সবিকল্প সমাধিতে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানও কোন না কোন ভাবে বৃত্তি জ্ঞান, তবে একটি বৃত্তিই থাকে, বৃত্তি জ্ঞান বললেও এই জ্ঞান কোন ভাবেই জাগতিক জ্ঞান নয়।

বৃত্তি জ্ঞান কিভাবে হয়? এনাদের মতে, যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি ভগবান তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তিনি তাঁর ক্রিয়াশক্তি দিয়ে, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি যখন হয় তখন বিবর্তন যেমন ধাপে ধাপে হয় ঠিক তেমনি সৃষ্টিটাও ধাপে ধাপে হয়। সৃষ্টিতে প্রথমেই আসে প্রকৃতি, প্রকৃতি তিনটে গুণের সমাহার, সত্ত্ব, রজো আর তমোগুণ, এই তিনটে গুণ সাম্য অবস্থায় থাকে। এর আগে আমরা এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তিনটে গুণ যখন পরস্পরের মধ্যে মিশতে শুরু করে তখন সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, সেই স্থূল থেকে আরও স্থূল জিনিসের সৃষ্টি হয়। যেমন সিমেন্ট খুব সূক্ষ্ম জিনিস, কিন্তু জলের সাথে মিশে গেলে পাথরের মত হয়ে যাবে। কেউ বাড়ি দেখিয়ে যদি বলে, এই যে বাড়ি দেখছ এটাই সেই সিমেন্ট পাউডার। খনি থেকে যে লোহার আকরিক তোলা হয় ওগুলো কাঁচের মত ভঙ্গুর, কিন্তু বিশেষ প্রসেসিং দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর সেটাই ইস্পাতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, যে ইস্পাতের তৈরী রেল লাইনের উপর দিয়ে রেলগাড়ি দৌড়াচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, যদি বল সচ্চিদানন্দ থেকে এই স্থূল সংসার কি করে হল। ঠাকুর নিজেই আবার বলছেন, কেন, শুক্রশোণি এমন তরল সেখান থেকে হাড় মাংসের শরীর তৈরী হয়ে যাচ্ছে। এই যে প্রসেসিং হয়, এই প্রসেসিংএর জন্য অনেক পরিবর্তন হয়। ঠিক তেমনি সত্ত্ব, রজো আর তমোর যখন প্রসেসিং হয় তখন সেখান থেকে ধাপে ধাপে স্থূল থেকে স্থূলতর হতে হতে শেষে এই জগতের অবস্থায় চলে আসে। এই প্রসেসিং দিয়েই মনেরও সৃষ্টি হয়, ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয় আর বস্তুরও জন্ম হয়।

মনও সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ দিয়ে তৈরী, কিন্তু মন সত্ত্বপ্রধান। তার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়গুলিরও সত্ত্বগুণ আছে কিন্তু এদের ক্ষমতা একটু নীচের দিকে চলে যায়। প্রাণ, যা দিয়ে কাজকর্ম হয়, তাতে রজোগুণ একটু বেশি থাকে। আর তিনটে গুণের সমান অনুপাতে মিলে তৈরী হয় সংসারের

বিষয়গুলো। এবার যদি গুণের দিক দিয়ে দেখা হয়, তখন দেখা যাবে মন যে জিনিস দিয়ে তৈরী, সেই একই জিনিস দিয়ে তৈরী ইন্দ্রিয়গুলিও, একই জিনিস দিয়ে তৈরী বিষয়গুলো। মন ত্রিগুণাত্মিকা, ইন্দ্রিয়ও ত্রিগুণাত্মিকা, বস্তুও ত্রিগুণাত্মিকা সত্ত্ব, রজো আর তমো। অথচ আত্মা, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি ত্রিগুণাতীত। এই যে বিরোধ, একদিকে রয়েছন ত্রিগুণাতীত আর তিনি ঘরবাড়ি বানিয়েছেন ত্রিগুণাত্মিকা দিয়ে আর তার সাথে ইন্দ্রিয় ও বস্তু একেবারে এক। একটা পাত্রে জল আর তেল খুব ভালো করে মেশান আছে, কিন্তু একটু ছেড়ে দিলে জল জলের দিকে চলে যাবে, তেল তেলের দিকে চলে যাবে। কারণ যে জিনিসের যা স্বভাব সে তার সাথে ঘর করে। এই পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়ে মন তৈরী, পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়েই ইন্দ্রিয় তৈরী আর এই পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়ে বিষয়বস্তুও তৈরী। যখন ঝাঁকুনি দেওয়া হয় তখন যে যার সে তার দিকে চলে যায়। বিষয় চলে যাবে ইন্দ্রিয়ের দিকে, বিষয় চলে যাবে মনের দিকে, মন আবার যাবে বিষয়ের দিকে। মন ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে আছে, ইন্দ্রিয় বস্তুর সাথে জুড়ে আছে, তার মানে এই জগৎ মনের সাথে পুরো জুড়ে রয়েছে। আমি বলতে যাকেই বুঝি না কেন, আমি বলতে মন বুঝি, আমি বলতে ইন্দ্রিয় বা দেহ বুঝি, কিন্তু শেষমেশ আমরা জড়িয়ে আছি জগতের সাথে। যোগ দৃষ্টিতে যদি বহির্জগতকে নামিয়ে দিয়ে মনের জগতে চলে যায়, সেখানেও দেখা যাবে, যেমন জল আর মাটি মিশে একেবারে কাদা হয়ে আছে, ঠিক তেমনি মন আর এই তিনটে গুণ এক হয়ে আছে। তাই মনে যে অনবরত বৃত্তি জ্ঞান হয়ে চলেছে এই বৃত্তি জ্ঞানও ত্রিগুণাত্মিকা, বৃত্তি জ্ঞান মানেই ত্রিগুণাত্মিকা। জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা, যে মন ওই জগতকে জানছে সেও ত্রিগুণাত্মিকা, সব মিলেমিশে এক হয়ে আছে। তাহলে এই মনকে দিয়ে আমরা ত্রিগুণাতীতকে জানব কি করে? মন কখনই ঈশ্বরের দিকে যাবে না, কারণ মন আর ঈশ্বর দুজনের স্বভাব এক নয়। সমস্যা হল বিষয় হল জড় তার নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা আছে মনের, কারণ তার পেছনে আত্মার শক্তি আছে, আর মন থেকে একটু শক্তি যাচ্ছে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়ের শক্তিও খুব কম। অনেকগুলো বাচ্চাকে যদি কোন খেলনা ঘরে ছেড়ে দেওয়া হয়, বাচ্চাগুলো এখন যার যার পছন্দের খেলনার দিকে দৌড় লাগাবে। ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক সেই ভাবে বিষয়ের দিকে দৌড় লাগায়। মনের কোন উপায় থাকে না, মনও ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যা, ইন্দ্রিয়ও তাই, মনও তাই।

চারজন কুমার ব্রহ্মাকে এটাই জিজ্ঞেস করছেন যাদের চিত্ত আর বিষয় এক, চিত্তে বিষয় ঢুকে আছে, বিষয়ে চিত্ত ঢুকে আছে, সে মুক্তি পাবে কি করে? মুক্তি পাওয়া মানে বেরিয়ে আসা, মনকে আত্মাতে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু মনকে আত্মাতে নিয়ে যাবে কি করে! মনের নিজের লোক ইন্দ্রিয়, মনের নিজের লোক জগৎ, জগতের নিজের লোক মন, ওরা কেউ কাউকে ছাড়তে চাইবে না, কারণ ওরা এক জাতের, এক পরিবারের। আর আত্মজ্ঞান অন্য জাতের, অন্য জগতের। আত্মাকে জানা কি করে সম্ভব, সম্ভবই নয়। প্রশ্ন এটাই, চিত্ত আর গুণ এরা সমানধর্মী বলে মিলেমিশে আছে, মুক্তি হবে কি করে? চার কুমার ব্রহ্মাকে এই প্রশ্ন করেছেন। এদিকে ব্রহ্মার সমস্যা হল, তিনি মূল প্রশ্নটা বুঝতেই পারলেন না। তবে এটা একটু অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, কখনই হবে না যে ব্রহ্মা প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন না। ব্রহ্মার প্রশ্ন না বুঝতে পারার একটা কারণ অবশ্য বলে দিচ্ছেন, সৃষ্টির কার্যে ব্রহ্মা এমন জড়িয়ে ছিলেন যে ওনার মন তখন রজোগুণে ভরে ছিল, সেইজন্য তখন তাঁর উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কর্ম ধ্যানের সব থেকে বড় শত্রু। সাধনা দুই প্রকার, একটা বহিরঙ্গ সাধন, দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ সাধন। যাঁরা কর্মযোগ করেন তাঁদের কর্ম বহিরঙ্গ সাধন, ধ্যান হল অন্তরঙ্গ সাধন। কিন্তু বহিরঙ্গ সাধন আর অন্তরঙ্গ সাধন মানেই বিপরীত। কর্ম মানেই চারটে জিনিসে জড়াতে হয় আর ধ্যান মানেই সব কিছু থেকে মনকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজীর এক বন্ধু স্বামীজীকে বলছেন, আপনি এক সময় বলেছিলেন আপনি চাইলে আমাকে সমাধি করিয়ে দিতে পারেন, আপনার কি এখনও সেই ক্ষমতা আছে? স্বামীজী বলছেন, বিদেশে অনেক বছর কাজ করে করে আমার ঐ শক্তিটা চলে গেছে, ছয় মাস হিমালয়ে গিয়ে ধ্যান করলে শক্তিটা আবার চলে আসবে। কর্ম এমনই জিনিস যে যাঁরা যুগপুরুষ তাঁরাও কর্মে বেশি জড়িয়ে গেলে তাঁদেরও শক্তি হ্রাস হয়ে যায়। ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য করছেন, তাঁরও সেই শক্তি চলে গেছে। ধ্যানের শক্তি যদি চলে যায়, জগতের কাজে জড়িয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিটা যদি চলে যায় তখন উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা সূক্ষ্ম প্রশ্নকেও ধারণা করতে পারবেন না। কোন সূক্ষ্ম জিনিসকে ধারণ করার জন্য তার থেকেও

সূক্ষ্ম হতে হয়। চালনি দিয়ে সরষেকে যদি চালতে হয় তখন চালনির ছিদ্রগুলিকে আরও সূক্ষ্ম হতে হবে, তা নাহলে ছোট্ট ছোট্ট সরষে দানাগুলো বেরিয়ে যাবে। সূক্ষ্ম তত্ত্বকে ধারণা করার জন্য মনকে তার থেকে আরও সূক্ষ্ম হতে হবে। কর্ম করলে এই সূক্ষ্ম ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক পথে যাঁরাই যান, প্রথমে তাঁদের কর্তব্য বোধটা নাশ হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, যারা আন্তরিক ঈশ্বরের পথে যেতে চায় তিনিই তার সব যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। হয়ত বাড়ির দায়ীত্ব কোন দাদা বা জ্যাঠা কাকারা নিয়ে নিল। আমাদের কর্তব্য বোধটা সমস্যা নয়, আমাদের সমস্যা হল অকর্তব্য বোধ, যেগুলো আমাদের কাজ নয় সেইসব কাজেও আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেলছি। ঠাকুর বলছেন, লঙ্কায় রাবণ মল বেহুলা কেঁদে আকুল হল। ঠাকুর বলছেন, নিজের বাড়ির যে দায়ীত্ব সেটাও কেউ নিয়ে নেবে তাকে আর দায়ীত্ব নিতে হবে না। ঠাকুর সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছেন না, তার মানে এখনও তার সময় হয়নি। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়, হে ঠাকুর আমার কাজ কমিয়ে দাও, বেশি কাজে জড়ালে তোমাকে স্মরণ করতে পারি না। কাজ কমিয়ে দেওয়া মানে কর্তব্য বোধটা কমিয়ে দেওয়া। অকর্তব্যে আমরা কেন জড়াই? একটা হল রজোগুণ, দ্বিতীয় নামযশের ইচ্ছা। ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন বলে প্রশ্নটা ধারণা করতে পারছেন না।

জীবন মানে সময়ের এক মহাসমুদ্র, আমাদের কাছে আছে একটা ছোট্ট ডিঙ্গি, ঐ ছোট্ট ডিঙ্গি দিয়ে আমাদের পেরোতে হবে সময়ের এই মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্র কি? সমগ্র জীবনের জন্য যত ঘন্টা বরাদ্দ হয়ে আছে। ডিঙ্গিগুলো হল ছোট ছোট কর্ম। ছোট ছোট কাজ যদি না থাকে, ডিঙ্গি ভেঙে গেলে সময়ের ঐ মহাসমুদ্রে এবার হাবুডুবু খেতে হবে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা কি করব, এটাই আমাদের সমস্যা। সময় আমাদের কাটতে চায় না, দরকার হয় কাজের, কাজ না থাকলে কাজ জুটিয়ে নেওয়া হয়। এখানে বলছেন ব্রহ্মার বুদ্ধি কর্মপ্রবণ ছিল। তবে এই ধরণের শাস্ত্রবাক্য খুব আন্তরিক ভাবে নিতে নেই, কারণ একটা তত্ত্বকে বোঝাবার জন্য, যাদের বুদ্ধি কর্মপ্রবণ তারা কখন সূক্ষ্ম জিনিসের ধারণা করতে পারে না। তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ যাঁরা ভগবানেরই রূপ বা যাঁরা বড় বড় ঋষি ওনাদের নিয়ে এই ধরণের প্রশ্ন ভাবাও উচিত নয়। লোকোপদেশের জন্য শাস্ত্রে এই ধরণের অনেক কিছু বলা হয়, এছাড়া আর কিছু না।

ব্রহ্মা যখন উত্তর দিতে পারলেন না, তখন তিনি খুব শান্ত চিত্ত হয়ে ভগবানের ধ্যান করলেন। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, ব্রহ্মা আমার ধ্যান করলেন। আমার ধ্যান করাতে আমি হংস রূপে ব্রহ্মার সামনে উপস্থিত হলাম। আমাদের শাস্ত্রে হংসকে প্রায়ই ঈশ্বরের প্রতীক রূপে নেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে প্রতীক তাতেও আছে *তন্নোহংস প্রচোদয়াৎ*। হংস বলতে পরমহংস, পরমহংস বলতে সেই পরমাত্মা, পরমপিতাকে বোঝায়। ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছেন, আমি ভগবানের ধ্যান করছিলাম, তিনিই হংস রূপে এসেছেন। কিন্তু এখানে বিষয়টা হল সনকাদি চার কুমারের প্রশ্ন। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *দৃষ্টা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্। ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছু কো ভবানিতি।।১১/১৩/২০।।* আমাকে দেখে সনকাদি চার কুমার ব্রহ্মাকে সামনে রেখে আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে এলেন। আমার চরণ বন্দনা করে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? আমাদের সংস্কৃত ভাষা direct language নয়, indirect। সংস্কৃতে সরাসরি কথা বলা হয় না, ঘুরিয়ে বলা হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন *ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা। যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে।।১১/১৩/২১।।* সনকাদি ঋষিরা পরমার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ছিলেন, তাই তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে আমি যা যা বলেছিলাম সেটাই আমি তোমাকে বলছি।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *বস্তুনো যদ্যনানাত্বমাত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ। কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ।।১১/১৩/২২।।* উত্তর সব সময় দুই প্রকার হয়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে। এই জিনিসগুলো আমাদের শাস্ত্রেই ছিল, কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর বিভিন্ন ভাষ্যে এগুলোর উপর প্রচুর জোর দিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব বুঝতে গেলে তার ব্যবহারিক সত্তা আর পারমার্থিক সত্তা দুটোকেই বুঝতে হয়, শুধু একটা বুঝলেই হয় না। আমাদের সমস্যা হল, আমরা ব্যবহারিক সত্তাকে পারমার্থিক সত্তাতে লাগিয়ে দিই আর পারমার্থিক সত্তাকে প্রায়শই ব্যবহারে বলে বেড়াই। যেমন আমরা অনেক সময় মজা করে বলে থাকি, ঠাকুর

দেখছেন, কিন্তু এগুলো পারমার্থিক সত্য, ব্যবহার কালে অন্য ভাবে চলে। আবার ব্যবহারের জিনিস গুলোকে ভগবানে দিয়ে দিই, আমরা বলি তিনি দয়াময়, জগতে আমরা তাকেই ভালোবাসি যিনি দয়াময়, সেইজন্য মনে করি ঈশ্বরও দয়াময়। জ্ঞানীরা পারমার্থিক বস্তুকে পারমার্থিক রূপে দেখেন আর ব্যবহারিককে ব্যবহারিক রূপেই দেখেন। আমাদের মত লোকেরা ব্যবহারিক জিনিসগুলো পারমার্থিকে ঢোকাতে থাকি, পারমার্থিককে ব্যবহারিকে ঢুকিয়ে দিই, আবার দুটোকে আলাদা দেখার জন্য মিশিয়েও দেখি। সেইজন্য আমাদের জগতের জ্ঞান, জগতের ব্যবহার একেবারে বিশৃঙ্খল হয়ে আছে। যারা নাস্তিক তারাও তাই, তারা জানে আমি মরে গেলে কিছুই থাকবে না, তাই মনে করে আমি মারা গেলে কিছু থাকবে না, সেইজন্য ভগবানও নেই। আর আমরা মানি ভগবান চিরন্তন তাই আমরাও চিরকাল থাকতে চাই। এখানে প্রশ্ন ছিল যোগের শেষ অবস্থা কি, কিন্তু মাঝখানে আরেকটা প্রশ্ন এসে গেছে, হংসকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কে। শ্রীকৃষ্ণ তাই আগে মাঝখানের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন, যদি পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলা যায় তাহলে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে না। কারণ পারমার্থিক দৃষ্টিতে নানা বলে কিছু নেই। কথাটা অতি সাধারণ কথা কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে এটাই শেষ কথা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যদি প্রশ্ন করেন আমি কে, আর আমি যদি পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলি তাহলে তো এর উত্তর দেওয়াই যাবে না। আপনারা ঋষি, ঋষিরা সব সময় পারমার্থিক দৃষ্টিতেই সব কিছু দেখেন। তাহলে আমি কিভাবে উত্তর দেব, আমি কে? কারণ পারমার্থিক দৃষ্টিতে আমি তুমি বলে কিছু নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যা আছে তা আছে, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, তাই বলা যাবে না আমি কে। আমরা যখনই ঈশ্বরীয় কথা বলি তখন আমরা ভাবি আমি একজন আর ঠাকুর আরেকজন। কিন্তু তা হয় না, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দুই নেই, পারমার্থিক দৃষ্টি একও নেই, তিনিই আছেন। যখন কোন কিছুর উত্তর দিতে হয় তখন উত্তর দেওয়ার জন্য একটা আশ্রয় নিতে হয়। তাহলে আমি কিসের আশ্রয় নিয়ে এই উত্তর দেব? আশ্রয়ের সংজ্ঞা হল, যেটা গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও বলছেন, জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ এই চারটে হল আশ্রয়। যখন কোন পরিচয় দেওয়া হয় তখন এই চারটেকে আশ্রয় করেই পরিচয় দেওয়া হয়। Theory of knowledgeএও বলা হয় কোন জিনিসকে আমরা যে জানতে চাইছি আমরা জানছি কি করে? বলছেন জানার জন্য এই চারটের আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রথম যার আশ্রয় নেওয়া হয় সেটা হল জাতি, জাতি বলতে বোঝায় সমানধর্মী। আমি কোন দিন সিংহ দেখিনি, ছবিও দেখিনি। আমি চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখতে যাব, কিন্তু চিনব কি করে যে এটাই সিংহ। তখন আমাকে বলে দেওয়া হল, বেড়াল দেখেছ তো, সিংহ বেড়ালের মতই বিরাট আকারের আর হলুদ রঙ, জাতি দিয়ে একটা সম্বন্ধ করে দেওয়া হল। আবার গুণ দিয়ে হয়, আগুনের মত গরম বরফের মত ঠাণ্ডা, এগুলো আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কেউ রেগে গেলে বলি, রেগে আগুন হয়ে গেছে। মরে গেলে বলি, শরীরটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সম্বন্ধ জাতি দিয়ে বা ক্রিয়া দিয়ে আনা হয়। এই চারটের কোন একটাক আশ্রয় নিয়ে পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন বলছে, আমার ছেলে, একটা সম্বন্ধ আছে। কোন কিছুকে যখন জানা হয় তখন এই চারটে জিনিসের মধ্যেই ঘুরপাক করবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ। কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থক।।১১/১৩/২৩।।* *ভূতেষু*, যত ভূত আছে, ভাষ্যকাররা বলছেন, দেবতাই হোক, মানুষই হোক, পশুপাখি বা উদ্ভিদই হোক, এদের যদি শরীর রূপেও দেখা হয় তাহলে এরা সবাই পঞ্চ ভূতাত্মা, এদের সবারই শরীর পঞ্চ ভূত দ্বারা নির্মিত, তাই এরা অভিন্ন। সেইজন্য আপনি কে এই প্রশ্নটা হয় না। প্রশ্ন দুই রকমের হবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে হবে আর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে হবে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন হলে তখন আত্মার দৃষ্টিতেই হবে, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, নানাত্ব বলে কিছু নেই, সেইজন্য আপনি কে এই প্রশ্ন হয় না। যদি জাগতিক দৃষ্টিতেও প্রশ্ন করা হয় তখনও দেখা যাবে শেষমেশ পঞ্চভূত ছাড়া কিছু নেই। শরীর যে রকমেরই হোক না কেন, পেছনের দিকে নিয়ে গেলে পড়ে থাকবে পাঁচটি ভূত, ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ আর ব্যোম। সেইজন্য সব ভূতের বা প্রানীর অভেদ ভাব আছে। অভেদ ভাব থাকলে সেখানে নানাত্বও থাকছে না। যেভাবেই যাওয়া হোক না কেন, পারমার্থিক রূপে আত্মার দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় সেখানে নানাত্ব নেই সেইজন্য এই প্রশ্ন হয় না, যদি জীবের দৃষ্টিতে দেখা হয়, জীবের যে শরীরের জন্ম সেই শরীর আকার পেয়েছে সেই পঞ্চভূত থেকে।

তাহলে আসল সত্তা রয়েছে পঞ্চভূতে, সেইজন্য এই প্রশ্ন হবে না। চিনি দিয়ে যে মঠ তৈরী হয়, তাতে হাতি, ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল নানা রকমের পশুর আকৃতি দেওয়া হয়, বিচার করে দেখলে সবটাই চিনি, সেইজন্য এই প্রশ্ন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কে, এই প্রশ্ন শুধু বাচারম্ভো, শব্দ জাল ছাড়া আর কিছু না। যদিও মূল প্রশ্ন পুরোপুরি যোগের উপর আধারিত কিন্তু আসলে এটাই বেদান্তের ঘোর বিচার। বিচার করে দেখলে এটাই দেখাবে যে বেদান্তের দৃষ্টিতে নানাত্ব নেই, আমি, আপনি কেউই নেই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত এই শরীর, সব শরীরে পঞ্চভূতই আছে। আমি নিঃশ্বাস নিলাম আর ফেললাম, বলা হয় যে বায়ুতে শতকরা কুড়ি থেকে একুশ ভাগ অক্সিজেন থাকে, যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে তাতে শতকরা আশি ভাগ অক্সিজেন থাকে, তার মানে অক্সিজেন খুব কম যায়, বাকিটা বেরিয়ে আসে। আমি যে নিঃশ্বাসটা ছাড়লাম সেই বায়ুটা কিছুক্ষণ আমার সাথে ছিল, আমার ভেতরে গিয়ে কার্বনডাই অক্সাইডে পরিবর্তিত হল। ঐ বায়ুটাই আমার সামনে আরেকজনের ভেতরে গিয়ে ঢুকছে। আমার ভেতরে যেটা ছিল সেটা ওনার ভেতরে যাচ্ছে, ওনার ছাড়া বায়ুটা আবার আমার ভেতরে আসছে। আমার রক্তের যত আবর্জনা কার্বনডাই অক্সাইড হয়ে আরেকজনের ভেতরে ঢুকছে, অপরেরটাও আমার ভেতরে ঢুকছে। আরেকটু বৃহতে গিয়ে যদি দেখা হয়, সেই সূর্যের রশ্মি গাছাপালা তৈরী করছে, সেটাই আমরা খাচ্ছি। আমরা যে নিঃশাস-প্রশ্বাসে কার্বনডাই অক্সাইড ছাড়ছি সেটাকে আবার গাছাপালা ফটোসিন্থেসিসের মাধ্যমে খাদ্য তৈরী করছে। আমি যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়লাম সেটাই গিয়ে ওখানে ধান গম হচ্ছে, সেই ধান গম আবার অনেকে খাচ্ছে। তার মানে আমার শরীরেরই অঙ্গ অন্যরা খাচ্ছে। অপরেরটাও আমি খাচ্ছি। বেশি বিচার করলে দেখা যাবে আর জীবন চলবে না। এই কারণে ঋষি মুনিরা সমাজে থাকতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, এই প্রশ্ন হয় না। হবে, সাধারণ লোকেদের জন্য হবে। কিন্তু আপনারা হলেন ঋষি, আপনাদের জন্য এই প্রশ্ন হবে না। এরপর ভগবান মূল প্রশ্নে ঢুকছেন।

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেহন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ। অহমেব ন মত্তোহন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা।। ১১/১৩/২৪।। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে তা আপনি মন দিয়ে নিন, বাণী দিয়ে নিন, দৃষ্টি অর্থাৎ যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে নিন, যা কিছু দিয়েই নেওয়া হোক না কেন, দেখা যাবে সব কিছু আমিই হয়েছি, আমি ছাড়া অন্য কিছু নেই। এখানে আমি বলতে ভগবান আত্মা রূপে বলছেন। বিষয়ের চিন্তন করতে করতে মন ঐ বিষয়ের সাথে এক হয়ে যায়, যেটা মূল প্রশ্ন ছিল, চিত্ত গুণের সাথে এক হয়ে যায় এটাও যেমন ঠিক আবার এটাও ঠিক যে মন আর ঐ বিষয় বস্তু দুটো আমিই হয়েছি, ওই দুটো আমারই উপাধি। মূল প্রশ্ন ছিল, মন গুণের সাথে, বিষয়ের সাথে এক হয়ে যায়, এটাই মনের স্বভাব, তাহলে মন গুণ থেকে বেরিয়ে এসে ঈশ্বরের দিকে যাবে কি করে। ভগবান উত্তর দিচ্ছেন, যোগের যে শেষ কথা, যদি বিচার করে দেখ এটা ঠিকই মন বিষয় থেকে আলাদা হবে না, কিন্তু মন আর বিষয় আমারই উপাধি। উপাধি মানে যে জিনিসকে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা মানুষ মাত্র, কিন্তু আমাদের অনেক রকম পরিচয়, পরিচয় মানেই উপাধি এসে গেছে। ভক্তরা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে, একবার যদি ভাব হয়ে যায় তখন সংসারে আর মন লাগবে না। ঠাকুর বলছেন কেন লাগবে না, সংসার কি ভগবান থেকে আলাদা। ঠাকুর তখন রামায়ণ থেকে উপমা নিয়ে বলছেন, শ্রীরাম সংসার ত্যাগ করবেন, বশিষ্ঠদেবকে বলা হল শ্রীরামকে বুঝিয়ে সংসারে রেখে দেওয়ার জন্য। বশিষ্ঠদেব তখন শ্রীরামকে বোঝাচ্ছেন, সংসার কি ঈশ্বরের থেকে আলাদা, তুমি আগে আমাকে বুঝিয়ে দাও ভগবান সংসার থেকে আলাদা তারপর তুমি সংসার ত্যাগ কর। ঠাকুর কেরানীর উপমা দিচ্ছেন, কেরানী যদি জেল থেকে ছাড়া পায় সে কি ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে, সে আবার কেরানীগিরিই করবে। সংসারে মন না দিলে করবে কি, কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে। তফাৎ হল, জ্ঞানের আগে যে সংসারকে আলাদা মনে হত, জ্ঞানের পরে দেখে সংসারটা একই জিনিসের উপাধি। বেদান্তের খুব প্রচলিত কথার সূত্র ধরে বলি আমরা সবাই এক। কিন্তু সবাই কি কখন এক হয়, কখনই এক হবে না। একই সত্তা আছে, ঐ একই সত্তাকে নাম আর রূপে আলাদা দেখান হয়, সেটাকে আমরা ম্যানেজ করে নিই। কিন্তু যখন মনের ব্যাপার আসে, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার আসে তখন আমরা ধরা পড়ে যাই। কারণ তখন আমরা জানছি আমার মন আলাদা, আমার ইন্দ্রিয় আলাদা। খাওয়ার সময় আমরা জানি এটা মিষ্টি, এটা ঝাল, এটা নোনতা। আমরা কখনই নোনতা দিয়ে মিষ্টি

খাওয়ার ইচ্ছা মেটাই না। ব্রহ্মজ্ঞানী হন আর যেই হন, ঐ জায়গাতে সবাই ভ্রমজ্ঞানী হয়ে যান। চায়ে চিনির জায়গায় নুন দিয়ে দিলে তখনই বোঝা যাবে তিনি কি করে সব কিছুকে ঠাকুরে ইচ্ছা বলে নিচ্ছেন। কারণ মন যখন বিষয় আর ইন্দ্রিয়কে নিয়ে খেলা করে তখন এগুলো সব আলাদা হয়ে যায়। এই অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন, মন, ইন্দ্রিয় আর বস্তু কি করে ঈশ্বরের উপাধি। তাত্ত্বিক ভাবে এটা বোঝা যায়, প্রকৃতির যে তিনটে গুণ, এই তিনটে গুণই evolve করে করে ইন্দ্রিয় হয়েছে, মন হয়েছে, বস্তু হয়েছে। আমরা এর উপর অনেকবার আলোচনা করেছি। এখানে বলছেন, ওগুলো ঈশ্বরেরই উপাধি।

ঈশ্বরের উপাধি হওয়াতে কি হয়, *গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া। গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ।।১১/১৩/২৬।।* ঠাকুর বলছেন, অনেক দিন ধরে পাপকর্ম করতে করতে পাপকর্মের প্রতি ঘেন্না চলে যায়। যে জিনিসটাই আমরা অনেক দিন ধরে করতে থাকি তখন ঐ জিনিসটা আমাদের কাছে খুব সহজ হয়ে যায়, সহজ হওয়া মানে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া। আমাদের মন, ইন্দ্রিয় আর জগৎ সৃষ্টির আদিকাল থেকে একই খেলা করে যাচ্ছে, ফলে চিত্ত সত্যিকারের ভুলে গেছে যে এটা আসলে তার কাজ নয়। চিত্তে আত্মা বিরাজ করে আছেন। বলছেন, এর থেকে বাঁচার একটাই পথ, যদি ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায়। ঈশ্বরের স্বরূপকে যদি কেউ জানতে পারে তখন মন যে ওর মধ্যে জড়িয়ে আছে, এই জড়ানো ব্যাপারটা খসে পড়ে যায়। আত্মজ্ঞান যাকে বলছি, ঈশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান আমরা যাকে বলছি, জ্ঞান মানেই যথাবৎ, জিনিসটা যেমন তেমনটি দেখা। জিনিসটা কেমন? বলছেন নানাত্ব নেই, উপনিষদও বার বার একটা কথাই বলে যাচ্ছেন একত্ব। জ্ঞান হয়ে গেলে বাস্তবিক দেখেন আমার ভেতরে যে চৈতন্য তিনিই সর্বব্যাপী বিরাজমান, তিনিই আছেন। আর দেখেন চিত্ত যা দিয়ে নির্মিত ইন্দ্রিয়ও সেই একই জিনিসের দ্বারা নির্মিত, জগতের সব বস্তু সেটা দিয়েই নির্মিত। সেইজন্য জ্ঞান হয়ে গেলে এটা আমার পছন্দের, এটা অপছন্দের, এই ব্যাপারটা তাঁর আর থাকে না। এর চরমসীমা কোথায় চলে যায়? ঠাকুর বলছেন, সন্দেশও যা বিষ্ঠাও তাই। সন্দেশ খাওয়া যা বিষ্ঠা খাওয়াও তাই, আর এর আক্ষরিক করতে গিয়ে ঠাকুর নিজের বিষ্ঠা জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করলেন। তখন ঠাকুরকে বলা হল, ওতো নিজের বিষ্ঠা, তখন তিনি অপরের বিষ্ঠাতেও একই জিনিস করলেন। কিন্তু জ্ঞানে অবস্থিত থাকার সময় সত্যিকারের এটাই হয়। জ্ঞানের ঐ অবস্থা থেকে মন নেমে এলে তখন স্বাভাবিক ভাবে আবার নানান ভাব এসে যায়। তাছাড়া অন্য আরও অনেক কিছু আছে। তান্ত্রিকরা মড়ার খুলিতে রান্না করে খায়। অনেক কাপালিক চিতার কাছেই থাকে, চিতার জ্বলন্ত কাঠেই রান্নাবান্না করবে, তাদের ঐ ভেদ বুদ্ধিটা চলে গেছে। অবশ্য এর পেছনে আরও অনেক কিছু জড়িত থাকে, তাদের কাছে পয়সা থাকে না যে রান্নার জন্য কাঠ জোগাড় করবে আর হয়ত মড়া পোড়ার গন্ধটাও অনেকের ভালো লেগে যায়, এটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু এখানে বলছেন, এই যে নানান ভেদ, যেটা চিত্ত ইন্দ্রিয়কে মাধ্যম করে জগতকে যে বিভিন্ন রূপে দেখে; জ্ঞান হয়ে গেলে এই নানাত্ব দেখা বন্ধ হয়ে যায়। উপনিষদে এটাকে এক কথায় বলছেন, যখন ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায় তখন তার কারুর প্রতি ভালোবাসা থাকে না, কারুর প্রতি দ্বেষ থাকে না, কোন জিনিস চলে গেলে তার আর দুঃখও হয়, কোন জিনিস পাওয়ার জন্য তার কোন মোহও হয় না।

<u>অবস্থাত্রয় বিচার</u>

এরপর বেদান্তের খুব প্রচলিত একট ধারণাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আলোচনা করছেন। মানুষের তিনটে অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। কিন্তু এই তিনটে অবস্থা থেকে বিলক্ষণ বা সাক্ষী হলেন জীবাত্মা, জীবাত্মা এই তিনটে অবস্থার বাইরে। এই সিদ্ধান্তকে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি এই তিনটে দিয়েই সিদ্ধ করা হয়েছে। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রে এই সিদ্ধান্তকে উপস্থাপিত করে দেখাচ্ছেন, কিভাবে এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে এসেছে, আর যুক্তি দিয়েও এটাই পাওয়া যায় আর মানুষও তাই অনুভব করে। কারণ মানুষ সেটাই অনুভব করে যেটা তার থেকে আলাদা। শ্রীকৃষ্ণ একটা একটা করে যুক্তি দিয়ে বলছেন, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা কিছু দেখছি সবটাই ইন্দ্রিয় দিয়ে এই বহির্জগতকেই দেখছি। যে জগতকে আমরা দেখছি এই জগতটা ক্ষণভঙ্গুর, বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না আর ক্রমাগত এর পরিবর্তন হয়ে চলেছে। জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা কিছু দেখেছি সেগুলোই স্বপ্নাবস্থায় অন্য ভাবে বিচিত্র রকম আকার ধারণ করে আসে। সুষুপ্তি অবস্থায় অর্থাৎ গভীর নিদ্রায় স্বপ্নাবস্থায় যা কিছু ছিল সব

লয় হয়ে যায়, যেন বীজাকারে রাখা থাকে। সুষুপ্তি অবস্থা থেকে মানুষ বেরিয়ে আসার পর তার দুটো জিনিসই থাকে – আমার কিছু মনে নেই আর দ্বিতীয় আমি খুব সুখে ছিলাম। এই দুটো জিনিস, আমি খুব সুখে ছিলাম আর এই বোধ যে আমার কিছু মনে নেই, সুষুপ্তির এই অবস্থায় মানুষের সত্ত্বগুণের স্বভাব আসে। সত্ত্বগুণ মানেই তাই, জ্ঞান অর্থাৎ বোধটুকু থাকে আর তার সাথে সুখ বোধ। সুখ বোধটাই ঠিক ঠিক যেখানে সত্ত্বগুণের লক্ষণ পাওয়া যায়। ওই সুষুপ্তি থেকেই আবার স্বপ্ন জগৎ নির্মিত হয়, ওই স্বপ্নাবস্থা থেকে আবার এই স্থূল জগতটা নির্মিত হয়ে যায়, নির্মিত হয়ে যাওয়া মানে জগতের বোধটা আবার ফেরত চলে আসে।

এই তিনটে অবস্থার যদি বিচার করা হয় তখন দেখা যায় কেউ একজন আছেন যিনি এই বোধ করেন। বেদান্তের এটাই পুরো আলাদা একটা Branch of knowledge। বেদান্তের যে বিচার করার কথা বলা হয়, তার মধ্যে এই তিন অবস্থার বিচার খুব গুরুত্বপূর্ণ, এর নাম অবস্থাত্রয় বিচার। বেদান্তের অবস্থাত্রয় বিচার রীতিমত কঠিন বিষয়, খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে আর খুব উচ্চ মানের সাধনা করা না থাকলে অবস্থাত্রয় বিচার করা তো দূরের, ধারণাই করা যাবে না। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীর কাছে জগৎ স্বপ্নবৎ। স্বপ্নবৎ বলতে অনেক ভুলে মনে করেন বেদান্ত জগতকে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু স্বপ্নবৎ তা নয়, বেদান্তের সাধনা, বিশেষ করে জ্ঞানমার্গের সাধনা মানেই অবস্থাত্রয় বিচার। আমরা মনে করছি, যে মন দিয়ে আমরা দেখছি জানছি, এই মনই চৈতন্য, জগতকে বোঝা, জানার ক্ষমতা মনেরই আছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সব শাস্ত্রই মনকে জড় বলছেন। আসল যে চৈতন্য, তাঁকে যে নামেই বলা হোক না কেন, এনারা আত্মা বলছেন, সেই আত্মা কিন্তু মন নন। মন এই জগতেরই বস্তু, চৈতন্য মনকে নিজের জন্য ব্যবহার করেন। যেমন একজন সামনে কম্প্যুটার রেখে কাজ করছে, কম্প্যুটারে অনেক কিছুই আছে কিন্তু কম্প্যুটার থেকে মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। মনটাও একটা মেশিন, মেশিন মানেই জড় কিন্তু তার পেছনে যিনি আত্মা তিনিই চৈতন্য। আত্মার কাছে কয়েকটা দৃশ্য আসে, যেমন আমি চুপচাপ বসে আছি তখন আমার কাছে নানান দৃশ্য আসতে থাকে। সরাসরি চোখের মাধ্যমে কিছু দৃশ্য আসছে, আবার সিনেমার পর্দায় কিছু দেখছি, আবার কম্প্যুটারের স্ক্রীনে দেখেছি, সব আলাদা আলাদা দৃশ্য। এই দেখাটা সব সময় হয় মস্তিষ্কে। সামনে বস্তুর ছবি চোখে যাচ্ছে, সেই ছবি ইলেক্ট্রিক্যাল সিগনালের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যাচ্ছে, মস্তিষ্ক সেটাকে প্রসেসিং করে ইমেজ তৈরী করছে। এটা যেমন একটা জগৎ, তেমনি চিন্তারও একটা জগৎ আছে। চোখ বন্ধ করে আমি যদি কারুর কথা চিন্তা করি তখন তার যে ছবি মনের মধ্যে আসবে সেটা অন্য ধরণের। তাকেই স্বপ্নে যদি দেখি সেটাও অন্য ধরণের ছবি হবে, ছবিতে যদি দেখি সেটা আরেক ধরণের। সেই একই জিনিস চোখ দিয়ে সরাসরি দেখলে এক রকম, ছবিতে দেখলে অন্য রকম, চোখ বন্ধ করে ভাবলে আরেক রকম, স্বপ্নে দেখলে আরেক রকম। একই ছবি যখন বিভিন্ন রূপে দেখা হয় তখন বিভিন্ন ভাবে আসে।

জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এই তিনটেকে সব সময় বিচার করা আর নিজেকে মনে করানো, আমি তিনটে অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জাগ্রত অবস্থায় আমি যা কিছু দেখছি, নিজের ভেতরে নিচ্ছি, এটা যদি সত্য হত তাহলে স্বপ্নে এগুলো চলে যেত না, স্বপ্নে জগতটা যেমন আছে তেমনটাই বোধ করতাম। আর জাগ্রত ও স্বপ্ন যদি সত্য হত তাহলে সুষুপ্তিতে যে আমার বোধ হচ্ছে আমার কিছু মনে নেই আমি খুব সুখে ছিলাম, এই বোধ হত না। স্মৃতিকে যদি অন্বয় করা হয়, স্মৃতিকে অন্বয় করা মানে, আমি ছিলাম স্বপ্নে, আমি ছিলাম সুষুপ্তিতে, সেই আমি এখন জেগে আছি। সুষুপ্তির স্মৃতি, স্বপ্নের স্মৃতিকে আমরা বিচার করছি জাগ্রত অবস্থায়। তাহলে কিছু একটা আছে যেটা এই তিনটে অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকছে। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের এই বোধটুকু আছে যে, আমার স্বপ্ন ছিল, আমার সুষুপ্তি ছিল। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের সুষুপ্তির বোধ নেই আর জাগ্রত অবস্থার বোধও চলে যায়। সুষুপ্তিতেও ঠিক তাই, স্বপ্নের বোধও চলে যায় আর জাগ্রত অবস্থার বোধও চলে যায়। কিন্তু এই তিনটে অবস্থায় একটা জিনিস সব সময় থাকছে, সেটা হল আমি বোধ, এই আমি বোধটা কখনই যায় না। আচার্য শঙ্কর বেদান্তের আলোচনায় ঠিক এই জিনিসটাকেই নিয়ে আসেন। এই গ্লাশ আছে, গ্লাশ আছে বলাতে দুটো জিনিস বলা হল, একটা গ্লাশের সত্তা আর আছে এই সত্তা, সত্তা মাত্রম্। দুটো জিনিস এক সঙ্গে চলে, একটা গ্লাশ আর গ্লাশের অস্তিত্ত্ব। জগতের সব গ্লাশকেই ভেঙে দিতে পারি কিন্তু সত্তা, আছে,

এই অস্তিত্বকে কখনই ভাঙা যাবে না। সেইজন্য অস্তিত্ব, সত্তা, এটাই আসল। ঠিক তেমনি অবস্থার পরিবর্তন যতই হোক, আমি সুখী থাকতে পারি, জাগ্রত থাকতে পারি, শুয়ে থাকতে পারি, যাই হয়ে থাকি, একটা জিনিস কিন্তু সব সময় এক ভাবে চলছ, সেটা হল, আমি বোধ। অধ্যাত্ম মানেই ঐ আমিকে ধরা, যে আমিকে অবলম্বন করে বাকি সব কিছুর খেলা চলছে। যে আমি দেখছে আমি দুখী, যে আমি দেখছে আমি সুখী, যে আমি দেখছে আমাকে জপধ্যান করতে হবে, যে আমি দেখছে আমি শুয়ে ছিলাম, যে আমি বলছে আমার কোন হুঁশ ছিল না, যে আমিকে কঠোপনিষদে যমরাজ বলছেন *একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*, যিনি এক, যিনি চেতনারও চেতনা, বুদ্ধি চেতনার কার্য তারও পেছনে যে চেতনা, ওই চেতনার আমি বোধ এমন একটা জায়গায় আছে, সেখান থেকে সে জাগ্রতকেও দেখছে, স্বপ্নকেও দেখছে, সুষুপ্তিকেও দেখছে, সুখকেও দেখছে, দুঃখকেও দেখছে, এই অনিত্য সংসারকে দেখছে, কিন্তু সব কিছুতে পেছনে থেকে যাচ্ছে একটি আমি বোধ, ঐটাই আসল আমি, আর ঐ আমি এই তিনটে অবস্থা জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ওনারা যুক্তিতর্ক আনছেন ঠিকই, কিন্তু এখানে যুক্তিতর্কের কোন ব্যাপার নেই, এনাদের কাছে একেবারে সাক্ষাৎ, তাঁরা এই রকমই দেখেন। ঠাকুর বলছেন, বিচার করে দেখ জগতটা কি রকম। বিচার করে দেখলে আর জগৎ থাকে না। কিভাবে থাকছে না? যখন আমি ঘুমিয়ে আছি তখন স্বপ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, স্বপ্ন মানে মস্তিষ্কে যে কিছু কোষ আছে সেগুলো সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। কেন সক্রিয় হয় সেই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরাও কিছু বলতে পারছেন না। দৃশ্য যখন দেখছি তখনও কোশিকা গুলো সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। আর সব সময় একই জিনিসকে ঠিক সেইভাবেই দেখছি তা নয়, তার উপর অনেক কালারিং এসে যায়। আর তৃতীয় যখন গভীর নিদ্রায় চলে যাচ্ছে, নিদ্রা ভাঙলে বলছে আমার কিছু মনে নেই। আগেকার দিনে লোকেরা ভাবত ঘুমনো মানেই স্বপ্ন, কিন্তু এখন পরিষ্কার যে নিদ্রার বিভিন্ন অবস্থা আছে। এনারা বলছেন, আত্মা আছেন বলেই গভীর নিদ্রাতেও বোধ হয় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, খুব আনন্দে ছিলাম আর আমার কিছু মনে নেই, কিছু মনে না থাকা এই অজ্ঞানটাও একটা জ্ঞান। বেদান্তের এগুলো খুব কঠিন বিষয়, খুব সহজে বোঝা বা ধারণা করা যায় না। বেদান্তে এটাকেই অভাব প্রমাণ বলেন। যদি বলা হয় এই ঘরে কি হাতি আছে? আমরা বলব, হাতি নেই। যখন বলছি হাতি নেই, তখন আমরা কি দেখে বলছি নাকি না দেখে বলছি, মানে একটা অভাবকে দেখছি নাকি প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখছি? দেখা মানে প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখা। তাহলে হাতির অভাবকে আমরা কি করে দেখছি। দর্শন শাস্ত্রে এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, অভাব প্রমাণের উপর অনেকগুলো দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বলেন অভাব একটা প্রমাণ আবার কেউ বলেন অভাব কোন প্রমাণ নয়। বেদান্তে অভাব প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, অভাব প্রমাণকে যদি বেদান্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বেদান্ত ধসে পড়ে যাবে। বেদান্ত তাই দেখিয়েও দেন যে অভাব দিয়েও জিনিসটাকে জানা যায়। বিয়ে বাড়িতে একজনের আসার কথা কিন্তু সেদিন সে আসতে পারেনি। পরে তাকে বলবে, সেদিন তোমার অনুপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করলাম। অনুপস্থিতিকে কি করে লক্ষ্য করবে, লক্ষ্য তো উপস্থিতিকেই করে। এটা শুধু কথার কথা নয়, এটা বাস্তবিক যে মন ধরে নেয় তার প্যাটার্নের মধ্যে একটা জিনিস মিসিং। সেইজন্য বলে অভাবটাও একটা জ্ঞান, অজ্ঞানটাও একটা জ্ঞান। এই যে অজ্ঞান বোধ, আমার কিছু মনে নেই, এটাও জ্ঞান। কিছু মনে নেই, এই জ্ঞান কখন হবে? তখনই হতে পারে যখন তার পেছনে একজন জ্ঞাতা আছেন। জ্ঞাতা যদি আরেকজন না থাকেন তখন ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে। আমার কিছু মনে নেই, এই বোধ যখন আসছে তার মানে তার পেছনে আরেকজন জ্ঞাতা আছেন। সেই জ্ঞাতা ঐ গভীর নিদ্রাকেও দেখছেন, সেই জ্ঞাতা স্বপ্নাবস্থাকেও দেখছেন আর জাগ্রত অবস্থাকেও সেই জ্ঞাতাই দেখেন। তিনটে অবস্থার জ্ঞাতা সেই একজনই আছেন।

বিচার করতে করতে দেখে যে আমি ঐ গভীর নিদ্রাতে সুখ বোধ করছিলাম, সেই আমিই স্বপ্নও বোধ করছিল আর সেই আমি এখন জাগ্রত অবস্থাকে বোধ করছে। তার মানে আমার সাথে এই সংসারের যে একাত্ম বোধ, এটা মিথ্যা। কারণ দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা জিনিসকে যখন আমি ভোগ করছি তখন ওটা যদি আমার স্বাভাবিক থাকে, ওটার সাথে যদি এক থাকে তখনই ভোগ হবে। বেদান্তে এনারা বিচার করতে করতে নিয়ে যান, ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগৎ এই দুটো এক, সেইজন্য এরা এক অপরকে ভালোবাসে। আর

আমিও নিজেকে মনে করি আমি আর আমার ইন্দ্রিয় এক, সেইজন্য আমরা জগতকে ভালোবাসি। কিন্তু বিচার করতে করতে যখন দেখে আমি আলাদা জগৎ আলাদা, জগতটা কিছুই না, তখন জগতের প্রতি আকর্ষণটা কমে যায়। যখন এই বোধ এসে যায়, যে আমি গভীর নিদ্রায় সুখ বোধ করছিলাম, যে আমি স্বপ্ন বোধ করছিলাম, সেই আমিই এই জাগ্রত অবস্থায় আছি। তখন বুঝতে পারে এটা আত্মার স্বভাব নয়। আত্মা এগুলোকে দৃশ্য রূপে দেখছে।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই জিনিস গুলো আমার স্বভাব নয়, এই চিন্তন করে করে সে জগতকে উচ্ছেদ করে দেয়। আমাদের সমস্যা হল, আমি আর এই জগৎ আমরা এক অপরের সাথে জুড়ে আছি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সব আমার, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার তাদেরও আমি, আমি আর আমার এমন আষ্টেপৃষ্টে জুড়ে আছে যে এগুলো যে আলাদা এই ধারণা করাটাই অসম্ভব। কিন্তু যখন বিচার করে করে বুঝতে পারে এগুলো আমার থেকে আলাদা, আমার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, তখন ধীরে ধীরে সব কিছু খসে পড়ে যায়। এই যে বিচার, এটাই ঠিক ঠিক জ্ঞানমার্গের বিচার। বেদান্তে এই বিচারকে বলছেন দৃগ্-দৃশ্য-বিবেক, দ্রষ্টা আর দৃশ্য এই দুটো পুরো আলাদা। এই বিচার সব থেকে ভালো হয় তিনটে অবস্থাকে নিয়ে যখন বিচার করা হয়। আর দ্বিতীয় বিচার হয় সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের বিচারের দ্বারা। জগতে যা কিছু আছে সব তিনটে গুণের খেলা, আমি এগুলো থেকে আলাদা বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থা থেকে আমি আলাদা।

এই সব বলার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্। বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ।। ১১/১৩/৩৪।।* একটু বিচার করলেই দেখতে পাবে এই জগৎ হল মনের বিলাস, শুধুই ভ্রম। কি রকম ভ্রম? *দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্*, এনারা একটা শব্দ ব্যবহার করেন, *অলাতচক্রম্*। অলাত্ মানে মশালের মত আলো, একটা লাঠির মাথায় আগুন লাগিয়ে সেই লাঠিকে যদি খুব জোরে ঘোরান হয়, তখন মনে হবে আগুনের একটা বৃত্ত রয়েছে। আগুন একটিই আছে, জোরে ঘোরানোর জন্য মনে হয় আগুনের একটা বৃত্ত, এটাকেই বলে *অলাতচক্রম্*। বেদান্তের খুব নাম করা গ্রন্থ মাণ্ডুক্যকারিকাতে এই জিনিসটাকে খুব প্রচলিত করা হয়েছে, তাতে অলাতচক্রের বর্ণনা করে বলছেন, এই জগতটা অলাতচক্রের মত বন্ বন্ করে ঘুরছে। আমরা দেখে মনে করছি একটা আলোর বৃত্ত, কিন্তু বৃত্ত নেই একটা আগুন শুধু জ্বলছে। বৃত্তকে যদি থামিয়ে দেওয়া হয় তখন দেখা যাবে কোথাও কিছু নেই শুধু একটা আগুন জ্বলছে। বেদান্ত এই জিনিসটার উপর খুব জোর দেয়। এখান থেকেই বৌদ্ধ ধর্মে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ এসেছে, একটা momentary চৈতন্য, একটার পর একটা জিনিস ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে। কাঠের আলাত্ যেমন ক্রমাগত ঘুরছে, এটা যেমন চঞ্চল তেমনি জগতটাও চঞ্চল আর ভ্রম মাত্র। ঠাকুর বলছেন, সন্দেশ জিহ্বাতে যতক্ষণ আছে ততক্ষণই মিষ্টি, গলার নীচে গেলে আর কিছুই নেই। সন্দেশের মিষ্টত্ব ওই মুখটুকুতেই, আর কোথাও কিছু নেই। জগতে যত ভালোবাসা আর যত রাগ-দ্বেষ সবটাই মনের খেলা, স্বপ্নও মনের খেলা, জাগ্রতটাও মনের খেলা। যাকে নিয়ে আমি এত হম্বিতম্বি করছি সব মনের মধ্যেই হচ্ছে। কদিনের জন্য হচ্ছে? কয়েকটি বছরের জন্য। কিন্তু তার জন্য কত তোড়জোর কত কি করছে মানুষ। যতই আমরা এই কথাগুলো শুনি না কেন, আমাদের কোন পরিবর্তন হয় না, হওয়ার কথাও নয়, এটাই মায়া। যেটা খুব সাধারণ জিনিস সেটাকেই আমরা পালন করতে পারছি না, সেখানে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থাকে উড়িয়ে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। সেইজন্য জ্ঞানমার্গ, সাংখ্য বিচার এগুলো জগতে একজন দুজনেরই জন্য, সাধারণের জন্য একেবারেই নয়, শাস্ত্রের কথা শুনতে হয় তাই একটু শুনে রাখা হল। আগেকার দিনে উপনিষদ কোন অব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণও অত্যন্ত নৈষ্ঠিক, সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন না হলে পড়তেই দিতেন না। স্বামীজী এখন উপনিষদ সবার জন্যই খুলে দিয়েছেন, আর অনেকেই শুনছে, কিন্তু ধারণা করা খুব কঠিন। শেষ অবস্থায় আত্মার যে বিচার হয় সেখানে এই তিন অবস্থা জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তির বিচার আসবেই আসবে। অবস্থাত্রয় বিচার ছাড়া জ্ঞানমার্গের দর্শনকে ধারণা করা যাবে না, অবস্থাত্রয় বিচার ছাড়া উপনিষদ কখনই সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু এর বিচার করা বা ধারণা করার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, অথচ সবাইকেই এই পথ দিয়েই যেতে হবে।

বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া, তিনি এক কিন্তু তিন রূপে দেখান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, কিন্তু এমনই তাঁর জাদু যে তিনি জ্ঞান, জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় রূপে ভাসমান হয়ে যান। আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখছেন, এখানে তিনটে বোধ আসছে। একটা আমি বোধ, যাকে দেখছি সেই বোধ আর আমি দেখছি, এই বোধ। অথচ তিন বলে কিছু নেই, এক আত্মাই আছেন। জ্ঞানীরা, যাঁরা ঠিক ঠিক ধর্ম সাধক, তাঁরা এই জিনিসটার উপর অবস্থান করেন; যিনি এক তিনিই তিন রূপে দেখাচ্ছেন। আর সব কিছুই সেই আত্মারই রচনা, সবটাই যেন স্বপ্নের মায়াজাল। সমস্যা হল যখনই মায়াজাল বলা হয় তখন মনে করছি জগতটা যেন মিথ্যা, কিন্তু তা বলছেন না। উচ্চমানের সাধকরা ভগবানের জন্য সব ত্যাগ করে দেন, সাধারণ লোকের পক্ষে যা কখনই সম্ভব নয়। ঘরবাড়িই যিনি ছেড়ে দিয়েছেন, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে কেন তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। জগৎ স্থূল, শরীরটাও স্থূল, কিন্তু আশ্চর্যের এটাই, স্থূল শরীর দিয়ে স্থূল জগতকে জানছি, আবার দেখছি, সবই সেই আত্মারই সৃষ্টি। মদ খাওয়ার পর তার কোথায় শরীর, কোথায় তার কাপড় চোপড়, কোন হুঁশ থাকে না, ঠিক তেমনি সিদ্ধ পুরুষরাও এই রকম উন্মত্ত অবস্থা হয়ে নশ্বর দেহের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যান। যে শরীরে তাঁর স্বরূপ দর্শন হয়েছে তারপর সেই শরীর কোথাও যাচ্ছে, কোথাও থাকছে, কোথা থেকে ফিরছে তার উপর তাঁর আর কোন দৃষ্টি থাকে না। কে তাকে সম্মান দিল, কে তাকে সম্মান দিল না, এসবের কোন বোধ তাঁর থাকে না। কারণ তিনি জেনে গেছেন সম্মানটা যতটা মিথ্যা অপমানটাও ততটা মিথ্যা। এই শরীরের সাথে যা কিছু সম্বন্ধ আছে তার কোন কিছুর দিকেই তাঁর দৃষ্টি থাকে না। ঠাকুরের শরীর খারাপ হয়েছে, ঠাকুর বলছেন 'আমার এখন এমন অবস্থা যে হয় সবাইকেই বিশ্বাস করি আর তা নাহলে কাউকেই বিশ্বাস করি না। ডাক্তারের কথাকেই যে আমি বিশ্বাস করব তা না, যে যা বলে দেবে, একটা বাচ্চা ছেলেও যদি কিছু বলে দেয় সেটাই বিশ্বাস করে নিই'। কারণ ঐ যে আমিত্ব, যেখানে এটা ঠিক এটা ভুল, এই বিচার আর থাকে না, সবটাই উড়ে গিয়ে ঐ জায়গাতে গিয়ে এক হয়ে যায়। কিন্তু সাধনার সময় যে তিনি কিছু কিছু জিনিস অনুশীলন করে এসেছেন সেটার জন্য তাঁর আর বেতালা পা পড়ে না, কামিনী, কাঞ্চন, নাম, যশ এসব দিকে তাঁর মনে যায় না। ঠাকুর বলছেন, আমাকে কেউ গুরু, কর্তা, বাবা বললে কাঁটা বিধে। অন্য দিকে আবার একজন বড়লোককে বলছেন, তোমাকে আমি রাজাটাজা বলতে পারব না। দুটোই আছে, নিজেকেও বড় করছেন না, অপরকেও বড় করছেন না, তাঁর সমদৃষ্টি, সমত্ব হয়ে যায়। তখন কি হয়?

দেহোহপি দৈববশতঃ খলু কর্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ। তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ।।১১/১৩/৩৭।। তখন তিনি মনে করেন এই শরীরটা প্রারব্ধের অধীন। যদিও বলেন আত্মাই এই জগতের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি দেখছেন জগৎ থেকে আত্মা ভিন্ন, ভিন্ন এই অর্থে যে, জগতটা মিথ্যা, ওটা চঞ্চল। সেই জগতে কিভাবে কিভাবে আমার শরীরের সৃষ্টি হয়ে গেছে, শরীর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নিজের মত কর্ম করে, সেই কর্মের সাথে সে নিজেকে জুড়ে নেয়, কখন ভালো কর্মের সাথে জুড়ে নেয় কখন মন্দ কর্মের সাথে জুড়ে নিচ্ছে, ভালো মন্দ কর্মের সাথে যখন জুড়ে নিচ্ছে তখন তার স্বভাবে সে চাইছে ভালোর দিকে যাব আর মন্দ থেকে দূরে থাকব। ফলে তার পরের শরীরটাও সেই অনুসারে হয়, *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, যেমনটি কর্ম করেছে আর যেমনটি তার জ্ঞান হয়েছে। যেমন একজন লোক মনে করছে টাকা-পয়সাই সংসারের ঠিক ঠিক সুখের চাবিকাঠি, এরপরে যে জন্ম হবে ঐ টাকা-পয়সার জায়গাতেই হবে। জগতের বেশির ভাগ লোকই তো টাকা-পয়সার জায়গায় যেতে চাইছে, সবাই তো যেতে পারছে না, তাহলে কে যেতে পারবে? টাকা-পয়সার ব্যাপারে যে যেমন কর্ম করেছে সেই অনুসারে যাবে। যখন সেই রকম শরীর পেয়ে গেল তখন আবার সেই কর্ম করতে থাকে। এই করতে করতে কোথাও গিয়ে তার একটা চেতনা জাগে, ঐ চেতনা যখন জাগবে তখন সে সাধুসঙ্গ করতে শুরু করে। কিন্তু এতদিনের যে পুরনো কর্ম জমে আছে সেইজন্য সেখানেও সে আবার ভালো মন্দ খুঁজতে থাকে।

এক ভদ্রলোক ছিলেন, খুবই ভালো লোক, সারা জীবন ব্যাচেলর থেকে একা একাই কাটিয়েছেন, ছোটখাটো একটা ইণ্ডাস্ট্রি ছিল, টাকা-পয়সাও ভালো ছিল। যৌবনে তাঁর খুব সাধু হওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শুধু বিচার করতেন কোন সেন্টারে ভালো থাকা-খাওয়া আছে। এই বিচার করতে করতে ওনার বয়সটা পেরিয়ে

গেল, সন্ন্যাসী আর হতে পারলেন না। কিন্তু চিরদিনই সাধুদের খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মনে একটা ইচ্ছা জাগল আমি সাধু হব কিন্তু তার সাথে একটা বিপরীত ভাব আমার ভালো খাওয়া, ভালো থাকাটা যেন ঠিক থাকে, ঐ দুটোকে মেলাতে গিয়ে আর সাধু হওয়া হল না। কোন একটা কর্ম আছে যার জন্য কারুর ইচ্ছে হল আমি সন্ন্যাসী হব, কিন্তু নারীর প্রতি একটা দুর্বলতা থেকে গেছে, এবার দুটোর মধ্যে লড়াই চলতে থাকবে। কোন ভাবে সে হয়ত সাধু হয়ে গেল, এরপর সাধনা করে করে তাকে ঐ দুর্বলতাকে জয় করে নিতে হবে। কারণ কর্ম তাকে সহজে ছাড়বে না, যতক্ষণ না দুর্বলতাকে জয় করতে পারছে, কর্ম সুযোগ পেলেই তাকে মারবে। সাধনা করতে করতে শেষ জন্ম যখন এসে গেল, যেটা ভগবান বুদ্ধের বোধিসত্ত্বের জাতকের কাহিনীতে নিয়ে আসা হয়েছে, শেষ জন্মটা হল, কিন্তু এখনও তাঁর কিছু কর্ম জমে আছে, এবার যদি পারিপার্শ্বিক সব শুভ সংযোগ গুলোকে যদি কাজে লাগান তাঁর সব কিছু খসে পড়ে যাবে। যদি না কাজে লাগায় তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না, আরও কয়েকটা জন্ম অপেক্ষা করতে হবে। নষ্ট কিছুই হয়ে যাবে না। যাঁর এই জ্ঞানরাশি, যিনি এই স্তরে চলে গেছেন, যেমন ভগবান বুদ্ধ তিনি স্ত্রী, নবজাতক পুত্রকে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যদি তিনি না ছাড়তেন তাও কিছুই হত না, দু বছর চার বছর থাকতেন আবার উনি বেড়িয়ে যেতেন। সন্ন্যাসীদের অনেকে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি সাধু হলেন কি করে? সাধু না হয়ে যাবে কোথায়, তাঁকে তো ঐ কর্মের শক্তিটা ঠেলছে। অনেক সময় মনে হয় এই কারণে সাধু হয়ে গেল, কখনই কোন কারণ থাকে না, সাধু জীবনে হঠাৎ রূপান্তর বলে কিছু হয় না, হঠাৎ রূপান্তর সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। খ্রীশ্চানরা এই ধারণা নিয়ে চলে, কারণ তারা মনে করে এই একটাই জন্ম হয়েছে। একটাই জন্ম যখন, তখন মনে হয় তাড়াতাড়ি সব লুটেপুটে খেয়ে নাও, এর মধ্যে হঠাৎ মনে হল ভগবান আছে, লুটপুটে খাওয়া যাবে না, বিচিত্র সব চিন্তা-ভাবনা। আমাদের কাছে পরিষ্কার, জন্মের পর জন্ম তোমার ভালো মন্দ সব মিলেমিশে চলছে। যখন তুমি মন্দে আছ তখন মন্দ বলে কিছু নেই, তার মধ্যেও ভালো আছে, যখন তুমি ভালো আছ ভালোর মধ্যেও কিছু নেই, সবটাই ভালো কখনই হয় না, মন্দ থাকবেই। রামের নামেও গালাগাল, কৃষ্ণের নামেও গালাগাল, বুদ্ধের নামেও গালাগাল চিরদিনই থাকবে, কিছু করার নেই। ভালো পড়াশোনা করে গ্রাজুয়েট হয়েছি, মাস্টার ডিগ্রী পেয়েছি, সার্টিফিকেট পেয়েছি, কিন্তু তার মধ্যেও অনেক অজ্ঞান থেকে গেছে, কিছু সুবিধা অসুবিধাও থেকে গিয়েছিল। আত্মজ্ঞান যখন হয় সেখানেও কিছু কিছু জিনিস থেকে যায় তবে সেটা জাগতিক ব্যাপারে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নয়। দ্বিতীয়, সাংসারিক ব্যাপারে তাঁদেরও কিছু কিছু গোলমাল থেকে যায়, সেটাও কোন ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। বিল গেটসের এত সম্পত্তি, তার দশটা কি গোলমাল আছে সেটার দিকে কেউ তাকাতে যাবে না, তার সম্পত্তির দিকেই সবাই তাকায়। ঠিক তেমনি ভগবান বুদ্ধের যে জ্ঞানরাশি, ঐ জ্ঞানরাশির জন্য এখনও এত লোকের মঙ্গল হচ্ছে যে ঐ গোলমালের দিকে কেউ তাকায়ও না। মাঝে মাঝে কেউ কাকের মত কা কা করে। কিন্তু যাঁর জ্ঞান হয়ে গেল, তারপর তিনি উপলব্ধি করেন, বাপরে! এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্ম দিয়ে অনাদি অনন্ত কাল ধরে আমি শরীর ধারণ করে আসছি, আর এই শরীর যে ধারণ করেছি এখন এই জ্ঞান যদি আমি না পেতাম আরও কয়েকটা শরীর আমাকে ধারণ করতে হত। এখন যে প্রারব্ধের জন্য এই শরীর পেয়েছেন এটা এখন momentumএ চলতে থাকবে, যে কর্মগুলো এখন এই শরীরকে চালাচ্ছে, সেই কর্মগুলো আস্তে আস্তে যেই শেষ হয়ে যাবে শরীরটাও খসে পড়ে যাবে। এরপর তিনি যদি ভাবেন, আমার তো হয়ে গেল, এবার এই শরীরকে আত্মাহুতি দিয়ে দিলেই হয়, তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাঁরা তা করেন না, এই জন্যই করেন না, তাঁরা দেখেন আমার কাছে যে জ্ঞানরাশি আছে জগতের হিতার্থে এর দরকার আছে। তিনি তাই শরীরটাকে ধারণ করে রাখেন, কিন্তু ঐ শরীর থাকলেও যা, না থাকলেও তাই। ঠিক এই কথা শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *দেহোহপি দৈববশতঃ খলু কর্ম যাবৎ*। এখানে জ্ঞানীদের কথা বলছেন, অবতার পুরুষদের কথা বলছেন না। স্কুলের ছুটির ঘন্টা পড়ে যাওয়ার পর কোন ছেলেকে যদি দশ মিনিট আটকে রাখা হয়, ওর এটাই মনে হবে কতক্ষণ আর আটকে রাখবে ছুটি তো হয়ে গেছে, কোন ছেলে হয়ত ছটফট করবে, না আমি বেরিয়ে যাই। জ্ঞানীদেরও ঠিক সেই রকম অবস্থা হয়।

তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ, এখন তিনি সমাধিতে ছাড়া আর কিছুতে থাকবেন না। সমাধি মানে ঈশ্বর চিন্তনে লীন হয়ে থাকা। আর বলছেন, *স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ,* সমাধির বিপরীত যে প্রপঞ্চ, যেখানে জগৎ আছে, তিনি আর ঐদিকে যাবেনই না। ঐদিকে যাওয়াটাও তিনি চেষ্টা করে আটকাচ্ছেন না। আগে তিনি চেষ্টা করে করে জগৎ থেকে মন তুলে নিচ্ছিলেন, এখন এটাই তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সমাধির অবস্থায়, ঈশ্বরের চিন্তনে এমন গভীর ভাবে থাকেন যে তখন তাঁর শরীরেরই কোন হুঁশ থাকে না, পরিধান বস্ত্রের কোন হুঁশ থাকে না। এখানে বর্ণনা করছেন মাতালদের যেমন কোন কিছুতে হুঁশ থাকে না। শাস্ত্রের এই বর্ণনা ঠাকুরের জীবনেই আমরা দেখছি। ঠাকুর হৃদয়রামকে জিজ্ঞেস করছেন আজকে অমবস্যা না পূর্ণিমা। হৃদয়রাম বলছেন, যে অমবস্যা পূর্ণিমা জানে না তাকে আবার সবাই অবতার বলে। বার, তিথি, নক্ষত্র কোন কিছুরই তাঁর আর হুঁশ থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন *ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ। জানীত মাহহগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্মবিবক্ষয়া।।১১/১৩/৩৮।।* সাংখ্য এবং যোগের যে গুহ্য কথা সেটাই আমি বললাম। এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চারজন কুমার ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন কিছু প্রশ্ন নিয়ে। ব্রহ্মার মন তখন সৃষ্টি কার্যে হারিয়ে আছে। সেইজন্য ভগবান হংস রূপ ধারণ করে এসে চারজন কুমারের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। *অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্তস্য তেজসঃ। পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্তের্দমস্য চ।।১১/১৩/৩৯।।* জগতে মানুষ অনেক কিছুই করে, যোগ অভ্যাস করে, সাংখ্য অনুশীলন করে আর সত্য, ঋত, তেজ, শ্রী, কীর্তি এবং দম যা কিছু করে এর সব কিছুর পরমগতি, পরম অধিষ্ঠান আমি। একমাত্র বেদান্তই এই কথা বলে, যে কোন মানুষের যে কোন ক্ষেত্রে তার যা কিছু উপলব্ধি হয় তা ঈশ্বরেরই প্রকাশ, ঐ কর্মের মাধ্যমে মানুষ জান্তে বা অজান্তে ঈশ্বরকেই খুঁজছে। গান্ধীজী বলছেন, আমি রাজনীতির মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুঁজছি, দেখছি রাজনীতি দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কিনা। এই কথা হিন্দু ছাড়া কেউ কোন দিন বলতে পারবে না। আমাদের এখানে এমন কোন জিনিস নেই যা দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। যাঁরা উচ্চাঙ্গের নৃত্য করছেন তাঁরা বলেন নৃত্য দিয়েই আমি ঈশ্বরের আরাধণা করে তাঁকে পেতে চাই। গান, চিত্র, স্থাপত্য, যে কোন শিল্প দিয়ে ঈশ্বরের আরাধণা করে তাঁকে পাওয়া যায়। তবে কিছু জিনিস আছে যা দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তি করা যায়, সেগুলো খুব সহজে বলে দেওয়া হয়, যেমন ঠাকুর সত্যকে নিয়ে বলছেন, সত্যই কলির তপস্যা। সত্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় আর যে সত্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, সেই সত্যের কোন দাম নেই। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, কিন্তু সত্য কথা বলতে গিয়ে যদি আমার গলাটাই কাটা পড়ে তাহলে কি করে আর ঈশ্বর দর্শন হবে! ঠাকুরকে এখানে বিরোধ করা হচ্ছে না, সত্যে যদি অবস্থিত না থাকে তাহলে সব এলেমেলো হয়ে যাবে, তখন আর কিছুই হবে না। সেইজন্য শ্রীমাও দেখাচ্ছেন সত্যকে পরিস্থিতি অনুযায়ী কি করে ব্যবহার করতে হয়। মহাভারত আর মনুস্মৃতিতেও বলছেন, কয়েকটি পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলাটাই ধর্ম। স্বামীজী নিজের ভাষণে বার বার বলছেন, আমি ভালো কেন হব, সত্যি কথা আমি কেন বলব। যারা বলে আমি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলি না বুঝবেন সব গোলমেলে লোক। তাদের কাছে সত্যটাই প্রাধান্য হয়ে গেছে, সত্যের যে উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ সেটার আর কোন মূল্য নেই। তোমার সত্যতে যদি তোমার নিজের ক্ষতি হয়ে যায়, তোমার সত্যতে যদি অপরের ক্ষতি হয়ে যায়, ওই সত্যকে নিয়ে কি লাভ! উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর লাভ। স্বামীজী বলছেন, একবার লক্ষ্য ঠিক হয়ে গেলে, আমাকে কি পেতে হবে জেনে নিলে, এরপর আর লক্ষ্যের দিকে তাকিও না, এবার তোমার পথের দিকে যত্ন নাও, কিভাবে এগোচ্ছ সেদিকে তাকাও বাকি সব নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। মূল্যবোধ জিনিসগুলো খুবই গোলমেলে। মহাভারতে বার বার বলছেন, *গহনা ধর্মো গতিঃ,* ধর্মের গতি খুব গহন। একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেছে সেখানে সত্যি কথা বলব কি বলব না। এখানে তেজের কথা বলছেন, মানুষের মধ্যে যে তেজ থাকে, তেজ কখনই উদ্দেশ্য নয়, তেজের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। তেজ যদি ঈশ্বর লাভের দিকে না নিয়ে যায় তাহলে সে একটা রাবণ কিংবা আলেকজাণ্ডার হয়ে যাবে। কেউ কবিতা লিখছে, সাহিত্য রচনা করছে, তারও উদ্দেশ্য হবে কবিতা রচনার মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ করা। যদি তা না হয় একজন সাহিত্যিক কবি হয়েই সে থেকে যাবে। সত্যকে নিয়ে যখন বলা হচ্ছে, তখন সেখানেও একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, সত্য কথা

বলাটা উদ্দেশ্য নয়। তপস্যা করা, বিদ্যার্জন করা, দান করা, যা কিছুই করছে সব কিছুরই পরমগতি একমাত্র ঈশ্বর। শাস্ত্র ঠিক জানা না থাকলে আমরা প্রায়ই এই ভুল করে থাকি। ধারণা গুলোও ভুলভাল হয়ে যায়, তখন সত্যের উপরই জোর এসে যায় ঈশ্বরে দিকে জোর থাকে না।

এই কথা বলার পর ভগবান বলছেন, দেখ আমি ত্রিগুণাতীত, নিরপেক্ষ কিন্তু বেশ কিছু গুণ আছে যা আমারই সেবা করে, যেমন অনাসক্ত, যে আমারই সেবন করে। এর মধ্যে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল, ভগবান বা ব্রহ্ম যে শব্দই নেওয়া হোক না কেন, তিনি সরাসরি যেভাবে আছেন সেইভাবে তাঁকে আমরা কোন দিন ধারণা করতে পারব না। ভগবানকে ধারণা করার জন্য তাঁকে কিছু গুণ দিতে হয়। গুণ ছাড়া আমরা ধারণা করতে পারি না। সেইজন্য বিভিন্ন ধর্মে বলা হয় তিনি প্রেমস্বরূপ, তিনি ন্যায়পরায়ণ, তিনি কর্মবিধাতা কর্মের ফল দেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি নির্গুণ নিরাকার। ভগবান উদ্ধবকে বলছেন, এইভাবে আমি সনকাদি মুনিদের সংশয় নিরসন করেছিলাম।

ভক্তিযোগের মহিমা ও ধ্যানবিধির বর্ণনা

এরপর চতুর্দশ অধ্যায়ে উদ্ধব আবার প্রশ্ন করছেন 'হে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা আত্মকল্যাণের জন্য অনেক পথের কথা বলে গেছেন। আপনি আমাকে বলুন শ্রেষ্ঠ পথ কি। আর আগেও আপনি বলেছিলেন ভক্তিযোগ খুব ভালো, এই ব্যাপারেও যদি কিছু বলেন'। এতক্ষণ সাংখ্য আর যোগের কথা বললেন। এখান থেকে ভক্তির কথা শুরু করছেন। বেদান্ত বোঝার জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার, ভক্তিতে সাধকের হৃদয় না খুলে থাকলে ভক্তিশাস্ত্রের কোন কথাই ধারণা করা যাবে না। বেদান্তে বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করতে হয়ে আর ভক্তিতে হৃদয়কে পুরো খুলে দিতে হয়, হৃদয় না খুলে দিলে ভক্তি উপাচার সর্বস্ব হয়ে দাঁড়াবে।

ভগবান তখন বলছেন *কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াহহদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।১১/১৪/৩।।* এই শ্লোকগুলোই পরে পরে প্রচলিত কথার মধ্যে এসে গেছে। এক সময় ছিল যখন বেদের জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টির সময় যখন হয় তখন ব্রহ্মাকে আমিই এই উপদেশ দিয়েছিলাম। এই জিনিসগুলো অনেক রকম কাহিনীর মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়। কেন আনা হয় বলা খুব মুশকিল। একটা হল সৃষ্টির আরম্ভে তিনি বলেন। আর গীতাতেও ভগবান বলছেন আমিই প্রথম স্বয়ম্ভূকে এই জ্ঞান দিয়েছিলাম। ধর্মের শেষ কথা ভগবান ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। মন দিয়ে চিন্তন করে ধর্ম কখনই আসবে না। ধর্মের জ্ঞান যখন লুপ্ত হয়ে যায়, তখন অবতার রূপেই হোক বা ভগবান স্বয়ং এই উপদেশ দেন। এরপর ভগবান বিরাট লম্বা তালিকা দিয়ে বলছেন, তিনি কিভাবে ব্রহ্মাকে উপদেশ দিলেন, ব্রহ্মা আবার মনুকে দিলেন, সেখান থেকে পর পর নীচে নামতে নামতে বলছেন, এই যে পর পর বেদের জ্ঞান নামতে নামতে বিভিন্ন লোকের কাছে যাচ্ছে, এই জ্ঞান বিভিন্ন লোক তাদের স্বভাব ও বুদ্ধি বৃত্তির অনুসারে গ্রহণ করে। সেখান থেকে বেদের জ্ঞানে অনেক ভুলভাল জিনিস ঢুকে যায়, কেউ কেউ আবার খুব নিষ্ঠা নিয়ে ধরে রাখেন, আবার অনেক জায়গায় বেদ বিরোধী কথাও প্রচলিত হয়ে যায়। আচার্য শঙ্করও বলছেন, উত্তম শিষ্যকে একবার বললেই ধারণা করে নেয়, মধ্যম শিষ্যকে নানান ভাবে বোঝাতে হয় আর অধম শিষ্য বিপরীত বুঝে নেয়। এসবের জন্য ধর্মের কথায় অনেক রকম বিরোধ লেগে যায়, কিছু করার নেই, এভাবেই চলে এসেছে আর এভাবেই চলবে। কিছু দিনে আগে কোন বাবাজীকে পুলিশ গ্রেফতার করে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে আর হাজারে হাজারে ভক্তরা গুরুকে ঘিরে রেখেছে তাঁকে নিয়ে যেতে দেবে না। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছাড়ছে, ভক্তদের থেকে আবার পুলিশের দিকে গুলি ছুড়েছে। যে গুরুকে রক্ষা করার জন্য গুলি চালাতে হয় সে কিসের গুরু। কোথাও ধর্মের একটা গোলমাল হয়ে গেছে। আরেক বাবাজী ব্যবসা করে কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে, তাকে আবার সরকার জেড ক্যাটাগরির সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছে। কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায়। এই গোলমাল আজকেই হচ্ছে না, ভাগবতেই বলে দিচ্ছেন এই গোলমাল হয়, আর চিরদিনই এই গোলমাল হয়ে আসছে। আচার্য শঙ্কর অবতারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটাই বলছেন, কালে বিভিন্ন রকম কামনা-বাসনার জন্য ধর্মটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়, তখন ভগবানকে আসতে হয়।

ভগবান তখন উদ্ধবকে বলছেন *এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে।।১১/১৪/৮।।* স্বভাব ভেদে এবং পরম্পরার ভেদে অনেক রকম বৈপরীত্য এসে যায়। মানুষের স্বভাব সব সময় পাল্টাতে থাকে, যাঁরা আচার্য হন তাঁদেরও স্বভাব পাল্টাবে, আজকে তিনি যে কথা বলছেন, কাল তিনি যে একই কথা বলবেন তার কোন ঠিক নেই, কিন্তু শেষ কথা বা মূল কথা কখনই পালটানো যাবে না, কিন্তু তার বিস্তার আর কিছু কিছু বর্ণনা পাল্টাবে। এটা যেমন স্বভাবে পাল্টাচ্ছে, আবার কিছু কিছু জিনিস পরম্পরার জন্যও পাল্টায়। ঠাকুরের পরম্পরায় যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁদের জীবন এক ধরণের চলবে আর যাঁরা ইসকনে বড় হয়েছেন তাঁদের জীবনধারা অন্য ধরণের চলবে। বলছেন, *মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরষর্ষভ। শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি।।১১/১৪/৯।।* যত মানুষ আছে সবারই বুদ্ধি আমারই মায়াতে মোহিত হয়ে আছে। মোহিত হওয়ার জন্য নিজের নিজের কর্মসংস্কার অনুযায়ী তাদের নিজের নিজের আত্মকল্যাণের সাধনমার্গও আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। দুজনের সাধনমার্গ কখনই এক হবে না। একটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে দীক্ষা দিতে নিষেধ করেছিলেন, স্বামীজী বলেছিলেন, তোর শিষ্য আর অন্য শিষ্যদের মধ্যে ঝগড়া হবে। স্বামীজীর আশেপাশে বিদেশিনী মহিলা ভক্তরা থাকতেন। স্বামীজীর এক গুরুভাই স্বামীজীকে বলছেন, তুমি এভাবে কেন থাকছ, ঠাকুর তো মেয়েদের দিকে তাকাতেও নিষেধ করেছেন। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুর তোকে বারণ করেছিলেন, আমাকে বারণ করেননি। সবারই সাধন যে এক রকম হবে তা নয়, কারণ সবারই কর্মসংস্কার এক রকম নয়। কর্মসংস্কারকে নির্মূল করার জন্য সবাইকে যে একই রকম লড়াই করতে হবে তাও নয়। আর বলছেন *ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্। অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্।।১১/১৪/১০।।* পূর্বমীমাংসকদের অনুগামীরা যজ্ঞকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, সাহিত্য অনুরাগীরা যশকে, কামশাস্ত্রের পথিক কামকে, যোগ পথের পথিক সত্য ও ইন্দ্রিয়দমনকে, দণ্ডনীতি পথের পথিক ঐশ্বর্যকে, ত্যাগী ত্যাগকে এবং লোকায়িত ধর্মীরা ভোগকেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও পরমলাভ মনে করে। *কেচিদ্ যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্। আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ। দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ।।১১/১৪/১১।।* বলছেন, কর্মযোগীরা বলেন, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, যম, নিয়ম এগুলোই ঠিক ঠিক পুরুষার্থ। কিন্তু উদ্ধব তুমি একটা জিনিস জেনে রেখো এর সব কিছুর পরিণতি হয় স্বর্গলোকে। এগুলো তোমাকে শেষে স্বর্গে নিয়ে যাবে। সেই অর্থে যজ্ঞ, দান, ব্রত যা কিছু হয় এগুলো ঘোর অজ্ঞানের জিনিস। অজ্ঞান কি অর্থে? এতে তার স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। স্বর্গ প্রাপ্তিতে তার আরও অনেক দুঃখের দিন বাড়ল, আরও অনেক দিন তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরে বেড়াতে হবে। দেখো উদ্ধব এই জিনিস গুলো আরও দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। যাঁরা ঠিক ঠিক বোঝেন, এগুলোতে অনেক যন্ত্রণা, তাঁরা এর সব কিছু থেকে সরে আসেন। উদ্দেশ্য হল বেরিয়ে আসা। ঠাকুর কোথাও কোথাও গৃহস্থ ভক্তদের বলছেন তোমাদের জন্য দুটোই, এও কর ওও কর, কারণ প্রথমেই তাদের সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বললে ছিটকে যাবে, তখন যাও কিছু হওয়ার ছিল সেটাও তাদের কিছুই হবে না, তাই ঠাকুর এভাবে বলছেন। কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের ব্যাপারে বা জ্ঞানের ব্যাপারে কখনই দুটো একসাথে হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেসঃ। ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।।১১/১৪/১৩।।* সত্যিকারের যে সব দিক থেকে নিরপেক্ষ হয়ে গেছে, কারুর কাছে কোন অপেক্ষা রাখে না, কোন ধরণের কর্তব্য বোধ থাকে না, কোন কাজ বা কাজের ফলের দিকে তার আগ্রহ থাকে না, আর নিজের অন্তঃকরণকে সর্বতো ভাবে আমাতে অর্পিত করে রেখেছে, এরা যে ধরণের সুখ পায়, ইন্দ্রিয়সুখে যারা জড়িয়ে আছে তারা এই সুখ কোন দিন পাবে না। *অকিঞ্চনস্য*, যার টাকা পয়সা নেই, *দান্তস্য, শান্তস্য*, যারা ইন্দ্রিয়কে সংযম করে নিয়েছে, মনকে শান্ত করে নিয়েছে, সব দিকে সমবুদ্ধি। আগেকার দিনে বলত, ভারত দরিদ্র দেশ হতে পারে, ভারতের মানুষ গরীব হতে পারে কিন্তু এখানকার লোকেদের ভেতর শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু এটা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভারতের ইতিহাসের যে পাতাই খোলা হোক দেখা যাবে এই দেশে মারামারি কাটাকাটি ছাড়া কিছু ছিল না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করছি এই নাম করে কিভাবে সারা দেশ থেকে ছিনতাই, লুটপাট করার জন্য লোকেরা জড়ো হয়ে যেত আর নিজেদের লোকেদেরই লুট করত।

সারা দেশে নামকরা নামকরা ডাকাতরা থাকত। আর যারা একেবারে অসহায় তারাই শুধু শান্ত থাকত। কিভাবে শান্ত থাকত? *ময়া সন্তুষ্টমনসঃ*, এর মধ্যে crucial term হল ময়া সন্তুষ্টমনসঃ, আমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট, ঈশ্বরকে নিয়ে সন্তুষ্ট। নিজের অন্তঃকরণে যদি ঈশ্বরকে নিয়ে সব সময় না থাকতে পারে তার অশান্তি কোন দিন ঘুচবে না, তা সে যতই যজ্ঞ করুক, তপস্যা করুক, দান করুক, ব্রত করুক। আর যে ইন্দ্রিয়কে সংযম করে নিয়েছে, মন শান্ত করে নিয়েছে, সমবুদ্ধি করে নিয়েছে অথচ অকিঞ্চন সে কি খুশী থাকবে? থাকবে যদি তার মন ঈশ্বরে থাকে। যদি বলা হয়, টাকা-পয়সাও হোক আর ঈশ্বরেও মন থাকুক? রাজা জনক তো ছিলেনই। কিন্তু সাধারণ ভাবে এটা সম্ভব এই জন্যই হবে না, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি থাকার জন্য অনেক কাজকর্ম বেড়ে যায়। বেশি কাজকর্মে জড়িয়ে গেলে পুরোপুরি ঈশ্বরে মন রাখা কঠিন। এখানে অকিঞ্চন হওয়াটা প্রধান নয়, প্রধান হল ধীরে ধীরে নিজের মনকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া।

এরপর ব্যাখ্যা করছে অকিঞ্চন কাকে বলে আর কিভাবে ইন্দ্রিয়কে জয় করে নেওয়া হয়। *নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ।।১১/১৪/১৬।।* যদি কোথাও দেখ এমন লোক যে কারুর কাছে কোন অপেক্ষা রাখে না, জগতের চিন্তা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছে, সবার প্রতি সমান দৃষ্টি আর তার সাথে আমারই চিন্তন মননে একেবারে ডুবে আছে ইত্যাদি বলে ভগবান বলছেন, তুমি মনে রেখো এরা হাঁটার সময় যে ধুলো উড়বে আর সেই ধুলো যদি আমারই গায়ে এসে পড়ে তাতে আমি পবিত্র হয়ে যাব। আসলে বলতে চাইছেন এই ধরণের ভক্ত প্রায় দুর্লভ। আর যদি এই ধরণের ভক্তের সাথে কারুর যোগাযোগ হয়ে যায় সে ধন্য হয়ে যাবে। এর সাথে বলছেন *বাধ্যমানোহপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।।১১/১৪/১৮।।* অজিতেন্দ্রিয় মানে এখনও যার ইন্দ্রিয় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। যোগ প্রথমেই বলে দেবে শম দম ছাড়া যোগ করা যাবে না। কর্ম করতে গেলেও প্রথমে মনের নিয়ন্ত্রণ দরকার। আর বেদান্ত প্রথমেই বলে দেবে *ইহামুত্রফলবিরাগ*, এই জগতের সুখ আর মৃত্যুর পর স্বর্গের সুখ, এই দুটো লোকের ফল কামনা ত্যাগ করতে হবে। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এগুলো যেন আগেই হয়ে গিয়ে থাকে। যদি না হয়ে থাকে তাহলে সাধনা তো অনেক দূরের কথা তার আগে বেদান্তের কিছুই বুঝতে পারবে না। ভক্তিতে যে আসতে চাইছে তাকে প্রথমে এত কিছু করতে হয় না। কারণ ভালোবাসাটা সবাই জানে ও বোঝে। ছোটবেলা থেকে বাবা-মাকে ভালোবেসে এসেছে, বাবা-মা, দাদু ঠাকুরমার ভালোবাসা পেয়েছে, বড় হয়ে বন্ধুদের ভালোবেসেছে। বিবাহের পর স্ত্রীকে ভালোবাসে, স্ত্রীর ভালোবাসা পায়, তারপর সন্তানকে ভালোবাসে। ভালোবাসাটা মানুষ জানে, তার সাথে এটাও জানে আমার ভেতরে অনেক কামনা-বাসনা আছে, অনেক দুর্বলতা আছে, এগুলোকে আমি ছাড়তে পারব না। সবাই বলে ঈশ্বরকে তো ভালোবাসতে চাই, কিন্তু সংসারটাও তো চাই। যোগে প্রথমেই বলে দেবে সংসার-ফংসার ভুলে যাও। আর জ্ঞানযোগে তো সংসারের কোন প্রশ্নই নেই, সংসারের সাথে কোন সম্পর্ক আছে তো তোমার জন্য জ্ঞানযোগ নয়। কিন্তু ভক্তিযোগ সবার জন্য খুলে দিয়েছে। যে বলছে আমার দ্বারা সংসার ত্যাগ হবে না, আমি সবাইকে নিয়ে থাকতে চাই কিন্তু ঈশ্বরকেও চাই। তখন বলবে তোমার জন্য ভক্তিযোগ। এটা কি সম্ভব? তাহলে ঠাকুর কেন বলছেন জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই, জ্ঞানযোগ যেখানে নিয়ে যায় ভক্তিযোগও সেখানেই নিয়ে যায়? অন্য পথের যে সাধনা তার সাথে ভক্তি পথের সাধনা তো পাল্টে গেল, তাই যদি হয় তাহলে তো জ্ঞানযোগ এক জায়গায় নিয়ে যাবে ভক্তিযোগ আরেক জায়গায় নিয়ে যাবে। আসলে তা নয়, ভক্তি পথে প্রথমে শুরু করার সময় সংসারও রাখতে পারে, কিন্তু ভক্তির গভীরে যত প্রবেশ করতে থাকে, ঈশ্বরের প্রতি একটা তীব্র ভালোবাসা এসে গেলে সংসার নিজেই খসে পড়ে যায়। ভক্তিযোগ প্রথমে সাধকের কাছে বেশি কিছু চায় না। তন্ত্র সাধনেও ঠিক একই জিনিস হয়। তন্ত্রও প্রথমেই সব কিছু ছেড়ে দিতে বলে না, ওরা জানে মানুষ পারবে না। কিন্তু জ্ঞানযোগ, রাজযোগ সাধারণদের জন্য নয়, পুরো প্রস্তুতি না হয়ে থাকলে হবে না। ভক্তিকে তাই সহজ পথ বলা হয়। তোমার যা কিছু আছে কোনটাই ছাড়তে হবে না, সব নিয়েই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে থাক। এবার যেমন যেমন ভক্তিতে এগোতে থাকবে তত সংসারটা আলুনি হয়ে আসবে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, মেয়েরা বাচ্চা বয়সে পুতুল নিয়ে খেলা করে, বড় হয়ে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুতুলগুলোকে

বাক্সের মধ্যে রেখে তুলে রাখে। তার আবার যখন বাচ্চা হবে তখন সে আবার ঐ পুতুলগুলোকে বার করবে। জীবনের যে নানা রকমের খেলা এটাই পুতুল খেলা, ভক্তির দিকে যত এগিয়ে যায় তত তার পুতুল খেলা পেছনে খসে পড়ে যেতে থাকে।

এই শ্লোকে ভগবান বলছেন, যে অজিতেন্দ্রিয়, এখনও নিজের মনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি সেও যদি আমাকে ভক্তি করে এগোতে চেষ্টা করে, তারও কামনা-বাসনা গুলো খসে পড়ে যায়, সেও ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসে। একটা জায়গায় বৈষ্ণবরা কীর্তন করছে, তাদের সবার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। সেখানে একজনের কিছুই হচ্ছিল না। হঠাৎ তার নিজের উপর খুব ধিক্কার এসে গেল, আমি কেমন অভাগা, কীর্তন করে সবারই চোখে জল আসছে, ভাব হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে আর আমার কিছুই হচ্ছে না! ওখান থেকে উঠে লোকটি বাড়ির ভেতরে গিয়ে লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে চোখের মধ্যে দিয়েছে, লঙ্কার জ্বালায় তার জল বেরোতে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের মনে হবে এটা তো ভক্তিতে চোখের জল বেরোল না, অন্য ভাবে জল বার করান হল। ঠিকই ভক্তির অশ্রু নয়, কিন্তু তার নিষ্ঠাটা দেখার। এই নিষ্ঠা যার এসে গেছে, তার আর বেশি দেরী হবে না, আজ কিংবা কাল ভাব, ভক্তি সব পেয়ে যাবে। আগুনের লেলিহান শিক্ষা যেমন স্তুপীকৃত কাঠকে মুহূর্তে ভস্ম করে দেয় ঠিক তেমনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সব পাপরাশিকে পুড়িয়ে দেয়।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ খুব নামকরা একটা কথা বলছেন, এই কথা আগেও এসেছে পরেও আবার আসবে। *ন সাধয়তি মাং যোগ ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।১১/১৪/২০।।* এখানে একটা শব্দ বলছেন উর্জিতা ভক্তি, অনেক উজ্জ্বিতা ভক্তি বলে। উর্জিতা ভক্তি মানে প্রেমা ভক্তি বা অনন্যা ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কেউ যদি যোগ সাধন করে বা কেউ যদি সাংখ্য যোগের সাধন করে, সাংখ্য মানে জ্ঞান বিচার বা জ্ঞানযোগ বা যদি কেউ ধর্ম সাধন করে, ধর্ম সাধন মানে জপ, ধ্যান, পূজা, তীর্থাদি বা যদি কেউ স্বাধ্যায় করে, খুব মন দিয়ে শাস্ত্র পাঠ বা অধ্যয়ন করছে, এগুলোর দ্বারা ঐভাবে অত সহজে আমাকে পাওয়া যাবে না, যত সহজে উর্জিতা ভক্তি দিয়ে আমাকে পাওয়া যায়। তবে এই কথার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যায়। উর্জিতা ভক্তি হয়ে যাওয়া মানে সে এখন অন্য এক স্তরে চলে গেছে, কিন্তু জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়ের কথা যখন বলছেন তখন এগুলো বৈধী ভক্তির মধ্যে পড়ছে। ভক্তি দুই প্রকার বৈধী ভক্তি আর প্রেমা ভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি। বৈধী ভক্তি মানে যেখানে বিধি আছে, বিধি মানে আমাকে এত জপ করতে হবে, গঙ্গাস্নান করতে হবে, তুলসী পাতা খেতে হবে, সবই বিধিযুক্ত। বিধি সাধককে একটা স্তর থেকে নীচে পড়তে দেয় না, কিন্তু বেশি দূর নিয়েও যেতে পারবে না। আমাদের দেশের আগেকার দিনের বিধবারা আর আচারী ব্রাহ্মণরা ছিলেন বৈধী ভক্তির একেবারে একনিষ্ঠ সাধক। বৈধী ভক্তি সাধকের চরিত্র, মনের ভাবকে একটা অবস্থার নীচে নেমে আসা থেকে আটকে রাখে। বৈধী ভক্তি মানেই তার ভেতরে এখনও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসেনি। ভগবান এখানে প্রেমাভক্তির কথাই বলতে চাইছেন। বৈধী ভক্তি যেমন বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না, তেমনি অন্যান্য ধরণের যে সাধনা আছে সেগুলোও বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে না। জপও বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না, সকাল বিকেল ধ্যান করাও পারবে না, নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করেও পারবে না, কেউই পারবে না। এখানে উর্জিতা ভক্তির সাথে বাকি সব কিছুর তুলনা করছেন। আগে তুমি দেখ তোমার ভেতরে কোন গোলমাল আছে কি নেই। যে কাজ সব জায়গায় সব সময় করা যায় ওটাই ঠিক কাজ, ওর বাইরে সবটাই গোলমেলে কাজ। যেমন দোকানদার মিথ্যা কথা বলে একজন সরল সহজ ক্রেতা দেখে তাকে বোকা বানাচ্ছে, কিন্তু পাড়ার মস্তানের কাছে মিথ্যা কথা বলবে না। কোন ছেলে মেয়েদের দেখলে টিটকারি মারে, কিন্তু সে যখন তার মা বোনের সাথে থাকে তখন টিটকারি মারতে পারে না, তার মানে গোলমেলে কাজ করছে। কিন্তু ধ্যান আমরা সব জায়গাতে যে কোন সময় করতে পারি। তাই বলে পার্টিতে নাচ, গান, হৈ হুল্লোর হচ্ছে সেখানে কেউ ধ্যান করতে যাবে না, স্থান, কাল, পাত্র দেখে নিতে হয়।

যদি দেখা যায় আমার ভেতরে দোষ-ত্রুটি আছে, মন পরিষ্কার নয়, তাহলে আমি যে জপ-ধ্যান করছি, মন্দিরে যাচ্ছি, এগুলো আমাকে আর সাহায্য করবে না। আমাকে এখন ভক্তি পথে ঢুকতে হবে। হিন্দু ধর্মে কাউকে বলা হয় না যে, তোমার দ্বারা হবে না। কোন না কোন পথ তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়, যে পথ দিয়ে সে

এগিয়ে যেতে পারে। ভক্তি পথ তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এরপর সে বৈধী ভক্তি করছে, মাথা ঠুকছে আমার হচ্ছে না, ঠাকুর আমাকে রক্ষা কর। হয়ত সে মিথ্যা কথাই বলছে, ভেতরে কোন নিষ্ঠা নেই, তাতে কোন দোষ নেই। বৈধী ভক্তি করতে করতে হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জেগে যায়। স্বাধ্যায় বা জপে এই জিনিস হবে না। একজন রোজ তিন ঘন্টা ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যাচ্ছে কিন্তু তার ভেতরে অনেক গোলমাল, আর অন্য দিকে আরেকজন ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে ঠুকে ভক্তি করে, কিন্তু সেও ভেতরে ভেতরে গোলমেলে। এই দুজনের মধ্যে কোনটা হওয়া ভালো? জপ, ধ্যান, শাস্ত্র অধ্যয়ন সাত দিন করতে না করতেই অহঙ্কার এসে যাবে, অহঙ্কার আসবেই, এর কখনই অন্যথা হয় না। কিন্তু সে জানে আমার ভেতর অনেক গোলমাল আছে, গোলমাল থেকে আমি বেরোতে পারছি না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে কাঁদতে কাঁদতে তার মধ্যে বিনয় আসতে শুরু হয়। এই নিয়ে অনেক কাহিনী আছে, একজন ফকির ছিল আর তার কুঠিয়ার সামনে এক নষ্টা মেয়ে থাকত। ফকির বসে বসে রোজ হিসেব রাখত আজ কটা খদ্দের ওর কাছে এসেছে। পাথরের ঢিপি জমে গেছে। ফকির বলছে, তোমার তো নরকেও স্থান হবে না। আর মেয়েটি রোজ ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করত, হে ঠাকুর! পেটের দায়ে আমাকে এই নোংরা কাজ করতে হচ্ছে, না করলে আমি কি খাব, আমার তো কোন পথ নেই। মরার সময় দুজন একসাথেই মরল, তখন দেখা গেল আল্লার দূত এসে মেয়েটিকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে আর ফকিরকে নরকে নিয়ে যাচ্ছে। ফকির বলছে, তোমাদের ভুল হয়ে গেছে। আল্লার দূতরা বলছে, আমাদের কোন ভুল হয়নি, তোমার মনটা সব সময় পাপেই ভর্তি ছিল। আসলে ঠিক পাপে ভর্তি ছিল না, ফকিরের অহঙ্কার ছিল। কথামৃতে মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে সাধুরা আসছে, তারা পায়ের উপর পা তুলে বসে ঠাকুরকে বলছে, বোলো ক্যায়সা হ্যায়। কোন দোষ নয়, কারণ ওরা চলেই self-confidenceএর উপরে, জ্ঞানী মাত্রেই self-confidenceএ চলবে, আর ভক্ত মানেই বিনয়। কিন্তু সব সময় যে বিনয় থাকবে তা নয়, ঠাকুর হৃদয়ের সাথে এর ওর কাছে যখন যাচ্ছেন তখন কেমন একটা বাচ্চা ছেলের ভাব ঠাকুরের। কিন্তু যেমনি ধর্মের বিষয় শুরু হল তখন ঠাকুরের পরাক্রমটা বেরিয়ে আসছে, ওই জায়গাতে আর কোন ছাড়াছাড়ি নেই। এই যে এখানে বলছেন, উর্জিতা ভক্তির দিকে যখন সাধক যায়, ঐ ইচ্ছাটুকু যদি থাকে তাহলে খুব সহজে ভক্তি হয়। এখানে কিন্তু তার আগে শর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন অজিতেন্দ্রিয়।

ভগবান বলছেন, যাঁরা আমাকে অনন্যা ভক্তি করে আমি তাদেরকেই ধরা দিই। এখানে কোন পূর্বাশর্ত থাকে না। গীতার নবম অধ্যায়ে ভক্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় ভগবান বলছেন, চণ্ডাল হোক, স্ত্রী হোক, ভক্তি কোন শর্ত লাগায় না, ভক্তির একটাই শর্ত ভালোবাসা। অনন্যা প্রেম যদি নাও হয়, সংসারকে যদি রাখতেও চায় রাখুক, তাতে দোষ নেই, শুধু একটাই, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শুরু করুক। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন, *ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি।।১১/১৪/২২।।* অন্য দিকে যদি সদ্‌গুণ থাকে কিন্তু আমার প্রতি ভক্তি নেই, ওর কিন্তু ধর্মও হবে না, বিদ্যাও হবে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুক, বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকুক, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি যদি না থাকে তাহলে কোনটাই কিছু না। আর বলছেন *কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনাঽঽনন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাঽঽশয়ঃ।। ১১/১৪/২৩।।* যতক্ষণ এই শরীর আছে, তাঁর নাম নিয়ে এই শরীরে যদি রোমাঞ্চ না হয়, তাঁর নামে শরীর যদি রোমাঞ্চিত না হয়, মন ভাবে গদগদ না হয়ে যায়, চোখ আনন্দাশ্রুতে যদি প্লাবিত না হয় আর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তি প্লাবনে মনে উথালপাতাল ভাব না জাগে ততক্ষণ তার শুদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথম শুরু করেছিলেন অজিতেন্দ্রিয়দের নিয়ে, মনে যাদের কামনা বাসনা আছে। কিন্তু কি করে বুঝব যে আমার মনের কামনা বাসনা চলে গেছে? ঠাকুর বলছেন, তাঁর নাম নিলেই যার শরীরে রোমাঞ্চ হয় আর চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু নির্গত হতে থাকে, তখন বোঝা যায়। সমস্যা হল, যে কোন ক্ষেত্রে যারা বড় হন তাঁদেরকে সাধারণরা সব দিক থেকে নকল করে। বাচ্চা ছেলে সব সময় তার বাবাকে নকল করে, বাবা কি করে জামা পড়ে, বাবা কিভাবে হাঁটে, বাবা কিভাবে বসে। স্কুলের শিক্ষকরা যা যা করে ছাত্ররাও তা নকল করে। আর আধ্যাত্মিক গুরুরা যা যা করেন তাঁর শিষ্যরাও গুরুর নকল করে। এখানে বলছেন, *কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা*, তাঁর নাম নিলে শরীরে যদি রোমাঞ্চ না হয়, চোখ দিয়ে জল যদি না বের হয়।

এগুলোই আবার ভক্তিতে বিরাট সমস্যা তৈরী করে। গান-বাজনার সময় মনের ভাব অন্য রকম হয়ে যায়, একটা ছন্দে চলে আসে। যদি কেউ ভক্তির গান করে, অনেক বছর ধরে করে যাচ্ছে আর এটাই তার জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে, তখন এগুলোই কৃত্রিম ভাবে উঠতে শুরু হয়ে যায়। এখানে হয়ত ঢং ঢাং হচ্ছে না, সত্যিকারেরই হচ্ছে, কিন্তু যে প্রস্তুতি তাকে উপরে নিয়ে যাবে সেই প্রস্তুতিটা থাকে না।

দশজন কলেজের বন্ধু আরও অনেকের সাথে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করতে করতে প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে এগোচ্ছে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ হতে হতে কেউ বলে উঠল প্রিন্সিপালকে মারো ঢিল, এরপর সবাই মারতে শুরু করে দিল, তার মধ্যে আমিও হয়ত একটা ঢিল মেরে দিলাম। সাধারণ অবস্থায় আমি কিন্তু কখনই এই কাজ করতাম না, করতে পারবও না। মারার পর হঠাৎ মনে হবে, এ আমি কি করলাম! ওখানে তখন একটা টেম্পো উঠে গিয়েছিল। বেশির ভাগ পলিটিশিয়ানরা এটাই করে, একটা টেম্পো তুলে দেবে, টেম্পো তুলে দিয়ে একটা মোমেন্টারি সাহস তৈরী করে দেবে। দেখা যায় কিছু কিছু এমন পরিস্থিতি আসে, পরিস্থিতিবশাৎ প্রচণ্ড সাহস করে ফেলে, তার ভেতরে আসলে কোন সাহস নেই। ঐ সাহসটা তখন সত্যিকারের, যার জন্য কাউকে সে মেরে দিতে পারে, নিজেও মরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এগুলো সাময়িক, পরিস্থিতি তাকে এই রকম বানিয়ে দেয়। ভক্তিতে ঠিক এই সমস্যা হয়। ভক্তি করার জন্য একটা প্রস্তুতি দরকার পড়ে, ভক্তিতেও অনেক ধরণের প্রস্তুতি আছে। ঐ প্রস্তুতি না নিয়ে যদি *কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা* এতে নেমে পড়ে, খুব বিপদ হয়ে যাবে। আর তখন মনটাও সত্যিকারের উঠে যায়, মনে তখন অন্য কোন ভাব থাকে না। খুব উচ্চাঙ্গের কীর্তন হচ্ছে, কথা, সুর, তাল, লয় এমন উচ্চমানের যে বৈষ্ণবদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসবে, যে বৈষ্ণব নয় তারও মন থেকে সেই সময় সংসার খসে পড়ে যাবে। কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর মনটা এবার যখন নীচে নামবে, তখন তাকে এক মহাভোগী, মহা বিষয়ী বানিয়ে ছেড়ে দেবে। বৈষ্ণবরা এটা করবেই, কারণ তারা গুরুজনদের করতে দেখেছে, গুরুকে করতে দেখেছে।

স্বামীজী তাঁর গুরুভাই আর সাধুসন্ন্যাসীদের বলে দিলেন, বেলুড় মঠ যেন বাবাজীদের আখড়া না হয়। বাবাজীর আখড়া মানেই কীর্তন। এখনও রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে কীর্তনের প্রথা নেই। বেশির ভাগ বাবাজী, মহাত্মারা কোথাও না কোথাও তাঁদের প্রথায় কীর্তনকে ঢুকিয়ে দেন। লোকেরা যেমন ড্রাগস নেয় কীর্তনাদি হল আধ্যাত্মিক ড্রাগস। ওতে একবার যদি কারুর নেশা হয়ে যায়, সে বার বার ওখানেই যেতে চাইবে। শুধু যে কীর্তনেই এই জিনিস হয় তা নয়, যে কোন ক্ষেত্রে যেখানে খুব বেশি ইমোশান চলতে থাকে, ইমোশান চলে গেলে সে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে সোজা নীচে এসে ধপাস করে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ আর বলছেন *বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।।১১/১৪/২৪।।* আমার ভক্ত সংসারকে পবিত্র করে দেয়। আমরাও তাই দেখি, ঠাকুর জগতকে পবিত্র করলেন, যীশুও তাই করলেন, ভগবান বুদ্ধও তাই করলেন। কিন্তু তাঁদের পথ আলাদা। এখানে ভক্তি পথের যিনি তাঁর কথা বলছেন, প্রেমে তাঁর বাণী রুদ্ধ হয়ে যায়, মন দ্রবিত হয়ে জলের ধারার মত আমার দিকেই প্রবাহিত হতে থাকে, কখন সে কাঁদছে আবার কখন খিল খিল করে হাসতে থাকে, এই হাসছে, এই কাঁদছে। কিন্তু যেটা আরও আশ্চর্যের, কোন লজ্জার ভাব থাকে না, লোকে কি বলবে, আমাকে সবাই কি ভাববে, এই ভাবগুলো থাকে না। এগুলোই উর্জিতা ভক্তির লক্ষণ, এখানে কোন গায়ক, শ্রোতা, দর্শক কেউ নেই। দেখতে হবে একা থাকলে এই ভাবগুলো হয় কিনা। জোসেফিন ম্যাকলাউডের জীবনে একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে। তিনি জীবনে বিয়েথা করেননি। স্বামীজীকে তিনি চিরদিন my friend বলতেন, দীক্ষাও নেননি। একবার উনি বেলুড় মঠের গেস্ট হাউসে আছেন। একজন মহারাজ কোন কারণে ম্যাকলাউডকে ডাকতে গেছেন। দরজা বন্ধ, জানলাটা একটু খোলা ছিল সেখান দিয়ে তিনি দেখছেন, স্বামীজীর ছবিকে খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ছবির সামনে উনি একা একা নৃত্য করে যাচ্ছেন। মহারাজও জানলা দিয়ে দেখছেন। জানলার দিকে চোখ পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে উনি সসম্প্রভিত হয়ে বলছেন, Who cares for this negar। নিগার মানে নিগ্রো, আমেরিকাতে বিদেশীদের গালাগাল দেওয়ার সময় নিগার বলে, জোসেফিন খুব ভালোবেসে নিগার বলছেন, দেখাচ্ছেন আমি যেন কেয়ার করি না। এই যে ভাব, আমার খুব আপনার লোক, তার সামনে আমি নৃত্য করছি, কাউকে

দেখানোর জন্য নয়। উর্জিতা ভক্তিতে ভগবানকে আপন মনে করে এই হাসছে, এই কাঁদছে, আবার এই উচ্চস্বরে গান করছে, এই নৃত্য করছে। ঈশ্বরের প্রতি যে গভীর প্রেম, ভালোবাসা জাগে তাতে এগুলো বাস্তবিক হয়, অনুশীলনের জিনিস নয়, স্বাভাবিক ভাবেই হয়। যদি কখন সখন কোন কারণে এই রকম ভাব জাগে তখন ভাব সম্বরণ করতে হয়। আর ভাব যদি নিজে থেকেই হয় তখন চাপা দিলেও সম্বরণ হয় না।

ভক্তি পথে যখন এগোতে শুরু করে তখন কি কি হয় তারই বর্ণনা করছেন। আবারও বলা হচ্ছে যে, এই ধরণের যত ইমোশান আছে সেখানেও ঠিক তাই হয়। ভেতরে হয়ত নানা রকমের দুঃখ জমে আছে, সেখান থেকেও ইমোশানে ভক্তির উচ্ছাসে অনেক কিছু হয়। ঠাকুরের এই ভাব নয়, রামকৃষ্ণ মিশনেরও ভাব নয়। কারণ এই জিনিসগুলো ইমোশানে কখন নেমে যাবে কেউ বলতে পারবে না। আগে যেমন বলা হল, জপ, ধ্যান, পাঠ এগুলো অহঙ্কারে পরিবর্তিত করে দেয়। ভক্তিতেও এই সমস্যা হয়, ভাব সম্বরণ করার ক্ষমতা না থাকলে ইমোশানে পরিবর্তিত করে ভোগে নামিয়ে দেবে। অহঙ্কারে এক ধরণের সমস্যা হবে, ইমোশানে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের সমস্যা আসবে। ইমোশান মানেই এবার তাকে সব রকম ভোগের দিকে নিয়ে যাবে। ছোট গোপাল একজন ভক্ত মহিলার কাছে যেত, মহিলার আবার বাৎসল্য ভাব। ঠাকুর ছোট গোপালকে সাবধান করে দিচ্ছেন, ঐ বাৎসল্য ভাব থেকেই তাচ্ছল্য ভাব এসে যাবে, খুব সাবধান, ওখানে বেশি যাবি না। সেইজন্য রামকৃষ্ণ মিশনের ভাব হল যোগ সমন্বয়, সব ধরণের যোগকে এক সঙ্গে নিয়ে চলা। প্রত্যেক যোগেরই একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, ঐ বিশেষত্ব মহৎ করে দেয় আবার প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পথে গর্ত আছে। সেইজন্য একটা দিক দিয়ে গেলে, ঠাকুরের মত না গেলে বিভ্রাট হয়ে যাবে, অনেক সমস্যায় পড়ে যাবে। এক অপরকে counter checking করে। শ্রীকৃষ্ণও বলছেন, এটাই যদি ভক্তি ভাবে হয় তাহলে কি হবে? *যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্। আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্।।১১/১৪/২৫।।* সোনায় যদি ময়লা জমে, আগুনে দিলে তার ময়লা যেমন পুড়ে যায়, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে মানুষের ভেতরের যত ময়লা সব পরিষ্কার হয়ে যায়, যত কর্মবাসনা আছে সব কেটে যায়, আর তার শুদ্ধ আত্মা নির্মল হয়ে যায়। কিন্তু যদি সত্যিকারের ভক্তি ভাব না থাকে, শুধু ইমোশান বা ভাবের উপর চলে তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেবে। ঠাকুর অনেক রকম সাধকদের সাথে দেখা করতে যেতেন, বিভিন্ন রকম সাধকদের জানতেন, সবারই চালচলন, কথাবার্তা খুব ভালো করে লক্ষ্য করতেন। এক জায়গায় গিয়ে দেখছেন, সেই সম্প্রদায়ের সাধিকা একজন পুরুষকে কৃষ্ণ পাতে, এগুলো সবই গোলমেলে। কোথাও একটা সূক্ষ্ম দুর্বলতা থেকে গেছে, সেখান থেকে এই জিনিসগুলো হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যেমন যেমন আমার পরমপাবন লীলাকথার শ্রবণ-কীর্তনে চিত্তের মলিনতা দূর হয়, তেমন তেমন তাঁর সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু মূল যে এক, এই এককে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এককে উপমা দিয়ে বোঝাতে হয়। কারণ সূক্ষ্ম জিনিসের ব্যাখ্যা হয় না। সাধারণ ভাবে একটা সূক্ষ্ম জিনিসের সাহায্যে আরও কঠিন জিনিসের ব্যাখ্যা করা হয়। যে কোন জটিল জিনিসকে বোঝাবার জন্য সূক্ষ্ম জিনিসকে দিয়ে বোঝাতে হবে। যেমন quality বা গুণ, গুণকে বোঝান যাবে না, গুণকে intuitively বুঝতে হয়। সত্য কি? সত্য জিনিসটা নিজেকেই বুঝতে হয়, কেউ সত্যকে বোঝাতে গেলে বোঝাতে পারবে না। আত্মা বা ঈশ্বর হলেন সূক্ষ্মতম, এর থেকে আর সূক্ষ্ম হয় না, সেইজন্য আত্মা বা ঈশ্বরকে কোন জিনিস দিয়ে বোঝান যায় না। আত্মা বা ঈশ্বর আছেন বলে জগৎ আছে, আত্মাকে দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু জগতকে দিয়ে আত্মার ব্যখ্যা কোন দিন করা যাবে না। সেইজন্য সহজকে বুঝতে হলে মনের গভীরতম স্তরে যেতে হবে। কিন্তু মন নিজে অত্যন্ত জটিল। জটিল মনকে সহজ করার জন্য মনের ভেতর যে নানা রকমের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা গুলো আছে এগুলোকে তাড়াতে হয়। কিন্তু মন সহজে দমে না। কিন্তু যেই ভক্তি করা শুরু করল, ঠাকুরকে ভালোবাসছে, ঠাকুরের কথা শুনছে, তাঁর কথা শুনে চোখে জল আসছে, চোখের জলে মনের ময়লাগুলো যখন ধোয়া হয় তখন মনটা সরল হতে শুরু করে। তখন সে ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলোকে বুঝতে শুরু করে। আমরা ভক্তি, জ্ঞান, নানা রকমের শব্দ বলি ঠিকই, কিন্তু সবটাই এক। সবটাতেই জানা হয়, যিনি ভক্তি করছেন তিনিও সেই তত্ত্বকেই জানছেন। জ্ঞানমার্গে যিনি আছেন তিনিও সেই তত্ত্বকেই জানেন। জানার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।।১১/১৪/২৭।। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বিষয়ের চিন্তন যে করে তাঁর মন ধীরে ধীরে বিষয়ের দিকেই চলে যায়। কিন্তু আমাকে যে চিন্তন করে ধীরে ধীরে সে আমাতেই লয় হয়ে যায়। মন একটা জিনিসকে নিয়েই থাকতে পারে, সেইজন্য বহুমুখী প্রতিভা খুব কম দেখা যায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে পাওয়াই যায় না। একজন নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পরে তিনি অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করলেন, আর ওটাকে নিয়েই চর্চা করতে থাকলেন। অর্থনীতিতে যে তিনি থিয়োরী দিলেন পরে ঐ থিয়োরীর উপর কাজ করে জন্ ন্যাশ অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেলেন। বহুমুখী প্রতিভাতেও যখন একটা জিনিসকে নিয়ে আছেন তখন তিনি ওটাকে নিয়েই থাকেন। যাঁরা গান বাজনাতে ওস্তাদ তাঁরা অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারদর্শি হয়ে যান। ওখানে মূল হল ছন্দ ও তাল, উনি একটা তালকে ধরে আছেন। কখন সখন দেখা যায় ক্রিকেটও ভালো খেলতে পারে আবার ফুটবলও ভালো খেলতে পারে। ইংল্যাণ্ডের একজন প্লেয়ার ছিলেন, তিনি জাতীয় ক্রিকেট টিমেও ছিলেন আর জাতীয় ফুটবল টিমেও খেলেছেন। এগুলো খুব দুর্লভ প্রতিভা। কিন্তু মন যখন বিষয়ে ডুবে যাচ্ছে তখন সে বিষয় ছাড়া আর কিছু দেখতে পারে না। কিন্তু এই মনকে যদি ভগবানের দিকে সরিয়ে নিয়ে আসে, ধীরে ধীরে ভগবানে লয় হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, মন হল ধোপা ঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙের হয়ে যাবে।

সেইজন্য প্রথমে কি করতে হয়? *তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্। হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্।।১১/১৪/২৮।।* তাই হে উদ্ধব! অন্য সব সাধন ছাড়, কোন ফলের আশা করবে না, কোন কিছুকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবে না। তুমি জেনে নাও এই সব কিছু হল মনের কল্পনা, কল্পনার বাইরে কিছু নেই। সেইজন্য তুমি শুধু আমার চিন্তনই করে যাও। গীতায় ভগবান বলছেন *ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।* প্রথমে শুরু করেছিলেন তাদের কথা দিয়ে যারা বলছে আমার সংসারও চাই ঈশ্বরও চাই। সেখান থেকে পর পর দেখালেন শেষে সংসারটাও কিভাবে খসে পড়ে যায়। কেন খসে পড়ে যায়? যখন এগোতে শুরু করে, ঈশ্বরের আরও গভীরে যাচ্ছে, বুদ্ধি তখন পরিষ্কৃত হতে থাকে। বুদ্ধি পরিষ্কার হলে দেখে, সব কিছু মনের রাজ্য। আমরা যত রকমের কল্পনা করছি, সঙ্কল্প করছি, যত রকম ফলের কামনা করছি, সব মনেরই কল্পনা। আমাদের যত ভালোবাসা সেও মনের রাজ্যে আর কারুর প্রতি যে রাগ, অভিমান সেটাও মনেরই কল্পনা। যদি জিনিসগুলো বাস্তবিক থাকত তাহলে সেগুলোকে সরান খুব কঠিন হয়ে যেত। আমরা যে কাজকর্ম করছি আর তার যে ফল, এটাও মনের রাজ্যেরই জিনিস। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ আমাদের মন অত্যন্ত স্থূল। আর সংসারে এমন আকর্ষণ যে আমরা ছাড়তে পারব না। পুরো জিনিসটা যে মনের রাজ্যেরই ঠিকানা, এই জিনিসটাকে বোঝার জন্যই সাধন ভজন। সাধন ভজন করতে করতে বুঝতে পারে সবটাই মনের রাজ্য, ভালোটাও তাই, মন্দটাও তাই, কর্মের ফলও তাই, নামযশও তাই, দুর্নামও তাই, বন্ধুও তাই আর শত্রুও তাই। হয়ত কেউ জীবনে কোন সময় প্রচুর দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, তার জীবন সংশয় হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়ে গিয়েছিল, আজকে যদি সে ওই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকায়, তার মনে হবে তারই মত আরেকজনের সাথে এই ঘটনা হয়েছিল। এখন হয়ত তার ভালো দিন এসেছে, এখনও যদি মনে করে এই ঘটনা আমার সাথেই হয়েছিল তাহলে সে কিন্তু পাগল হয়ে যাবে। সবারই জীবনে কোন না কোন সময় প্রচুর দুঃখ-কষ্ট এসেছিল, কিন্তু সুখের দিন আর আনন্দের দিন এই দুটোকে যদি আলাদা করে নিতে পারে, জীবন তখন অন্য রকম হয়ে যাবে। ভগবান এখানে ঠিক এই কথাই বলছেন, যখন তুমি বুঝে নেবে সবটাই মনের রাজ্যের, আর বার বার বিষয়ের চিন্তা করে করে সব মনের রাজ্যে বসে গিয়েছিল, তাই তুমি শুধু আমারই চিন্তা কর, তখন সবটাই replaced হয়ে যাবে। বাহ্য জগতটা যদি সত্য হত তাহলে এটা কোন দিন replaced হত না, সাধনার মূল এই জায়গাতেই। এটাকে সব সময় ব্যাখ্যা করা হয় না ঠিকই, কারণ মানুষ ধরতে পারে না। কম্প্যুটার দিয়ে জিনিসটাকে ভালো বোঝান যায়। কম্প্যুটারে আমি একটা চিঠি টাইপ করলাম, চিঠিটা মনঃপূত হল না। চিঠিটাকে পাল্টে দিয়ে আরেকটা চিঠি টাইপ করলাম। তারপর মনে হল, আগের চিঠিটাই ঠিক ছিল। পুরো জিনিসটা পরিবর্তিত হয়ে আগের চিঠিটা এসে যাবে। এ চিঠিটাই যদি

সাদা কাগজের উপর লেখা হত তাহলে কিন্তু এভাবে replace করা যেত না। কাগজে লেখা চিঠি মানে, কাটাকুটি, লেখা পাল্টানো সবটাই পাকাপাকি থেকে যাবে, আর পাল্টানো যাবে না। আমরা সব সময় ভাবি জগতটা কাগজে লেখা, কিন্তু তা নয়। জীবন সব সময় কম্প্যুটারে লেখার মত, যখন যেটা খুশি সেটাকে ডিলিট করে নতুন লেখা নিয়ে আসা যাবে, যে কোন লেখাকে ওভাররাইট করে দেওয়া যায়, যেটা আমি রাখতে চাইব সেটাই থাকবে। মনটাও একটা কম্প্যুটারের মত, এখানেও সব কিছুকে ওভাররাইট করা যায়। কি দিয়ে ওভাররাইট করব? ঈশ্বর চিন্তন দিয়ে। ঈশ্বর চিন্তন যদি ছেড়ে দেয় আবার বিষয় চিন্তনে ঢুকে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তন করতে করতে যদি ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায় তখন ওটাই চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যাবে, আর তার পরিবর্তন হবে না। সেইজন্য প্রথমে কি করতে হবে?

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্। ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।। ১১/১৪/২৯।। তুমি যদি আত্মবান হতে চাও, আত্মবান মানেই যিনি আত্মার জ্ঞানে পেতে চাইছেন, তুমি যদি ঈশ্বর জ্ঞানের দিকে যেতে চাও তাহলে নারীসঙ্গ ছাড় (নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষসঙ্গ)। শুধু তাই না, *স্ত্রীসঙ্গিনাং*, যারা নারীসঙ্গ করে তাদের থেকেও অনেক দূরে থাকবে। এখানে সাধুসঙ্গের যে কথা বলছেন সেটারই গুরুত্ব বেশি। লাটু মহারাজের ছোটবেলা বিহারের অজ গ্রামে কেটেছে, গ্রামের লোকেদের তাড়ি খেয়ে নেশা করতে দেখেছেন, সেখান থেকে তাঁরও ভেতরে এর একটা সংস্কার থেকে গিয়েছিল। ঠাকুরের কথা শোনার পর তাঁর মনে হল এদিকে যেন তাঁর মন না যায়। সেদিন থেকে যে রাস্তায় মদ বিক্রি হয় সেই রাস্তা ছেড়ে তিনি ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া শুরু করলেন। যে মদ খায় তার একদিন মনে হল মদ খাওয়াটা ভালো নয়, সে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল। কিন্তু মদ খাওয়াটা ছাড়লে হবে না, যারা মদ খায় তাদেরও সঙ্গ তাকে পরিহার করে চলতে হবে। সাধক জীবনে সব থেকে বড় সমস্যা নারীসঙ্গ। *ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ। যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।।১১/১৪/৩০।।* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে উদ্ধব! জগতে অনেক রকমের বন্ধন আছে, কিন্তু যারা নারীসঙ্গ করে আর লম্পট, তাদের যারা সঙ্গ করে, এদের যে পরিমাণ ক্লেশ পেতে হয় এবং বন্ধনে পড়তে হয়, এর মত আর কোন কিছুতে এত ক্লেশ সহ্য করতে হয় না আর বন্ধনেও পড়তে হয় না। একজন মহারাজ ছিলেন তিনি খুব সুন্দর কথা বলতেন। কেউ যদি তাঁকে বলত, মহারাজ আমার মনটা মাঝে মাঝে নামযশের দিকে চলে যায়, কি করব? উনি বলতেন, যেদিকেই মন যায় যাক, দেখবে নারীর দিকে যেন মন না যায়। উনি খুব দামী একটা শব্দ ব্যবহার করতেন, মেয়েরা খুব স্লিপারি রাস্তা। ঠাকুর বলছেন বিশালক্ষ্মীর দ। নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষরাও সমান ভাবে প্রযোজ্য। নারী পুরুষ দুটো জাতকেই আনা হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, যে কাম জয় করে নিয়েছে সে কি না করতে পারে, তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তাঁর কৃপা আনছেন, কারণ তাঁর কৃপা ছাড়া ঈশ্বর দর্শন হয় না। জগতে সব থেকে কঠিন কাজ ঈশ্বর দর্শন করা, সেটাও কামজয়ীরা তাঁর কৃপায় করে নিতে পারে।

কথামৃতেও ঠাকুর বার বার বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে বাপু হবে না। সব শাস্ত্রে একই কথা বলে। ঠাকুর একদিন এই ধরণের কিছু কথা বলছিলেন, তখন একজন বলছে, মশাই ওসব জানা আছে। ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন, এগুলো ধারণা করা চাই। যাঁরা নিয়মিত কথামৃত পড়েন তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, মনে হয় যেন সব বুঝে ফেলেছি। কিন্তু স্বামীজীর রচনাবলী পড়তে গেলে মাথায় আর ঢুকতে চায় না। দু-চারটে পাতা পড়তে পড়তে কিছু কথা এক দিক থেকে ঢুকছে আর আগের কথা গুলো অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। যিনি পুরো বিবেকানন্দ সাহিত্যকে মাথায় ধারণ করে রাখতে পারেন, একমাত্র তিনিই কথামৃত ধারণা করতে পারবেন, তাঁরাই গীতা, উপনিষদ ধারণা করতে পারবেন। বাকিদের কাছে সবটাই শব্দ মাত্র। শব্দগুলো আমাদের মধ্যে শুধু বসে যাচ্ছে, ধারণা হচ্ছে না। ঠাকুরও একই কথা কখন এদিকে থেকে বলছেন, কখন ঐদিক থেকে বলছেন, তিনি যে একই কথা বলছেন এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। ভাগবতে, গীতাতে, উপনিষদে সবেতেই তাই। হৃদয়রাম বলছেন, মামা তুমি একই কথা বার বার বল কেন? ঠাকুরও তাঁকে বলছেন, হাজার বার বলব, তাতে তোর কি! কারণ একই কথা বার বার না বললে লোকেদের ধারণা হয় না। একই কথা শুনতে শুনতে একটা সংস্কার তৈরী হয়। অনেক সন্ন্যাসীদের দেখা যায় তাঁরা প্রথম

থেকে জনসেবাদি কাজ করে করে একটা বয়সে এসে মনে করেন এগুলো কিছুই না। তাহলে যিনি এত দিন বলে এসেছেন কাজ করতে হবে, কাজ করে করে জীবনকে শেষ করে দিতে হবে, তাঁর কথাগুলো মুখের কথাই ছিল। তাহলে তাঁর কি করে পরিবর্তন হয়ে গেল, যার জন্য আজকে বলছেন এগুলোর কোন গুরুত্ব নেই। অথচ স্বামীজীও নিজের গুরুভাইদের বলেছেন কাজ কর। তার মানে আবার এটাই ফিরে আসবে। সাধন জীবন অত্যন্ত জটিল, খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি যদি না থাকে, একদিকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর অন্য দিকে নিজেকে বৃহৎ করতে হচ্ছে, সব কিছুকে ধরে নেওয়ার ক্ষমতা, এই দুটো যদি একসাথে না থাকে তাহলে কোন দিন এগুলোকে ধারণা করা যাবে না। ঠাকুর নিজের ব্যাপারে বলছেন, আমি এক ডেলে গাছ, একটা জিনিসকে নিয়ে এগিয়ে চলে গেছেন। সেইজন্য মনে হয় ঠাকুরের কথা খুব সহজে বোঝা যায়। আমরাও ভাগবতে যে কথাগুলো শুনছি একই কথা শুনছি, কিন্তু শুনে যেতে হবে, শুনে যাওয়াটাও একটা সাধনা।

শ্রীকৃষ্ণ এসব বলার পর উদ্ধব জানতে চাইছেন, মুমুক্ষু পুরুষরা কিভাবে আপনার ধ্যান করেন, কত প্রকারে ধ্যান করবেন আর কেমন ভাবে করবেন? এটাই উদ্ধবের প্রশ্ন। এমনিতে মনে হয় ভক্তি পথ খুব সহজ পথ। ঠাকুরও বলছেন ভক্তি পথ সহজ পথ। মানুষ যে পথেই যাক, সব পথে একটাই সাধারণ, তা হল ঈশ্বর চিন্তন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ যে পথেই যাক না কেন, ঈশ্বরের ধ্যান প্রত্যেক পথেই করতে হয়। আমাদের একটা ভুল ধারণা হয়ে আছে যে, ভক্তিযোগের যারা অনুশীলন করবে তাদের আর কিছু করতে হবে না। আমরা মনে করি ভক্তিযোগ মানেই একটু পূজো করা হল, খুব শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে প্রণাম করা, বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ উৎসব করা, খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করা। কিন্তু এগুলো বৈধী ভক্তিতেও পড়ে না। তবে বৈধী ভক্তির জন্য এই জিনিস গুলো প্রস্তুত করে দেয়। ভক্তি পথে যে চিন্তন, মনন, স্মরণ করা হয় তার মধ্যেও ধ্যান আবশ্যক। যে পথেরই সাধক হন না কেন, যদি ধ্যান না করে তাহলে বুঝে নিতে হবে তাঁর কিন্তু ঈশ্বর চিন্তন হচ্ছে না। কর্মযোগীকেও ধ্যান করতে হয়, রাজযোগ তো ধ্যানের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে, জ্ঞানযোগে যিনি বিচার করেন তাঁকেও ধ্যান করতে হয় আর ভক্তিযোগে গভীর ধ্যান করতে হয়। লোকেদের মনে একটা ভুল ধারণা যে, আমি যদি ঠাকুরকে ভালোবাসি, যদি ঠাকুরের নাম কীর্তন করি এতেই সব হয়ে যাবে। মনের চাঞ্চল্য সবারই থাকবে, আর সবাইকেই মনের চাঞ্চল্যতার নিরসন করতে হবে। মনে চাঞ্চল্য থাকলে কোন যোগই হবে না। মনের চাঞ্চল্যতাকে বন্ধ করে সম্পূর্ণ ঈশ্বর চিন্তনে মনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ধ্যান অবশ্যই করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখন শুধু ধ্যানেরই কথা বলছেন।

উদ্ধব জানতে চাইছেন, *যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্। ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসি।।১১/১৪/৩১।।* আমাদের মত লোকেরা কিভাবে ধ্যান করে উদ্ধব জানতে চাইছেন না। উদ্ধবের প্রশ্ন মুমুক্ষুদেরকে নিয়ে। মুমুক্ষুরা কিভাবে ধ্যান করেন, কিভাবে আপনার চিন্তন করেন। তাহলে বাকিরা কি মুমুক্ষ নয়? বাকিরা সত্যিই কেউ মুমুক্ষ নয়। আমরা সবাই একটা জীবনধারা ঠিক করে নিয়েছি, জীবনের একটা পরিভাষা ঠিক করে নিয়েছি, ভালো মন্দের একটা পরিভাষা আমরা ঠিক করে নিয়েছি, শুভ অশুভের আমাদের একটা পরিভাষা আছে। আর সবটাই ডায়নামিক, আজ থেকে দশ বছর আগে আমি যেটা ভালো মনে করতাম, আজ তা মনে করছি না। অপরে চুরি করলে আমি বলব লোকটা একটা চোর। আর আমি যদি চুরি করে ধরা পড়ি, বলব দায়ে পড়ে করতে হয়েছে। আমাদের কাছে যেটাই ধোঁয়াশে অপরের কাছে সেটাই হয়ে যাবে সাদা-কালো। যারা বড় বড় নৈতিকতার কথা বলে বেড়ায়, ভালো করে দেখলে দেখা যাবে, এখনও তারা সেই পরিস্থিতিতে পড়েনি। যাদেরকে আমরা সচ্চরিত্র মনে করছি, তাদের সবারই গোলমালটা সেখানে। কারণ ঈশ্বর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত কেউ সচ্চরিত্র হতে পারে না। যখন সব কিছু আমাদের পরিভাষা অনুযায়ী চলে তখন ভগবানের জয়জয়কার দিতে থাকে। যেমনি অন্য রকম কিছু হয়ে গেল তখন ঠাকুর, ঠাকুরের বাপঠাকুর্দার শ্রাদ্ধ করি। ঠাকুরের প্রতি ভক্তিরও একটা নিজস্ব পরিভাষা আমরা তৈরী করে নিয়েছি। সংসারীদের চাকরি করা, কেনাকাটা করা, সামাজিকতা করা, ছেলেমেয়েকে বড় করা, তার মধ্যে ঠাকুরকে ভক্তি করাও আছে। মুমুক্ষুত্ব যে কি জিনিস ভাবলে সংসারিদের তো আতঙ্ক লাগবেই, এমনকি অনেক সন্ন্যাসীরও আতঙ্ক লেগে যাবে। ঠাকুর বলছেন, সংসারী মানে কেল্লার ভেতর থেকে যুদ্ধ করা, সন্ন্যাসীরা যেন কেল্লার বাইরে এসে যুদ্ধ করছে। হাজার

হাজার শত্রু এগিয়ে আসছে আর তার মধ্যে একজন বীর একা যুদ্ধ করতে মাঠে নেমে পড়েছে আর গৃহস্থরা কেল্লা থেকে কামান চালিয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থরা কখন মুমুক্ষু হতে পারে না। মুমুক্ষু হওয়া মানে সাংসারিকতার ভাব থেকে বেরিয়ে আসা। সবাইকেই একদিন বেরোতে হবে, যারা বেরোয় না মৃত্যুর সময় তাকে টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। মুমুক্ষের পথ দিয়ে সবাইকেই যেতে হবে। প্রত্যেক জন্মেই জীবন আমাদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা শিক্ষাটা নিতে চাই না, কারণ আমরা নিজেদের মত কিছু পরিভাষা তৈরী করে রেখেছি, ওই পরিভাষার বাইরে আমরা কিছুতেই যেতে চাই না। উদ্ধব জানতে চাইছেন এই ধরণের মুমুক্ষুরা কিভাবে ধ্যান করেন। সাধারণ লোক কিভাবে ধ্যান ধারণা করে আমরা এর আগেই বললাম। ঠাকুরের বিগ্রহ আছে, ছবি আছে, দু বেলা তাতে ফুল দিচ্ছি, পূজা করছি, জপ করছি, চোখ বুঝে ধ্যানও করছি। কিন্তু ওই তেজ, যে তেজে সে একা খোলা মাঠে নেমে হাজার হাজার শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়। এখানে যে বর্ণনাগুলো আছে তাতে বোঝা যায় না ঈশ্বরের কৃপা যদি কারুর উপর থাকে তাহলে তাকে কতটুকু করতে হবে। এই বর্ণনাগুলোও সম্পূর্ণ নয়, পূর্ণ বর্ণনা একমাত্র অবতারই করতে পারেন, ঠাকুর বলছেন, আমি ষোল আনা করেছি তোরা এক আনা কর। তার মানে আমাদের শতকরা ছয়ে নেমে গেল। এই যে বর্ণনা করছেন এগুলো ছয় পারসেন্ট। সত্যিকারের যদি করত তাহলে এটাকেই শতকরা চুরানব্বুই ভাগ বাড়িয়ে দিতে হবে, একমাত্র অবতারের পক্ষেই যা করা সম্ভব। ভগবান যখন কৃপা করেন তখন মানুষ এই এক আনার জোরেই বেরিয়ে যায়। আমরা যদি লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে ঠাকুরের সাধন জীবন না জানতাম তাহলে মনে করতাম এগুলো গালগপ্প। রোমা রোঁলা ঠাকুরের জীবনীতে ঠিক এটাই লিখছেন, বিশ্বাস হয় না যে আমাদেরই যুগে এমন কেউ ছিলেন, মনে হয় কোন আদিমকালের কোন কাহিনী শুনছি।

সাধারণ লোকেদের ধ্যান পরিভাষিত, সংসারে পাঁচটা জিনিস করছে তার মধ্যে এই ধ্যানটুকুও আছে। অতি সাধারণ লোকের বাড়িতেও একটা বিছানা থাকবে, দু চারটে বাসনপত্র থাকবে, কিছু খাবার জিনিসও থাকবে আর তার মধ্যে একটা ঠাকুরের ছবিও আছে। তাদের কাছে বাসনপত্রের যে মান, ঠাকুরের ছবিরও অতটুকুই মান। যাদের একটু সামর্থ আছে তাদের অনেক ঘরের মধ্যে আলাদা একটা ঠাকুরঘরও থাকে, নিজেদের দামী দামী বিছানার সাথে ঠাকুরেরও একটা বালিশ, তোষক আছে। ঠাকুর বলছেন, রুদ্রাক্ষের মালাতে জপ করবে তার মধ্যে রূপোর দানাও আছে। আমাদের যেমন পরিভাষা, যেমন চিন্তা ভাবনা সেই ভাবেই ঠাকুর আছেন। রোজ দাঁত ব্রাশ করছি, স্নান করছি, বিছানায় শুতে যাচ্ছি এগুলো যেমন ক্রিয়া, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করাটাও সেই রকম একটা ক্রিয়া, তার বেশি কিছু না। এসব ক্রিয়ার কথা ভগবান আগেই বলে দিয়েছেন, কি কি করতে হবে। কিন্তু এবার বলুন মুমুক্ষুরা কি করে?

ভগবান বলতে শুরু করে প্রথমেই বলছেন, *সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্। হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ।।১১/১৪/৩২।।* গীতার ধ্যানযোগ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, *সমং কায়শিরোগ্রিবাং ধারায়ন্নচলং স্থিরঃ*। মেরুদণ্ড সোজা করে আসনে বসবে, শরীরের ওজন কোমড়ের উপর থাকবে। মেরুদণ্ড যদি সোজা না থাকে তখন যে শুধু মনই বসবে না তা নয়, মনে কোন উচ্চ চিন্তন কখনই আসবে না। উচ্চ চিন্তন এখানে শুধু অধ্যাত্ম নিয়ে বলা হচ্ছে না, যে কোন বিষয়, বায়োলজি, কেমেস্ট্রি, ফিজিক্স কোন বিদ্যারই উচ্চ চিন্তা আসবে না। যখনই আমাদের কোন ব্যাপারে alertness আসে আমাদের শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে যায়। কেন হয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু এটাই শরীরের একটা বিচিত্র ধর্ম। শাস্ত্রও বলছেন, ধ্যান করছ, অধ্যয়ন করছ সোজা হয়ে বসে কর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে পড়ছে, মাথায় কিছু ঢুকবে না। উপন্যাস, গল্প ঠিক আছে কিন্তু কোন উচ্চ চিন্তন হবে না। সেইজন্য আগে সোজা হয়ে বসাটা অভ্যাস করতে হয়। যাদের কোমরের সমস্যা, ব্যাক পেইন আছে তারা চেয়ারে যতটা পারবে সোজা হয়ে বসবে। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে চিন্তন হবে কিন্তু চেয়ারে বসে ধ্যান সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা আগে থেকে ধ্যানে রপ্ত হয়ে গেছেন তাঁদের চেয়ারে বসেও ধ্যান হয়। আর বলছেন বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালুকে রেখে দুটো হাতকেই কোলের উপর রাখতে হয়। এভাবে হাত রাখাকে এনারা বলেন sign of alertness। শত্রু পক্ষ থেকে অনবরত গোলাগুলি ছুটে আসছে, সেখানে তাঁকে লড়াই করতে হচ্ছে, তাঁর চোখ,

কান, নাক সব সজাগ, শরীরটা পুরো ফ্রি কিন্তু একেবারে সোজা। ধ্যান করা মানে রাবণের সাথে যুদ্ধ করা। ধ্যান করা মানে হাত থেকে পা সব ইন্দ্রিয় ফ্রি কিন্তু একেবারে সজাগ। কাউকে মারার সময় হাত শক্ত থাকলে জোরে মারা যাবে না, হাত যত আলগা থাকবে তত জোর মারা যাবে। ধ্যানের সময়ও শরীরটা একেবারে লুজ থাকবে কিন্তু সজাগ। নৃত্য শিল্পীদের মধ্যে এই জিনিসটা খুব ভালো দেখা যায়, জলের প্রবাহের মত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছন্দের তালে দুলতে থাকে, কিন্তু সব সময় তালের দিকে সজাগ, একটুও বেতালা হবে না। লড়াই, নৃত্যের কথা বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ধ্যানে এর থেকেও অনেক বেশি alertness দরকার। রাজযোগে প্রথমেই বলে দেয়, আগে কয়েক জন্ম ধরে শুধু আসন অভ্যাস করে যাও। আমরা এখন বসতেই শিখিনি, ধ্যান কোথা থেকে হবে! ধ্যান শুরু করার আগে এক আসনে কোন নড়াচড়া না করে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকাটা আয়ত্ত কর। এখানে ধ্যানের কথাই বলছেন, জপের কথা বলা হচ্ছে না। জপ যেভাবে বসেই করে নিতে পারে। মা বলেছেন জপাৎ সিদ্ধি, জপ করতে করতেই সিদ্ধি হয়। সিদ্ধি ঠিকই হবে, কিন্তু শেষমেশ যে পথেই যাওয়া হোক না কেন, ধ্যানের পথে সবাইকেই নামতে হয়, যেখানে পুরো attention ঈশ্বরের উপর।

আসন জয় করার কথা বলে দিয়ে প্রথমে অন্নময় কোষকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বলে দিলেন। দেহই সব কিছুর মূলে, কারণ দেহ দিয়েই জগতের সাথে interaction হয়। এই দেহই সেই পরমাত্মার সাথে আমার আমিকে সংযোগ করিয়ে দেয়। আচার্য শঙ্করও যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়ের কথা বলছেন, যুস্মদ্ অস্মদ্ মানে আমি আর সে। শুদ্ধ আত্মা অর্থাৎ আমার যিনি আসল আমি আর জগৎ, এই দুটোর সম্পর্ক করায় এই দেহ। শরীর যে কতটা মূল্যবান লোকেরা খেয়ালই করে না। দাঁতে ব্যাথা, পেটে ব্যাথা হলে আমরা একটু শরীরের কথা ভাবি। আমার যে আমি বোধ, এই আমি বোধকে দেহই চালিয়ে নিয়ে যায়, ঈশ্বরের দিকে এই দেহই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, জগতের দিকেও এই দেহই নিয়ে যেতে পারে। আর ঈশ্বরের সাথে জগতের সম্পর্ক দেহই করায়। সেইজন্য আগে দেহকে জয় করতে হয়। দেহকে জয় করা মানে, আমার ইশারায় আমার দেহ চলবে, দেহের ইশারায় আমি চলব না। আগে আহার আদির কথা হয়ে গেছে, এবার মূল জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছেন। মূল জায়গাটা কি? আসনে সোজা হয়ে বসবে।

এরপরে আসছে প্রাণময়কোষ, শরীরকে সরাসরি চালায় প্রাণ। আমাদের আচার্যরা বলেন আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিই, এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শরীরের ভেতরে গিয়ে শরীরকে বিভিন্ন ভাবে চালায়। দীর্ঘক্ষণ কথা বললে প্রাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে না, কথা বলার সময় যত বাতাস ভেতরে নেওয়া হয় তার থেকে বেশি বাতাস শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। দেহটা তখন বলে আমার চলছে না, হঠাৎ কথা বলা থামিয়ে হাই তুলে অনেকটা বাতাস টেনে নিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করে। দৌড়ঝাপ করার সময়েও একই জিনিস হয়। তখন তাকে শরীর যতটা পারার করে নিতে দেবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হাঁপাতে থাকবে। হাঁপিয়ে সেটাকে পূরণ করে নেয়। কমাণ্ডোদের ট্রেনিং সেইজন্য ঐভাবেই দেওয়া হয়। ওরা দু কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়ে আসবে, শেষের একশ মিটার আরও জোরে দৌড়াবে আর ঐ ছুটন্ত অবস্থায় গুলি চালাবে। কোন হাঁপাহাঁপি নেই, ওভাবেই ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয়ে গেছে। কিসের ট্রেনিং হয়ে গেছে? প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করার ট্রেনিং। আমাদের ট্রেনিং নেই তাই একটু ছোটাছুটি করলেই হাঁপাতে শুরু করি। কিন্তু যারা ধ্যান করছে বা জপ করছে, এদের জন্য প্রাণের নিয়মন আবশ্যিক। প্রাণনক্রিয়া তিন রকমের, পূরক, রেচক আর কুম্ভক। একবার ভেতরে বায়ুকে ভরা হচ্ছে, দ্বিতীয় বায়ুকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয় আর কুম্ভক মানে ভেতরে বায়ুকে ধরে রাখা। ঠিক ঠিক যখন ধ্যান হয় তখন নিজে থেকেই কুম্ভক হয়ে যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যায়। সেনাবাহিনীতে শরীরের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যোগশাস্ত্রেও শরীরের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে যে সাধনার কথা বলছেন তাতেও শরীরের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে মনের নিয়ন্ত্রণ করছেন। আমাদের আসনে বসাটা শিখিয়ে দিলেন, এবার বলবেন তুমি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটা ঠিক ভাবে নিতে শেখ। প্রাণনক্রিয়া মানে নিঃশ্বাস নেওয়া, প্রশ্বাস ছাড়া আর মাঝখানে হয় বাইরে আর তা নাহলে ভেতরে বায়ুকে ধরে রাখা। এই তিনটে দিয়ে প্রাণকে শোধন করতে হয়।

প্রাণ আর বায়ু দুটো আলাদা বস্তু। প্রাণ মানে যে জিনিসটা শরীরের মধ্যে কাজ করছে। আর ঐ প্রাণের intent হয় বায়ু দিয়ে। বর্তমান কালের বায়োলজি দিয়ে মেলাতে গিয়ে এগুলো মিলবে না। আমাদের ঋষিরাও

জানতেন, আমরা যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ভেতরে গিয়ে ফুসফুসকে সঞ্চালন করছে, পরের বিস্তারিত জিনিসগুলো হয়ত জানতেন না। কিন্তু ওনারা জানতেন, খাওয়া-দাওয়া করে এনার্জি আসে না, খাওয়া-দাওয়া করলে যদি এনার্জি আসত তাহলে বেশি পরিমাণে খেয়ে নেওয়ার পর হাঁকপাক করত না, কিংবা অনেকে আছে যারা কম খাওয়া-দাওয়া করেও তাদের মধ্যে প্রচুর প্রাণশক্তি দেখা যায়। খাওয়ার মাধ্যমে প্রসেসিং হয়ে ভেতরে শক্তি একভাবে চলে, কিন্তু সেটা খুব স্থূল। আরও যেটা সূক্ষ্ম তা হল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফুসফুসে যাচ্ছে, ফুসফুসে রক্তকে শোধন করার পর সেই রক্ত হার্টে যাচ্ছে, এরপর যে এনার্জি জেনারেট হয়, এটাকে পিওরলি বায়োলজিক্যাল দিক দিয়ে নিলে আমরা এর কিছুই বুঝতে পারব না। তাই এই ব্যাপারে ঋষিরা যেমনটি বলেছেন তেমনটিই আমাদের মেনে নিতে হয়, যে প্রাণনক্রিয়া শরীরকে চালাচ্ছে এই ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রাণায়ামের কথা বলেন। যে কোন লোক সকাল-বিকাল যদি পনের থেকে আধ ঘন্টা প্রাণায়াম করে, এমনিতেই তার শরীর সুস্থ হয়ে যাবে, ভোতকা শরীর, পেটরোগা, লিকলিকে শরীর এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে। শরীরের যেখানেই যা গোলমাল তার মানেই সেই জায়গাতে প্রাণ একটু চঞ্চল হয়ে গেছে, প্রাণের ভারসাম্যটা বিঘ্নিত হয়ে গেছে। ইদানিং কালে প্রাণিক হিলিং এর কথা খুব শোনা যায়, ওখানেও ওরা হিলিং এর মাধ্যমে প্রাণের ভারসাম্যটা ফিরিয়ে আনে। কিন্তু খুবই সামান্য ব্যাপার, সোজা হয়ে বসে খুব গভীর ভাবে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিলে ওতেই শরীরের অনেক রোগ ব্যাধির প্রকোপ কমে যাবে। যাঁরা ঈশ্বর চিন্তন করেন তাঁদের জন্য নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াটা অবশ্য কর্তব্য। প্রাণায়াম ছাড়া কখনই ধ্যান হবে না। ঈশ্বর চিন্তন যখন খুব গভীরে চলে যায় তখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে, তার সাথে একটা স্বাভাবিক কুম্ভক হতে শুরু হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হয়ে যায়। ভেতরে যে এনার্জি এতক্ষণ যাচ্ছিল আর যে এনার্জি বেরিয়ে আসছিল আর যেটুকু এনার্জি ভেতরে থেকে যায় ওই এনার্জি দিয়েই শরীরের সব কাজ চলতে থাকে। এসব নিয়ে অনেক রকম থিয়োরী আছে। বায়োলজিতে কেউ কেউ হিসাব করে বলেন, যাদেরই respiratory system আছে, ওদের একটা হিসাব আছে একটা জীবনে এরা ঠিক এতবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। সেইজন্য যাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন পড়ে তারা বেশি দিন বাঁচে না। যাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যত ধীরে গতিতে চলে তারা তত বেশি দিন বাঁচে, যেমন কচ্ছপ খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, তাই অনেক বছর বাঁচে আবার কুকুর খুব ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়, বাঁচেও অনেক কম।

যোগীদের কাছে শরীর অত্যন্ত মূলবান, কারণ তাঁদের কাছে শরীর হল যার সাহায্যে এই জীবনে যতটা পারা যায় এগিয়ে যাওয়া। যোগীরা বুঝতে পারেন, শরীর আর মনকে আমি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখনও সিদ্ধি লাভ হয়নি, শরীরটা যদি চলে যায় এরপর আমি কোথায় জন্ম নিয়ে কোন দিকে ছিটকে যাব কোন ঠিক নেই। যোগীদের মধ্যে যাঁরা খুব উন্নত তাঁরা মনে করেন আমাকে এই শরীর ছেড়ে যাওয়া যাবে না, এই শরীর দিয়েই যা কিছু করার এই জন্মেই করে নিতে হবে। আমি যদি মরে যাই এরপর কোথায় জন্ম নেব কোন ঠিক নেই, হয়ত কোন রাজার বাড়িতে জন্ম নিলাম, সেখানে তো আমাকে আর এগোতেই দেবে না। সেইজন্য তাঁরা যোগশক্তিতে তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর থেকে অনেকগুলো শরীর তৈরী করে নেন। ঐ শরীর গুলোর মাধ্যমে যোগীরা তাঁদের সঞ্চিত কর্ম্মগুলো বার করতে থাকেন, মূল শরীর বাকি শরীরগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। তবে এগুলোকে অনেকে বিশ্বাস করেন আবার অনেক বিশ্বাস করেন না। যাঁরা বিশ্বাস করতে চান না তাঁরা বলবেন, যিনি এগুলো লিখেছেন তাঁর ভ্রমও হতে পারে বা বাড়িয়ে লিখতে পারেন। কিন্তু এতজন এর উপর লিখে গেছেন বলে এগুলোকে না করা যায় না। ঠাকুরও বলছেন, অনেকে যখন বলে গেছে তখন মেনে নিতে হয়। আমেরিকায় স্বামীজীর একটা ঘটনা আছে, স্বামীজীর সেদিন ক্লাশ ছিল, তার আগে স্বামীজী ঘরে ধ্যান করছিলেন। ওনার এক আমেরিকার শিষ্য মজা করার জন্য ক্লাশের আগে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে। তারপর যখন ক্লাশের টাইম হয়েছে সে গিয়ে দেখছে স্বামীজী ক্লাশ নিচ্ছেন। সে চমকে উঠেছে, স্বামীজী বেরোলেন কি করে! স্বামীজীর ঘরে এসে দেখছে ঘরের ভেতর তিনি ধ্যান করছেন। আবার চমকে ওখানে গিয়ে দেখে স্বামীজী ক্লাশ নিচ্ছেন। নিউ ডিসকভারিজে এই ঘটনার বর্ণনা আছে। ঠাকুরে জীবনেও এই ধরণের ঘটনা আছে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরকে বাংলাদেশে ঢাকায় দেখছেন, তিনি আবার গা

টিপে টিপে দেখেছেন। হৃদয়রামও তাঁদের ঠাকুর দালানে দূর্গাপূজার সময় দূর্গাপ্রতিমার পাশে ঠাকুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। যোগীদের এই ক্ষমতা থাকে, ওনারা সূক্ষ্ম শরীর থেকে প্রয়োজনে অনেকগুলো শরীর এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, বাকি শরীরগুলো মূল শরীরের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

প্রথম দুটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের প্রথম ধাপ আসন নিয়ে বললেন। দ্বিতীয় ধাপে বলছেন প্রাণায়াম, *প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ। বিপর্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।।১১/১৪/৩৩।।* প্রাণায়াম আমাদের শরীরকে শুদ্ধ করে, প্রাণায়ম করলে শরীরের সমস্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় তার সাথে রোগ ব্যাধিও অনেক কম হয়। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বলছেন, যে কোন ব্যাধি যোগ পথের বিরাট বিঘ্ন। সব কিছু থেকে টেনে ব্যাধি মনকে শরীরে নামিয়ে দেবে। ধ্যান জপ ছেড়ে এখন শরীরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। তার সাথে বলছেন *শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ*, আসন, প্রাণায়ম আর তার সাথে *নির্জিতেন্দ্রিয়*, ইন্দ্রিয়সংযম। যোগশাস্ত্রে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলছেন কিন্তু এখানে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছেন ইন্দ্রিয়সংযম। মনের যে অশান্ত ভাব, এর প্রধান কারণ ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব। দুঃখ সবারই আসতে পারে, প্রিয়জন মারা গেল, ছেলে অবাধ্য, ছেলের চাকরি নেই, টাকা-পয়সা নেই কিন্তু তাতেও মন শান্ত থাকছে, তার মানে তাঁর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে আছে। কেউ যদি বলে আমার মন সব সময় অশান্ত, মনে ভীষণ হতাশা, তার মানে তার ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে নেই। সারা জীবন ইন্দ্রিয় সংযম করেনি এখন বুড়ো বয়সে এসে বলছে জপে মনে বসছে না, ধ্যান করতে পারি না। যখন করার ক্ষমতা ছিল তখন কিছুই করেনি, মজা করে, স্ফুর্তি করে দিন কাটিয়েছে। তবে কিছুই যে হবে না তা নয়, একেবারে গোল্লায় চলে যাওয়ার থেকে আটকে দেবে, একটু নিয়ন্ত্রণে আসবে, কিন্তু পাহাড় ঠেলাটা সম্ভব হবে না। এখন থেকে মনন চিন্তন করতে করতে আগামী জন্মটা ঠিক হবে। আসন, প্রাণায়াম আর ইন্দ্রিয় সংযম ধ্যানের প্রথম পাঠ। অল্প বয়স থেকেই এই পাঠ নিতে হবে, একটা বয়স পেরিয়ে গেলে এর কোনটাই হবে না। তাও যিনি নিজেকে বুঝে নিয়েছেন যে আমার মন চঞ্চল, স্থির হয়ে বসতে পারি না, চিন্তন করতে পারছি না, তার মানে তাঁর সময় এসে গেছে, এবার আপনি আসন করুন, প্রাণায়াম করুন আর তার সাথে ইন্দ্রিয় সংযম করুন। যে জিনিসটা জেনে গেলেন আমার জন্য ঠিক নয়, তৎক্ষণাৎ সেই জিনিসকে ত্যাগ। এই কয়েকটি জিনিস, আসনা নিজেকেই করতে হবে, প্রাণায়াম নিজেকেই করতে হবে আর ইন্দ্রিয় সংযম নিজেকেই করতে হবে, এই জায়গাতে আমাদের কেউ সাহায্য করতে পারবে না। এই তিনটে ঠিক ঠিক না করলে কোন ভাবেই ধ্যান হবে না, সে যে পথ দিয়েই যাই না কেন, এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

তখন বলছেন *হৃদবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘন্টানাদং বিসোর্ণবৎ। প্রাণেনোদীর্য তত্রাথ পুনঃ সংশবয়েৎ স্বরম্।।১১/১৪/৩৪।।* দীক্ষার সময় গুরু যেমন যেমন করতে বলে দেন সেই রকমই করতে হয়। তবে এখানে শ্রীকৃষ্ণ যে জিনিসটা বলছেন, এটাই গুরু সাধারণ ভাবে বলে থাকেন। কল্পনা করে নিতে হবে আমাদের হৃদয়ে যেন একটা পদ্মফুল আছে। পদ্মফুলের ডাঁটি খুব পাতলা কিন্তু মধ্যে একটা ফুটো থাকে, ঠিক তেমনি আমাদের যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, এটাই যেন একটা পাতলা সুতোর মত ঐ পদ্মফুলের ডাঁটির ফুটোর মধ্যে দিয়ে গেছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পুরো জিনিসটা অতি সূক্ষ্ম আর তার মধ্যে যেন ওঙ্কার ধ্বণি হতে থাকে। যখন নিঃশ্বাস নেওয়া হচ্ছে আবার নিঃশ্বাস যখন ছাড়া হচ্ছে তখন মনে হবে হৃদয়ের ঐ পদ্ম থেকে ওঁ উঠছে আর ওখানে ঘন্টানাদবৎ, যেন একটা ঘন্টার ধ্বণি হচ্ছে, ওই ধ্বণিতে মনকে স্থির করবে। এটা কিন্তু একটা টাইম, সব জায়গাতে যে একই টাইম হবে তা নয়। এগুলো ধ্যানের গভীরে যেতে মনকে সাহায্য করে। প্রথমের দিকে কল্পনা করতে হবে, নিঃশ্বাস নিচ্ছি, নীচের দিকে যাচ্ছে তখন মনে করতে হবে মাঝখানে ওঁ যেন উপরে উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি নিঃশ্বাস ছাড়ছি ওঁ আবার যেন উপরে উঠে আসছে, ওঁ একটা ঘন্টা ধ্বণির মত কল্পনা করতে হয়, পরে ওটাই সত্যি হতে থাকে, ওঁ এ গিয়ে মনটা স্থির হয়ে যাচ্ছে। এর অন্য একটা পথ আছে, হৃদয়ে পদ্মফুলের মাঝখানে একটা জ্যোতির কল্পনা করে সেখানে মনকে একাগ্র করতে বলা হয়। যাঁরা মন্ত্র জপ করেন তাঁদের সাধারণ ভাবে এই পদ্ধতিটাই অনুসরণ করতে হয়। মনে করা যাক একজনের ইষ্ট মন্ত্র ওঁ নমঃ শিবায়, নিঃশ্বাস যখন ভেতরে যাচ্ছে তখন ঐ মন্ত্রটা উঠে ওঁমে হারিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা অনেক দিন ধরে জপ করে যাচ্ছেন তাঁদের ওঁ নমঃ শিবায় এক মিনিটে একশ বারের উপর হয়ে যায়। যাদের মন চঞ্চল তাদের ধীরে

ধীরে জপ হয়। যাঁরা আরও স্পীডে জপ করেন তাঁদের আধ মিনিটে বা কুড়ি সেকেণ্ডে একশ আট জপ হয়ে যায়। আর যাঁদের নাড়িটা খুলে যায়, তাঁদের পাঁচ সেকেণ্ডে একশ আটবার জপ হয়ে যায়, জপ তখন নিজের মতই হতে থাকে, চেষ্টা করে করতে হয় না। জপ নিজে থেকে যখন চলে তখন এক রকম চলে আর যখন নিজের চেষ্টায় জপ করছি তখন অন্য রকম চলে। কিন্তু যেটা হয় সেটা এখানে যেভাবে বলছেন এই ভাবেই হয়। তার সাথে বলছেন, ঐ ওঁম ধ্বণিতে কখন যেন ছেদ না পড়ে, অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে যে ওঁম এর চিন্তন চলছে সেটাতে যেন কখন ছেদ না পড়ে।

প্রাণায়াম অনেক রকমের হয়, যদিও এখানে কিছু বলছেন না। তবে আমাদের জন্য সব থেকে নিরাপদ প্রাণায়াম হল ক্ষমতা অনুযায়ী যতটা সময় ধরে ভেতরে নিঃশ্বাস নেওয়া হল ঠিক ততটা সময় ধরে নিঃশ্বাস বাইরে ফেলা। এইভাবে করতে করতে নিজে থেকেই কোন সময় কুম্ভক হতে শুরু করবে। কুম্ভকের ক্ষেত্রে অনেকে বলেন বাইরে নিঃশ্বাস ফেলে বন্ধ করাটা অনেক ভালো, নিঃশ্বাসকে ভেতরে রেখে বন্ধ করাটা ফুসফুসের জন্য ভালো না, তাতে ফুসফুস নতুন বায়ু ছাড়া থেকে যাবে আর বেশিক্ষণ বায়ু ভেতরে থাকলে বায়ুটা বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। সঠিক হল নিঃশ্বাসটা বাইরে ফেলে কুম্ভক করা। তবে প্রাণায়ামের অনেক পদ্ধতি আছে, আরেকটা পদ্ধতিতে বলে 1:2:1, এতে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় দশ গুণতে গুণতে নিল, আর নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় দশ গুণে ছাড়া আর কুড়ি গুণে বাইরে নিঃশ্বাসকে আটকে রাখা। কেউ যদি সমান সমান করেন তাতেও কোন দোষ নেই। তবে 1:2:1 অনেক ভালো, স্বামীজীও এর কথা বলছেন। স্বামীজীর সরল রাজযোগে এর উপর অনেক বর্ণনা আছে। আমাদের শরীরের জন্য এক রকম প্রাণায়ম হয় আর ধ্যানের জন্য আরেক রকম হয়। এটা ধ্যানের জন্য প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামে ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রের চিন্তা করা হচ্ছে, তখন আর কিছুই হচ্ছে না, জপ করছে না বলে জিভ নড়ছে না, ঠোঁট নড়ছে না, হাত নড়ছে না, কোন অঙ্গ নড়ছে না, শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্র উপরে উঠে স্থির হচ্ছে, আবার ওখান থেকে টেনে স্থির হচ্ছে, ঐ একটা জিনিসের উপরেই মনকে একাগ্র করে রেখেছে।

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ। দশকৃত্বস্ত্রিষবর্ণং মাসাদবার্গ্ জিতানিলঃ।।১১/১৪/৩৫।। ত্রিসন্ধ্যা দশবার ওঁ-কার সহযোগে প্রাণায়াম অভ্যাস করলে এক মাসের মধ্যেই প্রাণবায়ু তার বশে এসে যাবে। প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণে এসে গেলে কি হয়? বিভিন্ন রকমের সিদ্ধি আসতে শুরু হয়ে যাবে। একটু পরেই ভগবান বিভিন্ন সিদ্ধাইয়ের কথা বলবেন। অন্য দিকে প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণে না এলে জপধ্যান হবে না। এরপর কি চিন্তা করতে হবে বলছেন *হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমুর্দ্ধনালধোমুখম্। ধ্যাত্বোর্ধ্বমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।।১১/১৪/৩৬।* হৃদয়ে একটা পদ্মফুলের চিন্তা করতে হবে যার মুখ অধোমুখী। প্রথমে ওঁ দিয়ে মনকে স্থির করা হল, কিন্তু আসল ধ্যানটা এরপর শুরু হয়। মন স্থির হতে শুরু হওয়ার সাথে সাথে কল্পনা করবে পদ্মের ডাঁটিটাও সোজা হতে শুরু করেছে। এবার সোজা হয়ে গেল, তারপর পদ্মের পাপড়ি গুলো একটা একটা করে খুলতে শুরু করল। সব পাপড়ি খুলে যাওয়ার পরে দেখবে পদ্মের আটটি পাপড়ি, অষ্টদল পদ্ম। তবে দীক্ষার সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুরা বিভিন্ন রকম বলেন, এগুলো তাই যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপারে, গুরু যেমনটি যেমন ভাবে করতে বলে দিয়েছেন, তার বাইরে কাউকেই যেতে নেই। এখানে একটা সাধারণ পদ্ধতি বলে দিলেন। অনেক জায়গায় আবার পদ্মফুলের পাপড়ির সংখ্যা নিয়েও মতভেদ আছে, কিন্তু এখানে অষ্টদল। আমাদের পরম্পরাতে অষ্টদল পদ্ম খুবই প্রচলিত। তন্ত্র মতের সাধনাতেও অষ্টদল পদ্মকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও এখানে বলছেন না, কিন্তু পদ্মের রঙ রক্তবর্ণ। তবে গুরুর ধ্যান হয় শ্বেত বর্ণের পদ্মে আর ইষ্টের ধ্যান রক্তবর্ণ পদ্মে করা হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, নারায়ণ রূপে করা হচ্ছে, নারায়ণের ধ্যান কিভাবে হবে সেই ব্যাপারে বলছেন। ঐ রক্তবর্ণ পদ্মের মাঝখানে দেখবে একটা হলুদ রঙের অত্যন্ত সুকোমল আসন পাতা আছে।

কর্ণিকায়াং ন্যাসেৎ সূর্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তম্। বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্ রূপং মমৈতদ্ ধ্যানমঙ্গলম্।। ১১/১৪/৩৬।। কর্ণিকায় অনেক রকম ন্যাস করতে হয়, সেগুলো হল সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নি। বৈদিক যে প্রথা ছিল সেই প্রথা দিয়ে পূজা অর্চনা করতে বলছেন। এখন আর এভাবে পূজা অর্চনা হয় না। ইদানিং সাধারণ

লোক, যাদের দীক্ষাদি হয়নি তারা বলবে, ঐ অষ্টদলে তুমি একটা আলো বা সূর্য উদয় হচ্ছে তার কল্পনা কর, এবার ঐ জ্যোতি বা আলোর মধ্যে তোমার যে দেবতা বা ভগবানের যে মুর্তি ভালো লাগে, ধীরে ধীরে তাঁকে দেখো। আবার অনেক সময় বলবে, আমাদের যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন গুরু রূপে তাঁকে আমরা খুব সম্মান করি, ওখানে তোমার গুরুর ধ্যান করবে। গুরুর ধ্যান করতে করতে দেখবে গুরুর পাশেই তোমার ইষ্টও আছেন, তারপর গুরু ইষ্টতে এক হয়ে গেলেন। আবার অনেক সময় বলেন, গুরুর হৃদয়ের মধ্যে তিনি বসে আছেন, গুরুর ধ্যান করতে করতে গুরু ইষ্টে মিলে যান, থাকেন শুধু ইষ্ট। ন্যাস করতে বলাতেও একই জিনিসের কথা বলছেন। যেমন বলছেন অগ্নির ন্যাস করবে, অগ্নির মধ্যে আমার বা বিষ্ণুর বা নারায়ণের স্বরূপ রয়েছে, সেই রূপটাই সেই অগ্নির মধ্যে যেন জ্বল জ্বল করছে। তিনটে জ্যোতির কথা বলে দিলেন, সূর্যের জ্যোতি, চন্দ্রমার জ্যোতি আর অগ্নির জ্যোতি। অগ্নির জ্যোতির মধ্যে আমি শ্রীকৃষ্ণ বসে আছি। তবে শ্রীকৃষ্ণ ঐ রূপে নয়, ভগবান বিষ্ণুর যে রূপ পরে খুব প্রচলিত হয়েছে, বলছেন তাঁর ধ্যান করতে। যাঁরা এখনও দীক্ষাদি নেননি তাঁরা খুব সহজে এগুলোর অনুশীলন করতে পারেন, যে কেউই করতে পারে, আর বলছেন, এই ধ্যান খুব মঙ্গলময়। তবে গুরুর থেকে যে মন্ত্র নেওয়া হয় সেই মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র, তার একটা দাম আছে।

এগুলোতে মন সহজেই স্থির হয়, প্রথমে কল্পনা করে নিতে হয়, কল্পনা করে করে চিন্তনের স্তরে যায়, চিন্তন হতে হতে মন সেখানে স্থির হয়। মন যত স্থির হয় তত সে যোগের দিকে এগোতে থাকে। যখন একটা কিছুতে মন অনেকক্ষণ রাখা হয় সেটাই হয়ে যায় চিন্তন, ঐ একই জিনিসকে নিয়ে যখন নানান রকম জল্পনা কল্পনা চলে তখন তাকেই বলে কল্পনা। একই জিনিসকে নিয়ে অনেক দিন ধরে চিন্তন করলে তখন মন ওখানে স্থির হতে শুরু করে, মন যেখানে স্থির হয় সেখান থেকে তার আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান শুরু হয়। উচ্চতম অবস্থার বিচারে এই অবস্থাও কিছুই নয়, কিন্তু এখানেও উন্নতি হয়। এরপর আসে জ্যোতি দর্শনের অবস্থা, সেই জ্যোতিতে তুমি তোমার ইষ্টকে কল্পনা করবে। এখানে যেহেতু ভগবান বিষ্ণুর সাধনার কথা বলা হচ্ছে সেইহেতু বলছেন *সমং প্রশান্তং সমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্। সচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্।। ১১/১৪/৩৮।।* ভগবান বিষ্ণুর দেহসৌষ্ঠব সব দিক থেকে অনুপম, প্রতিটি রোমকূপে প্রশান্তি বিরাজিত আর দীর্ঘ বাহু সমন্বিত। বলা হয় আজানুলম্বিত বাহু শুভের লক্ষণ। ইষ্টের গ্রীবা অতি সুন্দর ও সুশোভন, কপোল সুস্নিগ্ধ আর মুখে একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে। এই জিনিসগুলোকে আমাদের চিন্তন করতে সাহায্য করার জন্য বলছেন। কারুর প্রতি যদি আমরা খুশী হয়ে কৃপা করতে যাই তখন আমাদের মুখে একটা আনন্দের ছাপ থাকে। ঠিক তেমনি আমরা যখন ইষ্টের কৃপা প্রার্থনা করছি তখন ইষ্টের মুখে আমরা একটা শুচিস্মিত, নির্মল হাসি দেখতে চাই। যিনিই আমার ইষ্ট হন, তাঁকে যখন ধ্যান করা হবে তখন তাঁকে দেখতে খুব সুন্দর হতে হবে আর মুখে হাসি থাকবে। ধ্যানের সময় প্রথমে সবটাই আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়। বিচার করে দেখতে গেলে এগুলো কোনটাই তেমন গুরুত্ব নয়, দেখতে হয় মন কোন জায়গাতে সুখ পায়, যে জায়গাতে সুখ পাবে ঐ জায়গাটাকে নিয়েই চিন্তন করতে হয়। কারণ আসল যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান অন্য একটা পদ্ধতিতে হয়, যেটা কখনই এই পদ্ধতিতে হবে না। মন যখন পুরোপুরি একাগ্র হয়ে যায় তখনই ভগবান ওই জ্ঞানটা দিতে শুরু করেন। ওই সময় যে বোধ হয়, ওই বোধটাও পুরো অন্য ধরণের হয়। তবে ওখান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এগুলো করা খুব জরুরী। মইয়ের সাহায্য নিয়ে আমি ছাদে উঠলাম, ছাদে উঠে এবার আমি যা করার করলাম, কিন্তু ছাদের ওঠার জন্য মই জরুরী, মই কিন্তু ছাদ নয়। সিমেন্টের সিঁড়ি দিয়েও ছাদে যাওয়া যায়, সেখানেও সিঁড়িটা ছাদ নয়। কিন্তু সিঁড়ি ছাড়া ছাদে যাওয়া যাবে না। আবার ঠাকুর বলছেন, ছাদে গিয়ে দেখে যে চুন সুরকি দিয়ে ছাদ তৈরী ওই চুন সুরকি দিয়ে সিঁড়িও তৈরী। যে জিনিসগুলো এখানে করতে বলা হচ্ছে এগুলো ভুল কিছু না। যারা বোঝে না তাদের অনেক সময় মনে হতে পারে আমি তো এগুলো কল্পনা করছি। কিন্তু ঐ কল্পনাই ধীরে ধীরে চিন্তনের রূপ নেয়, চিন্তনই যখন গভীর হয়ে যায় তখন মনকে একাগ্রতার দিকে নিয়ে যায়। একাগ্রতা হতে হতে একটা জায়গায় নিরুদ্ধ হয়ে যায়। মনের নিরুদ্ধ অবস্থায় সচ্চিদানন্দের ঠিক ঠিক স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। ভগবান হলেন রাজা, তিনি কোন রূপে আসবেন, নির্গুণ নিরাকার রূপে আসবেন নাকি যে রূপ চিন্তন করছিলাম সেই রূপে আসবেন নাকি সেই রূপ সম্পর্কিত অন্য কোন রূপে আসবেন কেউ

জানে না। ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে দেখছেন মা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ের রূপে দিগম্বরী হয়ে ছুটোছুটি করছেন। ঠাকুরের প্রথম যে দর্শন হয়েছে তারপর যা কিছু তিনি দর্শন করছেন তার কোনটাই কোন কল্পনা বা চিন্তন নয়। এসব করার পর ভগবান, যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি বিভিন্ন রূপে সামনে আসেন। কিন্তু এরপর তিনি কখন কোন রূপে আসবেন আর বলা যাবে না, সেটা তাঁর ইচ্ছে। সচ্চিদানন্দের কাছে মানুষের মন কিছুই না। ঠাকুর বলছেন, একদিন রতির মার বেশে মা দেখা দিয়ে বললেন, তুই ভাবমুখে থাক। ঠাকুর আবার যদি কাউকে শিক্ষা দেন কিভাবে ধ্যান করবে, তখন তিনিও এই পদ্ধতির কথাই বলবেন, কারণ এটা সহজ পথ।

শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করে বলছেন, তাঁর মুখে একটা মৃদু নির্মল হাসি, হাল্কা আলোর আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, কান দুটো সমান আর তাতে উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভিত। শরীরের রঙ বর্ষাকালীন মেঘের মত শ্যামবর্ণ, তিনি পীতাম্বর ধারণ করে আছেন। ভগবান বিষ্ণুর যে রূপ তারই বর্ণনা করছেন। আর যার যিনি ইষ্ট, তাঁর বর্ণনা সেই রকম হবে। দীক্ষার সময় গুরু বলে দেন, এই তোমার ইষ্ট আর ইষ্টের এই রূপ, ধ্যান তুমি এর রূপেরই করবে। ধ্যান অনেক প্রকারের হয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ন ধ্যান হল রূপের ধ্যান। দ্বিতীয় হয় লীলা চিন্তন, মন একটু চঞ্চল থাকলে লীলা চিন্তন করতে বলা হয়। ভগবান বিষ্ণু যে বিভিন্ন অবতার রূপ পরিগ্রহ করে অনেক লীলা করেছেন, সেই লীলার চিন্তন করা। আর গুণ চিন্তন, ভগবান বা অবতারের অনেক গুণ আছে, মনকে ওই গুণের উপর একাগ্র করতে হয়। কিন্তু আমাদের মনের স্বাভাবিক গঠন অনুযায়ী রূপ চিন্তন সব থেকে সহজ পদ্ধতি।

এই রকম অনেক কিছু বর্ণনা করে উদ্ধবকে বলছেন, আমার যে অঙ্গের প্রতি তোমার মন আকর্ষিত হয় সেখানেই তোমার মনকে স্থাপন করবে। তার মানে কখন শ্রীকৃষ্ণের হাতের উপর, কখন মুখমণ্ডলের উপর ধ্যান করার কথা বলছেন। এভাবে বলার উদ্দেশ্য, প্রথমের দিকে ধ্যান করতে গেলে কিছুই হয় না, মাসের পর মাস ধ্যান করে যাচ্ছে কিন্তু কিছুই হয় না। সেইজন্য একটা একটা করে অঙ্গের চিন্তন করে করে এগোতে হয়, কখন হাত, কখন পা, কখন মুখ একটা একটা করে চিন্তন করে এগোতে হয়। মন আমাদের এত চঞ্চল যে কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। সেইজন্য বলছেন, মন যে জায়গাতে গেছে ঐ জায়গাতেই মনকে ধরে রাখ। ঐ জায়গায় মনকে জোর করে যাওয়া হচ্ছে না, মন নিজে থেকেই গেছে। কারণ মন পুরোপুরি চঞ্চল না, মানুষ তাহলে পাগল হয়ে যেত, মনেরও একাগ্রতা হওয়া বা সজাগ থাকার একটু ক্ষমতা থাকে। বাচ্চাদের যে ভাবে নামতা মুখস্ত করান হয়, একই জিনিস বার বার করে করে মুখস্ত করান হয়। ঠিক তেমনি যখন ইষ্টের হাতের ধ্যান করছে বা পায়ের বা মুখের ধ্যান করছে, এই ভাবে ধ্যান করতে করতে মন একাগ্র হতে শুরু হয়। এই একাগ্রতা অন্তর্জগতের একাগ্রতা, বাহ্য জগতের একাগ্রতা আমাদের এমনিতেই থাকে কিন্তু অন্তর্জগতে একাগ্রতার জন্য রীতিমত অনুশীলন করতে হয়। এই ভাবে করতে করতে ইষ্টের পূর্ণ ছবি আসতে শুরু হয়, তখন জিনিসটা সহজ হয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তোমার মন, বুদ্ধি, সাধন আমার যে কোন অঙ্গে লাগিয়ে দাও তাতে কিছু আসে যায় না। মন, বুদ্ধিকে চঞ্চল হতে না দেওয়াটাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য।

ভাষণ শোনার সময় আমাদের কোন অসুবিধা হয় না, মন তখন একভাবে চলে, মন দিয়ে সব শুনে যাবে। কিন্তু চোখ বুজে একটু বক্তৃতার কথা ভাবতে বললে মন তখন কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাবে কল্পনাই করা যাবে না। চোখ বন্ধ করলেই মন দুর্দান্ত ঘোড়া হয়ে যায়। মনের যে কি সাংঘাতিক শক্তি, বুঝতে পারা যায় চোখ বন্ধ করলে। লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় যে পৌঁছে যাবে আর সামলানো যাবে না। কিন্তু সেই মনকেই যদি উপযুক্ত ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তখন মন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়ার মত হয়ে যায়। এর সহজ পদ্ধতি হল ঈশ্বরের ধ্যান করা। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানদের ছোট থেকেই গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে অনেক রকম অনুশীলনাদি করানো হত, সেই সব কারণে আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক অনেক উন্নত হত।

তৎ সর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ। নান্যানি চিন্তয়েদ্ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্।। ১১/১৪/৪৩।। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'এইভাবে করতে করতে যখন আমার সর্ব অঙ্গের ধ্যান শুরু হবে তখন তোমার চিত্তকে প্রত্যাহার করে আমার দেহের যে কোন একটা অঙ্গে মন কেন্দ্রীভূত করাই ভালো। অন্য সব চিন্তন ছেড়ে শুধু আমার শুচিস্মিত প্রসন্ন বদনের ধ্যানই করবে'। এটা আরেকটা পদ্ধতি। তবে গুরু যেমনটি বলে দিয়েছেন

সেভাবেই সবাইকে করতে হবে। সেখানেও এই ধরণের ধ্যানের কিছু সাযুজ্য পাওয়া যাবে। মন একবার ইষ্টের প্রসন্ন বদনের উপর স্থিত হয়ে গেলে বোঝা যাবে মন এবার নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এবার দেখাচ্ছেন সৃষ্টি যেভাবে হয়েছে, মন, বুদ্ধি, পঞ্চতত্ত্ব, জ্যোতি তত্ত্ব, এর একটাতে এক এক করে কিভাবে মনকে একাগ্র করতে হবে। বলছেন, আমার মুখ থেকে সরিয়ে আকাশ তত্ত্বের উপর মনকে একাগ্র করবে। আকাশ তত্ত্ব মানে সর্বব্যাপীত্ব, এই ইষ্টের মুখ চিন্তন করছে আবার বিরাটের চিন্তন করছে। আবার বলছেন আকাশতত্ত্বকে ত্যাগ করে আমার স্বরূপের চিন্তন করবে। ঈশ্বরের স্বরূপ মানে তাঁর প্রেমপূর্ণ সর্বব্যাপীত্বের উপর ধ্যান করতে বলছেন। নিয়ন্ত্রিত মনকে এবার খেলাচ্ছেন। ওখানে ধ্যান করার পর ঈশ্বরের আলোময়, জ্যোতির্ময় রূপের চিন্তন করবে। যত ধর্মগুরু আছে তাঁরা সবাই বলেন ধ্যানে আলোর মত একটা ভেসে ওঠে। জ্যোতির্ময় রূপের ধ্যান করতে করতে চিন্তা করবে ওই জ্যোতির মধ্যে আমিও আছি। প্রথমে ছিল কল্পনা, কল্পনা থেকে ধীরে ধীরে চিন্তন শুরু হল, চিন্তন হতে হতে তার ধ্যানের গভীরতা বেড়ে গেল। এরপর ইষ্টের বিভিন্ন অঙ্গের ধ্যান করছে, সেখান থেকে সরে এসে ইষ্টের মুখের উপর বেশি একাগ্র করছে, ওখান থেকে সে এবার নিজের ইচ্ছা মত ভগবানের স্বরূপের ধ্যান করছে। ভগবানের স্বরূপের চিন্তন করতে করতে তাঁর জ্যোতির্ময় রূপে গিয়ে মন একাগ্র হয়ে যায়। জ্যোতিতে একাগ্র হয়ে গেলে তখন আর চিন্তন থাকে না, ওখানে একটা বাস্তবিক উপলব্ধির অবস্থা হয়। অন্যান্য জায়গায় বলা হয়, কুণ্ডলীনি জাগ্রত হলে জ্যোতি দর্শন হয়। আর দ্বিতীয়, যেটা প্রথমের দিকে ভগবান বলেছিলেন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ মনে কর তোমার ভেতরে একটা ওঁ আছে, আর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে ওঁ রয়েছে, সেই ওঁ-এর সাথে তোমার ভেতরে ওঁ-কে জুড়ে দিচ্ছে। দুটো জিনিস, একটা হল, কল্পনা করে করে বিরাট জ্যোতিকে অনুভব করা আর দ্বিতীয় কল্পনা করে করে বিরাট সর্বব্যাপী যে নাদ ধ্বণি তার চিন্তন করা। এই করতে করতে মন যখন একাগ্র হয়ে যায় তখন দপ্ করে এই দুটো জিনিস সত্যিকারের এসে যায়। এই অবস্থায় চলে গেলে সে সব সময় অনাহত ধ্বণি শুনতে পাবে। মহারাজেদেরও অনেকের এই জিনিস হতে দেখা যায়, তবে তাঁদেরও একটা সংশয় হয় আমিই কি শুধু শুনছি নাকি অন্যরাও শুনতে পাচ্ছেন। জ্যোতি দর্শন বাস্তবিক তাঁরা দেখতে পান। তবে জ্যোতি দর্শন যে হতেই হবে তেমন কিছু নয়, যদি নাও হয় তাতে কিছু আসে যায় না। মনের একাগ্রত আর মনের পবিত্রতাই শেষ কথা। আধ্যাত্মিক পথে আমি এগোচ্ছি কিনা তার দুটো পরীক্ষা, একটা মনের একাগ্রতা আর দ্বিতীয় মনের পবিত্রতা, পবিত্রতার শেষ পরীক্ষা নিঃস্বার্থপরতা। স্বামীজী বার বার বলছেন নিঃস্বার্থপরতাই ভগবান। স্বার্থপরতাই সংসার, নিঃস্বার্থপর হওয়াটাই ঈশ্বর। ধ্যানজপে মন একাগ্র কিনা ধরা পড়ে যাবে তার কাজেকর্মে, যে কাজই করুক না কেন, একাগ্র হয়ে করছে কিনা। বেলুড় মঠে খুব নামকরা ঘটনা আছে, একবার একজন বরিষ্ঠ মহারাজ ব্রহ্মচারীদের ডেকে বললেন, আমি আজ বলে দেব কার কেমন ধ্যান হচ্ছে। তিনি সব ব্রহ্মচারীদের একটা করে সেদ্ধ আলু দিয়ে বলে দিলেন, যাও তোমরা আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। সবাই আলু ছাড়িয়ে নিয়ে আসার পর তিনি সবার আলু আর ছাড়ানো খোসা দেখতে লাগলেন। তার মধ্য থেকে একটা আলু আর তার খোসা তুলে বললেন, এই আলুর খোসা যে ছাড়িয়েছে তার ধ্যান সব থেকে ভালো হয়। পরে সেই ব্রহ্মচারী মঠের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মনের একাগ্রতার প্রতিফলন প্রত্যেকটি দৈনিন্দিন কাজে, লেখাপড়া, কথাবার্তা, চলাফেরা সবটাতে পড়বে। মায়েদের রান্নাবান্না, ঘরগেরস্থালির কাজ করে করে এমন হয়ে গেছে যে রোবটের মত কাজ নিজে থেকেই হতে থাকে। নতুন কোন কাজ দিলে ধরা পড়বে তার একাগ্রতাটা কেমন। মনের মত কাজ পেলে সবাই একাগ্র হয়ে করবে। কিন্তু একাগ্রতা মানে যখন মনের মত কাজ থাকবে না তখনও ঐ কাজ কত একাগ্র হয়ে করছে দেখতে হবে। একাগ্রতা আর পবিত্রতা ছাড়া ধ্যানের আর কোন পরীক্ষা নেই। জ্যোতি দর্শন, ঘন্টাধ্বণি শ্রবণ এগুলো কিছু না, মাইলস্টোনের মত। যদিও প্রথমের দিকেও আসতে পারে আবার শেষের দিকেও আসতে পারে। তবে প্রথমের দিকে এসে ওটা আরও নীচের দিকে নিয়ে চলে যেতে পারে। তবে অনেক দিন সাধনা করার পর জ্যোতি দর্শন হলে বা অনাহত ধ্বণি শুনতে পেলে মনে আনন্দ হবে, উৎসাহ পাওয়া যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ এইসব বলার পর খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, *এবং সমাহিতমোতির্মামেবাত্মানমাত্মনি। বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্।।১১/১৪/৪৫।।* এইভাবে তোমার মন পুরোপুরি একাগ্র হয়ে

গেলে তখন এক অন্য অনুভূতি আসবে। আমি যে সর্বাত্মা, এই সর্বাত্মার অনুভূতি হয়ে যাবে। সর্বাত্মা মানে, সাধক ধ্যানের গভীরে নিজের ভেতরে যাঁকে জ্যোতিস্বরূপ দেখলেন তখন দেখেন তিনি শুধু তাঁর ভেতরেই নেই সবার ভেতরেও আছেন।

শেষে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ। সংযাস্যত্যাশু নির্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ।।১১/১৪/৪৬।।* যোগী এই ভাবে তীব্র ধ্যানযোগ করতে করতে আমাতেই যখন সমস্ত চিত্ত, মনকে সংযম করে তখন তার কয়েকটি জিনিসের ব্যাপারে ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়। কি রকম ভ্রম? জগতে যে নানাত্ব দেখছিল, বিবিধতা দেখে আসছিল এই দেখাটা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক রকম ভালো ভালো খাবার সাজানো আছে আমরা ভাবছি কোনটা আগে খাব। কিন্তু তিনি দেখছেন সবটাই এক, গলার নীচে গেলে কোনটারই কোন দাম নেই। তিনি বাস্তবিক এমনটাই দেখেন। *দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ*, বস্তুর বিবিধতাটা নাশ হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের ধর্ম আর বিধবাদের ধর্ম এক, বিধবারা যা যা করে সন্ন্যাসীরাও তাই তাই করে। সন্ন্যাসীর ঐ একটা রঙ, গেরুয়া রঙের পোষাকই সব সময় ব্যবহার করছে, বিধবারাও সব সময় সাদা কাপড় ব্যবহার করছে। কারণ এটাই সাধকদের পথ, বিধবা মানে সে সাধিকা, সন্ন্যাসী মানে সে সাধক। যদি কেউ সাধন ভজন করতে চায়, সিদ্ধির অবস্থায় যেটা হয় সাধন অবস্থায় সেটাই করতে হয়। সিদ্ধির অবস্থায় বস্তুর বিবিধতা নাশ হয়ে যায়, সাধন অবস্থায় সাধককে বস্তুর বিবিধতাকে বর্জন করে সেই রকম জীবন যাপন করতে হবে। পোশাক আমাকে পড়তে হবে, একটা রঙ ঠিক করে দেওয়া হল, ওর বাইরে আর কোন রঙের পোষাক ব্যবহার করবে না। খাওয়া মানে আমাকে শরীর রক্ষা করতে হবে, তার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই খাওয়া-দাওয়া করতে হবে, জিহ্বার স্বাদ মেটানোর জন্য নয়, শরীর রক্ষার জন্যই আমাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হচ্ছে। বিলাসবহুল খাওয়া-দাওয়া তো ওখানেই শেষ হয়ে গেল। আর শুধু তাই না, যত রকমের ক্রিয়া আছে, ক্রিয়ার এই বিবিধতাও যোগীর নাশ হয়ে যায়। আমাকে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, ওটা করলে হয়, সেটা করলে হয়, এই ধরণের পঞ্চাশ রকমের সব ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি অনেক বিষয়ের উপর পড়াশোনাটাও বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরাখণ্ডে একজন মহাত্মা থাকতেন, ওনাকে কেউ কোন বই পড়তে দিলে সবাইকে বলে দিতেন, জীবনে আমি শুধু একটা বই পড়েছি আমার আর কোন বই লাগবে না। সেই বইটা হল জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, তার মানে নিজের মনকে এই তিনটে জিনিসের বিচারের উপরেই লাগিয়ে রেখেছেন, শুধু নিজেকে নিয়েই পড়াশোনা করে যাচ্ছেন, আর তার কিছু পড়ার দরকার নেই। জগতে যে এত বিবিধতা, এত বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্রতাকে সাধারণ মানুষ আঁকড়ে ধরে চারিদিকে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে আর ধ্যান করতে যখন শুরু করে তখন এগুলো কমতে শুরু করে। এখানে কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের কথা বলছেন না, ধ্যানের গভীরে যখন দেখছেন আমার ভেতরে যে জ্যোতি সেই একই জ্যোতি সবারই ভেতরে আছে। এরপর এতদিন যে নানাত্ব দেখে আসছিল, বস্তুতে, ক্রিয়াতে যে বিবিধত্ব দেখছিল, যোগীর বিবিধত্বের এই ভ্রমটা কেটে যায়। এতদিন সব সময় মনে হচ্ছিল অন্য জিনিসটা খুব ভালো, এই ভাবটাও তাঁর একেবারে কেটে যায়। উদ্ধব যে প্রশ্ন করেছিলেন আপনার ধ্যান কিভাবে হবে, এই হল তার উত্তর।

বিভিন্ন সিদ্ধির পরিচয় ও লক্ষণ

এরপর উদ্ধব বলছেন, আপনি যে বললেন মন এখানে লাগাবে, সেখানে লাগাবে, এগুলো করলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সিদ্ধি আসে, শক্তি আসে, শক্তি যদি নাই আসে তাহলে মানুষ কেন ধ্যান ধারণা করবে। উদ্ধবের এই প্রশ্নের উত্তরে পরের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সাধকদের যে বিভিন্ন রকমের সিদ্ধি হয় তার বর্ণনা করছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই শুদ্ধ আত্মাই আছেন, মানুষের যত জ্ঞান, যত শক্তি সব আত্মার। কখনই, কোন পরিস্থিতিতে তাই কারুর নামে আমরা বলতে পারব না যে, ওর দ্বারা এটা হবে না। বিদেশে পাপের যে পরিভাষা আমাদের দেশে পাপের সেই পরিভাষা নেই। আত্মা সর্বশক্তিমান, সেইজন্য মানুষ কখনই সব সময়ের জন্য দুর্বল হতে পারে না আর মানুষ কখনই সব সময়ের জন্য মুর্খ হতে পারে না, কারণ আত্মা জ্ঞানবান। আত্মার প্রকাশ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ মানুষ দুর্বল হবে, মুর্খ হবে, চরিত্রহীন হবে, কিন্তু এগুলো তার স্বভাব নয়। যেদিন সে তেড়ফুড়ে উঠবে তারপর আর কিছু বলা যাবে না কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমরা মনে করতে

পারি যোগে যেসব সিদ্ধির কথা বলা হয়, এগুলো আমাদের হবে না। ঠিকই, হয়ত হবে না, যেমন আমরা কোন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পারব না, কারণ তিনি হলেন ভগবান, তত্ত্বতঃ তাঁর সাথে আমি এক হতে পারি কিন্তু রূপতায়, ব্যাবহারিক জগতে কোন দিন তাঁর সাথে এক হতে পারব না। আর খ্রীশ্চান জগতে পাপ আর গুণকে যেভাবে বলা হয়, সেইভাবে আমরা কোন দিন বলব না যে এটা কোন দিন আমাদের দ্বারা হবে না। দ্বিতীয় কারুর হয়ত সিদ্ধির দরকার নাও হতে পারে, সব সময় সবারই যে সিদ্ধাই আসবে তা না। লোকাল ট্রেনে যাওয়ার সময় বোঝা যায় যে এটা বেলুড় স্টেশন, এটা বালী, এটা উত্তরপাড়া, কিন্তু রাজধানী এক্সপ্রেস যখন যায় তখন কোন স্টেশন যাচ্ছে বোঝাই যায় না, বোঝার আগেই স্টেশনটা চোখের নিমেষে হারিয়ে যায়। ঠিক সেই রকম হঠাৎ দেখা গেল ধ্যান এমন গভীর ভাবে হতে শুরু হয়ে গেল যে তখন সিদ্ধি গুলো এসে আবার কোথা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল বুঝতেই পারবে না। কিন্তু সাধারণ ভাবে মানুষ যখন সাধনা করতে থাকে, যেমন প্রচুর জপধ্যান করছে, কিংবা প্রচুর কর্মযোগ করছে, অপরের সেবা করছে বা বিবেক বিচার করছে, যে কোন ভাবেই সাধনা করুক না কেন, সাধনা করতে করতে তার মধ্যে বিভিন্ন সিদ্ধি আসে। এই সিদ্ধি কত রকমের হয় তার বর্ণনা এখানে করা হয়েছে। তার আগে ভগবান বলছেন, এর মধ্যে কিছু কিছু সিদ্ধি আছে যেটা ভগবানের স্বভাবেই থাকে, অন্যরা এই সিদ্ধি পায় না, কিছু কিছু সিদ্ধি আছে যেটা সাধক পেতে পারে। সাধনা করতে করতে সাধক যখন আমার স্বরূপকে নিয়ে চিন্তন করে আর সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদিকে নিয়ে যখন ধ্যান করতে শুরু করে আর একটা একটা করে তত্ত্বকে জয় করে নিতে থাকে তখন সেই তত্ত্বের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে আসে। এর উপর মহাভারতে বিরাট আলোচনা আছে। মহাভারতে এক জায়গায় যেমন বলছেন, কেউ যদি জলতত্ত্বের উপর ধ্যান করে তাহলে সে একটা বিশেষ শক্তি পেয়ে যায়, সেই শক্তিতে সে বিশ্বের সব জল পান করে নিতে পারে। কাহিনীতেও তাই আছে, অগস্ত্য মুনি ঠিক এই সিদ্ধিতেই সমুদ্রের সব জল পান করে নিয়েছিলেন। রাজযোগে বিভূতিপাদে এই ধরণের অনেক সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এখানে মোটামুটি তেইশ রকমের নামকরা সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এরমধ্যে অবশ্য বলা হয়েছে কি ধরণের ধ্যান করলে কি কি ধরণের সিদ্ধি হয়। আমরা অত বিস্তৃত আলোচনায় যাবো না, এমনিতেও এগুলো আমাদের কাছে খুব একটা গুরুত্ব নেই। যোগীরা এই ধরণের সিদ্ধির কথা বলেন ঠিকই কিন্তু আমরা কখন কোথাও সব ধরণের সিদ্ধি দেখতে পাইনা, কিছুই যে দেখা যায় না তাও নয়। দেখা মানেই, ঠাকুর, স্বামীজী আর ঠাকুরের পার্ষদরা সবাই সিদ্ধ পুরুষ, এনাদের জীবনে এত কিছু সিদ্ধির বর্ণনা আমরা পাই না। সেইজন্য আমরা অত গুরুত্ব দিই না, শাস্ত্রে বলা আছে বলে মানতে হয়, ঠাকুরও বলছেন, অনেকে বলে গেছেন তাই মানতে হয়, এর বেশি কিছু না।

জাগতিক যা কিছু আমরা দেখি, আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করে নিয়েছি এটা করলে ওটা হয়, ওটা করলে এটা হবে, কিন্তু আমাদের এই ধারণার বাইরে যখন কিছু দেখি তখনই সেটাকে অলৌকিক বলে মনে করি, অলৌকিক ব্যাপার কেউ দেখালে সেটাকেই আমরা সিদ্ধাই মনে করি। গ্রামের লোককে থার্মোফ্লাস্কের কথা বললে তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, একই জিনিষের মধ্যে গরম জিনিস গরম থাকে আর ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে। ওদের কাছে এটা অলৌকিক, কিন্তু আমাদের কাছে এটাই বিজ্ঞানের একটা নিয়ম। ঠিক তেমনি অনেক কিছুকে আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করে রেখেছি এই জিনিস সম্ভব নয়, কিন্তু যখন চোখের সামনে দেখা কোন ঘটনাকে বুদ্ধি দিয়ে মেলাতে পারি না তখন সেটাকেই আমরা আলৌকিক বা সিদ্ধি বলি। ঠাকুর বলছেন সিদ্ধাই খারাপ, ঠাকুর বলতে চাইছেন সিদ্ধাইয়ের জন্য যদি সাধনা করা হয় সেটা খারাপ। তাহলে সিদ্ধাইকে খারাপ কেন বলা হয়? সিদ্ধাই একটা বিশেষ শক্তি, এই শক্তিকে কত পরিশ্রম করে, কত সাধনা করে অর্জন করতে হচ্ছে। কিন্তু যেমনি সিদ্ধাইয়ের এই শক্তিকে নিজের কোন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে লাগিয়ে দেবে তখনই খেটে খুটে অর্জন করা শক্তিটা চলে যাবে। বিশ্বামিত্র ঋষির জীবনে এই ধরণের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তপস্যা করে যেই কিছু শক্তি অর্জন করতেন, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তিনি সেই শক্তিটা বশিষ্ঠ মুনির উপর চালিয়ে দিতেন। ওখানেই বিশ্বামিত্রের সব তপস্যা শেষ হয়ে যেত। এরপর তিনি আবার তপস্যায় চলে যেতেন। সিদ্ধাইয়ে শক্তিকে খারাপ বলার এটা প্রথম দিক। দ্বিতীয় দিক হল, আমি পাঁচ টাকা নিয়ে বাজারে গেলাম। পাঁচ টাকায় বাজারে ভালো বেগুনও পাওয়া যাচ্ছে আবার পচা বেগুনও পাওয়া

যাচ্ছে। আমি কোন বেগুনটা নেব সেটা নির্ভর করছে আমার উপর, আমি ইচ্ছে করলে পচা বেগুনও কিনতে পারি, ভালোটাও কিনতে পারি। ঠাকুর যে সিদ্ধাইয়ের নিন্দা করছেন সেটা ঠিক এই যুক্তিতেই নিন্দা করছেন, তোমার পুঁজি সীমিত। সামান্য কয়েকটি বছরের জন্য এই অমূল্য মনুষ্য জীবন পেয়েছ। তার উপর পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলে শারীরিক মানসিক শক্তি আরও সীমিত হয়ে যাচ্ছে। এই কয়েক বছরের জীবন, তার উপর শক্তি সীমিত, এটুকু পুঁজি সম্বল করে ভালো জিনিসটাই অর্জন করার চেষ্টা কর না কেন! সিদ্ধাই হল পচা বেগুন। পচা বেগুন কিনতেই তোমার পুঁজি শেষ। সেইজন্য ঠাকুর আমাদের জন্য হা হুতাশ করছেন, ওরে সময় যে চলে যাচ্ছে, কখন আর ভগবানকে ডাকবি! গীতাতেও ভগবান এই কথাই বলছেন – যখন ছোট ছোট দেবতাদের পূজা করছে তখন একই খাটনি দিয়ে এইসব দেবতাদের থেকে ছোটখাটো জিনিসই পাবে, একই শক্তি দিয়ে যখন ভগবানের আরাধনা করছে তখন সব কিছুই ভালো হয়ে যাবে আবার ভগবানের ভক্তি লাভও হচ্ছে, যে ভক্তি দিয়ে সে মুক্তি পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আমরা সময় ও শক্তি বৃথা অপচয় করে যাচ্ছি।

তিব্বতে একটা ঘটনা আছে, যদিও কতটা সত্য বা মিথ্যা আমাদের জানা নেই, কিন্তু তিব্বতীদের মধ্যে এই কাহিনী খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়। এই ধরণের প্রচুর অলৌকিক কাহিনী তিব্বতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। এক গরীব বিধবা ছিল। তার একটি ছেলে ছিল। গ্রামের জমিদার চালাকি করে বিধবার যা জমি-জায়গা ছিল সব দখল করে তার উপর খুব অত্যাচার করেছে। বিধবা সবাইকে দিন-রাত বলতে লাগল আমি এর বদলা না নিয়ে ছাড়ব না। ছেলেকেও তাতিয়ে যাচ্ছে তোকে এর একটা বদলা নিতে হবে। ছেলে একটু বড় হতেই মা তাকে পাঠিয়ে দিল তন্ত্র শিখতে। ছেলেটি বেশ কিছু বছর প্রায় সাত-আট বছর তন্ত্র মতে সাধনা করেছে। সাধনা করে তন্ত্রের অনেক ব্ল্যাক ম্যজিক শিখে গ্রামে ফিরে এসেছে। ছেলে ফিরে আসার পর তার মা সবাইকে বলে বেড়াতে শুরু করল আমার ছেলে ফিরে এসেছে এবার দেখ কি হয়। আর ছেলেকে শুধু এক কথা বলে যাচ্ছে তুই এবার বদলা নে।

সেই সময় জমিদারের বাড়িতে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। বাড়িতে অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে। ছেলেটিও সেখানে গিয়েছে। জমিদারের বাড়ির কারুর সাথে কিছু একটা কথা কাটাকাটি হতেই ছেলেটি একটা হাত দিয়ে কি একটা মন্ত্র বলতেই বিয়ে বাড়ির মণ্ডপে চারিদিকে আগুন লেগে গেছে। নিমেষের মধ্যে বিয়ে বাড়ির পুরো প্যাণ্ডাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিধবা মা খুব গর্ব করে বলছে এবার আমার বুকটা একটু ঠাণ্ডা হল। এই কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর গ্রামের সব লোক মা আর ছেলের আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করল। কারণ সবাই তাদের চোখের সামনে ছেলের ক্ষমতাটা দেখেছে। তন্ত্রের এমন একটা শক্তি লাগাল যে মুহুর্তের মধ্যে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে দেখলেই লোকজন রাস্থাঘাট ছেড়ে আতঙ্কে পালিয়ে যেত। এদিকে এতগুলো লোক মারা যাওয়াতে ছেলেটার মনে কোথাও একটা পাপ বোধ জেগেছে। একদিন মাকে বলে দিল আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। মহিলা ছেলেকে অনেক করে আটকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেটি মার কথা শুনল না, কোথায় যে চলে গেল কেউ জানতে পারল না। মা ছেলের শোকে প্রায় না খেয়ে খেয়েই মারা গেল। যখন মারা গেল তখন গ্রামের কেউ তাকে পোড়াতেও আসেনি। বিরাট লম্বা কাহিনী।

শোনা যায় ছেলেটি পরে নাকি বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। একজন নামকরা বৌদ্ধ গুরুর কাছে গিয়ে সে নিজের এই ঘটনার কথা বলেছে। গুরু জিজ্ঞেস করলেন তুমি এই কাজের জন্য খুব অনুতপ্ত? ছেলেটি বলল হ্যাঁ। গুরু তখন বললেন, আমি একটা মন্দির তৈরী করব, তার আগে তুমি এখানে একটা প্রাচীর তৈরী করে জায়গাটা ঘিরে ফেল, আর তোমাকে একাই এই কাজ করতে হবে। সেই বেচারী গুরুর আদেশে কারুর সাহায্য ছাড়াই নিজে খেটেখুটে একটা লম্বা প্রাচীর বানিয়েছে। পুরো প্রাচীর শেষ হওয়ার মুখে গুরু একদিন দেখতে এসেছেন। গুরু দেওয়াল দেখেই ছেলেটিকে খুব গালাগাল দিয়েছেন, এটা কি একটা পাঁচিল হয়েছে! আমি এই রকম পাঁচিলের কথা বলিনি। ভাঙো এই প্রাচীরকে। সে বেচারী তখন পুরো দেওয়ালটা ভেঙে দিল। গুরু দেখিয়ে দিলেন এই রকম করে বানাও। ছেলেটি আবার নতুন করে বানাতে লেগে গেল। আবার গুরু এসে গালাগাল দিয়ে প্রাচীর ভাঙিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে দশ বছর ধরে শুধু বানাচ্ছে আর গুরু এসে ভেঙে দিচ্ছেন। ছেলেটি মনের অনুতাপে দগ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যেতে লাগল, আমি একটা দেওয়ালও ঠিক ভাবে বানাতে

পারছি না। খাওয়া-দাওয়া কিছু নেই। একবারেই যখন ভেঙে পড়েছে গুরু তখন এসে বললেন তোমার প্রায়শ্চিত্ত এবার পুরো হয়েছে। এবার তুমি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিতে পারবে।

যে শক্তি দিয়ে আমি ঈশ্বরকে পেতে পারি, সেখানে আমি ভালো বেগুন না কিনে পচা বেগুন কিনছি। কিন্তু মানুষ একেবারে মোহান্ধ হয়ে আছে। সাধনা করে তোমার সিদ্ধাইয়ের শক্তি আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন এই শক্তি চলে যাবে তখন তুমি ফেঁসে যাবে। সিদ্ধাইয়ের শক্তির বর্ণনা আমরা লীলাপ্রসঙ্গতেও পাই। একজন যোগী অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার শক্তি অর্জন করেছিল। অদৃশ্য হয়ে নিজের কিছু কামনা চরিতার্থ করার জন্য এক বড়লোকের বাড়িতে ঢুকে যেত। একদিন শক্তি শেষ হয়ে যেতেই সে ধরা পড়ে যায়। এই ধরণের ঘটনা ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে এত বেশী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, এগুলোকে সন্দেহ করার কিছু নেই। এমনকি ইসলাম, খ্রীশ্চান পরম্পরাতেও প্রচুর পাওয়া যায়। শ্রীমা বলছেন জপাৎ সিদ্ধি, জপের দ্বারাও পরমার্থ সিদ্ধি হয়, কিন্তু অন্যান্য সিদ্ধিও আসে। শুধু জপ নয়, যে কোন জিনিস যদি দীর্ঘ দিন এক নাগাড়ে করে যাওয়া যায়, তখন তাতে একটা শক্তি এসে যায়। কিন্তু এই শক্তির কোন মূল্য নেই, যেমনি এই শক্তিকে একবার দুবার ব্যবহার করবে, শক্তিটা নিজে থেকেই চলে যাবে। আধ্যাত্মিক সাধনাকে যাঁরা জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছেন, তাঁদের কাছেও এসব সিদ্ধাই আসবে, আর তাঁদের কাছ থেকে এই শক্তি গুলো কোন দিন চলে যাবে না। কারণ তিনি তো সিদ্ধাই চাইছেন না। সিদ্ধাই আসলে একটা বিশেষ ধরণের শক্তি। যত সাধু, সন্ন্যাসী, মহারাজ আছেন তাঁদের সবারই টুকটাক কিছু না কিছু সিদ্ধাই থাকে, তবে তাঁরা এদিকে বেশী নজর দেন না বলে বুঝতেও পারেন না। যে জিনিসটা স্বাভাবিক ভাবে কখনই হওয়ার কথা নয়, সেটাই অস্বাভাবিক ভাবে হয়ে যাচ্ছে, এটাই সিদ্ধাই। আমাদের পরম্পরাতে যে সিদ্ধাইয়ের কথা বলা হয় তাকে অষ্টসিদ্ধি বলে। এখানে অষ্টসিদ্ধির সাথে আরও অন্যান্য কিছু সিদ্ধাইয়ের কথাও বলছেন।

প্রথম আসে অণিমা। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, ভগবানের একটা অনু রূপ আছে, *অণোরণিয়াম মহতোমহিয়ান*। কেউ যদি ভগবানকে অনু রূপে ধ্যান করে, তিনি অনু থেকেও অনু, ঠিক এইভাবে ধ্যান করে তখন সাধক এত ক্ষুদ্র হয়ে যেতে পারে যে, সশরীরে যেখানে খুশী প্রবেশ করে যেতে পারে। পাথরের মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না, কিন্তু পাথরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কণা রয়েছে, সেই ফাঁকের মধ্যেও সে সহজেই নিজের শরীরকে ঢুকিয়ে দিতে পারে। অহল্যার কাহিনীতে অহল্যাকে অভিশাপ দেওয়া হল সে পাষাণ হয়ে যাক। পাষাণ হয়ে যাওয়ার অর্থ কি? সে পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। অহল্যা অভিশাপে পাষাণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যোগীরা ইচ্ছে করলেই করতে পারেন। সূক্ষ্ম শরীরটা ওর মধ্যে ঢুকে গেল কিন্তু এটা বলা নেই যে তার মূল স্থূল শরীরটা তখন থাকে কি থাকে না। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'হে উদ্ধব, পঞ্চভূতের যে সূক্ষ্ম তন্মাত্রা এগুলো আমারই শরীর। যে সাধক ধ্যানের সময় আমার এই সূক্ষ্ম শরীরের কল্পনা করে, আর আমার এই সূক্ষ্ম শরীর দিয়েই সব সূক্ষ্ম শরীর হয়েছে এটাকে চিন্তা করতে থাকে সে অণিমা সিদ্ধি পেয়ে যায়'।

দ্বিতীয় মহিমা। ভগবান যেমন অনু রূপেও আছেন, তেমনি তিনি মহৎ রূপেও আছেন। এই মহৎ হল প্রকৃতির মহৎ, মানে সমষ্টি বুদ্ধি। ভগবানকে যখন মহৎ রূপে চিন্তা করে ওই রূপের সাথে এক হয়ে যায় তখন যোগী জগতের সমস্ত জ্ঞান পেয়ে যান। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'মহৎতত্ত্ব আমিই হয়েছি, এটাকে যে চিন্তা করবে, সে সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞান পেয়ে যাবে'। যোগী যদি চান, এই ব্যাপারে পদার্থ বিজ্ঞান কি বলছে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবেন। ভগবান হলেন সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টিভূত। যোগশাস্ত্রে এসব সিদ্ধিকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর যোগীদের এই কারণে খুব সুনাম। লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণনা আছে, ঠাকুর যখন সাধনা করছিলেন তখন সেখানে গিরিজা, চন্দ্র এনারা সব তন্ত্র সাধক ছিলেন, তাঁদেরও বিভিন্ন রকমের সিদ্ধাই ছিল। শরৎ মহারাজ এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাই অবিশ্বাস করা যাবে না। কিন্তু ঠাকুর সিদ্ধাই নিয়ে খুব বেশি কিছু বলেননি। অন্য দিকে স্বামীজীকে বলছেন, আমার সব শক্তি তোকে দিয়ে ফকির হয়ে গেলাম। শক্তি তো আছেই, আধ্যাত্মিক জীবনে একটা শক্তি এমনিতেই হবে।

অষ্টসিদ্ধির অন্যতম আরেকটি সিদ্ধি হল লঘিমা। লঘিমাতে যোগী যে কোন ধরণের লঘু আকার ধারণ করে নিতে পারেন। বায়ুতত্ত্ব ভগবানেরই রূপ এই ভেবে যোগী যদি ধ্যান করে চিত্তকে অনুরূপ করে নেন তখন তাঁর এই লঘিমা সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। মহাবীর হনুমান লঙ্কায় এই লঘিমা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করছেন আবার কখন মহিমা শক্তিকে লাগাচ্ছেন। প্রাপ্তি নামে একটা সিদ্ধির কথা বলছেন, এই সিদ্ধিতে যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা হয়ে যান, তখন তিনি যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোন জিনিস করতে পারেন। আরেকটি সিদ্ধাই হল প্রাকাম্য, কাম্য থেকে প্রাকাম্য। যোগী যখন প্রকৃতির অব্যক্ত রূপে ভগবানের ধ্যান করেন তখন তিনি জগতের সমস্ত রকমের ভোগ পেয়ে যান। ভগবান মায়ারও মালিক, তিনি আবার কালস্বরূপ, এই রূপে যদি কোন যোগী ভগবানের ধ্যান করেন, তখন তাঁর ঈশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে যায়। ঈশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেলে যোগী যাকে যা করতে বলবেন তাকে সেটাই করতে হবে, তার মানে যোগী সমস্ত প্রাণীকে নিজের ইচ্ছা মত চালনা করার শক্তি পেয়ে যান। ঠাকুর বলছেন, যার ঈশ্বরে জ্ঞান ভক্তি হয়ে যায় তাকে সবাই গণে মানে। মাস্টারমশাইর দিকে তাকিয়ে বলছেন – তার স্ত্রী পর্যন্ত। কারণ সব থেকে কঠিন কাজ স্ত্রীকে বশে আনা, কিন্তু ঈশিত্ব সিদ্ধি এসে গেলে সব মনকে সে নিজের খুশি মত চালাতে পারে। যোগী যখন নারায়ণ-রূপে ভগবানের ধ্যান করে চিত্ত স্থির করে দেন তখন তাঁর মধ্যে বশিতা সিদ্ধি চলে আসে। বশিতা সিদ্ধি প্রাপ্তি হলে সবাইকে যোগী বশে করে নিতে পারেন।

ঠাকুরের জীবনে আমরা অণিমা, লঘিমা, মহিমা সিদ্ধির কথা জানি না, কিন্তু বাকি সিদ্ধিগুলো প্রাকাম্য, ঈশিত্ব এগুলো পরিষ্কার দেখতে পাই। ঠাকুর বা স্বামীজীকে কখনই কারুর কাছ থেকে পালিয়ে আসতে হয়নি। স্বামীজী যখন পরিব্রাজক রূপে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন ভারতের সব বড় বড় রাজা, পণ্ডিত, গণমান্য মানুষ স্বামীজীকে আদর সম্মান করছেন। তখন স্বামীজীর বয়স মাত্র সাতাশ কি আঠাশ। বিদেশে গেলেন, সেখানেও বড় বড় লেখক, বিজ্ঞানী সবাই স্বামীজীকে মানছেন। অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে যে স্বামীজীর ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি, মেধাতে মুগ্ধ হয়ে সবাই স্বামীজীর সামনে নত মস্তক হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু শুধু যে intellectual power থাকার জন্যই এই জিনিস হচ্ছে তা নয়, স্বামীজীর মধ্যে এই যোগশক্তি গুলো খুব ভালো মতই ছিল। স্বামীজী নিজেও অনেক জায়গায় এই যোগশক্তির কথা বলছেন। নিউ ডিসকভারিতে একটা ঘটনার বর্ণনা আছে, স্বামীজী একবার খুব সুন্দর একটা লেকচার দিচ্ছিলেন, কথা বলতে বলতে হঠাৎ উনি থেমে গেলেন। থেমে যাওয়ার পর তিনি ওখান থেকে চলে এলেন। আসার সময় স্বামীজীকে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলছেন, স্বামীজী আপনি তো এত সুন্দর বলছিলেন, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন কেন? স্বামীজী তখন বলছে, তখন আমার হঠাৎ মনে হল সব শ্রোতাদের মন যে একতাল নরম মাটি হয়ে গেছে, এই মাটিকে আমি যেমন আকার দিতে চাইব তেমন আকার দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমি কখনই তা করব না, যার যেটা স্বভাব, যার যা প্রকৃতি সেই অনুসারেই তার উন্নতি হবে, সেইজন্য আমি থেমে গেলাম।

একটা কাহিনী আছে, এক ভিখারী একজনের কাছে ভিক্ষা চাইছিল, লোকটি একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ভিখারীর দিকে তাকিয়ে দুটো পয়সা দিয়েছে। ভিখারীটা তখন তাকে বলছে, আমাকে আপনি যা তা লোক ভাববেন না, আমি একজন নামকরা লেখক, আমার লেখা একটা নামকরা বই আছে 'কোটিপতি হওয়ার শত উপায়'। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করছে, তাহলে ভিক্ষা করতে নেমেছ কেন? ভিখারী বলছে, এটাও একটা পথ। বলতে চাইছে, ভিক্ষা করেও কোটিপতি হওয়া যায়। আমরা যে কাজই করি না কেন সবটাই সাধনা, ঈশ্বরের পূজা। আমরা যে এত লেকচার শুনছি, শাস্ত্র পড়ছি, এর কোনটাই আমাদের কাজে লাগবে না। আমাদের সবারই নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে। ঐ ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী থেকে থেকে একটা দুটো কথা যেন মিলে যায়। কতটা মিলবে? আমি যতটুকু জানি, আমার মনের যে বিচার, আমার যে ভাব ঐ অতটুকুই আমার, এর বেশি আমাদের হবে না। ঠাকুরের কথা, স্বামীজীর কথা মঠের হাজার হাজার সন্ন্যাসী, বাইরে এত লক্ষ লক্ষ ভক্ত পড়ছেন, শুনছেন, কিন্তু কোথাও তো কারুর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কখনই সম্ভব নয়। আমি আপনি যা আছি তাই থাকব। চারিদিকে যে এত কথা দুমদাম শুনছি এগুলো হল ক্ষেতে যেমন বীজ ছড়ান হয়, সেই রকম কথাগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবারই মাথায় ওই বীজ গিয়ে পড়ছে, কিন্তু ওর মধ্যে আমি আপনি যতটুকু

প্রস্তুত ততটুকুই নেব। ভালো কথা শোনার এক ঘন্টা পরেই সেটা মাথা থেকে নেমে যাবে, তবে ভালো লাগার অনুভবটুকু থেকে যাবে। সেইজন্য পরে আবার সুযোগ পেলে ভালো কথা শোনার জন্য মহারাজদের কাছে আসবে, ভালো অনুভবটা না থাকলে আসবে না। এরপর হাতুড়ির ঘা পড়তে পড়তে একটা সময় সে ওটার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মরুভূমিতে কাঁটা ঘাস হয়, কিন্তু কাঁটা ঘাস হয়ে গেছে মানে ওখানে মাটি আসছে। এবার যদি ঠিক মত জল দেওয়া হয়, সার দেওয়া হয় অন্য জিনিসও হবে। কিন্তু তিন ফসলি জমি হতে অনেক সময় লাগবে, ধাপে ধাপে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে রাতারাতি কিছু হয় না, যার রাতারাতি হয়ে গেছে সে হয় খুব মহা গোলমেলে লোক আর তা নাহলে তিনি প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সুযোগ হচ্ছিল না বলে চাপা ছিল। স্বামীজী থেমে গেলেন কেন, যারা শুনছিল তাদের মন তখন তৈরী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এটা ভুল পথ। এই পথে কাউকে কখন নিয়ে যেতে নেই, তাহলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ তার বাকি জিনিসগুলো, ইন্দ্রিয়, শরীর, সংস্কার এই উচ্চ ভাবের জন্য প্রস্তুত নয়। জ্ঞান সব সময় ভেতর থেকে আসে, জ্ঞান কখনই বাইরে থেকে আসে না। যত ইনফরমেশনই দেওয়া হোক না কেন, কোন ইনফরমেশান কোন কাজে লাগে না। আধ্যাত্মিক জীবনেও তাই শাস্ত্রের কোন কথা আর অমুক অমুক বক্তার অমুক অমুক লেকচার যতই শুনি না কেন, সবটাই আমাদের মধ্যে ইনফরমেশান হয়ে ঢুকছে, যা কোন দিন কোন কাজে লাগে না। তবে শুনে যেতে হবে, ঠাকুর বলছেন সময় না হলে কিছু হয় না। যদি সময় না হয়ে থাকে আর জোর করে তাকে যদি প্রভাবিত করতে থাকে তাহলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর কক্ষণ নিজে না কাউকে প্রভাবিত করতেন আর না কাউকে প্রভাবতি করতে দিতেন। ঠাকুর বলছেন, কেউ আসছে দেখলেই আমার ভেতরের ভাবটা পাল্টাতে শুরু করে দেবে। বৈষ্ণব ভক্ত আসতে দেখলে ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাব আসতে শুরু হয়ে যেত, শাক্ত ভক্ত দেখলে শাক্ত ভাব আসতে শুরু হয়ে যেত। কারণ তিনি কারুর ভাব নষ্ট করবেন না।

সিদ্ধির কথাও তাই আমাদের শুনে রাখতে হয়, কিভাবে যোগীরা শক্তি পেয়ে যান। ঠিক তেমনি দূরশ্রবণ, দূরদর্শন এই ধরণের অনেক সিদ্ধির কথা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলে যাচ্ছেন। রাজা মহারাজ বলতেন 'আজ অমুক লোক আসবে'। তিনি পরিষ্কার দেখতেন অমুক লোক আসছে। বড় বড় সাধকরাও এই ধরণের অনেক সিদ্ধি এমনিতেই পেয়ে যান। আবার আছে মনোজব সিদ্ধি। মন ও শরীরকে প্রাণবায়ুর সঙ্গে এক করে যখন ভগবানের ধ্যান করেন যোগী তখন এই মনোজব সিদ্ধি লাভ করেন। যোগীর হয়তো ইচ্ছে হয়েছে আমি এখন কৈলাসে যাবো, যেমনি ভাবলেন সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসে পৌঁছে গেলেন। নারদের এই মনোজব সিদ্ধি ছিল, যখন তখন যেখানে খুশি সেখানে প্রকট হয়ে যেতেন। আবার অনেকে বলেনে মনোজব সিদ্ধিতে যোগী সশরীরে না গিয়ে সূক্ষ্মশরীরে যান, তবে তিনি সব কিছু দেখতে পান। আবার বলছেন, ভগবানের প্রাণশরীরের ধ্যান করে একাত্ম হয়ে গেলে যোগী নিজের শরীরকে ছেড়ে অন্য শরীরের প্রবেশ করে যেতে পারেন। আচার্য শঙ্করের জীবনে এই ধরণের কাহিনী আছে। তবে আমাদের ঠাকুরের ভাবে একটাই কথা, ঈশ্বরকে ভালোবাসা, এছাড়া অন্য কিছু চলে না। এই শক্তিগুলো নিজের মত আসবে কিন্তু ওদিকে বেশি তাকাতে নেই, ঈশ্বরের যে ভাবগুলো আসে ওই ভাবেরই বেশি দাম, আর কোন কিছুর দাম নেই।

কিন্তু যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল *যথা সঙ্কল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্। ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে।।১১/১৫/২৬।* আমরা যতগুলি সিদ্ধির আলোচনা করলাম বা করব, তার মধ্যে এই সিদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঈশ্বর হলেন সত্যসঙ্কল্প, ঠাকুর সত্যসঙ্কল্প, ঠাকুর সত্যবাদী নন। অন্য দিকে গান্ধীজী সত্যবাদী ছিলেন, কারণ তিনি চেষ্টা করে করে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সত্যসঙ্কল্পের অর্থ হয়, ওখানে মিথ্যার কল্পনাই করা যাবে না। সত্যবাদীর অর্থ হল, যিনি সত্যটাও জানেন মিথ্যাটাও জানেন। যেমন সূর্যে অন্ধকারের কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি ঈশ্বরে মিথ্যার কল্পনা করা যায় না। ঠাকুরের পক্ষে মিথ্যার কল্পনা করাটাও কখনই সম্ভব না। এই ধরণের যাঁরা হন তাঁরাই সত্যসঙ্কল্প। সত্যসঙ্কল্পের মুখ দিয়ে যদি মিথ্যা কথাও বেরিয়ে যায় তখন ওটাই সত্য হয়ে যাবে, কারণ সত্যসঙ্কল্পে মিথ্যা বলে কোন কিছু হয় না। বলছেন, ঈশ্বরকে যখন সত্যসঙ্কল্প রূপে ধ্যান করা হয় তখন যোগীও সত্যসঙ্কল্প হয়ে যান, যোগীর মনে যে সঙ্কল্প উঠবে সেটাই হয়ে যাবে। যোগশাস্ত্রে বলছেন *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়াত্ব*, যোগী যখন সত্যে

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তখন তাঁর ক্রিয়াফল আশ্রয় হয়ে যায়। মানে, একটা জিনিষের কাজ না করেই তার ফল পেয়ে যান। ঠাকুরকে যদি কেউ সত্যসঙ্কল্প রূপে ধ্যান করে তখন সেও একই শক্তি পেয়ে যাবে। ঠাকুরকে যে সত্যসঙ্কল্প রূপে দেখছে তার মুখ দিয়ে আর মিথ্যা বের হবে না। সেইজন্য বলে সাধুরা কাউকে আশীর্বাদ করলে সেটা যেমন ফলবে তেমনি কাউকে যদি অভিশাপ দিয়ে দেন সেটাও লাগবে। বলছেন, যে যোগী চিত্তে সব সময় ঈশ্বরকে ধারণ করে রাখেন, তাঁর মন পবিত্র হয়ে যায়, যোগী ভূত, ভবিষ্যত, অতীত সব কিছু জেনে যান। যে যোগী ঈশ্বরের ধ্যান করে করে নিজের চিত্তকে একেবারে শিথিল করে দিয়েছেন, সেই যোগীর কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না, আগুন তাকে জ্বালাতে পারে না, জল থাকে ভেজাতে পারে না। প্রহ্লাদের ঠিক এটাই হয়েছিল, প্রহ্লাদের মন সব সময় বিষ্ণুর চিন্তাতে মগ্ন থাকত বলে তাঁকে কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

সব শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – যে বিচারশীল পুরুষ শুধু আমারই ধ্যান করে, কেবল আমারই মনন-চিন্তন করে সে এই যত সিদ্ধির কথা বলা হল, সব সিদ্ধি এমনিই পেয়ে যায়। সব সিদ্ধি পেয়ে গেলে কি হয়? আমার পকেটে একজন একশ টাকা রেখে দিয়েছে। আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম পকেটে একশ টাকা রয়েছে। আমি জানিও না কে দিয়েছে। বাজারে গিয়ে যাই হোক একটা কিছু কিনে নিলাম। মাঝে মাঝে দেখছি পকেটে কোথা থেকে টাকা চলে আসছে, আবার কখন দেখছি টাকা আছে আবার দেখছি নেই। একজন মাঝে মাঝে টাকাটা দিচ্ছে আবার তুলে নিচ্ছে। যখনই পকেটে হাত যাচ্ছে তখনই দেখছি একশ টাকা আছে। কোন সময় আবার দেখছি টাকা নেই। ভগবানের যিনি ভক্ত তাঁর সিদ্ধাই ঠিক এইভাবে আসে। ঈশ্বরকে এইভাবে চিন্তা করলে একটা জিনিস হবে, আরেক ভাবে চিন্তা করলে এই রকম হবে, অন্য আরেক ভাবে চিন্তা করলে আরেক রকম হবে। আসলে আর কিছুই নয়, সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। ভগবান হঠাৎ কখন এই সিদ্ধাই, আবার কখন ওই সিদ্ধাই দিয়ে দিলেন। আমি দেখছি কখন কোন চিন্তা করলে সেটা হয়ে যাচ্ছে, আবার কখন হচ্ছে না। কারণ সিদ্ধাই গুলো আসছে যাচ্ছে, আর আমিও সিদ্ধাই ধরে রাখতে চাইছি না। ধরে রাখতে চাইছি না বলে এগুলো আসছে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধভকে বলছেন, ঈশ্বরকে যখন বিভিন্ন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয় তখন এই সিদ্ধাইগুলো আসে আবার চলে যায়, আমার যে সত্যিকারের ভক্ত তাঁর সিদ্ধাইয়ের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না।

ভগবান বলছেন, ঈশিত্ব মানে সবারই আমি স্বামী আর বশীত্ব সবাইকে নিজের বশে রাখা, এটা আমার স্বাভাবিক গুণ। ভগবান এই রূপেও আছেন, এই রূপে যিনি চিন্তন করবেন তিনিও এই শক্তি পেয়ে যান। এখানে যে এত রকম সিদ্ধির আলোচনা করছেন, মূল কথা বলতে চাইছেন ভগবান সর্বব্যাপী, ভগবানের বিভিন্ন গুণ আর রূপ আছে, যেটাকে নিয়ে আমি চিন্তন করব সেটাই আমি পেয়ে যাব। ঠাকুরের ধ্যান করা, ঠাকুরকে ভালোবাসা, ঠাকুরের ভক্ত হওয়া এর সব কটির একটিই অর্থ, ঠাকুরের ভাব গ্রহণ করা। ঠাকুরের যে ভাবকে আমরা গ্রহণ করব সেই ভাবই ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে এসে যাবে। মা বলছেন, ঠাকুর ত্যাগীর বাদশা, এই ভাব নিয়ে ঠাকুরকে ভালোবাসলে, ধ্যান করলে সে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু এসব শাস্ত্রে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হলে কি হয় তার বর্ণনা নেই। সন্ন্যাসীরা বলবেন ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তার সব কিছু নাশ হয়ে যায়। গৃহস্থরা বলবে ত্যাগে যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে সব কিছু পেয়ে যাবে। গৃহস্থ এখন সব কিছু পাওয়ার আশায় ঠাকুরের ত্যাগ মুর্তির ধ্যান করবে। কিন্তু যাই হোক না কেন, ঠাকুরের যে ত্যাগমুর্তি এটাই ঈশ্বরের ঠিক ঠিক মুর্তি। কারণ ঈশ্বর মানেই সংসারের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুরের ত্যাগ মুর্তির ধ্যান করা মানেই সংসার ত্যাগ। আধ্যাত্মিক জীবনের এটাই শেষ কথা। ঠিক তেমনি ঠাকুর সত্যসঙ্কল্প, ঠাকুর করুণাময়, যেটাকে নিয়েই সে ধ্যান করুক না কেন ধীরে ধীরে সেই গুণ তার মধ্যে এসে যাবে। ঠাকুর বলছেন, যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। আমরা যে ঠাকুরের চিন্তা করব, সেই ঠাকুর কি কোন ছবি, নাকি কোন মুর্ত? কোনটাই না, ঠাকুর হলেন ভাববিগ্রহ। ঠাকুরের কি ভাব? সেটা আমাদেরকেই বেছে নিতে হবে, যে ভাবকে নিয়েই চিন্তন করব সেই ভাবই ধীরে ধীরে আমার ভেতরে প্রাকট্য আর আধিক্য দুটোই হতে শুরু করবে। স্বামীজী বলছেন, যখনই আমি মনে করি আমার শক্তি চাই তখন আমি সিংহের ধ্যান করি।

সিদ্ধি, সিদ্ধাই যাই বলা হোক, এগুলোকে ইংলিশে খুব সুন্দর ভাবে বলে technicalities of religion। যে কোন জিনিসে technicality involved থাকে। যেমন টিউব লাইটের আলো, এই আলো মাইথন থেকে আসছে নাকি ম্যাসাঞ্জর থেকে আসছে, কোন ট্রান্সফরমার থেকে আসছে, এত কিছু যদি আমরা জানতে যাই তাহলে আসল কাজটাই হারিয়ে যাবে। কিন্তু এগুলো জানা কি ভুল কাজ? কখনই না, যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদের জানার দরকার আছে। সেইজন্য আমাদের মাথায় সব সময় রাখতে হয়, আমি প্রকৃত কি চাইছি। যেটা চাইছি তখন ঐ জিনিসের technicalityতে কখনই নামতে নেই। ঠাকুর যেমন বলছেন, আম খেতে এসেছ আম খাও, ডাল-পাতার হিসাব করতে যেও না। কিন্তু মানুষ সব সময় technicalityকে নিয়েই প্রশ্ন করে, ঠিক তেমনি সিদ্ধাইও ধর্মের technicality, সিদ্ধাইও একটা শক্তি, কিন্তু কি ধরণের শক্তি আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। কারণ শাস্ত্রেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম সিদ্ধির কথা বলছেন আর সবারই ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সেইজন্য স্বামীজীর ওই একটি কথাকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে, সবারই মধ্যে সেই চৈতন্য আছে। ঐ চৈতন্যের উপর আবরণ পড়ে গেলেই জীবন চলতে শুরু করে। সাধনা মানে এই আবরণকে সরিয়ে দেওয়া। যত আবরণ সরানো হবে তত সে ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে, চৈতন্যের তত প্রকাশ হতে থাকে। সেই চৈতন্যের সত্তাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে। যে সত্তাতে জগৎ চলছে সেই সত্তা যদি কারুর ভেতরে ক্রমশ জাগ্রত হতে শুরু হয়, স্বাভাবিক ভাবেই জগতে তার প্রভাব ছড়িয়ে যাবে। এর সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবন। ঠাকুরকে যদি আমরা মানুষ রূপেও দেখি, এক গরীব ব্রাহ্মণ পুরোহিত, শরীর চলে যাবার পর যাঁর বিধবা ধর্মপত্নীর খাবার জুটছে না। আর তাঁর নামে সারা বিশ্বে এত মন্দির তৈরী হবে এটা কি কখন সম্ভব! যীশু কি ছিলেন? একজন সামান্য ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে। তাহলে এমন কি ঘটে গেল যে যীশুর মৃত্যুর পর দু হাজার বছর পরেও তাঁর নামে এখনও চার্চ তৈরী হয়ে যাচ্ছে? ধর্মীয় নেতারা এর নানান ব্যাখ্যা দেন। এর কতটা ঠিক, কতটা ঠিক নয় আমরা কেউই জানি না, তাই আমরা এগুলোতে বেশি জোর দিই না। তবে যে জিনিসগুলো আমাদের কাজে লাগবে, সেগুলো জানা দরকার। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর বা আচার্য শঙ্করের জীবনে আমরা অনেক কিছু দেখেছি, জীবনে না দেখে থাকলেও এনারা পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করছেন। ঠাকুর, মা, স্বামীজী আর আচার্য শঙ্কর এই চারজনই আমাদের কাছে একমাত্র প্রামাণ্য। কিন্তু এর বাইরে যা কিছু আছে, বাল্মীকি রামায়ণই হোক, তুলসীদাসের রামচরিতমানস হোক, মহাভারত হোক আর পুরাণই হোক, যেমনটি আছে তেমনটিই আমাদের পড়ে যেতে হবে, ওখানে আর কোন বাছবিচার করা যাবে না, এটা ঠিক কিনা, ওটা কতটা সম্ভব এইসব প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু যেখানে মূল তত্ত্বগুলো আসছে, সেখান বুঝতে হলে আচার্য শঙ্কর, ঠাকুর আর স্বামীজী এই তিনজনের বাইরে আর কোন কিছু দেখার দরকার নেই। স্বামীজীও বলছেন, আমাদের জীবন রামকৃষ্ণ মুষা। মুষা মানে, যারা সোনা রূপা বিক্রি করে তাদের কাছে একটা পাত্র থাকে তাতে একটা বিশেষ রসায়ন পদার্থ থাকে, ওর মধ্যে সোনা বা রূপাকে দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। স্বামীজী মুষা শব্দটা ব্যবহার করছেন, রামকৃষ্ণ জীবনটাই মুষা। রামকৃষ্ণ মুষাতে নামা মানে, ঠাকুর যা যা বলেছেন, যা যা করেছেন, বুঝতে হবে এটাই যুগোপযোগী। তার বাইরে আর যা আছে সেটাও থাকুক, ফেলার কোন দরকার নেই, কারণ সবটা মিলিয়েই একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয়। ঠাকুর নিজেই বলছেন, বেলের শাঁসটুকুই আসল, সবাই বেলের শাঁসটাই খায়, কিন্তু বেল বলতে তার বীচি, খোসা, শাঁস সবটাকে নিয়েই বলা হয়। শাস্ত্র বলতে সবটাই, তখন আর বিচার করা হয় না, এতটুকু তত্ত্ব আর অতটুকু কাহিনী, যেমনটি আছে তেমনটিই নিতে হবে। কিন্তু আমাদের এই তো এতটুকু জীবন আর সেখানে যদি পূর্ণাঙ্গ রূপে নিতে হয় তখন একটা দিক নিতে নিতেই জীবনটা শেষ হয়ে আসবে, অতিরিক্ত আর কিছু করার ফুসরৎ পাবে না। সেইজন্য মূল জিনিসটা যতটুকু আছে ততটুকুতে মনকে একাগ্র করে এগিয়ে যেতে হয়।

এখানে যত রকম সিদ্ধির কথা বলছেন এগুলো শুনে রাখা ভালো। খুব সংক্ষেপে আরেকবার আমরা বলে দিচ্ছি। অনেক রকম সিদ্ধির কথা আছে, অনেক জায়গায় অষ্টসিদ্ধির কথা বলা হয়, কোথাও চব্বিশ সিদ্ধির কথা বলে কিন্তু এখানে আঠারোটি সিদ্ধির কথা বলছেন। এই আঠারোটি সিদ্ধির কিছু মূল সিদ্ধি আছে যে সিদ্ধিগুলো একমাত্র ভগবানের। শরীর সম্পর্কিত সিদ্ধি বলছেন অণিমা, লঘিমা আর মহিমা। শরীর সম্পর্কিত এই

সিদ্ধি আমরা কাহিনীতেই পেয়েছি কিন্তু বাস্তব জীবনে কখন দেখিনি, আমরা দেখিনি বলে যে এগুলো নেই বলা যাবে না। কারণ ঠাকুরের জীবনে কোথাও কোথাও সিদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, স্বামীজীর কথাতেও বলা হয়। এর বাইরে আছে প্রাপ্তি আর প্রাকাম্য। প্রাপ্তিতে যোগী যেটা চাইছেন ইচ্ছে করলে প্রাপ্ত করে নিতে পারেন। প্রাকাম্য, কাম্য মানে যে কোন কাম্য বস্তু, সেই বস্তু এই জগতেরই হোক কিংবা স্বর্গলোকেরই হোক, সেটাকে যোগী কামনা করলে পেয়ে যান। ঈশিত্ব মানে সবার উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা আর বশীতা মানে তিনি সব কিছুকে নিজের বশে নিয়ে আসেন, বশে মানে, তিনি ইন্দ্রিয় জগতে থেকেও কোন ভাবেই জগতের কোন কিছু দ্বারাই প্রভাবিত হন না, রাজা জনক এর দৃষ্টান্ত। আরেকটা সিদ্ধি কামবসায়িতা, যে জিনিসটা তিনি কামনা করবেন সেই কাম্যবস্তুর সুখ ভোগের চরম সীমায় চলে যাবেন। বলা হয় ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবসায়িতা এই ক্ষমতাগুলো ঈশ্বরেরই আছে। তারপর আরও অনেকগুলো সিদ্ধির কথা বলছেন, খিদে না পাওয়া, তৃষ্ণা না পাওয়া, বাল্মীকী দুটো বিদ্যার কথা বলছেন, বলা ও অতিবলা বিদ্যা। এই দুটো বিদ্যা পেয়ে গেলে তার খিদে পাবে না, জলতৃষ্ণা পাবে না, নিদ্রার দরকার হবে না, তার মানে শরীরের উপর তাঁর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে গেল। এগুলো বলা খুব মুশকিল, বিজ্ঞান বলছে শরীরকে যদি খাওয়া না দেওয়া হয়, জল যদি না দেওয়া হয়, বিশ্রাম না দিলে শরীর চলবে না। কিন্তু যোগীরা বলেন সব কিছু মন দিয়েই হয়, মনের ঠিক জায়গাতে যদি নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়া যায়, শরীর নিজে থেকেই চলতে থাকবে। আর নানান রকম ভোগের ইচ্ছা, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছা, কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা, কোন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা, এগুলো যোগের বিঘ্ন। যোগীরা এমন একটা ক্ষমতা পেয়ে যান যে ক্ষমতায় এগুলো খুব সহজে পেয়ে যেতে পারেন। যুক্তিবাদীরা, বিজ্ঞানীরা মানবেন না। কিন্তু ইদানিং কালে অনেক গবেষণায় বলছেন, মনে মনেও যদি কোন কিছু করা হয় পরে দেখা যায় ওটা বাস্তবিক হয়ে যায়। একজন নামকরা দৌড়বীর তার পায়ে চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। দু তিন মাস তার দৌড়ান বন্ধ, পায়ে প্লাস্টার, দিন কুড়ি পর প্লাস্টার কাটা হবে, কিছু দিন পা সরগড় করতে চলে যাবে তারপর সে দৌড়ে নামতে পারবে। তখন কোচ আর ডাক্তাররা মিলে তাকে বলল, সকাল ছটায় তুমি সজাগ হয়ে যাওয়ার পর তোমার মনকে একটা মাঠে নিয়ে যাও, সেখানে এবার তুমি মনে কর সত্যি সত্যি দৌড়াচ্ছ, মনকে ঐ দৌড়ের মধ্যে নিয়ে যাও, এমনি স্বাভাবিক অবস্থায় যে ভাবে দৌড়াতে ঠিক সেই ভাবে মনে মনে দৌড়াতে থাক, আর আগে ঘড়ি ধরে যত স্পীডে দৌড়াতে, ঠিক তত স্পীডে আর ততক্ষণই প্র্যাক্টিস করতে থাক। প্লাস্টার পায়ে সে এখন রোজ সকাল ছটার সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছে আমি দৌড়ের প্র্যাক্টিস করছি। বাইরে থেকে কোচ ও ডাক্তাররা মনিটরিং করছে ও ভাবছে কিনা। এইভাবে দিনের পর দিন প্র্যাক্টিস চালিয়ে গেল। দু তিন মাস পর প্লাস্টার কেটে পা পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাওয়ার পর মাঠে নামতে দেখা গেল আগের মত স্বাভাবিক ভাবেই দৌড়াচ্ছে। মাঝখানে এতদিন যে বিছানায় শুয়ে ছিলে দৌড়ানর সময় এই চিন্তাটা তার একবারও আসেনি। একটা দুটো নয়, এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে।

একজন মহারাজ উনি যখন কাশীতে ছিলেন তখন সেখানে ওনার একজন পরিচিত ছিল যার প্রেতসিদ্ধি না দূর-সিদ্ধি নাকি ছিল। কেউ এসে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিয়ে দিতেন। একদিন এক ভদ্রলোক এসে তার কাছে জানতে চাইল যে তার ছেলে আর পুত্রবধূ অনেক দূরে থাকে, অনেক দিন তাদের কোন খবর পাইনা, তারা সবাই ঠিক আছে কিনা। উনি তাদের দুদিন পরে আসতে বললেন। মহারাজ বলছেন 'দুদিন পর আমরা সবাই উৎসুক মন নিয়ে ঐ প্রেতসিদ্ধের কাছে গিয়ে বসেছি'। তখন সে বলছে 'ওরা দুজন বাইরে গেছে, এখন বাড়িতে নেই। আর ওরা এটা জানিয়ে একটা চিঠিও দিয়েছে যে ওরা বাইরে গেছে বলে কোন খবর দিতে পারেনি, চিঠিটা আপনারা কালকে পেয়ে যাবেন, চিঠিটা পেলে আমাকেও খবরটা দিয়ে যাবেন'। পরের দিন দেখে সত্যিই চিঠি এসেছে। চিঠি পেয়ে সেই প্রেতসিদ্ধের কাছে গিয়ে বলছে 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, ওরা সত্যিই বাইরে গেছে, আর এই চিঠি এসেছে'।

ঠাকুরের জীবনে একটা মজার ঘটনা আছে। কলকাতা থেকে কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে পিকনিক করতে এসেছে। তাদের একটি ছেলে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে বলছে 'মশাই, সব্জী কাটবার জন্য একটা ছুরি দেবেন'? ঠাকুর বলছেন 'না, ছুরি দেওয়া যাবে না, তুমি ছুরি ফেরত দেবে না'। 'না, না, ছুরি ঠিক ফেরত

দিয়ে যাব'। সে যাই হোক অনেক দিব্যি করে ঠাকুর তাকে ছুরি দিলেন। ঠাকুরের কথাই ঠিক, খাওয়া দাওয়া করে তারা চলে গেল কিন্তু ছুরি আর ফেরত দেয়নি। পরে ভাগ্নে হৃদুকে বলছেন 'যা, দ্যাখ গিয়ে ঐ গাছের তলায় সব্জীর খোসা পড়ে আছে ওর মধ্যে ছুরি রাখা আছে'। হৃদু গিয়ে দেখে সত্যিই ঠিক ঐ জায়গাতেই ছুরিটা পড়ে আছে। হৃদুতো অবাক, মামা কি করে পুরো ব্যাপারটা জানতেন, আর ওখানেই ছুরি রাখা আছে তাও কি করে জানলেন। ঠাকুরের কাছে ছুরিটা নিয়ে এসে হৃদু বলছে, আপনি প্রথম থেকে যা যা বলে গেছেন সব একেবারে ঠিক ঠিক ফলে গেছে। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন 'এতে অবাক হওয়ার কি আছে, খুবই সাধারণ ব্যাপার, যে ছেলেটি ছুরি নিতে এসেছিল ওর জামার বোতাম দেখেই বুঝেছিলাম এ গোছানো লোক নয়, ছুরি এ ফেরত দেবে না, তারপরে এটা কাকতালীয় হয়ে গেছে যে ও ফেরত দেয়নি'। হৃদু এবার জিজ্ঞেস করছে 'তা, আপনি বুঝলেন কি করে যে গাছের তলায় ছুরিটা পড়ে আছে'? 'আরে রোদ দেখেই বুঝেছি, রোদের মধ্যে বসে কেউ তো আর সব্জী কাটবে না, গাছের তলায় ছায়াতে বসেই সব্জী কাটবে, তাই বললাম গাছের তলায় আছে। আর ওতো দিয়ে যেত, কিন্তু কাটতে গিয়ে খোসার মধ্যে পড়ে গেছে, চোখে পড়েনি বলে ভুলে গেছে'। আমার আপনার মত বোকা লোক বলবে ঠাকুর দিব্য দর্শনে সব দেখে নিয়েছিলেন।

স্বামী শঙ্করানন্দের স্মৃতি কথায় একজন মহারাজ বলছেন – মহারাজের কাছে গেলেই ওনার শরীর থেকে একটা খুব সুগন্ধ বেরুতো। আমি একজন মহারাজকে জিজ্ঞেস করাতে উনি বললেন, সমাধিবান পুরুষ কিনা, সমাধিবান পুরুষদের শরীর থেকে অনেক রকম দিব্য গন্ধ বেরোয়। তারপর ওনার সেক্রেটারিকে দিব্যগন্ধের কথা বলাতে উনি বললেন 'আরে না না, কোন দিব্যগন্ধের ব্যাপারই নয়, মহারাজের জামা কাচাতে একটা বিশেষ ডেটারজেন্ট ব্যবহার করা হয়, আর ঘরে মশা তাড়াবার সময় আমরা একটা বিশেষ কেমিক্যাল স্প্রে করি, এই দুটো গন্ধ মিশে একটা তৃতীয় গন্ধ তৈরী করছে, যেটা অন্য আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ঐ গন্ধটাই লোকে পায়। যে মহারাজ স্মৃতি কথা লিখছেন তিনি বলছেন, সেক্রেটারির কাছে শুনে আমি হতাশ হয়ে গেলাম। একটা দিব্য জিনিস ভেবে ভেবে নিজেকে ঐ গন্ধ আঘ্রাণ করার সৌভাগ্য মনে করছিলাম। বেশীর ভাগই এই ধরণের ব্যাপার।

পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা কিছু করছি, দেখছি, শুনছি। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অতি সীমিত। বিজ্ঞান কি করছে? আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলোর ক্ষমতাকে আরো একটু প্রসারিত করে দিচ্ছে। একটা টেলিস্কোপ লাগিয়ে দিচ্ছে মানে চোখের দৃষ্টিকে আরো বাড়িয়ে দিলেন, মাইক্রোস্কোপে চোখে দিয়ে দেখছেন মানে চোখের একটা বিশেষ ক্ষমতা হয়ে গেল, যখন রেডিওর সিগন্যাল গ্রহণ করছেন তখন আপনার কর্ণেন্দ্রিয়র শক্তিটা একটু লম্বা করে দিলেন। তেমনি যখন কম্প্যুটারের মাধ্যমে অনেক কিছু গবেষণা করছেন তখন মনকে, যেটা একটা ইন্দ্রিয়, একটা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ সম্পন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন, আপনার হাত পা কে ছেড়ে দিন, চোখ, কান আর কিছুটা মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করে দিয়েছে, কিন্তু এর বাইরে যে একটা কিছু হতে পারে, সেই জিনিসটা কখনই ধরতে পারবে না। আমাদের চোখ যদি আরো একটু শক্তিশালী হত তাহলে আমরা ইনফ্রা রে দেখতে পারতাম, ইনফ্রা রে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকার সৈন্যরা প্রথম ব্যবহার করেছিল, রাত্রিবেলা ইনফ্রা রে চোখে লাগিয়ে যুদ্ধ করত। আমাদের চোখে যদি ইনফ্রা রেড থাকত আর আপনি যদি ছুটে ছুটে বাড়ি আসেন তাতে আপনার শরীর থেকে তাপ বিকিরণটা বেড়ে যাবে, বাড়ির লোকেরা দেখবে আপনি অনেক মোটা হয়ে গেছেন। আবার ঠাণ্ডার দিনে শরীর থেকে তাপ বিকিরণ কম হয় বলে রোগা দেখাবে। চোখের দৃষ্টি শক্তি হেরফের হয়ে গেলে জগতকে এখন যেমন দেখছি তখন পুরো অন্য রকমে দেখব। সেইজন্য আমাদের জ্ঞানের মাত্রা আর জ্ঞান আহরণের সুযোগ খুবই সীমিত। এই কারণে কখনই কোন কিছুতে সন্দেহ নিয়ে আসা ঠিক নয়, কেননা এই ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কতটা আর জানব, আর যেটাও জানি সেটাই বা কতটা ঠিক ঠিক জানছি কি করে বুঝব।

একটা বইতে ভারতের এই সবকে নিয়ে খুব সুন্দর বলছে India is a land where a magician wants a religious touch and religious people want magical touch. যারা এখানে ধর্মীয় গুরু

তারা যদি দুটো ম্যাজিক শিখে নেয় তাহলে তারা একেবারে কেল্লাফতে করে দেবে। আর যত ম্যাজিসিয়ানরা আছে, যারা রাস্তা ঘাটে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, লোকেরা তাদের কাছে জড়িবুটি চেয়ে বেড়ায়। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকেরাই ম্যাজিসিয়ানদের কাছ থেকে ধর্মের খবর জানতে চায় আর ধর্মীয় গুরুর কাছ থেকে ম্যাজিক দেখতে চায়, এই হল ভারতে ধর্মের অবস্থা। তবে যাঁরা সত্যিকারের ঈশ্বরের সাধক, যিনি সত্যি সত্যিই আধ্যাত্মিক চরম সত্যকে জানতে চাইছেন তাঁর কাছে এগুলো কোন আশ্চর্যের ব্যাপারই নয়, খুবই নগণ্য ব্যাপার। স্বামীজী সরল রাজযোগে বলছেন, কেউ যদি নাকের উপর ধ্যান করে কিছু দিনের মধ্যেই তার নাকে সুগন্ধ আসতে শুরু করবে, যারা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণায়াম অভ্যাস করে তাদের কণ্ঠস্বর সুন্দর হয়। এগুলো শারীরিক ব্যায়ামের মত। যদি হাতের ব্যায়াম করে হাতের পেশী শক্তিশালী হয়ে যাবে, পায়ের ব্যায়াম করলে ঐ জিনিসই হবে। ঠিক সেই রকম মনকে নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করলে মনের কিছু ক্ষমতা বেড়ে যাবে। যাই হোক, এখনও উদ্ধবের সাথে শ্রীকৃষ্ণ কথা বলে যাচ্ছেন।

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ

গীতার মত এখানেও শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অনেক বিভূতির বর্ণনা করছেন। তার সাথে গৃহস্থের কি কি ধর্ম, সন্ন্যাসীর কি কি ধর্ম এই ধরণের নানা প্রসঙ্গ উদ্ধভকে বলে যাচ্ছেন। উদ্ধভ আবার শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ব্যাখ্যা করতে বলছেন। জানতে চাইছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার বাণীই বেদ হয়েছে, বেদের মধ্যে কত কিছু আছে, কোথাও বিধি আছে, কোথাও নিষেধ আছে, আবার কোথাও আপনি বলছেন কোন ধরণের ভেদ দৃষ্টি রাখবে না, কখন আবার বলছেন, বিধি আর নিষেধ রাখবে, আপনার এই ধরণের কথা আমার মনে অনেক সংশয় উৎপন্ন করছে, আমি বিভ্রান্ত, অনুগ্রহ করে আমার এই সংশয় দূর করে দিন। হিন্দু ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রূপে নিলে আমাদের এত রকমের বিভ্রান্তি হবে যে কোন কিছুই আমরা মেলাতে পারব না। হিন্দুদের নামে একটা অভিযোগ করা হয় যে হিন্দুরা হল কপট, কপট বলে বলতে চাইছে তারা মুখে বলে একটা করে আরেকটা। যেমন হিন্দু ধর্ম বলছে আত্মাই সত্য, তার মানে সবাই সমান, *বসুধৈ কুটুম্বকম্*, এই কথা হিন্দুরাই বলে, অথচ এরাই নারী নির্যাতন করে। সমস্যা হল, শাস্ত্রে সব রকম কথাই আছে, কিন্তু সব কথা আবার সবার জন্য নয়, অধিকারী ভেদ আছে। অধিকারী ভেদ অন্য কোন ধর্মে নেই, একমাত্র হিন্দু ধর্মেই আছে। সেইজন্য অনেক রকম বিভ্রান্তি হয়, কারণ একটা জাতি হাজার হাজার বছর ধরে একটা জিনিসে নিজের উপলব্ধি, নিজের জ্ঞান ঢেলে যাচ্ছে। ভাগবত সব কিছুকে একসাথে জড়ো করে গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। গীতাতেও তাই, যদিও ভাগবতের তুলনায় গীতা খুবই ছোট্ট গ্রন্থ, কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই ভারতে যত রকমের মতবাদ, দর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, সব কটি মতবাদ, দর্শনকে এক জায়গায় এনে সমন্বয় করে দিয়েছেন।

উদ্ধবের কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন *যোগোস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহনোহস্তি কুত্রচিৎ।।১১/২০/৬। শ্রেয়োবিধিৎসয়া*, মানবকল্যাণের জন্য আমি অধিকারী ভেদে তিনটে বেদ সৃষ্টি করেছি। ভাষ্যকাররা এখানে যোগ করে দিয়েছেন, অধিকারী ভেদে আমি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তি যোগ এই তিন প্রকার যোগের উপদেশ দিয়েছি। ভাষ্যকাররা কখনই নিজের মন থেকে কিছু যোগ করেন না। শ্লোকে একটা কোন শব্দ আছে, ভাষ্যকার বলবেন, এই যে শব্দটি এখানে আছে এই শব্দকে বাদ দিয়ে দিতে হবে, এই শব্দটা নিপাতবাচক। আমরা তো ছাড়ব না, গীতার মধ্যে ভগবান এই শব্দ দিয়েছেন, আমি সেই শব্দকে কেন ফেলে দেব! ভাষ্যকাররা অনেক সময় আবার বলছেন, এই শ্লোকে এই শব্দটি উহ্য আছে বা এই শব্দে এই অক্ষরটা লাগাতে হবে। ঈশোপনিষদে আছে *সম্ভূতিং চ বিনাশং চ*, আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বলছেন এখান *অসম্ভূতিং* হবে, *সম্ভূতিং* হবে না। আচার্য শঙ্করকে অনেকে বলতে পারেন আপনি তো বেদকেই পাল্টে দিচ্ছেন, ঋষি রচনা করে গেছেন আর আমরা ছোটবেলা থেকে মুখস্ত করে আসছে *সম্ভূতিং চ বিনাশং চ*, আর আপনি হঠাৎ আজকে বলছেন *সম্ভূতিং* হবে না *অসম্ভূতিং* হবে। স্বামীজীও কোথাও বলছেন আচার্য শঙ্কর text torture করেছেন। আচার্য কিছুই text torture করেননি। আবার গীতাতে এক জায়গায় আচার্য শঙ্কর বলছেন, গীতার এই শ্লোক থেকে এই শব্দটা ফেলে দিতে হবে। আমরা যখন পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বলি সব সময় আমরা সব কথা বলি না, অনেক সময় ইঙ্গিত ইশারা দিয়েও অনেক কিছু কথা

বলে দেওয়া হয়। একটা শব্দ বলে দিল 'যাও', যাকে শব্দটা বলা হল সেই একমাত্র বুঝতে পারবে কি বলতে চাইছে, বাকিরা কেউ বুঝতে পারবে না। ভাষ্যকাররা প্রথমে দেখেন পুরো শাস্ত্রের মূল বক্তব্যটা কি, শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটাকে নিয়ে এবার শাস্ত্রের মধ্যে ছোট ছোট যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলোকে ঐ পূর্ণাঙ্গ চিত্রে মানানসই ভাবে বসাতে হয়। যেমন আমরা জানি ঠাকুর বলছেন মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। স্বামীজীর রচনাবলী পড়ে মনে হল স্বামীজীরও একই বক্তব্য। এবার একদিন বেলুড় মঠে এসে দেখছি যে এখানে খিচুড়ি খাওয়ানো চলছে, সবাই খুব আনন্দে খিচুড়ি খেয়ে যাচ্ছে। এরপর আমার মনে হবে শুনেছিলাম ঈশ্বর দর্শনই উদ্দেশ্য কিন্তু এখানে এসব কি হচ্ছে! পুরো জিনিসটাই আমার কাছে মিসম্যাচ হয়ে গেল। এবার একজন ভাষ্যকারের দরকার, যিনি ব্যাখ্যা করে বলে দেবেন, ঐ যে ঈশ্বর দর্শনের কথা আগে বলা হয়েছিল, এই খিচুড়ি খাওয়ানাটো তারই একটা অঙ্গ। তারপরে আবার একটা সংযোজন করে দিয়ে বলবেন, সাধারণ ভক্তরা খায় আর উচ্চমানের ভক্তরা ধ্যান করে। ভাষ্যকার প্রথমে পূর্ণ চিত্রটা নেন, এই পূর্ণ চিত্র কিন্তু সব ভাষ্যকাররা নিতে পারেন না। আচার্য শঙ্করের মত যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ হন একমাত্র তাঁরাই পুরো চিত্রটাকে নিতে পারেন। আচার্য শঙ্কর গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র সব কটির ভাষ্যা রচনা করে বলছেন, সব কটি শাস্ত্র একটি কথাই বলছে, ঈশ্বরেরই সত্তা আছে, ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই। আচার্য শঙ্কর এই সত্তাকে মেনে এবার যেই চলতে শুরু করবেন তখন হঠাৎ দেখা যাবে একটা শব্দ মিলছে না। শব্দ না মেলা অনেকগুলো কারণে হয়। প্রথম কারণ, শাস্ত্রের বেশির ভাব কথা শ্লোকে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ছন্দ মেলানর জন্য যতটুকু দরকার তার থেকে একটা দুটো অতিরিক্ত শব্দ থাকে, আবার ঐ ছন্দকেই মেলানোর জন্য একটা অক্ষরকে কমিয়ে দেওয়া হয়, ভাষ্যকার সেখানে ঐ অক্ষরটা যোগ করে দেন। আবার অনেক সময় কোন বিশেষ কারণে একটা শব্দ বা অক্ষর বাড়ানো থাকে। সেইজন্য ভাষ্যকার ছাড়া কক্ষণ কোন শাস্ত্র বোঝা যায় না। এই শ্লোকেও অধিকারী ভেদের কথা সেভাবে বলছেন না, কিন্তু ভাষ্যকার নিজের তরফ থেকে যোগ করে দিয়েছেন। কারণ এর পরে যে কথা শ্রীকৃষ্ণ বলবেন তাতে অধিকার ভেদ কথাটা আছে, সেই কারণে যে জায়গাতে নেই সেখানেও ঐ শব্দটা যোগ করে দেন। সেইজন্য ভাষ্যকার ছাড়া শাস্ত্র পড়লে সবাই ভুলভাল বুঝে নেবে।

ভগবান বলছেন বেদ আমিই দিয়েছি আর বেদের তিনটে যে পদ সেটাও আমিই দিয়েছি। তিনটে পদ মানে, *জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ*। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল অধিকারী ভেদ এই কথাটি। সবাই সব কিছু করতে পারে না। ঠাকুরের ভাবধারাতেও দুই রকমের সাধনা আছে, একটা বহিরঙ্গ সাধনা আর অন্যটি অন্তরঙ্গ সাধনা। ঠাকুরের কথামৃত হল অন্তরঙ্গ সাধনার জন্য। সেইজন্য কথামৃত সবাই পড়ে ঠিকই কিন্তু সবার জন্য কথামৃতের সাধনা নয়। আর বহিরঙ্গ সাধনা হল স্বামীজীর সেবার আদর্শ। যারা ধর্ম জানে না, বোঝে না, মানতে চায় না তাদের জন্য স্বামীজী সেবার আদর্শ সামনে রাখলেন। ভগবানে তোমার বিশ্বাস নেই বলছ, কিন্তু সমাজ, মানুষকে তো বিশ্বাস করছ, তাতেই হবে। তুমি সমাজের সেবা কর। এটাই বহিরঙ্গ সাধনা। বহিরঙ্গ সাধনা করতে করতে একটা সময় তার মধ্যে চেতনা জাগ্রত হবে। এত লেকচার, ভক্ত সম্মেলন, শিক্ষার প্রসারের জন্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য যে এত কর্মযজ্ঞ চলছে এগুলো সবই বহিরঙ্গ সাধনা। অন্তরঙ্গ সাধনা যখন শুরু হয় তখন সে নিজের অন্তর্জগতে ডুবে যায়, তার আর তখন জগতের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না আর জগৎ থেকেও কিছু প্রত্যাশা করে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, অধিকারী ভেদে, মানুষের আধার অনুযায়ী আমি তিন রকম সাধনার কথা বলেছি – জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। পরম শান্তি প্রাপ্তির জন্য এই তিনটে ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তার মানে, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটে কোন কাজের নয়, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তিযোগ এই তিনটেই মানুষের প্রয়োজনে লাগে।

প্রায়ই এনারা তিনটে বেদের কথা বলেন, তিনটে পথের কথা বলেন, বেদ কিন্তু চার আর পথও চার। কিন্তু ওই চারটেকে যদি নামিয়ে আরও ছোট করতে শুরু করা হয় তখন একটাই বেদ থেকে যায়, ঋগ্বেদ। কিন্তু সাধনার পথ কোন মতেই দুটোর নীচে আসবে না, এই দুটি পথ হল কর্মের পথ আর জ্ঞানের পথ। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন, জপ, ধ্যান, পূজা এগুলোও কর্ম। জগতে দুই ধরণের মানুষ হয়, এক ধরণের মানুষ জানে আমি আলাদা জগৎ আলাদা, আমি আলাদা জগৎ আলাদা এই বোধ যেখানে সেখানে ক্রিয়ার ভাব এসে যায়।

যেখানেই ক্রিয়ার ভাব সেখানেই কর্মযোগ। দ্বিতীয় ধরণের মানুষ যাদের মধ্যে প্রথম থেকেই একত্ব বোধ হয়ে আছে, তাদের সাধনাকে বলে জ্ঞানযোগ। কর্মে আবার অনেক রকমের কাজকর্ম আছে, ঐটাকে আলাদা করার জন্য বলা হয় ভক্তিযোগ। জ্ঞানযোগে যে চিন্তন আদি হয় ওটাকেই বলছে বিচার, সব সময় বিচার করতে হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু সাধক আছেন যাঁরা শুধু ধ্যান করে যান। এদের আলাদা করে বোঝাবার জন্য বলা হয় রাজযোগ। রাজযোগেও আবার দুই ধরণের ধ্যান হয়ে যায়, এক প্রকার ধ্যানে মনে করেন আমি সেই চৈতন্য আর আরেকটা ধ্যান হয় যেখানে ঈশ্বরের ধ্যান করা হয়। রাজযোগও এই ভাবে দুই রকমের হয়ে যায়, একটা জ্ঞানমার্গ আরেকটা ভক্তিমার্গ। এরপর সাধনার পথের সংখ্যা ছড়াতে থাকে, এর কোন শেষ নেই। যে পথেই সাধনা হয়ে থাকুক, সব পথেই মূল কথা কিন্তু দুটো থেকে যায়, আমিত্বের বোধ আছে আর আমিত্বের বোধ নেই। আমিত্বের বোধ যাঁর আছে তিনি কর্মসাধন করেন, আর যাঁর আমিত্বের বোধ কমে গেছে তিনি জ্ঞানমার্গের সাধন করেন। এখানে ভগবান তিনটি যোগের কথা বলছেন, জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম।

নির্বিমানাং জ্ঞানযোগ ন্যাসিনামিহ কর্মসু। তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্।।১১/২০/৭।। যার কর্ম এবং কর্মফল থেকে পূর্ণ বিরক্তি এসে গেছে তার জন্য জ্ঞানযোগ। এটাকেই ঠাকুর কত চরমে নিয়ে গিয়ে বলছেন, জ্ঞানীর হাত কেটে গেছে, দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে, জ্ঞানী বলছেন কই আমার তো কিছু হয়নি, এরাই ঠিক ঠিক জ্ঞানী। তার কি ব্যাথা লাগছে না? অবশ্যই লাগছে, কিন্তু জ্ঞানীর আমিত্ব জুড়ে আছে শুদ্ধ আত্মার সাথে, শরীরের সাথে নয়। ভগবান গীতায় নিজের কথা বলছেন *ন মে কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা*, কোন কর্মে আমার আসক্তি নেই আর কোন কর্মফলেও আমার স্পৃহা নেই। কাজ করতে চাইছে আর কাজের ফলেও স্পৃহা আছে, এই মনোভাব খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু সব থেকে বেশী খারাপ হল কর্ম না করে কর্মের ফলে স্পৃহা। গীতায় ভগবান এই মনোভাবের খুব কঠোর নিন্দা করছেন। কর্ম না করে কর্মফলের প্রতি স্পৃহা মানুষের সব থেকে বড় শত্রু, এই মানসিকতাই মানুষকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। আমরা সবাই মুখে বলছি আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই, কিন্তু তার জন্য যে পরিশ্রম করতে হবে সেই পরিশ্রম করতে রাজী নই। ঈশ্বর দর্শনের জন্য যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়ের দরকার সেই দিকে আমাদের কারুর মন নেই, কিন্তু মুখে সবাই বলছি আমি ঈশ্বর দর্শন করতে চাই। আমরা সবাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত – কর্ম না করে কর্মফলের প্রতি স্পৃহা। আজকালকার ছেলেমেয়েরাও কাজকর্ম কিছু করতে চায় না কিন্তু হাতে প্রচুর টাকা আসুক চাইছে। গীতাতে এদের কথাই ভগবান বলছেন *কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্*, কাজ করছে না কিন্তু মনে মনে চিন্তা করে যাচ্ছে, আমার এই হোক, সেই হোক।

অনেকে বলবেন ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান কোন কর্মফলের দ্বারা হয় না। ঠিকই বলছেন, কিন্তু আত্মজ্ঞান হওয়ার আগে মানুষকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা আবার পুরোটাই কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ। ঈশ্বর ত্রিগুণাতীত, তাই ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান যাই বলুন, এগুলো কর্মের কোন ফল নয়। কিন্তু তার আগে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যা অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কবে ঈশ্বর দর্শন হবে সেটা আমাদের হাতের বাইরে। এই জায়গাটা কর্মফলের বাইরে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত খাটতে হবে। কি রকম খাটনি? ঠাকুরের বারো বছর সাধনার ইতিহাস পড়লে বোঝা যাবে কি ধরণের খাটতে হবে। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। জ্ঞানযোগ কার জন্য? যার কর্মের প্রতি আসক্তি শেষ হয়ে গেছে, যার কর্মফলের প্রতি স্পৃহা চলে গেছে আর যার কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। এটা গেল ঈশ্বর লাভের ব্যাপারে। আর জাগতিক স্তরে সবাই এই তিনটে স্তরে পড়ে আছে, প্রথম হল কর্মফলে স্পৃহা, দ্বিতীয় কর্মে স্পৃহা আর তৃতীয় কর্মে স্পৃহা না থাকলেও কর্ম ছাড়তে পারছে না। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসে বসে সবার সব রকম কথাবার্তা আচরণ লক্ষ্য করতেন। বলছেন – গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে এসে বুড়ি বিধবারা নিজেদের মধ্যে যত রকমের বৈষয়িক কথাবার্ত বলবে, আমার নাতির বিয়েতে আমাকে সব কিছু করতে হল, পান সাজা থেকে শুরু করে ফুলশয্য তৈরী করা পর্যন্ত। ঠাকুর কি বলতে চাইছেন? সে বিধবা কিন্তু এখনও কর্ম ছাড়তে পারছে না, এটাই কর্মস্পৃহা। এখনকার ছেলেরা বলে আমি কম মাইনেতে চাকরী করতে রাজী আছি কিন্তু আমার job satisfaction চাই। তার মানে, কর্মফলে স্পৃহা নেই কিন্তু কর্মে স্পৃহা আছে। আমার মনের মত কাজ চাই।

মনের মত কাজ সবাই করতে পারে। মনের মত কাজ না পেয়েও কাজে কুশলতা দেখাচ্ছে তবেই বোঝা যাবে সে যোগ করছ। কর্মযোগ মানে ধর্মে অবস্থিত থাকা। কর্মযোগে ফল আসবে না তা নয়, রীতিমত ফল আসবে, যে কোন কর্ম করলে তার ফল আসবেই। কিন্তু যিনি কর্মযোগী তিনি কোন ফলাকাঙ্খা করেন না। কর্মযোগে তাই ধর্ম আর কর্ম দুটো এক সঙ্গে চলে। আমি একটা পথ ঠিক করে নিয়েছি, এতে আমার নাম হবে, যশ হবে, টাকা হবে, খুব ভালো, বদনাম হবে, আমার অর্থের নাশ হবে, তাও আমি তাই করব, কারণ আমিই ঠিক করে নিয়েছি এটাই আমার ধর্ম পথ, এটাই আমার কর্ম। দুঃখ সব মানুষেরই আসে, কিন্তু শোক তাদেরই হবে যারা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে না। বর্তমান ছেলেমেয়েদের কত রকম সমস্যা বেড়ে গেছে, আত্মহত্যা করা, ড্রাগ নেওয়া, আরও কত কিছু করছে। কেন করছে? শোক, শোক থেকে বাঁচার জন্য তারা এসব করছে। তৃতীয় স্তরে কর্মেও স্পৃহা নেই আর কর্মফলেও স্পৃহা নেই কিন্তু কর্ম থেকে ছাড়া পাচ্ছে না, এটা কপাল। দৈব বশে এমন এমন দায়ীত্ব চলে আসে যে সেগুলো সে আর উপেক্ষা করে এড়িয়ে যেতে পারে না। বাবা-মা ছেলের বিয়ে দিয়েছে। তাদের সন্তানও হয়েছে। তারপর একটা কি অশান্তি হল ডিভোর্স করে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বাচ্চাটিকে কেউ নিতে চাইছে না, ছেলেও আবার আরেকটা মেয়ে জুটিয়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করেছে। আগের স্ত্রীও আরেকজনকে জুটিয়ে নিয়েছে। ছেলেটির বাবা-মার হয়তো কোন কর্মের স্পৃহা নেই আর কর্মফলেও স্পৃহা নেই। ব্যাঙ্কে টাকা আছে, পেনশনও আছে। তাই দিয়ে দুজনের বাকী জীবন ঈশ্বর সাধনায় কেটে যাবে। কিন্তু বাবা-মার কাঁধে এখন নাতির সব দায়ীত্ব এসে পড়েছে, তাকে তো আর ফেলে দিতে পারবে না। এটাই কপাল। এখানে মহা ফাঁকিবাজদের, যারা খাটবেও না অথচ ফলের আশা করছে, তাদের কথা আলোচনায় আনাই হচ্ছে না। এই তিনটে স্তরকে যে পেরিয়ে এসেছেন সেই ঠিক ঠিক জ্ঞানযোগের জন্য প্রস্তুত। জ্ঞানযোগের পথে যারা আসছে তাদের নিত্য-অনিত্য বিচার করতে হয়, ঈশ্বর ছাড়া সবই ফালতু। উপনিষদই একমাত্র জ্ঞানযোগের গ্রন্থ। উপনিষদ অধ্যয়ন করে কারা বুঝতে পারবেন? যাঁদের কর্ম ও কর্মের স্পৃহা এবং কর্মফলের স্পৃহা চলে গেছে। বাকিরা উপনিষদ ধারণাই করতে পারবে না। তবে জানতে হয় আমাদের পূর্বপুরুষরা কি বলে গেছেন, তার বেশি কিছু না।

যারা এর বিপরীত তাদের জন্য কর্মযোগ। বিপরীত বলতে বোঝাচ্ছেন, যার এখনও কর্মফলে স্পৃহা আছে, কর্মের প্রতি অনাসক্তি আসেনি আর কর্ম মাত্রই দুঃখ এই বুদ্ধি যার আসেনি। এরা সবাই সকাম, এদের জন্য কর্মযোগ। কর্ম করাতেও দুঃখ, কর্মের ফলেও দুঃখ। বৈরাগ্যশতকমে বলছেন, টাকা আয় করতে যাও তাতে দুঃখ, কত পরিশ্রম করতে হয়। টাকা যখন থাকে তখন এই ভয়, চোর ডাকাতে না নিয়ে যায়, সব সময় দুশ্চিন্তা লেগে থাকে। টাকা যখন চলে যায় তখনও কত দুঃখ। এই বিচার আমরা কখনই করতে পারব না। গীতাতেও ঠিক এই কথাই বলছেন যার কর্ম আর কর্মফলে আসক্তি আছে তাদের এখনও কর্মযোগ করে যেতে হবে। কর্ম মানে, বেদ বিহিত যে কর্মগুলো আছে বা শাস্ত্র বিহিত যে কর্মগুলো আছে, মনুস্মৃতিতে যেসব কর্মের কথা বলছেন বা গুরু যেমনটি করতে বলে দিয়েছেন সেইভাবে কর্ম করে যেতে হবে।

কিন্তু মাঝখানে একটা তৃতীয় শ্রেনী আছে, তাদেরকে নিয়ে বলছেন, *যদৃচ্ছায়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্। ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।১১/২০/৮।।* তাহলে ভক্তিযোগ কাদের জন্য? যারা জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগের মাঝামাঝি অবস্থায় আছে তাদের জন্য ভক্তিযোগ। যাদের এখনও সংসারের প্রতি পুরোপুরি বিরক্তি আসেনি, অর্থাৎ পূর্ণরূপে ত্যাগী নয় যার জন্য সে জ্ঞানযোগ করতে পারবে না। সংসার থেকে এখনও তার পূর্ণ বৈরাগ্য আসেনি অন্য দিকে সংসারের প্রতি সেই রকম আসক্তিও নেই। কিন্তু এর সাথে তৃতীয় আরেকটি জিনিস আছে, ঈশ্বরের লীলাকথায় শ্রদ্ধা। পূর্ণ ত্যাগী নয়, সংসারে পূর্ণ আসক্তিও নেই আর ঈশ্বরের লীলাকথায় শ্রদ্ধা, কোন ভাবে তার মধ্যে ঈশ্বরীয় ভক্তি এসে গেছে, এই তিনটে যার মধ্যে আছে তার জন্য ভক্তিযোগ। ঈশ্বরের লীলাকথায় শ্রদ্ধার ব্যাপারে বলছেন, পূর্ব পূর্ব জন্মের শুভ কর্ম থেকেই মানুষের মধ্যে এই শ্রদ্ধার ভাব আসে। আগে পরিবারের ঐতিহ্যে বাচ্চাদের প্রথম থেকেই শিক্ষা দেওয়া হত যাতে সে শুভকর্ম করতে পারে। আগেকার দিনে যারা একটু বড়লোক, বাচ্চার জন্মদিনে তাকে দাড়িপাল্লায় বসিয়ে যার যেমন ক্ষমতা সেই অনুসারে চাল, ডাল দিয়ে ওজন করত। তারপর সেগুলো গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিত, আর

বাচ্চার হাত দিয়েই দেওয়ানো হত। কিন্তু এখন বাচ্চার জন্মদিনে সবাই পার্টি দিচ্ছে। একটু যে সুযোগ ছিল, যার মাধ্যমে বাচ্চার মধ্যে স্বার্থহীনতা আসবে, যেখানে একটু পূণ্য সঞ্চয় হবে, সেই সুযোগটাও বন্ধ করে দিয়েছে। ঠাকুরের জন্মতিথিতে ভক্তরা সবাই মঠে আসছে, খিচুরী খাচ্ছে, লেকচার শুনছে। এই একই জিনিস নিজের বাড়িতেও তাঁরা করতে পারেন। যে কাজ একশ টাকায় হয় সেই কাজ পঁচানব্বুই টাকাতেও হয়, বছরের শেষে সবারই কিছু টাকা বাঁচে, ঠাকুরের জন্মতিথিতে সেখান থেকে কিছু টাকা দিয়ে ছোট করেই উৎসব করুক। ঠাকুরের ছবি লাগিয়ে দুটো ফুল দিল, যা টাকা থাকল সেই দিয়ে খিচুরী বানিয়ে ভোগ দিল, তারপর চারজন বন্ধুবান্ধবকে সেই প্রসাদ খাওয়ালো। সেখানে পনের মিনিট কেউ কথামৃত পাঠ করল। মায়ের তিথি পূজায় মায়ের কথা পাঠ হল। কিন্তু ভক্তরা করবে না, এই মানসিকতাই এখনও তৈরী হয়নি। শুভকর্মের পথটাই আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। বাড়িতে বাচ্চার জন্মদিন পালন করতে কেউ নিষেধ করছে না। কিভাবে পালন করবে? আমি পার্টি দেব না, এই এই খাবার গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। এখন আর বাচ্চাকে দাড়িপাল্লাতে বসাতে হয় না, বাচ্চার ওজন জানা আছে, ঐ ওজনে কিছু খাবার-দাবার তৈরী করে বাচ্চার হাত দিয়ে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিন। কিন্তু পার্টি করতে হবে, আর তার বিনিময়ে বাচ্চা গিফট পাবে। তার মানেই আমরা স্বার্থপর তার সাথে বাচ্চাকেও স্বার্থপর তৈরী করে দিচ্ছি। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়দের এই দিনে আপ্যায়ন করব না, আপ্যায়ন করতে হলে অন্য দিনে করব। এগুলোই পূণ্য সঞ্চয় করার সুযোগ। নিঃস্বার্থ হওয়া, পূণ্যের যে সৃষ্টি হবে সেটা হচ্ছে না। এই একটা প্রজন্মেই কেউ ঠাকুরের কথা শুনতে চাইছে না, তাতে কোন দোষ নেই। পুরো দেশ নাস্তিক হয়ে যাক, তাতে কোন দোষ নেই। নাস্তিক হয়ে কি হচ্ছে, লাইন দিয়ে সবাই depressionএ চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে লাইন দিয়ে সব আত্মহত্যার দিকে চলে যাচ্ছে। আর তা না করতে পারলে এ ওকে মারছে, সে তাকে মারছে, মেরেই যাচ্ছে। বাচ্চা বয়স থেকে যে একটা শিক্ষা দেওয়া হবে, সেই শিক্ষা দেওয়াটা এখন পরিবার থেকে উঠে গেছে। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনতে চাইছেন, তাঁদের সৌভাগ্য তাঁরা যে বংশে জন্ম নিয়েছেন তাঁদেরকে দিয়ে বড়রা শুভকর্ম করিয়েছেন। আর আগের আগের জন্মেও কিছু পূণ্য ছিল, *ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগহস্য সিদ্ধিবঃ*, ভক্তিযোগ দিয়েই এরা সিদ্ধি পান, যদি এই রকম লোক হন, যাঁদের আসক্তি খুব বেশি নেই আবার সেই রকম তীব্র বৈরাগ্যও নেই, কিন্তু এমন কিছু পূণ্য সঞ্চিত আছে যার জোরে তাঁদের মধ্যে ভক্তির উদয় হয়। এই তিনটে পথ। তিনটে পথের শর্ত কি? যাঁদের মধ্যে পূর্ণ বৈরাগ্য এসে গেছে তাঁরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করবেন। যাদের এখনও কর্মে দুঃখ বুদ্ধি আসেনি, এখানে শব্দটা হল কর্মে দুঃখ-বুদ্ধি, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, অন্যান্য জায়গায় সচরাচর এই সংজ্ঞা পাওয়া যাবে না, অন্যান্য জায়গায় বলছেন যাদের মধ্যে এখনও কর্মে স্পৃহা আছে। কর্মে দুঃখ-বুদ্ধি আসতে চায় না, কারণ আমরা প্রকৃতির এলাকার বাসিন্দা, প্রকৃতি আমাদের ফাঁসিয়ে রেখেছে। এই দুটোর মাঝখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সবার জন্য ভক্তিযোগ।

তারপর খুব সুন্দর বলছেন *তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।১১/২০/৯।।* মানুষ কত দিন কর্মযোগ করবে? কর্ম থেকে যে সুখ সুবিধা পাওয়া যায়, তার থেকে যত দিন না বৈরাগ্য আসে। এখানে আদর্শের কথা বলা হচ্ছে না, দরিদ্রের সেবা করা, রোগীর সেবা করা, বন্যার্তদের রিলিফ দেওয়া এসব কাজের কথা বলা হচ্ছে না, এগুলো আদর্শের জন্য। এখানে বলছেন কর্ম থেকে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, সেটার প্রতি বৈরাগ্য হয়ে গেলে তার আর কোন কর্ম করার দরকার হবে না। সে যদি ভক্ত হয়, তখন তার মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে যাবে। তার সাথে বলছেন, *মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে*, যদি আমার লীলা-কথা, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে ভালো লাগে তখন আর কর্ম করতে নেই। এখানে খুব পরিষ্কার, যদি ঈশ্বরীয় কথাতে তোমার রুচি এসে যায় তাহলে এবার তুমি কর্ম থেকে সরে এস। কাজ ততক্ষণই করবে যতক্ষণ কর্মময় জগৎ আর তার দ্বারা প্রাপ্ত ফলে বিতৃষ্ণা না এসে যায়। বিতৃষ্ণা মানে, ঈশ্বরীয় কথা শোনার তৃষ্ণা এসেছে, এবার কর্ম থেকে সরার সময় হয়ে গেছে। এখানেও একটু চেষ্টা লাগাতে হয়, যারা ভাবছে সময় হলে তিনিই ডাকবেন তাদেরকে বলতে হয়, তিনি কোন দিন ডাকবেন না। যখনই মনে হবে কোন শুভকর্মের জন্য ঈশ্বরের কথা শোনার আগ্রহ এসেছে, এবার তাকে চেষ্টা করে শুরু করতে হবে। একটু জোর লাগাতে হয়, একটু চেষ্টা করলে তিনি আরও সুযোগ করে দেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, নিজের ধর্মে যখন নিষ্ঠা রাখে, ধর্ম বলতে এখানে পথকে বলছেন, এটাই আমার পথ, যেখানে চাকরি করছে সেখানে নিষ্ঠা নিয়ে কাজকর্ম করবে, চুরি করবে না, স্ত্রীর দায়ীত্ব নিয়েছ তার প্রতিপালন করবে, তোমার অবর্তমানে সে যেন কষ্টে না পড়ে। এই ধরণের মানুষ, যাদের মধ্যে একটু ভক্তি জেগেছে, তারা স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিহিত কর্ম করতে করতে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে পুরোপুরি সরে আসে। নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সরে আসার পর ধীরে ধীরে সে পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্র মানেই নিঃস্বার্থপরতা। নিঃস্বার্থ হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা হল রাগ-দ্বেষ বর্জিত, অর্থাৎ কোন কিছুতেই আসক্তি থাকবে না, আর কোন কিছুর প্রতি বিদ্বেষ থাকবে না। রাগ আর দ্বেষ এটাই স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা মানেই, কিছু জিনিসকে সে ভালোবাসে সেগুলোকে সে নিজের জন্য চাইবে আর কিছু জিনিসকে পছন্দ করে না, সেগুলোকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইবে। পবিত্রতা মানেই রাগ-দ্বেষ বর্জিত। মন যখন রাগ- দ্বেষ বর্জিত হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে এবার সে জপধ্যানের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ধর্মে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, আমার এই ধর্ম, এবার সে নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সরে গেল, যেগুলো বিহিত কর্ম সেগুলো করে যাচ্ছে, এবার ধীরে ধীরে সে রাগ-দ্বেষ থেকে সরে আসবে। তার সাথে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *অস্মিঁলোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোহনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া।।* ***১১/২০/১১।।*** ধর্মে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ এই দেহেই নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগে সফল হয়, তখন সে রাগ-দ্বেষের মল থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যায় আর তার আত্মসাক্ষাৎরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় আর তা নাহলে আমার ভক্তি লাভ করে। ঐ জায়গাতে পৌঁছে জ্ঞান আর ভক্তি আর আলাদা থাকে না। এর আগে আমরা জ্ঞান আর ভক্তি নিয়ে অনেক আলোচনা করে এসেছি, তাই আর বেশি কিছু বলা হচ্ছে না।

রাজা পুরূরবার বৈরাগ্য লাভ

এই আলোচনা করার পর অনেক রকম কথা বলে আবার বলছেন, এই শরীর অসার আর কিভাবে আমরা বন্ধনাদিতে পড়ে যাই। এর উপর পুরূরবা আর ঊর্বশীকে নিয়ে খুব নামকরা কাহিনী বলছেন। এই কাহিনী বেদেই আছে, পরে আবার ঘুরে ঘুরে মহাভারত ও ভাগবতেও এসেছে। তখনকার দিনে দেবতা মানুষ সবাই যেন একসাথেই মেলামেশা করতেন। খুব সংক্ষেপে কাহিনী হল, যদুবংশের বিখ্যাত রাজা পুরূরবা স্বর্গের অপ্সরা ঊর্বশীকে খুব ভালোবেসেছিল। ঊর্বশী সেই সময় কোন কারণে অভিশপ্ত হয়ে ঐখানে অপেক্ষা করছিল। ঊর্বশীর স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু পুরূরবা তাকে ছাড়তে চাইছে না। ঊর্বশী পুরূরবাকে বিবাহের আগে একটা শর্ত দিয়েছিল, আমি যেন তোমাকে কখন বিবস্ত্র না দেখতে পাই। দেবতারা অপ্সরা ছাড়া স্বর্গে থাকতে পারছেন না, আর পুরূরবা ভালোবাসা দিয়ে ঊর্বশীকে এমন ভাবে বেঁধে রেখেছে যে ঊর্বশীকে স্বর্গেও নিয়ে আসা যাচ্ছে না। তখন দেবতারা কায়দা করে দুটো খুব সুন্দর ভেড়ার বাচ্চা ঊর্বশীকে দিয়েছে। ঊর্বশী ভেড়ার বাচ্চা দুটোকে খুব স্নেহ করে। ইন্দ্র একদিন ভেড়ার বাচ্চা দুটোকে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। ভেড়া দুটো তখন খুব চিৎকার করে ডাকছে, ঊর্বশীও খুব বায়না করে যাচ্ছে, আমার ভেড়া চুরি হয়ে গেলে আর তুমি এখন ঘুমোচ্ছা, ভেড়া দুটোকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই করছ না। পুরূরবা বলছে আমার এখন কাপড় পড়া নেই। ঊর্বশীও ছাড়ছে না, আমার ভেড়া দুটো চুরি হয়ে যাচ্ছে, ওরা আমার সন্তানের মত আর তুমি বাহানা দিয়ে শুয়ে আছ। অন্ধকার রাত, বৃষ্টি পড়ছে। পুরূরবা ভাবছে অন্ধকার রাত আমাকে কেউ দেখতে পারবে না, দৌড়ে গিয়ে ভেড়া ধরে নিয়ে আসি। ঐ অন্ধকারের মধ্যে পুরূরবা ভেড়া আনতে দৌড়েছে আর সেই সময় ইন্দ্র আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করলেন। বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিতে ঊর্বশী পুরূরবাকে বিনা বস্ত্রে দেখে নিল। ঊর্বশী তখন বলে দিল, আমি চললাম, তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে তুমি আমার সামনে কাপড় ছাড়া আসবে না, এই তো তোমাকে আমি খালি গায়ে দেখে নিয়েছি। পুরূরবা খুব ভেঙে পড়েছে, ঊর্বশীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত কিনা।

পুরূরবা এখন ঊর্বশীর বিরহে উন্মত্ত হয়ে গেল। তারপর ঠিক হল বছরে একটা দিন ঊর্বশী তার কাছে আসবে। শ্রীকৃষ্ণ এই কাহিনীকে আধার করে বলছেন *মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ। আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্।।****১১/২৬/১।।*** হে উদ্ধব! এই যে মানব শরীর, আমার স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি,

আমাকে লাভ করার জন্য এই মানব শরীর মুখ্য আধার। এর উপর আমরা আগেও কয়েকবার আলোচনা করেছি। ঠাকুরও বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এর অর্থ হল, মানব শরীর ব্যাতিত আর যত শরীর আছে আর ঐ শরীরের সাথে যে মন আছে, সেই শরীর আর মন দিয়ে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঋষিরাও বলে গেছেন মানব শরীর আর মানব মন ছাড়া ঈশ্বর দর্শন সম্ভব না। একটা জিনিসকে যখন আমরা কাজে লাগাই সব সময় ওর থেকে সর্বোচ্চ ফল পেতে চাই। মানব শরীর আর মানব মন এমন জিনিস যা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। এই মন দিয়ে আলু পটলের হিসাব হয়, এই মন দিয়ে এ্যটম বোমা তৈরী হয় আর এই মন দিয়েই ঈশ্বর দর্শনও হয়। ঋষিদের বক্তব্য হল, আলু পটলের হিসাব করা যেমন অত্যন্ত সহজ কাজ আর এ্যটম বোম তৈরী করা অনেক কঠিন কাজ কিন্তু ঈশ্বর দর্শন সব থেকে কঠিন কাজ, অথচ মানব শরীর দিয়ে সব থেকে কঠিন কাজ হতে পারে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ঠিক এই জিনিসটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। উদ্ধবকে বলছেন, যে মানব শরীর দিয়ে তুমি সর্বোচ্চ বস্তু লাভ করতে পারবে সেই মানব শরীরকে তাই অন্য কোন কিছুর সাথে আপোষ করতে যেও না। তাহলে সবাই কেন শরীরকে অন্য দিকে লাগাচ্ছে? প্রথম কথা, তাদের মন ওটার জন্যই প্রস্তুত, দ্বিতীয় তারা গুরু পায় না। অনেক সময় লোকেদের বলতে শোনা যায়, সময় থাকতে এইসব কথা শুনতে পাইনি এখন আর শুনে কি করব। অনেকে আছে যারা শোনার সুযোগ পায় কিন্তু পেরে ওঠে না, কিন্তু চাইছে। খুব সহজ উপমা হল, ক্লাশ টেনের ছেলেরা মনে প্রাণে চাইছে পরীক্ষায় নব্বই, পঁচানব্বই নম্বর পাবো, কিন্তু পেরে ওঠে না। কারণ বুদ্ধির দৌড় সেই রকম নয়। তার মা বলবে, তুমিও তো একজন মায়ের সন্তান, তুমিও তো মায়ের ভালোবাসা পাও, তুমি কেন পারবে না, কিন্তু তাও পারে না। ঠিক সেই রকম সব মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা উদ্ধবকে বলছেন, আর উদ্ধবের মাধ্যমে মানবজাতিকে সজাগ করে দিচ্ছেন। দেখো উদ্ধব, বেশির ভাগের লোকের ক্ষমতা নেই, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এই ক্ষমতা আর সুযোগকে সাধারণ জিনিসে বৃথা নষ্ট হতে দিও না। রাশিয়াতে কম্যুনিস্টদের শাসন কায়েম হওয়ার পর ওদের মাথায় থেকে থেকে নানা রকমে ঝোঁক চাপত। একবার একটা ঝোঁক চাপল, সব বুর্জোয়াদের শেষ করে দিতে হবে। বড় বড় যাঁরা ম্যাথমেটিসিয়ান, পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁরা বড় বড় ল্যাবোরটরিতে কাজ করতেন, তাঁদেরকে দিয়ে দিল ঘর ঝাড় দেওয়া, বাথরুম পরিষ্কার করার কাজ। যাঁরা এতদিন ল্যাবরটরিতে কাজ করে এসেছেন তিনি এবার ঘর ঝাড় দিতে লাগলেন। বিশ্বের একজন সেরা ম্যাথমেটিসিয়ান তাঁকে দেওয়া হল বাথরুম পরিষ্কার করার কাজ। বছরের পর বছর তিনি বাথরুম পরিষ্কার করে গেছেন। যিনি বিশ্বের সেরা ম্যাথমেটিসিয়ান, তিনি গণিত শাস্ত্র নিয়েই কাজ করবেন, সেই কাজ না করতে দিয়ে তাঁকে দিয়ে বাথরুম সাফাই করানো হচ্ছে। বাথরুম সাফাইয়ের কাজ একজন ম্যাথমেটিসিয়ানও করতে পারবেন আর একজন সুইপারও করতে পারবে, কিন্তু ম্যাথমেটিকসের কাজ সুইপার করতে পারবে না। মায়েরা সংসারের অনেক কাজই করতে পারেন, রান্নাও করতে পারেন, ঘর পরিষ্কার করতেও পারেন, পড়াশোনাও করতে পারেন। মায়েদের মধ্যে একজন আছেন যার মধ্যে একটা কিছুতে প্রতিভা আছে, হয়ত লেখালেখিতে প্রতিভা আছে। তাঁর কাছে এখন রান্না করাটা গুরুত্ব নাকি লেখালেখি করাটা গুরুত্ব? অনেক মেয়ে আইএএস, আইপিএস অফিসারও হয়, এনারা চাইলে ঘরে রান্নাও করতে পারেন আবার সরকারি কাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। গুরুত্ব কোনটাতে দেবেন? অবশ্যই সরকারী কাজে।

মানুষ যদি এই শরীর ও মনকে অন্য দিকে না লাগিয়ে ঈশ্বরের দিকে লাগিয়ে দেয় তখন সে আনন্দস্বরূপকে পেয়ে যায়। ঈশ্বর প্রাপ্তির একটাই লক্ষণ সদা আনন্দে থাকেন, নিরানন্দ কখনই তাঁর হবে না। কারণ তিনি শোক মোহকে অতিক্রম করে যান, যাঁর শোক মোহ নেই তাঁর মধ্যে কোথা থেকে নিরানন্দ আসবে, সম্ভবই না। আমেরিকায় থাকার সময় স্বামীজী কিছু দিন নিউইয়র্কে ক্লাশ নিতে শুরু করেন। তখন তাঁর কাছে সেই রকম টাকা-পয়সা ছিল না। ক্লাশ নেওয়ার জন্য স্বামীজী সস্তায় একটা জায়গায় বাড়ি ঠিক করলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা বললেন, এখানকার ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলারা কেউ ক্লাশ শুনতে আসবে না। ঠিক তাই হল, প্রথম কয়েক দিন দু চারজন ছাড়া কেউ ক্লাশ শুনতে এলো না। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে কথাবার্তা ছড়িয়ে গিয়ে লোক আসা শুরু হয়ে গেল। স্বামীজী বলছেন, কে ভালো কে মন্দ কে বিচার করবে, সবই সেই ভগবানেরই

রূপ। আমাদের চেতনার স্তরটা কোথায়, আমাদের ভেতরে কি আছে আগে দেখে নিতে হবে। ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠবে। আমাদের ভেতরে যা আছে একটু টোকা মারলেই সেটা বেরিয়ে আসবে। স্বামীজীকে বন্ধুরা বললেন, এখানে ভদ্রলোকের আসবে না। স্বামীজীর তখন স্বগতোক্তি, তিনিই তো আছেন, তাই কে ভালো কে মন্দ এর বিচার করবে কে। তখন তাঁর আর দুঃখ থাকবে না, শোক আসবে না, শ্রোতারা কেউ না এলেও কোন শোক হবে না, আর অমুক ভদ্রলোক এলেন কিনা সেই নিয়েও কোন মোহ হবে না আর অনেক শ্রোতা এলেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন, জীবের যোনিপ্রাপ্তি, জীবের বিভিন্ন গতি, আর এই যে সত্ত্ব, রজো আর তমো আদি যে গুণ দেখা যায় এগুলো মায়া মাত্র, বাস্তবিক এগুলো কিছু নয়। এইভাবে দেখার জন্য কোন গুণই জ্ঞানীকে বন্ধনে ফেলতে পারে না। মথুরবাবু ঠাকুরকে কলকাতার নর্তকীদের কাছে নিয়ে গেছেন, কিন্তু ঠাকুর তাদের দেখছেন সাক্ষাৎ ভগবতী, তিনি সমাধিতে চলে গেলেন। মথুরবাবুর স্ত্রী ঠাকুরকে লাগিয়েছেন গোয়েন্দাগিরি করার জন্য, মথুরবাবু কোথায় কোথায় যায়। ঠাকুরকে নিয়ে মথুরবাবু এক জায়গায় গেছেন, সেখান থেকে ফিরে আসার পর মথুরবাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন, বাবা তুমি কোথায় গিয়েছিলে, কার সাথে গিয়ে দেখা করেছিল? ঠাকুর বলছেন, জানি না কার সাথে দেখা করেছিল, তবে এক মহিলা বড় বড় চোখ, দেখতে সুন্দর, আমাকে বললে নীচে বসতে আর দুজনে উপরে চলে গেল। ঠাকুর পরে বলছেন, আমি যেমনটি দেখছি তেমনটি বলে দিয়েছে, ও যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। ওই অবস্থায় ভালো মন্দ বিচারের কোন অবকাশ নেই, বিচার করার ক্ষমতাটাই চলে যায়। তবে ঠাকুরের যেটা ছিল সেটা একেবার চরম। স্বামীজীর চরম ছিল না, কারণ চরম হয়ে গেলে জনসাধারণের কাজ হবে না, সেইজন্য স্বামীজী রজোগুণকে একটু ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর লেখার মধ্যে, কথার মধ্যে এগুলোই বেরিয়ে আসে, কে ভালো কে মন্দ কে বিচার করবে। স্বামীজীর জীবনেও অনেক ঘটনা আছে যেখানে অনেক আজেবাজে লোকের সাথে দেখা করতে হয়েছে কিন্তু স্বামীজী সবার সাথে যেমন ব্যবহার করেন তাদের সাথেও একই রকম ব্যবহার করছেন, কোন রকম বিরক্তির ভাব আসেনি।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে উদ্ধব! যদি তুমি সাধনা করতে চাও তাহলে *সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ। তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ।।১১/২৬/৩।।* পাশ্চাত্য দর্শনে একটা শব্দ আছে এ্যপিকিউরান্স, এই দর্শনে এনারা ভোগবাদ নিয়ে বলতেন, কিন্তু এই ব্যাপারেও তারা একটা ভ্রান্ত ধারণা করে আছে। চার্বাক দর্শনে জীবনের উদ্দেশ্যই হল ভোগ করা, কিন্তু চার্বাক নিজে একজন ঋষি ছিলেন আর পাশ্চাত্যের এপিকিউরাস উনিও একজন দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু ওনার যে থিয়োরী সেটাই নিম্নগামী হয়ে নেমে গেল খাওয়া-দাওয়া কর, মস্ত কর। কোন কারণে যাতে ভুল না হয়ে যায় সেইজন্য শাস্ত্রে প্রায়ই যে শব্দ ব্যবহার করেন তা হল শিশ্নোদর বৃত্তি। শিশ্নোদর বৃত্তি মানে মন সব সময় নীচের দিকে থাকা, খাওয়া-দাওয়া, কাম-বাসনা পূরণ করা, মোদ্দা কথা ইন্দ্রিয়সুখে ডুবে থাকা। বঙ্কিমবাবু যেমন ঠাকুরকে বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য আহার, নিদ্রা, মৈথুন। ঠিক তেমনি যাদের আহার, নিদ্রা, মৈথুন জীবনের উদ্দেশ্য, *সঙ্গং ন কুর্যাদ*, এদের সঙ্গ কখনই করবে না, এরা অসৎ লোক। অসৎ মানে যারা অসতের সত্তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে চলছে। অসৎ কি? কামিনী আর কাঞ্চন, খাওয়া-পড়া, কাম-বাসনা, ভোগের তৃপ্তি এর বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না। যদি এদের সঙ্গ ত্যাগ না কর তাহলে অন্ধকে অনুসরণ করে যা অবস্থা হয়, তোমারও সেই অবস্থা হবে। আমরা কত রকমের খবর কাগজ, ম্যাগাজিনে কত রকমের লেখা পড়ছি, এগুলো কারা লিখছে? যারা অসৎ তারাই লিখছে। অসৎ মানে যাদের মধ্যে শিশ্নোদর বৃত্তি রয়েছে। বাড়িতে বাচ্চাকে ভালো কথা শেখাতে গেলে শিখবে না, কিন্তু রোজ স্কুল গিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে দু চারটে গালাগাল শিখে আসে। কারণ মনের স্বাভাবিক গতিই নীচের দিকে, সেইজন্য খারাপ জিনিসটা তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। যদি অসৎ পুরুষের সঙ্গ বেশি করে, ওদের কথাবার্তা গুলো তাড়াতাড়ি শিখে নেবে। ওদের সংস্কার ভেতরে একটা ছাপ ফেলবে আর পরে সেও সেগুলোই করতে চাইবে, ওদের মতই মানসিকতা হয়ে যাবে। স্বামীজী তাই সন্ন্যাসীদের নিষেধ করে গেছেন, কোন ধরণের রাজনীতিতে যাবে না, সংবাদপত্রে যাবে না। রাজনীতিবিদদের এটাই লক্ষণ, তাঁরা করেন কম বলেন বেশি।

যারা বিষয়ী, বিষয়-বাসনা নিয়েই সারাদিন পড়ে আছে, এদের সঙ্গ করবে না। সঙ্গ মানে, এদের লেখা যদি পড়ে, এদের কথা যদি শোনে ধীরে ধীরে ওদের ভাবটাও আমাদের মধ্যে এসে যাবে। আধ্যাত্মিক পথে যারা আসতে চাইছে তাদের প্রথম কাজ হল বিষয়ী লোকেদের থেকে দূরে থাকা।

তখন শ্রীকৃষ্ণ পুরূরবার উপমা দিচ্ছেন, পুরূরবা ঊর্বশীকে নিয়ে একেবারে মত্ত হয়ে আছে, ঊর্বশী ছাড়া আর কিছু জানে না। যখন ঊর্বশী চলে গেল তখন তার নেশাটা ভাঙলো। ঊর্বশী চলে যাচ্ছে আর পুরূরবা বিবস্ত্র হয়ে ঊর্বশীর পেছনে পাগলের মত দৌড়াচ্ছে। পুরূরবা উর্বশীকে নিয়ে ভোগে এমনই নিমজ্জ ছিল যে কত বছর কেটে গেছে কিন্তু তার মনে হল যেন মাত্র কয়েকটা দিন কেটেছে। এরপর যখন একটু সম্বিৎ ফিরে এসেছে তখন চেঁচাচ্ছে, *অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ। দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃ খণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ।। ১১/২৬/৭।।* উর্বশী আমাকে এমনই বাহু দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিল যে আমার আয়ুর এতগুলো অমুল্য বছর চলে গেল একটুও আমি টের পেলাম না। বিস্মৃতির একটা সীমা হয়, সেই সীমাকেও আমি হারিয়ে ফেললাম। *নাহং বেদাভির্নির্মুক্তঃ সূর্যো বাভ্যুদিতোহমুয়া। মুষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত।।১১/২৬/৮।।* কখন সূর্যোদয় হল কখন সূর্যের অস্ত হয়ে গেলে কিছুই জানতে পারলাম না, যার জন্য আমার ধর্ম কর্ম সব ওতেই ডুবে গেল। কত দিবসরজনী কেটে গেল আমি কিছুই টের পেলাম না। তখন পুরূরবা বলছে, *অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ। ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ।।১১/২৬/৯।।* আমি কোন সাধারণ লোক নই, একজন চক্রবর্তী রাজা কিন্তু *ক্রীড়ামৃগঃ*, আমি একটা নারীর হাতের খেলনা হয়ে এত বছর বিস্মৃত হয়ে কাটিয়ে দিলাম। এটা শুধু পুরূরবার কাহিনী না, সবার একই কাহিনী, ঠাকুর বলছেন বিশালক্ষীর দ, ওখানে হাতিও পড়লে তলিয়ে যাবে। পুরূরবা বলছে, আমি ক্রীড়ামৃগ হয়ে গেলাম, উর্বশী যেমনটি নাচাত তেমনটি নাচতাম, যেমনটি খেলাত তেমনটি খেলতাম। আর বলছেন, *সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্। যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং উন্মত্তবদ্ রুদন্।।১১/২৬/১০।।* আমার প্রজাদের মর্যাদা আমি সর্বদা রক্ষা করতাম, আর সেই আমি কিনা উলঙ্গ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় ঊর্বশীর পেছনে দৌড়েছিলাম! গাধা লাথি মারলে যেমন অবস্থা হয়, আমার এই স্ত্রী এমনই আমার মন হরণ করে নিয়েছিল যে তার সব লাথি আমি সহ্য করেছি। *কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা। কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্।।১১/২৬/১২।।* যতই তোমার বিদ্যা থাকুক, যতই তোমার তপস্যা থাকুক, যতই শাস্ত্র অভ্যাস থাকুক কিন্তু যদি কারুর মন কোন নারীর দিকে চলে গিয়ে থাকে বা কোন নারী যদি তার মন অপহরণ করে নিয়ে থাকে, সবটাই তার বৃথা। বাকি সব কিছুকে হয়ত জয় করে নিতে পারা যাবে কিন্তু নারী বা স্ত্রী যদি মনকে টেনে নেয় তখন আর কিছুই করার থাকবে না, যাই করবে সবটাই বেকার। যতই তুমি একান্ত কর, যতই জপধ্যান কর, যতই তপস্যা করা, যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, সবটাই বৃথা, মন তোমার একজন কেড়ে নিয়েছে। পুরূরবাও একই কথা বলছে, আমি এত বড় রাজা, আমি নিজেকে এত বড় পণ্ডিত মনে করি কিন্তু এই মেয়েটির পাল্লায় পড়ে আমার সব নষ্ট হয়ে গেল। চাষীরা যেভাবে বলদের ব্যবহার করে, দু বেলা দুটো খড় দানা দিল আর সারাদিন ক্ষেতে কাজ করিয়ে যায়, ঠিক সেই রকম আমার অবস্থা।

আরও অনেক কথা বলে বলে পুরূরবা বলছে, সাপকে দড়ি মনে করে কেউ যদি হাত দিয়ে তুলে নেয় তাতে সাপের কি দোষ। একজন লোক জঙ্গলে গিয়েছিল, সেখানে ঝোপের আড়ালে একটা বাঘ বসেছিল। ঝোপের বাইরে বাঘের লেজটাকে দেখে সে মনে করল একটা কী সুন্দর দড়ি। লোকটা গিয়ে লেজটা ধরে নিয়েছে। লেজ ধরতেই বাঘটা ধড়মড় করে উঠেছে। লোকটার অবস্থা কাহিল! বাঘ যেখানেই যায় লোকটা বাঘের লেজ ছাড়ছে না, শক্ত করে ধরে আছে। লেজ যদি একবার ছেড়ে দেয় লোকটির জীবন শেষ। নারী মানেই বাঘের লেজ। একবার ধরলে আর ছাড়া যাবে না, ছাড়লেই শেষ। এবার মেয়েটি যেখানে যাবে সেখানেই তাকেও যেতে হবে। কিচ্ছু করার নেই। গৃহস্থ জীবন মানেই বাঘের লেজ ধরা। পুরূরবার এখনও কি মোহ, সে বলছে, এর জন্য উর্বশীকে কেন দোষ দিই। ঠাকুর বলছেন, সবাই নিজের মাগের সুখ্যাতি করে। চড়

খাবে, গালাগালি খাবে কিন্তু সুখ্যাতি করবে। পুরূরবা বলছে, এর জন্য আমিই দায়ী কারণ আমি একটা অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ঊর্বশীকে কেন আর দোষ দিই।

মায়া মানেই অসুন্দরে সুন্দরের আরোপ। যোগশাস্ত্রে এটাকেই বলে শোভনধ্যাস। সাধারণ ভাবে দেখা যায় কোন ছেলে যদি কোন মেয়েকে ভালো লাগে ও কিন্তু আগে দেখে মেয়েটির মধ্যে সেবা ভাব, বুদ্ধি, নম্র, লজ্জাশীলার মত কিছু গুণ আছে কিনা। মানুষ কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গুণের দ্বারা আকর্ষিত হয়। সেইজন্য বলে ব্যক্তিত্ব মানুষকে বেশি আকর্ষিত করে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিত্ব কখন ব্যক্তির উপর নেমে আসে আমরা টের পাই না। আমরা বলতে পারি তাহলে সুন্দর মুখের দিকে কেন আমাদের দৃষ্টি চলে যায়। কারণ সৌন্দর্য জিনিসটাই একটা নিজস্ব গুণ। যখন ঐ সৌন্দর্যটাই একটা চেহারের মধ্যে দেখছে তখন তাকে আকর্ষিত করছে। খুব নামকরা লেখক রাস্কিন বণ্ড বলছেন, যখন কম বয়স ছিল তখন আমি প্রেমে পড়তেই থাকতাম আর ধাক্কা খেতেই থাকতাম। কেন এই রকম হত? উনি বলছেন, যেমনি কোন মেয়ে মিষ্টি করে কথা বলত অমনি ওর প্রেমে পড়ে যেতাম। মিষ্টি হাসি, মিষ্টি ব্যবহার, এগুলো এক একটা গুণ। ঐ গুণ গিয়ে একটা লোকের উপর অধ্যারোপ করে দিচ্ছে। সৌন্দর্য গুণটাকে নিয়ে গিয়ে একটা শরীরের উপর ফেলে দিচ্ছে, এটাই যোগশাস্ত্রের শোভনধ্যাস। গোলমালের উৎস ঠিক এই জায়গাটা।

ভগবান বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ ভিক্ষায় বেড়িয়েছেন। পথে তাঁর জলতেষ্টা পেয়েছে। দেখছেন ইজারা থেকে একটা নীচু জাতির মেয়ে জল তুলছে। আনন্দ গিয়ে মেয়েটির কাছে জল চাইল। মেয়েটি জল দেওয়াতে আনন্দ মিষ্টি করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মেয়েটি বড় হয়েছে নোংরা, অভদ্র ভাষা শুনে শুনে। মেয়েটি ওখানেই ঘটি-ফটি সব ফেলে আনন্দের পেছন পেছন হাটতে শুরু করে দিয়েছে। আনন্দ আশ্রমে পৌঁছে গেছেন, মেয়েটিও পেছন পেছন আশ্রমে হাজির হয়ে গেছে। আনন্দ তাকে ভগবান বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন। ভগবান বুদ্ধ খুব সুন্দর কথা বলছেন। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আনন্দের কোন জিনিসটা তোমার ভালো লাগল? বলছে, ওর ব্যবহার। ভগবান বুদ্ধ বলছেন, ওই জিনিসটা তোমার ভেতরে থাকলেও তো ভালো, তুমি চেষ্টা করে ওটা নিজের ভেতরে নিয়ে এসো। মেয়েটি ওখানেই ভিক্ষুণী হয়ে গেল। একটা কথা প্রায়ই উপদেশ আকারে শোনা যায়, পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে না। স্বামীজী বলছেন, যদি এমন কেউ থাকে তাকে দেখার জন্য আমি কুড়ি মাইল হেটে যাব। এমন লোক হয় না, পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে না, এগুলো মুখের কথা। এভাবে কারা দেখতে পারেন, ব্রহ্মজ্ঞানী ছাড়া কেউ পারবে না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী পাপী কখনই দেখেন না, তবে ওনারা পাপকেও দেখেন না, এটাই মুশকিল। আমরা ভালো লোকের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছি। কেন দৌড়াতে যাবো? আপনি তার পেছনে দৌড়াবেন নাকি আপনার পেছনে সবাই দৌড়াবে? কোনটা আপনি চান আগে ঠিক করুন? লোকেরা আমার পেছনে দৌড়াক চাই। তাহলে ওই গুণগুলো আপনার ভেতরেও নিয়ে আসুন। কিন্তু মানুষ মাত্রই ফাঁকিবাজ, সে চায় বড়লোকের পেছনে দৌড়ে যদি আমার কিছু প্রাপ্তি হয়। সৌন্দর্য না হয় ভগবানের ঘর থেকে নিয়ে এসেছে সেটা তোমার হয়ত হবে না, কিন্তু তার যে অন্যান্য গুণগুলো আছে সেগুলো তো তোমার মধ্যে নিয়ে আসতে পার।

পুরূরবা এখানে ঠিক এই কথাই বলছেন। এই শরীরটা একটা কদর্য-পূতিগন্ধময়, আর অপবিত্র ও ঘৃণ্য অথচ এর মধ্যে গুণ দর্শন করতে শুরু করলাম। যে গুণগুলোকে গুণ রূপে দেখার কথা ছিল, সেটাকে আমি মানুষের মধ্যে নামিয়ে দিলাম। একজন খুব উচ্চমানের বরিষ্ঠ মহারাজ বলছিলেন, আমার যখন বয়স অল্প ছিল তখন এক মহারাজের কাছে একটা খুব সুন্দর পেন ছিল। আমি দেখে বললাম, বাঃ পেনটা খুব সুন্দর তো। সেই মহারাজ তখন আমাকে বললেন, তুমি নেবে, তোমার কাছে রাখতে চাও? আমি মহারাজকে বললাম, আমারও ঐ বয়স পেরিয়ে গেছে যে সব সুন্দর জিনিসকে আমার কাছেই রাখতে হবে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটাই সমস্যা, সাধারণ মানুষ যখন কোন কিছুর প্রশংসা করছে তার মানেই সে বলতে চাইছে, ওটাতো আমার কাছে থাকার কথা। সে যদি দিয়ে দেয় তো আরও খুশী হয়ে যাবে। অসুন্দরের উপর যখন সুন্দরের আরোপ হয় মানে আমরা কোন জিনিসকেই আর নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে পারছি না। যিনি যত নিরপেক্ষ হবেন তিনি তত মহাপুরুষ হবেন। পুরূরবা বলছে, ঊর্বশীকে দোষ দিয়ে কি হবে আমি নিজেই অজিতেন্দ্রিয় ছিলাম,

অসুন্দরের উপর সুন্দরের আরোপ করে দিয়েছিলাম। সুন্দর মানে গুণ আর অসুন্দর মানে শরীর, গুণগুলো শরীরের উপর আরোপ করে দিয়েছে।

পুরূরবা বলছে, এই যে শরীর, এই শরীরটা কার? *পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ। কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে।।১১/২৬/১৯।।* এই শরীরটা কি বাবা-মার? কারণ বাবা-মা এই শরীরটা দিয়েছেন। নাকি এই শরীরটা স্ত্রীর সম্পত্তি? নাকি কোন মালিকের সম্পত্তি, যার অধীনে আমি কাজ করছি? নাকি এই শরীরটা অগ্নির ইন্ধন? কারণ শেষমেশ তো আগুনেই শরীরটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হবে। নাকি এক শরীরটা কুকুর, শেয়াল আর শকুনের? কারণ ওদের তো এটাই খাদ্য। শেষমেশ শরীরটা যার কাছে যাবে সেই মালিক। এই শরীরটা খাদ্য রূপে তো ঠিক করাই আছে, কাক আর গৃধ্ররাই খাবে। আর শরীরটা তো আগে থেকেই বিক্রি হয়ে আছে, হয় আগুনে পোড়াবে, নাহলে মাটিতে পোকায় খাবে, আর যদি রাস্থায় মরে পড়ে থাকে শেয়াল কুকুরে খাবে। পার্সিদের শরীরটা গৃধ্ররা খায়। যদি বিচার করা হয় এই শরীরটা তাহলে কার? কোম্পানী মাল তৈরী করে, সেই মাল ক্যুরিয়ার সার্ভিসে যে কেনে তার কাছে পোঁছে যায়। এই শরীরটা বাবা-মার কোম্পানীর তৈরী আর মালটা যাবে অগ্নির কাছে, কারণ অগ্নি আগেই বুকিং করে রেখেছে, আর মাঝখানে আমরা শরীরটাকে কত কিছুতে লাগিয়ে দিয়ে লাফালাফি করে যাচ্ছি। বিচার করলে আমাদের মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। আর বলছে, যে বস্তুকে কেউ কখন দেখেনি, শোনেনি সেই বস্তুকে নিয়ে কখন বিকার হয় না। সেইজন্য যাঁরা সাধন-ভজন করতে চান তাঁদের বিষয়ী লোকের সঙ্গ করতে নেই। বিষয়ী লোকের সাথে থাকলে বিষয়ের কথাই হবে, তখন মনে বিষয়ের ছাপ পড়ে যাবে। এইভাবে অনুতাপ আর বিচার করতে করতে পুরূরবা ঊর্বশীকে মন থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। এটা ভাগবতে বলছে, কিন্তু অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীতে বলে পুরূরবা কখনই ঊর্বশীকে ছাড়তে পারেনি। কিন্তু পরে নিজের সাম্রাজ্যের কাজ মন দিতে শুরু করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলছেন, সাধকের যখন পুরূরবার মত ধাক্কা খেয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখনই সে আমার দিকে মন দেয়। আমরা অতি সাধারণ, আমরাও জীবনে অনেক ধাক্কা খাই, চোখ দিয়ে জলও বের হয় কিন্তু তখন ভাবি একবার ধাক্কা খেয়েছি, আগামীবার আর ধাক্কা খাবো না। আবারও ধাক্কা খায়, চড় খায়, এত শিক্ষা পায় তবুও ছাড়তে পারে না। এভাবেই জীবন এগিয়ে চলে। এরপর আরও অনেক কথা বলছেন।

পরমার্থ নিরূপণ

শ্রীকৃষ্ণ এরপর পরামার্থ নিরুপণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলছেন। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগে মানুষ ভগবানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ভগবানই পরমার্থ, তিনিই শেষ কথা। ভগবানের স্বরূপ কি, সেটাই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধভকে ব্যাখ্যা করছেন। *পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।।১১/২৮/১।* ব্যবহার কালে পুরুষ আর প্রকৃতিকে দ্রষ্টা আর দৃশ্য রূপে পৃথক দেখায়। এখানে আমি হলাম দ্রষ্টা আপনারা আমার কাছে দৃশ্য আর আপনাদের কাছে আমি দৃশ্য আপনারা দ্রষ্টা। দ্রষ্টা আর দৃশ্যের এই ভাব আমাদের সব সময়ই থাকে। অন্য দিকে এতদিন শাস্ত্র কথা শুনে শুনে আমরা ধারণা করতে পারছি যে ভগবানই সত্য। তাহলে এখানে দুই ধরণের সত্তা এসে যাচ্ছে, একটা পারমার্থিক সত্তা আরেকটি ব্যবহারিক সত্তা। ব্যবহার কালে সব কিছু আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে। আধ্যাত্মিক জীবনের এটাই একমাত্র সমস্যা। ব্যবহার কালে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎকে দেখছি দ্বৈতপ্রপঞ্চ। কিন্তু পারমার্থিক সত্তা হল অদ্বৈত। যখন বলছে ভগবান আর ভক্ত, তখনও দ্বৈতবোধ থেকে যাচ্ছে, ভগবান দৃশ্য আর ভক্ত দ্রষ্টা। দ্রষ্টা আর দৃশ্যই সবাই দেখছি, ঠিক তেমনি পুরুষও দেখছি আর প্রকৃতিকেও দেখছি অর্থাৎ চৈতন্যও দেখছি আবার জড়কেও দেখছি। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলছেন, হে উদ্ধভ! যদিও ব্যবহার কালে পুরুষ এবং প্রকৃত দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের ভেদে আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে, কিন্তু যখন তুমি পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখবে তখন সব কিছুকে একটা অভিন্ন অধিষ্ঠান স্বরূপ দেখাবে, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। সেইজন্য বলছেন, কেউ যদি শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় স্বভাবের হয়, তাদের কর্ম এবং তাদের নিন্দা করতে নেই। প্রথমে ব্যবহার কালে পুরুষ আর প্রকৃতিকে দ্রষ্টা ও

দৃশ্য রূপে পৃথক দেখায়, কিন্তু যখন বিচার করবে তখন দেখবে দৃশ্যই শুধু থেকে যায়, সচ্চিদানন্দই একমাত্র থেকে যান। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধভকে বলছেন *পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ*, অপরের স্বভাব এবং অপরের কর্মকে কখন প্রশংসাও করবে না, নিন্দাও করবে না, কারণ সচ্চিদানন্দ ছাড়া যে কিছু নেই। স্বামী প্রভবানন্দজী মহারাজ খুব অল্প বয়সে রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ছিলেন। রাজা মহারাজের প্রচুর কৃপা পেয়েছিলেন। স্বামী প্রভবানন্দ মহারাজ মাঝে মাঝে রাজা মহারাজকে বলতেন 'মহারাজ! আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেন না'। রাজা মহারাজ বলছেন 'আমি তো তোদের উপদেশ দিতে চাই, কিন্তু যখন উপদেশ দিতে যাই তখন দেখছি তোদের ভেতরে সেই নারায়ণই বিরাজ করে আছেন, এরপর আর উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না'। স্বামীজী বলছেন I am the Jesus Christ, I am the Zudas the carrier। জুদাস হল, যে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল, যার জন্য যীশুকে ক্রুশিফাইড হতে হয়েছিল। খ্রীশ্চান জগতে জুদাসকে খুব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু যিনি প্রভু তিনিই যীশু হয়েছেন, যিনি প্রভু তিনিই জুদাস হয়েছেন। ঠাকুর বলছেন – লেটো গালে হাত দিয়ে বসে আছে, দেখছি সেই সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে বালিশ যেমন ভাসতে ভাসতে যায়, ঠিক তেমনি সমস্ত মানুষ, জীব সচ্চিদানন্দ সাগরে এক একটা বালিশের মত ভেসে বেড়াচ্ছে। এটা কোন তত্ত্ব কথা নয়, এটাই একমাত্র সত্য। ভাগবত এই কথা বলছে, ঠাকুর একই কথা বলছেন, তিনি বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন আর মাস্টার মশাই নোট করে যাচ্ছেন। ঠাকুর আবার বলছেন কার নিন্দা করবে, তিনিই তো সব হয়েছেন। ঠাকুরের মানস সন্তান রাজা মহারাজও একই কথা বলছেন – কাকে উপদেশ দেব, তিনিই তো সব হয়েছেন। তাহলে উপদেশ কার্য কখন হবে? এই অদ্বৈত জ্ঞান থাকলে উপদেশ কার্য হয় না, সেইজন্য একটা আবরণ পড়ে যায়। কিন্তু ওই আবরণটা থেকে থেকে সরে যায়, যখন সরে যায় তখন আর কোন কথা বলতে চান না। আর আবরণ যখন পড়ে তখন আমাদের মত আবরণ থাকে না, খুব পাতলা আবরণ থাকে। তাঁদের কারুর প্রতি ক্রোধ হয় না, কাম থাকে না। কার উপর ক্রোধ করবেন আর কাকে নিয়ে, কি নিয়ে তিনি কাম করবেন! সবার মধ্যে তো তিনি নিজেকেই দেখছেন। ঈশাবাস্যোপনিষদেও একই কথা বলছে, *তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতি*। যখন আমি পরিষ্কার দেখছি আপনিই আমি হয়েছি তখন আমি আপনার কি ধরার চেষ্টা করব। কাম মানে, আমি অপূর্ণ আমি তোমাকে চাই। কিন্তু দেখছি আমিই তুমি হয়েছি, আমি নিজেকে কি ধরার চেষ্টা করব। এটাই অদ্বৈত জ্ঞান। জ্ঞানীরা যেটা সাক্ষাৎ দেখছেন সাধকরা সেটাই সচেতন ভাবে অনুশীলন করে। তিনিই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন তাহলে ক্রোধটাও তো তাঁর, কামনাটাও তাঁর, শোকটাও তাঁর। হ্যাঁ ঠিকই, কিন্তু এগুলো প্রকৃতির এলাকার। সাধক যদি প্রকৃতিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে দেয় তাহলে সেটাই তার আধ্যাত্মিক জীবনের কাল হয়ে যাবে। সারা জগৎ কি করছে না তাকিয়ে আগে তুমি এই প্রকৃতির এলাকা থেকে বেরিয়ে এসো।

মানুষ যা কিছু করছে সবই বুদ্ধির জোরে করছে। আইনস্টাইন বিজ্ঞানের এত কিছু করলেন সেটাও তিনি বুদ্ধির জোরে করেছেন। আবার পণপ্রথা, ঘুষ নিয়ে যা কিছু হচ্ছে সেটাও বুদ্ধির এলাকাতেই হচ্ছে। যা কিছু ভালো-মন্দ করছি সব বুদ্ধির জোরেই করছি। কিন্তু বুদ্ধি প্রকৃতির এলাকার বাসিন্দা। শাস্ত্র বলছে প্রকৃতিকে কোন গুরুত্ব না দিতে। আমার পকেটে কয়েক শত স্বর্ণমুদ্রা আছে, আর বাকিরা মাটির ঢেলা নিয়ে খেলছে। আমার পকেটে এত স্বর্ণমুদ্রা থাকতে আমি কেন মাটির ঢেলার খেলা নিয়ে মাততে যাবো! তুমি নিজের দিকে তাকাও। এখানে আদপেই বলছেন না যে, তোমার মধ্যেও হাজারটা দোষ আছে, অপরের কি দোষ দেখছ! এখানে আত্মদৃষ্টিতে বলা হচ্ছে, ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। তুমি নিজেরও দোষ দেখবে না। দোষ আবার কিসের! তুমি তো শুদ্ধ আত্মার, শুদ্ধ আত্মার কোন দোষ থাকতে পারে না। তোমার মধ্যে যে দোষ সেটা তো প্রকৃতির এলাকার। নিন্দনীয় তখনই হবে যখন তুমি প্রকৃতির এলাকার দিকে তাকাচ্ছো।

পরের শ্লোকটিও খুব সুন্দর। প্রথমে শ্লোকে বললেন অপরের কর্ম ও অপরের স্বভাবের নিন্দাও করবে না আর তার প্রশংসাও করবে না। গীতায় ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে বলছেন *নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতঃ*, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তিনি কাউকে দ্বেষও করেন না আর কারুর প্রশংসা করতেও যান না। কুঁড়ে ঘর নিয়েও নিন্দা করবেন না আবার লাটসাহেবের বাড়ি নিয়েও প্রশংসা করবেন না। ঠাকুর তাই

লাটসাহেবের বাড়ি দেখে বলছেন – দেখলাম যেন মাটির ঢিপি। আত্মজ্ঞানীরা যে চিন্তা-ভাবনা করে এইসব দেখছেন বা বলছেন তা নয়, তাঁরা সত্যিকারের এই রকমই দেখেন। কিন্তু ঠাকুর যে হাজরাকে গালাগাল দিচ্ছেন ঢ্যামনা শালা! ঠাকুর হাজরাকে লোকশিক্ষার জন্য গালাগাল দিচ্ছেন। যাঁরা লোকশিক্ষার জন্য আসেন তাঁদের এই অধিকার আছে। তাঁরা অনেক গালমন্দ বকাঝকা করে মানুষকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। আবার যখন সবার ভেতরে নারায়ণকে দেখছেন তখন কাউকে কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুর বলছেন – আমার এমন অবস্থা ডাক্তার দেখাতেও পারি না, হয় সবাইকে বিশ্বাস করি নয়তো কাউকেই বিশ্বাস নেই। একটা বাচ্চা ছেলেও যদি বলে দেয় এই ওষুধ খেতে তখন তাকেও বিশ্বাস করে নিতে হয়। অন্য দিকে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারুর উপর বিশ্বাস নেই।

দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন *পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি। স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ।।১১/২৮/২।।* যদি কেউ অপরের স্বভাব ও অপরের কর্মের প্রশংসা বা নিন্দা করে, সে তখন পরমার্থ সাধন থেকে চ্যুত হয়ে যায়। আমাদের উদ্দেশ্য পরমার্থ সাধন দ্বারা এগিয়ে যাওয়া, যারাই এই রকম নিন্দা বা প্রশংসা করবে তারা যতটা এগিয়েছে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে যাবে। নিন্দা স্তুতি সাধন পথে বিরাট বিঘ্ন। এখানে যোগের বিঘ্ন রূপে বলা হচ্ছে না, খুব সহজ সরল যুক্তিতে ব্যাখ্যা করছেন। পরমার্থ সাধনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল দ্বৈত অভিনিবেশ বা দ্বৈত বুদ্ধিকে কেটে উড়িয়ে দেওয়া। অদ্বৈত মানে, দ্বৈত নয়, দ্বৈত বোধকে আটকে দেওয়া হচ্ছে, সব ক্ষেত্রে একত্বকে নিয়ে আসা হচ্ছে। তার মানে, দ্বৈত বোধে নিষেধ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। শ্রীমা বলছেন যদি শান্তি পেতে চাও কারুর দোষ দেখবে না। শ্রীমা কেন নিষেধ করছেন? কারণ দোষ দেখাটা আসে দ্বৈত বুদ্ধি থেকে। দ্বৈত বুদ্ধির নিষেধ করাটাই পরমার্থ সাধনা। আমি যখন কারুর দোষ দেখছি তার মানে দ্বৈত বুদ্ধিটা আমার কাছে সত্য হয়ে আছে। যাঁরা ওঁ নমঃ শিবায় জপ করছেন তখন বলছেন শিবই সব কিছু হয়েছেন, তাহলে শিব কি অমুককে বাদ দিয়ে সব হয়েছেন? আমরা যখন এক ঘন্টা জপ করছি তখন বলছি ঠাকুরই সব। জপ থেকে উঠে আসার পর এর ওর নিন্দা করছি, একে প্রশংসা করছি তাকে গালাগাল দিচ্ছি। একটা আদরের বাচ্চা, বাবারও আদরের আর মায়েরও আদরের, এখন বাবা বাচ্চার এক হাত ধরে টানছে মা আরেক হাত ধরে টানছে, বাচ্চার তো হাত ছিড়ে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়ে যাবে। এইজন্যই সাধকের প্রাণটা যায়। জপের সময় একদিকে টানছে, জপের বাইরে অন্য দিকে টানছে। বেশীর ভাগ লোকের দুরবস্থার কারণ এটাই। এখানে বলছেন যারা ঘোর বিষয়ী তাদের কোন কষ্ট নেই, কারণ তারা পাক্কা জানে দ্বৈতই সত্য। আর যাঁরা জ্ঞানী তাঁদেরও কোন কষ্ট নেই। প্রাণ যায় আমাদের মত লোকদের। কেন প্রাণ যায়? কারণ সাধনার সময় বলছি ঠাকুরই সত্য ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই, সাধনার বাইরে যখন থাকছি তখন দুনিয়ার শ্রাদ্ধ করছি। দুটো বিপরীত শক্তি যখন বিপরীত দিকে টানে তখন ভেতরে একটা ঘূর্ণাবর্ত তৈরী হয়, এটাই সাধকের কাল হয়ে যায়। সেইজন্য বলছেন আগে তোমার দ্বৈত ভ্রমটা দূর কর। কিন্তু ভ্রম দূর না করে আমরা সব কিছুর নিন্দা স্তুতি করে যাচ্ছি। তুমি যদি নিন্দা-স্তুতি দুটোই বন্ধ না করতে পারো তাহলে অন্ততঃ আগে নিন্দা করা থেকে বিরত হও। এরপর থেকে তুমি একটু একটু করে এগোতে শুরু করবে, তারপর একটা অবস্থার পর স্তুতিটাও বন্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য বার বার বলছেন তুমি প্রকৃতির দিকে বেশী নজর দিতে যেও না। প্রকৃতির কোন কিছুকেই গুরুত্ব দিও না।

দ্বৈতটাই মিথ্যা, আমি-তুমি ভেদটা মিথ্যা। এই মিথ্যা থেকে বেরোবার জন্যই সাধনা। সাধনা করছি মিথ্যা থেকে বেরোবার জন্য কিন্তু সাধারণ অবস্থায় বলছি – আহা কি সুন্দর দেখতে, কি সুন্দর কথা বলে, কি সুন্দর গান করে আবার ওর মত স্বার্থপর দুনিয়ায় আর নেই, এত নোংরা স্বভাব যে কথা বলতেও ইচ্ছে করা না। এই দুটো বিপরীত শক্তি আমাদের সাধনার অগ্রগতিকে একেবারে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।* গুরু শিষ্যকে বলছেন তুমি এই ভাবটা আরোপ করবে – তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। আরোপ করে চিন্তা করতে করতে দ্বৈত বুদ্ধিটা কমে আসবে, এরপর তাঁর কৃপায় অদ্বৈত জ্ঞান পাকা হয়। মাটি দিয়ে অনেক খেলনা বানানো হয়েছে, হাতি, ঘোড়া, গরু অনেক কিছু বানানো হয়েছে। ইচ্ছে করলে পরের দিন

হাতিটাকে পাল্টে গরু বানিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মাটির খেলনাকে আগুনে ফেলে দেওয়ার পর আর ওটা পাল্টানো যাবে না। সাধনার সময় মন নানান রকম আকার নিতে থাকে, আকার নিতে নিতে একটা অবস্থায় মন একটা রূপ নিল। কি রূপ? অদ্বৈত। কিন্তু এরপরেও মন অদ্বৈত থেকে আবার দ্বৈতে চলে যাবে। এই যাওয়া আসাট চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আগুনে ফেলা হচ্ছে। আগুনের যে ফেলা হবে এটা আমার আপনার হাতে নেই, এটা তাঁর হাতে। এরপর অদ্বৈত জ্ঞান পাকা হয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন – মানুষ যখন জেগে থাকে তখন সে দ্বৈত দেখে। যখন স্বপ্নে যায় তখন যে চিন্তাগুলি স্বপ্ন হয়ে আসে তখনও সে দ্বৈতে থাকে। সুষুপ্তিতে চলে যাওয়ার পর তার চেতনা থাকে না আমি কোথায় আছি, গাঢ় নিদ্রায় তাই অদ্বৈতে চলে যায়। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গের পর আবার দ্বৈতে ফিরে আসে। সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রাতেই সব কিছু লয় হয়ে যাচ্ছে, আর যা কিনা বাস্তবিক অদ্বৈত, যেখানে অজ্ঞান নেই সেখানে সবটাই এক, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। ভাগবতে অনেক রকম তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে। বড় বড় সাধকরা ভাগবতের উপর অনেক ভাষ্য রচনা করেছেন, সেখানে তাঁরা ভাগবতের অনেক তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, কেউ বলছেন ভাগবত দ্বৈত দর্শনকে দাঁড় করিয়েছে, কেউ বলছেন বিশিষ্টাদ্বৈতের কথাই ভাগবত বলছে, চৈতন্য মহাপ্রভু ভাগবত থেকে নিয়ে এলেন অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, বাস্তবিক দ্বৈত বলতে কিছু নেই, সেইজন্য দ্বৈতে মন দিতে নেই। এখানে যা বলা হচ্ছে সবই ভগবৎ সাধকদের জন্য বলা হচ্ছে। বাইরের লোকদের বললে এগুলো কে বিশ্বাস করবে আর মানতে চাইবে!

জগতের সব কিছুকে হয় বাণী দিয়ে ব্যক্ত করা যায় আর নয়তো মন দিয়ে চিন্তা করা যায়, তার মানেই এগুলো সব মিথ্যা। সবাই আজকে এক রকম বলছে কাল অন্য রকম বলবে, আজকে এক রকম চিন্তা করছে কাল অন্য রকম চিন্তা করবে। মিথ্যা বলতে এখানে অনিত্য, চিরস্থায়ী কিছু নেই, দেশ, কাল ও বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একমাত্র তিনি আছেন, তিনিই থাকবেন। তাই অনিত্যকে ভালোবেসে কি হবে! কিন্তু মানুষ জাগ্রত অবস্থায় কত কি করছে, এগুলোই স্বপ্নে গিয়ে অন্য একটা জগৎ তৈরী করছে। আর যখন জাগ্রত হয় তখন দেখে স্বপ্নের জগৎ বলে কিছু নেই, সব মিথ্যা। ঠিক তেমনি সমাধির অবস্থায় এই জাগ্রত অবস্থাটা ভেঙে যায় তখন দেখে – আরে! সবই তো মিথ্যা। স্বপ্নে যা কিছু হয় স্বপ্নাবস্থায় তার সব কিছুই সত্য, আরও মজার ব্যাপার, স্বপ্ন ভেঙে গেলেও সত্যটা কিছুক্ষণ চলতে থাকে। ঠাকুর বলছেন – স্বপ্নে বাঘ দেখেছে, ঘুম ভাঙার পরেও বুকটা টিপটিপ করতে থাকে। একেবারেই যে মিথ্যা তা তো নয়, হুঁশ আসার পরও বুক ধরফর করছে। ঠিক তেমনি জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু হচ্ছে এগুলোও সত্যই কিন্তু স্বপ্নটা মিথ্যা মনে হয়। জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু হয় সমাধি অবস্থায় গিয়ে দেখে সবটাই মিথ্যা। পরমার্থ সাধনে এগুলোকেই সব সময় বিচার করতে হয়।

ভাগবত ধর্ম নিরূপণ

ভগবতের একাদশ স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ভাগবত ধর্মের নিরূপণ করা হয়েছে। এত রকম সাধনের কথা শোনার পর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন – হে অচ্যুত! সাধারণ মানুষ মনকে বশীভূত করতে অক্ষম তাদের পক্ষে আপনার কথা মত পরমার্থ সাধনা করা অত্যন্ত কঠিন বলে আমার ধারণা। এদের জন্য আপনি এমন কোন সহজ সরল পথের কথা বলুন যাতে মানুষ অনায়াসে আপনার পরমপদ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। উদ্ধভের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন এটাই ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্মে মূলতঃ ঈশ্বরে ভক্তির কথাই বলা হচ্ছে। অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা ভাগবত ধর্মকে একটা আলাদা ধর্ম রূপে দেখেন, এনারা গীতা, উপনিষদ থেকে ভাগবত ধর্মকে আলাদা করে দেখেন। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ ইনস্টিট্যুট থেকে যে কালচারাল হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া বই বেরিয়েছে তাতে কিছু কিছু পণ্ডিত লেখকরা ভাগবত ধর্ম শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁরাও দেখাতে চাইছেন ভাগবত ধর্ম গীতা ও উপনিষদ থেকে আলাদা। কিন্তু গীতা, উপনিষদ থেকে ভাগবত ধর্ম আলাদা কিছু নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি এই 'হন্ত তে' শব্দ ব্যবহার করে বলছেন – *হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্। যাঞ্ছ্রদ্ধয়াহহচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্।।১১/২৯/৮*। হে উদ্ধব আমি আবার, 'হন্ত তে'

শব্দের অর্থ হল আবার নতুন করে তোমাকে *মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্* বলছি, আমার যে ধর্ম, যেটা সুমঙ্গল, আর মম ধর্ম মানে ভাগবত ধর্ম বলছি। তুমি তো বললে এগুলো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক আছে আমি আরো সহজ উপায় সেই অত্যন্ত মঙ্গলময় ভাগবত ধর্মের কথা তোমাকে বলছি। মানুষ যদি শ্রদ্ধাপূর্বক এই ধর্মের অনুশীলন করে তাহলে সে মৃত্যুকে জয় করে নেবে। এখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ধর্মের একটা বিরাট লম্বা আলোচনা করছেন। এর থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরছি। প্রথমেই বলছেন, সব কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করবে আর কাজের সময় ঈশ্বরের কথা স্মরণ করবে ও তাঁর নাম করবে। এই ভাব নিয়ে যতক্ষণ কর্ম না করবে ততক্ষণ কিন্তু কর্ম তোমাকে জড়িয়ে রাখবে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমাদের এমন অনেক কাজ করতে হয় যে কাজকে ঈশ্বরের কাজ বলে মনে হয় না, আর তার ফলও ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন সব কর্মই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করছি আর কাজ করার সময় তাঁর নাম জপ করা অভ্যেস করে যেতে হবে, জপ না হলেও তাঁর স্মরণ করে যেতে হবে। একদিনে হবে না, অভ্যাস করে যেতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় একটা বর্ণনা আছে। যশোদা একদিন দই থেকে মাখন তুলছেন, তিনি এক মনে মাখন তোলার দণ্ড ঘুরিয়ে যাচ্ছেন, চোখ বন্ধ করে শিশু কৃষ্ণের কথা ভাবছেন আর মুখ দিয়ে কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক গান করে যাচ্ছেন। একজন মা তার শিশু সন্তানকে বাল্যরস দিয়ে যে ভাবে চিন্তা করে এখানে তা একেবারেই হচ্ছে না। যশোদার এটা একটা অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক বর্ণনা। যশোদার মাধ্যমে দেখাচ্ছেন একজন সাধক কিভাবে সাধনা করবে। ওখানে কাজ হল মাখন তোলা, যশোদা সেই কাজ করছেন কিন্তু তাঁর মন সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন, মুখে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গান করছেন। কার জন্য মাখন তুলছেন? শ্রীকৃষ্ণ মাখন ভালোবাসে, শ্রীকৃষ্ণের জন্য মাখন তুলছেন। ঠাকুর বলছেন, সংসারে কিভাবে থাকবে? ঢেঁকিতে গ্রামের মহিলা ধান ভাঙছে, হাত দিয়ে ভাঙা ধান সরাচ্ছে, একজন খদ্দেরকে বলছে তোমার এত পয়সা দেনা আছে, ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে কিন্তু মনটা সব সময় রয়েছে ঢেঁকির উপর, হাতের উপর না ঢেঁকি এসে পড়ে। খুব কঠিন, অনেক দিন অভ্যাস না থাকলে হবে না। কাজ করার সময় ঈশ্বরকে স্মরণ করাও খুব কঠিন, অনেক দিন অভ্যাস করতে করতে রপ্ত হয়। অনেক মহারাজদের দেখা যায়, অফিসে কাজ করছেন, যেমনি দেখলেন এখন কোন কাজ নেই, ওখানেই চেয়ারে বসেই ধ্যানে করতে বা জপ করতে শুরু করে দিলেন। আবার কেউ এসে গেল, কোন বিরক্তি নেই, সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে গেলেন। স্বামী মাধবানন্দজী তখন জেনারেল সেক্রেটারী, একদিন সন্ধ্যেবেলা মশারির ভেতর জপ করছেন। একজন মহারাজ কোন কাজে দেখা করতে এসে দেখেন মহারাজের ঘর অন্ধকার। উনি ফিরে যাচ্ছেন, হঠাৎ করে ঘরের লাইটটা জ্বলে উঠল, ভেতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ, কে? উনি ভেতরে গেলেন, অফিসের একটা কাজ নিয়ে এসেছিলাম, আপনি জপ করছেন দেখে চলে যাচ্ছিলাম। মাধবানন্দজী বলছেন, এটাও ঠাকুরের কাজ। ওনার কাছে জপ করাও যা কাজ করাও তাই।

মঠের এক পরিচিত ভক্ত আছেন, প্রায়ই মঠে আসেন, ভক্ত পরিবার। জীবনে অনেক ধাক্কা খাওয়ার পর এখন একটা দোকান চালান। উনি একদিন তাঁর পরিচিত এক মহারাজকে দোকান দেখাতে নিয়ে গেছেন। সব দেখার পর মহারাজ ভক্তটিকে বলছেন 'জীবনে তো অনেক ধাক্কা খেলেন, এখন কিছু একটা করুন'। 'কি করব মহারাজ'। 'কেন! দোকানে তো সারাদিন বসে থাকেন, খদ্দের না থাকলে শুধু জপ করতে থাকুন'। 'চেষ্টা করি কিন্তু কখন যে জপ বন্ধ হয়ে যায় বুঝতেই পারিনা'। 'ঠিক আছে আপনার দোকানের আলমারির গায়ে এই তিনটে শব্দ লিখে রাখুন, আর এই তিনটেকে ঠিক মত পালন করতে থাকুন'। এই বলে মহারাজ নিজেই একটা কাগজে বড় করে লিখলেন **'জপ, জপ, জপ'** আর কাগজটা আলমারির কাঁচে সাটিয়ে দিতে বললেন। 'যখনই আপনার এই লেখাটার দিকে চোখ যাবে আপনি তখুনই একটু জপ করতে থাকবেন। ভুলে যাবেন ঠিকই, কিন্তু আলমারিটা আপনাকে বারবার খুলতে হবে তখন আবার চোখ পড়ে যাবে, আবার জপ করতে শুরু করে দেবেন'। অনেক দিন পর মহারাজের সঙ্গে সেই ভক্তের ফোনে কথা হল। মহারাজ জানতে চাইলেন সব ঠিক চলছে কিনা। হ্যাঁ মহারাজ, সব ঠিক আছে। আরও কিছু দিন যাবার পর মহারাজের সঙ্গে কথা হতেই বলছেন 'মহারাজ ঐ লেখাটা আলমারির অন্য জিনিষের মত হয়ে গেছে, চোখে পড়লেও কিছু হয়

না'। মানুষ পারে না, সে যতই চেষ্টা করুক না কেন। সেইজন্য ভগবান সহজ পথের কথা বলে দিচ্ছেন। যতটুকু হয়। যারা প্রচণ্ড চেষ্টা করে, সাধু সন্ন্যাসীরা কি প্রচণ্ড চেষ্টা করে যাচ্ছেন আর চেষ্টার কত রকম পন্থা যে অবলম্বন করেন দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। দিনে একবার টানা দু ঘন্টা জপ করা আর সারাদিন কাজের ফাঁকে ঐ ভাবে যদি এক ঘন্টা জপ হয়ে যায়, তাতে অনেক গুণ কাজ হবে।

দ্বিতীয়, *দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্। দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্ত্যাচরিতানি চ।।১১/২৯/১০।* পবিত্র স্থানে বাস করবে। পবিত্র স্থান মানে, যেখানে সাধু সন্তরা থাকেন, সেখানেই থাকবে, যেখানে সেখানে থাকবে না। আর দেবতা হোক, অসুর হোক আর মানুষই হোক যাঁরাই ঈশ্বরের ভক্ত তাঁদের জীবনচর্চার অনুশীলন করবে। যেমন দৈত্যদের মধ্যে ছিলেন প্রহ্লাদ, তিনি ঈশ্বরের ভক্ত, তুমিও প্রহ্লাদের মত আচরণ করবে। মানুষের মধ্যে ধ্রুব, তিনিও একজন ভগবানের ভক্ত। ঠাকুরও বলছেন, মাঝে মাঝে নির্জনবাস করবে। কোন আশ্রমে গিয়ে থাকা, মহারাজরা যেভাবে জীবন-যাপন করছেন সেইভাবে তুমিও তাঁদের মত জীবন-যাপন করার চেষ্টা করবে।

তৃতীয়, পবিত্র দিনে, বিশেষ পার্বণে ভক্তরা একত্র হয়ে বা একাকী ভাবে কীর্তন ভজনের আয়োজন করবে। ঠাকুরের তিথি-পূজায় বেলুড় মঠে কোন কারণে আসতে পারলেন না, বাড়িতেই সবাই মিলে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করে ঠাকুরের কিছু নামগান করলেন, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে পাড়ার সবাইকে ডেকে প্রসাদ বিতরণ করলেন।

চতুর্থ, *মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্। ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ।।১১/২৯/১২।।* নিজের শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভক্ত যেমন সেই নারায়ণ দর্শন করবেন, সেই সাথে সমস্ত প্রাণীর মধ্যেও নারায়ণকে দর্শন করবে। ভক্ত নিজের ভেতরে যা দেখে বাইরেও তাই দেখে। গীতায় ভগবান বলছেন *শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*, যিনি বিদ্বান সবার প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি, ভক্ত সব সময় গীতার এই উপদেশ পালনের চেষ্টা করবে। ভক্ত এইভাবে দেখে, আমার ভেতরে কে আছেন, সেই পরমাত্মা, বাইরে কে আছেন, সেই পরমাত্মা, আবরণশূন্য, পূর্ণ রূপে তিনিই আছেন, সেখানে কোন সীমা নেই। সমস্ত প্রাণী, যেখানে যত প্রাণী আছে সবারই ভেতর সেই এক ঈশ্বরই আছেন, এই ভাব নিয়ে চলতে হবে। স্বামীজী যে বলছেন, কে ভালো কে মন্দ কে বিচার করবে, সবই তো তিনিই হয়েছেন। একই কথা বেদও বলছে, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, হে ভগবান! তুমিই নারী হয়েছ, তুমিই পুরুষ হয়েছ। এইসব বলে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, এই জ্ঞানদৃষ্টিকে অবলম্বন করবে, এখানে এখনও জ্ঞান হয়নি, বলছেন জ্ঞানদৃষ্টি নিয়ে। আমরা যে কাজই করছি সংসার দৃষ্টি নিয়ে করছি, ভেদ বুদ্ধি নিয়ে কাজ করছি, এই বুদ্ধি দিয়ে মানুষ এগোতে পারে না। সেইজন্য বলছেন জ্ঞানদৃষ্টি, সে জানে আমি অপরের মধ্যে ঈশ্বর দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু প্রতিনিয়ত চিন্তন করতে হয়, ভাবতে হয়। এটা করতে করতে একদিন হয়ত কেউ তাকে একটা গালাগাল দিল, ক্ষণিকের জন্য হয়ত মনটা নড়ে উঠবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে, এর মধ্যেও তো ঠাকুরই আছেন, ও যা বলছে ঠাকুরই বলাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কিন্তু ঠিক ঠিক যিনি জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তিনি সমস্ত প্রাণীতে ও পদার্থে আমাকেই প্রত্যক্ষ করেন। তখন তাঁর ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, চোর-ভক্ত, সূর্য-স্ফুলিঙ্গ ও কৃপালু-ক্রূর সবার প্রতি সমদৃষ্টি এসে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যখন তার মধ্যে এই ভাব চলে আসে তখন তার মন থেকে স্পর্ধার ভাব, ঈর্ষার ভাব, তাচ্ছিল্য ভাব আর অহঙ্কার ভাব চলে যায়। এখানে সেই উপনিষদের বাণীরই অভিব্যাক্তি, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ*, যখন একত্ব ভাব চলে আসে তখন কাকে নিয়ে আর মোহ করবে আর কি নিয়েই বা শোক করবে! অদ্বৈত দৃষ্টি এসে গিলে কিসের অহঙ্কার করবে! মানুষের সব থেকে উচ্চতম অবস্থা হল নির্বিকল্প সমাধি। নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মজ্ঞানই তো হবে, নতুন কিছুই পাচ্ছে না। হারানো জিনিসটাই সে ফিরে পেল। বিস্মৃত জ্ঞানটা ফিরে ফেল তাতে অহঙ্কারের কি আছে! নির্বিকল্প সমাধি শ্রেষ্ঠ, তার নীচে সবিকল্প সমাধি, সবিকল্প সমাধির নীচে ধ্যান-ধারণা, তার নীচে ভক্তি। ভক্তি হয়েছে বলে আমি ঠাকুরের মন্দিরে এসে চরণামৃত আর বাতাসা খাচ্ছি আর আমার পাশের বাড়ির লোকরা মন্দিরে যায় না, তার জন্য আমার অহঙ্কার করার কি আছে!

এই কথাগুলো সাধকদের জন্য। আর যার টাকা-পয়সা প্রচুর আছে, তাদের জন্য ঠাকুর বলছেন, তারে বাড়া তারে বাড়া আছে, মানে তার থেকেও বড় আছে। ভগবান বুদ্ধ তাঁর এত রাজ ঐশ্বর্যকে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, তার মানে টাকা-পয়সা, ঐশ্বর্যের থেকেও অনেক মূল্যবান কিছু আছে, যেটাকে পাওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধ সব ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন এই ভাব যতক্ষণ ভক্তের মধ্যে না আসছে তত দিন তার মনে যত রকমের সঙ্কল্পের উদয় হচ্ছে আর যত রকমের কর্ম করছে মন, বাণী আর শরীর দিয়ে সেই সঙ্কল্প ও কর্মগুলি আমারই সাধনা করছি এই ভাব নিয়ে করবে। *সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া। পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ।।১১/২৯/১৮।* সমস্ত কিছুকে যদি অভেদ বুদ্ধি দিয়ে দেখার অভ্যাস করতে থাকে তাহলে স্বল্পকালের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপাতে তার জ্ঞানের উন্মোচন হয়ে যাবে আর সব কিছুকে ব্রহ্ম রূপেই দেখবে। তখনই সমস্ত সংশয়, সন্দেহের নিবৃত্তি হয়ে জাগতিক দৃষ্টিটা নষ্ট হয়ে যাবে। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যত রকমের সাধনা আছে তার মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ সাধনা হল মনে যত রকম চিন্তা-ভাবনা হয়, শরীর দিয়ে যত রকম ক্রিয়া হতে পারে আর বাণী দিয়ে যত শব্দ ব্যক্ত হয় সবটা দিয়ে অর্থাৎ কায়মনোবাক্য দিয়ে একমাত্র ঈশ্বরেরই ভজনা করা আর ঈশ্বরের ভাবে তদ্‌গতচিত্ত হওয়া।

কর্ম থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে সব কিছুতে ঈশ্বরের ভাব আরোপ করা, ঈশ্বরের চিন্তন করা এটাই ভাগবত ধর্ম। ভাগবত ধর্ম শুরু হয় অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে আর শেষ হয় অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় গিয়ে। ভাগবত ধর্মের কথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মোস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙনির্গুণত্বাদনাশিষঃ।। ১১/২৯/২০।* একবার যদি ভাগবত ধর্ম শুরু করে দেওয়া হয়, আর কোন কারণে যদি একটু বাধা-বিঘ্ন এসেও থাকে, তাতেও কেউ পথভ্রষ্ট হয় না। গীতাতেও ভগবান যোগের প্রশংসা করে বলছেন *নেহভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*। সামান্যতমও যদি ভাগবত ধর্মের অনুশীলন করে এটা আর নাশ হয় না। *যো যো ময়ি পরেধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ। তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ ভয়াদেরিব সত্তম।।১১/২৯/২১।* ভাগবত ধর্ম পালনে কোন ত্রুটি হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। কারণ ভাগবত ধর্মের সাধক, যিনি সব কিছুতে ঈশ্বর বুদ্ধিকে প্রয়োগ করছেন, তিনি যদি ভয় ও শোকের কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ক্রন্দন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে উন্মত্তের মত আচরণের মত নিরর্থক কর্মগুলিও নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরকে সমর্পিত করে দেয়, তাতেও তার আধ্যাত্মিক উন্নতিই হয়। ধরুন, একজন সাধক সব সময় অভেদ বুদ্ধি, সবার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখার অনুশীলন করছেন। কোন কারণে তাঁর একটা শোক হয়েছে, শোক হওয়াতে তিনি এখন ক্রন্দন করছেন। একটা সময় কান্নাকাটি থেমে গেল, থেমে যাওয়ার পর সাধক ঠাকুরকে বলছে 'হে প্রভু! এই যে আমি কান্নাকাটি করলাম, এটাও আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম'। ফলে সাধক এগিয়েই যায়, থেমে যায় না। শোকের জন্য ক্রন্দনটাও তখন সাধকের কাছে একটা ধর্ম হয়ে যায়। সব কর্ম আবার ঈশ্বরকে অর্পণ করা যায় না। একজনকে খুন করে এসে বলবে ঠাকুর এই কর্মটা তোমাকে অর্পণ করলাম, এই ধরণের কর্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করা যায় না। কারণ এটা ধর্ম নয়।

শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন *এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষীণাম্। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যোনাপ্লোতি মামৃতম্।।১১/২৯/২২।* বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এতেই লেগে থাকে, যিনি মনীষী তাঁর মনীষা ভাব এটাতেই থাকে। বুদ্ধিমান আর মনীষীকে এখানে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। বুদ্ধি হল অপরের জিনিসকে চটপট গ্রহণ করার ক্ষমতা, যেমন গবেষকরা। আর মনীষী হলেন যাঁরা নতুন চিন্তা-ভাবনা করেন। একটা secondary talent আর আরেকটি creative talent। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি মনীষী, নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা দিয়ে কবিতা, সাহিত্য রচনা করছেন। আবার যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর গবেষণা করে পিএইচডি করছেন, এঁরা হলেন বুদ্ধিমান। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, বুদ্ধিমানের যে বুদ্ধি আর মনীষীদের যে মনীষা, এই বুদ্ধি আর মনীষা দিয়ে তাঁরা যেন অনৃতের মধ্যে সত্যকে প্রাপ্ত করে। আর *মর্ত্যোনাপ্লোতি মামৃতম্*, এই জগৎটা মর্ত্যলোক, এই মর্ত্যলোক থেকে অমৃতত্ব লাভ করবে। তাহলে বুদ্ধি আর মনীষাকে কোথায় কাজে লাগাতে

বলছেন? তুমি বুদ্ধিমান, অনৃত থেকে সত্যকে প্রাপ্ত করার জন্য আর মর্ত্যলোক থেকে অমৃতত্বকে পাওয়ার জন্য তোমার বুদ্ধিকে লাগাও। তুমি মনীষী, তুমিও তোমার মনীষার সাহায্যে অনৃত থেকে সত্যকে অন্বেষণ করে সত্যে পৌঁছে যাও আর মর্ত্যলোক থেকে অমৃতত্বকে খুঁজে নিয়ে সেই অমৃতকে প্রাপ্ত কর। যাঁরা এইভাবে বুদ্ধি ও মনীষাকে ব্যবহার করেন তাঁরাই বুদ্ধিমান, তাঁরাই মনীষী। কিন্তু আমাদের সব বুদ্ধি, কৌশল লাগিয়ে দিচ্ছি কীভাবে একটা চাকরী জুটিয়ে ঘর-সংসার পেতে অনৃতের মধ্যে অনৃত হয়ে থাকাতে। ঠাকুরও বলছেন, সা চাতুরি চাতুরি, সেটাই চাতুরি যে চাতুরির দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। চাতুরি মানে চতুর, যার বুদ্ধি ও কুশলতা আছে। আমাদের শাস্ত্রও বলছে, *সা বিদ্যা যা মুক্তয়ে* – সেটাই বিদ্যা, যে বিদ্যা আমাদের মুক্তির পথে নিয়ে যায়। চাতুরিও তাই, যে চাতুরি আমাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটাই চাতুরি। স্বামীজী এটাকেই অনুবাদ করে বলছেন Education is the manifestation of the perfection already in man। অনৃতের মধ্যে যে সত্য সেই সত্যকে পাওয়া আর মর্ত্যলোকের মধ্যে যে অমৃতত্ব সেই অমৃতত্বকে পাওয়া, এটাই আসল তত্ত্ব, বাকি কোন কিছুই কিছু না। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বিরোধী পক্ষের কথা তুলে বলছেন – কত পণ্ডিতরা তো এই জগৎকে সত্য বলে মনে করছেন, আপনি কেন জগৎকে মিথ্যা বলছেন? আচার্য তার উত্তরে বলছেন – শোন ভাই! এইসব পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য সত্যকে ভুলে গিয়ে মিথ্যাকে ধরে রাখাতে। বিরোধী পক্ষের কথা না হয় আমরা ছেড়ে দিলাম। সারা জগতে এখন কাদের বেশী সম্মান করছে? আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীদের, বড় বড় দার্শনিকদের, মনীষীদের। কিন্তু ভারতে এই প্রথা নেই, ভারতীয় পরম্পরাতে তাঁদেরকেই উচ্চ সম্মান দেওয়া হয় যাঁরা অনৃত থেকে নিত্যে পৌঁছে গেছেন। যিনি ভাগবত ধর্মে অবস্থিত হয়ে নিত্যবস্তু লাভ করে অমৃত হয়ে যান, তিনিই চতুর, তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই মনীষী। এর বাইরে যা কিছু কথাবার্তা, বুদ্ধি, চাতুরি সব ফাঁকা আওয়াজ, এরা সবাই প্রকৃতির এলাকায় তাদের বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ সব শেষে বলছেন – দেখো উদ্ধব আমি তোমাকে পুরো ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য বিস্তারিত ভাবে বললাম। তুমি এটা ভালো করে বুঝে নাও মানুষ কখনই নিজের বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে সত্য ও অমৃতকে লাভ করতে পারবে না, দেবতারাও পারবে না, সেইজন্য তোমাকে নিরন্তর ভাবে লেগে থেকে এই ভাগবত ধর্মের অভ্যাস করে যেতে হবে। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ধর্মের বর্ণনা শেষ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের পার্থিব শরীরকে ছেড়ে স্বধামে চলে যাবেন ঠিক করে নিয়েছেন, সেই সময় উদ্ধব এসে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন – হে প্রভু, আপনি তো চলে যাবেন, আমি কি করব? আমার জন্য আপনি কি উপদেশ রেখে যাচ্ছেন, কেননা আমিতো আপনার শিষ্য। এখান থেকে আমাদের এই আলোচনা শুরু হয়েছিল।

যদুবংশ নাশ ও বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যধাম ত্যাগ

আমরা ভাগবতের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এরপর আসছে যদুকুল সংহার। যদুকুল সংহারের পরে যে অধ্যায়গুলো আছে যদিও ভাগবতের সঙ্গে এই অধ্যায়গুলোর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিন্তু এর মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাঁরা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও হিন্দু ধর্ম কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে জানতে চান তাদের জন্য এই অধ্যায়গুলো ভালো করে অধ্যয়ন করা উচিৎ।

এর আগে আমরা যদুকুল সংহারের প্রাথমিক পর্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ঋষিদের সাথে যাদব কুলের যুবকরা মজা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণেরই এক পুত্র সাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে ঋষিদের বলছে 'আপনারা বলুন! এই গর্ভবতী মেয়েটির ছেলে হবে, না মেয়ে হবে'? ঋষি তখন খুব রেগেমেগে অভিশাপ দিলেন, 'এ একটা মুষল প্রসব করবে আর এই মুষলই তোমাদের বংশ-নাশের কারণ হবে'। মহাভারতে যদুকুল সংহার আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ভাগবতের বর্ণনার সাথে অনেক অমিলও পাওয়া যায়। যদিও মূল কথা একই কিন্তু ঘটনা ও বর্ণনা সামান্য পাল্টে যায়।

ভাগবতে পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলছেন – যদুকুল নাশের যখন সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন তার পূর্ব আকাশে, ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে অতি ভয়ংকর ও অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। এই লক্ষণগুলো বলে দিচ্ছে জগতে

বিরাট বিধ্বংস হতে যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণও বুঝে গেছেন যদুকুলের নাশের সময় হয়ে গেছে। তিনিও এই বিনাশকে আটকাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন যদুকুলের সব ছেলেদের নিয়ে প্রভাসক্ষেত্রে চলে গেলেন, উদ্দেশ্য তীর্থে স্নান উপবাসাদি করে সবাই একাগ্রচিত্তে ভগবানের পূজা করবে, যাতে এই অমঙ্গল জনিত অশুভ লক্ষণ থেকে জগতের বিনাশকে রোধ করা যায়। মহাভারতে কিন্তু বলছে যাদবরা সব সেখানে উৎসব করতে গিয়েছে, এখন যেমন সবাই পিকনিক করতে যায়। যদিও ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলকে বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টা করলেন না। কিন্তু মহাভারতে আছে তিনি শেষ একটা চেষ্টা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সব যাদবদের বললেন, তোমরা তোমাদের সব অস্ত্র এখানেই রেখে যাবে, কেউ কোন অস্ত্র নিয়ে উৎসবে যাবে না। কিন্তু ভাগবতের বর্ণনা অন্য রকম, এখানে সবাই তাদের অস্ত্র সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল।

যাই হোক ওখানে গিয়ে সবাই খুব খাওয়া-দাওয়া করেছে। খাওয়া-দাওয়া করার পর সবাই প্রচুর মদ খেয়েছে। ধীরে ধীরে মদের নেশা সবাইকে ধরে নিয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কিছু কিছু যাদব সেনাপতি কৌরবদের দিকেও ছিলেন, যেমন কৃতবর্মা শেষ দিন পর্যন্ত দুর্যোধনের হয়ে লড়াই করেছিলেন, কিন্তু কৃতবর্মা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কমাণ্ডার-ইন-চিফ্। অন্য দিকে সাত্যকি আবার পাণ্ডবদের দিকে ছিলেন। সাত্যকি সব সময় বলতেন অর্জুন আমার গুরু, গুরুকে আমি কখন ছাড়বো না। মদের নেশা ধরে নিতেই পুরনো দিনের কথা তুলে এক অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে। একজন আরেকজনকে বলছে তুমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই করেছিলে, আবার সে বলছে তুমি এই এই করেছিলে। তর্কাতর্কি হতে হতে সাত্যকি আর কৃতবর্মার মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই লেগে গেল। দুজনে লড়াই লাগতেই শ্রীকৃষ্ণের নাতি আর সন্তানরা কিছু সাত্যকির পক্ষে কিছু কৃতবর্মার পক্ষে যোগ দিয়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেলে। এরপর লড়াই আর দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, সবাই সবার সঙ্গে লেগে গেল। দোষারোপ থেকে দলাদলি, দলাদলি থেকে মারামারি শুরু হয়ে গেল। ভাগবতের বর্ণনা হল, সবাই যত অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল সেই অস্ত্র দিয়ে এক অপরকে আক্রমণ করে দিল। মদের নেশায় এমন ঘোরের মধ্যে রয়েছে যে কে কাকে মারছে বুঝতেও পারছে না। ছেলে বাবাকে মারছে, বাবা ছেলেকে মারছে, ভাই ভাইকে, বন্ধু বন্ধুকে মেরেই চলেছে। এরপর সব অস্ত্র যখন শেষ হয়ে গেল তখন তারা সমুদ্রের তীরে পাট গাছের মত কুশ জাতীয় লম্বা লম্বা ঘাস, এখানে বলছেন এরকা ঘাস তুলে পরস্পর মারামারি করতে লাগলো। এই সেই এরকা ঘাস, যার শেকড়ে ঋষিদের অভিশপ্ত মুষলের গুঁড়ো লেগে রয়েছে। তাদের হাতে যেতেই এরকা ঘাস একেবারে বজ্রসম কঠোর মুদ্গরে পাল্টে গেল। ক্রোধে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিপক্ষকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকল। মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিষেধে তারা কোন অস্ত্র নিয়ে যায়নি তাই প্রথম থেকেই তারা ওই কুশ ঘাস নিয়ে মারামারি শুরু করে দেয়। সেখানে গিয়ে সব মদ খেয়ে একে অপরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেইছিলেন, এদের শক্তি বড্ড বেড়ে গেছে, এর ফলে জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। কৃতবর্মা, সাত্যকির মত বড় বড় যোদ্ধা, এদেরকে কেউ হারাতে পারবে না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই মরবে।

যাদবদের এই নোংরা খেয়োখেয়ি দেখে বলরামের মধ্যে প্রচণ্ড ধিক্কার এসে গেছে। তিনিও সমুদ্রের দিকে একটা নির্জন জায়গায় ধ্যানে বসে নিজের শরীর ছেড়ে দিলেন। ভগবান বলুন আর যাই বলুন একবার যখন পৃথিবীতে এসে যান তখন এই সংসার ছেড়ে যাওয়া সবারই কাছে খুব কঠিন হয়ে যায়। অবধূতের যে চব্বিশ গুরু ছিল, সেখানে তিনি পায়রার কাছ থেকে এই শিক্ষাটাই গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রী, পুত্র সব একে একে জালে ফেঁসে যাওয়ার পর পুরুষ পায়রা বলছে – জীবনে যা কিছু পাওয়া যায়, সব স্ত্রী পুত্র দিয়েই পাওয়া যায়, আর ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটে পুরুষার্থ স্ত্রী-পুত্রকে দিয়েই হয়। আমার সব শেষ হয়ে গেল, একা বেঁচে থেকে আমি আর কি করব! এই বলে পুরুষ পায়রাও জালের মধ্যে ঝাঁপ দিল। এই দৃশ্য দেখে অবধূত শিক্ষা পেলেন, ভালোবাসাটাই বন্ধন। কথামৃতে ঠাকুর মাছের উপমা দিয়ে বলছেন, জেলেরা যখন পুকুরে জাল ফেলে তখন কিছু মাছ জাল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়। আবার কিছু মাছ এত সেয়ানা যে জালের ধারে কাছেই যায় না। ওরা জানে একবার যদি জালে ফেঁসে যাই বেরিয়ে আসা খুব মুশকিল হবে। বেরিয়ে হয়তো যেতে পারি আবার ফেঁসেও যেতে পারি। বলরামও দুঃখটা নিতে পারলেন না। চোখের সামনে নিজের আত্মীয় স্বজনরা

মারামারি করে একে একে মারা যাচ্ছে এই দৃশ্যকে তিনি সহ্য করতে না পেরে একাগ্র চিত্তে ধ্যানে বসে শরীরটা ছেড়ে দিলেন। আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, ঠাকুরকে আমরা সচ্চিদানন্দ ভগবান রূপেই দেখছি। আর তাঁর পার্ষদদের মধ্যে নরেন, রাখাল নিত্যসিদ্ধ, শ্রীমা স্বয়ং জগজ্জননী। ঠাকুরের শরীর চলে যাবার যখন সময় হল, তখন ঠাকুর এক দিকে বলছেন – এরা যতক্ষণ কেঁদে কেঁদে না বলে ওনাকে যে কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, এর থেকে চলে গেলেই ভালো, ততক্ষণ আমার শরীর ছাড়ার উপায় নেই, তা নাহলে ওরা প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। অন্য দিকে শ্রীমা তারকেশ্বরে গিয়ে শিবের কাছে হত্যে দিচ্ছেন যাতে ঠাকুর ভালো হয়ে যান। এনারা সবাই নিত্যসিদ্ধ, কেউ সাধক নন, কিন্তু মহামায়ার এমনই জাল যে, একটা শরীর চিরদিনের মত আমার চোখের আড়ালে যাবে, এটা কেউ স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে না, নেওয়া খুব কঠিন। আমরা বলবো এগুলো তাঁদের নাটক, হতে পারে নাটক কিন্তু নাটকেও তো এই জিনিসটাই দেখানো হচ্ছে, স্বজনরা এক এক করে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, এটাকে বুক নিতে পারে না। ঠাকুরের সন্তানরা এক এক করে দেহত্যাগ করছেন, খবর পেয়ে শ্রীমা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছেন। স্বামীজীর শিষ্য গুডউইন, যিনি স্বামীজীর সব কিছু লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তিনি দেহ ছাড়ার পর স্বামীজী একেবারে চিৎকার করে উঠছেন, দুঃখটা নিতে পারছেন না। পৃথিবীতে একদিকে সবাই নিজের সঙ্গী খোঁজে, সঙ্গী ছাড়া জীবন চলবে না, কিন্তু সেই সঙ্গী চলে যাওয়ার পর যে বেদনা, যে দুঃখ, প্রচণ্ড কষ্টদায়ক। ঠাকুরের জীবনে কারুর সাথে যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, চলে গেলে যে কষ্ট হবে, সেই রকম কারুর সঙ্গে ছিল না। শুধু ভ্রাতষ্পুত্র অক্ষয়ের সময় মা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন মানুষ স্বজন-বিয়োগে কি ধরণের কষ্ট পায়। শ্রীকৃষ্ণও অবাক দৃষ্টিতে সব দেখছেন।

মারামারি শুরু হয়ে যেতেই শ্রীকৃষ্ণ বুঝে গেছেন এরা আর বাঁচবে না। তিনিও সেখান থেকে সরে সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখছেন দাদা বলরাম ধ্যানে বসে পরমার্থ চিন্তন করতে করতে নিজের দেহত্যাগ করে দিচ্ছেন। সেখান থেকেও শ্রীকৃষ্ণ সরে এলেন। ওখান থেকে একটু দূরে নির্জনে একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। মহাভারতে বলছে শ্রীকৃষ্ণ গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ভাগবতে বলছেন তিনি ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। শুয়ে পড়ারই কথা, কারণ ধ্যানস্থ হয়ে গেলে তাঁর মুখটা ব্যাধ দেখতে পেতে। কাছেই জরা নামে এক ব্যাধ শিকার করতে বেরিয়েছে। জরা মানে বার্ধক্য। শ্রীকৃষ্ণ গাছের ছায়ায় শুয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণের পায়ের তলা গোলাপী রঙের ছিল। সূর্যের আলোতে পায়ের বুড়ো আঙুলের গোলাপী রঙ আরও উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে চিকচিক করতে লাগল। ঝোপের আড়াল থেকে উজ্জ্বল একটা জিনিস চিকচিক করছে দেখে জরা মনে করল হরিণের চোখ। মুষলের শেষ যে টুকরোটা থেকে গিয়েছিল সেটাকে যাদবরা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। সেই লোহার টুকরোকে একটা মাছ গিলে নিয়েছে, সেই মাছকে এক জেলে ধরেছে, মাছের পেট থেকে লোহার টুকরোটা সে বাইরে ফেলেছে, এক ব্যাধ সেই লোহার টুকরো নিয়ে পিটিয়ে একটা বাণ তৈরী করেছে। সেই ব্যাধ এবার হরিণ ভেবে সেই বাণটা শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালিয়েছে। ঋষিরা যে অভিশাপ দিয়েছিলেন এই মুষলই তোমাদের বংশকে নাশ করবে। শ্রীকৃষ্ণের কোন দোষ নেই, কিন্তু মারা গেলেন এক ব্যাধের হাতে। শ্রীকৃষ্ণকে যদি ভগবান বলে নাই মানা হয়, কিন্তু তিনি যে আত্মজ্ঞানী ছিলেন কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আত্মজ্ঞানীর এসবে কি আর আসে যায়। ঠিকই, কিছুই আসে যায় না। ব্যাধ দৌড়ে হরিণ নিতে এসে হতবম্ব হয়ে দেখছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ভয়ে ব্যাধ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, বার বার কাতর হয়ে বলছে – আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার মত মহাপুরুষকে আমি এভাবে বধ করে দিলাম! এই সেই শ্রীকৃষ্ণ, সুদর্শন চক্রের চালিকা শক্তি তাঁর মধ্যে, কত রথী মহারথীকে তাঁর পরাক্রমের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে, তাঁকেই কিনা একজন সামান্য ব্যাধের হাতে প্রাণ দিতে হয়!

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে অভয় দিয়ে বলছেন – তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। এভাবেই আমার শরীর যাওয়া নির্ধারিত ছিল, আর ভালোই হল তুমি আমাকে এই দেহ থেকে মুক্তি দিলে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র যদুবংশের তখন বেঁচে ছিলেন, যদুকুল সংহার কিনা, শ্রীকৃষ্ণও তো যদুকুলের। ঋষির অভিশাপ, শ্রীকৃষ্ণও বাঁচতে পারলেন না। ঐদিকে বলরাম আগেই চলে গেছেন, অন্য দিকে যদুকুলও শেষ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ এবার তাঁর নরলীলা সাঙ্গ করে মর্ত্যধাম ত্যাগ করলেন। ভাগবতের মূল কথা এখানেই এসে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিছু দিন আগে টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদকীয় কলমে একজন বিদেশী হিন্দু ধর্মের উপরে খুব সুন্দর একটা সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সম্পাদকীয়তে মহাভারতের মাণ্ডব্য ঋষির কাহিনী নিয়ে হিন্দু ধর্মের খুব প্রশংসা করেছেন। মাণ্ডব্য ঋষি বাচ্চা বয়সে একটা ফড়িংয়ের পেছনে কাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বলে তাকেও দণ্ড দিয়ে শূলে চাপানো হয়েছিল। তখন উনি ধর্মকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তুমি শূদ্রার গর্ভে জন্ম নেবে আর আজ থেকে আমি বিধান দিলাম চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বাচ্চার কোন পাপ লাগবে না। এই কাহিনীকে অবলম্বন করে উনি একটা খুব সুন্দর কথা লিখছেন – ভারতীয়রা ধর্মকে অন্য ভাবে দেখে। কোন মূল্যবোধেরই চরম সীমা বলে কিছু হতে পারেনা, সব নীতি, মূল্যবোধের এটাও হতে পারে আবার অন্যটাও হতে পারে। এই ব্যাপারে ধর্মেরও কোন ছাড় নেই, দরকার পড়লে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। ভগবান হও আর যাই হও, শরীর ধারণ যখন করেছ তখন তোমাকে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেই হবে। কোন অবস্থাতেই ধর্মকে অতিক্রম করতে পারবে না। যদুবংশের প্রতি অভিশাপ তোমাকেও ছাড়বে না, তুমিও অভিশপ্ত। ঋষিরা যখন অভিশাপ দিয়েছেন সে ভগবানই হোক আর যেই হোক, কাউকে ছাড়বে না।

দ্বাদশ স্কন্ধ

এরপর শুরু হয় দ্বাদশ স্কন্ধ। আমাদের মনে থাকার কথা যে, বারোটি স্কন্ধ নিয়ে ভাগবত। প্রথম নয়টি স্কন্ধে নানা রকম পৌরানিক কথা কাহিনী বলা হয়েছে। দশম স্কন্ধ এসে মূল কৃষ্ণকথা বা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী শুরু হয়। আর একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের লীলা শেষ হয়। যদিও ভাগবতের মূল চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভাগবতে খুব বেশী শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী নেই। কিন্তু পরবর্তি কালে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন কাহিনীকে আধার করে কবি, ভক্ত, সাধকরা অনেকে কাহিনী রচনা করেছেন। পরবর্তি রচনাতে শ্রীকৃষ্ণের সাথে আরও অনেক নতুন নতুন চরিত্রের সমাবেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শ্রীরাধা। মহাভারতে যেখানে রাধার কোন নামগন্ধও নেই, আর ভাগবতে শুধু রাসলীলায় একবার এক গোপীকে আরাধিকা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই আরাধিকা থেকে শ্রীরাধাকে পরের সাধক কবিরা একটা নতুন চরিত্র সৃষ্টি করলেন। ঠাকুরও আদর্শের দৃষ্টি থেকে অনেকবার রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে দেখলে অনেক গোলমাল দেখা যাবে।

পুরাণের একটি লক্ষণ হল বংশানুক্রম, যেমন শ্রীকৃষ্ণ কথাতে শ্রীকৃষ্ণের বংশে আগে কারা কারা ছিলেন, আর এই বংশ পরে কারা এসেছেন, এই করে দুদিকেই অনেক দূর পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বাদশ স্কন্ধের শুরুতেই শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশে কে কে এসেছিলেন, পরে কারা আসবেন পর পর অনেক নাম বলে গেছেন। তবে অনেক নাম মেলে না। ভবিষ্য পুরাণে তো ভারতে আকবর রাজা আর ইংরেজরা রাজত্ব করবে এত দূর পর্যন্ত বলে দেওয়া হয়েছে। বলা আছে মানে, পরের দিকে একটার পর একটা পাতা জুড়ে দিয়ে চলে গেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে অনেক রকম মত তৈরী করেছেন। সেখানে একটা মতে বলছেন, মূল কথাতে কখন হস্তক্ষেপ করা হতো না। যদি কিছু যোগ করতে চাইতেন তাহলে হয় সামনের দিকে যোগ করে দেবেন নয়তো একেবারে শেষের দিকে যোগ করে দেবেন। যদি যথার্থ রূপে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে ব্যাসদেব দশম আর একাদশ স্কন্ধই লিখেছিলেন। এই দুটি স্কন্ধ অবশ্যই ব্যাসদেবের রচনা হবে। কারণ ব্যাসদেবকে নারদ ভক্তিশাস্ত্র রচনা করতে বলেছিলেন। ব্যাসদেব যদি দশম আর একাদশ স্কন্ধ রচনা করে দেন এরপর আগে পিছনে কাহিনী জুড়ে দিতে কোন অসুবিধাই হবে না।

দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু হয় কলিযুগের বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেই কলিযুগ শুরু হয়। এখনও কলিযুগ চলছে, আর কলিযুগে কি হয় আর কি হতে পারে সবই আমরা চোখের সামনে দেখছি। শুকদেব পরীক্ষিতের কাছে কলিযুগের বর্ণনা করে বলছেন কলিযুগের অনেক দোষ। সব বলে বলছেন, কলিযুগের গ্রাস থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল নামসঙ্কীর্তন, এটাই যুগধর্ম। নারদীয়া ভক্তিই কলিযুগের যুগধর্ম। ভাগবতের মূল কাহিনী ছিল, পরীক্ষিৎএর উপর কলিযুগ ভর করেছিল, সেই কলিযুগ ভর করার জন্য পরীক্ষিৎ

একজন ধ্যানস্থ ঋষির গলায় মরা সাপ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, ঋষির ছেলে এসে পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়েছে যে সাত দিনের মধ্যে সে তক্ষক সাপের দংশনে মারা যাবে। পরীক্ষিৎ দেখছেন ঋষির অভিশাপে আমার শরীর তো চলে যাবে, এই সাত দিন আমি কীভাবে অতিবাহিত করব। তখন শুকদেব এসে বললেন – ঠিক আছে, সাত দিনের মধ্যেই আমি তোমার মুক্তির দ্বার খুলে দিচ্ছি। তখন শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত কথা শোনাতে শুরু করলেন। এই সাত দিন ধরে পরীক্ষিৎকে তিনি ভাগবত কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্ম ও অধর্মের চারটি চরণ ও কলিযুগের দোষের বর্ণনা

পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা আর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর কলিযুগের আগমন এবং কলিযুগের নানা রকম দোষের কথা কথা শোনার পর শুকদেবকে জিজ্ঞেস করছেন *কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ। বিধমিষ্যন্তুপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে।।১২/৩/১৭।* হে ভগবন্! আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি কলিযুগে তো কেবল দোষের প্রাচুর্যে পূর্ণ। এই দোষই যদি কলির যুগধর্ম হয় তাহলে মানুষ কলির এই দোষ থেকে নিস্তার পাবে কি করে?

পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শুকদেব চারটে যুগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে বলছেন – সত্যযুগের ধর্মের চারটি চরণ থাকে – সত্য, দয়া, তপ ও দান। সত্যযুগে সবাই ধর্মের এই চারটি গুণেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন, সবারই প্রতি দয়া থাকবে। তাহলে কি কলিযুগে দয়া নেই? দয়া না থাকলে এত এত বাচ্চারা বড় হচ্ছে কি করে? জন্মের পর থেকে পাঁচ সাত বছর পর্যন্ত সন্তানকে মা কত যত্ন করে সামলে রাখছে। সন্তানের প্রতি দয়া আছে বলেই তার জন্য ভাবছে। দয়া যদি না থাকতো তাহলে কোন বাচ্চাই আজ বড় হতে পারতো না। সমস্যা হল তাদের দয়াটা শুধু নিজের শিশু পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে যায়, অপরের সন্তানের প্রতি, অপরের প্রতি আর দয়া যেতে পারে না। কিন্তু সত্যযুগে সবার প্রতিই সমান দয়া। সত্যযুগে সবাই তপস্যা করেন। কিন্তু এখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত শুধু তপস্যা করেন। শ্রীমা এই যুগে বলছেন যার আছে মাপো যার নেই জপো। সত্যযুগে তা নেই, যার আছে সে যেমন প্রচুর দান করে আর তার সাথে জপও করে। তপস্যা আর দান সত্যযুগের এক সঙ্গেই চলে।

শুকদেব আবার বলছেন – ধর্মের যেমন চারটি চরণ, ঠিক তেমনি অধর্মেরও চারটি চরণ থাকে – অসত্য, মিথ্যা কথা বলাও যেমন অসত্য আর একটু চালাকি করে কথা বলাটাও অসত্যের মধ্যে ধর্তব্য। দ্বিতীয় হিংসা, দয়ার জায়গায় হিংসা এসে যায়। তৃতীয় অসন্তোষ, সন্তোষের অভাব। আর চতুর্থ বিগ্রহ, বিগ্রহ মানে ঝগড়া-বিবাদ বা কলহ। দুজনের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব আছে বিগ্রহ গিয়ে ঝগড়া করিয়ে দেব, স্বামী-স্ত্রী বিয়ের পর সুখে আছে বিগ্রহ গিয়ে ডিভোর্স করিয়ে দেবে। ধর্মের চারটে চরণ আর অধর্মের চারটে চরণ। যেমন যেমন যুগ পাল্টায় তেমন তেমন ধর্মের চরণ কমে যায়। কলিযুগে ধর্মের চারটে চরণই থাকবে কিন্তু চার ভাগ ক্ষমতা কমে গিয়ে এক ভাগ পরে থাকে আর চার ভাগের তিন ভাগ ক্ষমতা অধর্মে চলে আসে।

কলিযুগে সত্য, দয়া, তপ ও দান সবটাই আছে কিন্তু তিন চতুর্থাংশ ক্ষীণবল হয়ে পড়ে। সেইজন্য সব কিছুতে অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। যেমন *অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ। তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ।।১২/৩/২২।* কলিযুগে ব্রহ্মচারীদের ব্রহ্মচর্য ব্রতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। গৃহস্থরা অপরকে যে দান করবে তার বদলে তারা সবার কাছে চেয়ে বেড়ায়। বাণপ্রস্থীরা গ্রামেই থেকে যায়। আর সন্ন্যাসীদের *ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ*, অতি অর্থ লোভী, সহজ ভাষায় বললে দাঁড়ায় অর্থপিশাচ হতে দেখা যায়। ভাগবত সেই কবেকার গ্রন্থ, সেই সময়ই বলছেন সন্ন্যাসীরা খালি টাকার পেছনে দৌড়ায়। সেই সময় বৌদ্ধ ধর্ম এসে গিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের সন্ন্যাসীরা প্রচুর মঠ তৈরী করতে শুরু করেছিলেন। মঠ তৈরী করতে প্রচুর টাকা-পয়সার দরকার। তাঁদের নিয়েই ভাগবত হয়তো বলছেন। এইভাবে পর পর শুকদেব বলে যাচ্ছেন কলিযুগে ব্যবসায়ীরা কি রকম হয়, মেয়েরা কি রকম হয় ইত্যাদি।

কলিযুগের নেতিমূলক জিনিসগুলো উত্থাপন করা ভাগবতের উদ্দেশ্য নয়। কারণ এখানে শুকদেব খুব সুন্দর কথা বলছেন *পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্। সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।।১২/৩/৪৫।* হে পরীক্ষিৎ! কলি যুগের দোষের অন্ত নেই। কিন্তু যত রকমের দোষ আছে, দেশ, কাল, পাত্রের যত রকম দোষের আমরা কল্পনা করতে পারি, সব দোষের মূল উৎস আমাদের অন্তঃকরণ। ধর্মের মূলে এসে হিন্দু ধর্ম আর অন্যান্য ধর্মের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। খ্রীশ্চানরা বলছে যা কিছু দোষ হয় সব ডেভিল অর্থাৎ শয়তান থেকে আসে। দ্বৈতবাদের এই এক বিরাট সমস্যা, দ্বৈতবাদে দুটো সত্তা – ভগবান আর শয়তান। শেষ কথা ভগবানই আছেন, কিন্তু ভালো আর মন্দ দুটো সত্তা মেনে নেওয়া হয়। পার্সি ধর্ম, যাকে জুরাথ্রুজিমদের ধর্ম বলা হয়, এই ধর্মই প্রথম দুটো সত্তাকে নিয়ে আসে। জেন্দাবেস্তাতে দুটো সত্তাকে তারা বলছেন মাজ্দা আর আহিরবান্। মাজ্দা হল আলো মানে দৈবী শক্তি আর আহিরবান্ অসুর মানে আসুরিক শক্তি। দৈবী শক্তি আর আসুরিক শক্তির মধ্যে ক্রমাগত লড়াই চলছে। ওরা বলবে, আমি যখন ভালো কিছু করতে চাইছি তখন এটা যেন দেবতারা আমাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যখন আমি লোভে পড়ে যাচ্ছি, হিংসা করছি তখন আমাকে আসুরিক শক্তি ধরে নিয়েছে। বেদান্ত এই জিনিস কখনই মানবে না। ভালো কোনটা আর খারাপ কোনটা, এই ধরণের মূল্যবোধের উপর এই নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে, অনেক বই লেখা হয়েছে। কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ কি করে বুঝবো? আরও হল এর বিচার কে করবে? স্বামীজীও এই একই জিনিস নিয়ে অনেক কথা বলছেন। তিনি বলছেন – এক সময় যেটা ভালো মনে হচ্ছে, পরে আবার সেটাই খারাপ মনে হয়। যেমন যুদ্ধের সময় মানুষকে হত্যা করা হয় তখন এটাই ধর্ম আবার শান্তির অবস্থায় নিজের সমাজের কাউকে হত্যা করা গর্হিত জঘন্য পাপ কর্ম। একটা বাচ্চা ছেলে যদি বলে – আপনি পরিষ্কার করে বলুন তো মানুষকে মারা পাপ না পূণ্য। তখন আপনি বলবেন যারা আমার দুষমন্ তাদের মারা পূণ্য কিন্তু নিজের লোককে মারা পাপ। এইভাবে ভালো মন্দের বিচার হয় না, কারণ তখন আমাদের দুটো সত্তা নিয়ে আসতে হবে। নিজের স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া ধর্ম, কিন্তু অপরের স্ত্রীর দিকে নজর দেওয়াটা অধর্ম বলছে। অপরের স্ত্রীর দিকে যখন দৃষ্টি দিচ্ছে তখন আরেকটা সত্তা থেকে আসছে আর নিজের স্ত্রীর দিকে যখন তাকাচ্ছে সেটা আরেকটি সত্তা থেকে আসছে। এটাই ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদ।

বেদান্ত এই জিনিস কখনই মানবে না। বেদান্ত বলবে, সবটাই ঈশ্বরের থেকে আসছে, কারণ ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। তাহলে ভালোটা কার আর মন্দটাই বা কার? ভালো-মন্দ সবটাই ঈশ্বরের। সাধারণ মানুষ এই ব্যপারটা ধারণাই করতে পারে না। কিন্তু এটাই সত্য, তিনিই ভালোটা দেন, মন্দটাও তিনিই দেন। যখন ভালো দিচ্ছেন তখন তিনি বুঝছেন যে আমার কিছু ভোগের দরকার। যখন তাঁর মনে হয় আমাকে দিয়ে একটু যোগ করানোর দরকার তখন তিনি মন্দ কিছু দিয়ে দেন। ভগবান যখন সুখ দেন তখন ভোগ করার জন্য দেন আর তিনি যখন ঠিক করেন আমাকে দিয়ে যোগ করাবেন তখন তিনিই যোগের দিকে নিয়ে যান। এটা হল অকারণে যখন দুঃখ আসে। কিন্তু যে দুঃখ কারণে আসছে, যেমন আগুনে হাত দিয়ে দুঃখ পেলাম, এই দুঃখ ভগবান আমাকে থোরাই দিচ্ছেন। যে দুঃখ অজান্তায় এসে যায় সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে।

শুকদেব বলছেন যত দোষ, যত ভালো, যত সুখ, যত দুঃখ সব তোমার অন্তঃকরণ থেকেই উৎপন্ন হয়। আর যত রকমের পাপ সব তোমারই অন্তঃকরণ থেকে আসছে, এগুলো ভগবানও করান না, কোন শয়তান বা ডেভিলও করায় না। তাহলে কে করাচ্ছে? তোমার নিজের অন্তঃকরণ। যখন সুখের সন্ধানে তুমি দৌড়াতে শুরু করেছ, তখন তুমি প্রথমে বলছ আমার ভোগ চাই, দ্বিতীয় বলছ ভোগের জন্য আমাকে একটু ডান দিক বাম দিক করতে হবে। ডান দিক বাম দিক যখন করতে শুরু করেছ তারপর একটু পরে বাম দিকটা বেশী করতে শুরু করেছ। বোঝাই যাচ্ছে তোমার নিজের লোভের জন্য বাম দিক করছ। এই লোভ আসছে কোথা থেকে? তোমারই নিজের অন্তঃকরণ থেকে। তাহলে এখানে ভগবান কোথা থেকে আসছেন, ভগবান তোমার পাপের জন্য কেন দায়ী হতে যাবেন! সব পাপ তোমার অন্তঃকরণ থেকেই জন্ম নিচ্ছে।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করছেন এটাকে আটকানো যাবে কি করে? উত্তরে শুকদেব বলছেন *সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ,* তোমার হৃদয়ে যখন পুরুষোত্তম ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করবে তখনই সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ

নষ্ট হয়ে যাবে। একবার হৃদয়ে ঈশ্বরকে বসিয়ে দিলে তখন তার আর কিসের লোভ আর কিসের মোহ আর কিসের শোক। এই যে আমাদের এত স্ট্রেস, এত টেনশান, কিসের জন্য? ভেতরে লোভ, কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে, সেগুলো পুরণ করতে গিয়েই এইসব হচ্ছে। কিন্তু বলছেন *সর্বান্ হরতি*, ভগবানকে হৃদয়ে বসিয়ে দিলে সব কিছু তিনি হরণ করে নেন, আমাদের যত লোভ, বাসনা, কামনা, পাপ সব তিনি হরণ করে নেন। তাঁকে বাইরে থেকে ধরে নিয়ে চিত্তে বসাতে হবে না, তিনি ভেতরেই অন্তর্যামী রূপে বসে আছেন। প্রথমে অন্তর্যামী, তারপরে অন্তরাত্মা, এই অন্তরাত্মার পরে অন্তর-মন, অন্তর-মনের পরে বহির্মন। এইভাবে এগুলো একটার পর একটা চলতে শুরু হয়। তিনি তো ভেতরেই বসে আছেন, তোমার সব কিছু তিনিই দেখছেন। কিন্তু তবুও তোমাকে ভোগ থেকে আটকানো যাচ্ছে না। দুষ্টু ছেলেকে মা সামলাতে পারছে না, মায়ের কোন কথাতেই সে কর্ণপাত করছে না। মা কি আর করবে! ছেলের বাঁদরামো দেখে যাচ্ছেন। হঠাৎ ছেলেটির চেতনা এলো, আমার মা কতো ভালো, তার কত গুণ, আমাকে কত ভালোবাসে, এই মায়ের সন্তান হয়ে আমি কেন বাঁদরামো করবো! ব্যস্, সব বদমাইশি থেমে গেল। মায়ের বুকটা আনন্দে ভরে উঠল, ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সব দোষ ক্ষমা করে দিল। ভগবান যিনি আমার হৃদয়ে বসে আছেন, তাঁর দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তৎক্ষণাৎ সব পাপ, সব কর্মকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেন। কলিযুগে যত দোষ থাকুক, যত পাপ থাকুক ভগবানের দিকে দৃষ্টি চলে গেলে এগুলো কিছুই থাকবে না।

শুকদেব আবার বলছেন *শ্রুতঃ সঙ্কীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা। নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।।১২/৩/৪৬।* যখন ভগবানকে ভেতরে নিয়ে আসা হয়, আনা হয় এই কারণে বলছেন মানুষ বুঝতে পারে না, মানুষ মনে করে সব কিছু বাইরে থেকে আসছে তাই এইভাবে বলা হচ্ছে। তিনি আমাদের সবার হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান, তিনি না থাকলে তো কোন সত্তাই থাকে না। ভগবান কীভাবে ভেতরে আসেন? *শ্রুতঃ সঙ্কীর্তিতো*, যদি তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা ও লীলাধামের শ্রবণ করা হয়। শাস্ত্র বলছে, তোমার যদি জপ-ধ্যান না করার ক্ষমতা থাকে তাহলে মন দিয়ে ভগবানের কথা শুনে যাও, কান দিয়েই তাঁর কটি কথা ভেতরে যাক। ইন্দ্রিয় দিয়েই তো ঢুকবে, কানটাও তো ইন্দ্রিয়। ধ্যান যখন করছে তখন মন দিয়েই তো ধ্যান করছে, মনও তো ইন্দ্রিয়। মূল কথা ভগবানকে ধারণা করার জন্য তাঁর কিছু কথা ভেতরে গিয়ে একটা সংস্কার তৈরী হোক। ভগবানের কথা ভেতরে যেতে শুরু হলে ভেতরের নোংরামি গুলো থেমে যায়। ঠাকুর বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। আমরা সব সময় সংসারের আবর্জনা আহার করে যাচ্ছি, আহার মানে যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জিনিসকে ভেতরে আহরণ করা, তখন সংসারের ঢেকুরই উঠবে। বিষয় যখন ভেতরে যায় তখন বিষয়ের ঢেকুরই উঠবে, ঈশ্বরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও লীলাধামের কথা যখন ভেতরে যাবে তখন ঈশ্বরের ঢেকুরই উঠবে। যে দিন-রাত কুড়ি দিন পঁচিশ দিন ধরে সৎসঙ্গ করে যাচ্ছে, তারপর তার মুখ দিয়ে যে কথা বেরোবে তার মধ্যে বিষয়ের কথা অনেক কমে যাবে। শ্রবণের যদি সুযোগ সুবিধা না হয় তাহলে সঙ্কীর্তন কর। ঠাকুর বলছেন সন্ধ্যে হলে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে। এটাই সঙ্কীর্তন, নিজেই করা যায়। *ধ্যাতঃ*, ভগবানের বিগ্রহের, তাঁর রূপের বা তাঁর কোন লীলার বা তাঁর যে কোন একটা গুণকে নিয়ে ধ্যান করো। যাদের মন খুব শান্ত স্বভাবের তাদের জন্য ধ্যান। এগুলো হল ঈশ্বরকে ভেতরে আনার প্রক্রিয়া। আমাদের ভালো করে জানা দরকার, আমরা এখানে বেদান্ত অধ্যয়ন করছি, কোন গেঁয়ো ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করছি না, যেখানে বলে ভগবানকে বাইরে থেকে আনা হয়। আমার অন্তঃকরণকে আমার ইন্দ্রিয়গুলো তার বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। থামিয়ে কোথায় দৃষ্টি নিয়ে যাচ্ছে? যিনি রাজা ভেতরে বসে আছেন, তাঁর দিকে দৃষ্টি নিয়ে যাচ্ছে।

আর কি করবে? *পূজিতঃ*, ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা আর লীলাধামের পূজা করবে। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর সব আচরণ মানুষের মতই হয়। অবতারের এই আচরণকেই আমরা লীলা বলছি। শাস্ত্রে ভগবানের লীলা অনুধ্যানের খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন। রাত্রিবেলা মা রুটি বেলছেন পাশে মায়ের সেবক রামময় মহারাজও (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী মহারাজ) রুটি বেলছেন। নলিনীদিদি রুটি শেঁকছেন। নলিনীদিদি বলছেন 'মা! তোমার বেলা রুটিগুলো ভালো ফুলছে না, রামময়ের

রুটিগুলো ভালো ফুলছে’। শুনে মার খুব অভিমান হয়েছে ‘রামময় সেদিনকার ছেলে, নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোবে, ওর বেলা রুটি আমার থেকে ভালো হবে! আর আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলাম’! বলেই বেলনা-চাকি ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ভাবটা এই, আমার বেলা রুটি যদি খারাপই হয় রামময়ই তাহলে বেলুক। তখন রামময় মহারাজ খুব মিষ্টি করে বলছেন। রামময় মহারাজ মায়েরই দীক্ষিত সন্তান। ‘মা! সব বেলা রুটি তো এক সঙ্গেই যাচ্ছে, নলিনীদিদি কি করে বুঝছে যে কোনটা আমার বেলা আর কোনটা তোমার বেলা’। এই বলে মাকে আবার শান্ত করান হল। চুপচাপ বসে যদি এগুলো চিন্তন করা হয় মনটা যে কোন জগতে চলে যাবে টেরই পাওয়া যাবে না। এটাই লীলা চিন্তন। এইসব কাহিনী থেকে যদি কোন অর্থ বার করার চেষ্টা হয় বা মা কেন অভিমান করলেন এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যদি কেউ খোঁজার চেষ্টা করে, সব বেকার, কোন অর্থই পাওয়া যাবে না। অবতার মানুষ হয়ে এসেছেন, তাঁকে মানুষের মতই আচরণ করতে হবে। যিনি বুদ্ধিমান তিনি এটাকেই লীলা চিন্তন করে করে একটা দিব্য অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছে যাবেন, তাঁর ভারি বয়ে গেছে এগুলোর অর্থ আর তাৎপর্য খুঁজতে। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ সবাই মানুষের মতই ব্যবহার করে গেছেন। অবতারকে এভাবেই আসতে হবে আর এভাবেই তাঁকে আচরণ করতে হবে, তা নাহল কেউ তাঁর কথা শুনবে না। গীতাতে ভগবান বলছেন *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানং কর্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্ত সমাচারন্।।* বিদ্বান যিনি, তিনি কখনই কারুর ভাব নষ্ট করে দেন না। তিনি আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের মতই কাজকর্ম করবেন।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – একজন ভক্ত একটা বাবলা গাছ দেখেছে, বাবলা গাছ দেখতেই তার ভাব হয়ে গেছে। এই বাবলা গাছের ডাল দিয়ে কোদালের বাঁট তৈয়ার হবে, সেই কোদাল দিয়ে মহাপ্রভুর বাগানে চাষ হবে, চাষ করে আনাজ তৈরী হবে, সেই আনাজ রান্না করে ভগবানের ভোগ হবে, ভাবতে ভাবতে মন ভগবানে হারিয়ে গেল। এ হল খুব উচ্চ অবস্থা, একটু সামান্য উদ্দীপক কিছু দেখলে মনটা ঝট্ করে ভগবানে ডুবে যাবে। ঠিক তেমনি ভগবানের লীলা চিন্তনের সাহায্যে মনটাকে সহজে ভগবানের মধ্যে বেঁধে ফেলা যায়। এই কথায় শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন, মানুষ যখন ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও ধাম এই চারটেকে সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে শ্রবণ, কীর্তন, পূজন আর ধ্যান করে তখন তিনি হৃদয়ে বিরাজমান হন। তিনি হৃদয়ে সব সময়ই বিরাজ করে আছেন, কিন্তু একটা আবরণ পড়ে গেছে, এগুলো করলে সেই আবরণটা সরে যায়। বেদান্তে বার বার একটা কথা বলা হয় আবরণ বিক্ষেপ, সচ্চিদানন্দের মায়া দুটো জিনিস করে, একটা আবরণ মানে ঢেকে দিচ্ছে, দ্বিতীয় বিক্ষেপ করে, মানে যেটা যেমন সেটাকে তেমন না দেখিয়ে অন্য রকম দেখিয়ে দেয়। অন্তর্যামী ভেতরে তিনি নিজেকে মায়া দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন। সংসারের সব কিছু সেই সচ্চিদানন্দই, ভগবানেরই সব সৃষ্টি। কিন্তু কিছু জিনিসকে দেখাচ্ছে ভোগ্য, আবার কিছু জিনিসকে দেখাচ্ছে ত্যাজ্য। এটাই আবরণ বিক্ষেপ। এই আবরণ বিক্ষেপের খেলা, ভোগ্য ত্যাজ্যের খেলাটা বন্ধ করাই সাধনা। সাধনা করে এই খেলা বন্ধ হয়ে গেলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়ে গেল, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে তাঁকেই বিরাজমান দেখবে। এই একটি ভাবের উপর আমাদের সমস্ত শাস্ত্র জোর দিচ্ছে। গীতায় বলছেন *যথৈধাংসি সমিদ্ধোর্হগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন*, স্তুপিকৃত কাঠের বিরাট ঢিপি, একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেলে দিলে নিমেষে সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এখানেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে। এগুলো কোন কথার কথা বা তাত্ত্বিক কিছু নয়, আক্ষরিক ভাবে এটাই হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেলে, অন্তঃকরণে তাঁকে বিরাজমান দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাপবোধ পূণ্যবোধ দুটোই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। মানুষ যখন আত্মার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নেয়, আত্মার কথা ছেড়ে দিন, আত্মা অনেক বড় কথা, ঈশ্বরের সঙ্গে যখন জুড়ে দেয় তখন তার দ্বারা কোন অশুভ কাজ হবেই না। তার কোন কাছের লোক যদি তাকে কোন অশুভ কাজ করতে বলে তখন তার এই বোধটাই আসবে না যে আমি কোন অশুভ কাজ করছি। নিজের স্বার্থ বলে কিছু থাকে না। আমার নিজের জন্য এই কাজটা করলে ভালো হয়, কখনই এই ভাব তার মনে আসবে না।

শেষে বলছেন *বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ। নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেহন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে।।১২/৩/৪৯।* হে পরীক্ষিৎ! যত রকমের বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়াম বা সর্বভূতে মিত্রভাব, তীর্থস্নান, ব্রত, দান আছে সবই শুদ্ধি করে ঠিকই এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু পরমাত্মাকে যে

হৃদয়ে বসিয়ে নিয়েছে তার মত শুদ্ধি অন্য আর কিছুতে হয় না। বলছেন এই জন্মের পাপের কথা বাদ দাও, জন্মজন্মান্তরের যত পাপ সব ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। নলিনীদিদি পায়ে কিছু মাড়িয়ে এসেছেন, গ্রামদেশ কোথায় কি নোংরা পড়ে আছে। তিনি এখন ঠাণ্ডার সময় স্নান করবেন। শরীরটাও ভালো নেই। শ্রীমা স্নান করতে নিষেধ করছেন। নলিনীদিদির মন খুঁতখুঁত করছে। শ্রীমা বললেন ঠিক আছে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নে। নলিনীদিদি মানবেন না। তখন শ্রীমা বলছেন 'আমাকে ছুঁয়ে দে'। এখন মাকে ছুঁলে কি নলিনীদিদি শুদ্ধ হবেন? কখনই হবেন না। এগুলো বুঝতে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। নলিনীদিদি পরে মাকে ছুঁয়েছিলেন কিনা কোথাও কোন উল্লেখ নেই। তুমি যদি তাঁকে দেবী রূপে দেখ তবেই তোমার শুদ্ধি হবে। তুমি যদি শ্রীমাকে জ্যেঠিমা, খুড়িমা, পিসিমা বলে দেখ তোমার কোন দিন শুদ্ধি হবে না।

পরীক্ষিৎকে শুকদেবের শেষ উপদেশ

এরপর আসছে শুকদেবের শেষ উপদেশ। এইখানে শুকদেবকে আমরা একজন সত্যিকারের আচার্য রূপে পাই। সাত দিন যাবৎ পরীক্ষিৎকে তিনি ভাগবত কথা শুনিয়ে যাচ্ছেন। সপ্তম দিন এগিয়ে এসেছে, পরীক্ষিৎএর মৃত্যুও ঘনিয়ে আসছে। ঋষির অভিশাপে আর কিছুক্ষণ পরেই তক্ষক নাগের দংশনে পরীক্ষিৎএর জীবনদীপ নির্বাপিত হতে যাচ্ছে। এত কিছু বলার পর শুকদেব তাঁকে শেষ উপদেশ দিচ্ছেন, এটাই ভাগবতের মূল বক্তব্য – হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! পুরো ভাগবতে ভগবান শ্রীহরির কথাই সংকীর্তন করা হয়েছে। আরও যে দুজন ভগবান ব্রহ্মা আর রুদ্র এনারও শ্রীহরিরই রূপ। ভগবান বিষ্ণু তাঁর ক্রোধ রূপকে রুদ্র রূপে ব্যক্ত করেছেন। ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদ রূপ নিয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। তাই তুমি জেনে নাও নারায়ণ ছাড়া কিছু নেই।

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি। ন জাতঃ প্রাগভূতোহদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি।। ১২/৫/২।। হে রাজন্! এবার তুমি পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর। পশুবুদ্ধি কি? অবিদ্যাজনিত যে অবিবেকমূলক ধারণা, যেমন আমি মারা যাব। আমি মারা যাব এই ভাবটা তুমি ত্যাগ কর। তোমার এই শরীরটা আগে কখন ছিল না, কিন্তু বাবা-মার জন্য এই শরীরটার জন্ম হয়েছে। কিছু দিন এই শরীর থাকবে তারপর নাশ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার নাশ কখন হবে না, দেহটাই পাল্টাবে তুমি পাল্টাবে না। তুমি পূর্বে ছিলে না, তোমার জন্ম হল, তুমি মরে যাবে – এটাই অবিবেকমূলক ধারণা, এই ধারণা তুমি ত্যাগ কর। তোমার যে প্রকৃত স্বরূপ, এটা শুধু তার দেহ। শুকদেব এখন পরীক্ষিৎকে বোঝাচ্ছেন। একটু চিন্তা করলেই এগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। বায়োলজিতেও এখন বলছে আমাদের শরীরের কোষীকা গুলো ক্রমাগত মরছে, আবার খাওয়া-দাওয়া করছি বলে নতুন নতুন কোষ জন্ম নিচ্ছে। যার ফলে আমাদের এই ভৌতিক শরীরটা প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে। বাতাসে যখন ঘূর্ণি তৈরী হয় তখন সেই ঘূর্ণি প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে দ্রুত এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যায়। তখন এই ঘূর্ণি কোন জিনিসকে ছাড়ছে আবার নতুন অনেক কিছুকে ঘূর্ণির মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। দেহটাও একটা ঘূর্ণির মত, অনবরত কিছু জিনিস ফেলতে ফেলতে আবার নতুন কিছু গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। কিছুটা গিয়ে এই ঘূর্ণিটা থেমে যাবে। এই শক্তিটা কিছুক্ষণ থেকে থাকবে আবার ওই ঘূর্ণিটা নতুন করে তৈরী হবে। দেহের মৃত্যুটা এই রকম। আমাদের সমস্যা হল দেহের সঙ্গে আমরা নিজেদের জুড়ে রেখেছি। আর এত শক্ত পোক্ত ভাবে জোড়া যে দেহটা ছাড়তে আমাদের এত কষ্ট হয়।

শুকদেব বলছেন, যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, সেই অঙ্কুর থেকে আবার গাছ হয় আবার সেই গাছ থেকে বীজ হয়, সেই বীজ থেকে অঙ্কুর হয়ে গাছ হয়। ঠিক সেই ভাবে তুমি এক দেহ থেকে আরেক দেহে, আরেক দেহ থেকে অন্য দেহে পুত্রপৌত্রাদি রূপে জন্ম নিতে থাকবে। *পুত্রৈব আত্মা*, পুত্রই আত্মা। গাছ আছে, গাছ থেকে বীজ হয়, সেই গাছ মরে যায় কিন্তু তার বীজ থেকে আবার গাছ হয়। এই চক্র চলছে তো চলছেই। আগেকার দিনে জেনেটিক বিজ্ঞানের এত কিছু ধারণা ছিল না, কিন্তু এখন তো বোঝাই যাচ্ছে, একজন বাবা তার জেনেটিক বস্তুগুলো নিজের সন্তানকে দিয়ে দিচ্ছেন। বাবাই তো সন্তান রূপে চলছে। শুকদেব এই কথাই বলছেন, তুমি দেহের দিক থেকে যদি দেখ, তাতেও তো তুমি মারা যাচ্ছ না, তোমার শরীর তো চলতেই থাকবে। যদি দেখ আমার সন্তান আমার শরীরেরই প্রসারিত সংযোজন, কিছু দিন পর শরীরের প্রতি আসক্তিটা

কমে যাবে। যখন কাঠে আগুন জ্বলে তখন কাঠ আর আগুন আলাদা। আগুন কাঠকে আশ্রয় করে আছে। ঠিক তেমনি তুমি এই দেহ থেকে আলাদা। তুমি আগুন, এই দেহটা কাঠ, এই দেহকে তুমি আশ্রয় করে আছ। তোমার যত ক্রিয়া দেখছ, সেই ক্রিয়া তোমার দেহকে আশ্রয় করে হচ্ছে। কিন্তু তবুও মানুষের দেহের প্রতি কি আসক্তি! যাদের বয়স হয়ে গেছে তারা মৃত্যুর কথা শুনলেই আতঙ্কে কুঁকড়ে যান। এই মনোভাবকেই শুকদেব বলছেন পশুবুদ্ধি, পশুরা মরতে চায় না। এই কথাই পরীক্ষিৎকে বলছেন যাদের পশুবুদ্ধি আছে তারাই এই রকম করবে। তুমি এই পশুবুদ্ধিকে ছাড়। যে সৈন্যরা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে তারা তো মৃত্যুকে ভয় পায় না। *সুখিনঃ ক্ষত্রিয়ঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমিদৃশম্*, অর্জুনকেও শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলছেন, এই ধরণের যুদ্ধ খুব সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই পায়। হে রাজন্! তুমি জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষ, তাই এই পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর।

স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্। যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ।। ১২/৫/৪। স্বপ্নাবস্থায় যদি দেখ কেউ তোমার গলা কেটে দিচ্ছে, তারপর তোমার আত্মীয়-স্বজনরা তোমাকে শ্মশানে নিয়ে দাহ করিয়ে দিল। তাতে তোমার কি হল! তুমি তো তোমার দেহকেই দাহ করতে দেখছ। শুকদেব বলছেন, যেমন যিনি স্বপ্নে যা কিছু দেখছেন তিনি নিজেকে স্বপ্নের সব কিছুর অবস্থা থেকে বাইরে থেকেই দেখছেন। ঠাকুর বলছেন – স্বপ্নে বাঘ দেখেছে, ঘুম ভাঙার পরেও তার বুক ধুকধুক করছে। সে জানছে যে স্বপ্ন আলাদা সে আলাদা। ঠিক তেমনি মানুষ যখন পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন দেখে, আমি তো এই দেহ থেকে চিরদিনই আলাদা। স্বপ্নাবস্থায় মানুষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ স্বপ্নের সব কিছু সত্য বলেই মনে হয়, ঘুম ভাঙলে স্বপ্ন চলে যাওয়ার পর মনে হয় এগুলো সব মিথ্যা। সেই রকম সমাধিতে জাগ্রত অবস্থাকে স্বপ্নের মত মনে হয়। তবে জাগ্রত অবস্থার তুলনায় স্বপ্ন কম সত্য, ঠিক তেমনি জ্ঞানের অবস্থায় দেহের অবস্থাটা কম সত্য। শুকদেবাদি ঋষিরা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই এই কথা বলছেন, জাগ্রত অবস্থায় এগুলো সবই আছে কিন্তু জ্ঞানের অবস্থায় বোঝা যায় আসল সত্যটা আরও ওপরে। রাতের অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলা হয়েছে। টর্চের আলো যেখানে পড়ছে সেই জায়গাটা স্পষ্ট ঝকঝকে দেখাবে, তার পাশে একটু আবছা আবছা দেখাবে, আর বাকি জায়গাটা অন্ধকারই থাকবে। আত্মজ্ঞানের আলো যেখানে পড়বে ওই জায়গাটা ঝকঝকে স্পষ্ট দেখায় কিন্তু বাকি সব কিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। ঠাকুরের কাছে থিয়েটারওয়ালারা এসে ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক জিজ্ঞেস করছে ঈশ্বর দর্শন কিরূপ। ঠাকুর ছিলেন সর্বদা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর সবাইকে সবার মত করে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ঈশ্বর দর্শনে কিরূপ হয় বোঝাতে গিয়ে ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন – থিয়েটার শুরু হওয়ার আগে দর্শকরা নিজেদের মধ্যে নানা রকম গল্প করতে থাকে, যেই থিয়েটারের পর্দা উঠে গেল সব কথা বন্ধ হয়ে সবার দৃষ্টি থিয়েটারে চলে গেল। ঠাকুর একটা উপমা দিয়ে বোঝালেন। আসলে তাই হয়, ঈশ্বর দর্শনে পুরো মন ওইদিকে চলে যায়। তাই বলে কি আশেপাশের সব কিছু চলে গেল? কিছুই যায়নি, সবই আছে, কিন্তু মন, ইন্দ্রিয় সব ঈশ্বরের দিকে চলে যায়। তখন এই জগৎটা কম সত্য মনে হয়।

স্বপ্নে কিছু জিনিস বাস্তবে মিলে যায়, আবার কিছু জিনিস মেলে না। স্বপ্ন নিয়ে নানা রকমের বিচার আছে। কিন্তু সবই মনের খেলা। জ্ঞানের অবস্থায় গিয়ে তাই দেখে এগুলো সব আংশিক সত্য। জগতের কিছু মেলে আবার কিছু মেলে না। ঠাকুরও বলছেন মায়ার জগতে কিছু মেলে কিছু মেলে না। বিজ্ঞানেও বিজ্ঞানীদের কথা এক সময় মিলে যাচ্ছে অন্য সময় সেই কথাই আরেকজন বিজ্ঞানী মিথ্যা প্রমাণ করে দিচ্ছেন। কিন্তু জ্ঞানের অবস্থায় সবার কথা মিলে যায়। সেইজন্য যত অমিল স্বপ্নাবস্থায়, যত বেমিল জাগ্রত অবস্থায় কিন্তু জ্ঞান লাভের পর অমিল বেমিল বলে কিছু থাকবে না, সব কিছু মিলে যাবে। তাই হে পরীক্ষিৎ! তোমার বিশুদ্ধ বিবেকবান প্রজ্ঞা দিয়ে তুমি পরমাত্মার সাক্ষাৎ কর। তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু, কারণ পরমাত্মার সাক্ষাৎ হওয়া মানেই তুমি সেই পূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যে পরমাত্মার ভয়ে মৃত্যুও মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে, সেই পরমাত্মাতেই তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সেই শুদ্ধ আত্মা হয়ে মৃত্যুকে জয় করে নাও। মৃত্যু পরমাত্মার অধীনে, কিন্তু এখন তুমি মৃত্যুর অধীনে। মহানির্বাণ তন্ত্রে বলছে *কালসংগ্রসনাদ্*, তুমি কালকেও গ্রাস করে নাও, সেইজন্য তোমার নাম কালী। যে যার অধীনে থাকে সে তাকে ভয় পায়। এখানে শুকদেব বলছেন, তুমি তো সেই পরমাত্মা, তোমার প্রকৃত স্বরূপ হল তুমি শুদ্ধ আত্মা, মৃত্যু তোমার অধীনে। কিন্তু তুমি মনে করছ

তুমি মৃত্যুর অধীনে। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, তুমি মৃত্যুরও মালিক, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যু। সেইজন্য ব্রাহ্মণের অভিশাপে তক্ষক নাগ তোমাকে দংশন করবে আর তুমি মারা যাবে বলছ, তুমি বিচার কর, তোমাকে কি করে মারবে, তুমিই তো মৃত্যুর মালিক। তুমি এই দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে, কিন্তু তুমি কি করে মারা যাবে!

হে পরীক্ষিৎ! তুমি এখন চিন্তা কর *অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্। এবং সমীক্ষন্নাত্মানমাত্মন্যাধ্যা নিষ্কলে।।১২/৫/১১।।* গীতার দশম অধ্যায়ে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বলছেন *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*, আপনি সেই পরমব্রহ্ম, আপনিই পরমধাম, আপনি পরম পবিত্র, আপনাকে স্পর্শ করলেই সব কিছু পবিত্র হয়ে যায়। এত হরিকথা আলোচনা করার পর ভাগবত বলছে, আমি সেই পরমব্রহ্ম, আমি পরমধাম মানে সবারই শেষ গতি, আমি সব কিছুর শেষ অধিষ্ঠান। শুকদেব পরীক্ষিৎকে এই চিন্তনে মগ্ন হতে উপদেশ দিচ্ছেন। এইভাবে চিন্তা করতে করতে তুমি তোমার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। *দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ। ন দ্রক্ষ্যসি শরীরং চ বিশ্বং চ পৃথগাত্মনঃ।।১২/৫/১২।।* তারপর যখন তক্ষক নিজের বিষাক্ত লকলকে জিহ্বা নির্গত করে ওষ্ঠদ্বয় লেহন করতে করতে তোমার পদে দংশন করবে, তখন তুমি একটুও আর বিচলিত হবে না। তখন তুমি তোমার আত্মস্বরূপে স্থিত থেকে দেখবে তুমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তুমি আর এই দেহ শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বকেই নিজের থেকে অভিন্ন রূপে দেখবে।

বাদশা আকবর একদিন সকালে রাজদরবারে এসে সবাইকে বলছেন 'আজ একজন আমার গোঁফ ধরে টেনেছে, আপনারা বিচার করে রায় দিন একে কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে'। বাদশার গোঁফ ধরে টানা! এত বড় আস্পর্দা কোন আহাম্মকের হতে পারে! একে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হোক। কেউ বলছে এর গর্দান হওয়া উচিৎ। রাজদরবারে খুব সোরগোল। সেই সময় বীরবল এসেছে। বীরবলকে সব বলার পর তাকেও জিজ্ঞেস করা হয় এর কি দণ্ড প্রাপ্য। বীরবল শুনে বলছে, বাদশার উচিৎ ওকে কোলে নিয়ে একটা চুমু দেওয়া। রাজদরবারের সব আমীর ওমরাওরা চমকে উঠেছে, বীরবল এ কি বলছে! তখন আকবর বাদশা বলছেন বীরবল ঠিকই বলেছে। আসল ঘটনা হল, আকবর তার দুই বছরের শিশু সন্তানকে আদর করতে কোলে নিয়েছিলেন, বাচ্চা ছেলে আকবরের গোঁফটা টেনে দিয়েছে। শিশু ছাড়া কার হিম্মৎ আছে আকবরের গোঁফ টেনে দেবে। রাজদরবারে কারুরই বুদ্ধি খেলছে না। দুষমন যদি গোঁফ টেনে দেয় তাহলে তার গলা কেটে দেওয়া হবে, আর তার নাতি যদি গোঁফ টেনে দেয় তাহলে কি হবে? আদর করে তাকে কোলে টেনে নেওয়া হবে। সাপ যখন দংশন করতে আসছে তখন আমি ভয় পাবো, লাঠি নিয়ে সাপকে মারতে যাবো, তা নাহলে দৌড়ে পালাব। কিন্তু যখন দেখবো যে সাপ আমাকে দংশন করতে আসছে সে আমারই স্বরূপ, তখন তো তাকে আদর করে আলিঙ্গন করতে যাবো। শুকদেব এই শ্লোকে ঠিক এই কথাই বলছেন – তুমি যাকে ভয় পাচ্ছো, তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ সে তোমারই স্বরূপ।

শুকদেবের উপদেশ শোনার পর পরীক্ষিৎ বলছেন হে ভগবন্! আপনি আমাকে পরমতত্ত্ব, ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতার সম্যক্ দর্শন দান করেছেন। তাই আমি এখন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরম শান্তি লাভ করেছি। তক্ষক দংশনের মৃত্যুভয় আমার আর নেই। এই সব কথা বলে পরীক্ষিৎ মৌন অবলম্বন করে সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানে বসে গেলেন। এরপর তক্ষকের দংশনের কাহিনী ভাগবতে যেভাবে বলা হয়েছে তার তুলনায় মহাভারতে অনেক নাটকীয়তা নিয়ে আসা হয়েছে। ভাগবতে দেখাচ্ছে তক্ষক একজন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে পরীক্ষিৎকে দংশন করছে। মহাভারতে তক্ষক একটা ফলের মধ্যে ছোট্ট পোকা হয়ে বসেছিল। সাত দিন অতিক্রান্ত হতে চলেছে, সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। পরীক্ষিৎ দেখছেন এখনও তক্ষকের আসার লক্ষণই নেই, অন্য দিকে তিনি ওই ফলটা খেতে গিয়ে দেখেন ফলের মধ্যে একটা পোকা। তখন তিনি বলছেন 'যাক্! সাত দিনের মধ্যে তক্ষক তো দংশন করলো না, কিন্তু ঋষিবাক্য সত্য হোক, ফলের এই ছোট্ট কীট আমাকে একটু দংশন করে দিক তাহলেই ঋষিবাক্য সত্য হয়ে যাবে। যেমনি বলছেন সঙ্গে সঙ্গে তক্ষক নিজের আসল রূপ ধারণ করে পরীক্ষিৎকে দংশন

করে বিষ ঢেলে পালিয়ে গেল। ওই একবার দংশনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎএর শরীর স্পন্দহীন হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আর চারিদিকে হাহাকার শুরু হয়ে গেল।

উপসংহার

আমাদের মনে থাকার কথা ভাগবত শুরু হয়েছিল নৈমিষারণ্যে। সেখানে ঋষিদের একটা বড় যজ্ঞ চলছিল। সেই যজ্ঞে সূত এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখন সব ঋষিরা শুকদেব পরীক্ষিৎকে যে ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন সেই কাহিনীটা বলার জন্য সূতকে অনুরোধ করলেন। সূত বলতে শুরু করেছেন, তারপর শুকদেবও কাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এইভাবে এক এক স্কন্ধ ও অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ভগবানের নানা রকম লীলা কাহিনী, সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশানুক্রমিক বর্ণনা করে উপসংহারে এসে সূত ঋষিদের বলছেন *সৈষা বিষ্ণোর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া। মুহ্যন্ত্যস্যৈবাত্মভূতা ভূতেষু গুণবৃত্তিভিঃ।।১২/৬/২৯।।* হে ঋষিগণ! বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের ক্রোধ হওয়া, ক্রোধে রাজাকে অভিশাপ দেওয়, রাজার মৃত্যু হওয়া, তারপর জনমেজয়ের ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া, সর্পযজ্ঞে বহু সর্পের দগ্ধ হওয়া, এ সবই সেই ভগবান বিষ্ণুর মহামায়া। সবটাই মায়া, এখানে সত্য বলে কিছু নেই। ভগবানের এই মায়া অনির্বচনীয় তত্ত্ব, মায়াকে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। মায়া কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে এসেছে, কেন এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ খুঁজে চেষ্টা করে কোন দিন সে এর উত্তর পাবে না। সেইজন্য বেদান্ত বলে দিচ্ছে মায়াকে খুঁজতে না গিয়ে আগে বিচার কর তুমি আছ আর এই জগৎ আছে, তুমি আছ এটা তো অস্বীকার করতে পারবে না, আর জগৎ তো তোমার সামনেই রয়েছে। তুমি আলাদা ও এই জগৎ আলাদা, এইখান থেকেই প্রথমে শুরু কর। এটাই বেদান্তের প্রথম কথা। মানুষ যতই চেষ্টা করুক মায়ার স্বরূপকে সে কোন দিন জানতে পারবে না, কিন্তু মায়ার স্বরূপ থেকে সে নিবৃত্তি পেতে পারে। কি ভাবে সে মায়া থেকে নিবৃত্তি পাবে? এর আগে ভাগবত ধর্মের আলোচনা করার সময় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে খুব দামী একটা কথা বলেছিলেন, কোন মানুষের স্বভাব ও কর্ম নিয়ে কখন আলোচনা করতে নেই। ইনি ভালো লোক, ইনি খারাপ লোক, এ অহঙ্কারী, এ কপটী, ইনি বিদ্বান, উনি মুর্খ এইভাবে যখন সব কিছু দেখছো তখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তুমি মায়ার জগতেই পড়ে আছ, কারণ ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। ঈশ্বর ছাড়া আরও অনেক কিছু যখন দেখছে তখন সে মায়াতে আবদ্ধ বলেই সব ভিন্ন ভিন্ন দেখছে। এই মায়া থেকে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় হল, পরচর্চার বন্ধ করে আত্মচর্চাতে জোর দেওয়া। তার সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সব সময় ধরে রাখা – ভগবান নারায়ণই শিষ্ট রূপে খেলা করছেন, তিনিই আবার দুষ্ট রূপে খেলা করছেন, নারায়ণই পণ্ডিত রূপে খেলা করছেন, তিনিই আবার মুর্খ রূপে খেলা করছেন। তখন মায়া তাকে আর বাঁধতে পারে না। খুব সহজ যুক্তি, যখন দেখছি দুষ্ট লোক রূপে নারায়ণই খেলা করছেন তখন আমি দুষ্ট লোক থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো না, যখন নারায়ণই শিষ্ট লোক রূপে খেলা করছেন তখন শিষ্ট লোকের প্রতিও আমার আর কোন আকর্ষণ থাকবে না, সবই তো তিনিই হয়েছেন। মায়া তখন ভয় পেয়ে যায়, আর যে শক্তি দিয়ে মায়া সবাইকে বাঁধে, বাঁধার সেই শক্তিটাই তার চলে যায়।

মানুষ যখনই মায়ার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখনই নানা রকমের বিবাদ, অপবাদ, মতবাদের শুরু হয়ে যায় আর এগুলোর মধ্যেই ডুবে থাকে, যার ফলে সে পরমাত্মার স্বরূপ জানতে পারে না। ঠাকুরের ভাষায় এটাই কাঁচা আমির অবস্থা। ঠাকুর বলছেন কাঁচা আমি যাবার নয়, তাই থাক শালা ঈশ্বরের দাস হয়ে। কাঁচা আমিটাই অহঙ্কারের ঢিপি। এই অহঙ্কারকে পাল্টানো যাবে একমাত্র অপরের স্বভাব আর অপরের কর্মের আলোচনা বন্ধ করে। ভালো-মন্দের পারে যাওয়ার আগে ভালোতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যদি কারুর ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে হয় তাহলে তার ভালোটাই আলোচনা করতে হয়। প্রথমে ভালো দিয়ে মন্দটাকে ফেলতে হয়। মন্দ সব ফেলার পর ভালোটাকেও ছাড়তে হয়। ভালো-মন্দের পারে চলে গেলে নিজের স্বরূপে অবস্থান করবে। যখন দেখছেন নারায়ণই সব কিছু হয়েছেন, তখন কাকে ভালো আর কাকেই বা মন্দ বলবেন! স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে তাঁর শিষ্য বলছেন – মহারাজ! আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেন না। রাজা মহারাজ বলছেন – আমি তো দেখছি তোমরা সেই নারায়ণই হয়েছ, আমি কি করে তোমাদের উপদেশ দেব। ভগবানকে উপদেশ কি করে দেব!

ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তার আগে তিনি মনকে পুরো একাগ্র করে নিলেন। মনকে একাগ্র করার পর ব্রহ্মার ভেতর থেকে নাদ ধ্বণি জন্ম নিল। এই নাদ ধ্বণি ব্রহ্মার জিহ্বা বা কণ্ঠ থেকে জন্ম নেয়নি। এর আগে আমরা শব্দের তিন রকমের উৎপত্তির স্থান বৈখরী, মধ্যমা ও পরা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সূত ঋষিদের বলছেন জিহ্বা, কণ্ঠ ও তালুর সংঘর্ষ ছাড়াই এই আশ্চর্যজনক নাদ সৃষ্ট হয়। তাই এই নাদকে বলা হয় অনাহত ধ্বণি। অনাহত মানে কোন কিছু সংঘর্ষ ছাড়াই যে ধ্বণি সৃষ্ট হচ্ছে, অনাহত ধ্বণিই একমাত্র শুদ্ধ ধ্বণি। মহান যোগীরা যখন ধ্যানের গভীরে গিয়ে মনোবৃত্তিকে রোধ করে দেন তখন তাঁরা এই অনাহত ধ্বণি শ্রবণ করেন। সুফিদের পরম্পরাতেও ধ্যানের গভীরে অনাহত ধ্বণির অভিজ্ঞতার খুব সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই অনাহত ধ্বণি থেকেই ‘অ’কার, ‘উ’কার ও ‘ম’কার রূপ ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁ-কার উৎপন্ন হয় এই ওঁ-কার থেকেই প্রকৃতি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়। ওঁ-কার স্বয়ং অব্যক্ত ও ব্যক্ত এবং পরমাত্মস্বরূপ হওয়ার জন ওঁ-কার স্বয়ং প্রকাশিত। সূত পর পর বলে যাচ্ছেন ওঁ-কার থেকেই কীভাবে পর্যায়ক্রমে বেদের উৎপন্ন হচ্ছে। সেখান থেকে বেদের কীভাবে বিভাজন হল তার পূর্ণ বিবরণ আমরা ভাগবতেই পেয়ে যাই।

ভাগবতে ঈশ্বরের সগুণ সাকার রূপের বর্ণনাতে আমরা পাই তিনি শঙ্খ, চক্র, গদ পদ্মধারী, তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলেন বা তিনি যখন পদ্মের উপর যোগনিদ্রায় শুয়ে থাকেন, বলছেন ঈশ্বরের ষট্ ঐশ্বর্যই হল এই পদ্ম। তিনি যে পদ্মের উপর দণ্ডয়মান বা যে পদ্মের উপর বসে থাকেন এটাই ভগবানের ঐশ্বর্য, এই ঐশ্বর্য তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকে বলে এইভাবে দেখান হয়েছে। ভগবান নিজে চামর ও ব্যজনরূপে ধর্ম ও যশকে ধারণ করেন। তিনটে বেদই হল গরুড়। ভগবান যে গরুড় পাখিকে বাহন করে চলেন তার মানে বেদ ভগবানের কথাকে বহন করছে। বেদ না থাকলে ভগবানের কথাও থাকবে না। সাধারণ মানুষ এত কথা বুঝবে না বলে বেদকে ভগবানের বাহন গরুড় পাখি করে দেওয়া হয়েছে। ভগবানের নির্গুণ-নিরাকার বা সগুণ-সাকারের তত্ত্ব কথা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না বলে তত্ত্ব কথাগুলোকে একটা মূর্ত রূপ দিয়ে কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনা করছেন।

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ। বিষ্বক্‌সেনস্তন্ত্রমূর্তিবিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ। নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাঃস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যা হরের্গুণাঃ।।১২/১১/২০।। ভগবান হলেন আত্মস্বরূপ, তিনি আত্মার শক্তি, আমাদের সবার ভেতরে যিনি আছেন তিনি আত্মশক্তি রূপে বিরাজ করছেন। ভগবানের আত্মশক্তি ভগবানের সাথে অভিন্ন, কখন তাঁর আত্মশক্তি তাঁর থেকে আলাদা হয় না। ভাগবত তাই এখানে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মী রূপে বলছেন, লক্ষ্মী যেমন ভগবান থেকে কখন আলাদা হন না, আত্মশক্তিও ভগবান থেকে আলাদা নন। গীতার ভাষ্যেও আচার্য শঙ্কর বলছেন শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। ভগবান আর তাঁর শক্তি অভিন্ন। মানুষ এটা বুঝবে না, তাই বলছেন ভগবান বিষ্ণু আর লক্ষ্মী কখন আলাদা নন, ঠাকুর আর শ্রীমা কখনই আলাদা নন। মানুষ সাধনা করে বুঝতে পারে গরুড়ের পিঠে চড়ে ভগবান ঘুরে বেড়ান এটা কিছুই নয়, কারণ ভগবান তো সর্বব্যাপী, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তাঁকে আবার গরুড়ের পিঠে করে যেতে হবে কেন! ভগবানের কথাকে বহন করে বেদ, তাই বেদকেই গরুড় বলা হয়েছে। ঠিক সেই রকম ভাবে বলছেন, ভগবানের বৈকুণ্ঠধামের আটটি দ্বারে আটজন দ্বারপাল আছে, আসলে এই আটজন দ্বারপাল হল ভগবানের অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি। এইভাবে সগুণ-সাকার ভগবানের এক একটি জিনিসকে এক একটি মূর্ত রূপ দিয়ে বর্ণনা করছেন। সাধারণ মানুষের জন্য পৌরানিক ঋষিরা একটা কাহিনীর মাধ্যমে ভগবানের বিভিন্ন তত্ত্বকে সহজ করে তুলে ধরছেন। এইভাবে নানা রকম ঈশ্বরীয় বর্ণনা করে যাচ্ছেন।

সব শেষে এসে বলছেন *সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।।১২/১৩/১৫।।* ভাগবত হল সমস্ত উপনিষদের সার। সত্যিই তাই, কারণ এই ভাগবতকে যিনি শ্রদ্ধা সহকারে, অর্থ অনুধাবন করে অধ্যয়ন করবেন তাঁর কাছে অন্য পুরাণ আর ভালো লাগবে না। যেমন সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা, দেবতাদের মধ্যে যেমন বিষ্ণু আর বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীশংকর সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনি সব পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ পুরাণ।

সর্বশেষে সূত প্রার্থনা করছেন, সর্বপ্রথম স্বয়ং ভগবান নারায়ণ ব্রহ্মার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবান নারায়ণই ব্রহ্মা রূপে দেবর্ষি নারদকে এই ভাগবত কথা উপদেশ করেন এবং নারদরূপে ভগবানই বেদব্যাসকে ভাগবতের কথা বলেছিলেন। ভগবানই ব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবকে এবং শ্রীশুকদেবরূপে পরমকরুণা সহকারে রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা উপদেশ করেছিলেন। পরীক্ষিৎএর মধ্যে সর্পদংশনজনিত মৃত্যুভয় জন্ম নিয়েছিল। যোগীবর ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ শুকদেবের মুখে এই ভাগবত তত্ত্বের উপদেশ শ্রবণ করার পর তাঁর মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। *যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে। সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমোমুমুচৎ।।১২/১৩/২১।।* আমি সেই সর্বসাক্ষী ভগবান বাসুদেবকে প্রণাম করি যিনি ব্রহ্মাকে এই শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের উপদেশ দান করেছিলেন। তার সাথে আমি সেই মহাযোগী শ্রীশুকদেবকেও নমস্কার করি যিনি শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের ভগবতত্ত্বের উপদেশ সংকীর্তন করে পরীক্ষিৎএর সংসাররূপ সর্পের দংশনজনিত মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করেছিলেন। হে প্রভু! পরীক্ষিৎএর মত আমরা এখনও মৃত্যুভয়ে শিহরিত, কিন্তু প্রভু আপনি এমন কৃপা করুন যাতে জন্ম-জন্মান্তরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে যেন আমরা অবিচল ও অচলা ভক্তি লাভ করি। এই প্রার্থনা করে সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীহরির চরণে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ অনুধ্যান শেষ করছেন।।হরি ওঁ তৎসৎ।। (৭/০৯/২০১৬)

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।

সূচীপত্র